প্রবন্ধ সমগ্র

দ্বিতীয় খণ্ড

মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ
১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট ঃ কলিকাতা-৭৩

ভাদ্র, ১৩৫৬

মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-৭৩
হইতে এস. এন. রায় কর্তৃক প্রকাশিত ও ডি. বি. প্রিন্টার্স, ৪ কৈলাস
মুখার্জী লেন, কলিকাতা-৬ হইতে আর. বি. মণ্ডল কর্তৃক মুদ্রিত।

প্রবন্ধ সমগ্র

দ্বিতীয় খণ্ড

সম্পাদনা
ধীমান দাশগুপ্ত

সূচীপত্র

লেখকের ভূমিকা	vii
সম্পাদকের ভূমিকা	ix
কণ্ঠস্বর	১
সাহিত্যে সংকট	৯১
শিক্ষার সংকট	১৩৫
সংহতির সংকট	২০১
বাংলার রেনেসাঁস	৩০৫

লেখকের ভূমিকা

আমার প্রবন্ধসমগ্রের প্রথম খণ্ডে সংকলিত প্রবন্ধগুলি কালানুক্রমে সাজানো হয়েছিল। দ্বিতীয় খণ্ডে সেই রীতি অনুসরণ করা হয়নি। এবার সাজানো হয়েছে বিষয় অনুসারে। এটা সম্পাদকের ও প্রকাশকের ইচ্ছায়। এতে পাঠকেরও সুবিধা। তাঁকে একই বিষয়ের উপর লেখার জন্যে পরবর্তী খণ্ডের অপেক্ষায় থাকতে হয় না। কিন্তু গবেষকের অসুবিধা। তিনি লেখকের মানসিক বিবর্তনের খেই হারিয়ে ফেলেন। ধরুন, পঞ্চাশ বছর বয়সের লেখার পর আসছে পঁচাত্তর বছর বয়সের লেখা। মানুষের মন তো এক লাফে পঁচিশ বছর ডিঙিয়ে যেতে পারে না। মাঝখানের পঁচিশটা বছর তো বিবর্তন থেমে থাকেনি। একই সময়ে লেখক একাধিক বিষয়ে পড়ে, শোনে, দেখে, শেখে, লেখে। একটি বিষয়ে লিখলেও তার উপরে বয়সের ছাপ পড়ে। কালানুক্রমিক সঙ্কলনে ধারাবাহিক বিবর্তনের সন্ধান মেলে।

প্রবন্ধ লেখা বিষয়নিরপেক্ষ একটি আর্ট। এই প্রসঙ্গে আমি আমার আট বছর আগে প্রকাশিত 'শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধ' সংকলনের ভূমিকার বক্তব্য পুনরাবৃত্তি করছি।

"প্রবন্ধ লেখার আর্ট আমি 'সবুজপত্র'-সম্পাদক প্রমথ চৌধুরী মহাশয়ের কাছে শিখি। বারো তেরো বছর বয়সে। তাঁর অজ্ঞাতসারে। পরবর্তী বয়সে যখন ইংরেজী সাহিত্যের সঙ্গে পরিচিত হই তখন চার্লস ল্যাম্ব, রবার্ট লুইস স্টীভেনসন, ভার্জিনিয়া উল্‌ফ প্রভৃতির প্রবন্ধের আর্ট আমাকে মুগ্ধ করে। ফরাসী সাহিত্যরথী মঁতেন যে সর্বশ্রেষ্ঠ প্রবন্ধকার এটা ভালো করে বোঝবার আগেই আমার মঁতেনের ইংরেজী অনুবাদের সেট্ চুরি যায়। তাঁর কাছে শিক্ষানবীশী আর হয় না।

প্রবন্ধও উৎকৃষ্ট শ্রেণীর আর্ট হতে পারে। কাব্য-নাটক ও উপন্যাস যদিও সাহিত্যের অগ্রজ তিনটি শাখা আর প্রবন্ধ সর্বকনিষ্ঠ তবু প্রবন্ধকেই আমরা দেখি সর্ব ঘটে। তার বৈচিত্র্য অশেষ। আমার অধিকাংশ প্রবন্ধই ফলাকাঙ্ক্ষী রচনা। ফল ফলবার পর তার আর প্রয়োজন থাকে না। সমসাময়িক সমস্যা ও তার সম্ভবপর সমাধান আমাকে ভাবায়। আমিও দশজনকে ভাবাই। কিছু ফল হয়তো ফলে। কিছু হয়তো ফলে না। এটা হলো একজন ইনটেলেক-চুয়ালের কর্তব্য পালন।

বাদবাকী রচনা সাহিত্যিক প্রসঙ্গে আমার উপলব্ধির প্রকাশ। সাহিত্য-গুরুদের প্রসঙ্গ তার মধ্যে পড়ে।"

ফরাসী প্রবন্ধকার মঁতেনের উল্লেখ করেছি। কিছুদিন আগে তাঁর ফরাসী প্রবন্ধসমগ্রের ইংরেজী অনুবাদ দুই প্রকাশক স্বতন্ত্রভাবে প্রকাশ করেছেন। অনুবাদকর্মও স্বতন্ত্র। মঁতেন ছিলেন ষোড়শ শতাব্দীর মানুষ। তাঁর প্রবন্ধ কালোত্তীর্ণ হয়েছে। একই সঙ্গে দেশোত্তীর্ণ। ফরাসী জানিনে। মনে হয় তাঁর মূল রচনাও একই সঙ্গে রসোত্তীর্ণ ও রূপোত্তীর্ণ।

সম্পাদকের ভূমিকা

প্রবন্ধ সমগ্রের দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ডে অন্নদাশঙ্কর রায়ের দেশ কাল ও সংস্কৃতি বিষয়ক যাবতীয় প্রবন্ধ-গ্রন্থ স্থান পেয়েছে। প্রথম খণ্ডের ভূমিকায় আমরা বলেছিলাম, লেখকের প্রবন্ধসাহিত্য তথা গদ্যসাহিত্য তাঁর রুচি, বুদ্ধি, মনন, মনস্বিতা ও ব্যক্তিত্বের প্রকাশ। এই মনন কোন নীরস, নির্জীব, খণ্ড উপাদান মাত্র নয়, তা এক অদ্ভুত সরসতা, সপ্রাণতা ও সৃষ্টিশীলতায় স্পন্দিত। প্রবন্ধসাহিত্যে লেখকের নিজস্ব পথ ও ক্ষেত্র সেই দায়িত্ববোধে যা দেশের ও কালের ভাগ নিতে উদ্বুদ্ধ করে, সেই সাহসে যা জনপ্রিয়তার দিকে না তাকানোর মনোভাবকে জাগ্রত করে, সেই সক্রিয়তায় বুদ্ধিজীবীদের নীরবতার বিরুদ্ধে এক একক ও প্রায় নিঃসঙ্গ সত্যান্বেষী যে প্রতিবাদ করে চলেন। তাঁর প্রবন্ধ-সম্ভার সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র কোন গদ্যকর্ম নয়, বস্তুত তাঁর গদ্যসাহিত্য ও কথা-সাহিত্য পরস্পরের খুব কাছাকাছি। এই বিষয়ে প্রসিদ্ধ সমালোচকদের কয়েকটি উক্তির উদ্ধৃতি দিচ্ছি।

'তাঁর কথাসাহিত্যের গদ্য প্রবন্ধের গদ্যের অন্য পিঠ। বুদ্ধিজীবী এই মিস্টিকের লেখা সর্বত্র একই রকম প্রসন্ন ও উজ্জ্বল, মনীষা ও সহৃদয়তায় আক্রান্ত। শাণিত সংহত অথচ স্বচ্ছ একটি গদ্যভঙ্গিমার জনক তিনি। মুক্তমতি তাঁর রচনার, তা এখনো তারুণ্যে স্পন্দিত।' (—বীতশোক ভট্টাচার্য)

'ভাষায় এমন মুন্সিয়ানা এক প্রমথ চৌধুরী ছাড়া আর কারো লেখায় ইতিপূর্বে দেখিনি (অবশ্য রবীন্দ্রনাথকে বাদ দিয়ে কথা বলাই উচিত)। তাহলেও দুজনের বাচনভঙ্গিতে তফাৎ আছে। প্রমথবাবুর ভাষা ধারালো, তাকে তিনি রসালো করবার চেষ্টা করেননি। গদ্যের গায়ে পদ্যের লেশমাত্র ছোঁয়াচ-টুকুও তিনি বরদাস্ত করেননি। এজন্যে তাঁর গদ্য ইংরেজিতে যাকে বলে একটু rugged ধরনের। অন্নদাবাবুর গদ্যেও ধার যথেষ্ট কিন্তু রসকে তিনি বর্জন করেননি। তবে গদগদ রস নয়; রসের একটু শুধু ময়ান দিয়ে নিয়েছেন। তাতে ভাষার ধার কমেনি, লাবণ্য বেড়েছে। ভারি সপ্রতিভ ভাষা—যে কথাটি যেমনভাবে বলা প্রয়োজন ঠিক সেভাবে বলেন। যুক্তিতর্কের ব্যাপারে তাঁর ভাষা রীতিমতো তুখোড় কিন্তু মুখর নয়। অল্প কথায় অনেক কথা বলতে পারেন। ভাষাটি যেমন চক্‌চকে ঝক্‌ঝকে, রচনার প্রসাদগুণে বক্তব্যও তেমনি জ্বল্‌জ্বলে ঝল্‌মলে। এর মূলে আছে মনের সজীবতা। বয়সে আজ প্রবীণ হলেও মনটি এখনও নবীন। তারুণ্য তাঁর স্বভাবধর্ম, আজীবন তারুণ্যের চর্চা করেছেন। যৌবনদীপ্তি এখনও বিচ্ছুরিত (অন্নদাশঙ্করের) লেখার প্রতিটি ছত্রে।'

(—হীরেন্দ্রনাথ দত্ত)

'তাঁর এই মননপ্রকৃতিই (বিচারকসুলভ মনোবৃত্তি, মার্জিত রুচি এবং শান্ত অথচ শাণিত বুদ্ধির দীপ্তি) প্রতিফলিত হয় তাঁর প্রবন্ধরচনায়। তাঁর মুখের ভাষা ও লেখার ভাষায় ব্যবধান খুবই কম। একমাত্র রবীন্দ্রনাথ ছাড়া আর

কারও মুখের কথা ও লেখার ভাষায় এমন সামীপ্য অনুভব করিনি। আমার বিবেচনায় অন্নদাশঙ্করের প্রবন্ধসম্ভার বাংলা সাহিত্যের মহামূল্য সম্পদ। তাঁর গদ্যশিল্পেরই একটা বিশেষ প্রকাশ দেখা যায় তাঁর প্রবন্ধ রচনায়। এখানেও তাঁর স্বকীয়তা স্বতোভাস্বর। তাঁর গদ্যরচনার এই বিশিষ্টতা আসলে তাঁর ব্যক্তিত্ব ও মনস্বিতারই প্রকাশ। তাঁর মনস্বিতার প্রসঙ্গে মনে পড়ে রবীন্দ্রনাথের একটি উক্তি। দেশনায়ক নামের এক প্রবন্ধে তিনি বলেন—যাঁহারা সাধক, যাঁহারা দেশের গুরু, তাঁহারা খ্যাতি-প্রতিপত্তির অপেক্ষা না রাখিয়া, বিরোধ-অবমাননার আশঙ্কা স্বীকার করিয়াও দেশের মতি ফিরাইতে চেষ্টা করিবেন, আর যাঁহারা দেশের নায়ক, তাঁহারা গতিদান করিবেন। যে-সকল জাতি স্থির হইয়া বসিয়া নাই, যাহারা চলিতেছে, তাহারা এইভাবেই চলিতেছে। একদল উপর হইতে তাহাদের শুভবুদ্ধিকে নিয়মিত করিতেছে, আর একদল বক্ষের মধ্যে থাকিয়া তাহার প্রাণশক্তি গতিশক্তিকে প্রবর্তিত করিতেছে।—আমাদের সদ্য-বিগত জাতীয় জীবনের ইতিহাস অনুধাবন করলেও এই উক্তির সত্যতা প্রতিপন্ন হবে। কিন্তু আমাদের এই কালটা গণতন্ত্রের কাল। বঙ্কিমচন্দ্র, স্বামী বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ লোকগুরুদের দিন ফুরিয়েছে। দেশের মতি ফেরাবার, তার শুভবুদ্ধিকে জাগিয়ে রাখার ও নিয়মিত করার দায়িত্ব এসে পড়েছে একদল মনস্বী ব্যক্তির উপরে। বর্তমানে আমাদের এই মনস্বীদের পুরোভাগেই আছেন সত্যনিষ্ঠ দেশহিতৈষী অন্নদাশঙ্কর। তাঁর এই সত্যনিষ্ঠ দেশহিতৈষণাই দুই রূপে প্রতিফলিত হয়েছে তাঁর ছড়ায় ও প্রবন্ধে।' (—প্রবোধচন্দ্র সেন)

নিজের প্রবন্ধ সম্পর্কে লেখক কী বলছেন তা এবার দেখা যাক। শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধ বইয়ের ভূমিকায় লেখক লিখেছেন—

প্রবন্ধ লেখার আর্ট আমি সবুজপত্র-সম্পাদক প্রমথ চৌধুরী মহাশয়ের কাছে শিখি। বারো তেরো বছর বয়সে। তাঁর অজ্ঞাতসারে। পরবর্তী বয়সে যখন ইংরেজী সাহিত্যের সঙ্গে পরিচিত হই তখন চার্লস ল্যাম্ব, রবার্ট লুইস স্টিভেনসন, ভার্জিনিয়া উল্‌ফ প্রভৃতির প্রবন্ধের আর্ট আমাকে মুগ্ধ করে। ফরাসী সাহিত্যরথী মঁতেন যে সর্বশ্রেষ্ঠ প্রবন্ধকার এটা ভালো করে বোঝবার আগেই আমার মঁতেনের ইংরেজী অনুবাদের সেট চুরি যায়। তাঁর কাছে শিক্ষানবীশী আর হয় না।

প্রবন্ধও উৎকৃষ্ট শ্রেণীর আর্ট হতে পারে। কাব্য, নাটক ও উপন্যাস যদিও সাহিত্যের অগ্রজ তিনটি শাখা আর প্রবন্ধ সর্বকনিষ্ঠ তবু প্রবন্ধকেই আমরা দেখি সর্ব ঘটে। তার বৈচিত্র্য অশেষ। আমার অধিকাংশ প্রবন্ধই ফলাকাঙ্ক্ষী রচনা। ফল ফলবার পর তার আর প্রয়োজন থাকে না। সমসাময়িক সমস্যা ও তার সম্ভবপর সমাধান আমাকে ভাবায়। আমিও দশজনকে ভাবাই। কিছু ফল হয়তো ফলে। কিছু হয়তো ফলে না। এটা হলো একজন ইনটেলেকচুয়ালের কর্তব্যপালন।

(আমার) বাদবাকী রচনা (প্রবন্ধ) সাহিত্যিক প্রসঙ্গে আমার উপলব্ধির প্রকাশ। সাহিত্যগুরুদের প্রসঙ্গ তার মধ্যে পড়ে।

অর্থাৎ লেখক তাঁর প্রবন্ধগুলিকে মূলত দুটি ভাগে ভাগ করছেন, সমস্যামূলক ও সাহিত্যবিষয়ক। আমি কিন্তু আরও কয়েকটি অতিরিক্ত ভাগে ভাগ করার পক্ষপাতী। লেখকের প্রবন্ধ সাহিত্যের একটি বড় অংশ নিঃসন্দেহে সমস্যামূলক প্রবন্ধের। তাঁর প্রথম প্রকাশিত প্রবন্ধই (উনিশ বছর বয়সে লেখা) সমস্যামূলক : 'পারিবারিক নারীসমস্যা'। সমস্যা সমাজ-রাজনীতি-সংস্কৃতি-বিশ্বজগৎ নানা বিষয়ে হতে পারে। সাহিত্য-প্রসঙ্গও তাঁর প্রবন্ধসাহিত্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে রেখেছে কোন সন্দেহ নেই। এর পর ও এর বাইরে নতুন যে কটি ভাগ আমি করতে চাই তার প্রথমটি অর্থাৎ সব মিলিয়ে লেখকের প্রবন্ধসাহিত্যের তৃতীয় ভাগটি হলো জীবনীমূলক। এর মধ্যে সাহিত্যগুরু ও সাহিত্যিকদের জীবনের কথা হয়তো দ্বিতীয় ভাগে অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে, কিন্তু সাহিত্যিক নন এমন আরও বহু ব্যক্তি ও ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে লেখকের মূল্যায়ন ও স্মৃতিচারণ জীবনীমূলক প্রবন্ধের অন্তর্গত হবে। প্রবন্ধ সমগ্রের চতুর্থ ও পঞ্চম খণ্ড লেখকের জীবনীমূলক প্রবন্ধাদির সংগ্রহ। চতুর্থ ভাগটিকে বলতে চাই আত্মজীবনীমূলক—লেখকের জীবন, জীবনদর্শন ও সাহিত্যিক বিবর্তন বিষয়ক রচনাদি এবং ব্যক্তিগত প্রবন্ধ ও পত্র। প্রবন্ধ সমগ্রের শেষ খণ্ডে এ-জাতীয় বহু রচনা স্থান পেয়েছে। এর সঙ্গে পঞ্চম একটি ভাগও হয়তো করা যায়, যাকে বলবো বিবিধ বা miscellaneous.

রচনাবলীর বর্তমান ও পরবর্তী খণ্ডে যে-সমস্ত গ্রন্থ আছে তার মধ্যে সাহিত্যে সংকট, শিক্ষার সংকট ও সংহতির সংকট সমস্যামূলক ; আর্ট বিষয়-বস্তুর জন্য যতটা তার চাইতে বেশি রচনাভঙ্গির জন্য, আমার মতে, আত্মজীবন-মূলক (বিনুর বই-য়ের মতো) ; কণ্ঠস্বর, সংস্কৃতির বিবর্তন, বাংলার রেনেসাঁস ও শিক্ষার ভবিষ্যৎ জাতীয় গ্রন্থের জন্য নতুন একটি শ্রেণীকরণের প্রয়োজন হতে পারে—ঐতিহাসিক, অথবা সমস্যামূলক (critical অর্থে) শ্রেণীটিকে একাধিক ভাগে ভাগ করা যেতে পারে, যেমন—সমসাময়িক, ঐতিহাসিক, ইত্যাদি। আমি এই ভূমিকার শুরুতে দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ডে স্থানপ্রাপ্ত প্রবন্ধ-গ্রন্থগুলির একটি অন্য ধরনের শ্রেণীবিভাজন করেছি—দেশ-বিষয়ক, কাল-বিষয়ক ও সংস্কৃতিবিষয়ক। এই বিভাজন বিষয়ভিত্তিক, যেখানে পূর্বোক্ত বিভাজনকে পদ্ধতিভিত্তিক বলা যেতে পারে।

পদ্ধতির কথায় বলতে হয়, পরে এই বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছি বলে এখানে খুব সংক্ষেপে শুধু বলছি, তাঁর অধিকাংশ প্রবন্ধের আদর্শ হলো সবচেয়ে কম কথায় সবচেয়ে বেশি ভাব সবচেয়ে সহজ ও সরস ভাবে প্রকাশ। শুধু সহজ সামান্য কথায় জটিল প্রশ্নগুলির আলোচনাই যথেষ্ট নয়, প্রবন্ধে যুক্তি ও তর্কের সঙ্গে, বুদ্ধির পাশাপাশি, রসের উপস্থিতিও জরুরি। একাধিক সাক্ষাৎকারে লেখক প্রবন্ধে সরসতার প্রতি তাঁর বিশেষ মনোযোগের কথা বলেছেন। সরসতা সত্ত্বেও তাঁর প্রবন্ধ রম্যরচয়িতার মেজাজে লেখা নয়, তথ্যনিষ্ঠ রচনা, বিচারকের দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে লেখা, মোহমুগ্ধের দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে নয়।

এই সূত্রেই আসে এবং প্রসঙ্গ ও পদ্ধতির পরে আসে, মনোবৃত্তির কথা। এ-

বিষয়ে 'লেখার কথা' প্রবন্ধে লেখক বলেছেন, কেন লিখি ? এ প্রশ্ন আমাকে একদা অস্থির করে তুলেছিল। দেখা গেল অনেক সময় ওটা আমার অপ্রিয় কর্তব্য। যেখানে অন্যায় হচ্ছে, কেউ মুখ ফুটে প্রতিবাদ করছে না, সেখানে আমাকেই লেখনীর মুখে দু-কথা বলতে হবে। আমার অনেক লেখা বিশুদ্ধ কর্তব্যবোধ থেকে। কিন্তু সমস্যা বেশী দিন থাকে না, সমাধান এক ভাবে না এক ভাবে হয়ে যায়। না হলেও মানুষ তা নিয়ে জ্বালাতন হয় না। আমার লেখার তা হলে শাশ্বত মূল্য কী ? শুধুমাত্র ঐতিহাসিক মূল্য নিয়ে আমার কোন তৃপ্তি ? এর থেকে এলো আরেক রকম লেখা যা কর্তব্যের অনুরোধে নয়। যার উৎস আনন্দ। অহেতুক আনন্দ। পিওর ডিলাইট। যে লেখে তারও আনন্দ, যে পড়ে তারও। একবার এ রকম লেখা যার হাত দিয়ে হয়েছে সে কখনো সাধ করে আর কিছু লিখতে চাইবে না। আমার ডান হাত চিরকালের মতো পিওর ডিলাইটের জন্যে রাখা। কর্তব্যের জন্যে বাম হাত।

এই কর্তব্যবোধের কথাই মনোবৃত্তির প্রসঙ্গে প্রধানত আসে। অন্নদাশঙ্কর রাজনৈতিক ভাবে, অর্থনৈতিক ভাবে, সামাজিক ভাবে, নান্দনিক ভাবে—সমস্ত দিক থেকেই একজন মুক্ত লেখক, **free writer.** আর দার্শনিকদের মতে **freedom is responsibility.** অন্নদাশঙ্করের প্রবন্ধে সেই দায়িত্বেরই প্রতিফলন ঘটেছে। যদিও আনন্দময় লেখা যে-হাত দিয়ে হয়েছে সেই হাতে আর কিছু লিখতে সাধ হয় না, তবু কর্তব্যপ্রসূত লেখা লিখে ওঠাই অনেক সময়ে হয়ে ওঠে মুখ্য কাজ। রাজনীতি নিয়ে আর কিছু লিখতে অ্যালার্জিক বোধ হলেও রাজনীতি নিয়েই লিখতে হয়। জাতীয় জীবনও এখন এত জটিল হয়ে পড়েছে যে তা নিয়ে লেখা নিছক সাহিত্যিকের কর্ম নয়, তার জন্য কিছুটা সমাজবিজ্ঞানী ও দার্শনিকও হতে হয়। অন্নদাশঙ্কর তা অনেকাংশে হতে পেরেছেন। এই ব্যাপক ও দূরপ্রসারী দৃষ্টিভঙ্গির জন্যই লেখকের অনেক সমসাময়িক প্রবন্ধও যুগোত্তীর্ণ হতে পারে। আমি লেখকের প্রবন্ধগুলিকে সমসাময়িক ও চিরকালীন—এই দুই ভাগে ভাগ করে একটি ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকারে এই মত প্রকাশ করেছিলাম যে বাংলাদেশ যুদ্ধ বা ভারতে জরুরি অবস্থা নিয়ে লেখা তাঁর প্রবন্ধগুলি একেবারেই সাময়িক ধরনের যার উত্তরে লেখক বলেছিলেন যে, দেশ ভাগ, নতুন দেশ সৃষ্টি বা একাধিক দেশের একত্র মিলে একটি নতুন দেশগঠন একটা সনাতন বা চিরকালীন প্রসঙ্গ হতে পারে যেমন যে-কোন দেশে যে-কোন কালেই জরুরি অবস্থা নানাভাবে প্রতিভাত হতে পারে এবং এর সঙ্গে জনগণের ভাগ্য ও ব্যক্তিস্বাধীনতার যে প্রশ্ন জড়িত তাও এক চিরকালীন প্রশ্ন।

দেশকালপাত্র বা প্রসঙ্গের চিরকালীনতার প্রশ্নে লেখক যুগ, যুগ থেকে শতাব্দী, শতাব্দী থেকে সহস্রাব্দীরও কথা বলেন : 'একটি শব্দও এত শক্তিমান হতে পারে যে হাজার বছর ধরে মানুষের জীবনকে প্রভাবিত করতে পারে। একটি বাক্যের জন্যে হয়তো একটা যুগ অপেক্ষা করছিল, যেই ওটি উচ্চারিত হলো অমনি মানুষ পেয়ে গেলো তার ভাবনার কণ্ঠস্বর। একটি আইডিয়াও ইতিহাসে নতুন অধ্যায় সূচনা করতে পারে। অষ্টাদশ শতাব্দীর ইউরোপে

যেসব আইডিয়ার বীজ বুনে দেওয়া হয় সেসব সারা উনবিংশ শতাব্দী ধরে কাজ করে।'

আসলে 'শিল্পীকে যেমন করতে হয় গর্ভরক্ষা তেমনি মানবিকবাদীকে বা ধ্যানীকে করতে হয় বীজরক্ষা। চাষীরা যেমন বীজধান রক্ষা করে তেমনি আদর্শবাদীদেরও রক্ষা করতে হয় সেইসব আদর্শ যেসব পরে একদিন অঙ্কুরিত হবে, বিকশিত হবে, ফুটবে ও ফলবে। বীজধান একবার যদি নষ্ট হয়ে যায় তবে কে জানে ক' শতাব্দী লাগবে তাকে ফিরে পেতে। ইউরোপের ইতিহাসে যেটাকে বলে অন্ধকার যুগ সেটা ছিল নষ্ট হয়ে যাওয়ার যুগ। যেটাকে বলে রেনেসাঁসের যুগ সেটা ফিরে পাওয়ার যুগ। আমাদের ইতিহাসেও কি তার অনুরূপ দেখা যায় না? পাশ্চাত্ত্য রেনেসাঁসের সংস্পর্শে এসে ভারতের মধ্যবিত্ত শ্রেণী গত শতাব্দীতে রেনেসাঁস ঘটায়। সেটা মৌলিক নয় বলে বা জনগণের নয় বলে কম মূল্যবান নয়। তার রেশ এখনো মিলিয়ে যায়নি। তার সঙ্গে অন্বয় রক্ষা করছি আমরা একালের শিল্পী ও ভাবুকরাও।' বাংলার রেনেসাঁস গ্রন্থে এই ইতিহাস ও বর্তমান পরিস্থিতির বিস্তৃত বর্ণনা আছে। লেখক এও বিশ্বাস করেন যে ভারতের জনগণই একদিন আনবে ভারতের মৌলিক রেনেসাঁস। সেটা ইউরোপের সঙ্গে মেলানো গত শতকের মধ্যবিত্তশ্রেণীর ক্ষীণপ্রাণ রেনেসাঁস নয়। এই রেনেসাঁসের যাঁরা নায়ক হবেন তাঁদের হৃদয় পড়ে থাকবে না কয়েকটি মহানগরে।

এ-সমস্ত কিছু নিয়েই লেখককে ভাবতে হয়, লেখক ভাবেনও। সাহিত্য দর্শন ধর্ম রাজনীতি ইত্যাদি তো এক একটা পরস্পরবিচ্ছিন্ন কক্ষ নয়। যাবতীয় মানবিক কার্যকলাপই পরস্পরকে প্রভাবিত করতে পারে। ভাবনা একবার প্রকাশ পেলে বহুদূর দেশ ও বহুদূর কাল অবধি যেতে পারে এবং বহু বড় বড় ঘটনা ঘটাতে পারে। কিন্তু তার উপর দৃষ্টি রেখে সৃষ্টি করতে গেলে কোন লেখকের একূল ওকূল দুকূল যেতে পারে। তাই অন্নদাশঙ্কর নিজেকে কোন ঐতিহাসিক বা প্রাকৃতিক শক্তি অথবা একটা মরাল ফোর্স হিসেবে ভাবেন না। তবে এও জানেন এসব শক্তির কিছু-কিছু যে তাঁর ভিতরে একেবারেই নেই তাও নয়। 'আমার দেশ, আমার কাল, আমার সমাজ, আমার রাষ্ট্র, আমার চেনা অচেনা অসংখ্য মানুষ, আমার অন্তরে যা আছে আর বাইরে যা আছে, প্রকৃতি ও ভগবান ও বিশ্বের অন্তর্নিহিত নৈতিক বিধান—সবাইকে নিয়ে আমি, আমাকে নিয়ে সবাই।'

আবার 'আমি কি কেবল মানুষ? আমি কি প্রাণীজগতের একজন নই?… তারপর আমি কি কেবল একালের? কেবল এদেশের? পরমাত্মার মতো অন্তরাত্মাও নিরুপাধিক। তাকে দেশচিহ্নিত বা কালচিহ্নিত করা যায় না। আমার যে সত্যিকার আমি তার না আছে জন্ম না আছে মরণ, সে নিত্য বর্তমান ও বহমান স্পেস টাইমের ভিতর দিয়ে চলেছে, কিন্তু তা বলে স্পেস টাইমের ভিতরে সে নিবদ্ধ নয়, স্পেস টাইমের ঊর্ধ্বেও সে আছে, বাইরেও সে আছে।'

লেখকের নিজের এই নিভৃত উপলব্ধি, এই জ্যোতির্ময় ভিশন (vision) বহু নিবিড় অন্ধকারের মধ্যেও তাঁকে বাঁচিয়েছে। লেখকের বোধ হয়েছে, সব

মিথ্যা হতে পারে, কিন্তু প্রত্যক্ষ উপলব্ধি কখনো মিথ্যা হতে পারে না। এইভাবে লেখকের ইনটেলেকট যেখানে পরাস্ত হয়েছে ইনটুইশন সেখানে শেষরক্ষা করেছে। এর দ্বারা কিন্তু ইনটেলেকটকে খাটো করা হয় না। জাগতিক ব্যাপারের খুঁটিনাটি বুঝতে হলে ইনটেলেকটের উপর নির্ভর করতেই হয়। যেমন চিরন্তন সত্যের জন্য ইনটুইশনের প্রয়োজন। আবার প্রাণীজগতের একজন রূপে লেখকের মধ্যে ইনস্টিংকটও আছে। তার জন্যেও তাঁর জীবনে স্থান আছে। যেমন ইনটুইশন, যেমন ইনটেলেকট, তেমনি ইনস্টিংকটও তাঁর পথপ্রদর্শক। লেখকের প্রবন্ধসাহিত্য এই ত্রিবেণী সঙ্গমের সর্বশ্রেষ্ঠ উদাহরণ।

অন্নদাশঙ্কর তাঁর প্রবন্ধে সর্বদা আচারের চেয়ে (শাস্ত্রাচার ও লোকাচার, দেশাচার ও যুগাচার) বিচারকে উচ্চতর স্থান দিয়েছেন এবং এইভাবে বারবার দুঃসময়ে আলো দিয়েছেন আমাদের। বস্তুত সাহিত্যগুরুদের কাজ তা-ই। 'কতক লোক থাকবেন যাঁরা আলোর তপস্যা করবেন ও আলোক দেখিয়ে যাবেন। সমসাময়িক সমাজ তাঁদের অগ্রাহ্য করলেও, পরে তাঁদের কথাই সমাজ মেনে নেবে।'

একজন বিখ্যাত চিত্রকর অন্নদাশঙ্করের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এসে তাঁকে বলেছিলেন, এই (বিরূপ) পরিবেশে মানুষ কী করতে পারে? এ-প্রশ্ন শুধু একজন চিত্রকরের নয়, সকল শিল্পীর মনের কথা। সকল স্রষ্টার, যাঁরা মানুষের সৃষ্টিধারাকে বহমান রাখেন। এই প্রশ্নের লেখক-কৃত উত্তর হবে এই যে, পরিবেশের চেয়ে তিনি মানুষকেই বড় বলে জানেন। তাঁর মতে সমস্ত সংকটের মধ্যেও শিল্পীকেও সৃষ্টির স্রোত প্রবহমাণ রাখতে হবে।

এমনিতে সাহিত্যিকদের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ শোনা যায় যে, তাঁরা সমাজ-সচেতন নন, তাঁরা গজদন্তের মিনারে বাস করেন, তাঁদের চোখের সামনে রোমনগরী পুড়ে ছারখার হলেও তাঁদের বেহালাবাদন থামে না। এই ধরনের একটি অভিযোগের উত্তরে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় এইচ জি ওয়েলস বলেছিলেন, আমিই হচ্ছি সেই সভ্যতা যাকে রক্ষা করার জন্য তোমরা লড়ছো।

অন্নদাশঙ্কর একদিকে তাঁর সৃষ্টিশীল সাহিত্যের মধ্য দিয়ে এই উক্তির অংশীদার, অন্যদিকে দুঃসময়ে বাঙালি বুদ্ধিজীবীর নীরবতার বিরুদ্ধে এক সচেতন প্রতিবাদও। মনোবৃত্তি প্রসঙ্গে এ-সমস্ত কথাই জরুরি এবং সে-ক্ষেত্রে তাঁর প্রবন্ধসম্ভার অনেকটাই রাসেলের প্রবন্ধাবলীর সগোত্র।

আলোচনার এই পর্যায়ের উপসংহারে বলা যায় যে, লেখক নিজেকে মুখ্যত রসিক শিল্পী বলেই মানেন। তাঁর জীবনদর্শন মোটের উপর একজন শিল্পীরই জীবনদর্শন। যে শিল্পীর বহির্জীবনের চেয়ে অন্তর্জীবনই সক্রিয়। যার নিজের সঙ্গে নিজের বোঝাপড়া সমস্তক্ষণ চলেছে, যেমন বিশ্বের সঙ্গে বোঝাপড়াও। নিজেকে স্বাধীন ও সৃষ্টিশীল লেখক রূপে পরিচয় দিতেই তাঁর গর্ব, না, কালচারাল ওয়ার্কার এই পরিচয়ে নয়। ওয়ার্কার হতে তাঁর আপত্তি নেই, কিন্তু কালচারাল ওয়ার্কার হতে আপত্তি। তিনি ক্রিয়েটিভ রাইটার এবং এই ক্রিয়েটিভিটিরই এক ক্রিটিকাল রূপ তাঁর প্রবন্ধসাহিত্যে।

ওই ক্রিয়েটিভিটি প্রসঙ্গে আর্টের কথা আসে ও আর্টের প্রকৃতি বিষয়ে কথা। যে আর্টের উদ্দেশ্য কিনা, লেখকের ভাষায়, লীলা।

আর এই লীলার কথায় লেখকের যৌবনে বিশ্বাসই প্রকাশ পায়—

যৌবনের দূত আমি যৌবনের শেষে
হেথা হতে যাব চলে অন্য কোনোখানে
সেখানেও নিত্য লীলা মাধবীবিতানে।
যৌবন পোহালে যাব যৌবনের দেশে। (—বসন্তের দূত)

লেখক এও বলেছেন, রূপ রস গন্ধের জগৎ, ঘটনার পর ঘটনার জগৎ, তথ্যের ও যুক্তির জগৎ, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ও বুদ্ধিগ্রাহ্য জগৎ—এই বাইরের মহল ছাড়িয়ে আর্টের অন্দরমহলে বিশুদ্ধ সৌন্দর্য, চিরবসন্ত। বসন্ত অর্থে এখানে যৌবন। তা 'যে চায় সে পায়। আর যে পায় সে তার প্রাপ্তির সৌরভ বিতরণ করে।' আর্টিস্টের কাজ ওই।

কী শিল্পদৃষ্টিতে, কী জীবনদর্শনে, কী জাতীয় জীবনের ক্ষেত্রে সর্বত্রই অন্নদাশঙ্কর যৌবনে বিশ্বাসী। আর এই বিশ্বাস থেকেই তিনি দুর্মর ভাবে আশাবাদী: 'যৌবনের ধর্ম হচ্ছে অদমনীয়তা। যুবকের মন কিছুতেই দমে না। যার মন দমে যায় সে যুবক নয়, সে জরাগ্রস্ত। যে দেশে যৌবন সর্বদা কাজ করছে সে দেশ বারবার পড়ে গেলেও বারবার উঠে দাঁড়ায়। সে দেশে আবার আদর্শবাদী জন্মায়, আবার তপস্যা শুরু হয়, আবার জোয়ার আসে। ভারত যদি সেইরকম একটি দেশ হয়ে থাকে তবে তার যৌবন তাকে নতুন নেতৃত্ব দেবে। আমরা যেন আমাদের দেশের নিত্য বহমান যৌবনস্রোতে বিশ্বাস না হারাই। এর মধ্যে নতুন সৃষ্টির ও দৃষ্টির বিপুল সম্ভাবনা আছে। সে সম্ভাবনা আর কেউ কেড়ে নিতে পারে না।'

"অন্নদাশঙ্করবাবুর লেখার সঙ্গে যাঁদের পরিচয় আছে তাঁরা লক্ষ্য করবেন, সূর্যাস্তের শেষ রশ্মি যেমন লেগে থাকে আকাশের গায়ে, পর্বতচূড়ায়, বৃক্ষশাখায়, অন্নদাশঙ্করের যৌবনদীপ্তি এখনও বিচ্ছুরিত লেখার প্রতিটি ছত্রে।"

"এই প্রত্যয় তাঁর আছে বলেই অন্ধকারে আজো তিনি আলোকস্তম্ভ। জোয়ার যদি আসে এই মহৎ শিল্পী এবং ভাবুকের জীবন ও রচনাবলী আগামী প্রজন্মকেও প্রেরণা জোগাবে।"

লেখকের যৌবনদীপ্তি দিয়ে যে ভূমিকা শুরু করেছিলাম, লেখকের যৌবনে বিশ্বাস বিষয়ক সমালোচকদের এই দুটি উক্তি দিয়ে আমাদের সেই ভূমিকা শেষ করছি।

কণ্ঠস্বর

টলস্টয়, গান্ধী ও আমি

আমার যখন সতেরো কি আঠারো বছর বয়স তখন আমি আবিষ্কার করি যে আমি অন্তর থেকে নৈরাজ্যবাদী। আমার পছন্দ রাষ্ট্রহীন অস্তিত্ব: সৈন্য নেই, পুলিশ নেই, নেই ম্যাজিস্ট্রেট, নেই আদালত। পরিবার, বিবাহ, জাত, শ্রেণী: এগুলিতে আমার বিশ্বাস অল্পই। সম্পত্তি, মালিকী স্বত্ব, উত্তরাধিকার, টাকা খাটানো: এগুলোরও কোনো অর্থ হয় না আমার কাছে।

অদৃষ্টের এমনি পরিহাস যে আমিই হয়ে দাঁড়াই রাষ্টযন্ত্রের অঙ্গ। ম্যাজিস্ট্রেট হয়ে পুলিশ নিয়ে কাজ করি। জজ হয়ে আইন প্রয়োগ করি। আবার ম্যাজিস্ট্রেট হয়ে ফৌজ নিয়ে কাজ করি, স্বরাজের পরে অর্ধসামরিক ক্রিয়াকলাপ পবিচালন করি। বেশ বুঝতে পারি যে আমার জীবিকা নির্ভর করে প্রতিষ্ঠিত ব্যবস্থাকে কায়েম রাখাব উপর। যে ব্যবস্থা বৈদেশিক শাসনের চেয়েও গভীর, ধনতন্ত্রের চেয়েও বনেদী, ফিউডালিজমের চেয়েও প্রাচীন।

তবে কি আমি আমার নৈরাজ্যবাদ বিসর্জন দিই বা অতিক্রম করি? না। বরঞ্চ উপলব্ধি করি যে নৈরাজ্যবাদের মধ্যে রয়েছে আরো উন্নত, আরো তৃপ্তিকব ব্যবস্থার প্রতিশ্রুতি। যদি নৈরাজ্যবাদের পূর্বে একটি বিশেষণ বসানো হয়। বিশেষণটি 'অহিংস'। এ কথা অক্ষরে অক্ষরে সত্য যে আগে আসবে অহিংসা, তার পরে আসবে নৈরাজ্যবাদ।

এমনি করে আমি অন্তরের প্রত্যয় থেকে হলুম অহিংস 'নৈরাজ্যবাদী। এ ক্ষেত্রে আমার গভীর সাযুজ্য ছিল টলস্টয়ের সঙ্গে, গান্ধীব সঙ্গে। একই বিশ্বাসে বিশ্বাসবান আমবা। সে বিশ্বাস দাঁড়িয়েছে ঋদ্ধ অভিজ্ঞতার অচলের উপরে। রণজর্জর জগতে আমরা ধরে আছি সেই নিশ্চিত বিশ্বাসকে যে বিশ্বাস স্থির থাকবে সব বিপর্যয়ের পরেও, সব ভাঙাচোরার পরেও।

কিন্তু এব মানে কি এই যে আমি টলস্টয়বাদী বা গান্ধীবাদী? না। তার কারণ তাঁদের সঙ্গে দু'তিনটি জায়গায় আমার গুরুতর মতভেদ আছে।

প্রথমত, আমার কাছে আর্ট হচ্ছে নিজেই নিজের লক্ষ্য। মহত্তর লক্ষ্যের উপলক্ষ্য হতে গেলে আর্ট তার আত্মাকে হারায়। অহিংস নৈরাজ্যবাদী হিসাবে আমার আত্মাকে পেতে গিয়ে আর্টিস্ট হিসাবে আমি আমার আত্মাকে হারাতে রাজি নই। নতুন সমাজব্যবস্থায় শিল্পীকে ছেড়ে দিতে হবে তার নিজের মতো করে বাঁচতে, তার নিজের মনের মতো সৌন্দর্যপ্রতিমা গড়তে। তার জীবিকার জন্যে সে এমন লোকের অনুগ্রহনির্ভর হবে না যারা শিল্পকে শিল্প বলে মূল্য দেয় না। এ জায়গায় আমি টলস্টয় ও গান্ধীর মতো আপোসহীন, কিন্তু তাঁদের বিরুদ্ধে।

দ্বিতীয়ত, প্রেম বলতে আমিও মানবপ্রেম বুঝি, যেমন বুঝতেন টলস্টয় ও গান্ধী। কিন্তু আমি প্রেম বলতে আরো বুঝি পুরুষের প্রতি নারীর ও নারীর প্রতি পুরুষের প্রেম। টলস্টয়ের সারাজীবন গেল এর সঙ্গে যুঝতে। গান্ধীও বৃথা চেষ্টা করলেন সন্তোষজনক সমাধানে পৌঁছতে। টলস্টয়ের

অপূর্ব জ্ঞান সত্ত্বেও, গান্ধীর নিখুঁৎ শিভ্যালরি সত্ত্বেও নারীকে তাঁরা কেউ চিনতেই পারলেন না। অচেতনভাবে নারীকে তাঁরা দেন অধীনতার ভূমিকা, যেমন দিয়ে এসেছেন ধার্মিক পুরুষেরা এতকাল মাতৃত্বের নামে। গৌরবে দিশাহারা হয়ে। আসলে কিন্তু নারীকে তাঁরা নরকের মতো ডরাতেন। তাঁদের সহজাত সংস্কার তাঁদের বলত, নারী ও পাপ এক অপরের সঙ্গে যুক্ত। আমি এ মনোবৃত্তি সম্পূর্ণ অস্বীকার করি। নতুন সমাজব্যবস্থায় মানবপ্রেম ও নরনারীর প্রেম সমান গুরুত্ব পাবে।

তৃতীয়ত, টলস্টয় বা গান্ধী কেউ বিশ্বাস করতেন না আধুনিক সভ্যতায়। আমি বিশ্বাস করি। এই সভ্যতার কতকগুলি মূল্য যে মন্দ তা আমিও মানি। কিন্তু কতকগুলি মূল্য আছে যা ভালো, যা উৎকৃষ্টতর, যা অনন্য। এই মার্গই বিবর্তনের মার্গ। এই মার্গে চলতে চলতে আমরা মন্দকে অতিক্রম করতে পারি। যন্ত্রপরায়ণ, নাগরিক, প্রকৃতির সঙ্গে যুধ্যমান, দুর্বলের যম, নির্মমভাবে হিংস্র এই সভ্যতা নিজের হাতেই মরবে, যদি না এর অন্তরের পরিবর্তন হয়। তা বলে এর কীর্তিগুলো কেবলমাত্র আধিভৌতিক নয়। আধ্যাত্মিকও বটে। এ সভ্যতা আমাদের বহু পরিমাণে দিয়েছে অভাব থেকে, উৎপীড়ন থেকে, অতীত-উপাসনা থেকে, পারলৌকিকতা থেকে, সামাজিক অবিচার থেকে মুক্তি। বহু পরিমাণে সাম্য, বহু পরিমাণে জ্ঞান। বহির্বিশ্বের জ্ঞান তো বটেই, অন্তর্জগতের জ্ঞানও। সত্যই যে ভগবান, এটি আধুনিক সভ্যতারই দান। এমন কি অহিংসার নতুন ব্যাখ্যাও আধুনিক সভ্যতার কল্যাণে। টলস্টয় ও গান্ধী উভয়েই আধুনিক সভ্যতার সন্তান। আমিও। কিন্তু সজ্ঞানে।

(১৯৫৩)

জনগণ ও আমরা

শ্রীমান পুণ্যশ্লোক রায় প্রশ্ন করেছেন সাম্যবাদীদের। উত্তর দিচ্ছি আমি। এর থেকে মনে হতে পারে আমিও একজন সাম্যবাদী। তা নয়। যদিও আমি সাম্যে বিশ্বাস করি ও সাম্যের দিকে দেশকে অগ্রসর করে দিচ্ছি তবু আমি সাম্যবাদ নামক কোনো মতবাদে দীক্ষা নিইনি। আমি ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী। লোকে ভুল বুঝবে, নইলে বলতুম আমি নৈরাজ্যবাদী। সাম্যবাদী যাঁরা তাঁরা সমাজকে ব্যক্তির ঊর্ধ্বে স্থান দেন, তাঁরা সমাজবাদী। যদিও আমি সমাজকে সমাজের প্রাপ্য দিতে সব সময় রাজি তবু ব্যক্তির হাতে রাখতে চাই নিজের মনের মতো করে বাঁচবার অধিকার।

এখন ভেবে দেখা যাক জনগণ কারা, আমরাই বা কে। কিছুদিন আগে এক বিখ্যাত সাম্যবাদী কবি বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের সঙ্গে আলাপকালে বার বার বললেন, "ওরা" আর "আমরা"। ওরা মানে গাঁয়ের চাষী মজুর, বস্তির মুসলমান, কারখানার মজুর। আর আমরা মানে শহরের ভদ্র

মধ্যবিত্ত, শিক্ষিত হিন্দু। তিনি দীর্ঘকাল সাম্যবাদের সাধনায় নিযুক্ত। বহুবার কারাবাস করেছেন, মাটির তলায় থেকেছেন। আপন জন বলতে নিশ্চয়ই তিনি বোঝেন মেহনতী জনতাকে। কিন্তু যেই নিজের ভাই বোন স্ত্রী শ্যালক আত্মীয় স্বজনের সঙ্গে মিলিত হন অমনি মুখ দিয়ে সত্যি কথাটা বেরিয়ে যায়। "ওরা" চিরদিন "ওরা", আর "আমরা" চিরদিন "আমরা"। এ সংস্কার বিশ পঁচিশ বছরের সাম্য সাধনায় ক্ষয় হয়নি। হবেও না। কারণ সত্যি সত্যি তো তিনি শ্রেণীচ্যুত হচ্ছেন না। তাঁর সাধনায় তিনি সিদ্ধিলাভ করবেন সেই দিনই যেদিন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের বলতে পারবেন, "আপনারা" আর "আমরা", আপনারা শিক্ষিত ভদ্র মধ্যবিত্ত শ্রেণী আর আমরা অশিক্ষিত ক্ষেত-মজুর কল-মজুর শ্রেণী।

তার কথা উল্লেখ করলুম এইজন্যে যে তিনি প্রাণপণ চেষ্টা করেও জনগণকে আপন ভাবতে পারেন নি, তাঁর আপন হচ্ছে উপরের দিকের একটি শ্রেণী, তাও সর্বোচ্চ শ্রেণী নয়। তাঁর কথা তাঁর শ্রেণীর অনেকের কথা। আমিও আত্মপরীক্ষা করে দেখেছি যে আমার মধ্যেও শ্রেণীচেতনা কাজ করছে। আমি এক এক করে জাতের বেড়া, ধর্মের বেড়া, নেশনের বেড়া ভেঙেছি। শ্রেণীর বেড়া ভাঙতে চেয়েছি, পারিনি। সমাজে যা পারলুম না সাহিত্যে তা পারব ভেবেছিলুম। এখন পর্যন্ত তাও সম্ভব হয়নি। সাম্যবাদী নই বলেই রক্ষা, নইলে আমি লজ্জায় মুখ দেখাতে পারতুম না। আমার সান্ত্বনা এই যে আমার কাছে কেউ কোনো দিন এমন কোনো প্রতিশ্রুতি পায়নি যে আমি শ্রেণীচ্যুত হব বা শ্রেণীশূন্য সমাজ গড়ব। তবে সেইটেই কাম্য। আমিও তাই বিশ্বাস করি।

আমার ভাবতে ভালো লাগে যে সকলেই আমার আপন জন, কেউ পর নয়। যদিও আমার আহার বিহার একটি বিশেষ শ্রেণীতে তবু এরাই "আমরা', আর বাদ বাকী সকলে "ওরা" এ কথা ভাবতে আমার সত্যি কষ্ট হয়। সব দেশের, সব সম্প্রদায়ের, সব শ্রেণীর লোক আমাকে আপন বলে গণ্য করুক, পর বলে দূরে সরিয়ে না রাখুক, এই আমার অন্তরের বাসনা। কিন্তু দীর্ঘকালের অভিজ্ঞতার ফলে হাড়ে হাড়ে বুঝতে পেরেছি জন্মগত সংস্কার কাপড় ছাড়ার মতো সহজ নয়, একে কাটিয়ে উঠতে হলে মান অভিমান লাজ ভয় আরাম আয়েস সুযোগ সুবিধা ছাড়তে হয়। মুসলমানের সঙ্গে মুসলমান হতে চাইলে গোরু খেতে হবে, শুধু 'ঈশ্বর আল্লা তেরে নাম' বললে চলবে না। চাষীর সঙ্গে চাষী হতে চাইলে উদয়াস্ত লাঙল ঠেলতে হবে, মজুরের সঙ্গে মজুর হতে হলে মজুরির অর্থে সংসার চালাতে হবে। এসব যদি কেউ পারে তা হলে সে জনগণকে "ওরা", বলবে না, মধ্যশ্রেণীকে "আমরা" বলবে না। জনগণও তাকে পর ভাববে না।

মানুষ এ পৃথিবীতে যে ক'দিন থাকতে এসেছে সকলের সঙ্গে মিলেমিশে আপন হয়ে থাকলেই সুখী হবে, সুখী করবে। নইলে একটা না একটা গণ্ডীতে, একটা না একটা কোটরে বসে ঠাওরাবে এই হচ্ছে পৃথিবী, এইখান থেকে বিদায়ই পৃথিবী থেকে বিদায়। এ রকম একটা সংকীর্ণ সীমার মধ্যে নিজেকে বেঁধে রাখলে অসীমের আকর্ষণ তাকে উতলা করবেই, উতলা ভাব

বিকৃত হয়ে যুদ্ধ বিগ্রহ দাঙ্গা বিপ্লবের মধ্যে প্রকারান্তরে সাযুজ্য খুঁজবে, মানুষ মানুষকে চিনতে চাইবে মারামারির মাধ্যমে, ধ্বংসের ছলে। এসব অনর্থ আপনি আসে না, আসে অলঙ্ঘনীয় ব্যবধানকে লঙ্ঘন করার আভ্যন্তরিক প্রয়োজন থেকে। এই যে "আমরা" আর "ওরা" এ কথা আমি হিন্দু মুসলমানের মুখে বার বার শুনে প্রমাদ গনেছি। ঘটল প্রমাদ। না ঘটে পারত না। কারণ ব্যবধান দিন দিন অসহ্য হয়ে উঠেছিল। প্রকৃতির অসহ্য। তেমনি আর একটা ব্যবধান দিন দিন অসহনীয় হচ্ছে। এর পরিণাম তো সেই জাতীয় কিছু হবে।

এই যে বিনোবা পাগলের মতো পায়ে হেঁটে সারা দেশ ঘুরছেন ও জমি ভিক্ষা করছেন এর অর্থ কী? লোকের মঙ্গল করাই কি একমাত্র অর্থ? আমার মনে হয়, এর অর্থ অলঙ্ঘনীয় ব্যবধানকে প্রেম দিয়ে লঙ্ঘন করা। কার্যত কত দূর কী হবে বলা যায় না, হয়তো হিন্দু মুসলমানের মতো এ ক্ষেত্রেও অনর্থ ঘটবে। তা বলে হাত গুটিয়ে বসে থাকাও ঠিক নয়। যা ঘটবার তা ঘটবেই, অমোঘ নিয়তি, ইতিহাসের ইচ্ছা, ডিটারমিনিজম, এ সব উক্তি প্রেমিকের মুখে মানায় না। প্রেমিক বলবে, করেঙ্গে য়া মরেঙ্গে। হয়তো শেষ পর্যন্ত মরবে, তবু এই তার পথ। এর মধ্যে আত্মপ্রবঞ্চনা নেই, পর-প্রবঞ্চনা নেই। আছে কর্তব্য-বোধ। কর্তব্য এখানে ধর্মের পর্যায়ে উঠেছে। বিনোবা মনে করেন এই তাঁর ধর্ম। তাঁর মতো ধর্মবোধ যাঁদের মধ্যে কাজ করছে তাঁরা ব্যর্থ হলেও অনর্থ বহু পরিমাণে খর্ব হবে। যেমন হলো হিন্দু মুসলমানের বেলা। গান্ধী তৎপর না হলে, আত্মবলি না দিলে যা ঘটেছে তার বহু গুণ হিংসা প্রতিহিংসা ঘটত। জার্মানীর ত্রিশ বছরের যুদ্ধের মতো।

তা হলে দাঁড়াচ্ছে এই। জনগণের উপকার করতে চাই, এর পিছনে অনুগ্রহের ভাব যাঁদের আছে তাঁদের আছে। কিন্তু তাঁরাই মধ্যশ্রেণীর সবাই নন। আরো অনেকে আছেন যাঁরা ব্যবধান লঙ্ঘন করতে চান, লঙ্ঘন করতে পারছেন না বলে দুঃখিত এবং লজ্জিত। বিড়লা ডালমিয়ার সঙ্গে এঁদের তুলনা করা চলে না। এঁরা অতুলনীয়। এঁরা যা নিচ্ছেন তার ছিটেফোঁটা দিয়ে দায় সারছেন না। তার চেয়ে বেশী দিচ্ছেন। কেউ কেউ জীবন দিচ্ছেন। এঁদের মধ্যে নানা মতবাদের লোক আছেন। সোশ্যালিস্ট, কমিউনিস্ট থেকে শুরু করে কংগ্রেস কর্মী, সর্বোদয় কর্মী। একমত না হলেও এঁরা খাঁটি আদর্শবাদী। তলে তলে এঁদের এক জায়গায় একটা মিল আছে। এঁরা জনগণকে অবজ্ঞা করেন না। জনগণের ঐতিহাসিক ভূমিকা সম্বন্ধে এঁরা পূর্ণ সচেতন।

আবার আমার ব্যক্তিগত প্রসঙ্গে ফিরে আসি। আমি আমার হাতের কাজ ফেলে জনগণের জন্যে জান দিতে যাব না। কিংবা আমার হাতের কাজের মধ্যে জনগণকে টেনে আনব না। এর থেকে মনে হতে পারে জনগণ সম্বন্ধে আমি উদাসীন। কিন্তু জনগণ যেদিন পড়তে ও পড়ে বুঝতে শিখবে সেদিন দেখবে যে আমি ক্ষুদ্র একটা শ্রেণীর মন জোগানোর জন্যে আয়ুক্ষয় করিনি। আমি জনগণের জন্যেই লিখছি। তাদের সঙ্গে এক হয়ে যেতে পারিনি তা ঠিক, মিলতে মিশতে পারিনি তাও ঠিক। কিন্তু তাদের প্রতি প্রেম ও বিশ্বাস আমাকে

আকৈশোর অনুপ্রাণিত করেছে। আর যাই করি তাদের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিনি। করব না।

মধ্যশ্রেণীর সঙ্গে সম্পর্ক না কাটিয়ে জনগণের সঙ্গে সম্পর্ক পাতানো সব রকমে সাধন করতে হবে। সামাজিক ভাবেও। এটুকু সৎসাহস যদি না থাকে তা হলে ব্যবধান অলঙ্ঘনীয় রয়ে যাবে। ভূদান গোদানেও ভবী ভুলবে না। জীবনদানেও না। বঞ্চনা যদি থাকে তবে এরই মধ্যে উহ্য রয়েছে। হিন্দু মুসলমানের বেলায় যেমন ছিল। এ কথা সাম্যবাদীদেরও স্মরণ রাখা ভালো। সমাজ এক হবে না, অথচ সমাজতন্ত্র হবে, এই ধরি মাছ না ছুঁই পানির অনিবার্য পরিণাম মধ্যপদলোপী সমাস।

মধ্যশ্রেণীর সত্যিকারের ভূমিকা হচ্ছে shock absorber-এর। নীলকণ্ঠের।

(১৯৫৪)

চেতাবনী

কিছু দিন থেকে লক্ষ করছি রাষ্ট্রের ভার যাঁদের উপর বর্তেছে তাঁরা তাঁদের ব্যক্তিগত বা গোষ্ঠীগত ধর্মানুষ্ঠানকে রাষ্ট্রের ব্যাপার করে তুলতে ব্যস্ত। গাছ লাগানো হবে, তার একটা গালভরা সংস্কৃত নামকরণ হলো বনমহোৎসব। গাছ থেকে বন হতে বিশ বছর দেরি, অথচ মহোৎসবটি এখন থেকে সেরে রাখতে হবে। যেমন পরীক্ষা পাশ করার আগেই সিদ্ধিমহোৎসব। তার জন্যে পুরোহিত ডাকো, মাটিতে বসো, মন্ত্র পড়ো, দক্ষিণা দাও, প্রণাম করো। কুম্ভমেলা হচ্ছে, পুণ্য অর্জন করতে হবে, তার জন্যে পাণ্ডা পাকড়াও, গঙ্গায় ডুব দাও, দক্ষিণা দাও, প্রণাম করো।

এই যদি ব্যক্তি বা গোষ্ঠীবিশেষের ধর্মবিশ্বাস হয় তা হলে অপরের বলবার কিছু নেই। কিন্তু এখানে দুটি ভুল হচ্ছে। এক, যে টাকাটা খরচ হচ্ছে সেটা আসছে সমষ্টির তহবিল থেকে। সমষ্টির তহবিলে ট্যাকসো জুগিয়েছে অনেক অজ্ঞেয়বাদী বা নাস্তিক, অনেক জড়বাদী বা নিরাকারবাদী, অনেক পুরোহিত-বিরোধী বা ব্রাহ্মণপ্রাধান্যবিরোধী, অনেক সংস্কৃতবিরোধী বা মন্ত্রবিরোধী। এরাও হিন্দু। এ ছাড়া আর যারা ট্যাকসো জুগিয়েছে তাদের অনেকে আদিবাসী, অনেকে খ্রীষ্টান পার্শী বা মুসলমান, অনেকে বৌদ্ধ বা জৈন। এদের সংখ্যা কম বলে যে মূল্য কম তা নয়। যুদ্ধ বিগ্রহের দিন যখন জয়পরাজয় সমান অনিশ্চিত তখন দু' চার হাজার লোক এদিক থেকে ওদিকে গেলেই পরাজয় অবশ্যম্ভাবী। সেইজন্যে একটি লোককেও তুচ্ছতাচ্ছিল্য করতে নেই। তাদের রক্ত জল করা কড়ি তোমার হাতে পড়েছে বলে তুমি তোমার দেবতাকে বা তোমার পুরোহিতকে বা তোমার সম্প্রদায়কে উৎসর্গ করবে এ কখনো ন্যায়নীতি হতে পারে না। এখানে ভোটের জোর খাটে না।

দুই, রাষ্ট্রের কর্তা যাঁরা হবেন তাঁরা এক হিসাবে প্রতীক স্বরূপ। রাষ্ট্রীয় পতাকার মতোই তাঁদের প্রতীক সত্তা। তাঁদের মাথা যদি মাটিতে গড়ায় বা পায়ে ঠেকানো হয় তা হলে দেশসুদ্ধ মানুষের মাথা হেঁট হয়। ভারতের পতাকা মাটিতে গড়ালে বা পায়ে ঠেকালে যেমন হয়। কর্তারা যখন গঙ্গাস্নানে যান তখন তাঁদের সঙ্গে বহু লোকলস্কর যায়। এরা রাষ্ট্রের কর্মচারী। বলতে গেলে রাষ্ট্রই তাঁদের সঙ্গে গঙ্গাযাত্রা করে। আমাদের এটা নবীন রাষ্ট্র। এখনো এর গঙ্গাযাত্রার বয়স হয়নি। একে অকালে গঙ্গাযাত্রায় পাঠালে এর ভবিষ্যৎ আর কদ্দিন! এটা তো আমাদের সেক্যুলার স্টেটের মূলনীতির সঙ্গে মেলে না। হিন্দু রাষ্ট্রের মূলনীতির সঙ্গে মিলতে পারে, কিন্তু ভারত তো হিন্দু রাষ্ট্র নয়। গোপনে গোপনে তাই যদি হয়ে থাকে তা হলে সংবিধান সংশোধন করা হোক। এখানে বলে রাখতে চাই যে হিন্দু রাষ্ট্র কস্মিন্ কালে প্রজাতন্ত্রী ছিল না। যখন প্রজাতন্ত্রী ছিল তখন সেক্যুলার স্টেটই ছিল, হিন্দু রাষ্ট্র ছিল না। প্রজাতন্ত্র বহু দেশে ও বহু যুগে প্রবর্তিত হয়েছে। কোথাও তা ধর্মের ভেক ধারণ করেনি। যখনি করতে গেছে তখনি মরেছে। তখন আর তা প্রজাতন্ত্র নয়, অভিজাততন্ত্র, তার থেকে আবার রাজতন্ত্র। অর্থাৎ পুনর্মূষিক।

ধর্ম চিরকাল থাকবেই, ধর্ম না হলে মানুষের চলে না। রাষ্ট্র চিরকাল থাকবে, যদি না মানুষের জীবন বিকেন্দ্রীকৃত হয়। ধর্মের সঙ্গে আমাদের ঝগড়া নেই, আমরা বরং ধর্মের ঝগড়া চুকিয়ে দিতে চাই। সে অধ্যায় শেষ হলেই আমরা বাঁচি। আমরা বলি, ধর্মও থাকুক, রাষ্ট্রও থাকুক, কিন্তু জোড়া লেগে ধর্মরাষ্ট্র না হোক। বকও ভালো, কচ্ছপও ভালো, কিন্তু সুকুমার রায়ের ছড়ার সেই 'বকচ্ছপ' ভালো নয়। সেক্যুলার স্টেট সকলের কাছে সমান আনুগত্য দাবি করে, তাই সকলের প্রতি তার সমান অপক্ষপাত। হিন্দু রাষ্ট্র সকলের প্রতি সমান অপক্ষপাতী হতে পারে না, কাজেই তার প্রতি সকলের সমান আনুগত্য সম্ভব নয়। আনুগত্যের প্রয়োজনই নির্দেশ করে দিচ্ছে অপক্ষপাতের প্রয়োজন। আমাদের কর্তাদের ব্যবহারে এক চুল পক্ষপাত এসে পড়লেই আমাদের জনসাধারণের আনুগত্যে চিড় ধরবে। তাতে কর্তাদের কী! তাঁরা তো গঙ্গার দিকে পা বাড়িয়েই বসে আছেন। কিন্তু ভুগবে ভবিষ্যৎ বংশ। সেই ভবিষ্যতের মুখ চেয়েই বর্তমানকে সতর্ক হতে হবে। বর্তমান যদি অতীতের দিকে মুখ ফিরিয়ে সংস্কৃত মন্ত্র পড়তে থাকে তা হলে কে জানে হয়তো ভবিষ্যৎও একদিন বর্তমানের দিকে মুখ ফিরিয়ে রুশ মন্ত্র বা চীন মন্ত্র পাঠ করবে। সেও তো এক প্রকার শাস্ত্র।

ধর্ম নিজের পায়ে হাঁটতে শিখুক। ঘোড়ার পিঠে চড়া ছেড়ে দিক। ঘোড়ার পিঠ থেকে তাকে নামতে হবেই। কেউ না কেউ তাকে নামাবে। আমরা ধর্মের শুভানুধ্যায়ী বলেই তাকে পরামর্শ দিই, বাপু, তুমি মন্দিরে থাকো, মসজিদে থাকো, গির্জায় থাকো, গৃহে থাকো, বেদীতে থাকো, মর্মে থাকো। কিন্তু রাজদ্বারে যেও না। রাজপুরুষদের মাথায় উঠো না। রাজকোষের অর্থ নিও না। আজ না হয় ওরা তোমার দৌলতে জনপ্রিয় হবে, জনতার ভোট পাবে, কিংবা

উপরওয়ালার নেক নজর। কিন্তু কাল যখন ওরা তলিয়ে যাবে তখন তুমিও তো তলিয়ে যাবে ওদের সঙ্গে। অতএব সময় থাকতে নিরস্ত হও। তুমিও বাঁচবে, ওরাও বাঁচবে। আর নয়তো তোমার ভক্তরাই তোমাকে সাবাড় করবে। হিন্দু মুসলমানে ঐ যে খুনোখুনিটা হলো তাতে তুমি হিন্দুত্ব আর তুমি ইসলাম তুমিও তো ঘায়েল হয়ে রয়েছ। মধ্যযুগের ইউরোপে তুমি খ্রীস্টধর্ম তোমার কী দশা হলো মনে আছে? ক্যাথলিকে প্রোটেস্টাণ্টে হানাহানির ফলে তোমারও বলহানি হলো। তোমার যারা শুভানুধ্যায়ী তারা তোমাকে রাষ্ট্রের পিঠ থেকে মানে মানে নেমে আসতে প্রবর্তনা দেয়। যেখানে যেখানে তুমি তা করলে সেখানে সেখানে তুমিও বাঁচলে, রাষ্ট্রও বাঁচল। ভলতেয়ারের চেতাবনী শুনলে ফরাসী বিপ্লবের প্রয়োজন হতো না। ফরাসীদের শিক্ষা হয়েছে, তাদের রাষ্ট্র সত্যি সত্যি সেক্যুলার। ইংলণ্ডে ক্রমওয়েলের প্রজাতন্ত্র বেশী দিন টিকল না বটে, কিন্তু রাজতন্ত্রও সাবধান হলো সেই থেকে। সেখানকার রাষ্ট্র কাগজে কলমে নয় কিন্তু ভিতরে ভিতবে সেক্যুলার। রাজা না থাকলে কাগজে কলমেও হতো। রাজার খাতিরে কতকটা আপোস করতে হয়েছে অতীতের সঙ্গে, ঐতিহ্যের সঙ্গে। আমেরিকায় তার দরকার হয়নি। স্বাধীনতা অর্জনের পর আমেরিকা এক কলমের খোঁচায় রাজতন্ত্র খারিজ করে, সঙ্গে সঙ্গে রাজধর্মকে। সেখানে রাষ্ট্রধর্ম বলে কিছু নেই। নেই ধর্মরাষ্ট্র। এতে ধর্মও বাঁচল, রাষ্ট্রও বাঁচল। নইলে জড়াজড়ি করে দু জনেই ডুবত। যেমন ফরাসী বিপ্লবের সময় ফ্রান্সে। রুশ বিপ্লবের সময় রুশদেশে।

সেক্যুলার স্টেট যেমন এক হাতে রাষ্ট্রকে উদ্ধার করে তেমনি আর এক হাতে ধর্মকে। আমরা যারা সেক্যুলার স্টেটকে 'বকচ্ছপ' হতে দেখলে দুঃখ পাই আমরাই বকের বন্ধু তথা কচ্ছপের। বকও ভালো, কচ্ছপও ভালো, কিন্তু 'বকচ্ছপ' ভালো নয়।

(১৯৫৪)

আমাদের ভবিষ্যৎ

এই সেদিন আর একটা দেশ ভাগ হয়ে গেল। ইন্দোচীন। অবশ্য দেশের লোক ইচ্ছা করলে নির্বাচনে ঐক্য ফিরিয়ে আনতে পারবে, কিন্তু সকলেই জানে তা হবার নয়। কারণ আজকের দুনিয়ায় মতবাদ বলে একটা শক্তি কাজ করছে। মতবাদ বিভিন্ন ও বিরুদ্ধ হলে দেশ ভাগাভাগি হয়ে যায়। নয়তো গৃহযুদ্ধ চলতে থাকে। বাইরের লোক তাতে ইন্ধন জোগাতে থাকে। দেখতে দেখতে হয়ে দাঁড়ায় বাইরের সঙ্গে বাইরের যুদ্ধ। সেইজন্যে একালের গৃহযুদ্ধ সারা দুনিয়ার লোককে ভাবায়। তা সে কোরিয়ায় হোক বা ইন্দোচীনে হোক। সব জায়গায় ওটা শেষপর্যন্ত ক্যাপিটালিজমে কমিউনিজমে বলপরীক্ষা। এই বলপরীক্ষার

নিট ফল তোর অর্ধেক মোর অর্ধেক। তুই নে ন্যাজাটা মুই নিই মুড়োটা। মস্কো আর ওয়াশিংটন একমত না হলে ভাঙা ইন্দোচীন আর জোড়া লাগবে না। ভাঙা কোরিয়া ভাঙা রয়ে যাবে। ভাঙা জার্মানীরও সেই দশা। এক যদি বিশ্বযুদ্ধ বাধে, যদি এক পক্ষ অপর পক্ষকে পরাস্ত করে তবে অবশ্য অন্য কথা।

আমাদের এখানেও মতবাদ নামক শক্তিটা সক্রিয়। তবে ঠিক ঐ অর্থে নয়। এখানেও ক্যাপিটালিস্ট বনাম কমিউনিস্ট আছে, তাদের কাজ তারা করে যাচ্ছে, কিন্তু এখানে তাদের চেয়েও সক্রিয় ভারতীয় জাতীয়তাবাদ বনাম বিশ্ব ইসলাম। ভারত যার নাম তার প্রতিষ্ঠা ভারতীয় জাতীয়তাবাদের বনেদের উপর। আর পাকিস্তান যার নাম তার ভিত্তি হলো বিশ্ব ইসলাম। পাকিস্তান হচ্ছে মরক্কো থেকে ইন্দোনেশিয়া পর্যন্ত বিস্তৃত একটি শৃঙ্খলের অঙ্গ। ভারত সে শৃঙ্খলের ধারাবাহিকতা ভঙ্গ করছে। আর করছে বর্মা ও সিংহল। সম্প্রতি দেখা যাচ্ছে ইন্দোনেশিয়া ভারতের অনুসরণে সেক্যুলার স্টেট স্থাপন করেছে, ইসলামিক স্টেট নয়। এবং ভারতেরই অনুসরণে ক্যাপিটালিস্ট বা কমিউনিস্ট কোনো পক্ষের শিবিরে যোগ না দিয়ে নিরপেক্ষ রয়েছে। বর্মাও তাই। সিংহল এখনো দ্বিধাগ্রস্ত।

আবার অন্য দিকে দেখা যাচ্ছে কামাল পাশার কীর্তি নাশ করে তুর্কী এখন সেক্যুলার স্টেটের নীতি বিসর্জন দিতে বসেছে, এখন সেখানে ইসলামের দোহাই দিলে ভোটে জেতা যায়। জেতারা ব্যবসাদার শ্রেণীর লোক, তাঁদের প্রধান মুরুব্বি আমেরিকা। টাকা দিচ্ছে স্যাম চাচা, ভোট পাচ্ছে—যাক গে, ওদের নাম ভুলে গেছি। এর থেকে আমাদেরও শেখবার আছে। জনগণকে আফিং খাওয়ানো বড়লোকদের চিরকেলে পেশা, আর আফিং হলো জনগণের চিরকেলে নেশা। আজ আমরা সেক্যুলার স্টেট পত্তন করলুম আর অমনি জনজণের নেশা ছুটে গেল তা হয় না। তাদের ভালো করে বুঝিয়ে দিতে হবে কেন আমরা সেক্যুলার স্টেট চেয়েছি। কার স্বার্থে ? সেটা কি জনগণের স্বার্থ নয় ?

দুরকম পরাধীনতা আছে। একটা প্রত্যক্ষ, যেমন সাত বছর আগে ব্রিটিশ সরকার এ দেশ শাসন করতেন, আমরা ছিলুম ইংরেজের প্রজা। আর একটা পরোক্ষ, যেমন নামে মীরজাফর বাংলাদেশ শাসন করতেন, আসলে করত ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী। বাংলাদেশের লোক ছিল নবাবের প্রজা, অথচ ইংরেজের অধীন। এই হলো মধ্য প্রাচ্যের দেশেগুলির মোটামুটি চেহারা। প্রায় প্রতি ক্ষেত্রেই একটি করে মীরজাফর থাকেন, তাঁর পিছনে থাকেন হয় ইংরেজ, নয় ফরাসী, নয় মার্কিন ধনশক্তি। জনশক্তি সেসব দেশে নেশায় বুঁদ। এর ব্যতিক্রম ঘটেছিল তুর্কীর বেলায়, কামাল পাশার নেতৃত্বে। এখন নেতাবদল হয়েছে, তুর্কী এখন তাঁবেদারিতে ফিরে চলল। আর একটি ব্যতিক্রম এই সম্প্রতি লক্ষ করা যাচ্ছে ঈজিপ্টে। এর পরমায়ু কদ্দিন তা জোর করে বলা যায় না। মধ্য প্রাচী যখন, তখন নেশার দিকে ঝোঁকটাই স্বাভাবিক। এসব দেশকে দীর্ঘকাল ধরে ইউরোপীয় শিক্ষা দেওয়া দরকার। ইন্দোনেশিয়া সেটা বুঝেছে। আমাদের ইন্দোনেশীয় বন্ধু বললেন, সেখানকার সরকার নিজের খরচে ছ' হাজার ছাত্র-

ছাত্রীকে ইউরোপে আমেরিকায় অস্ট্রেলিয়ায় ও ভারতে পাঠিয়েছে। আমার মনে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই যে ইউরোপের ইতিহাস যারা মন দিয়ে পড়েছে তারাই কেবল সেক্যুলার স্টেট বস্তুটিকে ধারণ ও বহন করতে পারে। পত্তন যেই করুক না কেন। তবে এটাও ঠিক যে সেক্যুলার স্টেটকে ভেঙে যেতে দিলে যে মারটা কপালে আছে সে মারটাই প্রকৃষ্ট শিক্ষা। মার খেতে খেতে ইউরোপ যা শিখেছে মার খেতে খেতেই ভারত তা শিখবে। আর মধ্য প্রাচী-র তো মার ছাড়া আর কোনো শিক্ষাই নেই। মধ্য প্রাচী বলতে আমি পাকিস্তানও বুঝি।

কিন্তু কেন সেক্যুলার স্টেট? প্রত্যক্ষ পরাধীনতা থেকে মুক্তির উপায় সকলের জানা। কোথাও তা সশস্ত্র বিদ্রোহ, কোথাও নিরস্ত্র প্রতিরোধ। কিন্তু পরোক্ষ পরাধীনতার কী চিকিৎসা? আফিং ছাড়ানো। সাধে কি আমরা মাদক বর্জন নীতি গ্রহণ করেছি! কিন্তু মাদক কেবল মদ গাঁজা আফিং নয়। মাদকের তালিকায় পড়ে সেকেলে শিক্ষা। যে শিক্ষা টোল মাদ্রাসা মক্তবে দেওয়া হতো। যেখানে স্কুল নেই হাসপাতাল নেই জল নেই জলনিকাশ নেই বাস নেই বস্ত্র নেই অন্ন নেই সেখানে বেগার খাটিয়ে মসজিদ বা মন্দির তৈরি করাও মাদক দ্রব্যের তালিকায় পড়ে। কেন, গাছতলায় বসে কি নামাজ পড়া যায় না, উপাসনা করা যায় না? বড়ো ইমারত না হলে যদি ধর্ম কর্ম না হয় তবে সেটা রাষ্ট্রের ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়া কেন? যারা সে ভার বইতে পারে তারাই সে ভার নিক। রাষ্ট্রকে বলো রাষ্ট্রের দায়িত্ব পালন করতে। আধুনিক রাষ্ট্রের দায়িত্বটি বড়ো কম নয়। প্রত্যেকটি প্রজাকে কর্ম জোগানো আধুনিক রাষ্ট্রের প্রাথমিক দায়িত্ব। যে দেশে বেকার সংখ্যা বেশী সে দেশের রাষ্ট্র তার প্রাথমিক দায়িত্ব পালন করেনি বলতে হবে।

জনগণের স্বার্থে সেক্যুলার স্টেট যেমন অবশ্য গ্রহণীয় তেমনি গ্রহণীয় নিরপেক্ষ আন্তর্জাতিক নীতি। ভারত কোনো শিবিরে যাবে না, সে ও তার মতো আরো দুটি একটি দেশ মিলে নিরপেক্ষ থাকবে, তার ডাক শুনে যদি কেউ না আসে তা হলে সে একলা চলবে। দীর্ঘকালের দাসত্বের পর যে দেশ সদ্য মুক্ত হয়েছে তার পক্ষে এ ছাড়া আর কোনো নীতি যুক্তিযুক্ত নয়। যেসব পণ্ডিত এর মধ্যে যুক্তি খুঁজে পাচ্ছেন না তাঁদেরকে আমেরিকার ইতিহাস পড়তে বলি। স্বাধীনতার পর আমেরিকাও এই নীতি গ্রহণ করে যে আন্তর্জাতিক ব্যাপারে সে নিরপেক্ষ থাকবে। তার নিরপেক্ষতা শতাব্দীকাল স্থায়ী হয়েছিল। সেই শতাব্দীকালের আত্মবিকাশের ফলে সে ক্রমে প্রথম শ্রেণীর শক্তি হয়ে ওঠে। নতুবা সে তৃতীয় শ্রেণীতেও স্থান পেত না। আমেরিকার সৈন্যদল তার সীমান্ত রক্ষার কাজে নিযুক্ত ছিল। সেইজন্যে আকারে প্রকারে ক্ষুদ্র ছিল। সামরিক ব্যয়ে যে টাকাটা বরবাদ হতে পারত সে টাকা জনকল্যাণে লাগল। প্রথম থেকেই আমেরিকা শিক্ষার জন্যে বহু ধন ব্যয় করে। প্রাথমিক শিক্ষার উপর জোর দিতে গিয়ে উচ্চ শিক্ষাও ব্যাহত হয় গোড়ার দিকে। প্রাথমিক শিক্ষা সেক্যুলার পদ্ধতিতে হতো। রাষ্ট্র ব্যতীত আর কাউকে প্রাথমিক বিদ্যালয় চালাতে দেওয়া হতো না। এবং রাষ্ট্র তার বিদ্যালয়গুলিতে ধর্মমত শেখাত না। যার যার

ধর্মশিক্ষা তার তার ঘরে। তা বলে রাষ্ট্র যা শেখাত তা অধর্ম নয়। তা সকলের শিক্ষণীয় সাহিত্য গণিত বিজ্ঞান ইতিহাস। প্রাথমিক শিক্ষার পরে বেশীর ভাগ ছাত্র কাজকর্ম খংজে নিত। যারা কলেজে যেত তারা ইচ্ছা করলে খ্রীস্টান কলেজে খ্রীস্টধর্ম শিক্ষা করতে পারত। কিন্তু কলেজ রাষ্ট্রের হলে তাতে ধর্ম-শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল না। আমেরিকা খ্রীস্টানদের দেশ। অখ্রীস্টান অল্প কয়েকজন ছিল, তাদের অনুপাত পশ্চিম পাকিস্তানের হিন্দুর চেয়েও কম। পূর্ব পাকিস্তানের হিন্দুর চেয়ে তো অনেক কম। তা সত্ত্বেও কেন সে দেশ তার প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা থেকে ধর্মকে সযত্নে বাদ দেয়? এর মূল কারণ তার স্বাধীনতাপ্রিয়তা। স্বাধীনতাকে সর্বতোভাবে রক্ষা করতে হলে সেক্যুলার মনোভাবকে প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকেই প্রোথিত করতে হবে। তার জন্যে যে খরচটা হবে সেটা আসবে সামরিক ব্যয়সংকোচের ফলে। এবং সামরিক ব্যয়-সংকোচ সম্ভব হবে নিরপেক্ষ আন্তর্জাতিক নীতির ফলে। ইতিহাসে আমাদের নীতির নজীর আছে। স্বাধীনতাপ্রির সুইসরাও নিরপেক্ষ তথা সেক্যুলার। তা বলে তারা ধর্মবিরোধী নয়। সেক্যুলার কথাটা ধর্মের বিপরীত নয়। ধর্ম থাকুক, কিন্তু তা যেন জনগণের আফিং না হয়। ধর্মের নেশায় যেন তারা স্বাধীনতা বিকিয়ে না দেয়।

পাকিস্তানের জনগণ ক্রমে এসব বুঝবে। তার আগে অনেক দুর্ভোগের ভিতর দিয়ে যাবে। তাদের ঐতিহ্য মধ্য প্রাচ্যের সঙ্গে মেলে। ভারতের সঙ্গে মেলে না। তারা ইউরোপীয় শিক্ষা বয়কট করেছিল। বয়কট প্রায় অর্ধ শতাব্দী স্থায়ী হয়েছিল। যদি-বা তারা ইউরোপীয় শিক্ষায় ব্রতী হলো সেই সঙ্গে আলীগড়ের মতো বিদ্যাপীঠে ধর্মকেও তার সঙ্গে জুড়ে দিল। পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠাতাদের অধিকাংশ আলীগড়ী বা আলীগড়পন্থী। প্রধান প্রতিষ্ঠাতা মহম্মদালী ঝীণাভাই খোজানী—যিনি মহম্মদ আলী জিন্নাহ্ নামে প্রখ্যাত—আলীগড়ী বা আলীগড়পন্থী ছিলেন না। কিন্তু জনগণের সঙ্গে তাঁর সংস্পর্শ না থাকায় সেক্যুলার স্টেট যে কাদের জন্যে দরকার, কেন দরকার, সে অভিজ্ঞতা তাঁর ছিল না। পাকিস্তান তার ঐতিহ্যকে অতিক্রম করতে এখনো অর্ধ শতাব্দী সময় নেবে। ততদিন তার ভাগ্য তার, ভারতের ভাগ্য ভারতের। পাকিস্তান ও ভারত একই যুগে বাস করলেও একই যুগের নয়। ভারতকে আধুনিক করে তোলা যত কঠিন পকিস্তানকে আধুনিক করে তোলা তার চেয়ে অনেক কঠিন। তার ভবিষ্যৎ ও ভারতের ভবিষ্যৎ একই রকম হলে আমি সুখী হতুম। কিন্তু একই রকম হবার সম্ভাবনা নেই।

আমি বিশ্বাস করিনে যে পাকিস্তানকে ভারতের শামিল করলেই তার সমস্যার সমাধান হবে। বরং উল্টোটি হবে। তার সমস্যা আরো জটিল হয়ে দাঁড়াবে। তার সমস্যার সমাধান হলো ইন্দোনেশিয়ার মতো অতীতকে এক দিনে ঝেড়ে ফেলা। ইন্দোনেশিয়ার লোক শিক্ষাবিস্তারের সুবিধার জন্যে রোমক লিপি গ্রহণ করেছে। তার আগে ছিল আরবী লিপি। কিন্তু পাকিস্তানের লোক প্রাণ ধরেও রোমক লিপি নেবে না। পাকিস্তানীরা বলে বটে তাদের

শিশু রাষ্ট্র, শিশু জাতি। কিন্তু কার্যকালে দেখা যায় সে শিশু নতুন কিছু করবে না। যা চিরকাল হয়ে এসেছে তাই চিরকাল হবে এই তার জীবনদর্শন। আমি অনেক সময় হাঁফ ছেড়ে বাঁচি এইজন্যে যে এ শিশুর জন্যে আমার কিছুমাত্র দায়িত্ব নেই। তার পরেই মনে পড়ে যায় আমি তো জনগণকে এক ও অবিভাজ্য বলে বিশ্বাস করি। তাদের স্থিতি যে রাষ্ট্রেই হোক না কেন তাদের জন্যে আমার সমান দায়িত্ব। আমি তো হিন্দু মুসলমানে ভেদ করিনে। তা হলে আমি কী করে এ দায়িত্ব এড়াতে পারব? এক শ বার ভাবি পাকিস্তানের ব্যাপারে কথা কইব না। এক শ বারের পরের বার ভাবি, কথা কওয়া দরকার। একটা পা পেছিয়ে থাকবে, আর-একটা পা এগিয়ে যাবে এ কি কখনো হতে পারে? পাকিস্তানকে টেনে নিয়ে চলতে হবে আমাদের, যেমন চলেন সাহেবী পোশাক পরা বিলেত ফেরৎ স্বামী, পিছনে শাড়ি পরা ঘোমটা মাথায় দেওয়া বঙ্গললনা।

পাকিস্তান স্বতন্ত্র হয়েছে, স্বতন্ত্রই থাকুক। কিন্তু তাকে পর করে দেওয়াও বিজ্ঞতা নয়। তাকে আপন করতে হবে। নিজেদের আদর্শ বা কর্মপন্থা বিসর্জন না দিয়ে কী করে এটা সম্ভব? আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে নিরপেক্ষতা নীতি ত্যাগ করা কিছুতেই চলতে পারে না। তেমনি আভ্যন্তরিক ক্ষেত্রে সেক্যুলার স্টেট নীতি বিসর্জন দেওয়া কোনো মতেই চলবে না। আমরা যদি এই দুটি পদতলভূমির উপর অটল থাকি তা হলে পাকিস্তানের সঙ্গে আমাদের সমঝোতা কি কোনো দিন হবে? আরো পরিষ্কার করে বলছি। ভারত হিন্দু রাষ্ট্র নয়। সেক্যুলার স্টেট। এ রাষ্ট্রে হিন্দু কে আর মুসলমান কে আর খ্রীস্টান কে তা আইন আদালত আপিস আর্মি মিল ফ্যাক্টরী ডকইয়ার্ড ইত্যাদি কোনোখানেই খোঁজ করা হয় না, যদি হয় তবে তা কন্স্টিটিউশনবিরুদ্ধ। তলে তলে হয়তো অনেকে ভেদবুদ্ধি জিইয়ে রেখেছে। কিন্তু তার জন্যে রাষ্ট্র দায়ী নয়। যে রাষ্ট্র সকলের কল্যাণের দায়িত্ব নিয়েছে, যে কাউকে ধর্মভেদের জন্যে ক্ষতিগ্রস্ত করতে চায় না, সে রাষ্ট্রে নিশ্চয় কাশ্মীরি মুসলমানদেরও স্থান আছে। তারা যে মুসলমান তার চেয়েও বড়ো কথা তারা ভারতীয়। চার কোটি মুসলমান যদি ভারতীয় হতে পারে তা হলে কয়েক লক্ষ কাশ্মীরী মুসলমান কেন তা পারবে না? কেনই বা আমরা ধরে নেব যে তারা মুসলমান বলেই তাদের স্থান এখানে নয়, পাকিস্তানে? অথচ পাকিস্তান এ বিষয়ে স্থিরনিশ্চয় যে কাশ্মীর পাকিস্তানের অঙ্গ। ভারত তাকে বঞ্চিত করেছে। এ দুই দৃষ্টিভঙ্গির কোনোটা বেঠিক নয়। সেইজন্যে এ প্রশ্নের মীমাংসা এখনো হয়নি, হবেও না। এও সেই মতবাদের দ্বন্দ্ব। ভারতীয় জাতীয়তাবাদ বনাম বিশ্ব ইসলাম। গৃহযুদ্ধ এড়াবার জন্যে অখণ্ড ভারত দ্বিখণ্ড হয়েছে। গৃহযুদ্ধ রহিত করার জন্যে কাশ্মীরেও লাইন টানা হয়েছে। সে লাইন তুলে দেওয়ার সঙ্গে মতবাদের প্রশ্ন, ভারসাম্যের প্রশ্ন জড়িয়ে রয়েছে। কাশ্মীরকে গায়ের জোরে এক রাষ্ট্রভুক্ত করতে হলে দুই রাষ্ট্রের মধ্যে যুদ্ধ বেধে যাবে। সে যুদ্ধ কাশ্মীরের সীমানায় আবদ্ধ থাকবে না। তার ফলে মার্কিন

ও রুশ দুই দিক থেকে হস্তক্ষেপ ঘটতে পারে। তার থেকে আর একটা বিশ্বযুদ্ধ।

যেমন সেক্যুলার স্টেট বনাম ইসলামিক স্টেট নিয়ে মতবাদঘটিত বিরোধ—কাশ্মীর যার পরীক্ষাস্থল—তেমনি নিরপেক্ষতা নীতি বনাম কোনো এক পক্ষে যোগদান নীতি নিয়ে নীতিঘটিত বিরোধ। মার্কিন পক্ষে যোগদান এখানেও অনেকে চায়, কিন্তু এদের সঙ্গে জনগণের সম্পর্ক নেই। জনগণ কোনো পক্ষে যোগ দেবে না। রুশ পক্ষেও না। কমিউনিস্টরা তাদের রুশ পক্ষে যোগ দেওয়াতে পারবে না। তাদের মোটা মোটা অভাবগুলো মিটিয়ে দেবার জন্যে জবাহরলাল ও বিনোবা উভয়েই তৎপর। অপর পক্ষে পাকিস্তানের মোটা মোটা অভাবগুলো মেটাবার দায় চলে যাচ্ছে বিদেশী বান্ধবদের কাঁধে। এ নীতি আমাদের নয়। এর পরিণাম ভেবে আমরা সতর্ক। সমঝোতা তা হলে হবে কোন সূত্রে? আমি তো সাহিত্য ব্যতীত আর কোনো উপলক্ষ্য দেখতে পাচ্ছিনে।

(১৯৫৪)

আমেরিকা রাশিয়া ভারতবর্ষ

ফরাসী বিপ্লবের ইতিহাস যাঁরা পড়েছেন তাঁরা নিশ্চয় লক্ষ করেছেন যে লিবার্টি যত দিন মূলমন্ত্র ছিল বিপ্লব তত দিন জোরসে চলেছিল। কিন্তু যেই উচ্চারিত হলো প্রপার্টি অমনি সকলে তটস্থ। তারপর জনশক্তি বিপথগামী হয়ে যেসব অঘটন ঘটাল তার নিট ফল হলো প্রতিবিপ্লবের জয়। প্রমাণ হলো ফরাসীরা লিবার্টি যত না ভালোবাসে তার চেয়ে বেশী ভালোবাসে প্রপার্টি।

আমেরিকাও বিপ্লবের দেশ। অষ্টাদশ শতাব্দীর স্বাধীনতা সংগ্রামকে তাদের ইতিহাসে বলে আমেরিকার বিপ্লব। এখনো সে দেশের মহিলাদের একটি সংস্থা আছে। তার নাম 'ডটার্স অফ দি রেভলিউশন'। তার সদস্যা হবার অধিকার শুধু সেই মহিলাদেরই যাঁদের পূর্বপুরুষরা ঐ বিপ্লবে যোগ দিয়েছিলেন। কিন্তু বিপ্লব বলতে এ ক্ষেত্রে বোঝায় লিবার্টি ঘটিত বিপর্যয়। প্রপার্টি ঘটিত নয়। তার বেলা আমেরিকানরা অবিকল ফরাসীদের মতো মনোভাব দেখায়। স্বাধীনতা খুব ভালোবাসে ওরা। কিন্তু সম্পত্তি ভালোবাসে তার চেয়েও বেশী। তবে তারা পরের সম্পত্তি কেড়ে নিয়ে পরের ধনে পোদ্দার হতে চায় না। সেইজন্যে সাম্রাজ্যবাদ বলতে ইউরোপের দেশগুলিতে যা বোঝায় আমেরিকায় তার অনুরূপ নেই। কেউ যদি বলেন আমেরিকানরা ইংরেজদের মতো সাম্রাজ্যবাদী তা হলে তিনি অজ্ঞতার অথবা বিদ্বেষের পরিচয় দেবেন। আমেরিকা পরের ধন চায় না, কিন্তু নিজের ধনকে যক্ষের মতো রক্ষা করতে চায়।

তার পরম শত্রু রাশিয়া। এ জন্যে নয় যে রাশিয়া তাকে যুদ্ধে হারিয়ে

দিয়ে তার ধন হরণ করবে। এই জন্যে যে একটা দেশে যদি প্রপার্টির পরাজয় হয় তা হলে আর একটা দেশেও হবে, হতে হতে এক দিন আমেরিকাতেও হবে। আতঙ্কটা প্রকৃত পক্ষে প্রপার্টি ঘটিত। রাশিয়া তার নিমিত্ত মাত্র। কমিউনিজম যদি রাশিয়ায় না হয়ে তার আগে মার্কসের দেশ জার্মানীতে হতো তা হলে আমেরিকা আরো ভয় পেত। শিরে হলে সর্পাঘাত বাঁধন দেবে কোথায় ?

আমেরিকা এখন সাপের কামড়ের বিষ ছড়াবার ভয়ে বাঁধনের পর বাঁধন দিতে ব্যস্ত। কমিউনিজম একটার পর একটা অঙ্গ অধিকার করে আর আমেরিকা অধিক থেকে অধিকতর সন্ত্রস্ত হয়। ভারত যদি কোনো দিন লাল হয়ে যায় আমেরিকা উন্মত্তর মতো হাইড্রোজেন বোমা দিয়ে এ দেশ ধ্বংস করে দিতে চাইবে। ভারতের প্রতি তার আক্রোশ আছে বলে নয়, তার নিজের ঘরে কমিউনিস্টদের সাহস বেড়ে যাবে বলে। সম্পত্তির মালিক যারা তারা চোখে সরষে ফুল দেখবে বলে। লাল সরষে ফুল।

রাশিয়াতেও দীর্ঘকাল ধরে লিবার্টি ঘটিত বিপ্লবের সাধনা চলেছিল, অসংখ্য লোক প্রাণ দিয়েছিল, নির্যাতন সয়েছিল। রাশিয়ানরা যে লিবার্টির মূল্য বোঝে না তা নয়। কিন্তু সেখানেও সেই একই সমস্যা দেখা দিল প্রথম বিপ্লবের পর, যেমন ফরাসী বিপ্লবের বেলা। লিবার্টি থেকে প্রপার্টিতে আসতে একই অনিচ্ছা। তখন সত্যিকারের একটা নতুন ঘটনা ঘটালেন লেনিন। দ্বিতীয় বিপ্লবের দ্বারা প্রপার্টিকে হারিয়ে দিলেন। তারপর থেকে আজ অবধি সেখানে প্রপার্টি হেরে আসছে। লিবার্টি যে কোথায় তলিয়ে গেছে তার পাত্তা নেই। রুশ দেশের ইতিহাস মন দিয়ে পড়লে এ রহস্য ভেদ করা সহজ হয়। ও দেশে লিবার্টির বীজ বাইরে থেকে হাওয়ায় উড়ে যায়। মাটি থেকে আপনি গজায়নি। কিন্তু ওদেশের মাটিতে প্রপার্টির চারাও বেশী দিন শিকড় গাড়েনি। ওরা সব জমি সবাই মিলে ভোগ করত। যার যার জমি তার তার নয়। সকলের জমি সকলের। ওটা ওদের প্রাচীন ব্যবস্থা। কালক্রমে ওর রদবদল হয়। যারা রদ-বদল করে তারা কোনো দিনই ওদের অন্তরের সমর্থন পায়নি। আমেরিকার জনগণ যেমন গোড়া থেকেই ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য মেনে নিয়েছে রাশিয়ার জনগণ তেমন কিছু মেনে নিয়েছে বলে ইতিহাসে লেখে না, যেটুকু মেনেছে সেটুকু দায়ে ঠেকে। লেনিন তাঁর দেশের জনগণের মন জানতেন, স্টালিন তো জনগণেরই সন্তান। তারা কী চায়, কী চায় না, তাদের কতটা সইবে, কতটা সইবে না, লেনিন ও স্টালিন এ বিষয়ে অন্তর্যামী ছিলেন। কমিউনিজম ওদেশে দৈবাৎ ঘটেনি। বীজ হয়তো হাওয়ায় ভেসে এসেছে, কিন্তু মাটি তার জন্যে হাজার বছর ধরে অপেক্ষা করছিল।

হাইড্রোজেন বোমা মেরে রাশিয়ার জনগণের অন্তর থেকে কমিউনিজমকে উৎখাত করা যাবে না। বরং তাদের কাছে লিবার্টির একখানি প্রাণচিত্র তুলে ধরো, শুধু মানচিত্র নয়। আমেরিকার সাধারণ মানুষ যে পরিমাণ লিবার্টি ভোগ করে তেমন আর কোনো দেশের নয়। এমন কি ইংলণ্ডেরও নয়, ফ্রান্সেরও

নয়। ধীরে ধীরে রুশদেশের সাধারণ মানুষের প্রাণে ঐ পরিমাণে লিবার্টির জন্যে অভাববোধ জাগুক। যেমন জেগেছিল জারের রাজত্বকালে। তখন তারা আপনিই বর্তমান ব্যবস্থার সংশোধন চাইবে। সংশোধন ইতিমধ্যে শুরু হয়েছেও। মালেনকভ ঠিক স্টালিন নন। বাইরের চাপ কমলে রাশিয়ার চেহারা অতটা লাল না হয়ে একটু গোলাপী হবে। ওদের ব্লাড প্রেসার মাথা থেকে নিচের দিকে নামবে যদি আমেরিকা প্রকৃতিস্থ হয়। কমিউনিজম যে দিকে দিকে ছড়াচ্ছে এটা রাশিয়ার দোষে নয়, গত মহাযুদ্ধের দোষে। মহাযুদ্ধের সময় যে অর্থ-নৈতিক বিশৃঙ্খলা ঘটেছিল, যে মুদ্রাস্ফীতি, যে দুর্নীতি কমিউনিস্টরা তার ফসল কাটছে। তোমরা মহাযুদ্ধ বাধতে দিলে কেন ?

আমেরিকায় লিবার্টি নিয়ে বিপ্লব হয়েছে, প্রপার্টি নিয়ে বিপ্লব হয়নি, যাতে না হয় তার জন্যে প্রাণপণ চেষ্টা। রাশিয়ায় লিবার্টি নিয়ে বিপ্লব হতে না হতে প্রপার্টি নিয়ে বিপ্লব হয়েছে, যাতে প্রতিবিপ্লব না হয় তার জন্যে প্রাণপণ চেষ্টা। এখন ভারতবর্ষের স্থিতি কোথায় ও গতি কোন দিকে ?

ভারতবর্ষেও লিবার্টি নিয়ে এক প্রকার বিপ্লব ঘটে গেছে। ইংরেজ দয়া করে চলে যায়নি, গেছে জনগণের নবশক্তি দেখে। রাজা রাজড়াদের হাত থেকে ক্ষমতা কেড়ে নেওয়া হয়েছে। কেড়ে নিয়েছে জনগণ, তাদের নির্বাচিত প্রতি-নিধি। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, প্রপার্টি নিয়ে কী করা যায়। এর উত্তর এক ভাবে না এক ভাবে দিতে হবেই। নিরুত্তর থাকা যাবে না। যদি আমেরিকার অনু-সরণে প্রপার্টিকে দেবতা করে তোলা হয় তা হলে চাঁদ সদাগরের মতো সমস্ত ক্ষণ সতর্ক থাকতে হবে পাছে লখীন্দরকে সাপে কামড়ায়। তা সত্ত্বেও একদিন সাপে কাটবে। দ্বিতীয় বিপ্লব এড়ানো আমেরিকার পক্ষে যত সহজ ভারতের পক্ষে তত সহজ নয়। এখানে অধিকাংশ লোকই নিঃস্ব। তাদের কিছু হারা-বার নেই। অপর পক্ষে যদি রাশিয়ার অনুসরণে প্রপার্টির সঙ্গে সঙ্গে লিবার্টিও সহমরণে যায় তা হলে আমাদের ষাট সত্তর বছরের স্বাধীনতা-সাধনা বৃথা হবে। সেই সাধনার ফলে আমরা যে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য চিন্তা ও বাক্যের স্বাধীনতা, যে-কোনো দলকে নির্ভয়ে ভোট দিয়ে শাসক নির্বাচন ও শাসক পরিবর্তনের অধিকার, অবিচারের বিরুদ্ধে সুপ্রীম কোর্টে দরবার, সংবিধানের উপর আইনের প্রতিষ্ঠা, বিরোধী দলের অস্তিত্ব, ন্যায়সংগত বিরুদ্ধতা অথচ অধিকাংশের ইচ্ছায় শাসন পরিচালনা লাভ করেছি এর সবটাই হারাব। যাদের হারাবার মতো ধন-সম্পদ নেই তারাও এই সম্পদ হারাবে।

অতএব আমরা চোখ বুজে আমেরিকার বা রাশিয়ার কোনো তাঁবুর তাঁবেদার হতে পারিনে। আমাদের নিজস্ব একটা উত্তর আছে। সে উত্তর দিয়ে গেছেন গান্ধী, দিয়ে যাচ্ছেন বিনোবা ও জবাহরলাল। আমরা বিপ্লব এড়াতে চাইনে, কিন্তু তাকে ঘটাতে চাই প্রেম দিয়ে, অহিংসা দিয়ে, আপোসে। এই যে জমিদারি উঠে যাচ্ছে, মধ্যস্বত্বাধিকারীদেরও স্বত্ব কিনে নেওয়া হচ্ছে, এই যে লোকে স্বেচ্ছায় ভূদান করছে, সম্পত্তি দান করছে, এ কি বিপ্লব নয় ? তবু এর পিছনে গায়ের জোর নেই। ধনিকদের দাপট আছে, ঠিক। কিন্তু তারাও একেবারে

অবুঝ নয়। হলে এত দিনে হিন্দু ফাসিস্ট সরকার কায়েম হয়ে থাকত। ধনিকদেরও সময় দিতে হবে জনগণের ইচ্ছায় বিবর্তিত হতে। তারা নির্ধন হোক এ প্রস্তাব কেউ করবে না। তবে নির্বিরোধ হোক এ কামনা করবে। যেমন ইংলণ্ডের রাজবংশ। এই সাত বছরে আমরা ভুল করেছি অনেক। ভুল করতে করতে এই শিখেছি যে আমাদের একটা স্বতন্ত্র উত্তর আছে। সে উত্তর রাশিয়ার সঙ্গে মেলে না, আমেরিকার সঙ্গে মেলে না, তবু তা নির্ভুল।

(১৯৫৪)

রেনেসাঁস

প্রায়ই দেখা যায় যে আমরা বিদেশ থেকে শব্দ নিই আর তার উপর আরোপ করি মন-গড়া অর্থ। রেনেসাঁস শব্দটির বেলা এমনি এক অর্থবিকৃতি ঘটেছে। অভিধান অনুসারে তার অর্থ নবজন্ম। তা বলে যে কোনো একটি নবজন্মকে রেনেসাঁস বলা উচিত নয়। রেনেসাঁসের ইতিহাস পড়তে হবে। কোনখান থেকে এল, কেন এল, কী বাণী নিয়ে এল, কোথায় তার দুর্বলতা এ সমস্ত ভালো করে বুঝে তার পরে ব্যবহার করা না করা উচিত ঐ শব্দ।

রেনেসাঁসের প্রথম লক্ষণ অন্তহীন জিজ্ঞাসা ও কৌতূহল। যা কিছু দেখবার আছে দেখতে হবে, যা কিছু শেখবার আছে শিখতে হবে। সব জিনিস হাতে কলমে পরীক্ষা করতে হবে। যা এতদিন অভ্রান্ত মনে হয়েছিল তাকে পুনর্বিচার করতে হবে। স্বয়ং ভগবান তাঁর পুত্রের মুখ দিয়ে বলালেও তা অভ্রান্ত নয়। প্রেরিত পুরুষদের ধ্যানগোচর হলেও তা অভ্রান্ত নয়। শাস্ত্র কিংবা সংঘ কিংবা গুরু কিংবা সাধু কেউ অভ্রান্ত নন। মানুষ তার স্বাধীন চিন্তা ও পরীক্ষার দ্বারা সত্য নির্ণয় করবে। হয়তো ভুল করবে, তবু পরের মুখে ঝাল খাবে না। তার জ্ঞানবুদ্ধির অন্ত নির্দেশ করা চলবে না। তার উপর বাধা নিষেধ খাটবে না।

দ্বিতীয় লক্ষণ অশঙ্কিত রূপভোগ সৌন্দর্যভোগ। এ জিনিসটাকে সেকালের সাধু সন্ন্যাসীরা ভয় করতেন। শয়তান এই পথ দিয়ে মানুষকে অধঃপাতে নিয়ে যায়। সেইজন্যে তাঁরা সযত্নে ইন্দ্রিয়ের দ্বার রোধ করে অন্ধ ও বধির হতেন। না চিত্রকলা, না ভাস্কর্য, না সংগীত কোনোটির সম্যক বিকাশ হতো না। হতো যে পরিমাণে তা ধর্মজীবনের পরিপূরক। তার বাইরে যে অসীম রূপলোক সৌন্দর্যলোক আছে এর দিকে তাকালেই তাঁরা শিউরে উঠতেন। ঐ রে, শয়তান প্রলোভন দেখাচ্ছে। অমনি করে ও ভালোমানুষকে ভোলায়।

তৃতীয় লক্ষণ মানবের আত্মশক্তির উপর অগাধ বিশ্বাস। সে শক্তি শয়তানের চেয়েও বেশী, দেবদেবীদের চেয়েও বেশী, প্রায় ভগবানের সমান। মানুষ না পারে এমন কর্ম নেই। মানুষের অসাধ্য কাজ নেই। এক দিন হয়তো মরাকে বাঁচাবে। জরাকে জোয়ান করবে। জড় থেকে প্রাণী সৃষ্টি করবে। মঙ্গল গ্রহে

যাত্রা করবে, চন্দ্রলোকে ভ্রমণ করবে। পৃথিবীকে ধনধান্যে নন্দনকানন করে তুলবে। নিজেও দেবতা হবে।

অবশ্য এর পরেও প্রশ্ন থেকে যায়। ততঃ কিম্ ? যাদের বিবেক নেই, ন্যায় অন্যায় বোধ নেই, প্রেম নেই, প্রীতি নেই, দয়া নেই, অহিংসা নেই, কে চাইবে তাদের রাজ্যে বাস করতে ? এর চেয়ে মধ্যযুগের অন্ধকারও ভালো। আজকের ইউরোপে মধ্যযুগের প্রতি একটা পিছু টানও লক্ষ করা যায়। এর কারণ মানুষের নিষ্ঠুরতা।

(১৯৫৪)

যুগজিজ্ঞাসা

খুকুকে জিজ্ঞাসা করা হলো, "খুকু, তুমি কাকে বেশী ভালোবাসো ? মাকে, না বাবাকে ?"

খুকু কী উত্তর দিল জানেন ? "মাকেও, বাবাকেও।"

তেমনি আমাকে যদি কেউ জিজ্ঞাসা করে, "কাকে বেশী ভালোবাসো ? দেশকে, না যুগকে ?" আমি উত্তর দেব, "যুগকেও। দেশকেও।"

দেশ এত দিন পরাধীন ছিল বলে আমরা দিন রাত দেশের কথাই ভেবেছি, যুগের প্রতি মনোযোগ দিইনি, যখনি কেউ মনে করিয়ে দিয়েছে তখনি আধুনিককে পাশ্চাত্য বলে এক খোঁচায় নস্যাৎ করে দিয়েছি। এখন তো দেশ স্বাধীন হয়েছে, এখন যুগের সঙ্গে মোকাবিলা করা দরকার। ঐ কাজটি বকেয়া পড়ে রয়েছে।

গত শতাব্দীর নায়কদের মধ্যে যুগজিজ্ঞাসা প্রবল ছিল। রামমোহন থেকে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত কেউ দেশকে ভালোবাসতে গিয়ে যুগকে অনাদর করেননি। কিন্তু ঐ শতাব্দীরই শেষ ভাগে উল্টো হাওয়া বইতে আরম্ভ করে। দেশানুরাগ হয়ে দাঁড়াল দেশের অতীতানুরাগ, যে অতীতের সঙ্গে বর্তমানের কোনো সম্বন্ধ নেই। প্রাচীন ভারত ও আধুনিক বিশ্ব এর একটাকে বরণ করতে গেলে অপরটাকে উপেক্ষা করতে হবেই, মাঝখানে সেতুবন্ধনের আশা দুরাশা। অথচ এমনি আমাদের পরাধীনতার জ্বালা যে আমরা ইংরেজ মনে করে ইউরোপকে বর্জন করব, ইউরোপ মনে করে আধুনিক যুগটাকে অগ্রাহ্য করব, থাকব কাকে নিয়ে ? না, ভারতের অতীতকে।

ভূতকে নিয়ে ঘর করা যায় না। তার থেকে এল সেতুবন্ধনের কথা। প্রাচীন ভারতও থাকুক, আধুনিক বিশ্বও থাকুক, মাঝখানে একটা সেতু নির্মাণ করা হোক। সমন্বয়। তার মানে গোঁজামিল। অতীত সম্বন্ধে কারই বা সম্যক ধারণা আছে যে দৃঢ় ভূমির উপর পা রেখে বলতে পারবে এই হলো সেতুর এক প্রান্ত ! প্রাচীন ভারতে যেমন দেবতা ছিল তেমনি দানব ছিল, যেমন মানুষ ছিল তেমনি রাক্ষস ছিল, যেমন পাণ্ডব ছিল তেমনি কৌরব ছিল, যেমন অহিংসা

ছিল তেমনি অতি ভয়ংকর ভয়ংকর মারণাস্ত্র ছিল, যেমন আস্তিক দর্শন ছিল তেমনি নাস্তিক দর্শন ছিল। প্রাচীন ভারতের স্বরূপ অনেকটা আধুনিক ইউরোপের মতো। সেখানে বহু বিভিন্ন ও বিরুদ্ধ শক্তি ক্রিয়া করছে। তাকে এক কথায় আধিভৌতিক বলে পাতালে নামিয়ে দেওয়া যায় না, প্রাচীন ভারতকেও এক কথায় আধ্যাত্মিক বলে আকাশে তুলে দেওয়া যায় না, আকাশের সঙ্গে পাতালকে একসূত্রে গাঁথা যায় না।

এই পণ্ডশ্রমের পশ্চাতে ছিল পরাধীনতাবোধ। এখন তো সে বোধ নেই। এখন পণ্ডিতদের বলা উচিত, আর পণ্ডশ্রম করতে হবে না, পুরোপুরি আধুনিক যুগের সঙ্গে অভিন্ন হও। অতীত সম্বন্ধে অনুসন্ধিৎসা অপরের মধ্যে যতটা দেখছ তোমাদের মধ্যেও ততটা থাকবে। প্রাচীন ভারত তার আয়ু নিঃশেষে ভোগ করেছে, তোমাদেরটাও যেন গ্রাস না করে।

আর এই যে আধুনিক যুগ, ইউরোপ বা আমেরিকা এর একমাত্র শরিক নয়। তোমবাও শরিকান। তোমরা এক হাতে নেবে, আর-এক হাতে দেবে, তোমাদেবও একটা ভূমিকা আছে, তোমরা তাতে অভিনয় করবে, কিন্তু খবরদার, সেটা হ্যামলেটের ভূতের পার্ট নয়। তোমরা প্রাচীন ভারতের ভূত নও। তোমরা আধুনিক ভারতের জীবন্ত মানুষ। তোমাদের ভূমিকা পূর্বনির্দিষ্ট নয়, তা সৃষ্টিশীল, তা আপনাকে আপনি সৃষ্টি করে চলবে। থাকবে তার মধ্যে তোমাদেব ভারতীয় বৈশিষ্ট্য, কেউ সাধছে না তোমাদের মার্কিন বা রুশ হতে। কিন্তু আধুনিক যুগের বৈশিষ্ট্যগুলি থাকা চাই।

এ যুগ যে বিজ্ঞানের যুগ এ কথা সকলে জানে। কিন্তু তার চেয়েও বড়ো কথা, মানবিকতার যুগ। যাকে বলে হিউমানিজম তার লক্ষণ হলো সমাজের চেয়ে মানুষ বড়ো, সম্প্রদাযের চেয়ে মানুষ বড়ো, শ্রেণীর চেয়ে মানুষ বড়ো, সংঘের চেয়ে মানুষ বড়ো। আগেকার দিনে মানুষের চেয়ে মানুষের সমাজ ইত্যাদিকে বড়ো করে দেখা হয়েছে। নারীকে, শূদ্রকে, ক্রীতদাসকে নির্মম ভাবে ছোট করে রাখা হয়েছে, যেন সেটা তাদের দৈবলিখন। দৈবলিখন বলে চালানো হয়েছে যা প্রতিকারযোগ্য, যা প্রতিকার করা সম্ভব, তাকে। সনাতন বলে চালানো হয়েছে যা তৎকালীন তাকে। প্রাকৃতিক বলে চালানো হয়েছে যা কৃত্রিম তাকে। নৈতিক বলে চালানো হয়েছে যা বদ্ধমূল সংস্কার তাকে। সত্য বলে চালানো হয়েছে যা স্বার্থদুষ্ট তাকে।

বিদ্রোহ শুরু হয় ইউরোপের রেনেসাঁসের সময় থেকে। তা বলে বিদ্রোহটা শুধুমাত্র ইউরোপীয়দের ঘরোয়া ব্যাপার নয়। ওটা সর্বমানবের। যেমন ভারতীয়দের অহিংস সত্যাগ্রহ সর্বমানবের। বিদ্রোহের ঢেউ এক বন্দর থেকে আর-এক বন্দরে পৌঁছলেও সেটা বন্দরের ঢেউ নয়, সমুদ্রের ঢেউ। বিদ্রোহের হাওয়া এক দেশ থেকে আর-এক দেশে পৌঁছলেও সেটা মাটির হাওয়া নয়, আকাশের হাওয়া। বিদ্রোহ ক্রমে ক্রমে আধুনিকতম রূপ নিয়েছে। কেউ পড়ে থাকতে চায় না, জাতের দরুন না, রঙের দরুন না, লিঙ্গের দরুন না। অনেক যুগের জমে থাকা পাপ এই যুগেই সাফ করতে হবে। তা সে যুদ্ধ করেই

হোক বা বিপ্লব করেই হোক বা আপোসেই হোক বা বন্ধুভাবেই হোক। শ্রেষ্ঠ উপায় অবশ্য বন্ধুভাব বা অহিংসা। নিকৃষ্ট উপায় যুদ্ধ। একটা উপায় ব্যর্থ হলে মানুষ আর একটা উপায় পরীক্ষা করবেই। উদ্দেশ্য হলো স্বাধিকার প্রতিষ্ঠা।

অবশ্য কেবল এই নিয়ে আয়ু শেষ করা সকলের কর্তব্য নয়। সৃষ্টির কাজ করে যেতে হবে আমাদের অনেককে। গায়ক গাইবে, বাদক বাজাবে, নর্তক নাচবে, ছবিকার ছবি আঁকবে, কবি কবিতা লিখবে। এসব কাজ এক দিনও ফেলে রাখা যায় না। ফেলে রাখলে পরম্পরা কেটে যাবে। সাধনার ধারা শুকিয়ে যাবে। নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের মতো এসব প্রক্রিয়া নিত্য বহমান। কেউ যদি বলে, এসব কিছু কালের জন্যে বন্ধ রাখলে ক্ষতি কী, তা হলে বুঝতে হবে নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের মূল্য সম্বন্ধে তার কোনো ধারণা নেই। মানুষের দুর্ভাগ্য বর্তমান শতাব্দীতে এ ধরনের লোক সব দেশেই দলপতি হয়ে বসেছে। কোথাও কম কোথাও বেশী।

বন্ধ রাখলে সাধারণের দিক থেকেই আপত্তি ওঠে। তখন এরা বলে এদের ফরমাস মতো লিখতে, আঁকতে, গাইতে, বাজাতে, নাচতে। আর-এক আপদ। এর চেয়ে বন্ধ করা কম খারাপ। শিল্পীদের পক্ষে আধুনিক যুগে বেঁচে থাকা শক্ত। বাঁচা অবশ্য কায়িক অর্থে নয়। সৃষ্টি করতে করতে বাঁচা। এর একটা নিষ্পত্তি চাই, নইলে আর সব হবে, রস হবে না, রূপ হবে না, সৌন্দর্য হবে না। এ যুগ যখন অতীত হয়ে যাবে তখন এর কোনো শিল্পসম্পদ রেখে যাবে না। পরবর্তী যুগের ওরা বলবে এ যুগ নিষ্ফলা, বন্ধ্যা।

সুতরাং স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার জন্যে যা করতে চাও, করো। কিন্তু সেই সঙ্গে মনে রেখ শিল্পীদের বেঁচে থাকা দরকার। শুধু কায়িক অর্থে নয়, আত্মিক অর্থে। তারা যদি মনের মতো করে লিখতে না পারল, আঁকতে না পারল, গাইতে না পারল, নাচতে না পারল তা হলে তেমন বাঁচার কী তাৎপর্য! তারা যদি তোমাদের ফরমাসই খাটবে তা হলে তারা শিল্পী হতে যাবে কোন দুঃখে! তারা যুগের ভিতর দিয়ে কাজ করছে বটে, কিন্তু তারা নিত্য কালের রাখাল। অমৃতের সন্তান। যুগ যদি তাদের বিকৃতি ঘটায় সেটা যুগেরই মুখবিকৃতি। ভাবীকাল তা দেখে হাসবে।

এ যুগের ভিতর দিয়ে যেতে হবে সকলকেই। শিল্পীকেও। কিন্তু শিল্পীর পরমায়ু যুগের চেয়েও দীর্ঘ। সেইজন্যে তার সাধনাও যুগকে অতিক্রম করবার মতো দুরূহ। এই দুরূহ নিয়ে যারা আছে তাদের সহজ দিয়ে ভোলানো যায় না। যারা নগদ বিদায় চায় তাদের ধারা আলাদা। তারা আজ আছে, কাল নেই। কিন্তু যারা আজ আছে, কাল আছে, চিরকাল আছে তাদের কাজে হস্তক্ষেপ না করে চুপ করে দেখ তারা কী লিখছে, কী আঁকছে, কী দিচ্ছে। তারা যদি বাঁচে তাদের মধ্যে, তাদের সৃষ্টির মধ্যে, তোমরাও বাঁচবে।

শিল্পীর দুর্দিন সব দেশেই লক্ষ করছি। সেইজন্যে যুগকেই তার জন্যে দায়ী করি। এ যুগ যদি শিল্পীদের সহ্য না হয় তা হলে আফসোসের সীমা

থাকবে না, কারণ এমন বিষয়বস্তু, এত ঘাত প্রতিঘাত, এত রকম চরিত্র, এ পরিমাণ সংস্কারমুক্তি আর কোনো যুগে সম্ভব হয়নি।

(১৯৫৪)

ভাষার লড়াই

ইংরেজ রাজত্বের শেষের দিকে প্রশ্ন ওঠে, ইংরেজের উত্তরাধিকারী হবে কে? এই প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে মহামারী বেধে গেল। কেননা একজনের উত্তর আর একজনের মনঃপূত হয় না। বড়ো একদল মুসলমান এই বলে বেঁকে বসলেন যে ইংরেজ চলে গেলে তার উত্তরাধিকারী হবে হিন্দু, অতএব স্বাধীনতার সংগ্রামে তাঁরা যোগ দেওয়া দূরে থাক পদে পদে বাধা দেবেন, যদি না উত্তরাধিকারের একাংশ তাঁদের স্বতন্ত্রভাবে দেওয়া সাব্যস্ত হয়। হলোও তাই। নইলে মহামারী চরমে উঠত।

ইংরেজ গেছে, কিন্তু ইংরেজী যায়নি। প্রশ্ন উঠেছে, ইংরেজীর উত্তরাধিকারী হবে কে? পাকিস্তানের ভাগ্যবিধাতারা পশ্চিমা, তাঁদের সুবিধা হয় যদি উর্দু হয় উত্তরাধিকারী। কিন্তু অধিকাংশ পাকিস্তানী থাকে পূর্ব অঞ্চলে। তাদের ভাষা বাংলা। গণতন্ত্র চলে অধিকাংশের ইচ্ছায়। তা হলে বাংলাকেই করতে হয় পাকিস্তানের একচ্ছত্র রাষ্ট্রভাষা। কিন্তু পশ্চিমারা তাতে কিছুতেই রাজি হবে না। সেইজন্যে আপোসের শর্ত হিসাবে উর্দু ও বাংলা উভয়কেই রাষ্ট্রভাষা করার দাবি উঠেছে। এই দাবি সময়মতো মেনে নিলে ঢাকার ছাত্ররা প্রাণ দিত না, মুসলিম লীগ মন্ত্রীমণ্ডলীর পতন হতো না, আবহাওয়া এমন গরম হয়ে উঠত না যে নারায়ণগঞ্জের কাছে বাঙালী অবাঙালী শ্রমিকের সংঘর্ষ ঘটত ও তার ফলে বহু শত নরনারী ও শিশু নিহত হতো। আবহাওয়া কী করে ঠাণ্ডা হবে যদি না উর্দু ও বাংলা যৌথ উত্তরাধিকারী হয়? অথবা পাকিস্তানকে ভেঙে দু ভাগ করে দেওয়া হয়? অথবা ইংরেজীকেই চিরস্থায়ী রাষ্ট্রভাষা বলে ঘোষণা করা হয়? চতুর্থ কোনো সমাধান নেই। উর্দু একচ্ছত্র উত্তরাধিকারী হবে, এ মনোভাব যদি না বদলায় তবে পাকিস্তানের কনস্টিটিউশন কোনো কালেই রচিত হবে না, কেন্দ্রীয় শাসকদের প্রতি অনাস্থা জন্মাবে, দেখতে দেখতে গৃহ যুদ্ধ বেধে যাবে।

এমন আশঙ্কাটি আমাদের এদিকেও আছে। ইংরেজীর উত্তরাধিকারী হবে কে? ভারতের ভাগ্যবিধাতারাও পশ্চিমা, তাঁদের সুবিধা হয় যদি হিন্দী হয় ইংরেজীর উত্তরাধিকারী। তাঁরা ভুলে গেছেন যে মহাত্মা গান্ধী যখন হিন্দীকে রাষ্ট্রভাষা করতে বলেছিলেন তখন তার সঙ্গে গোটা দুই শর্ত জুড়ে দিয়েছিলেন। প্রথমত, হিন্দীর নাম হবে হিন্দী-হিন্দুস্থানী, দেবনাগরী ও ফারসী দুই লিপিতে লিখিত। দ্বিতীয়ত, সে শুধু কেন্দ্রীয় কাজকর্মের জন্যে ব্যবহৃত হবে, সেসব কাজকর্ম কেবল দেশরক্ষা যানবাহন ও বৈদেশিক ব্যাপার এই তিনটি

বিভাগে বিভক্ত। তিনি বিকেন্দ্রীকরণ চেয়েছিলেন। আজকের কেন্দ্রীয় সরকারের মতো বিরাট আয়তন চাননি। যার অসংখ্য কর্মচারী, অশেষ বিভাগ। দেবনাগরীতে লিখিত সংস্কৃতপ্রধান হিন্দী যদি হয় রাষ্ট্রভাষা তা হলে এক ঢিলে অনেকগুলি পাখি মরে। অনেকগুলি প্রতিযোগীকেই খতম করা হয়। মুসলমান তো প্রতিযোগিতায় হটবেই, পাঞ্জাবী হিন্দুরাও ফেল করবে, কারণ তারা উর্দুতে অভ্যস্ত, ফারসীতে দোরস্ত। বাঙালী অসমীয়া ওড়িয়াদের দুর্গতি হবে। একদম কলকে পাবে না দক্ষিণীরা। এরা সকলেই হিন্দু। এখানে ধর্মের প্রশ্ন অবান্তর।

যেসব রাজ্যের লোকভাষা একাধিক সেসব রাজ্যে সরকারী কাজকর্ম এতদিন ইংরেজীতে চলে আসছে, তবে আদালতে লোকভাষাও চলে। হিন্দীকে ইংরেজীর উত্তরাধিকারী করলে মরাঠা গুজরাতী ও কর্ণাটকী কারুর কোনো সুবিধা নেই, প্রতিযোগিতায় সকলের সমান অসুবিধা, এ কথা ভেবে বোম্বাই সরকার হিন্দীর দিকে ঝুঁকেছেন। সম্প্রতি যেসব ঘটনা ঘটেছে তার থেকে মনে হচ্ছে ইংরেজীর পক্ষপাতীরা অত সহজে হাল ছেড়ে দেবেন না, তাঁরা যদি-বা ছাড়েন গুজরাতী মরাঠা ও কর্ণাটকীরা যে যার নিজের ভাষার দাবি উপেক্ষা করে হিন্দীকে সিংহাসনে বসাবেন না। এটা গান্ধীজীর ইচ্ছা ছিল না যে বিকেন্দ্রীকৃত ভারতের আঞ্চলিক ভাষাগুলিকে ইংরেজীর উত্তরাধিকারী হতে না দিয়ে হিন্দীকে সর্বাধিকারী করা হয়। তিনি তো কল্পনাই করেননি যে গুজরাত মহারাষ্ট্র প্রভৃতি স্বতন্ত্র প্রদেশ সৃষ্টি না হয়ে সাবেক আমলের বোম্বাই প্রদেশ কায়েম থাকবে। বোম্বাই প্রদেশ যাঁরা কায়েম রাখতে চান তাঁদের আসল অভিপ্রায় বোম্বাই শহরটাকে মরাঠাদের একচেটে দাবির হাত থেকে বাঁচানো। ওদিকে মরাঠারাও বোম্বাই শহরটাকে আলাদা একটা রাজ্য হতে দেবে না, দিলে প্রস্তাবিত মহারাষ্ট্র প্রদেশ কানা হয়ে যায়। মাদ্রাজ শহরটাকে নিয়ে তামিল ও তেলুগু মিলে টানাহেঁচড়া করায় অন্ধ্র রাজ্যের গঠন কিছুতেই সম্ভব হচ্ছিল না। মাদ্রাজকে বাদ দিয়ে আপাতত অন্ধ্র রাজ্য গঠিত হয়েছে, কিন্তু অন্ধ্ররা এখনো আশা করছে মাদ্রাজের একাংশ ওরা পাবে। সীমানার গোলমাল মেটানোর জন্যে যে কমিশন বসছে তার প্রাণ অতিষ্ঠ হবে যদি ভাষাভিত্তিক রাজ্য গড়তে গিয়ে কান ধরাধরি বেধে যায়। বোম্বাই শহর নিয়ে মরাঠা গুজরাতীর, মাদ্রাজ শহর নিয়ে তামিল তেলুগুর, মানভূম জেলা নিয়ে বাঙালী বিহারীর, জামশেদপুর নিয়ে বাঙালী বিহারী ওড়িয়ার, এমনি কত রকম কোঁদল যে ফণা তুলে রয়েছে তার আভাস এখনি পাচ্ছি, প্রকাশ পরে দেখব। এতদিন ইংরেজী বহাল আছে বলেই রক্ষা, নয়তো ইতিমধ্যে হাতাহাতি আরম্ভ হয়ে যেত। মাদ্রাজ সরকার যদি আজ এখনি মাদ্রাজ শহরে ইংরেজীর জায়গায় তামিল প্রবর্তন করেন তা হলে চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে রক্তারক্তি হয়ে যাবে।

ভারতবর্ষের ভাষা সমস্যা ক্রমেই রঙীন হয়ে উঠবে, যতই ইংরেজীর দিন যাবে। এর মধ্যে প্রতিযোগিতার প্রশ্ন উহ্য রয়েছে। যা নিয়ে ফরাসী জার্মানের যুদ্ধ শতাধিক বর্ষ ধরে চলেছে, এখনো মীমাংসা হলো না, তাই নিয়ে আমরা

এক নেশন হয়ে উঠব, কেউ কোথাও শান্তিভঙ্গ করবে না, এটা দুরাশা। হিন্দীকে ইংরেজীর সর্বময় উত্তরাধিকারী করলে বিপদ, না করলেও বিপদ। মাঝখান থেকে হয়তো ইংরেজীই চিরস্থায়ী হবে। নয়তো এমন কোনো সমাধান খুঁজে বার করতে হবে যাতে প্রতিযোগিতায় সকলের সমান সুবিধা, সমান অসুবিধা।

সে রকম একটা সমাধানের প্রস্তাব কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি করেছেন। সর্বত্র উচ্চশিক্ষার বাহন হবে আঞ্চলিক ভাষা। হিন্দীকে কারুর উপর চাপিয়ে দেওয়া হবে না। কেন্দ্রীয় সরকারের পরীক্ষাগুলোতে হিন্দী মাধ্যম আপাতত আবশ্যিক হবে না। হিন্দী শিখতে হলেও তা এক রকম সোজা হিন্দী, আঞ্চলিক হিন্দী নয়। হিন্দীভাষীদেরও অন্য ভাষা শিখতে হবে। প্রস্তাবের মূলে প্রচুর পরিমাণে সদিচ্ছা রয়েছে। আদৌ হিন্দী সাম্রাজ্যবাদী মনোভাব নেই। কিন্তু এখনো কেউ বলতে পারছেন না এমন কোন হিন্দী প্রচলিত আছে বা হবে যা আঞ্চলিক হিন্দীর চেয়ে সোজা, যা সহজে শেখা যায়, সহজে লেখা যায়, সহজে উচ্চারণ করা যায়, যা শুনে কেউ কানে আঙুল দেবে না। হিন্দীকে খুন না করলে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির প্রস্তাব কার্যকরী হওয়া সম্ভব নয়। হিন্দী বিদ্বানরা যে "বাঁচাও" "বাঁচাও" বলে আর্তনাদ করবেন এটা স্বাভাবিক। কখন কার মাথায় খুন চাপবে, অশুদ্ধ হিন্দী শুনে সে হয়তো এমন ক্রুদ্ধ হবে যে যুদ্ধং দেহি বলে মাথার খুলি উড়িয়ে দেবে। না, সমস্যা অত সহজ নয়। তার চেয়ে সোজা আমাদের পাকিস্তানী ভ্রাতাদের পদাঙ্ক অনুসরণ। অর্থাৎ হিন্দীও থাকুক, তার সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হোক আরো দু তিনটে ভাষা। যেমন বাংলা, মরাঠী, কর্ণাটকী। তামিল বলতে বলতে বললুম না এইজন্যে যে তেলুগুরা বরং হিন্দী সহ্য করবে, তবু তামিল নৈব নৈব চ। সুইটজারলণ্ডে যদি ফরাসী জার্মান ইতালিয়ান তিনটে রাষ্ট্রভাষা চলে তবে ভারত রাষ্ট্রে কেন চারটে রাষ্ট্রভাষা চলবে না? ইচ্ছা থাকলে উপায় থাকে। সরকারী কাজে যখন হিন্দী বাংলা কর্ণাটকী ব্যবহার করা হবে তখন একটাই লিপি মেনে নেওয়া হবে,হয় দেবনাগরী নয় রোমান। বক্তৃতার সময় তর্জমার ব্যবস্থা ইউনাইটেড নেশনসের মতো হবে, সঙ্গে সঙ্গে তর্জমা হয়ে যাবে।

এক দেশ, এক ধর্ম, এক ভাষা। হিন্দ্, হিন্দু, হিন্দী। এ বুলি চিরকালের মতো ভুলতে হবে। নইলে শান্তিস্থাপনের বিন্দুমাত্র ভরসা নেই। ধর্ম নিয়ে দেশ দ্বিখণ্ড হলো, ভাষা নিয়ে বহুখণ্ড হবে। আর একটা ইউরোপ আর কী!

২

হিন্দীর সঙ্গে বাংলা, মরাঠী ও কর্ণাটকী এই তিনটি ভাষাকেও রাষ্ট্রভাষা করলে ভালো হয় আমার এই আর্জি পড়ে একজন প্রশ্ন করেছেন, উর্দু কেন রাষ্ট্রভাষা হবে না?

এর উত্তরে আমার কৈফিয়ৎ:

আমি যখন বাংলার নাম করি তখন আমার মাথায় ঘুরছিল হিন্দীর চেয়ে বাংলা যাদের পক্ষে সহজ সেই অসমীয়া, মণিপুরী, মৈথিলীদের কথা। কেবল বাঙালীর কথা নয়। কেবল বাঙালীর কথা ভাবলে অত বড়ো দুঃসাহস আমার হতো না। কারণ রাষ্ট্রভাষা নির্ধারিত হয় একাধিকের স্বার্থে, বিপুল সংখ্যকের স্বার্থে। একলার স্বার্থ নিয়ে আমরা যদি ভারতের পার্লামেণ্টে হাজির হই কেউ আমাদের খাতিরে হাত তুলবে না। আমরা ভোটে তো হারবই, লজ্জায় মুখ তুলতে পারব না, কোণঠাসা হব।

তেমনি মরাঠীর নাম করবার সময় কেবল মরাঠাদের স্বার্থচিন্তা করিনি, কর্ণাটকীর উল্লেখ করার সময় কেবল কর্ণাটীদের স্বার্থ ধ্যান করিনি। হিন্দীর চেয়ে মরাঠী বা কর্ণাটকী যাদের পক্ষে সহজ তাদের কথাও ভেবেছি। নইলে তারা হাত তুলবে কেন? ভোট দেবে কেন? গণতন্ত্রে এসব লড়াই লাঠি ডাণ্ডা বোমা রিভলবার দিয়ে হয় না।

এখন, হিন্দীর চেয়ে উর্দু কাদের পক্ষে সহজ? একমাত্র উর্দুভাষীদের পক্ষে নয় কি? উর্দুভাষী ব্যতীত আর কেউ কি হাত তুলবে, না ভোট দেবে? কোণ-ঠাসা হতে উর্দুভাষীরা নিজেরাই রাজি হবেন না। আগে তাঁদের দল ভারী করতে হবে। কিন্তু এমন কে আছে যে স্বেচ্ছায় হিন্দী ছেড়ে উর্দু শিখতে প্রস্তুত? গণতন্ত্রে কোনো জিনিস কারো উপর জোর করে চাপানো যায় না। যায় না বলেই ঢাকার ছেলেরা জান দিল। সেখানকার উজীরদের পতন হলো। উর্দুকে এ রাষ্ট্রে জোর করে চাপানো অসম্ভব।

আগেকার দিনে উর্দুর পক্ষে খুব জবর যুক্তি ছিল এই যে অখণ্ড মুসলমান সমাজকে যদি সম্মানের সঙ্গে থাকতে হয় তবে তাদের প্রিয় ভাষা উর্দুকেও হিন্দীর সমান আসন দিতে হবে। এ যুক্তি ভাষাগত নয়, সম্প্রদায়গত। এটা ভাষার লড়াইয়ের এলাকায় পড়ে না, পড়ে সম্প্রদায়ের লড়াইয়ের এলাকায়। আমার প্রবন্ধের বিষয় ভাষার লড়াই, সম্প্রদায়ের লড়াই নয়। আবার যদি সাম্প্রদায়িক মীমাংসার প্রশ্ন ওঠে তাহলে উর্দুকে ভারতের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার প্রস্তাব উঠতে পারে, সঙ্গে সঙ্গে হিন্দীকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার প্রশ্নও উঠতে পারে। দুই রাষ্ট্রের প্রতিনিধিরা একত্র হয়ে এক টেবলের চার ধারে বসে একসঙ্গে এ দুই প্রশ্নের মীমাংসা করবেন, তারপর দুই পার্লামেণ্ট সে মীমাংসা মেনে নেবে।

(১৯৫৪)

ইংরেজী শিক্ষা

একটা বিদেশী ভাষা এ দেশের রাষ্ট্রভাষা হবে আর দেশের ছেলেমেয়েদের সে ভাষায় লেখাপড়া শিখতে হবে, এ চিন্তা অসহ্য। কারণ এর সঙ্গে জাতীয় আত্ম-সম্মানের প্রশ্ন জড়িয়ে রয়েছে। আমরা সেইজন্যে স্বাধীনতা সংগ্রামের একটি

পর্যায়ে ইংরেজী শিক্ষা বর্জন করেছিলুম। এখন দেশ স্বাধীন হয়েছে। এখনো ইংরেজী শিক্ষার অবসান হয়নি দেখে অনেকে লজ্জাবোধ করছেন। বর্জনের প্রয়াস আবার ঐকান্তিক হয়েছে।

ব্যাপারটা পুনর্ভাবনার অপেক্ষা রাখে।

আমার বড়ো ছেলেকে বারো বছর পর্যন্ত ইংরেজী শিখতে দেওয়া হয়নি। তার সঙ্গে বা তার সামনে আমরা ইংরেজীতে কথা বলিনি। তার খাতিরে তার মাকেই বাংলা শিখতে হয়েছে। বন্ধুবান্ধব অনুযোগ করেছেন আমরা ছেলেটির ভবিষ্যৎ মাটি করছি। আমরা এর উত্তরে বলেছি মানুষ কেবলমাত্র একটি ভাষায় চিন্তা করতে পারে, একাধিক ভাষায় নয়। চিন্তার ভাষা বাংলা। তার জন্যে জন্মের পর বারো বছর সময় লাগবে। ইচ্ছা করলে অবশ্য ও বয়সে বহুভাষী হওয়া যায়। কিন্তু তাতে চিন্তার সুতো কেটে যাবে। মনের ভিতরে এমন একটা জখম ঘটে যাবে যার ফলে ঐ পণ্ডিত কোনো দিন ভাবুক হবে না। ঐ তোতা পাখি কোনো দিন বুলবুল হবে না।

এই পরীক্ষা ব্যর্থ হয়নি। বড়ো হয়ে ও ছেলে ইংরেজী শিখেছে, ভালোই শিখেছে, বোধ হয় অন্যের চেয়ে ভালো শিখেছে। এ তো চোখ বুজে গিলে গিলে খাওয়া নয়। এ চেখে চেখে চিবিয়ে খাওয়া। মনের দিক থেকে ও যতখানি সাবালক হয়েছে ওর বয়সের আর কেউ তা হয়েছে কি না তা পরে বোঝা যাবে।

মন তৈরি না হওয়া পর্যন্ত ইংরেজী ভাষা শেখানো উচিত নয়, এ বিষয়ে আমার মত আগে যা ছিল এখনো তাই। কিন্তু মুশকিল হলো এই যে দেশে এমন একটি ইস্কুল নেই যেখানে বারো বছর বয়স অবধি ইংরেজী শেখানো হয় না। অগত্যা ছেলেকে বাড়িতে বসিয়ে রাখতে হয়। তাতে তার সমবয়সীদের সঙ্গে বিচ্ছেদ ঘটে যায়। আর সবাই ইস্কুলে যাচ্ছে, সে যাচ্ছে না, মনের উপর এর প্রভাব ক্ষতিকর। বড়ো ছেলে এখনো ঠিকমতো মিশতে পারে না। ছোট ছেলে মিশুক হয়েছে, কিন্তু এর জন্যে তাকে বাধ্য হয়ে ইংরেজী শিখতে হয়েছে বারো বছর বয়সের আগেঃ। আমরা তাকে বাড়িতে আটকে রেখে তার সমবয়সীদের থেকে বিচ্ছিন্ন করতে ব্যথা বোধ করেছি। সেইজন্যে তার বেলা অন্য পরীক্ষা।

এই দুটি দৃষ্টান্তের নীতি এই যে বারো বছর বয়স পর্যন্ত ইংরেজী না শেখালে কোনো ক্ষতি হয় না, কিন্তু ইস্কুলে না পাঠালে ক্ষতি হয়। সুতরাং ইস্কুলে পাঠাতেই হবে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ইস্কুলের পাঠ্য তালিকা থেকে বারো বছর বয়স পর্যন্ত ইংরেজী বর্জন করতে হবে। কারণ মন হলো মানুষের প্রধান সম্বল। মানুষ মনোজীবী। সেই মনের উপর জুলুম করা কখনো উচিত নয়। অপর পক্ষে মানুষ একা বাঁচে না। তার সঙ্গীর দরকার হয়। দল বাঁধতে না জানলে, টীম গড়তে না শিখলে সে জীবন সংগ্রামে হটে যাবে। ইংরেজরা এই জিনিসটার উপরে খুব জোর দেয়। ওরা যে এতকাল রাজত্ব করে গেল এটা অনেকটা ওদের টীম ওয়ার্কের দরুন। জবাহরলাল যে আজ এই ছত্রভঙ্গ দেশের ছত্রপতি হয়েছেন এর বড়ো একটা কারণ তিনি ইংলণ্ডের পাবলিক স্কুলের ছাত্র।

হ্যারো বিদ্যালয়েই তিনি ভারত চালাতে শিখেছিলেন।

এর পরে আমি যা বলতে যাচ্ছি তা আগে কোনো দিন ভাবিনি। স্বাধীনতার পর থেকে ভাবছি। আসলে ইংরেজী শিক্ষা ইংরেজের প্রবর্তন নয়। ওদের উপর ছেড়ে দিলে ওরা দোভাষী দিয়ে কাজ চালাত, বাঙালীকে ইংরেজী শিখিয়ে ওদের বিশেষ কোনো লাভ ছিল না। ইংরেজী শিক্ষা এসেছে বাঙালীর নিজের আগ্রহে, রাজা রামমোহন প্রভৃতি দূরদর্শী পুরুষদের সিদ্ধান্তে। এ শিক্ষা কেবলমাত্র একটা বিদেশী ভাষা শিক্ষা নয়। বিদেশী ভাষার মাধ্যমে সমগ্র আধুনিক যুগটাকে আয়ত্ত করা। আত্মসাৎ করা। এ কি কখনো সংস্কৃত বা ফরাসী বা হিন্দী বা উর্দু মাধ্যমে হতে পারত, না পারে? বাংলা মাধ্যমেও হতে পারত কি? পারে কি? এখনো আমরা এতদূর অগ্রসর হইনি যে সমগ্র আধুনিক যুগটাকে বাংলার লোকের কাছে বিশুদ্ধ বাংলা ভাষায় তর্জমা করে দিতে পারব।

বাংলা তবু অনেকটা এগিয়ে রয়েছে। হিন্দী যেখানে আছে সেখানে তার পক্ষে আধুনিক যুগটাকে ধারণা করাই শক্ত। শব্দের অনুবাদ শব্দ দিয়ে করা যায়। কিন্তু তত্ত্বের অনুবাদ কী দিয়ে করবে? তার জন্যে ওদের প্রস্তুতি কই? সেদিন দিল্লীতে শুনে এলুম "নেক টাই" নাকি "কণ্ঠ ল্যাঙ্গোটি"। যারা ল্যাঙ্গোট পরে তারা গলায় ল্যাঙ্গোট পরার কথা ভাবতে পারে, কিন্তু স্বপ্নেও ভাবতে পারে না যে নেকটাই এসেছে ক্রিশ্চানদের ক্রস থেকে। ক্রস কোথায়, আর কোথায় ল্যাঙ্গোট! এটা একটা সামান্য উদাহরণ। রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সমাজতাত্ত্বিক, বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক শব্দগুলোর পিছনে দীর্ঘ ইতিহাস রয়েছে। মননের ইতিহাস। তুমি একখানা দ্বিভাষিক অভিধান খুলে তর্জমা করতে বসলেই তার হদিস পাবে? অত সহজ? এ কাজ তারাই পারে যারা শুধু ভাষাবিৎ নয়, ইতিহাসবিৎ। এবং ইতিহাস শুধু রাজনৈতিক ইতিহাস নয়, মানসিক পরিবর্তনের ইতিহাস। মধ্যযুগের মানুষ কেমন করে ধীরে ধীরে আধুনিক যুগের মানুষ হয়েছে এ জ্ঞান যার নেই সে যেমন নেকটাইকে ল্যাঙ্গোটের সঙ্গে তুলনা করবে তেমনি পার্লামেন্টকে লোকসভা ও রাজ্যসভার সঙ্গে। গবর্নমেন্ট হাউসকে রাজভবনের সঙ্গে। যদিও এটা রাজতন্ত্র নয়, প্রজাতন্ত্র।

প্রত্যেক বস্তুকে, ভাবকে, আইডিয়াকে তার স্বরূপে জানতে হবে। এই হলো শিক্ষার আসল উদ্দেশ্য। নেকটাইকে যদি কেউ ল্যাঙ্গোট বলে চালায় তা হলে বলতে হবে সে জনগণকে ভুল শেখাচ্ছে। তাদের অজ্ঞ করে রাখছে। রেপাবলিককে যদি কেউ রাজ্য বলে সমঝায় তা হলে সে রেপাবলিকের কবর খুঁড়ছে। তাকে নিরস্ত্র করতে হবে। সে স্বাধীন হয়েছে বলে আত্মঘাতের জন্যে স্বাধীন হয়েছে তা নয়। তার হাত থেকে আত্মহত্যার উপকরণ কেড়ে নিতে হবে।

বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজী তুলে দেবার কথা উঠতেই পারে না। ইংরেজী ভাষা তো শেখাতে হবেই, ইংরেজী মাধ্যমও প্রয়োজনমতো রাখতে হবে। এখন যা দেখছি তা বহু ক্ষেত্রে নিষ্প্রয়োজন। পরীক্ষার্থীরা সকলেই বাঙালী, তবু

প্রশ্নপত্র দেওয়া হচ্ছে ইংরেজীতে। এমন কি বাংলা সাহিত্যের প্রশ্নপত্রও। এটা সত্যি দাস মনোভাব। এ সেই মনোভাব যে চার-পাঁচ বছরের বাচ্চাকে এ বি সি ডি শেখাতে যায়, পাখি পড়ার মতো। এইসব পক্ষীরা যখন পরবর্তী বয়সে পরীক্ষক হন তখন বিদ্যা জাহির করার লোভ সংবরণ করতে পারেন না। দেশটা যে ইতিমধ্যে স্বাধীন হয়েছে এ সংবাদটাও এঁদের অজানা। এঁদের হাত থেকেও অস্ত্র কেড়ে নিতে হবে। এঁরাও ঘাতক।

বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজী মাধ্যম প্রয়োজনমতো রাখতে হবে বলেছি। বিদ্যালয় থেকে বারো বছর বয়সের আগে ইংরেজী অক্ষর পরিচয় উঠিয়ে দিতে হবে, ইঙ্গিত করেছি। বাকি থাকে মাঝখানের কয়েক বছর। যাকে বলা হয় মাধ্যমিক শিক্ষার কাল। আমার মনে হয় না যে ইংরেজী একেবারে বাদ দিলে মধ্যশিক্ষার বিশেষ কোনো ক্ষতি হবে। তবে যারা এর পরে উচ্চ শিক্ষার জন্যে বিশ্ববিদ্যালয়ে যাবে তাদের ইংরেজী ভাষাজ্ঞান এই কয়েক বছরে বেশ কিছুদূর এগিয়ে থাকতে পারে। ইংরেজী কেবল ইংরেজীর জন্যে নয়, ইংরেজী উচ্চ শিক্ষার জন্যে। উপরন্তু ফরাসী জার্মান প্রভৃতি অপর ভাষায় সহজে প্রবেশ করার জন্যেও। স্বাধীন ভারতকে ফরাসী জার্মান প্রভৃতি আরো কয়েকটি ভাষায় ওয়াকিবহাল হতে হবে আন্তর্জাতিক কারণে।

তা হলে দাঁড়ালো এই। বারো বছর বয়স পর্যন্ত ইংরেজী বর্জন। বারো থেকে যোলো বা মতান্তরে আঠারো পর্যন্ত ইংরেজী কেবল তাদের পক্ষে আবশ্যিক যারা উচ্চ শিক্ষার জন্যে প্রস্তুত হতে চায়, অন্যের পক্ষে আবশ্যিক নয়, ইচ্ছাধীন। তার পরের ধাপে—বিশ্ববিদ্যালয়ে—ইংরেজী জ্ঞান একান্ত আবশ্যক, তবে ইংরেজী মাধ্যম সব সময় বা সব ক্ষেত্রে প্রয়োজন নয়। আপাতত পঞ্চাশ বছর এই ভাবে চলুক। ইংরেজ গেছে বলে ইংরেজী শিক্ষা যেতে বাধ্য নয়। কারণ আধুনিক যুগের সঙ্গে ঐ আমাদের সেতুবন্ধ। দেশকে ভালোবাসি বলে যুগকে কম ভালোবাসিনে।

(১৯৫৪)

অনুবাদ প্রসঙ্গ

সম্প্রতি বাংলা সাহিত্যে ইংরেজী ফরাসী রুশ প্রভৃতি সাহিত্যের অসংখ্য বই ভাষান্তরিত হয়েছে। সেরা বই নয় এমন বইয়ের অনুবাদ অগণ্য। অনুবাদ যাঁরা করেছেন তাঁদের অনেকে বিদেশী নামের উচ্চারণ জানেন না, সামাজিক প্রথার মর্ম জানেন না, এমন কি কোন কথার কী অর্থ সেটুকুও ধরতে পারেন না। তা সত্ত্বেও তাঁরা একটা মহৎ কর্ম করছেন। বিদেশী জীবনযাত্রার সঙ্গে আমাদের জীবনযাত্রার তুলনা সম্ভব হচ্ছে। আমাদের আত্মগত জীবনধারা বিচলিত হচ্ছে। আমরা নতুন করে বাঁচতে শিখছি, বল পাচ্ছি। নানা দেশের নানা বিচিত্র চরিত্র আমাদের ঘরের লোকের মতো সুপরিচিত হয়ে যাচ্ছে। মানুষকে

বিভিন্ন পরিবেশে দেখছি ও দেখে চিনছি। মানুষের সঙ্গে এই যে চেনাশোনা এটা নিছক আনন্দের।

কিন্তু, কই, মরাঠী গুজরাতী তামিল উর্দু হিন্দী থেকে অনুবাদ কই? ভারতের কোটি কোটি নরনারীর বিচিত্র জীবনযাত্রা, বিভিন্ন সামাজিক প্রথা, বিশিষ্ট চিন্তাধারা, ঘরোয়া সুখ দুঃখ, অন্তরঙ্গ পরিচয়, এসব কি আমাদের জানতে ইচ্ছা করে না? জানা উচিত নয়? তারা ও আমরা মিলে এক নেশন। এ কি শুধু রাজনীতির বেলাই সত্য? আর কোথাও এর কোনো সমর্থন নেই? মমতা কোথায়, প্রেম কোথায়, ঔৎসুক্য ও চেনাশোনার আনন্দ কোথায়? বিদেশকে যে পরিমাণ ঘরে বসে পাচ্ছি স্বদেশকেও কি সেই পরিমাণে পাচ্ছি আমরা?

ভারতের প্রত্যেক প্রান্তে ও এখন যাকে পাকিস্তান বলা হয় তার প্রত্যেক অঞ্চলে হিন্দু বাঙালী মুসলমান বাঙালী বৌদ্ধ ও খ্রীস্টান বাঙালী ছড়ানো রয়েছেন। তাঁদের মধ্যে এমন লোক বড়ো কম নেই যাঁরা বাংলা লিখতে জানেন ও লিখে থাকেন। কিন্তু অনুবাদের কাজে তাঁদের কারো বিশেষ উৎসাহ আছে বলে মনে হয় না। সকলেই মৌলিক রচনায় সিদ্ধহস্ত হবেন এটা দুরাশা। মানুষকে অনেক সময় অসাধ্যসাধন ছেড়ে দিয়ে সাধ্যের আরাধনা করতে হয়। তাতে লজ্জার কিছু নেই। কাশীরাম কৃত্তিবাসও অনুবাদ করে অমর হয়েছেন। তাঁদের যুগের মৌলিক কবিরা মরে হারিয়ে গেছেন। অনুবাদের কাজ কোনো যুগেই কোনো দেশেই তুচ্ছ নয়। বাংলার বাইরে যাঁদের থাকতে হচ্ছে ও হবে তাঁরা বাংলার জন্যে যদি আর কিছু করতে না পারেন তো এইটুকু করুন। এর ফলে দেশের লোক দেশের লোককে চিনবে, আত্মীয়তাবোধ দৃঢ় হবে। তুলনায় ভালোমন্দ ধরা পড়বে, আত্মসংশোধন আসবে। বাংলা থেকে অনুবাদ ইতিমধ্যে শুরু হয়েছে। সেটাও জোর পাবে। ভবিষ্যতের সাহিত্য হবে বৃহত্তর ভারতীয় সাহিত্য, যদিও বহু ভাষায় রচিত।

সেদিন শান্তিনিকেতনের মহিলা কর্মী, শ্রীমতী মলিনা রায় উত্তর প্রদেশের প্রখ্যাতা লেখিকা শ্রীমতী মহাদেবী বর্মার স্মৃতিকথার অনুবাদ দেখতে দিলেন। দেশকে আর একটু ভালো করে চিনলুম, দেশের মানুষকে আর একটু নিকট করে পেলুম, উত্তর প্রদেশের দেহাতীদের সঙ্গে সম্পর্ক পাতানো হলো, আবিষ্কার করলুম মহাদেবীর মহান হৃদয়। সব দিক থেকেই লাভ। কেন যে হিন্দী থেকে আরো বেশী অনুবাদ হয় না, কেন যে তার উপর আমাদের অভিমান বা অনীহা, এর মর্ম বুঝিনে। বিদেশী বই যেসব অনুবাদ হচ্ছে তার মধ্যে ক'খানা আছে যা মহাদেবীর স্মৃতিকথার চেয়ে মূল্যবান? কিন্তু এ কাজ শান্তি-নিকেতনের কর্মীদের উপর ছেড়ে দিয়ে উত্তরপ্রদেশের বাঙালী লেখক লেখিকারা নিষ্ক্রিয় থাকবেন কোন যুক্তি বলে? বিহারে যাঁরা আছেন তাঁরা কেন নিরুদ্যম?

এটা একটা করবার মতো কাজ। এটা করতে পারেন তাঁরাই তাঁদের অবসর সময়ে। যদি বিশ্বাস করেন যে এটা বাংলা ও হিন্দী উভয়ের পক্ষে ভালো,

ভারতের পক্ষে ভালো। বাংলা মাসিক পত্র খুললে এক রাশ একঘেয়ে গল্প কবিতা প্রবন্ধ চোখে পড়ে। যে কথা সকলে জানে সেই একই কথা সবাই সবাইকে শোনাবে। পশ্চিমবঙ্গ একটা অন্ধকূপ, এখানে যারা কয়েদ হয়েছে তারা কারাকাহিনী শোনাবে পরস্পরকে, এরই নাম সাহিত্যসৃষ্টি! এর থেকে পরিত্রাণের জন্যে প্রাণ চার দিকে রুশ ফরাসী ইংরেজী ইটালিয়ান জানালা খুলে আলো আর হাওয়া খুঁজছে। নইলে অন্ধ হয়ে দম বন্ধ হয়ে মারা যাবে। এবার কয়েকটা স্কাইলাইট খুলে দেওয়া দরকার। হিন্দী উর্দু মরাঠী গুজরাতী তামিল তেলুগু স্কাইলাইট। এসব ভাষা শিখতে হবে, এসব সাহিত্য পড়তে হবে, এসব সাহিত্যের বই অনুবাদ করতে হবে যাঁরা পারেন ও বিশ্বাস করেন তাঁদের অনেককে। এটা একটা করবার মতো কাজ। বাংলাদেশের প্রকাশকেরা আজকাল উদ্যোগী হয়েছেন। ভালো জিনিস বড়ো একটা পড়ে থাকছে না। লোকের হাতে টাকা নেই, তবু বই বিক্রী হচ্ছে কী জানি কোন মন্ত্রবলে! মনে হয় মহাদেবী বর্মার আত্মচরিতের মতো বই ছেপে কারো লোকসান হবে না। অনুবাদকরা ও প্রকাশকরা তৎপর হলে বাঙালী পাঠক পাঠিকা সাড়া দেবেন ঠিকই। বাঙালী বাঁচতে চায়। বাঁচতে হলে যেমন ভাত কাপড় চাই তেমনি আলো হাওয়া চাই। দুই অর্থে লোকে এটা বুঝতে পেরেছে। সুতরাং বিভিন্ন প্রদেশের উৎকৃষ্ট গ্রন্থের অনুবাদ হাতের কাছে পেলে পড়ে দেখতে রাজি হবে নিশ্চয়।

(১৯৫৪)

পূর্বাংলার সাহিত্য ও সংস্কৃতি

পাকিস্তান সৃষ্টির অনেক দিন আগে থেকে কয়েকটি কথা আমার মাথায় ঘুরছে। এতদিন পরে গুছিয়ে বলার সুযোগ পাওয়া গেল।

ইউরোপে যেমন ইংরেজী ফরাসী জার্মান ইটালিয়ান রাশিয়ান এই পাঁচটা অগ্রগণ্য ভাষা ও সাহিত্য আছে, আমাদের দেশের বাইরে তেমনি আরবী ফারসী তুর্কী জাপানী চীনা এই পাঁচটা বহুমান্য ভাষা ও সাহিত্য। এসব ভাষা শিক্ষা করে এসব সাহিত্য অধ্যয়ন করে এদের যা কিছু শ্রেষ্ঠ তা বাংলা হিন্দী উর্দু মরাঠী গুজরাতী তামিল প্রভৃতি ভাষায় তর্জমা করা আমাদের ঠিক সেই রকম কর্তব্য যে রকম কর্তব্য ইংরেজী ফরাসী জার্মান ইটালিয়ান রাশিয়ান থেকে তর্জমা। এইভাবে আমাদের নিজেদের সাহিত্যগুলি সমৃদ্ধ হবে, অপরের সংস্কৃতি সম্বন্ধে আমরা সচেতন হব এবং আমাদের দৃষ্টান্ত যদি তারাও অনুসরণ করে তা হলে আমাদের সঙ্গে তাদের যোগাযোগ উভয় পক্ষকেই ঐশ্বর্যবান করবে। এই মহৎ কর্মে সকলেরই সহযোগিতা চাই। বিশেষ করে চাই মুসলমানের, কারণ আরবী ফারসী ও তুর্কী ভাষা ও সাহিত্য মুসলমানের পক্ষে আয়ত্ত করা তত কঠিন নয় যত কঠিন অন্যান্যদের পক্ষে। তা বলে অন্যান্যরা যে হাত গুটিয়ে বসে থাকবেন তা নয়। মূল আরবী ফারসী তুর্কী না জানলেও

ইংরেজীর মারফৎ আরব পারসা ও তুরস্কের শ্রেষ্ঠ কীর্তির পরিচয় নেওয়া সম্ভব। সেইভাবে অন্যান্যেরা ইতিমধ্যেই কোরান থেকে আরম্ভ করে আরব্য পারস্য তুরস্ক উপন্যাস অনুবাদ করেছেন, ওমর খৈয়াম হাফিজ রুমি প্রভৃতিও সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, কান্তিচন্দ্র ঘোষ ও নরেন্দ্র দেব প্রভৃতির কল্যাণে বাঙালীর ঘরে ঘরে পৌঁছেছেন। মুসলমানকে এ দায়িত্ব আনন্দের সঙ্গে নিতে হবে। এর একটা সুফল হবে এই যে ইসলামী সংস্কৃতি বলতে কী বোঝায় তা আলোর মতো স্পষ্ট হবে।

ইসলামী সংস্কৃতি বলতে সাধারণ লোক বোঝে ধর্মশাস্ত্র, বিধিনিষেধ ও দার্শনিক তত্ত্ব। কিন্তু ইসলাম যেসব দেশের ধর্ম সেসব দেশের ইতিহাস আছে, ভূগোল আছে, রাজনীতি আছে, অর্থনীতি আছে, নাটক আছে, কাব্য আছে, গাথা আছে, চিত্র আছে, নৃত্য আছে, সঙ্গীত আছে। বিংশ শতাব্দীতে তারা দশম শতাব্দীর ধ্যান করছে না। বিংশ শতাব্দীর ইউরোপ-আমেরিকার সঙ্গে পায়ে পা মিলিয়ে চলতে চেষ্টা করছে। সমসাময়িক গল্প উপন্যাস নাটক কবিতাও ইসলামী সংস্কৃতি। তাতে হয়তো ধর্মের নামগন্ধ নেই। আছে হয়তো একটু চোখের জল বা একটু হাসি। তবু সেও ইসলামী সংস্কৃতির পর্যায়ে পড়ে। যদি না পড়ে তা হলেও তা শ্রেষ্ঠ স্থান দাবি করতে পারে। ইসলামী সংস্কৃতি প্রসঙ্গে একথাও মনে রাখতে হবে যে ফিনিসিয়া, সুমেরিয়া, খালদিয়া, মেসোপোটেমিয়া প্রভৃতি অতি প্রাচীন ভূখণ্ডগুলিতে যে আদি মানব সভ্যতা বিবর্তিত হয়েছিল তার উত্তরাধিকারী হচ্ছে ইসলাম। প্রাচীন মিশরের উত্তরাধিকার, প্রাচীন ইরানের উত্তরাধিকার, প্রাচীন ইসরায়েলের উত্তরাধিকার, এমন কি প্রাচীন গ্রীসের উত্তরাধিকারও ইসলামের উপর বর্তেছে। আমরা এ দেশের লোক ঘরে বসে এসব বিস্মৃত সভ্যতার প্রতিধ্বনি শুনেছি ইসলামের দৌলতে। আমাদের সংস্কৃতির মধ্যে সে-সব হারাধ্বনি মিশে গেছে। তার ফলে যে বিমিশ্র সংস্কৃতির উদ্ভব হয়েছে তা প্রাচীন হিন্দু সংস্কৃতির উত্তরাধিকারী হলেও তা ঠিক সেই জিনিসটি নয়। এর বিশিষ্ট উদাহরণ হচ্ছে হিন্দুস্থানী সঙ্গীত। একে হিন্দু সঙ্গীত বলায় প্রমথ চৌধুরী তার প্রতিবাদ করেছিলেন। দ্বাদশ শতাব্দীর মন নিয়ে বিংশ শতাব্দীতে বাস করা যায় না। তখনকার দিনের হিন্দু সংস্কৃতির সঙ্গে ইসলামী সংস্কৃতি ও ইউরোপীয় সংস্কৃতি এমন অচ্ছেদ্য-ভাবে জড়িয়ে গেছে যে দেশ ভাগ করে লোক তাড়িয়ে দিলেও তা ছাড়িয়ে যাবে না। ইংরেজ রাজত্ব নেই, অথচ তাদের ভাষা তাদের সাহিত্য তাদের আইন তাদের শাসনতন্ত্র আমাদের মন জুড়ে রয়েছে। তেমনি ইসলামের সঙ্গে হিন্দু সংস্কৃতির সাত শত বর্ষব্যাপী যোগাযোগের ফলে যে বিমিশ্র সংস্কৃতির উৎপত্তি হয়েছে তাকে আবার অমিশ্র করা কারো সাধ্য নয়। আমার তো ভাবতে ভালো লাগে যে, আমরা ফিনিসিয়া, সুমেরিয়া, খালদিয়া, মিশর প্রভৃতি বহু প্রাচীন সভ্যতার আংশিক উত্তরাধিকারী। আমার মুসলমান বন্ধুদের পক্ষেও ভাবা সহজ হোক যে তাঁরাও আর্য দ্রাবিড় গান্ধার কুশান তিব্বত চীন সংস্কৃতির আংশিক উত্তরাধিকারী।

এর পর নতুন কিছু সৃষ্টি করার প্রশ্ন। আমরা কেবল উত্তরাধিকারী নই, আমরা জনক, আমরা পূর্বপুরুষ। কিন্তু কিসের জনয়িতা? কিসের প্রবর্তক? এমন কী আমরা দিয়ে যাচ্ছি যাতে সত্যিকারের নূতনত্ব আছে? যা অতীতের রোমন্থন নয়? যতই একথা চিন্তা করি ততই উপলব্ধি করি যে বিরাট জনসমুদ্রে ঝাঁপ দিয়ে পড়তে হবে, সব মানুষের সব সুখদুঃখের ঢেউ খেতে হবে, সকলের জীবনের অংশ নিতে হবে, কে হিন্দু কে মুসলমান কে ধনিক কে শ্রমিক এসব গণনার ঊর্ধ্বে উঠতে হবে, সাময়িকের মধ্যে ডুবে থেকেও চিরন্তনের উপর মুঠি শক্ত রাখতে হবে। আর সবাই যখন ঘুমিয়ে আমরা তখন জেগে। আর সবাই যখন নিশ্চেষ্ট আমরা তখন সৃষ্টিতৎপর। আমরা ধ্যানস্থ। নিরানন্দের মধ্যেও আনন্দ সঞ্চার করি আমরা, নইলে লোকে সইতে পারে না দুঃখদারিদ্র্য সংঘাত ও ধ্বংস। আমরা ঠিক থাকলে দুনিয়া ঠিক হয়ে যাবে।

২

পূর্ব পাকিস্তান থেকে আমার কাছে বইপত্র বড়ো কম আসে না। সে-সব পড়ে আমি কয়েকটি বিষয় লক্ষ করছি। প্রথমত দক্ষিণ বঙ্গের চলতি ভাষাই লেখকদের প্রিয় ভাষা। আমি স্বয়ং এ ভাষার পক্ষপাতী। সুতরাং আমার আনন্দের কারণ আছে। তা সত্ত্বেও আমি পরামর্শ দেব এ ভাষার মধ্যে পূর্ব-বঙ্গের বৈশিষ্ট্য সঞ্চার করতে। 'যাওয়া' না লিখে 'যাওন', 'থাকা' না লিখে 'থাকন' ব্যবহার করা যায় কি না পরখ করে দেখতে হবে।

দ্বিতীয়ত, আরবী ফারসীর ভাগ আগে যতটা ছিল এখন ততটা নয়। এটা বিস্ময়কর। যাঁরা ইসলামী রেনেসাঁস চান, তাঁরাও আরবী ফারসীর চেয়ে সংস্কৃত শব্দ পছন্দ করেন বেশী। এখানে বলে রাখতে চাই রেনেসাঁস কথাটি কেউ কোনো দিন ধর্মের বেলায় প্রয়োগ করেননি। ধর্মের রেনেসাঁস হয় না। রেনেসাঁস হয় দেশের বা জাতির। ধর্মের হয় রিভাইভাল। যা হোক আরবী ফারসীর ভাগ কমিয়ে দিলেও সংস্কৃতের পরিমাণ বাড়িয়ে দেওয়া ঠিক নয়। সাহিত্য যাদের জন্যে লেখা হচ্ছে তারা দেশের মাটি জল হাওয়ায় মানুষ। তাদের মুখে যদি পোলাও কোর্মা কাবাব তুলে দেন তা হলে তারা বছরে দুচার বার ভোজ খাওয়ার সুখ পাবে, কিন্তু দিনে দুবেলা ও জিনিস খেতে দিলে লুকিয়ে লুকিয়ে পান্তা ভাত ও শুঁটকি মাছ খাবে। পোলাও কোর্মার বদলে হবিষ্যান্ন দিলেও তাদের রসনার তৃপ্তি হবে না। লেখকদের কাজ পাঠকদের নিয়ে। পাঠকদের প্রতিদিনের খোরাক নিয়ে। শিশু যদি মাতৃস্তন্য চায়, তবে জননী তাকে ফীডিং বটল দিয়ে মুক্ত হতে পারেন না। ভাষাও একপ্রকার মাতৃস্তন্য।

তৃতীয়ত, লেখকদের নিজেদের মধ্যে মতভেদ দেখা দিয়েছে, মতভেদ থেকে দলাদলি। এটা জীবনের লক্ষণ। এ নিয়ে খুব বেশী মাথা ঘামানো উচিত নয়। কেউ যদি মনে করে থাকেন যে, ঐক্যের নামে সবাইকে একত্র করলে তার পরের দিন সব মতভেদ হাওয়া হয়ে যাবে তবে সেটা দুরাশা। ফ্রান্সের লেখকদের দলাদলির তুলনায় পূর্ব বাংলার বা পশ্চিম বাংলার লেখকদের দলাদলি কিছু

নয়। কতক লেখক যে ইসলাম থেকে প্রেরণা পাবেন এটা স্বাভাবিক। এই অনিশ্চয়তার যুগে ধর্ম যতখানি নিশ্চিতি জোগায় আর কোন জিনিস ততখানি নিশ্চিতি জোগাতে পারে। তেমনি কতক লেখক যে জীবন থেকে প্রেরণা পাবেন এটাও তেমনি স্বাভাবিক। জীবন প্রতিদিনই নতুন। ধর্ম তা নয়। জীবনের আকর্ষণ যদি এক হাত ধরে টানে, আর ধর্ম টানে আর-এক হাত ধরে, তা হলে বেশীর ভাগ শিল্পীই জীবনের সঙ্গে অভিসারে বেরোবে। তা না হলে তারা শিল্পীই নয়। সাম্যবাদ বলে একালে যে এক নতুন ধর্মের আবির্ভাব হয়েছে সেও পারবে না শিল্পীপ্রকৃতির মানুষকে ঘরে ধরে রাখতে। বাঁশির ডাক শুনে বেরিয়ে পড়াই যাদের স্বভাব তারা মোল্লা পুরোহিত বা কমিশার কারও তত্ত্বকথা শুনবে না, তত্ত্বপ্রচার করবে না। বৃথা চেষ্টা।

(১৯৫৪)

বাংলা সাহিত্যের নতুন ধারা

লোকে আশা করেছিল দেশ স্বাধীন হলে নতুন যুগ আসবে জীবনের সব ক'টা বিভাগে। অতএব সাহিত্যেও। সাত বছর পরে দেখছে সে আশা পূর্ণ হয়নি। নতুন যুগ আসেনি জীবনের কোনো বিভাগেই। সাহিত্যেও না। ভাবছে কারণটা কী? দোষ দিচ্ছে একে তাকে ওকে। স্বাধীনতাকেও সন্দেহ করছে।

এখন ব্যাপারটা হলো এই। মোগল আমল যখন শেষ হয়ে যায় তখন সেই সঙ্গে মধ্য যুগও শেষ হয়ে যায়। ইংরেজ আমল যখন শেষ হয় তখন আধুনিক যুগ কিন্তু শেষ হয় না। আধুনিক যুগ চলতে থাকে। এই চলতে থাকা শোভাযাত্রার থেকে ইংরেজ কখন এক সময় সরে পড়েছে, কিন্তু আর সবাই এগিয়ে চলেছে। কন্‌টিনিউইটির তুলনায় ডিস্‌কন্‌টিনিউইটি সামান্য।

পলাশীর পর কিন্তু কন্‌টিনিউইটির তুলনায় ডিস্‌কন্‌টিনিউইটি ছিল অসামান্য। গোটা মধ্য যুগটাই শোভাযাত্রা থেকে সরে গেল, শুধু নবাব সরকার নয়। এল আধুনিক যুগ। প্রথমে শাসন-ব্যবস্থায়, তার পরে বিচার-ব্যবস্থায়, তার পরে শিক্ষা-ব্যবস্থায়, তার পরে শিল্প-ব্যবস্থায়। ইউরোপে আধুনিক যুগ হচ্ছে তিনটি কি চারটি বড়ো বড়ো মুভমেন্টের যোগফল। একটির নাম রেনেসাঁস। একটির নাম রেফর্মেশন। একটির নাম ফরাসী বিপ্লব। আর একটির নাম শিল্পবিপ্লব। এক এক করে এগুলির প্রতিধ্বনি ভারতে পৌঁছল। এর যোগফল ভারতের জীবনের সর্বস্তরে আধুনিকতা সঞ্চার করল। সাহিত্যেও।

মধ্য যুগের বাংলা সাহিত্যের সঙ্গে আধুনিক যুগের বাংলা সাহিত্যের নামমাত্র পারম্পর্য আছে। প্রথম প্রথম দেখা গেল খোলটা পুরনো, কিন্তু নলচেটা নতুন। তারপর দেখি নলচেটাও বদলে গেছে, এখন খোল আর নলচে দু-ই নতুন। ছাপাখানা ছিল না, ছাপাখানা হলো। গদ্য ছিল না, গদ্য হলো।

প্রবন্ধ ছিল না, প্রবন্ধ হলো। উপন্যাস ছিল না, উপন্যাস হলো। ছোট গল্প ছিল না, ছোট গল্প হলো। নাটক ছিল না, নাটক হলো। অমিত্রাক্ষর ছিল না, অমিত্রাক্ষর হলো। সনেট ছিল না, সনেট হলো। এমনি কত কী ছিল না, কত কী হলো। আবার তার প্রত্যেকটির কত রকম বিবর্তন হলো। কেবল রূপ বা গড়ন নয়, ভাব অন্য প্রকার হলো, মূল্য অন্য প্রকার হলো। আধুনিক বাঙালীর চিন্তাপ্রণালী ও মূল্যবোধ পরিবর্তিত হতে হতে যেখানে এসে ঠেকেছে সেখানে আধুনিক ইংরেজের সঙ্গে তার খুব বেশী প্রভেদ নেই। তার চেয়ে বেশী প্রভেদ তার নিজের পূর্বপুরুষের সঙ্গে।

ইংরেজের সঙ্গে ঝগড়াও চলছিল, তলে তলে ফয়সালাও চলছিল। আসলে ওটা আধুনিক যুগের সঙ্গে। আমি চারটি মুভমেন্টের উল্লেখ করেছি। আরো কয়েকটির নাম ন্যাশনালিজম্, লিবারলিজম্, ডেমক্রেসী, সোশ্যালিজম। ইংরেজ চলে গেছে বলে এগুলি চলে যায়নি। এসব ভাবধারা আমরা এমন বেমালুম আত্মসাৎ করেছি যে যারা জানে না তারা বুঝতে পারে না কোন কোন উৎস থেকে আমরা প্রেরণা পাচ্ছি। এর প্রত্যেকটির ইতিহাস দীর্ঘ ও বিচিত্র। এ ইতিহাস বিশ্বমানবেরই ইতিহাস, কোন দেশে ঘটেছে সেটা এমন কিছু ধর্তব্য নয়। এর সঙ্গে কয়েকটি দেশীয় ভাবধারাও যুক্ত হয়েছে। কিন্তু তার দ্বারা আধুনিকতা মধ্যযুগীয়তায় পরিণত হয়নি।

এখন এই যে কন্‌টিনিউইটি এটা এত বেশী জায়গা জুড়েছে যে ইংরেজ সরকারের তিরোধান বিশেষ কোনো ডিস্‌কন্‌টিনিউইটির অনুভূতি জাগায়নি। ডিস্‌কন্‌টিনিউইটি যেটুকু দেখছি সেটুকু দেশ বিভাগেরই ফলে। এটা একটা ঘটনা মাত্র। একটা ভাবধারা বা মুভমেন্ট নয়। এ রকম ঝড়ঝাপটায় সাহিত্যের ওলটপালট হয় না। সমাজেরও না। একে বাদ দিলে গত সাত বছরে আর কী ঘটেছে যার ফলে সাহিত্যে যুগ পরিবর্তন দেখা দেবে? মানুষের মন বদলে দেবার মতো ব্যাপার এ নয়। তবে হাঁ, কিছু দিনের জন্যে পাগল করে দেবার মতো বটে। মন বদলে যেত যদি অহিংসার জয় হতো। সাহিত্যেও তার রং ধরত।

এই পর্যন্ত বলার পর বাকি যা বলবার থাকে তা এই যে সাত বছরে অনেক নতুন বই বেরিয়েছে, নতুন স্বাক্ষর চোখে পড়েছে। বিদেশী বই রাশি রাশি তর্জমা হচ্ছে। যেসব বিষয় সাহিত্যে অপাংক্তেয় ছিল সেসব বিষয় পংক্তিভোজনে বসে গেছে। নিষিদ্ধ বিষয় লেখা আগেকার মতো ধিক্কার জাগায় না। সাজাও নেই। তবে একটা সহজাত দায়িত্ববোধ লক্ষ করা যায় এটা স্বাধীনতার সুফল।

গদ্য রচনায় বাঁধুনি আসছে। আবোল-তাবোল কমে আসছে। ফেনিলতা, উচ্ছ্বাস, গালিগালাজ কম্‌তির মুখে। বাংলা গদ্য আগের চেয়ে আঁটসাঁট, বিস্তর লেখক আজকাল ভালো গদ্য লিখছেন। পদ্য রচনাতেও যত্নের পরিচয় পাচ্ছি। তবে বাচালতার অবসান দেখছিনে। বাংলার কবিরা যেদিন বাক্‌-সংক্ষেপে অভ্যস্ত হবেন সেদিন মনে হচ্ছে এখনো সুদূর। কবিতায় ছন্দের কাজ

প্রচুর হয়েছে। এখন যদি একটু সুর লাগে তো আনন্দের কারণ হয়। সুর বলতে আমি গানের সুর বলছিনে। কবিতার নিজের সুর।

কাজ সব চেয়ে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে রম্য রচনায়। সাহিত্যের এই বিভাগটি অপেক্ষাকৃত নতুন। যে মেজাজ থাকলে রম্য রচনা ওতরায় সে মেজাজ বহু লেখকের মধ্যে লক্ষ করছি। একসঙ্গে এতগুলি খোশ মেজাজের বুলবুলি গলা ছেড়ে রম্য রচনা ধরেছেন, এতে আমিও খুশি। আশা করি গল্প উপন্যাসের ভিড় একটু কমবে। শুনতে পাই বিক্রী সব চেয়ে বেশী রম্য রচনার।

ছোট গল্প ও উপন্যাসে বিষয়বৈচিত্র্য লক্ষ করবার মতো। জীবনের নানা অভিজ্ঞতার দিকে বাঙালীর দৃষ্টি পড়েছে। তা হলে নাটক কেন হয় না? কেন হয় না জীবনী? বানানো জীবনী নয়, তথ্যনিষ্ঠ জীবনী। বিচারকের মেজাজ দিয়ে লেখা। ভক্তের মেজাজ দিয়ে নয়। রম্য রচয়িতার মেজাজ দিয়ে নয়। আমার আশঙ্কা হয় রম্য রচনাই সাহিত্যের অন্যান্য বিভাগে আসন পেতে বসেছে। এমন কি উপন্যাসেও। রম্য রচনা হচ্ছে এক জাতের কক্‌টেল। আর কক্‌টেল পার্টি হচ্ছে একালের বৈশিষ্ট্য।

তবে সীরিয়াস সমালোচনাও কিছু কিছু চোখে পড়ছে। প্রধানত বামপন্থীদের কাজ। অনেক সময় মত মেলে না, তবু পড়তে ভালো লাগে। এঁরা পড়াশুনা করেন, তথ্যের উপরেই এঁদের ঝোঁক। তবে এঁদের কতকগুলি শাস্ত্রআছে যার অভ্রান্ততায় এঁরা নিঃসন্দেহ অথচ আমরা সন্দিহান। আর এই শাস্ত্রগুলি সাহিত্যশাস্ত্র নয়।

মনে হয় সাধারণ পাঠক এখনো মিষ্টি কথার কাঙাল। কথার পর কথা সাজিয়ে গেলেই তার মন পাওয়া যায়। কিন্তু কতক পাঠক তৈরি হয়েছে যারা ভাবতে রাজি। এরা খাঁটি প্রবন্ধ চায়। কিন্তু চাহিদা অনুসারে জোগান নেই। ঐ প্রাচ্য দর্শন উপনিষৎ ইত্যাদির পঞ্চামৃত—সেও এক রকম কক্‌টেল—প্রায় অপাঠ্য হয়ে এসেছে। সত্যিকারের ভালো প্রবন্ধ বিরল।

সব দিক বিবেচনা করলে ছোট গল্পকেই শিরোপা দিতে হয়। তার পরে কবিতাকে। দশ বিশ বছর পরে যদি কিছু স্থায়ী হয় একালের তবে তার একটা বড়ো অংশ কবিতা। এর সঙ্গে যদি কিছু গল্প উপন্যাসও থাকে তবে প্রায় সব কথাই বলা হয়ে গেল।

না, আরো একটু বাকি। নতুন ধারার ইঙ্গিত দিতে চাই। আধুনিকতার থেকে বিযুক্ত হয়ে নয়, লোকসংস্কৃতির সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে সাহিত্যে নবযুগ আসবে। যুগটাই ধীরে ধীরে বা দ্রুতবেগে জনগণের অভিমুখে চলেছে, কিংবা বলতে পারো, জনগণকে নিজের অভিমুখে টেনে আনছে। এই যে জনসংযোগ এটা রাজনীতিক্ষেত্রে যেমন রূপই নিক না কেন, সাহিত্যে এর রূপ হবে আধুনিক সংস্কৃতির সঙ্গে লোক সংস্কৃতির সংগম। কেমন করে এটা সম্ভব হবে জানিনে, কিন্তু এই একমাত্র পথ। এ পথে যারা চলবে তারা আপাতত একলা চলবে। যদিও এর মধ্যে জনগণের কথা আছে তবু এ পথ জনপ্রিয়তার পথ নয়।

কারণ এর মধ্যে যুক্তি তর্ক বিচার বিবেক তথ্যনিষ্ঠতা আয়াস অনুশীলন ডিসিপ্লিন উচ্চতর মূল্যবোধ রসজ্ঞান ও চিরন্তন সত্যের স্বীকৃতি রয়েছে। এসব বিষয়ে লক্ষ্য স্থির রাখলে জনপ্রিয় হওয়া দুষ্কর। তা বলে জনগণের উপরে অভিমান করে শব্দকল্পদ্রুম খুলে দুর্বোধ্য ভাষায় প্রতীক রচনা করাও ঠিক নয়।

(১৯৫৪)

১৭ই এপ্রিল ১৯৫৪ রবিবার ন্যাশনাল হাইস্কুল ভবনে অনুষ্ঠিত সাহিত্য বাসরে প্রদত্ত ভাষণ। সভাপতি শ্রীযদুনাথ সরকার।

ভারতীয় সংস্কৃতির স্বরূপ

চল্লিশ-পঞ্চাশ বছর আগে আমাদের বাল্যকালে রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ মনীষীর কাছে আমরা এই শিক্ষাই লাভ করেছিলুম যে ভারতের সংস্কৃতি হচ্ছে গঙ্গা-যমুনা-সরস্বতীর মতো তিনটি স্রোতের ত্রিবেণীসংগম। প্রাচীন আর্য বা হিন্দু। মধ্যযুগীয় মুসলিম বা সারাসেন। আধুনিক ব্রিটিশ বা ইউরোপীয়।

গান্ধীজীর অসহযোগ আন্দোলনের সময় একটি বেণী ছাঁটা হলো। ইংরেজের সঙ্গে তখন আমাদের শত্রুতা চলছে। সুতরাং আমাদের সংস্কৃতি যে তাদের সংস্কৃতির কাছে ঋণী, এ চিন্তা আমাদের অসহ্য লাগত। ভারতীয় সংস্কৃতি থেকে ইউরোপের দান বাদ দিলে যা থাকে তা হিন্দু-মুসলমানের যৌথ সম্পদ। গঙ্গা-যমুনার যুক্ত বেণী। সরস্বতী একদম লুপ্ত। রবীন্দ্রনাথের এটা ভালো মনে হয়নি। কিন্তু কে শোনে তাঁর প্রতিবাদ! আমরা তখন নিশ্চিত জেনেছি যে গোটা ইংরেজী আমলটাই আমাদের ইতিহাসে প্রক্ষিপ্ত। ওটা আমাদের উপর গায়ের জোরে চাপানো হয়েছে। আমরা যদি ওর দ্বারা সম্মোহিত হই, তবে আমাদের সেটা দাস মানসিকতা। রামমোহন থেকে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত সবাইকে আমরা দাস মানসিকতায় দাগী করে আত্মপ্রসাদ বোধ করলুম। কেবল ছাড় দিলুম সিপাহী বিদ্রোহের নায়কদের এবং তাঁদের মানসিকতায় দীক্ষিত হিন্দু-মুসলমানদের। খেয়াল ছিল না যে, ইংরেজের উপর রাগ করে আস্ত আধুনিক যুগটাকেই বর্জন করছি।

তার পর বেধে গেল হিন্দু মুসলমানে দাঙ্গা। প্রথম প্রথম তার পিছনে আমরা একমাত্র ইরেজের হাত দেখতে পেলুম। কিন্তু সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদের পর আমাদের চোখ থেকে পর্দা সরে গেল। মুসলমানের উপর রাগ যতই বাড়তে থাকল, ততই আসতে লাগল মুসলিম ধারা সম্বন্ধে বিতৃষ্ণা। একটু একটু করে আর একটি বেণী ছাঁটা গেল। সেটা মুসলমানেরও ইচ্ছায়। সংস্কৃতি বলতে আমরা বুঝলুম মুসলিমবর্জিত। তার মানে একাদশ শতাব্দীর পূর্বের। যখন সোমনাথের মন্দির কলুষিত হয়নি। আর ওঁরা বুঝলেন হিন্দুবর্জিত। তার

মানে আরব-ইরান প্রভৃতি মুসলমান অধ্যুষিত দেশের। যেখানকার রাষ্ট্র নাকি ইসলামী রাষ্ট্র।

পাকিস্তান হাসিল হবার পর অনেকে আশা করেছিলেন যে, হিন্দুস্থান প্রতিষ্ঠা হবে। সেখানকার সংস্কৃতিতে কেবলমাত্র গঙ্গাই থাকবে গঙ্গাজলের শুদ্ধতা নিয়ে। যমুনা থাকবে না। সরস্বতী থাকবে না। ইতিহাস থেকে প্রায় হাজার বছর কাটা পড়বে। কিন্তু ইংরেজীর বদলে হিন্দী শিখতে হবে শুনে টনক নড়ল। তখন ইংরেজীর খাতিরে ইংরেজ আমলটাকে কোনো রকমে হজম করা গেল। অন্তত ইংরেজী শিক্ষাটাকে। ইংরেজ আমলটা যত খারাপ হোক না কেন, ইংরেজী শিক্ষার প্রবর্তনটা বেশ ভালো কাজ হয়েছিল। তবে তাতে রামমোহনের বাহাদুরি নেই। তিনি যে মুসলমানদের দ্বারা পরিবৃত থাকতেন। সেটা নিষ্ঠাবান হিন্দুদেরই সুকৃতি। রামমোহন গেলে রবীন্দ্রনাথও যান। ব্রাহ্ম-সমাজ যায়। থাকেন তা হলে "শশধর, হাকস্‌লী ও গুজ্‌"। ইংরেজ আমলে ঐটুকুই আমাদের লাভ। আর সব লোকসান।

এই কয় বছরে মাথা অনেকটা সাফ হয়েছে। তবে যবনবিদ্বেষ এখনো বিদ্যমান। সরস্বতীকে স্বীকার করে নেওয়া হচ্ছে, কিন্তু যমুনাকে না। উত্তর প্রদেশ—যেখানে গঙ্গা-যমুনার সংগম—সেখান থেকে যমুনাকে সর্বতোভাবে সরাতে হবে। শাসনতন্ত্রে উর্দু পড়ানোর বিধান আছে, তবু উর্দু পড়ানো চলবে না। মুসলমান যদি থাকে তো হিন্দী পড়তে বাধ্য। তাও যদি সে পড়ল, তবে তার গোরু খাওয়া বন্ধ করতে হবে। এবার দেখা যাবে কেমন করে সে থাকে! তা সত্ত্বেও যদি থেকে যায়, তবে অন্য কোনো উপায় খুঁজতে হবে। নইলে শুদ্ধি কেমন করে সম্ভব হবে?

সংস্কৃতিকে শুদ্ধ করতে হবে: এ ভূত নামতে চায় না। যা হাজার বছর হলো মিশ্র, আজ তাকে অমিশ্র করার স্বপ্ন দেখা হচ্ছে। হাজার বছর? তার আগেও কি সে মিশ্র ছিল না? শক হূন কুশান ইত্যাদি কি বাইরে থেকে এসে গঙ্গাপ্রবাহে মধ্য এশিয়ার বারিধারা মেশায়নি? আরো আগে আর্য দ্রাবিড় মঙ্গোল কোল ইত্যাদি? বৈদিকের সঙ্গে বৌদ্ধ, ষড়্‌দর্শনের সঙ্গে আরো ছয়টি দর্শন, আস্তিক্যের সঙ্গে নাস্তিক্য? সংস্কৃতির স্বভাবই এই যে, তার মধ্যে বহু স্বতো-বিরোধ থাকে। যে সংস্কৃতি নানা বিবাদী সুরকে সংগতি দিতে জানে না সে তার শুদ্ধতা নিয়ে কালগর্ভে বিলীন হয়। আমাদের সংস্কৃতি যে এখনো বিলীন হয়নি তার কারণ বৈচিত্র্যকে অশুদ্ধ বলে বর্জন করা যৌবনকালে তার স্বভাব ছিল না। এ ভাব এসেছে বৃদ্ধবয়সে। জরাকে যৌবনে পরিণত না করলে সে আমাদের নবলব্ধ স্বাধীনতাকেও জরাগ্রস্ত করবে।

সংস্কৃতির মধ্যে কেবল একটি নয়, একাধিক ধারার স্বর-সংগতি রয়েছে। কী ভাষা, কী সাহিত্য কী সঙ্গীত, কী চিত্রকলা, কী ভাস্কর্য, কী স্থাপত্য, কী বেশভূষা, কী রন্ধনকলা, কী দর্শন, কী বিজ্ঞান, কী সমাজতত্ত্ব—যেদিক থেকেই বিবেচনা করা হোক না কেন, ভারতীয় সংস্কৃতি ত্রিবেণীর জল। শুদ্ধ গঙ্গাজল নয়। এমন কি, ধর্মেও সমন্বয়ের চেষ্টা হয়েছে। ইদানীং অবশ্য আর

শোনা যায় না যে, রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের বৈশিষ্ট্য ছিল তাঁর খ্রীস্টীয় ও মুসলমান মতের সাধনা। অবিকল রামমোহন যা চেয়েছিলেন। গান্ধী যা চেয়েছেন। খ্রীস্টধর্ম প্রায় উনিশ শতাব্দী ধরে ভারতের মাটিতে দৃঢ়মূল হয়েছে। ইসলাম প্রায় হাজার বছর ধরে। ভারতের মাটির গুণে তাদেরও পরিবর্তন ঘটেছে, তারাও পরিবর্তন ঘটিয়েছে। তার ফলে বিশুদ্ধ হিন্দু বা বিশুদ্ধ মুসলমান বলে কেউ নেই। বিশ্বাসের দিক দিয়ে সকলেই অল্পবিস্তর মিশ্র।

তিনটি বেণীর মধ্যে গঙ্গা চিরদিনই বড়ো ছিল, চিরদিনই বড়ো থাকবে। তা বলে যমুনা ও সরস্বতী উড়ে যাবে না। রাজনৈতিক মনোমালিন্য থেকে যে বর্জনশীল মনোভাব আসে, তা শেষ পর্যন্ত আপনাকেই বিড়ম্বিত ও বঞ্চিত করে। ইংরেজী পড়ব না, উর্দু শিখব না, দেড়শ বছরকে অবহেলা করব, হাজার বছরকে অবজ্ঞা করব, এতে আমাদেরই ক্ষতি। প্রকৃতিস্থ অবস্থায় মানুষ আত্মখণ্ডন করে না। ফিরিয়ে আনতে হবে সেই প্রকৃতিস্থ অবস্থা, যা চল্লিশ-পঞ্চাশ বছর পূর্বেও ছিল। এর জন্যে ইংরেজের বা পাকিস্তানী কর্তাদের শুভবুদ্ধির অপেক্ষায় বসে থাকা যায় না। যা সত্য তা স্বয়ংক্রিয়। তা অন্যের মুখ চেয়ে নিষ্ক্রিয় নয়। ভারতের সংস্কৃতি যদি ত্রিবেণীসংগম হয়ে থাকে, তবে তা এই কয়েক বছরের দুর্ঘটনার ফলে ত্রিধা বিভক্ত হতে পারে না। আমরা যা হয়েছি তা বহু সহস্র বৎসরের বিবর্তনে হয়েছি। তার মধ্যে গত হাজার বছরও পড়ে। গত দেড়শ বছরও পড়ে। মুসলমান আমল ও ইংরেজ আমল অকারণে হয়নি, অকারণও হয়নি। শান্ত ভাবে চিন্তা করলে বোঝা যায়, এসব অবশ্যম্ভাবী প্লাবন আমাদের জাতীয় জীবনের ঊষরতম মুহূর্তে ঘটেছে ও উর্বরতা বিধান করেছে। ভাঙন অপ্রীতিকর, পলিমাটি প্রীতিকর। ভাঙনের কথা মনে পুষে রাখব না, পলিমাটির উপর নতুন ফসল ফলাব।

ত্রিবেণীর সঙ্গে আমি আর একটি বেণী যোগ করতে চাই। সেটি ভারতেরই চিরউপেক্ষিতঃ লোকসংস্কৃতি। গঙ্গা যমুনা সরস্বতী আমাদের সকলের দৃষ্টি জুড়েছে, দৃষ্টির অন্তরালে রয়েছে ফল্গু। লোকসংস্কৃতির চর্চার জন্যে কোথও কোনো ব্যবস্থা নেই, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা তার ধার ধারে না। মাঝে মাঝে গ্রামের গায়কদের শহরে এনে গান করানো হয়, সেটা তাঁদের স্বস্থান নয়, সেখানে তাঁদের উপযুক্ত আবহাওয়া নেই। মাঠের রাখালকে এনে মঞ্চে দাঁড় করালে সে মাঠের অভাবে মিঠে বাঁশি বাজাতে পারবে না। সাঁওতাল সঙ সাজবে। বাউল বেল্লিক হবে। এদের চরিত্রভ্রষ্ট করে কার কী লাভ! লোকসংস্কৃতির দিকে মন যাচ্ছে, এই যা সুফল। কিন্তু এতে বিশ্বাস রাখতে হবে। এটা চতুর্থ একটা ধারা। অথর্ব বেদের মতো সবচেয়ে পুরাতন অথচ সবচেয়ে নতুন। এর ইতিহাস কেউ জানে না, অথচ সকলের ইতিহাস এর মধ্যে সংরক্ষিত হয়েছে। এক একটি রূপকথা প্রায় প্রাগ্ঐতিহাসিক। এক একটি ছড়ার বয়সের গাছপাথর নেই। অথচ মুখে মুখে ঘুরতে ঘুরতে তা নিত্য নবীন।

ভবিষ্যতে যারা সংস্কৃতির গর্ব করবে তাদের এই চারটি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে। বৈদিক বৌদ্ধ সংস্কৃতির ম্যাট্রিকুলেশন, মুসলিম সংস্কৃতির ইন্টার-মিডিয়েট, পাশ্চাত্ত্য সংস্কৃতির বি-এ আর লোকসংস্কৃতির এম-এ। ইচ্ছা করলে উল্টো দিক থেকেও পাশ করা যায়। কিন্তু শিক্ষা অসমাপ্ত রয়ে যাবে, যদি এর কোনো একটি অঙ্গ বাদ পড়ে। চারটি অঙ্গ মিলেই আমাদের সংস্কৃতি চতুরঙ্গ।

(১৯৫৫)

দোটানা

আমি যেসব সামাজিক পরিবর্তন চাই সেসব গ্রামপ্রধান দেশে হবার নয়, হলে শহরপ্রধান দেশে হবে।

অথচ আমি যেসব সাহিত্যিক পরিবর্তন চাই সেসব শহরপ্রধান দেশে হবার নয়, হলে হবে গ্রামপ্রধান বা অরণ্যপ্রধান দেশে।

সামাজিক-আমি'র সঙ্গে সাহিত্যিক-আমি'র এই যে গৃহবিবাদ এটা দীর্ঘকাল ধরে চলেছে। এ বিবাদ থামাবাব একটিমাত্র উপায় আছে। সেটি হচ্ছে সামাজিক-আমি বা সাহিত্যিক-আমি এর কোনো একটির আত্মবিসর্জন।

আমার সাহিত্যিক-আমি কিন্তু নাছোড়বান্দা। তাকে দমন করার চেষ্টা অনেক বার হয়েছে। কতবার আমি লেখা ছেড়ে দিয়েছি। নামমাত্র লিখেছি। কিন্তু কোনো মতেই তার হাত এড়াতে পারিনি। তার কিছু বলবার আছে, না বলে সে ছাড়বে না। দেশের লোক শুনতে চাইলেও সে বলবে। না চাইলেও সে বলবে। এমন লেখা আমার কল্পনায় আছে যা আমি লিখে রেখে যাব, ছাপতে দেব না, ছাপা হবে অনেক বছর পরে। আমি বেঁচে থাকতে নয় বোধ হয়। সাহিত্যিক-আমি বড়ো কঠিন লোক।

আর সামাজিক-আমি? সেটিও কম নাছোড়বান্দা নয়। ত্রিশ বছর ধরে আমি বার বার বলে আসছি, আর না। আমাকে দিয়ে সামাজিক বিষয়ে লেখা আর হবে না। আমি থাকব তার ঊর্ধ্বে। সৌন্দর্যলোকে। আমার বিহার চিরন্তনের তীরে! কিন্তু এমনি আমার কপাল, যেখানে যা কিছু ঘটবে তা আমার নজরে পড়বে। না পড়লে বন্ধুরা বাড়ি বয়ে এসে নজরে পড়াবে। বা চিঠি লিখে নজর টানবে। তারপর চালাও কলম। সামাজিক-আমিও বড়ো কঠিন। ছাপা হোক না হোক সেও লিখবেই। অন্তত বলবেই।

এই দুই আমি'র একটাকে বাদ দিয়ে আরেকটাকে বেছে নিতে বললে আমি অবশ্য সাহিত্যিক-আমিকেই বেছে নেব। কিন্তু আমি কমলীকে ছাড়লেও কমলী আমাকে ছাড়বে না। সে-ই আমাকে বেছে নেবে। এর কোনো প্রতিকার নেই। আমি দেখছি আমাকে আমার এই গৃহবিবাদ চালিয়ে যেতে হবেই। যত দিন বাঁচি।

কিন্তু আমার রুচিটা সাহিত্যের দিকেই বেশী। সুতরাং গ্রামের দিকে, পাহাড়ের দিকে, সমুদ্রের দিকেই। সৃষ্টিপ্রেরণার পক্ষে শহর ভালো নয়, গ্রাম ভালো, সমুদ্র ভালো। প্রকৃতির সঙ্গে, প্রাকৃত মানুষের সঙ্গে সাযুজ্য চাই। এ না হলে সৃষ্টি করতে পারিনে। আমাকে শহর থেকে দূরে সরে যেতে হবে। কিন্তু দেশের বিবর্তন আপাতত শহরের অভিমুখে চলবে। সেই ভালো।

(১৯৫৫)

আফ্রিকার কথা

সেদিন কোন আসমান থেকে নেমে এলেন আপনি। এসেই বললেন আফ্রিকার কথা। যে আফ্রিকা আপনার চোখে দেখা। যে চোখ দিয়ে ধারা বয়েছে।

আমাকে বললেন, "আপনিও একবার দেখে আসুন আফ্রিকা।"

আমি বললুম, "আমি গেলে আমিও তো কাঁদতুম। ও ছাড়া আর কী করতে পারতুম!" তার পর খুলে বললুম আপনাকে আমাদের নিজেদের দেশের কথা। আমার কাজ এইখানে। ঘর ভেঙে গেছে, ভাইয়ে ভাইয়ে ঝগড়া এখনো মিটল না। বাঙলীর দুর্গতির অবধি নেই। এ দুর্গতির পিছনে দুর্মতি। কবে এরা প্রকৃতিস্থ হবে, কেমন করে হবে, ভাবতে যদি হয় এসব ভাবি আগে। তার পর আফ্রিকার কথা।

কিন্তু আপনার চলে যাওয়ার পর থেকে দেখছি আফ্রিকাই আমাকে পেয়ে বসেছে। জানি, কিছু করবার নেই। তবু কোন পথে মঙ্গল তা বুঝতে চেষ্টা করছি।

বিংশ শতকের মধ্যভাগে কয়েকটি সুসভ্য জাতির লোক প্রকারান্তরে ক্রীতদাস প্রথা চালিয়ে যাচ্ছে, বহির্জগৎকে জানতে দিচ্ছে না। বহির্জগৎ যদি বা জানতে পাচ্ছে পরের এলাকায় হস্তক্ষেপ করতে পারছে না, করতে চাইছে না। উচিতও নয় হস্তক্ষেপ। আমাদের পঞ্চশীল নীতি পরের ঘরের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ পরিহার করতে বলে। সুতরাং কোনো এক ইউরোপীয় শক্তি যদি তার সাম্রাজ্যের কোনো এক অঞ্চলে সক্ষম মানুষদের ধরে বেঁধে বহু দূরে চালান দেয় ও খনির কাজে বা খামারের কাজে লাগায়, যদি অনিচ্ছুকের হাত কেটে দেয় বা পায়ে বেড়ী পরায়, যদি শিকল দিয়ে বেঁধে দলকে দল লোককে নিবিড় অরণ্যে গাছ কাটতে পাঠায় ও তাদের কঙ্কালে পথ ছাওয়ায়, যদি পারিশ্রমিক না দিয়ে তার বদলে দেয় মদ তা হলে আমরা দু পক্ষের মাঝখানে দাঁড়িয়ে এক পক্ষকে নিবৃত্ত ও অপর পক্ষকে সুরক্ষিত করতে পারিনে। সেদিক থেকে আমরা অক্ষম।

কিন্তু আমরা ধিক্কার দিতে পারি, প্রতিবাদ করতে পারি। বিশ্বের জনমত সব শক্তির উপরে। বিশ্বের বিবেক সব সরকারের ঊর্ধ্বে। বাইরে থেকে হস্তক্ষেপ এক কথা, উপর থেকে নৈতিক চাপ অন্য কথা। দুটো যদি ঘুলিয়ে না যায় তা হলে নিঃস্বার্থ নিষ্কাম বিবেকী ব্যক্তিদের ধিক্কার ও প্রতিবাদ অনেক দূর যেতে

পারে। আগের মতো প্রকাশ্যে বুক ফুলিয়ে অত্যাচার যে চলছে না, এটা এইসব ধিক্কার ও প্রতিবাদের ফলেই।

তার পর আজকাল ইউনাইটেড নেশনস হয়েছে। ইণ্টারন্যাশনাল লেবার অর্গানাইজেশন রয়েছে। আফ্রিকার শাসকরা এসব সংস্থায় যোগ দিয়েছেন। এই সূত্রে আন্তর্জাতিক জনমত তাঁদের কানে সব সময় পৌঁছচ্ছে। তাঁদেরকেও পদে পদে জবাবদিহি করতে হচ্ছে। আইনত তাঁরা বাধ্য নন। কিন্তু ন্যায়ত বাধ্য। ইণ্টারন্যাশনাল ল-র এখনো শিশু অবস্থা। কিন্তু ইণ্টারন্যাশনাল ইউসেজ বা লোকাচার শৈশব অতিক্রম করেছে। তা না হলে আমাদের এই সনাতন ধর্মের দেশে বহুবিবাহ রাতারাতি রদ হতো না। আর পাকিস্তানের শরিয়তী বেহেস্তে হুরী পরীদের মধ্যেও বহুবিবাহের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের লক্ষণ দেখা যেত না।

আন্তর্জাতিক সদাচার আফ্রিকার অত্যাচারীদের শান্তিতে থাকতে দেবে না। শুনতে পাই সেখানে মানুষকে বিনা দোষে বা নামমাত্র অপরাধে জেলে পাঠানো হয়, জেল থেকে বড়ো বড়ো জোতদার সাহেবদের জমিতে বেগার খাটতে চালান দেওয়া হয়। কয়েদীর শ্রমের মূল্য নেই। এক একজন জোতদার হয়তো এক এক লাখ একর জমি দখল করে বসে আছে, নিজে চষতে পারে না, পয়সা খরচ করে মুনিষ খাটাতে রাজি নয়। আর মুনিষও এমন যে পয়সার জন্যে খাটবে না, পয়সার দাম বোঝে না। পয়সার জন্যে ঘরবাড়ি ছেড়ে দূর দেশে গিয়ে মেহনত করতে চায় না। তারা যদি যে যার ঘরে পড়ে থাকে তা হলে আফ্রিকার খনি খামার কলকারখানা অচল হয়, দেশের বিকাশ হয় না, শ্বেতাঙ্গদের তো লোকসান হয়ই, কৃষ্ণাঙ্গদেরও জীবনযাত্রার পরিবর্তন হয় না। আফ্রিকার রূপান্তরের ঐতিহাসিক প্রয়োজন আফ্রিকার অত্যাচারিতদেরকেও শান্তিতে থাকতে দেবে না।

সকলের কাছে শুনি আফ্রিকার রূপান্তর জোর কদমে চলেছে। এমন কি ভারতের চেয়েও জোরসে। জোরসে চলার ঐতিহাসিক প্রয়োজন মেনে নিলে জোর জুলুমকেও সম্পূর্ণ এড়ানো যায় না। শিল্পবিপ্লবের গোড়ার দিকে ইংলণ্ডেও জোর জুলুম হয়েছিল, রাশিয়াতে এখনো হচ্ছে। চীনেও। সেসব দেশে বর্ণভেদ নেই। অত্যাচারী ও অত্যাচারিত উভয়েরই গাত্রবর্ণ এক। আফ্রিকায় যদি বর্ণভেদ না থাকত তা হলেও জোর জুলুম থাকত। সেটা অল্প সময়ের মধ্যে অধিক শ্রীবৃদ্ধির একটি শর্ত। আফ্রিকার রূপান্তর গত দেড়শ বছরের মধ্যে যতটা হয়েছে আগামী পঞ্চাশ বছরের মধ্যে তার বহুগুণ হবে। নতুবা সে অন্যান্য মহাদেশের সঙ্গে পাল্লা দিতে পারবে না। পশ্চাৎপদ থেকে যাবে। এ ত্বরান্বিত বিকাশ যে পদ্ধতিতেই হোক না কেন—ক্যাপিটালিস্ট বা কমিউনিস্ট—জোর জুলুম একেবারে বাদ দেওয়ার সম্ভাবনা কম। তবে আন্তর্জাতিক সদাচার যদি সর্বদা সক্রিয় থাকে তা হলে অত্যাচারীও উপরওয়ালার ভয়ে সন্ত্রস্ত থাকবে। সে উপরওয়ালা হচ্ছে বিশ্বজনমত। ইউনাইটেড নেশনস। ইণ্টারন্যাশনাল লেবার অর্গানাইজেশন। খ্রীস্টীয় চার্চ।

খ্রীস্টধর্মের হয়েছে জীবনসংকট। তার প্রতিষ্ঠাতা নির্দেশ দিয়ে গেছেন,

তোমরা সব দেশে যাও, সব মানুষের কাছে সুসমাচার পৌঁছে দাও। সসমাচার কী? সব মানুষ ভাই ভাই। সকলেই এক পিতার সন্তান। কিন্তু আফ্রিকায় যাঁরা এই বাণী পৌঁছে দিতে গেছেন তাঁদের অনেকেই অন্তরে অন্তরে স্বীকার করতে রাজি নন যে শাদা ও কালো ভাই ভাই। তাঁদের বেশ কিছু লোক আফ্রিকার কালো মানুষকে মানুষ বলে গণ্য করেন না, ওরা যদি মানুষ হয়ে থাকে তো বনমানুষ। খ্রীস্টধর্ম তা হলে ওদের জন্যে নয়। অথচ খ্রীস্টধর্ম প্রচার করতেই এঁরা সেখানে গেছেন, শোষণ বা শাসন করতে নয়। ঘটনার গতি যে দিকে চলেছে তা দেখে মনে হয় খ্রীস্টধর্ম আফ্রিকায় আর প্রসার লাভ করবে না। গত শতাব্দীতে যেমন ভারতে ধীরে ধীরে থেমে গেল এই শতাব্দীতে তেমনি আফ্রিকায় ক্রমে ক্রমে থেমে যাবে। কেনিয়াতে কিকিয়ুদের সংখ্যা দশ লাখের মতো। তিন বছরের বিদ্রোহের ফলে আট হাজার জনের উপর নিহত হয়েছে, তার অর্ধেক আহত অবস্থায় ধরা পড়েছে। সাতশ জনকে ফাঁসি দেওয়া হয়েছে। সত্তর হাজার বন্দীশালায় আছে। এ হলো গত মে মাসের হিসাব। লোকসংখ্যা যেখানে দশ লাখের মতো সেখানে এত বড়ো ত্যাগ আধুনিক ইতিহাসে কে কোথায় দেখেছে? আমাদের লোকসংখ্যা চল্লিশ কোটি। আমরাও কি তিন বছরে এই পরিমাণ ত্যাগ করেছি? তা সত্ত্বেও কিকিয়ুদের মনোবল ভেঙে যায়নি। তারা আত্মসমর্পণ করেনি। মশা মারতে কামান দাগার মতো এরোপ্লেন থেকে বোমা বর্ষণ করেও তাদের দমন করতে পারা যায়নি। ইংরেজের পক্ষে এটা নৈতিক পরাজয়। খ্রীস্টধর্মের পক্ষেও। কারণ কিকিয়ুরা মনের জোর পাচ্ছে তাদের প্রাচীন ধর্ম থেকে, নতুন ধর্ম থেকে নয়। যে ধর্ম অত্যাচারিতের পক্ষে না দাঁড়িয়ে অত্যাচারীর পক্ষে দাঁড়ায় তার কাছে বিদ্রোহীরা কিসের প্রেরণা পাবে? মাথা হেঁট করার, না মাথা উঁচু করার?

কিকিয়ুদের হয়তো পোকামাকড়ের মতো মেরে শেষ করে দেওয়া যাবে, কিন্তু প্রাচীন ধর্ম থেকে ত্যাগের প্রেরণা পেয়ে বছরের পর বছর বিদ্রোহ চালিয়ে যাওয়া সেইখানে শেষ হয়ে যাবে না। মাঝখানে মন্দা পড়বে। তার পর আবার বাধবে। এক আধ শতাব্দী একটা মহাদেশের জীবনে এমন কিছু দীর্ঘ সময় নয়। এশিয়ার মতো আফ্রিকাও একদিন মুক্ত হবে। কিন্তু ততদিনে খ্রীস্টধর্মের মর্যাদা কাদায় নেমে থাকবে আর ইউরোপীয় জাতিগুলির মর্যাদা ধুলোয় মিশে থাকবে। এটা বুঝতে পেরে এখন থেকে উদার নীতি অবলম্বন করাই শ্রেয়। কিন্তু তার উদ্যোগ যা দেখছি তা ছেলে ভোলানোর মতো। তাতে মড়ারেট আফ্রিকানরা ভুলতে পারে, কিন্তু লড়নেওয়ালা আফ্রিকানরা ভুলবে না। এ লড়াই অনেক দূর গড়াবে।

এটা অহিংস লড়াই নয়। যারা লড়ছে তারা সভ্যজাতির লোকও নয়। তারা যদি অশ্লীল দীক্ষা নেয়, নররক্ত পান করে, বীভৎস প্রক্রিয়ার আশ্রয় নেয় আমরা তার সমর্থন করব না। কিন্তু তাদের নিন্দা করার আগে এটাও ভেবে দেখব যে তাদের শত্রুরাও তো তাদের মানুষ বলে গণ্য করছে না। দেখবামাত্র গুলী করছে। স্ত্রী যাচ্ছে স্বামীকে খাবার দিতে। তাকেও গুলী করতে বাধছে না।

ঐটুকু দেশে ওদের হাতে কী-ই বা অস্ত্র আছে বা থাকতে পারে! কিন্তু ওদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করা হচ্ছে আধুনিকতম মারণাস্ত্র। যারা ব্যবহার করছে তারা সভ্যতার জাঁক করে। তাদের এরোপ্লেন আছে। বোমা আছে। এটা ভালো করে সমঝিয়ে দেওয়া হচ্ছে। আমরা কখনো এর সমর্থন করব না। কিকিয়ুদের এমন কোনো সুনাম নেই যে নষ্ট হবে। হলেও তারা প্রাণের দায়ে লড়ছে। কিন্তু ইংরেজের সুনাম নষ্ট হলে ইংরেজের ভবিষ্যৎ অন্ধকার। তাকেও নেমে যেতে হবে আফ্রিকাবাসীর সমতলে। বর্বরতার রসাতলে। এতেও যদি ইংলন্ডের জনমত বিক্ষুব্ধ না হয় তবে বুঝতে হবে সভ্যতার নেতৃত্ব তাদের হাত থেকে চলে গেছে।

তবে আফ্রিকানদের মনে রাখতে হবে যে প্রাচীন যুগে ফিরে যাওয়ার পথ চিরকালের মতো বন্ধ হয়ে গেছে। ট্রাইবাল সমাজ ব্যবস্থা তো হাজার হাজার বছর ধরে পরীক্ষা করা গেল। একই পরীক্ষা আর কত কাল চলবে! ইতিহাস নতুন কোনো পরীক্ষা চায়। প্রকৃতিরও নিয়ম তাই। আফ্রিকানরা যা জানে তার মায়া কাটিয়ে যা জানে না তার শিক্ষা নিক। নিতে হলে ইউরোপের কাছেই নিতে হবে। সুতরাং ইউরোপের সঙ্গে বিচ্ছেদ কখনো কাম্য হতে পারে না। আর খ্রীস্টধর্মের বর্তমান প্রচারকরা দীনাত্মা ও তাঁদের স্বজাতীয়রা দুরাত্মা হলেও তার প্রবর্তকের আত্মা মহান। সব মানুষকেই তিনি ভালোবেসেছেন। তাঁর ধর্মের মূলনীতি সব মানুষের জন্যে। খ্রীস্টীয় মূলনীতি বৌদ্ধ মূলনীতি মানবজাতির সম্পদ। যারা নাস্তিক তাদের জীবনেও খ্রীস্টীয় বৌদ্ধ গান্ধীয় মূলনীতির স্থান আছে। আফ্রিকানরা একে অগ্রাহ্য করতে পারে না। দীক্ষা নিয়ে খ্রীস্টান হয়তো হবে না। নাই বা হলো। কিন্তু খ্রীস্টীয় মূলনীতির চেয়ে বড়ো কিছুর সন্ধান না পেলে তারই প্রয়োগ করতে হবে। ট্রাইবাল নীতি যদি তার চেয়ে বড়ো হয়ে থাকে তবে অন্য কথা। কিন্তু ছোট হয়ে থাকলে তার উর্ধ্বে ওঠা উচিত।

তেমনি গত কয়েক শতাব্দীতে ইউরোপে যেসব আন্দোলন হয়েছে—রেনেসাঁস, রেফর্মেশন, ফরাসী বিপ্লব, লিবারল মতবাদ, ডেমক্রেসি, সোশ্যালিজম, রুশ বিপ্লব—এসব আন্দোলনের পরিধি ইউরোপেই নিবদ্ধ নয়। আফ্রিকাও এর থেকে শিখতে বাধ্য। নতুন যুগের আফ্রিকানদের মন এর দ্বারা তৈরি হবে। কিন্তু ঐতিহ্যকে বর্জন করে নয়।

ঐতিহ্যের কথা উঠলেই সব দেশের মানুষ রক্ষণশীল হয়ে ওঠে। ভালো-মন্দ সুন্দর কুৎসিত সব কিছুকে আঁকড়ে ধরে। আফ্রিকানদের ঝোঁকটাও আমাদের সনাতনীদের মতো। এদেশে যেমন সতীদাহ ওদেশে তেমনি কয়েক রকম কদর্য ও নিষ্ঠুর প্রথা আছে, ঐতিহ্যের নামে সেগুলোর প্রতি আনুগত্য রয়েছে। শিক্ষিত আফ্রিকানদের কাজ হবে এসব ঝাঁট দিয়ে ঘর সাফ করা। নইলে আধুনিক যুগের সঙ্গে তাদের বনবে না। একে তো ইউরোপের সঙ্গে ঝগড়া, তার উপর আধুনিক যুগের সঙ্গে অবনিবনা। দুই ফ্রন্টে লড়তে গিয়ে তারা হারতে থাকবে। অন্তত একটা ফ্রন্টে মিটমাট চাই। সেটা আধুনিকতার

স্পষ্ট। এ কথা এশিয়া সম্বন্ধেও খাটে। ভারতের ও দ্বিধা কাটেনি। পাকিস্তানের তো নয়ই।

আফ্রিকাকে আধুনিক হতে হবে। এ ক্ষেত্রে ইউরোপ তার শত্রু নয়। বরং সহায়। অথচ অপরাপর ক্ষেত্রে ইউরোপ তার মহাশত্রু। ইউরোপীয়রা কালো রং সইতে পারে না। যেখানে সেটুকু সহিষ্ণুতা আছে সেখানে ধর্মগত অসহিষ্ণুতা। যেখানে চর্ম ও ধর্ম দুই সহ্য হয় সেখানে ছোটলোকের আস্পর্ধা অসহনীয়। আফ্রিকান মাত্রেই ছোটলোক, এই যেমন বাগদী বাউরি চাঁড়াল আর কী! আফ্রিকান মাত্রেই দাসবংশের লোক। দাস বা দস্যু। অবিকল বৈদিক মনোভাব। এর থেকেই এসেছে দক্ষিণ আফ্রিকার আপার্টহাইড বা বর্ণাশ্রম ব্যবস্থা। এর বিরুদ্ধে সমস্ত শক্তি দিয়ে যুঝতে হবে। সে যুদ্ধে সন্ধি নেই। সেই কুরুক্ষেত্রের জন্যে আফ্রিকার মাটি তৈরি হচ্ছে। হবে একদিন রক্তপাত। আফ্রিকায় যেসব শাদা মানুষ থাকবে তারা সন্ধি করে থাকবে, গায়ের জোরে নয়। সন্ধির শর্ত হবে কালো মানুষকে স্বাধীন ও সমান বলে স্বীকার করা। তারা যদি খুশি হয়ে কোনো শাদা মানুষকে ভোট দেয় তা হলেই তিনি তাদের উপর কর্তৃত্ব করতে পারবেন, নয়তো কর্তৃত্বের আশা ছেড়ে দিয়ে এখানকার মতো ব্যবসা বাণিজ্য করবেন। কিন্তু আফ্রিকার মাটিতে সংখ্যাগুরু আফ্রিকানদের দাসত্বের ভিত্তিতে বর্ণাশ্রমী রাজ্য স্থাপন বিনা রক্তপাতে সম্ভব নয়। যুগটা এমন যে মরীয়া হয়ে উঠলে কালো লাল হয়ে যায়। চোখের উপর হলদেও লাল হয়ে গেল। চীনারা যা পারে, কোরিয়ানরা যা পারে, ভিয়েটনামের লোকরা যা পারে আফ্রিকার বুনোরাও তা পারে। মানুষকে অতটা অপদার্থ মনে করাই ভুল। এর পরের অধ্যায়ে হয়তো কিকিয়ুরা কমিউনিস্ট হয়ে যাবে। যেমন একদিন শূদ্ররা মুসলমান হয়ে গেল।

আফ্রিকা উঠবেই। সুপ্ত সিংহের মতোই উঠবে। ভবিষ্যৎ তো তারই। বর্তমানটা না হয় ইউরোপ আমেরিকার। আমরা তা হলে আফ্রিকার জন্যে কাঁদব না। সতর্ক থাকব যাতে আফ্রিকায় আমাদের লোক কোনো রকম ভুল না করে।

(২৪শে সেপ্টেম্বর ১৯৫৫)

(শ্রীঅমিয় চক্রবর্তীকে লিখিত পত্র)

রাষ্ট্র বনাম নেশন

পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠার মূলে এই দুটি ধারণা কাজ করছিল যে সম্প্রদায় হচ্ছে নেশনের সমান এবং নেশন হতে পারে একটিমাত্র সম্প্রদায় নিয়ে।

সাত আট বছর পরে সকলের না হোক অনেকের মন থেকে এ ধারণা মুছে

গেছে। পাকিস্তানের মুসলমান বন্ধুরা এখন চান যে হিন্দু বৌদ্ধ খ্রীস্টান প্রভৃতি অপরাপর সম্প্রদায়ের লোকজন সেখানে বাস করে। বাস করে জিম্মির মতো নয়, নাগরিকের মতো। কিন্তু এখনো তাঁরা উপলব্ধি করতে পারছেন না যে নাগরিকের মতো বাস করা এক কথা ও মিলে মিশে নেশন তৈরি করা আরেক। হাজার হাজার বছর আমরা পাশাপাশি বসবাস করেছি, কিন্তু নেশন গড়তে অক্ষম হয়েছি, নইলে দেশ ভেঙে যাবার অন্য কোনো কারণ ছিল না। পাকিস্তানী বন্ধুরা যদি নেশন গড়ার সংকেত না জানেন, যদি নেশন গড়তে অক্ষম হন তা হলে দেশ ভাঙার কারণটা নির্মূল হবে না, আবার এক ঐতিহাসিক দুর্যোগের অপেক্ষায় মাটির তলায় গুপ্ত থাকবে।

নেশন তৈরি করার সংকেত এই যে জাতীয় স্বার্থ আর সব গণনার ঊর্ধ্বে। সাম্প্রদায়িক স্বার্থ তার কাছে কিছু নয়। জাতির খাতিরে সম্প্রদায়কে খাটো করতেই হবে। যেসব দেশে একটিমাত্র সম্প্রদায়ের বাস তাদের বেলায় যা নিয়ম যেসব দেশে একাধিক সম্প্রদায়ের বাস তাদের বেলায় তা নিয়ম নয়। বহু সম্প্রদায়বিশিষ্ট দেশের বেলায় নেশন বানাবার নিয়ম হচ্ছে সম্প্রদায়কে খাটো করা ও জাতিকে বাড়িয়ে তোলা। এ নিয়ম লঙ্ঘন করলে ইতিহাস ক্ষমা করে না, শাস্তি দেয়। পাকিস্তান যখন আফগানিস্তান বা ইরাক নয়, সেখানকার নিয়ম এখানে খাটতে পারে না। এখানে খাটবে ইংলন্ডের নিয়ম, আমেরিকার নিয়ম, রাশিয়ার নিয়ম। যেসব দেশে একাধিক সম্প্রদায় বাস করছে সেসব দেশের নিয়ম। সে নিয়ম সম্প্রদায়কে ছোট করা, জাতিকে বড়ো করা, দুটোর তফাৎ সব সময় মনে রাখা, দুটোকে সমান না ভাবা।

পাকিস্তানের লোকপ্রতিনিধিরা এই মুহূর্তে শাসনতন্ত্র প্রণয়নে নিযুক্ত। তাঁদের শুভবুদ্ধির উপর কোটি কোটি নাগরিকের স্থায়ী মঙ্গল নির্ভর করছে। অদূরদর্শীর মতো তাঁরা যদি সম্প্রদায়কে জাতির ঊর্ধ্বে স্থান দেন তা হলে রাষ্ট্র হবে, কিন্তু নেশন হবে না। ইসলামী রাষ্ট্র ইসলামকেই শীর্ষস্থান দেয়, জাতিকে নয়। তা ছাড়া জাতির অন্যতম ধর্মকে একমাত্র ধর্মের মর্যাদা দিলে সাম্যনীতি রক্ষিত হয় না। মুসলমানের সংখ্যা বেশী বলে তাদের ধর্ম-ই একমাত্র ধর্ম বা শ্রেষ্ঠ ধর্ম এ যুক্তি মুসলমান ভিন্ন আর কে স্বীকার করবে? নেশনের ভিত্তি স্বীকৃতি। রাষ্ট্রের ভিত্তি সামরিক শক্তি। নেশন হয় স্বেচ্ছায়। রাষ্ট্র হয় গায়ের জোরে।

শাসনতন্ত্র ব্রিটিশ আমলেও সংরচিত হয়েছিল। তিন তিনবার গোল টেবলের বৈঠক বসে। তার পরে ১৯৩৫ সালের গবর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া য়্যাক্ট পাশ হয়। পাকিস্তানে এখনো সে আইন রদ হয়নি, সেই অনুসারে কাজ হচ্ছে। সে শাসনতন্ত্রের গলদ কোনখানে? গলদ এইখানে যে তাতে শাসকদের ইচ্ছাই জয়ী হয়েছে, শাসিতদের ইচ্ছা জয়ী হয়নি। অর্থাৎ ইংরেজ সকলের সঙ্গে পরামর্শ করেছে, কিন্তু কারো স্বীকৃতির জন্যে উদ্বিগ্ন হয়নি। সেইজন্যে নতুন করে শাসনতন্ত্র তৈরি করতে হলো ভারতে। হচ্ছে পাকিস্তানে।

কিন্তু এবারেও যদি দেখা যায় যে অপরাপর সম্প্রদায়ের স্বীকৃতির জন্যে

উদ্বেগ নেই, শাসক সম্প্রদায়ের ইচ্ছাই জয়ী হয়েছে, শাসিত সম্প্রদায়ের ইচ্ছা জয়ের অংশ পায়নি, তা হলে নতুন শাসনতন্ত্র সর্বজনস্বীকৃত হবে না। তার গোড়ায় গলদ থেকে যাবে। অমন করে রাষ্ট্র হয়, ইংরেজ সরকারও রাষ্ট্র গঠন করেছিলেন, তাঁদের মতো রাষ্ট্র গঠন প্রতিভা আর কার আছে? কিন্তু নেশন গঠনের প্রতিভা অন্য জিনিস। তার নিদর্শন ইংরেজরা তাদের নিজেদের দেশে দিয়েছে, কিন্তু পরের জন্যে তাদের এমন কী মাথাব্যথা যে আমাদের ধরে বেঁধে বা মাথায় হাত বুলিয়ে নেশন করে দেবে? এ কাজ পরের জন্যে পর করে না। এটা আমাদের নিজেদের কাজ। আমরা যদি নেশন গড়ার মতো প্রতিভার অধিকারী হয়ে থাকি তা হলে আমাদের পরবর্তী চতুর্দশ পুরুষ তার সুফল ভোগ করবে। যেমন করছে আমেরিকার লোক ওয়াশিংটন জেফারসন প্রভৃতি দূরদর্শী নেতাদের রোপিত মহীরুহের সুফল ভোগ।

স্বরচিত শাসনতন্ত্রের লক্ষ্য সুদূরপ্রসারী। শত শত বর্ষ পরে যারা জন্মাবে তারা ধন্য ধন্য করবে আজকের শাসনতন্ত্র প্রণেতাদের। এত বড়ো গুরুতর দায়িত্ব যাঁদের উপর বর্তেছে, যাঁরা শুধু আজকের লোকপ্রতিনিধি নন, ভবিষ্যৎ বংশের অনাগত সন্তানেরও প্রতিনিধি, তাঁরা যেন সাময়িক সুবিধা বা কৌশলের কথা না ভেবে বৃহত্তর মঙ্গলের কথা চিন্তা করেন। নয়তো রাষ্ট্র হবে, নেশন হবে না। নেশন ও রাষ্ট্র একসঙ্গে থাকলেও এক জিনিস নয়। তা যদি হতো পৃথিবীর সর্বত্র পুরোনো ধরনের রাষ্ট্র ভেঙে নতুন ধরনের নেশন-স্টেট গড়ার ধুম পড়ে যেত না। মনটাকে হাল আমলের না করলে সাবেক আমলের জের টেনে বেশী দূর চলা সম্ভব নয়। সেকেলে রাষ্ট্র সেকালেই শোভা পেত। একালের রাষ্ট্র নেশন-রাষ্ট্র হবে। সেইজন্যে নেশন গড়া এত দরকারী। আর নেশন গড়তে হলে নতুন ধরনের শাসনতন্ত্র এত জরুরি।

পাকিস্তানের লোকপ্রতিনিধিরা ইচ্ছা করলে এক সম্প্রদায়কে অপর সব সম্প্রদায়ের থেকে পৃথক করতে পারেন। পৃথক নির্বাচন পদ্ধতি বহাল রাখতে পারেন। এমন কি তাকে তফশিলভুক্ত হিন্দুদের প্রতি প্রসারিত করতে পারেন। কিন্তু তেমন করে রাষ্ট্র হতে পারে, নেশন হতে পারে না। এখন পর্যন্ত আর কোনো দেশে হয়নি। দক্ষিণ আফ্রিকাই একমাত্র অন্য দেশ যেখানে এই ধরনের একটা পরীক্ষা দেখতে পাই। সে পরীক্ষা নেশন গঠনের নয়। দক্ষিণ আফ্রিকায় যা গড়ে উঠছে কেউ তাকে নেশন বলবে না। "গড়ে উঠছে" বললেও ভুল বলা হয়। গঠনের প্রতিভা সেখানকার শাসকদের নেই। তারা যা করছে তা গঠন নয়। অমন করে নেশন তো দূরের কথা রাষ্ট্রও গড়া যায় না। রাষ্ট্র গড়ে দিয়েছিল ইংরেজ। তারা সে রাষ্ট্রকে কুক্ষিগত করতে গিয়ে তার কবর খুঁড়ছে।

যৌথ নির্বাচন পদ্ধতি না হলে নেশন গড়ে ওঠে না। তবে যেসব দেশে আদৌ নির্বাচন নেই সেসব দেশের কথা আলাদা। নেশন গঠনের জন্যে তারা অন্য উপায় অবলম্বন করে। যদি নেশন তৈরি করার জন্যে তাদের মাথাব্যথা থাকে। শাসনতন্ত্রের বালাই নেই তাদের। কাজেই তাদের সঙ্গে ভারতের বা পাকিস্তানের তুলনা করা চলে না। পাকিস্তান শাসনতন্ত্রকে মূল্যবান মনে করে।

ভারত তো করেই। এসব দেশে নেশন তৈরির ফরমূলা আমেরিকা বা ইংলণ্ডের অনুসরণ করবে এইটেই স্বাভাবিক। আমেরিকা বা ইংলণ্ড বা অন্য কোনো নির্বাচননির্ভর দেশে পৃথক নির্বাচন পদ্ধতি নেই। এমন কি দক্ষিণ আফ্রিকাতেও না। সেখানে সোজাসুজি ভোট অধিকার সীমাবদ্ধ করা হয়েছে, আরো সীমাবদ্ধ করা হচ্ছে। কিন্তু ভোট অধিকার যাদের আছে তারা যৌথ নির্বাচন পদ্ধতিতে ভোট দেয়। পৃথক নির্বাচন পদ্ধতিতে নয়। পাকিস্তানই একমাত্র দেশ যেখানে ভোট অধিকারীদের বিভিন্ন বিভাগ। তবে শুনেছিলুম শ্লোভাকিয়ায় স্বতন্ত্র নির্বাচন ছিল। কিন্তু সাম্প্রদায়িক নয়।

এখন কথা উঠতে পারে, পাকিস্তান যদি সাম্প্রদায়িক রাষ্ট্র না হয়, যদি পৃথক নির্বাচন পদ্ধতি তুলে দেয়, তা হলে তার বিশেষত্ব থাকবে কী করে? সে কি ভারতের সঙ্গে মিশে যাবে না? তার অস্তিত্বের সার্থকতা কোনখানে?

এর উত্তর দিতে হলে ইতিহাসচর্চা করতে হয়। ইউরোপের কোথাও ক্যাথলিক রাষ্ট্র বা প্রোটেস্টাণ্ট রাষ্ট্র নেই। সর্বত্র সেক্যুলার স্টেট। অথচ বিংশ শতকের মধ্যভাগেও সেখানকার লোকের মন থেকে ক্যাথলিক প্রাধান্যপ্রীতি বা প্রোটেস্টাণ্ট প্রাধান্যভীতি দূর হয়নি। ক্যাথলিকরা পারতপক্ষে প্রোটেস্টাণ্ট প্রাধান্য চায় না। প্রোটেস্টাণ্টরাও পারতপক্ষে ক্যাথলিক প্রাধান্য চায় না। সেইজন্যে দেশমিশ্রণের প্রশ্ন উঠলে একটা না একটা অজুহাতে এড়িয়ে যায়। ইদানীং জার্মানী দু ভাগ হয়ে যাওয়ায় পশ্চিম জার্মানী ক্যাথলিকপ্রধান হয়ে উঠেছে। পূর্ব জার্মানী থেকে ক্যাথলিকরা পালিয়ে এসে পশ্চিম জার্মানীকে ক্যাথলিক-প্রধান করেছে। ফলে সরকার চলে গেছে ক্যাথলিকদের হাতে। কয়েক শতাব্দী পরে সরকার হাতে পেয়ে ওরা যে কাল সকালেই তা আবার প্রোটেস্টাণ্টদের হাতে তুলে দেবে তেমন সুবোধ বালক ওরা নয়। ঐক্যের জন্যে মুখে আস্ফালন করলেও কাজে সেটাকে পেছিয়ে দেওয়ার চেষ্টাই বেশী। আমি যতদূর দেখতে পাচ্ছি জার্মান ঐক্য সুদূরপরাহত। খুব একটা অঘটন না ঘটলে ক্যাথলিকরা ক্ষমতার ঘাঁটি ছেড়ে দেবে না। জার্মানীর মতো প্রগতিশীল দেশে এই ব্যাপার। খুঁটিয়ে দেখলে অন্যত্রও ক্যাথলিক প্রোটেস্টাণ্ট প্রাধান্য প্রীতি বা ভীতি লক্ষ করা যায়। এসব অন্তঃস্রোত রয়েছে বলেই ইউরোপ—অন্ততপক্ষে পশ্চিম ইউরোপ—একজোট হতে পারছে না। এক হওয়া তো দূরের কথা চারশ বছর পরেও কলহের অবসান হয়নি।

তা হলে আমরা কেন অতিমাত্রায় আশাবাদী হতে যাই? কলহ থাকবে, তা সত্ত্বেও সেক্যুলার স্টেট হবে, নেশন হবে, প্রগতি হবে, বন্ধুতাও হবে। অদ্ভুত শোনায়, কিন্তু মানুষের স্বভাব এমনি বিচিত্র ও জটিল। সুতরাং আমরা অতিমাত্রায় নিরাশাবাদীও হব না। দেশবিভাগ মেনে নিয়ে ভেদবুদ্ধি কাটিয়ে উঠতে চেষ্টা করব।

(১৯৫৫)

স্বাধীনতাদিবসের ভাবনা

আবার সেই দিনটি এল যেদিন স্বচক্ষে দেখলুম রাইটার্স বিল্ডিংএর উপর, হাইকোর্টের উপর ইউনিয়ন জ্যাক উড়ছে না, উড়ছে ভারতের জাতীয় পতাকা। আর লাটভবনের উপর উড়ছে রাজাজীর নিজস্ব নিশান। স্বচক্ষে দেখলুম কলকাতার ফোর্ট উইলিয়ম আর ইংরেজের দখলে নয়, সিরাজউদ্দৌলার উত্তর-পুরুষের দখলে। সিরাজের আত্মা তৃপ্ত। এত বড়ো পরিবর্তন আড়াই শ বছরে হয়নি। পলাশীর পূর্বেও কলকাতা ইংরেজের ছিল।

সেদিন কলকাতায় যে উদ্দীপনা নিরীক্ষণ করেছি তা দেশবিভাগের শোক ভুলিয়ে দেবার মতো। ক্ষণকালের জন্যে ভুলে গেছি সে বেদনা। পরে কিন্তু সেই ব্যথাই প্রবল হলো। চোখের জলে ভেসে গেল হাসি। প্রতি দিন, প্রতি সপ্তাহ, প্রতি মাস, প্রতি বৎসর ভেবেছি, ভাবতে ভাবতে পাগল হয়ে গেছি— এমন কোনো উপায় কি ছিল না যাতে সাপও মরে লাঠিও ভাঙে না, পরাধীনতাও যায়, দেশবিভাগও হয় না! তার জন্যে না হয় আরো দশ বছর ধৈর্য ধরা যেত। কিন্তু এ যা হলো এ কি ঐক্যের বিনিময়ে স্বাধীনতা নয়!

দেশ এই আট বছরে যত দূর অগ্রসর হয়েছে তার চেয়ে নিশ্চয় আরো বেশী হতে পারত, কিন্তু তার জন্যে দায়ী দেশবিভাগের পরবর্তী বাদবিসংবাদ। এই অধ্যায়টা এখনো শেষ হয়নি, তবে ইতিমধ্যে লোকবিনিময়ে অরুচি এসেছে, যুদ্ধে অনিচ্ছা তো আরো গভীর। দেখেশুনে মনে হয় সাম্প্রদায়িকতার যুগ গেছে। পাকিস্তানের ভিতরের খবর যা কানে আসে তাও এই ধারণার পোষক। সেখানেও সাম্প্রদায়িকতা প্রতি দিন হটে যাচ্ছে। মানুষ মানুষকে ধর্মের দ্বারা চিহ্নিত করতে সব সময় রাজি নয়, এই হলো সেক্যুলার মনোভাবের আদত কথা। নইলে ধর্ম ছাড়তে বা ধর্মে অবিশ্বাস করতে কেউ বলছে না। সেক্যুলার স্টেট ধর্মবিরোধী নয়। ভেদবুদ্ধিবিরোধী। আরো পাঁচ দশ বছর লাগবে ভেদবুদ্ধির প্রভাব ভালো করে কাটিয়ে উঠতে। তাকে সাহায্য করবে অর্থনৈতিক পরিবর্তন। একজন এঞ্জিনিয়ার হিন্দু কি মুসলমান এ গণনার উর্ধ্বে না উঠলে বাঁধ ভাঙবে, বান ডাকবে, দেশ ভাসবে। একজন মিস্ত্রী হিন্দু কি মুসলমান এ চেতনা যদি দূর না হয় বয়লার ফাটবে, ফ্যাক্টরি পুড়বে, উৎপাদন বিপর্যস্ত হবে। অর্থনৈতিক পরিবর্তন যত দ্রুত হবে মানুষের সঙ্গে মানুষের অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ তত গাঢ় হবে। একজন হিন্দুর উপরে বহু মুসলমানের জীবিকা, একজন মুসলমানের উপর বহু হিন্দুর সমৃদ্ধি নির্ভর করবে। তবে এটাকে অর্থনীতির স্তর থেকে সামাজিক স্তরে তুলতে হবে। সামাজিক মেলামেশা অব্যাহত না হলে মনের বিষ যাবে না।

প্রগতির কথা উঠলে যারা রাশিয়ার সঙ্গে চীনের সঙ্গে তুলনা করে তারা ভুলে যায় যে, আমাদের এখানে কেউ সর্বেসর্বা নয়, কাউকে আমরা সর্বেসর্বা হতেও দেব না এখানে। গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করাই আমাদের প্রথম ও প্রধান কাজ। তার গোড়াপত্তন এই আট বছরে এখানে যতদূর হয়েছে রুশ চীনে ততদূর হয়েছে কি? গণতন্ত্রকে প্রাচ্য দেশের মাটিতে বদ্ধমূল করতে আট বছর কেন,

আশি বছর লেগে যাবে। ততদিন অবশ্য সামাজিক বা অর্থনৈতিক পরিবর্তন অপেক্ষা করতে পারে না। আমাদের নেতারাও এটা উপলব্ধি করেছেন। সেইজন্য তাঁরা গণতন্ত্রের কাঠামো বজায় রেখে সমাজতন্ত্রের পরিকল্পনা নিয়েছেন। তাঁরা এখন পর্যন্ত ব্যর্থ হননি৷ বড়ো রকম যুদ্ধবিগ্রহ না ঘটলে ব্যর্থ হওয়ার সম্ভাবনা সামনের দশ বছরে নেই। এর চেয়ে তাড়াতাড়ি করতে গিয়ে গণতন্ত্র বিসর্জন দেওয়া মূঢ়তা। সাধারণ লোক এটা বুঝতে পেরেছে বলে মনে হয়। না বুঝে থাকলে বুঝতে হবে। আর যদি এর চেয়ে দ্রুত পরিবর্তনের প্রয়োজন থাকে তা হলে বিনোবাজীর নেতৃত্ব বরণীয়। তিনি এমন এক পন্থা আবিষ্কার করেছেন যা ইতিহাসে অভিনব, যা জগতে অতুলনীয়।

আইনের সাহায্য না নিয়ে, সরকারের সাহায্য না নিয়ে ভূমি সমস্যার বা সম্পত্তি সমস্যার সমাধান করা যায়, এ কথা রুশ চীন ইংরেজ মার্কিন কেউ স্বীকার করতেন না। কিন্তু বিনোবাজীর কার্যকলাপ দেখে ইতিমধ্যেই কেউ কেউ আকৃষ্ট হয়েছেন। স্বীকার করার মতো সুদিন এখনো আসেনি। আগে তো আমাদের নিজেদের দেশে আসুক, তার পর অন্যত্র আসবে। গণতন্ত্র যদিও সব সময় কাম্য তবু কথায় কথায় রাষ্ট্রের বা রাষ্ট্রপরিচালকদের মুখাপেক্ষী হওয়া বাঞ্ছনীয় নয়। যে জাতি যত বেশী রাষ্ট্রনিরপেক্ষ অথচ উন্নতিশীল সে জাতি তত বেশী প্রশংসার যোগ্য। গান্ধীজী আমাদের এই শিক্ষা দিয়ে গেছেন যে রাষ্ট্রের উপর সব কিছু ছেড়ে দেওয়া উচিত নয়। রাষ্ট্র যদি সব কিছু করে দেয় তা হলে রাষ্ট্র একদিন সকলের সব স্বাধীনতা হরণ করবে। আমরা হব কনস্‌ক্রিপ্ট। কেবল যুদ্ধের সময়ে নয়, শান্তির সময়েও। বড়ো বড়ো স্বাধীন দেশগুলোর যুদ্ধকালীন অবস্থা দেখে মনে হয় না যে তাদের জনসাধারণ সত্যি স্বাধীন। শান্তিকালেও জনসাধারণের স্বাধীনতার উপর যুদ্ধের ছায়া পড়ে। এ ছায়া আমাদের এ দেশে নেই। আমরা যে এর থেকে মুক্ত এর জন্যে জবাহরলালজীর রাষ্ট্রনীতিকে তো সেলাম জানাবই, উপরন্তু বিনোবাজীর রাষ্ট্রবহির্ভূত নীতিকেও প্রণাম জানাব। ভারত যদি কোনোদিন যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে সাধারণ লোককে কনস্‌ক্রিপ্ট করা সহজ হবে না। এটা গান্ধীবাদী চিন্তা ও কর্মপন্থার পুণ্যফল। জবাহরলাল ও বিনোবা উভয়ের ভিতর দিয়ে গান্ধীজী কাজ করছেন। এঁরা গান্ধীর হাতে গড়া।

তার পর জাতি গড়তে হলে যে জাত ভাঙতে হয় এ জ্ঞান কংগ্রেস সভাপতি প্রমুখ অনেক নেতার হয়েছে। সামাজিক রক্ষণশীলতার সঙ্গে রাজনীতিক প্রগতিশীলতা খাপ খায় না। খাপটাও প্রগতিশীল হওয়া চাই। নইলে তরোয়ালটাও রক্ষণশীল হবে। তার মানে রাজনীতি হবে ফাসিস্ট মার্কা। আমার অনেক সময় ভয় হয় যে এ দেশের মাথার উপর ফাসিজমের খড়্গ ঝুলছে। তার কারণ সমাজটা ঘোরতর রক্ষণশীল। রুশ চীন ইংরেজ মার্কিন সমাজ এমন রক্ষণশীল নয়। কিন্তু সম্প্রতি যেসব নতুন আইন হয়েছে তার ফলে সমাজের রক্ষণশীলতা তলে তলে ক্ষয়ে আসবে। বিশেষ বিবাহ আইন ও হিন্দু বিবাহ আইন যে পাশ হবে তা আমি বিশ্বাস করতে পারিনি। বার বার বাধা

পেতে পেতে হতাশ হয়ে পড়েছিলুম। প্রায় সর্বসম্মতিক্রমে পাশ হলো লক্ষ করে অবাক হয়েছি। দেশের সুমতির এর চেয়ে বড়ো প্রমাণ আমার কাছে আর নেই। বহুবিবাহের অন্তর্ধান ও একবিবাহের প্রবর্তন একটা যুগান্তকারী ঘটনা। বিবাহবিচ্ছেদের স্বীকৃতি একটা কল্পান্তকারী ঘটনা। কন্যাকে পুত্রের সমান অংশ দান এখনো পার্লামেন্টের বিবেচনাধীন। এ যদি হয় তবে একটা অলৌকিক ঘটনা হবে।

(১৯৫৫)

রাষ্ট্রভাষা

নর্মানরা ব্রিটেন জয় করেছিল কবে? প্রায় ন'শ বছর আগে। ইতিমধ্যে ইংলন্ড বার বার ফ্রান্সের সঙ্গে যুদ্ধ করেছে, বার বার জিতেছে। নেপোলিয়নের পতনের পর থেকে দুই নেশনে মোটের উপর সদ্ভাব বজায় রয়েছে।

দুটোই খানদানী নেশন। দুটোরই প্রবল প্রতাপ। আত্মসম্মান কারো কম নয়। তা হলে কেন এমন হয় যে, ইংলন্ডের রাজপরিবারে এখনো বহু ব্যাপারে ফরাসী ভাষার একাধিপত্য? ইংলন্ডের অভিজাতরাও নর্মান বলতে ফরাসী বলতে অজ্ঞান। ভদ্রলোকেরা যেসব হোটেলে বা রেস্টোরান্টে খেতে যান সেখানে অর্ডার দিতে হয় ফরাসী ভাষায় ছাপা বা লেখা মেনু দেখে।

ইংরেজের চালচলন ইংলন্ড থেকে এদেশে এসে বদলায়নি। এখানকার বড়ো বড়ো হোটেলেও একই রীতি। রাজভবন যখন গবর্নমেন্ট হাউস ছিল তখন সেখানেও ফরাসী ভাষায় মেনু ছাপা হতো। যেদিনকারটা সেদিন। একালে কী হয় জানিনে।

এখন কথা হচ্ছে, এই সেদিন পর্যন্ত যে ইংরেজ পৃথিবীর পয়লা নম্বর গ্রেট পাওয়ার ছিল সে কেন আত্মসম্মান বিসর্জন দিয়ে ফরাসী ভাষার মেনু পড়ে পানাহার করে? আর তার রাজারাজড়ারা কেন ফরাসীতে জীবনের অর্ধেক কাজ সারেন?

আত্মসম্মানের জন্যে ইংরেজের যদি মাথাব্যথা না থাকে আমরাই বা কেন পদে পদে আত্মসম্মানের দোহাই দিই? সদ্য স্বাধীন হয়েছি বলে? পরাধীনতা ভুলতে পারিনি বলে? দুর্বল রয়ে গেছি বলে? হীনমন্যতা কাটেনি বলে?

নইলে প্রত্যেকটি ব্যাপারে হিন্দীকে ইংরেজের বিকল্প করার বাধ্যবাধকতা কিসের? কতক কাজ হিন্দীতে হোক, আপত্তি নেই। কিন্তু সব কাজ হিন্দীতেই হবে, সব ক্ষেত্র থেকেই ইংরেজী বহিষ্কৃত হবে, এ দাবি আত্মসম্মানের অনুরোধে, না এর পিছনে আর কোনো অভিসন্ধি আছে? আত্মসম্মানের দিক থেকে এর সমর্থন খুঁজে পাওয়া শক্ত।

আর আত্মসম্মানকেই যদি অতটা মূল্য দেওয়া হয় তবে বাঙালীর জন্যে বাংলা, মরাঠার জন্যে মরাঠী, গুজরাতের জন্যে গুজরাতী, তামিলনাডের লোকের জন্যে তামিল, যার যার জন্যে তার তার ভাষা কেন অগ্রগণ্য হবে না?

ভারতের মতো বহুভাষী দেশে একটি ভাষায় সকলের আত্মসম্মান চরিতার্থ হতে পারে না। এখানে সুইটজারল্যাণ্ডই আদর্শ।

প্রকৃত সমাধান হচ্ছে প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে ইংরেজীকে বহাল রাখা। অন্যান্য ক্ষেত্র হিন্দী ও অপরাপর ভাষার মধ্যে ভাগ করে দেওয়া। তা হলেই সব চেয়ে কম অবিচার হবে, সব চেয়ে কম বিক্ষোভ। নতুবা অন্তর্বিরোধ ও দ্বিতীয়বার ভারতবিভাজন।

(১৯৫৫)

প্রদেশ পুনর্গঠন

ছেলেবেলায় আমার এক ব্যসন ছিল মানচিত্র নিয়ে বসা, তার রূপ বদলে দেওয়া। প্রদেশগুলোকে তখন খুশিমতো ঢেলে সেজেছি। এমন কি দেশটাকেই কয়েক ভাগ করেছি। তার পর বড়ো হয়ে আমিও মেনে নিলুম যে প্রদেশগুলো ভাষাভিত্তিক হবে, প্রদেশগুলোর মাথার উপর একটাই রাষ্ট্র থাকবে। ভারতীয় নামে একটিমাত্র নেশন। বাঙালী, গুজরাতী, পাঞ্জাবী ইত্যাদি নামে পনেরো বিশটি 'সাব-নেশন'। প্রদেশকে ইংরেজীতে প্রভিন্স বলা হয়। তার বদলে স্টেট বলতে হবে।

অপ্রত্যাশিতভাবে দুই রাষ্ট্র হলো। কিন্তু প্রত্যাশিতভাবে প্রদেশগুলিকে স্টেট আখ্যা দেওয়া হলো। ইতিহাস মানুষের সব আশা পূরণ করে না, কিন্তু কতক আশা মেটায়। এখন কথা হচ্ছে, ভাষাভিত্তিক প্রদেশ নামক আশাটির কী হবে? সেটিও কি মিটবে? না, সেটি অপূর্ণ থেকে যাবে?

জবাহরলালজীকে আমি যতদূর জানি, তিনি ভাষাভিত্তিক প্রদেশকে ভয় করেন। করবারই কথা। কে জানে কোন দিন কে পাকিস্তানের মতো আলাদা হয়ে যাওয়ার ধুয়ো ধরবে। 'সাব-নেশন' যদি নেশন হতে চায় কে তাকে ঠেকাবে! আমাদের সৈন্যদল তো আমরা আভ্যন্তরিক বিরোধে ব্যবহার করব না। দশ বিশ বছর পরে এখনকার মহানেতারা থাকবেন না, তাঁদের বয়স হয়েছে। নতুন নেতাদের মধ্যে যদি বনিবনা হয়, ভালোই। নয়তো কেন্দ্রের সঙ্গে ঝগড়াঝাঁটি করে কেউ কেউ হয়তো স্বাতন্ত্র্যের ধ্বজা তুলবেন। কংগ্রেস ভেঙে গেলে এ রকম দুর্ঘটনা সত্যি সত্যি ঘটতে পারে। দূরদর্শীকে সেইজন্যে সাবধান হতে হয়।

ভাষাভিত্তিককে প্রশ্রয় না দেওয়ার আরো এক কারণ সীমানা নিয়ে গোলযোগ। বোম্বাই শহরটা কার ভাগে পড়বে? মাদ্রাজ শহরটা? হায়দরাবাদ শহরটা? জামশেদপুর শহরটা? ধানবাদ অঞ্চল? তুঙ্গভদ্রা অববাহিকা? এমনি অনেক মামলা উঠেছে ও উঠবে। মীমাংসা করতে করতে প্রাণ বেরিয়ে যাবে। আর কি কোনো মহৎ কাজ নেই সামনে? দ্বিতীয় পঞ্চবর্ষ পরিকল্পনা? দারিদ্র্যমোচন?

তা হলে কি ইতিহাস আমাদের আশা পূরণ করবে না ভাষাভিত্তিক

প্রদেশের ? এর উত্তর, হাঁ, যদি আমরা আপোসে রাজি হই। অর্থাৎ সীমানা নিয়ে গণ্ডগোল না করি। তার মানে কিছু পেয়ে কিছু ছেড়ে দিই। মোটা-মুটি ভাষাভিত্তিক হলেই কাজ চলে যায়। ষোল আনা ভাষাভিত্তিক বিনা দ্বন্দ্বে সম্ভব নয়। সুতরাং সংগত নয়।

তারপর যেসব বড়ো বড়ো কারখানা হচ্ছে সেসব তো কোনো এক প্রদেশের একচেটে সম্পত্তি নয়, সব প্রদেশের লোক সেখানে জুটবে ও খাটবে। ভাষাভিত্তিক অর্থহীন নয় কি ?

(১৯৫৫)

কাবুলীওয়ালা

ট্রেনে আলাপ। দিল্লীর ট্রেনে। ভদ্রলোক আমাকে তাজ্জব বানিয়ে দিয়ে বললেন, "আমি কাবুলী।"

কাবুলী ! তা কী করে হয় ! সাহেবী পোশাক পরা। ভাইকে ডাকছেন, "হরিজী।"

"হাঁ। তিন পুরুষ আগে আমরা কাবুলেই ছিলুম। সেখান থেকে আসা হয় কাশ্মীর। সেখান থেকে পাঞ্জাব। দেশ বিভাগের পর দিল্লী।" ভদ্রলোক ব্যাখ্যান দিলেন।

জানতে চাইলুম, "কাবুলে আপনারা কবে যান ? ক'পুরুষ আগে ?"

"আবহমান কাল আমরা কাবুলেরই অধিবাসী। বাইরে থেকে যাইনি। কেন, বিশ্বাস হয় না আপনার ? কাবুল তো হিন্দুরই দেশ ছিল।"

তখন আমার মনে পড়ল ইতিহাসের কথা। কাবুল ছিল হিন্দুদেরই দেশ, অবিকল লাহোরের মতো, পেশোয়ারের মতো। আমরা ভুলে গেলেও সেখানকার হিন্দুরা ভুলে যায়নি। এখনো তারা সেখানে আছে। সকলে নয় অবশ্য।

হিন্দু ভারত থেকে ভারতের বাইরে গেছে, একথা ঠিক নয় উত্তর পশ্চিমের বেলা।

হিন্দু ভারতেই ছিল। কিন্তু ভারত ছোট হয়ে গেল। এই যেমন ১৯৪৭ সালে। এমনি আরো কত বার। ইতিহাস অজ্ঞ শাস্ত্রান্ধ মন ভারতকে ছোট বলে ভাবতে অভ্যস্ত বলে অন্য ধারণা পোষণ করে।

ভারত বলতে আফগানিস্তানও বোঝাত পলাশীর অল্পদিন আগেও। এই যেমন পাকিস্তানও বোঝাত ১৯৪৭ সালের গোড়াতেও। দুঃখের বিষয় যাঁরা ছেলেদের জন্যে ইতিহাসের বই লেখেন তাঁরা এই সহজ সত্যটা জানেন না। ইংরেজ আমলের ভারতের মানচিত্র দেখে পূর্ব আমলের ভারতের সংজ্ঞা স্থির করেন। এক পুরুষ বাদে হয়তো হাল আমলের মানচিত্রখানা দেখে ভারতের সংজ্ঞা স্থির করা হবে। তখন ঢাকা চাটগাঁকে ভারতের বাইরে বলে ধরে নিয়ে কোনো কোনো পণ্ডিত গবেষণা করবেন যে হিন্দুরা ভারত থেকে পূর্ব

পাকিস্তানে গেছে।

তখন হয়তো এরোপ্লেনে কোনো সহযাত্রীর সঙ্গে কথা বলতে বলতে আমার নাতি (হয়ে থাকলে) শুনবে, "আমি ইসলামাবাদী।"

"ইসলামাবাদী! তা কী করে হয়! আপনার ভাই যে হরিপদ।"

"হাঁ, তিন পুরুষ আগে আমরা ইসলামাবাদেই ছিলুম। তার পরে…"

"কিন্তু ইসলামাবাদে আপনারা ক'পুরুষ আগে যান?"

"আবহমানকাল আমরা ইসলামাবাদেরই অধিবাসী। তার মানে চট্টগ্রামের।"

(১৯৫৫)

স্বপ্নের পর স্বপ্ন

এক জীবনে অনেক বার স্বপ্ন দেখা গেল। প্রথম বয়সে ছিল নৈরাজ্যের স্বপ্ন। রাজা নেই, মন্ত্রী নেই, কোটাল নেই, সওদাগর নেই, আদালত নেই, কারাগার নেই, ফাঁসি নেই, খুনজখম নেই, গুরু নেই, পুরোহিত নেই, প্রতিমা নেই, পূজারী নেই, শাস্ত্র নেই, অনুশাসন নেই, বিবাহ নেই, উত্তরাধিকার নেই, সম্পত্তি নেই, সঞ্চয় নেই। এতগুলো 'না'র পরেও যা থাকে সে এক ইউটোপিয়া। তার জন্যে চাই প্রেম ও মৈত্রী প্রতি মানবের অন্তরে। চাই সৃষ্টির নেশায় কাজ। চাই স্বতঃস্ফূর্ত সামঞ্জস্য। স্বভাবসিদ্ধ শৃঙ্খলা। অপরের জন্যে ভাবনা। আনন্দের সঙ্গে স্বার্থত্যাগ। সবাইকে নিয়ে বাঁচা, বাঁচতে জানা।

সংসারের সঙ্গে পরিচয় ঘটল। শেখা গেল "চাই" বললেই "পাই" হয় না। প্রেম, মৈত্রী, সৃষ্টির প্রেরণা ইত্যাদি সহজলভ্য নয়। মেলে সবই, কিন্তু দৈবে মেলে, বহু সাধনায় মেলে। তার উপর ভিত্তি করে সমাজ গড়া যায় না, রাষ্ট্র গড়া যায় না। এর পরে এলো বাস্তবের সঙ্গে মিলিয়ে আরেক স্বপ্ন। ডেমক্রাটিক লিবারল হিউম্যানিস্ট স্বপ্ন। যে স্বপ্ন গত পাঁচ শতাব্দী ধরে ইউরোপে আমেরিকায় ও ইদানীং এশিয়ায় অধিকাংশ জ্ঞানী গুণী ও কর্মীর চোখে অতীতের চেয়ে উজ্জ্বলতর ভবিষ্যতের প্রতিশ্রুতি নিয়ে উদিত।

কিন্তু দেশে দেশে শোষণ, বৈষম্য, বেকার দশা, সামাজিক অবিচার প্রত্যক্ষ করে মনে হলো এ স্বপ্নও বাস্তবের ধোপে টিকবে না। তখন এলো সাম্যবাদী ব্যবস্থার স্বপ্ন। যে স্বপ্ন এত দিনে অর্ধেক পৃথিবী জুড়ে বিপ্লব ঘটিয়েছে, বৈপ্লবিক পরিবর্তন এনেছে। যার প্রভাব বাকী অর্ধেকের উপরেও পড়েছে। ইংলণ্ডে আমেরিকায় প্রত্যেক কর্মক্ষম ব্যক্তিকে কর্ম জোগাতে বাধ্য করেছে। কর্মের জন্যে উপযুক্ত মজুরি দিতে প্ররোচিত করেছে।

কিন্তু মানুষের প্রাণের মূল্য কানাকড়িও নয়। যে কোনো দিন যে কোনো অজুহাতে যে কোনো মানুষকে সন্দেহমাত্র শূলে চড়িয়ে দিতে পারা যায়। বিচারকরা স্বাধীন নন, যো হুকুমের দল। বিবেকের বালাই নেই। প্রয়োজনই শেষ কথা। সেকালের হবুচন্দ্রের রাজ্যেও তো মুড়ি মিছরির এক দর ছিল।

লোকে পেট ভরে সন্দেশ খেতে পেত। কিন্তু সে যেন ফাঁসির খাওয়া। মোটা-সোটা মানুষ দেখলেই শূলে চড়ানো হতো। শেষে হবুচন্দ্র স্বয়ং শূলে চড়ালেন। প্রজারা বাঁচল।

যেখানে প্রাণের মূল্য নেই, বিবেকের প্রশ্ন নেই সেখানে যার খুশি সে সন্দেশ খেয়ে শূলে বসুক, আমার তাতে লোভ নেই। আমার স্বপ্নভঙ্গ হলো সতেরো আঠারো বছর আগে। এর পর এলো গান্ধীবাদী স্বপ্ন। যে স্বপ্ন প্রাণকে মহামূল্য জ্ঞান করে, অথচ শোষণকে অপরিসীম ঘৃণা করে। এই স্বপ্নের সামান্যমাত্র প্রয়োগ ভারতের জাতীয় সংগ্রামে হয়েছে। সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে প্রয়োগ বাকী। সে ভার নিয়েছেন বিনোবা ও জবাহরলাল নিজ নিজ জ্ঞান বুদ্ধি অনুসারে। এখনো হতাশ হবার মতো কারণ দেখা দেয়নি। বহু নিঃস্বার্থ কর্মী এখনো কর্মতৎপর। নতুন কর্মীরও অভাব ঘটেনি।

কিন্তু এই কয় বছরে আমি হাড়ে হাড়ে উপলব্ধি করেছি যে দেশকে আধুনিক করাও সঙ্গে সঙ্গে দরকার। পুরোনো বোতলে নতুন মদ বা নতুন বোতলে পুরোনো মদ কোনোটাই ভালো নয়। জীর্ণ সংস্কারে আমার একটুও আস্থা নেই। গান্ধীবাদী চিন্তাধারাও জীর্ণ সংস্কারের ঊর্ধ্বে উঠতে পারেনি। মুখে সকলেই বলেন বিপ্লব ঘটাবেন শান্তিপূর্ণ উপায়ে। কিন্তু বিপ্লবের অ আ ক খ জানেন না, জানতে চান না। বিপ্লব কথাটা এসেছে ফরাসী বিপ্লব থেকে। পতঞ্জলির যোগসূত্র বা ব্যাসদেবের ভগবদ্‌গীতা থেকে নয়। ইতিহাস থেকে। ধর্মশাস্ত্র থেকে নয়। ফরাসী বিপ্লবের আগে মানুষের মন বহু পরিমাণে মুক্ত হয়েছিল। মুক্তি দিয়েছিল বিজ্ঞান ও দর্শন। নব্য বিজ্ঞান ও নব্য দর্শন। রেনেসাঁসের সঙ্গে পরিচয় গভীর না হলে, রেফর্মেশনের সঙ্গে কিছুদূর না গেলে বিপ্লব ঘটে না, ঘটানো যায় না। আমাদের দেশে কতক পরিমাণে মন তৈরি করে গেছেন রামমোহন থেকে রবীন্দ্রনাথ। বাইরে যাঁরা চিন্তা করছেন তাঁদের লেখা পড়ে মন তৈরি হয়েছে কলেজে বিশ্ববিদ্যালয়ে। ইউরোপীয় শিক্ষা এদিক থেকে বিপ্লবভিত্তিক।

এর মানে এ নয় যে আমি মার্ক্‌স্‌বাদী। কেন নই তার সব চেয়ে বড়ো কারণ আমি প্রাণকে মহামূল্য মনে করি। বিবেককে পরম মর্যাদা দিই। উদ্দেশ্য ভালো হলে উপায়ের সাত খুন মাফ এমন কথা যারা বলে তাদের সঙ্গে আমার গোড়াতেই গরমিল। উপায় শুদ্ধ রাখতেই হবে, এ না হলে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে না। যা হবে তা গায়ের জোরে যত দিন পারে খাড়া থাকবে। গায়ের জোর কম পড়লে একটু একটু করে আপোস করবে, আপোস করতে করতে অন্য জিনিস হয়ে যাবে। এর মধ্যেই সাম্যবাদ থেকে সাম্য বাদ পড়েছে।

উপায় যদি অহিংস না হয় তবে গণতান্ত্রিক হওয়া আবশ্যক। অর্থাৎ গণতন্ত্রী রাষ্ট্র পার্লামেণ্টে ভোট নিয়ে আইনসম্মত জোর খাটাবে, তার উপর আপীল থাকবে নির্বাচকদের কাছে। নির্বাচকরা রায় দিলে সেই অনুসারে কাজ হবে।

(১৯৫৫)

লেখার কথা

সে বয়স আমার অনেক দিন আগে অতীত হয়েছে যখন ছাপার হরফে নিজের নাম দেখতে পেলে কৃতার্থ হতুম। আর টাকা যদিও নিই তবু টাকার জন্যে লিখিনি। লিখিনে। লিখব না। তা হলে কেন লিখি ?

এ প্রশ্ন আমাকে একদা অস্থির করে তুলেছিল। দেখা গেল অনেক সময় ওটা আমার অপ্রিয় কর্তব্য। যেখানে অন্যায় হচ্ছে, কেউ মুখ ফুটে প্রতিবাদ করছে না, সেখানে আমাকেই লেখনীর মুখে দু'কথা বলতে হবে।

আমার অনেক লেখা বিশুদ্ধ কর্তব্যবোধ থেকে। কিন্তু সমস্যা বেশী দিন থাকে না, সমাধান এক ভাবে না এক ভাবে হয়ে যায়। না হলেও মানুষ তা নিয়ে জ্বালাতন হয় না। আমার লেখার তা হলে শাশ্বত মূল্য কী। শুধুমাত্র ঐতিহাসিক মূল্য নিয়ে আমার কোন তৃপ্তি ?

এর থেকে এলো আরেক রকম লেখা যা কর্তব্যের অনুরোধে নয়। যার উৎস আনন্দ। অহেতুক আনন্দ। পিওর ডিলাইট। যে লেখে তারও আনন্দ, যে পড়ে তারও। মহাকালেরও আনন্দ তাকে সঞ্চয় করে, সঞ্চিত সুধার মতো বার বার আস্বাদন করে।

একবার এ রকম লেখা যার হাত দিয়ে হয়েছে সে কখনো সাধ করে আর কিছু লিখতে চাইবে না। আমার ডান হাত চিরকালের মতো পিওর ডিলাইটের জন্যে রাখা। কর্তব্যের জন্যে বাম হাত।

চল্লিশ বছর বয়স যখন হলো তখন দেখলুম আমাকে লিখতেই হবে সব প্রয়োজনের ঊর্ধ্বে উঠে ব্রহ্মাস্বাদের জন্যে, মুক্তির জন্যে। এ ব্রহ্মাস্বাদ শুধু শিল্পী বা কবিদের পক্ষেই সম্ভব। এ মুক্তি শুধু স্রষ্টাদের জন্যে।

সে সময় আমার প্রতীতি হলো যে আমার আসল কাজ কবিতায়। কবিতা না লিখলে আমার ব্রহ্মাস্বাদ বা মুক্তি পরিপূর্ণ হবে না। কিন্তু তার আগে আমাকে উপন্যাসের পাট চুকিয়ে দিতে হবে। উপন্যাসের কাজ কমিয়ে আনতে হবে। যা না লিখলে নয় তাই লিখে বাকীটা অলিখিত রেখে যাব। নইলে আমার কবিতা হবে না।

একদিন কবিতা লিখব বলে ঊর্ধ্বশ্বাসে উপন্যাস রচনার পরিকল্পনা করেছিলুম। কিন্তু দেশের জীবনে এলো ঘোর দুর্দৈব। এর জন্যে আমি তৈরি ছিলুম না। উপন্যাস লেখা বার বার পেছিয়ে যেতে থাকল মনের অপ্রবৃত্তি থেকে। এখন প্রবৃত্তি হয়েছে। এখন এক নিঃশ্বাসে উপন্যাস লিখতে চাই। দশ রকম ফরমায়েসী লেখার জন্যে সময় বা শক্তি বা অভিরুচি নেই। লেখা যাঁরা চান তাঁরা নিরাশ হলে আমি নিরুপায়। উপন্যাস শেষ হতে সাত আট বছর লাগবে। মাঝে মাঝে দম নেব। সেই ফাঁকে কিছু কিছু অন্য লেখা লিখতে পারি। কিন্তু ধ্যানভঙ্গ করে নয়। শরবৎ তন্ময়ো ভবেৎ।

(১৯৫৫)

ছড়ার কথা

বিশ বছর আগে কবিতা লিখতে লিখতে আমার মনে হলো কবিতার ভাষা ঠিক না হলে কবিতা ঠিক হবে না। ভাষা নিয়ে দশ বছর খাটতে হবে আমাদের কবিদের। দেখলুম, বাংলা গদ্যের ভাষার বিস্তর পরিবর্তন হয়েছে, কিন্তু পদ্যের ভাষার তেমন কিছু হয়নি। এ ভাষা রবীন্দ্রনাথের বাল্যে যেমন ছিল বার্ধক্যেও মোটের উপর তেমনি রয়ে গেছে। ছন্দ দিয়ে, সংস্কৃত শব্দ দিয়ে এ সত্য ঢাকা পড়েছিল, আর ঢাকা থাকছে না। অনেকেই সেইজন্যে পদ্যের মতো করে সাজিয়ে ছদ্মবেশী গদ্য লিখছেন। ভাবছেন মানুষের কানকে ফাঁকি দিয়ে যা লিখবেন তা কবিতা বলে গণ্য হবে, কবিতার মতো আনন্দ দেবে। এই যে ফজলির বদলে ফজলিতরো এর মধ্যে সমাধানের ইঙ্গিত নেই। যা আছে তা সমস্যা থেকে পলায়নের কৌশল।

কবিতাকে পদ্য রেখে, পদ্যছন্দের শাসন মেনে তার ভাষা বদলে দেওয়া যায় কি না এই হলো তখনকার দিনে আমার প্রথম জিজ্ঞাসা। সঙ্গে সঙ্গে আরেকটা জিজ্ঞাসা এল। ছন্দ তো যথেষ্ট হয়েছে, এবার একটু সুর এলে মন্দ হয় না। সুর কিন্তু গানের সুর নয়। গানের সুর সঙ্গীতের রাজ্যের ব্যাপার। সঙ্গীত আমার পক্ষে পররাজ্য। আমি চাই কবিতার সুর, কথার সুর। গায়কের সাহায্য না নিলেও সে সুর কানের ভিতর দিয়ে মরমে পশে।

লক্ষ করলুম অমিয় চক্রবর্তী এ লাইনে কিছু কাজ করছেন, কিন্তু তাঁর কবিতার ছন্দ পদ্যছন্দ নয়, গদ্যছন্দ ; নাচন নয়, হাঁটন। আর করছেন জীবনানন্দ দাশ। তাঁর ছন্দ গদ্যছন্দ নয়, পদ্যছন্দ। একটা প্রছন্ন সুর তাঁর কবিতায় গুন গুন করে। বুদ্ধদেবকে প্রথমে কিছু কাজ করতে দেখা গেল। কিন্তু তিনি তখন ফ্রী ভার্স নিয়ে পরীক্ষারত। সেখানে তাঁর ভাষা সত্যি নতুন। কিন্তু পদ্যে হাত দিলেই সেই পুরনো বোল বেরিয়ে আসে।

রবীন্দ্রনাথ বোধ হয় উপলব্ধি করেছিলেন কোথায় কী বিগড়েছে। তাই ছড়ায় মন দিতে চেয়েছিলেন। লেগে থাকলে সেই মার্গে সমাধান পাওয়া যেত। কিন্তু তিনি তো বাঁচলেন না। বড়ো রকম পরীক্ষা চালাবার মতো বয়স তাঁর নয়। বিশেষত তাঁর হাত যখন ছবির কাছে বাঁধা। আমার সঙ্গে একদিন কথাপ্রসঙ্গে বললেন, ওহে, ছড়া লেখ। আমিও লিখছি। আমার তখন চাকরির ঝামেলার উপর বৃহৎ উপন্যাসের ঝঞ্ঝাট। আমি তো কেবল কাহিনী বলে খালাস হইনে, বাক্যের পর বাক্য বানাই। বাক্য ঠিক না হলে আমার লেখাই এগোয় না। একথা শুনে রবীন্দ্রনাথ বললেন, অমন খুঁতখুঁত করলে তুমি কোনোদিন ঔপন্যাসিক হবে না, উপন্যাস লেখার রীতি ও নয়।

ঠিক ছড়া না হলেও লিমেরিক ও ক্লেরিহিউ গোটা কতক লিখেছিলুম ছেলেদের জন্যে। ছড়ার কথা ভাবিনি। রবীন্দ্রনাথের ছড়াও আমার কানে ছড়ার মতো লাগেনি। ছড়ার লাইন ও ভাবে শেষ হয় না। ও ধাঁচটাই ছড়ার নয়। কিন্তু এ নিয়ে কারো সঙ্গে তর্ক করার ইচ্ছা বা সময় ছিল না আমার।

আমি যেটুকু অবকাশ পেতুম উপন্যাস গঠনে নিয়োগ করতুম। ওটা একপ্রকার নির্মিতি। ছড়ার আর্জি এল হঠাৎ একদিন বুদ্ধদেববাবুর চিঠি থেকে। "এক পয়সায় একটি" সিরিজের জন্যে তিনি ষোলোটি কবিতা চেয়েছিলেন। ছড়া নয়। আমি তো এক কথায় 'নেই' বলে দিলুম। তারপর এক আশ্চর্য ঘটনা ঘটল। এক দিনেই দশ-বারোটি ছড়া তৈরি হয়ে গেল। বুদ্ধদেববাবুকে পাঠিয়ে দিলুম। বই হলো আরো কয়েকটি রচনা জুড়ে। এর পর থেকে ছড়ার চাড় এল। ছোট ও বড়ো উভয়ের জন্যে অনেক লিখতে হলো।

কিন্তু সে এক বিচিত্র প্রেরণা। আমার আসল লক্ষ্য শিক্ষিত আধুনিক ব্যঙ্গরসিক মন নয়। কিংবা কল্পনাপ্রবণ শিশু মন নয়। আমি চেয়েছিলুম সেইভাবে আমার ভাত-কাপড়ের ঋণ শোধ করতে। যারা আমাকে খাইয়ে পরিয়ে বাঁচিয়ে রেখেছে তাদের হাতে "ক্যাশ" নয়, "কাইন্ড" দিতে। ঐ ভাবে যা গড়ে উঠবে তার একপ্রকার জনসাহিত্য বা লোকসাহিত্য। গণসাহিত্য কথাটা আমার ভালো লাগেনি। অবশ্য একজনের চেষ্টায় কতটুকুই বা হবে! এ কাজ একাধিকের। শতাধিকের। আমি শুধু আমারি কর্তব্যটুকুর দায়িত্ব নিয়েছি। এ দায়িত্ব সীমাবদ্ধ। জনগণের হৃদয়ে যদি সামান্যতম স্থান পাই, আমার একটা ছড়াও যদি তাদের মনে গাঁথা থাকে, কানে কানে সঞ্চারিত হয়, মুখে মুখে পুরুষানুক্রমিক হয় তা হলেই আমি ধন্য। বই হবে, বিক্রি হবে, মুনাফা পাওয়া যাবে এসব তখন আমার চিন্তার বাইরে। মডেল হিসাবে আমি নিয়েছিলুম ছেলে-ভোলানো ছড়া। আগডুম বাগডুম ইত্যাদি। যার বয়স হাজার বছরেরও বেশী। একদিকে জনসাধারণ, অন্যদিকে নিরবধি কাল, দুই দিকে দুই মালিক আমাকে কান ধরে ওঠ-বস করিয়েছে।

এখন ছড়ায় তেমন রুচি নেই আমার। ব্যালাড লিখতে পারলে কৃতার্থ হই।

২৯শে সেপ্টেম্বর ১৯৫৫

(শ্রীপূর্ণেন্দুশেখর পত্রীকে লিখিত পত্র)

শান্তিনিকেতনে কেন থাকি

যুগ আমার জনক। দেশ আমার জননী। উভয় ধারাই আমার সৃষ্টিতে থাকবে। উভয়ের প্রতি আমার আকর্ষণ।

ইউরোপের আধুনিক কালের ইতিহাস—বিশেষ করে ফরাসী বিপ্লবের ইতিহাস—যখন পড়ি তখন আপনাকে তার মধ্যে স্থাপন করি। আমিও তার মধ্যে ছিলুম, যেমন ছিলুম পিতার মধ্যে। সে যেন আমার আপনার ইতিহাস। শেলী কীটসের কবিতা। সে যেন আমার আপন কবিতা। টলস্টয় রলাঁর উপন্যাস। সে যেন আমার আপন উপন্যাস। প্রথম দর্শনেই চিনেছি। একটুও অচেনা মনে হয়নি।

তেমনি দোলা দেয় আমাকে বাংলার বাউল কীর্তন ভাটিয়ালি রূপকথা ছড়া গীতিকা লোকগাথা। আউল বাউল বৈষ্ণবদের দেখলে, তাদের গান শুনলে, খোল করতাল আনন্দলহরী শুনলে, আমি আত্মহারা হয়ে যাই। আধুনিক শিক্ষিত পুরুষ আমি, আমার কেন এ মধ্যযুগ প্রীতি ? আসলে এটা মধ্যযুগের টান নয়, বাংলার মাটির টান।

এরা আমার আপন জন। আমি এদের একজন। কিন্তু যখনি এদের সঙ্গে এক হয়ে যেতে চাই তখনি বাধা পাই। কেননা আমি তো বৃন্দাবন ছেড়ে মথুরায় চলে এসেছি। আর কি সেখানে ফিরে যেতে পারি! ওরাই আমার কাছে আসে। মনে পড়িয়ে দেয়। বিষাদ জাগায়। মথুরার শান্‌বাঁধানো ঘাটে গোকুলের লোকের পদধ্বনি মিথ্যা লাগে। ওদের এখানে মানায় না। ওরা ডাক দিয়ে যায়। আমি শুনে আকুল হই।

এই কলকাতাই সেই মথুরা। এই নাগরিক সভ্যতাই সেই মাথুর। এর থেকে ফিরে যেতে চাইলেও ফিরে যাওয়া সহজ নয়। তাই সুদিনের অপেক্ষায় থাকি। অবশেষে ফিরতে চেষ্টা করি বৃন্দাবন অভিমুখে। এক পা এক পা করে ফিরি। এক দিনে পারিনে। একসঙ্গে পারিনে। কিন্তু পারি একটুখানি। আপাতত এই আমার পক্ষে অনেক। এই শান্তিনিকেতন।

শান্তিনিকেতন হচ্ছে মথুরা ও বৃন্দাবনের মাঝখানকার গাছতলা। এখানে একটু জিরিয়ে নিতে হয়। জিরিয়ে নিয়ে আমার বৃন্দাবনের পথে চলতে হয়। এখানে আমার চার বছর কাটল। আরো ক'বছর কাটবে কে জানে! হয়তো আট বছর। বড়ো উপন্যাসের বৃহদারণ্যক সমাপ্ত না করে কোথাও নড়তে ইচ্ছা নেই। উপনিষদের পক্ষে আদর্শ স্থান এই শান্তিনিকেতন। উপনিষদ্‌ থেকেই এর উদ্‌ভব।

তার পর আমার যুগটাও এখানে সংহত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ বরণ করে এনেছেন আধুনিক ইউরোপকে, চীনকে, ইরানকে। একনীড় করেছেন বিশ্বকে। আধুনিক বিশ্বকে। সেই নীড়ে বাস করে আমি সবাইকে একাধারে পাচ্ছি। আধুনিক যুগ আমাকে ঘিরে রয়েছে। এর থেকে প্রস্থান করতে আমার ত্বরা নেই।

(১৯৫৫)

রসের সাধনা

ঝড়ঝাপটার যুগে পদপাতের ছন্দ ঠিক থাকে না। মানুষকে উড়িয়ে নিয়ে যায়, গহ্বরে নিয়ে ফেলে। বাতি নিবে যায়। কবে ঝড়ঝাপটার অবসান হবে তত দিন অপেক্ষা করাও চলে না। বয়স ফুরিয়ে যায়। অপেক্ষার সময়টা বন্ধ্যা।

স্থিতি দিতে পারে, ছন্দ দিতে পারে চিরন্তন সত্য, eternal verities, তার সময় অসময় নেই। সব সময় তা আছে। ঝড়ে বাদলে গহ্বরে অতলে।

যারা ধার্মিক তারা চিরন্তনকে বলে ধর্ম।
যারা প্রেমিক তারা বলে প্রেম।
যারা শিল্পী তারা বলে রস।
আমরা শিল্পী। আমরা রসকে চিরন্তন বলে জানি।

"......................আমি ঋতুরাজ—
জরা মৃত্যু দুই দৈত্য নিমেষে নিমেষে
বাহির করিতে চাহে বিশ্বের কঙ্কাল—
আমি পিছে পিছে ফিরে পদে পদে তারে
করি আক্রমণ, রাত্রিদিন সে সংগ্রাম।
আমি অখিলের সেই অনন্ত যৌবন।"...(চিত্রাঙ্গদা)

আমরা শিল্পীরাও তাই।

নিজেদের মধ্যে সেই অনন্ত যৌবনকে অনুভব করতে পারাই রসের সাধনা। এ সাধনা ঝড়ঝাপটার মাঝখানেও চলতে পারে। চলা উচিত। এর ফলে ছন্দ ফিরে আসে বা ঠিক হয়ে যায়। মানুষ উড়ে যায় না, গহ্বরে পড়ে না।

যে দেশের শিল্পীরা সাধনারত সে দেশের বন্ধ্যাত্ব নেই।

১৯৫৫

রাজ্য ভাঙা গড়া

বয়স যখন অল্প ছিল তখন আমি কিছুতেই বুঝে উঠতে পারতুম না দেশের লোক কেন সর্বব্যাপী দারিদ্র্যের হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্যে হাতে হাত মেলায় না, কেন হিন্দু মুসলমানে হাতাহাতি করে। আর সকলের মতো আমিও ইংরেজ সরকারের 'ভাগ করো আর শাসন করো' নীতির ঘাড়ে সবটা দোষ চাপিয়ে দিয়ে আত্মপ্রসাদ অনুভব করেছি।

এক বার এক মুসলমান সাহিত্যিকের লেখা পড়ে আমার চোখ ফোটে। তিনি যা বলতে চেয়েছিলেন তার মর্ম এই যে হিন্দুশাসিত ভারতে মুসলমানের আইডেনটিটি থাকবে না। কথাটা আমার মনে লাগে। কিন্তু কথাটা রাগের কথা নয়। তিনি রাগ করে বলেননি। কথাটা ইংরেজের শেখানো কথা নয়। মুসলমানের প্রাণের কথা। সেইজন্যেই আমি এত ব্যথা বোধ করি। বন্ধু যদি বন্ধুকে বলে, তোমার সঙ্গে থাকলে আমার আইডেনটিটি থাকবে না, তখন এর উপরে আর কথা চলে না।

তখন আমার একমাত্র আশা হলো এই যে, মুসলমান নিজেকে সব সময় মুসলমান ভাববে না, অনেক সময় বাঙালী ভাববে, ভারতীয় ভাববে, চাষী ভাববে, মজুর ভাববে। কিন্তু ঘটনার গতি বিপরীত দিকে গেল। ক্রমে মুসলমান তো মুসলমান, হিন্দুও উৎকট ভাবে সাম্প্রদায়িক হয়ে উঠল। নোয়াখালীর পর আমিও কিছুদিনের জন্যে হয়েছিলুম। আমার অশুদ্ধ ভাবনার পরিণাম

যে দেশবিভাগ তা কি তখন জানতুম ! দেশবিভাগের সঙ্গে সঙ্গে আমার মাথা থেকে সাম্প্রদায়িকতার ভূত নামে। বুঝতে পারি যে এ পাপ আমাদের সকলের। এর জন্যে শুধু ইংরেজ বা শুধু মুসলিম লীগ দায়ী নয়। এর প্রায়শ্চিত্ত চাই। আর কেউ না করে তো আমি একা করব।

এই সাত আট বছরে শুদ্ধ চিন্তার সুফল ফলতে আরম্ভ করেছে। এখন এটা আমার কাছে স্বচ্ছ যে মানুষের কাছে তার আইডেনটিটি সত্যি খুব মূল্যবান। কেউ যদি নিজেকে সব সময় মুসলমান ভাবে তা হলে হিন্দুশাসিত ভারত সত্যি তার কাছে আত্মবিলুপ্তিকর। এর প্রতিকার হচ্ছে. সব সময় নিজেকে মুসলমান না ভাবা। কিংবা ভারতকে হিন্দুশাসিত হতে না দেওয়া। আমাদের মুসলমান বন্ধুরা যদি বাঙালী বা ভারতীয় বলে আপনাদের ভাবতেন কিংবা আমরাই যদি ভারতকে সেক্যুলার স্টেট করার জন্যে প্রাণপাত করতুম তা হলে দেশবিভাগ হতো না। স্বাধীন হওয়ামাত্র সারা দেশের সব ক'টা হাত দারিদ্র্যমোচনে নিয়োজিত হতো।

এখনো বহু লোকের বিশ্বাস ভারত হিন্দুশাসিতও হবে, অখণ্ডও হবে, তাতে মুসলমান শিখ খ্রীস্টান প্রভৃতির আইডেনটিটিও থাকবে। এঁদের সঙ্গে তর্ক করতে করতে আমি ক্লান্ত। আর এ নিয়ে লিখতে চাইনে।

এ যেমন গেল এক প্রকার আইডেনটিটি তেমনি আরেক প্রকার আইডেনটিটি আছে। বাঙালী বা মরাঠা, তেলুগু বা তামিল। কোনো একটি রাজ্যের অধিকাংশ লোক যদি হয় হিন্দীভাষী তবে সেখানে বাঙালীর মনে কারণে অকারণে সহজেই শঙ্কা জাগে আত্মবিলুপ্তির। বিহার প্রভৃতি ভূভাগের বাঙালী যা বলছে তা অবিভক্ত ভারতের সেই মুসলমান সাহিত্যিকের মুখের কথা। 'আমাদের আইডেনটিটি থাকবে না।'

প্রতিকার কী ? প্রতিকার হচ্ছে নিজেকে সব সময় বাঙালী না ভাবা। ভারতের মাটিতে ভারতীয় ভাবা, হিন্দুর সমাজে হিন্দু ভাবা, সমশ্রেণীর লোকের সঙ্গে সমশ্রেণীর লোক ভাবা। এ যেমন বাঙালীর কর্তব্য তেমনি বিহার প্রভৃতি রাজ্যের কর্ণধারদের কর্তব্য রাজ্যকে কোনো একটি ভাষার দ্বারা শাসিত না করা। আমাদের শাসনতন্ত্র এমন কথা কোথাও বলেনি যে এক একটি রাজ্য এক একটি ভাষার জন্যে বরাদ্দ বা এক একটি ভাষাভাষীর জন্যে। 'ভাষাভাষী' শব্দটা আমার পছন্দ নয়, কিন্তু বাঙালীকে আমি জাতি বলতে পারব না, বললে ভারতীয়কে কী বলব ? ইংরেজীতে নেশন বললে ভারতীয়কে বলা যেতে পারে, বাঙালীকে নয়। সাব-নেশন শব্দটা চালু হলে মন্দ হতো না, সত্য অনেকটা সেই শব্দটার সঙ্গে মেসে। কিন্তু আমাদের শাসনতন্ত্রে তার স্বীকৃতি নেই। ভারতের শাসনতন্ত্রে বাংলা উপস্থিত, কিন্তু বাঙালী অনুপস্থিত। যারা বাংলা ভাষায় কথা কয় এমন কতকগুলি ভারতীয় পশ্চিমবঙ্গে বাস করে, অন্যান্য প্রান্তেও। সমগ্র ভারত রাষ্ট্রই এদের হোমল্যাণ্ড। পশ্চিমবঙ্গ নামক ভূখণ্ডকে এদের হোমল্যাণ্ড বলে স্বীকার করা হয়নি।

বাঙালীর সম্বন্ধে যা বলা গেল তা মরাঠা গুজরাতী ইত্যাদি প্রত্যেকের

সম্বন্ধে বলা যায়। নেশনের ভিতরে নেশন বা সাব-নেশন স্বীকার করা অতি গুরুতর ব্যাপার। এর পরিণাম যে কত দূরে গড়াবে তা কেউ দেখতে পায় না। ইতিমধ্যেই আমরা গোয়ালপাড়া, বোম্বাই প্রভৃতি অঞ্চলের খবর থেকে অনুমান করছি যে ধোঁয়া থাকলে আগুন থাকে। প্রজাতন্ত্রে প্রজার ইচ্ছাই প্রবল। তাই অন্ধ্র রাজ্য গঠন করতে হলো শাসনতন্ত্র থেকে অলক্ষে সরে গিয়ে। ভাষার সঙ্গে রাজ্যকে একাকার করে ভাবতে ভাবতে আজ আমরা যেখানে পৌঁছেছি সেখানে দেখছি এক একটি ভাষার জন্যে এক একটি রাজ্য। প্রজার ইচ্ছায় কর্ম। এও অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু এক একটি ভাষাভাষী যদি এক একটি নেশনের মতো ব্যবহার করে তা হলে সংখ্যালঘু বাঙালী ইত্যাদির পক্ষে আইডেনটিটি রক্ষা করা শক্ত হবে। তখন পুরুলিয়া কিষণগঞ্জ ইত্যাদি অঞ্চলের তাৎপর্য আলসেস লোরেন ইত্যাদির মতো হবে। যা নিয়ে ইউরোপে যুদ্ধবিগ্রহ ঘটে গেল, আবার ঘটতে পারে।

এই মুহূর্তে আমাদের চোখের সুমুখে যে বীজ বপন করা হচ্ছে তা বিষবৃক্ষের বীজ। এর ফল ফলবে বিশ ত্রিশ বছর পরে যখন কেউ আমরা থাকব না। এমন সুন্দর একখানা শাসনতন্ত্র বহু ভাগ্যে মেলে। তাকে তছনছ করে কতকগুলো নেশন-স্টেট বা সাব-নেশন-স্টেট তৈরি করে দিলে কোন সমস্যার সমাধান হবে?

কথাটা আরো পরিষ্কার করে বলি। আমাদের অনেকগুলি ভাষা, অনেকগুলি রাজ্য, অনেকগুলি সম্প্রদায়, কিন্তু কোনোটার সঙ্গে কোনোটার আইডেনটিফিকেশন আমাদের শাসনতন্ত্রের অভিপ্রেত নয়। আমাদের শাসনতন্ত্র-প্রণেতারা একটিমাত্র নেশন সৃষ্টি করেছেন, একটিমাত্র জাতির অস্তিত্ব স্বীকার করেছেন। একাধিক নেশন বা সাব-নেশন যদি স্বীকার করতেন তা হলে গোটা শাসনতন্ত্রটাই অন্যরূপ হতো। ভাবাবেগের দ্বারা চালিত হয়ে আমরা যা দাবি করছি তা পনেরো ষোলটি সাব-নেশন। তার থেকে কালক্রমে পনেরো ষোলটি নেশন জন্মাবে, এ আশংকা অমূলক নয়। এর প্রতিকার কোনো রাজ্যকেই কোনো একটি ভাষার বা ভাষাভাষীর সঙ্গে এক করে না দেখা, না ভাবা। অর্থাৎ পশ্চিমবঙ্গ কেবল বাঙালীর নয়, বাঙালীমাত্রের নয়। বিহার কেবল বিহারীর নয়, বিহারীমাত্রের নয়। মহারাষ্ট্র বলে যদি কোনো রাজ্য গড়া হয় তবে কেবল মরাঠার নয়, মরাঠামাত্রের নয়। কর্ণাটক বলে যদি কোনো রাজ্য গড়া হয় তবে তা কেবল কন্নাডিগের নয়, কন্নাডিমাত্রের নয়।

কিন্তু এক হাতে ভাষাভিত্তিক রাজ্য গড়ে আর-এক হাতে ভাষাভাষীর প্রাধান্য রোধ করা যায় কি? কে রোধ করবে? কেন্দ্রীয় সরকার কি সর্বশক্তিমান? পার্লামেণ্ট কি সর্বতোভাবে নিরপেক্ষ? সেখানে বিহারী ব্লক আছে, হিন্দীভাষী ব্লক আছে। আরো অনেকগুলো ব্লক আছে। দর কষাকষি, বল কষাকষি নিত্য লেগে আছে ও থাকবে। সংখ্যালঘুদের স্বার্থ রক্ষা হয়তো সম্ভব, কিন্তু আইডেনটিটি আরো গভীর স্তরের কথা। আইডেনটিটি থাকল কি না সংখ্যালঘুরাই বোঝে, আর কেউ বুঝবে না। বুঝতে হলে দরদ থাকা চাই।

দরদ অতি দুর্লভ বস্তু। তা যদি না হতো পূর্ববঙ্গ থেকে এখনো হাজার হাজার লোক চলে আসত না। কেবলমাত্র অভাবের তাড়নায় লোকে ভিটেমাটি ছাড়ে না।

তা আমরা তো আরো কোটি কোটি শরণার্থীর জন্যে ক্ষেত্র প্রস্তুত করে রাখছি। পাঁচ বছর পরে লক্ষ লক্ষ গুজরাতী মহারাষ্ট্র থেকে পালাবে, লক্ষ লক্ষ মরাঠা গুজরাত থেকে। অনবরত লোক চলাচল করতে করতে একটা হবে বিশুদ্ধ মহারাষ্ট্র, অপরটা বিশুদ্ধ গুজরাত। তার পরের ধাপ হচ্ছে সাব-নেশন থেকে নেশন হয়ে ওঠা। আবার দেশবিভাগ। অশুদ্ধ চিন্তার ফল অশুভ না হয়ে পারে না। অস্ত্র দিয়ে তাকে ঠেকানো যায় না। গেলে পাকিস্তান মেনে নেওয়া হতো না। প্রাদেশিকতা সাম্প্রদায়িকতার চেয়ে কোনো অংশে কম বলবান নয়। ইউরোপ যে খণ্ড খণ্ড হয়ে গেছে, এখনো রয়েছে, এর মূলে প্রাদেশিকতাই ছিল ও রয়েছে। আমাকে দুজন ইংরেজ বন্ধু সতেরো আঠারো বছর আগে সতর্ক করে দেন। বলেন, "আমরা খ্রীস্টেনডমকে খণ্ড বিখণ্ড করে যে ভুল করেছি তোমরা ভারতবর্ষকে খণ্ড বিখণ্ড করে সেই একই ভুল করতে যেয়ো না।" তখন আমাদের কথাবার্তা চলছিল প্রাদেশিকতা নিয়ে। আমি তখন আমল দিইনি। কিন্তু ধর্মের নামে দেশবিভাগ ঘটে যাবার পর থেকে আমিও ভাবতে আরম্ভ করেছি যে ভাষার নামেও দেশবিভাগ ঘটতে পারে, ঘটা বিচিত্র নয়।

এই দুঃসম্ভাবনার জন্যে মনটাকে প্রস্তুত করে তার পর যা করতে চাও করো। বহু তপস্যায় আমরা দেশকে স্বাধীন করতে পেরেছি। দেশ অখণ্ড হলে আরো সুখী হতুম, কিন্তু যা হয়েছে তার চেয়েও খণ্ডিত হতে পারত। যাতে না হয় তার জন্যেও তপস্যা করতে হবে। এ তপস্যা আমাদের সকলের। মরাঠার গুজরাতীর বাঙালীর বিহারীর। কিন্তু এই মুহূর্তে আমাদের মনে হচ্ছে এ তপস্যা শুধু কয়েকজন মহানায়কের। তাঁরাই ভারতীয়, আর সকলে বাঙালী বা বিহারী, মরাঠা বা গুজরাতী। ভারতীয়দের সংখ্যা হঠাৎ এত কমে গেল কী করে? মাথার উপরে ইংরেজ নেই বলে? ঘরের বাইরে পাকিস্তান দুর্বল বলে? বহু দূরের লোক রাশিয়া ও চীন সহানুভূতিশীল বলে? জানিনে কেন, কিন্তু দেখে শুনে মনে হয় দারিদ্র্য নেই, ব্যাধি নেই, অশিক্ষা নেই, আছে কেবল ভাষা এবং তার জন্যে চাই ভূখণ্ড।

তা বলে আমি এমন কথা বলব না যে রাজ্যসংখ্যা যত কম হয় তত সমৃদ্ধি বা তত সুশাসন। রাজ্যসংখ্যা আটাশ থেকে আঠারোয় দাঁড় করালে দেশ অমনি ধনধান্যে ভরে উঠবে এটা কুসংস্কার। আমার বিশ্বাস ঠিক উলটো। আমি চাই বিকেন্দ্রীকরণ। তা হলে যে খরচটা কয়েকটি মাত্র জায়গায় হচ্ছে সেটা সব জায়গায় ছড়িয়ে যাবে। দিল্লী কলকাতা বোম্বাই প্রভৃতির তেলা মাথায় তেল ঢালার নাম উন্নয়ন নয়। এসব শহর থেকে খরচের মোহানা ঘুরিয়ে দিতে হবে, তা হলে গ্রামগুলো অঞ্চলগুলো জল পেয়ে বাঁচবে। ছিটেফোঁটা দিয়ে তাদের বাঁচিয়ে রাখা যাবে না। অনেকে তো ইতিমধ্যে গ্রামের হাল ছেড়ে দিয়ে শহরকেই ভারতের ভবিষ্যৎ বলে ভাবতে অভ্যস্ত হয়েছেন। মহাপণ্ডিত এঁরা, এঁদের

সঙ্গে তর্ক বৃথা। এঁদের কপালে মুষলপর্ব আছে। আপাতত এঁদের দ্বারা দ্বারকালীলা।

বিকেন্দ্রীকরণের আদর্শ সামনে রেখে গোটা পঞ্চাশ অঙ্গরাজ্য সৃষ্টি করাই আমার স্বপ্ন। ভাষা অনুসারে নয়, আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য অনুসারে। পশ্চিমবঙ্গ আরো ভাঙবে, বিহার তো তিন ভাগ হবে। আসাম তিন চার ভাগ। উত্তরপ্রদেশ বহুভাগ। কোথায় কে সংখ্যাগুরু বা সংখ্যালঘু লোকের মন থেকে এ গণনা মুছে যাবে। সব ভাষাই সমান আদর পাবে। সব ভাষাভাষী সমান মর্যাদা। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র যদি আটচল্লিশটি রাজ্যের সমবায় হয় তবে ভারত কেন হবে না পঞ্চাশটি রাজ্যের সমন্বয় ? ভারতের লোকসংখ্যা তিন গুণ। আয়তনও তিন গুণ হলে আমি হয়তো দেড়শটি রাজ্যের স্বপ্ন দেখতুম। কেন্দ্রীয় শাসন যদি এক এবং অবিভাজ্য হয়, মাঝখানে যদি পাঁচ সাতটি 'জোন' বা 'গ্রুপ' থাকে, তা হলে দেড়শটি অঙ্গরাজ্য থাকলে কার কী ক্ষতি ? যা হোক, আমি দেড়শটির স্বপ্ন দেখব না। ঐ পঞ্চাশটি পর্যন্ত আমার চিন্তার দৌড়। আদিবাসীদের আমি সন্তুষ্ট রাখতে চাই। পার্বত্যদেরও পরিতুষ্ট করতে হবে। চোদ্দটি প্রধান ভাষার মতো আরো কয়েকটি অপ্রধান ভাষা আছে, যেমন মৈথিলী। তাদের আত্মপ্রকাশের সুযোগ দিতে হবে, যাতে তারা আইডেনটিটি না হারায়।

কারো কারো ধারণা ইউনিট সংখ্যা যত কম হবে দেশ তত বেশী সমৃদ্ধ হবে, সুশাসিত হবে। এ ধারণার ন্যায়সংগত পরিণতি কমিউনিস্ট চীন। সেখান অঙ্গরাজ্য নেই। সমৃদ্ধি ও সুশাসনের এই আদর্শ রুশদেশও গ্রহণ করেনি। আমরাও গ্রহণ করব না। আমাদের সামনে আরো অনেক দৃষ্টান্ত রয়েছে। সমৃদ্ধি ও সুশাসন আকার আয়তনের উপর নির্ভর করে না। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে যেমন অতিকায় টেক্সাস আছে তেমনি অতি ক্ষুদ্র মেরীল্যান্ড, ডেলাওয়েয়ার ও রোড আইল্যান্ড আছে। কেউ বলে না যে এগুলি হচ্ছে সমৃদ্ধি বা সুশাসনের অন্তরায়। গণতন্ত্র আমাদের ধাতস্থ হয়নি, হলে দেখা যাবে অতি ক্ষুদ্র ইউনিট অতি বৃহতের চেয়ে কম সুশাসিত বা কম সমৃদ্ধ নাও হতে পারে।

এখন আমাদের কর্তব্য হবে সেক্যুলার ফরমুলার মতো আর একটি ফরমুলা আবিষ্কার করা। ভারত রাষ্ট্র যেমন হিন্দুশাসিত ভারত নয় তেমনি বিহার প্রভৃতি রাজ্য হবে না হিন্দীশাসিত বা অন্য কোনো একটি ভাষাশাসিত। আত্মপ্রকাশ ভালো, কিন্তু আধিপত্য ভালো নয়। এক পক্ষ আধিপত্য করলে অপর পক্ষ আত্মবিলুপ্তির দুঃস্বপ্ন দেখবে না তো কী করবে ? এ সমস্যা দু-একটা জেলা হস্তান্তর করলে মিটবে না। বিহারের কতক অংশ পশ্চিমবঙ্গকে দিলেও বিহারে লক্ষ লক্ষ বাঙালী থেকে যাবে, তাদের আইডেনটিটি থাকবে কোন মন্ত্রবলে ? বাঙালীর সংখ্যা যথেষ্ট বলেই তারা মনে বল পাচ্ছে। সংখ্যা কমে গেলে মনের জোরও কমে যাবে। মনের জোর যতই কমবে দৌড় দেবার ঝোঁক ততই বাড়বে। একটু বেদরদী ব্যবহার পেলেই ঝাঁকে ঝাঁকে বাঙালী ভাগলপুর ইত্যাদি জেলা থেকে ভাগবে। পশ্চিমবঙ্গকে তখন আর-এক প্রকার শরণার্থীর

জন্যে জায়গা খুঁজতে হবে। কোনো-একটা রাজ্য যে কোনো-একটা ভাষাব বা ভাষাভাষীর হোমল্যাণ্ড নয় এটা সবাইকে সমঝিয়ে দেওয়া চাই। সব ভারতীয়ের জন্যে সব রাজ্য। কারো একাধিপত্য বরদাস্ত করা হবে না।

(১৯৫৬)

মার্জার

মার্জার সম্বন্ধে তুমি আমার মত জানতে চেয়েছ। এই জন্তুটি আমার অচেনা নয়। বাড়িতেই গুটি কয়েক আছে। এদের নিয়ে আমি ছড়াও লিখেছি বিস্তর। কিন্তু আমাদের নেতারা যে জীবটির কথা বলছেন এ জীব সে জীব নয়। তা নিয়ে আমি ছড়া লিখতে ভরসা পাইনে। সেদিন একটু তামাশা করতে গেলুম, বন্ধু বললেন, রক্তগঙ্গা বইবে। গৃহিণী উপদেশ দিচ্ছেন, প্রবন্ধ লিখে কাজ নেই। বাস্তবিক, সত্য কথা বলব যে, শান্ত হয়ে শুনবে কে? সুতরাং ছড়া নয়, প্রবন্ধ নয়, চিঠিই লেখা যাক। খোলা চিঠি।

প্রথমে একটু প্রাণিতত্ত্ব আলোচনা করা যাক। মার্জারের প্রসঙ্গ যথাকালে উঠবে।

ঊনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে ইউরোপ মহাদেশের দিকে দিকে ন্যাশনালিজমের হাওয়া বয়ে যায়। সে হাওয়া ধীরে ধীরে ভারতবর্ষেও এসে পৌঁছয়। প্রথম পর্যায়ে এর রূপ হয় হিন্দু ন্যাশনালিজম। একটু লক্ষ করলে দেখবে ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে ইণ্ডিয়া বা ইণ্ডিয়ান বড়ো একটা ব্যবহার করা হতো না। হিন্দুস্থান. হিন্দু কলেজ, হিন্দু পেট্রিয়ট, হিন্দু মেলা। এর কারণ ফারসী ছিল তখনকার দিনের সরকারী ভাষা। ফারসীতে এ দেশের নাম ছিল হিন্দুস্থান। লোকে সেই ছাঁচে ভাবতে অভ্যস্ত ছিল। তাই ন্যাশনালিজমকেও সেই ছাঁচে ঢালাই করা হলো। এতে মুসলমানদেরও আপত্তি ছিল না, কারণ তাঁদের ধারণা তাঁরা হিন্দুস্থানের নেটিভ নন, তাঁরা ভিনদেশী বিজেতা। তাঁদের বাদশা তখনো দিল্লীতে। ইংরেজী সরকারী ভাষা হলো, ইংরেজদের রানি মহারানি হলেন, দেশের নাম হলো ইণ্ডিয়া, লোকের নাম ইণ্ডিয়ান, সিপাহী বিদ্রোহের সময় হিন্দুমুসলমান মিলে একজোট হয়ে লড়াই করায় মুসলমানকেও মনে করা হলো একই নেশনের অঙ্গ। কতক মুসলমান এটা মেনে নিলেনও। কিন্তু বহু মুসলমান মানতে পারলেন না। হিন্দুদের মধ্যেও বহুসংখ্যক অত দূর যেতে চাইলেন না। হিন্দু ন্যাশনালিজম রয়ে গেল। তার দোসর হলো প্যান-ইসলামিজম, পরে মুসলিম ন্যাশনালিজম, ঝীণা সাহেবের দুই নেশন থিয়োরি। উপরন্তু এল ইণ্ডিয়ান ন্যাশনালিজম। একটি স্রোতের জায়গায় তিনটি স্রোত। এ গেল দ্বিতীয় পর্যায়।

ইতিমধ্যে ইংরেজীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের ফলে ভারতের প্রত্যেকটি ভাষার নতুন সাহিত্য সৃষ্টি হয়। নতুন সাহিত্যিকরা যে যার মাতৃভাষার সঙ্গে মাতৃ-

ভূমির একাত্মতা স্থাপন করেন। এমন করে দেখা দিল বাংলাভাষা, বাংলাদেশ, বাঙালীজাতি, বাঙালী জাতীয়তা। মরাঠীভাষা, মহারাষ্ট্র দেশ, মরাঠা জাতি, মহারাষ্ট্রীয় জাতীয়তা। তেলুগু ভাষা, অন্ধ্রদেশ, আন্ধ্র জাতি, আন্ধ্র জাতীয়তা। মলয়ালম ভাষা, কেরলদেশ, মলয়ালী জাতি, কেরল জাতীয়তা। এই রকম আরো গোটা দশেক জাতীয়তাবাদ নিয়ে তৃতীয় পর্যায়। অনেকের খেয়াল থাকে না যে বঙ্কিমচন্দ্রের 'বন্দে মাতরম্' যাঁর বন্দনা তিনি ভারতমাতা নন, বঙ্গমাতা। ওটা বাঙালী জাতির জাতীয় সঙ্গীত। সে বাঙালী জাতির তখনকার দিনের লোকসংখ্যা ছিল সাত কোটি। তার মধ্যে আড়াই কোটি মুসলমান, দু কোটি বিহারী হিন্দু, পঞ্চাশ লক্ষ ওড়িয়া হিন্দু। বঙ্গভঙ্গের আন্দোলনে বিহারী হিন্দুকে, ওড়িয়া হিন্দুকে, একই বাঙালী জাতির শামিল বলে ধরে নেওয়া হয়েছিল। বিহার বা ওড়িশা আলাদা হয়ে যাক এটা আন্দোলনের লক্ষ্য ছিল না। তখনকার দিনের নেতাদের উদ্দেশ্য ছিল বিহারীকে সঙ্গে রাখা, ওড়িয়াকে সঙ্গে রাখা, অধিকন্তু পূর্ববঙ্গের হিন্দুমুসলমানকে সঙ্গী করা। বলা বাহুল্য বিহারীরা ওড়িয়ারা স্বতন্ত্র হতে চেয়েছিলেন। সেইজন্যে রবীন্দ্রনাথের মানসে এল সমন্বয়ের কল্পনা। তিনি বাঙালী জাতির মতো পাঞ্জাবী সিন্ধী গুজরাতী মরাঠা প্রভৃতি জাতিকে একসূত্রে গেঁথে ভারতীয় জাতির উদ্বোধন করলেন। তার মধ্যে হিন্দুও ছিল, মুসলমানও ছিল। তাঁর 'জনগণমন' স্বাতন্ত্র্যবাদী ও ঐক্যবাদী উভয় ধারার মধ্যে সামঞ্জস্য ঘটাতে পেরেছিল। সেটা ভারতীয় জাতির জাতীয় সঙ্গীত। সেইসঙ্গে বাঙালী ওড়িয়া গুজরাতী মরাঠা পাঞ্জাবী সিন্ধী প্রভৃতি জাতির স্বীকৃতি। সেইসঙ্গে হিন্দু মুসলমান প্রভৃতি জাতির স্বীকৃতি।

যেখানে জাতি বলতে এত রকম জাতি বোঝায় সেখানে ইংরেজী নেশন শব্দটির অপব্যবহার না হয়ে পারে না। যে যার খুশিমতো ন্যাশনাল শব্দটির শ্রাদ্ধ করে। কখনো দেখি পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক, কখনো হিন্দু ন্যাশনাল আর-কিছু। পাশাপাশি তিনটি স্রোত তো ছিলই, ভারতীয় বনাম হিন্দু বনাম মুসলিম। কোণাকুণি ছিল আরো কয়েকটা স্রোত। যেমন বাঙালী বনাম বিহারী, গুজরাতী বনাম মরাঠা, তামিল বনাম তেলুগু। সমন্বয় কাব্যে যত সহজ জীবনে তত নয়। কোথাও বিহারী সংখ্যাগুরু বাঙালী সংখ্যালঘু, কোথাও মরাঠা সংখ্যাগুরু গুজরাতী সংখ্যালঘু, কোথায় তামিল সংখ্যাগুরু তেলুগু সংখ্যালঘু। আবার এমনও দেখা যায় যে সরকারী কাজকর্মে সংখ্যালঘুরাই সংখ্যাধিক। সকলেই হিন্দু, সকলেই ভারতীয় এ যুক্তি ভুল নয়, তবু এতে ভবী ভোলে না। ভবী চায় সংখ্যাগুরুত্বের সুযোগ নিতে, না-ই বা থাকল যোগ্যতা। ইংরেজ যত দিন ছিল তার নীতি ছিল নিজের কোলে ঝোল টেনে বাকিটুকু এমন ভাবে বেঁটে দেওয়া যাতে যোগ্যতার খুব বেশী তারতম্য না হয়, অথচ সংখ্যাগুরুও অসন্তুষ্ট না হয়। এ ভাবে ব্যালান্স করতে করতে তার সাম্রাজ্য গেল। কার্যত অযোগ্যই প্রশ্রয় পেল। সংখ্যাগুরুকে তোয়াজ করতে গিয়ে সংখ্যালঘুকে অনাদর করা হলো।

ইংরেজ থাকতেই অনেকে আপন আপন প্রদেশ পেয়ে গেছল। যেমন বাঙালীরা বঙ্গ, ওড়িয়ারা ওড়িশা, বিহারীরা বিহার, অসমীয়ারা আসাম, সিন্ধীরা সিন্ধু। কিন্তু আরো অনেকের এই বাসনাটি অপূর্ণ রয়েছিল। স্বাধীনতার পরে তাদের প্রথম কথা হলো, এবার তো বিদেশীরা বাধা দিচ্ছে না, এবার কেন স্বতন্ত্র মহারাষ্ট্র হবে না, স্বতন্ত্র অন্ধ্রদেশ হবে না, স্বতন্ত্র কর্ণাটক হবে না, স্বতন্ত্র কেরল রাজ্য হবে না ? এই কেন-র উত্তর এই যে বাধাটা আসলে বিদেশীদের নয়, স্বদেশীদেরই। তুমি অন্ধ্রদেশ বলে একটা স্বতন্ত্র রাজ্য চাও। তা হলে মাদ্রাজের উপর তোমার দাবি ছাড়। নইলে তামিলরা বাধা দেবে। তুমি মহারাষ্ট্র বলে একটা স্বতন্ত্র রাজ্য চাও। তা হলে বোম্বাই শহরের উপর তোমার দাবি ছাড়। নয়তো গুজরাতীরা বাধা দেবে। একবার ভারতবর্ষের সবটা ঘুরে এলে দেখবে অসংখ্য জায়গায় অশেষ বাধা। গায়ের জোরের উপর ছেড়ে দিলে রক্তারক্তি বাধবে। কুরুক্ষেত্রের পুনরাভিনয় ঘটবে। ফলে আমাদের সদ্যলব্ধ স্বাধীনতা হাওয়া হয়ে যাবে। এইজন্যে নেতারা গড়িমসি করেছেন। আর যা করেছেন তা পরে বলছি।

আমাদের স্বাধীনতা যখন এল তখন সারা ভারতের হাতে একই দিনে একই ক্ষণে এল। দেখা গেল সারা ভারতের সেদিন দুই হাত। এক হাতের নাম পাকিস্তান, আর-এক হাতের নাম আগেকার মতো ভারত, কিন্তু রূপ আগেকার মতো নয়। তার আসল চেহারা বাকিস্থান। এক অপূর্ব দৃশ্য দেখতে হলো। বাংলাদেশ ও বাঙালী জাতি দুভাগ হয়ে কতক পড়ল পাকিস্তানে, কতক পড়ল বাকিস্থানে। পাঞ্জাব ও পাঞ্জাবী জাতির সেইরূপ অবস্থা। সিন্ধু ও সিন্ধী তো কেবল পাকিস্তানে। আশাবাদীরা আশা করেছিল যে, যা হবার তা হয়ে গেছে। যে যার ভাগ্য মেনে নিলে হয়। কিন্তু আমাদের জাতীয়তাবাদে গোড়া থেকেই গোলমাল ছিল। যে দেশে একটিমাত্র জাতীয়তাবাদ কাজ করছে সে দেশের ইতিহাস আর যে দেশে এতগুলো জাতীয়তাবাদ কাজ করছে সে দেশের ইতিহাস কী করে এক রকম হতে পারে! আমাদের বোঝা উচিত ছিল যে ভারতীয় জাতীয়তাবাদ কোনো কালেই সর্ববাদীসম্মত ছিল না। তাকে চ্যালেঞ্জ করবার জন্যে ছিল হিন্দু জাতীয়তাবাদ, মুসলিম জাতীয়তাবাদ, শিখ জাতীয়তাবাদ। তাকে জেরবার করবার জন্যে ছিল বাঙালী জাতীয়তাবাদ, মরাঠা জাতীয়তাবাদ, আন্ধ্র জাতীয়তাবাদ, পাঞ্জাবী জাতীয়তাবাদ প্রভৃতি চোদ্দ পনেরো রকম জাতীয়তাবাদ। "এসো ব্রাহ্মণ শুচি করি মন"ও তলে তলে সক্রিয় ছিলেন। দারুণ রেষারেষি ব্রাহ্মণে-অব্রাহ্মণে। এসব আমার চোখে দেখা। দক্ষিণে গেলে যে কোনো চক্ষুষ্মানের চোখে পড়ত। গান্ধীহত্যার পিছনে ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণ মরাঠা-গুজরাতী মনোভাবও কাজ করেছিল। 'চুপ' 'চুপ' বলে মনকে চোখ ঠেরে কোনো লাভ নেই।

গান্ধীহত্যার পর আমাদের নেতাদের দৃষ্টি উন্মীলিত হলো। তাঁরা তখন নতুন শাসনতন্ত্র প্রণয়নে নিযুক্ত ছিলেন। সে শাসনতন্ত্র যে সেক্যুলার নীতি বরণ করল এ কথা সকলের জানা আছে। তার মানে সে শাসনতন্ত্র হিন্দু

মুসলমান শিখ খ্রীস্টান জৈন পারসিককে একসূত্রে গাঁথতে চেষ্টা করল না। তাদের সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষা করল। তারা থাকতেও পারে, না থাকতেও পারে। ভারতীয় থাকলেই হলো। অর্থাৎ তুমি হিন্দু কি তুমি মুসলমান সে তোমার ঘরোয়া ব্যাপার। রাষ্ট্র তা জানে না, জানতে চায় না, মানে না, মানতে চায় না। তুমি যে ভারতীয় এইটুকুই যথেষ্ট। তুমি অজ্ঞেয়বাদী বা নাস্তিক হলেও যে-কোনো সনাতনীর সমান অধিকার ভোগ করবে। তুমি রাষ্ট্রপতিও হতে পার, প্রধান মন্ত্রীও হতে পার টিকি কেটে পৈতে ছেঁটে। আমাদের শাসনতন্ত্র এ ক্ষেত্রে বিলকুল আমেরিকান বা রাশিয়ান। আধুনিকতার শেষ কথা।

আমাদের শাসনতন্ত্র যে সেক্যুলার নীতি বরণ করল এ কথা সকলের ভালো না লাগলেও সকলের জানা আছে। কিন্তু আর কী নীতি বরণ করল তা অনেকের অজানা। আমাদের শাসনতন্ত্র কলমের এক খোঁচায় প্রদেশ কথাটা তুলে দিল। তার জায়গায় বসিয়ে দিল স্টেট, যার বংলা করা হচ্ছে রাজ্য বলে। আমি যদিও এই তর্জমা পছন্দ করিনে তবু সুবিধের খাতিরে মেনে নিচ্ছি। পশ্চিমবঙ্গ একটা প্রদেশ নয়, এটা একটা রাজ্য। যেমন হায়দরাবাদ একটা রাজ্য। হায়দরাবাদ বলতে কোনো একটা ভাষা বা জাতি বোঝায় না। সেখানে তেলুগু কানাড়ী মরাঠী ও উর্দু চারটে ভাষা চলে। ভাষাকে যদি জাতির সমার্থক ভাবো তবে চারটে জাতি বাস করে। তেমনি পশ্চিমবঙ্গে বাংলা নেপালী সাঁওতালী ও হিন্দী চারটে ভাষা চলে। সুতরাং যাঁরা ভাষাকে জাতির সমার্থক বলে ভাবতে অভ্যস্ত তাঁদের জেনে রাখতে হবে যে এখানে চারটি জাতির বাস। এই রকম সব রাজ্যে। নতুন শাসনতন্ত্র ভারতীয় ব্যতীত আর কোনো নেশন বা সাব-নেশন বা ন্যাশনালিটি বা জাতি স্বীকার করে না। শাসনতন্ত্রের দৃষ্টিতে এখানে একটিমাত্র জাতি বাস করে। তার নাম ভারতীয় জাতি। সে জাতি বহুভাষী। সে জাতির বহুপ্রচলিত ভাষাগুলির তালিকা শাসনতন্ত্রে দেওয়া আছে, রাজ্যগুলির তালিকাও অন্যত্র দেওয়া আছে। দুটি তালিকা একত্র দেওয়া যেতে পারত, তা ইচ্ছা করে আলাদা রাখা হয়েছে। কোন রাজ্যের যে কী ভাষা তা জানবার উপায় নেই শাসনতন্ত্র পড়ে। পশ্চিমবঙ্গের ভাষা যে বাংলা এটা কাগজে কলমে স্বীকার করা হয়নি। শাসনতন্ত্র বলে দিয়েছে রাজ্যের লোক যে যার ভাষা নিজেরাই ঠিক করে নেবে। অর্থাৎ পশ্চিমবঙ্গের লোকপ্রতিনিধিরা যদি ইচ্ছা করেন তবে বাংলা হবে তাঁদের মনোনীত ভাষা, তেলুগুও হতে পারে, সংস্কৃতও হতে পারে। অবশ্য সরকারী কাজকর্মের ভাষা।

তেমনি মহীশূর রাজ্যের লোকপ্রতিনিধিরা ইচ্ছা করলে বাংলাকেই তাঁদের সরকারী ভাষা করতে পারেন। এ রকম স্বাধীনতা সবাইকে দেওয়া হয়েছে। কেবল কেন্দ্রীয় সরকারকে স্বাধীনতা দেওয়া হয়নি। সে ক্ষেত্রে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে হিন্দীকেই করতে হবে সরকারী ভাষা। কিন্তু কোন হিন্দীকে? যে হিন্দী বাংলা মরাঠী ওড়িয়া গুজরাতীর মতো আঞ্চলিক ভাষা সে হিন্দীকে নয়। যা সকলে বলে সকলে বোঝে এমন কোনো হিন্দীকে। এই তো কয়েক বছর আগে জবাহরলাল এই প্রভেদটুকু চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছিলেন।

কিন্তু ইতিমধ্যে লোকে ওটা ভুলে গেছে। আবার শুনছি আঞ্চলিক হিন্দীকে কেন্দ্রীয় সরকারের সরকারী ভাষা করার কথা। বেসিক হিন্দী বা সুনীতি-কুমারের মতে বাজার হিন্দী কোথায় চাপা পড়ে গেছে। শাসনতন্ত্র অনুসারে কাজ হচ্ছে বলে তো মনে হয় না। হবে কী করে? হিন্দী বলে যা হিন্দীভাষীরা মেনে নিয়েছেন তার থেকে স্বতন্ত্র কোনো হিন্দী দেবনাগরী লিপিতে নেই। রোমান হরফে আছে। কিন্তু তার নাম হিন্দী নয়, হিন্দুস্থানী। ওটাকেই চালিয়ে দিলে মন্দ হতো না। কিন্তু ওর ঐ হরফটি রোমান হয়ে মাটি করেছে। ওতে নাকি বিজাতীয় গন্ধ আছে। যদিও ইউরোপের বাইরে বহু দেশ ও-লিপিকে আপনার করে নিয়েছে। আমাদের ছেলেবেলায় এশিয়াভুক্ত রাশিয়া ও তুর্কী। কিছু দিন আগে ইন্দোনেশিয়া। এই সম্প্রতি শুনছি, চীন। এদের জাতীয়তাবাদে আঘাত লাগল না। লাগল কেবল আমাদের।

যা হোক হিন্দীর তরফ থেকে যেসব নিখিল ভারতীয় সংস্কৃতিগত দাবি করা হচ্ছে সেসব শাসনতন্ত্রের বহির্ভূত। শাসনতন্ত্র অনুসারে ভারতীয়রা একটি বহুভাষী জাতি। সব ক'টা ভাষাই ভারতীয়দের ভাষা, কেবল হিন্দী নয়। শাসনতন্ত্র গৃহীত হয়ে যাবার পর ভারতীয় জাতীয়তাবাদের আর কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী নেই, শরিক নেই। এখন আর বাঙালী জাতীয়তাবাদ মরাঠা জাতীয়তাবাদ আন্ধ্র জাতীয়তাবাদ ইত্যাদির কোনো মানে হয় না। যেমন হিন্দু জাতীয়তাবাদ শিখ জাতীয়তাবাদ ইত্যাদির কোনো মানে হয় না। কিন্তু মানুষ পাঁচ সাত বছরে তার বহুকালের সংস্কার ভোলে না। তার সেণ্টিমেণ্ট যায় না। শাসনতন্ত্রের কোথাও বাঙালী মরাঠা ইত্যাদি জাতির নামগন্ধ নেই, তবু আমরা বাঙালী বলতে অজ্ঞান। মরাঠারা মরাঠা বলতে অজ্ঞান। ওড়িয়ারা ওড়িয়া বলতে অজ্ঞান। সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এই সেণ্টিমেণ্টকে শ্রদ্ধা করতে হয়, কিন্তু রাজনীতিক্ষেত্রে প্রশ্রয় দেওয়া ভুল। তুমি যেমন করেই মানচিত্র আঁকো না কেন, ভিন্নভাষী ভারতীয় রয়ে যাবেই, ভিতরে আসবেই। শাসনতন্ত্র অনুসারে তাদের অবাধ অধিকার, অবাধ গতি। দুর্গাপুরে যদি কয়েক লক্ষ অবাঙালী এসে জোটে তুমি তাদের তাড়াতে পারবে না। রাউরকেলায় যদি কয়েক লক্ষ বাঙালী গিয়ে জোটে ওড়িয়ারা তাদের রুখতে পারবে না। আইনত ওরা সবাই ভারতীয় নাগরিক। ডোমিসাইল সার্টিফিকেট এখন বেআইনী হয়ে গেছে। যদি না হয়ে থাকে তবে সুপ্রীম কোর্টে দরখাস্ত করলে প্রতিকার পাওয়া যাবে। স্বাধীনতার সঙ্গে, শাসনতন্ত্রের সঙ্গে যা আর খাপ খাচ্ছে না তাকে রাজনীতির সম্বল করে কতকগুলি লোক নেতা বনতে পারে, তাদের মধ্যে কংগ্রেসওয়ালারাও আছে। কিন্তু কোনো কোনো বিদ্বান বিচক্ষণ দেশপ্রেমিক আইনজ্ঞ ভাবুক ব্যক্তিকেও গোলে হরিবোল দিতে দেখছি। এর ফলে শাসনতন্ত্র-বিরোধীদের হাতের মুঠো শক্ত হচ্ছে।

হাঁ, শাসনতন্ত্রবিরোধীও এক দল আছেন। এঁদের থীসিস হচ্ছে ভারত একটি মালটিন্যাশনাল স্টেট। অর্থাৎ এ দেশে কেবল একটি নেশন নেই। অনেক-গুলি নেশন আছে। ঝীণা সাহেব মাত্র দুটি নেশনের কথা বলেছিলেন বলে

আমরা খাপ্পা হয়েছিলুম। এখন কমিউনিস্ট কমরেডরা বলছেন বহু নেশনের কথা। আর কংগ্রেসপক্ষীয়রাও ঘুরিয়ে ফিরিয়ে প্রকারান্তরে সেই কথার প্রতিধ্বনি করছেন। ভারত নাকি 'মহা-রাষ্ট্র'। 'মহা-ভারত'। 'মহাদেশ'। এই 'মহা' বিশেষণের তাৎপর্য কী? এর তাৎপর্য আমরা আমাদের নতুন শাসনতন্ত্র পড়িনি, পড়তে চাইনে, পড়লেও মানতে চাইনে। আগেকার দিনে এসব উক্তির পিছনে যুক্তি ছিল হয়তো। কিন্তু বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে এসব উক্তির পায়ের তলা থেকে মাটি সরে গেছে। এসব এখন আকাশকুসুম। আমাদের শাসনতন্ত্র অনুসারে আমরা একটিই 'পীপল'। একটিই 'নেশন'। এখানে বহু-বচন খাটবে না। ইংরেজী 'সাব' উপসর্গ বসবে না। এটা সুপারস্টেট নয়, ফেডারেশন নয়, কনফেডারেশন নয়। এখানে 'ইউনিয়ন' শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে বটে, কিন্তু রুশ কমিউনিস্ট অর্থে নয়। ইউনিয়নের একাধিক রূপ আছে। এটিও একটি। 'মহা' বিশেষণটি যাঁরা ব্যবহার করছেন তাঁরা গৌরবে করলে কথা ছিল না, কিন্তু রাজনীতির পরিভাষায় তার তাৎপর্য অন্য রকম। আমাদের এই দেশটির নাম ভারত, এটি মহাদেশ নয়, মহাভারত নয়। আমাদের এই রাষ্ট্রটি নিতান্তই রাষ্ট্র, মহা-রাষ্ট্র নয়।

যে কুরুক্ষেত্রের সূচনা দেখে আমরা সেক্যুলার স্টেট বরণ করলুম সেই কুরুক্ষেত্র আজ আবার আমাদের দুয়ারে ধাক্কা মারছে। শাসনতন্ত্র দিয়ে তাকে ঠেকিয়ে রাখা যাচ্ছে না। কারণ মানুষের মন এখ'না পুরনো ধরনের ছাঁচে অভ্যস্ত। এই ধরো, পশ্চিমবঙ্গের তরফ থেকে বিহারের কতক অংশ দাবি করা হচ্ছে এই বলে যে পশ্চিমবঙ্গ একটা ভাষাভিত্তিক রাজ্য, তার ভাষা বাংলাভাষা, তার অধিবাসী বাঙালী জাতি, অতএব বিহারের বঙ্গভাষী অঞ্চলগুলো তারই পাওনা, তাকে না দিলে সে পূর্ববঙ্গের শরণার্থীদের বসাবার জায়গা পাচ্ছে না, তাদের নাকি দাবি আছে, তাদের প্রতিও নাকি দায়িত্ব আছে, যেহেতু দেশবিভাগে কংগ্রেস সম্মত হয়েছিল। এই যেমন পশ্চিমবঙ্গের মামলা এমনি মামলা প্রত্যেকটি রাজ্য থেকে উপস্থাপিত করা হয়েছে। যারা এখনো ভাষাভিত্তিক নয় তারা চায় ভাষাভিত্তিক হতে। যারা আগে থেকে ভাষাভিত্তিক হয়ে রয়েছে তারা চায় স্বভাষীদের অধ্যুষিত অঞ্চল স্বরাজ্যভুক্ত করতে। ইউরোপে আমরা এর অনুরূপ দেখেছি। ইটালী তার অপূর্ণ দাবি আদায় করার জন্যে সেবার অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরীর সঙ্গে যুদ্ধ করে, এবার ফ্রান্সের সঙ্গে। ইটালিয়া ইরিডেণ্টা এখনো ষোলো আনা আদায় হলো না। এখনো ট্রিয়েস্টের একাংশ যুগোশ্লাভিয়ার ও রিভিয়েরার একাংশ ফ্রান্সের দখলে। এই ধরনের আন্দোলনকে বলা হয় ইরি-ডেণ্টিস্ট আন্দোলন। জার্মানীও জার্মানভাষী অঞ্চলকে আপনার শামিল করার জন্যে দু দু বার যুদ্ধে নেমেছে। সুডেটেন জার্মানদের উপর তার দাবি সে এখনো ছাড়েনি। তবু দেখা যাচ্ছে অস্ট্রিয়া আলাদা থাকতে ভালোবাসে, ইস্ট প্রাশিয়া তো জার্মানশূন্য হয়ে গেছে, পূর্ব জার্মানী রুশপ্রভাবিত স্বতন্ত্র রাষ্ট্র। শরণার্থীতে ছেয়ে গেছে পশ্চিম জার্মানী। সেখানেও ঐ একই যুক্তি। শরণার্থী সমস্যার সমাধানের জন্যে রাজ্যবিস্তার চাই। ভালোয় ভালোয় না

পেলে যুদ্ধ করতে চাই। তৃতীয় মহাযুদ্ধের প্রস্তুতি চলেছে তাই নিয়ে।

আমাদের ভাষাগুলো ইউরোপীয় ভাষাগুলোর সঙ্গেই তুলনীয়। সুতরাং রাজ্যগুলোও ইউরোপের রাষ্ট্রগুলোর সঙ্গে তুলনীয় হওয়া উচিত। কিন্তু তুলনাটা আর-এক কদম এগোলে ভারতও হবে ইউরোপের মতো বহুধা বিভক্ত। বিভক্ত হয়ে ইউরোপের শেষ পর্যন্ত কী লাভ হয়েছে? যুদ্ধবিগ্রহের অন্ত নেই। এক ভাগ তো রুশ-প্রভাবাধীন। অপর ভাগ মার্কিন-প্রভাবাধীন। ইউরোপের সঙ্গে তুলনাকে আমাদের ভয় করা উচিত। আমাদের স্বাধীনতা থাকবে না, ঐক্য ইতিমধ্যেই ব্যাহত হয়েছে পাকিস্তান সৃষ্টির ফলে। কেন্দ্রীয় সরকার না থাকলে, তার হাতের মুঠো শক্ত না করলে, তার রোয়েদাদ শিরোধার্য না করলে, তার বিরুদ্ধে আন্দোলন চালালে, তার রেল লাইন তুলে ফেললে বা রেল চলাচল থামিয়ে দিলে, তার অথরিটি অস্বীকার করলে কয়েক হাজার বর্গমাইল জায়গা হয়তো পাওয়া যাবে, কিন্তু সে যদি দুর্বল হয়ে অদৃশ্য হয়ে যায় তা হলে যে গৃহযুদ্ধ বাধবে আমাদের রাজ্যে রাজ্যে জাতিতে জাতিতে। তার ফলে ঐক্য বেবাক যাবে, স্বাধীনতা বরবাদ হবে।

বোম্বাই শহরে যা হয়েছে তার সব খবর বেরয়নি। একটু একটু করে কানে আসছে। মহারাষ্ট্র স্বতন্ত্র হবে, এটা স্থির হয়ে যাবার পরও আশ মেটে না। শুধু স্বতন্ত্র মহারাষ্ট্র হলে হবে না, সংযুক্ত মহারাষ্ট্র হওয়া চাই। বোম্বাই শহরটা হবে মহারাষ্ট্রের শামিল। যদিও সেখানে মরাঠীভাষী শতকরা পঞ্চাশও নয়। যদিও সেখানে গুজরাতীদের সংখ্যা সম্পত্তি ঐতিহ্য সব জড়ালে সমান। যদিও কংগ্রেস থেকে সেটাকে প্রাদেশিক মর্যাদা দেওয়া হয়ে এসেছে পঁয়ত্রিশ বছর ধরে। যদিও স্বাধীনতা আন্দোলনে সেখানকার গুজরাতীরাই কংগ্রেসের পরম সহায় হয়েছে। তার পর দ্বীপের চার দিকে তো জল। সমুদ্র কি তাকে কেবল একটা দিকের সঙ্গেই সংযুক্ত করে? গুজরাতের সঙ্গেও কি জলপথে তার সংযোগ নেই? গুজরাতীরা কি জলপথেও সেখানে আসেনি? বোম্বাইয়ের ইতিহাস কি গুজরাতের ইতিহাসেরও শামিল নয়? ভারত সরকার বোম্বাইকে মহারাষ্ট্র-গুজরাতের যুক্ত হস্তেই রাখতে চেয়েছিলেন, কোনো এক পক্ষের হাতে দিতে চাননি। কিন্তু যুক্ত রাজ্য যখন সম্ভব হলো না তখন নিজেদের খাসমহল করে রাখবেন বলে সিধান্ত করলেন। সঙ্গে সঙ্গে বেধে গেল বর্গীর হাঙ্গামা। ওদিকে নিরীহ গোবেচারা বলে যাদের খ্যাতি বা অখ্যাতি ছিল সেই ওড়িয়ারা যা করে দেখাল তা ইংরেজ আমলে স্বাধীনতার জন্যেও করেনি। আর পশ্চিম-বঙ্গের লোক এত কাল পরে সত্যি সত্যি শান্তিপূর্ণ ভাবে হরতাল পালন করল, সাধারণ ধর্মঘট করল। স্বাধীনতার জন্যেও যা তারা করেনি। যে দেশে গণতন্ত্র চালু আছে, লোকপ্রতিনিধিরা আইনসভায় গিয়ে শাসনতন্ত্রসম্মত উপায়ে সরকারী সিদ্ধান্তের রদবদল ঘটাতে পারেন, সে দেশে বোম্বাইয়ের মতো বর্গীর হাঙ্গামা, ওড়িশার মতো গণবিদ্রোহ, কলকাতার মতো শাসনব্যবস্থার পক্ষাঘাত কিসের সূচনা করে? গণতন্ত্রের ব্যর্থতার। বিদেশী পর্যবেক্ষকরা সেই ধারণা পোষণ করবেন। উপরন্তু বলবেন ভারতীয় বলে কোনো জাতি নেই। ওটা

শাসনতন্ত্রের চোতা কাগজে থাকতে পারে। মানুষের মনে বসেনি।

যেখানে গণতন্ত্র বিপন্ন, ভারতীয় জাতীয়তা বিপন্ন সেখানে এমন কিছু করা দরকার যাতে বিপদ থেকে এগুলিকে বাঁচানো যায়। তেমন কিছু হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গ ও বিহারের মিশ্রণ প্রস্তাব। অনুরূপ প্রস্তাব অন্যান্য রাজ্যের কাছেও করা গেছে। এ প্রস্তাব এতই অপ্রত্যাশিত এতই আকস্মিক যে আমাদের সকলের মাথায় বাজ পড়েছে। আমরা স্তম্ভিত, বিমূঢ়, বেদনাবিহ্বল। এর একটা সুফল হয়েছে এই যে ভারতের যে সব রাজ্যে গোলমাল চলছিল সে সব রাজ্যে হঠাৎ থেমে গেছে। যে সব রাজ্যে হতে পারত সে সব রাজ্যে হয়নি। পশ্চিমবঙ্গ ইতিমধ্যে দু নম্বর সাধারণ ধর্মঘট বাধিয়ে বসেছে। মার্জারের বিরুদ্ধে। মার্জার যদি এই উপায়ে রহিত হয় তবে তার বদলে কী হবে তা কিন্তু কেউ বলতে পারছেন না। সীমানার জন্যে আবার তাণ্ডব বাধবে তো? সে তাণ্ডব থামবে কোন মন্ত্রবলে, যদি মার্জার-মন্ত্র ব্যর্থ হয়? তারপর এ প্রস্তাবের পিছনে আর-একটা কারণ কাজ করছে। 'কাস্টইজম' নামক আর-এক পাখি মারার ঢিল এটা। বিহারের শাসনব্যবস্থা সেই পাখির উৎপাতে জীর্ণপ্রায়। সেখানকার রেওয়াজ হচ্ছে কায়স্থ যদি একটা পদ পেল রাজপুতকে একটা পদ দিতে হবে। মৈথিল ব্রাহ্মণ যদি প্রমোশন পেল ভূমিহার ব্রাহ্মণকেও প্রমোশন দেওয়া চাই। জাতই সব। যেখানে যোগ্য অযোগ্যের এক দর সেখানে যোগ্যরা মন দিয়ে কাজ করতে পারে না। শাসনকার্য দিন দিন অধঃপাতে যায়। আমাদের বর্ণাশ্রমী সভ্যতার পতন কেন হলো, পাঠান মোগল কেন এল, কেন অনায়াসে জুড়ে বসল তার জন্যে প্রাচীন ইতিহাস পড়তে হবে না। বিহার তার নিঃশব্দ উত্তর। মার্জারের দ্বারা এর প্রতিকার হতে পারে। পশ্চিমবঙ্গের শাসনব্যবস্থা বিহারের চেয়ে উৎকৃষ্ট। উৎকৃষ্টের সঙ্গলাভ উন্নতির উপায়।

মার্জারের পক্ষে ও বিপক্ষে জোরালো যুক্তি আছে। ওটা নিছক মন্দ বা নিপাট ভালো নয়। ভালোমন্দের মাঝামাঝি। মার্জার হলে আমি দুঃখিত হব না, সুখীও হব না। আমার নিজের মনের ধারা অন্য খাতে বয়। আমি এই ভাষাভিত্তিক আন্দোলনটা দু চক্ষে দেখতে পারিনে। ধরো, সব বাঙালীর জন্যে একটা রাজ্য হলো, সব মরাঠার জন্যে একটা রাজ্য হলো, সব ওড়িয়ার জন্যে একটা রাজ্য হলো। এই ন্যায় অনুসারে সব হিন্দীভাষীর জন্যে একটা রাজ্য হলো। ভেবে দেখেছ কি হিন্দীভাষী রাজ্যটির আকার আয়তন কত বড়ো হবে? লোকসংখ্যা কয় কোটি হবে? সারা ভারতের অর্ধেক জুড়বে সেই হিন্দীভাষী রাজ্য। তার লোকসংখ্যা হবে সারা ভারতের অর্ধেক। আর-সব রাজ্যই হবে সেই গ্রহের ছোট ছোট উপগ্রহ। এ প্যাটার্ন ভারতের ইতিহাসে বহুবার দেখা গেছে। অশোকের রাজ্য, সমুদ্রগুপ্তের রাজ্য, হর্ষবর্ধনের রাজ্য, আকবরের রাজ্য এই প্যাটার্নের ছিল। হিন্দীভাষীদের মনে এখনো এর স্মৃতি জাগেনি। কিন্তু এই সর্বনাশা আন্দোলন যদি আরো কিছু দূর গড়ায় আমরা হয়তো দেখব যে, সব হিন্দীভাষী রাজ্য এক হয়ে গেছে। সে-ও একপ্রকার মার্জার। তখন বিহারের এক পাউণ্ড মাংস নিয়ে আমরা করব কী? ভাষাভিত্তিক রাজ্য নিয়ে মরাঠা

গুজরাতী আন্ধ্র কন্নাডিগরাই বা করবে কী? ছত্রপতির মাথায় ছত্র ধরবে, অঙ্গে চামর বুলোবে?

আমি চাই গোটা পনেরো ভাষাভিত্তিক রাজ্য নয়, গুটি পাঁচেক 'মার্জিত' রাজ্য নয়, গোটা পঞ্চাশেক আঞ্চলিক রাজ্য। আমি খুশি হব জবাহরলাল ও গোবিন্দবল্লভ যদি সর্দার পানিক্করের সুপারিশ অনুসারে উত্তর প্রদেশকে দু ভাগ করে দৃষ্টান্ত দেখান। তা হলে সংযুক্ত মহারাষ্ট্র, বিশাল অন্ধ্র, মহাপাঞ্জাব ইত্যাদি ধুয়ো মুহূর্তে থেমে যাবে। বাঙালীও প্রকৃতিস্থ হবে। সব দেশেই কেন্দ্রানুগ ও কেন্দ্রাতিগ দুই শক্তি কাজ করে। তাইতেই দেশের স্বাস্থ্যরক্ষা হয়। এ দেশে কেবল কেন্দ্রানুগ শক্তির ক্রিয়া দেখে আমি শঙ্কিত। মার্জার সেই কেন্দ্রানুগ শক্তির ঘনীভূত রূপ। আমি চাই বিকেন্দ্রীকরণ। কেন্দ্রাতিগের জন্যে পথ কেটে দিতে হবে। নইলে রক্তের চাপ মাথায় উঠবে এ দেশের। ইতিমধ্যেই আমাদের কেন্দ্রীয় সরকার বিষম মাথাভারী হয়ে উঠেছে বিরাট পাবলিক সেক্টর করায়ত্ত করে। হিন্দীর মাধ্যমে প্রতিযোগিতায় নামতে বাধ্য হলে হিন্দীভাষীদের সঙ্গে ক'জন এঁটে উঠতে পারবে? বিপুলসংখ্যক সরকারী কাজকর্মের অধিকাংশই চলে যাবে হিন্দী যাঁদের মাতৃভাষা তাঁদেরই দখলে। তাঁরা যোগ্যতর বলে নয়, তাঁরা জন্মসূত্রে প্রিভিলেজ-প্রাপ্ত বলে। গণতন্ত্রে সব রকম প্রিভিলেজ-প্রাপ্ত শ্রেণীর প্রিভিলেজ লোপ করা হয়ে থাকে। কিন্তু আমাদের এখানে উলটে আর-একটা প্রিভিলেজ-প্রাপ্ত শ্রেণী তৈরি করা হবে। আমি হিন্দীবিদ্বেষী নই, হিন্দীপ্রেমী। ছাত্রবয়স থেকেই হিন্দীর পক্ষে। আজ স্বাধীনতার পর সুবিধা-ভোগ করার জন্যে নয়। কিন্তু অযোগ্যকে প্রিভিলেজ দিলে দেশ রসাতলে যাবে যে। জাতীয় ঐক্যের নামে জাতিকে অযোগ্যের হাতে সঁপে দেওয়া যায় না। আর জাতীয় আত্মসম্মান কি কেবল আমাদেরই আছে, আর কারো নেই? প্রায় হাজার হাজার বছর আগে ইংরেজদের দেশে নর্মানরা গিয়ে ফরাসী ভাষা চালায়। সে ভাষা এখনো তাদের রাজবংশে ও অভিজাত মহলে চলে। হোটেলে রেস্টো-রাণ্টে খেতে গেলে দেখবে তোমাকে ফরাসী ভাষায় মেনু দেবে ইংরেজ। ইংরেজ অধিকৃত ভারতেও আমরা লাটসাহেবের সঙ্গে খানা খেতে গিয়ে ফরাসী মেনু পেয়েছি। হোটেলেও তাই।

অনেক ভেবেচিন্তে আমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি যে শাসনব্যবস্থাকে যোগ্যতমের হাতে রাখতে হলে শাসনতন্ত্র সংশোধন করে ইংরেজীকেই প্রতি-যোগিতার মাধ্যম করতে হবে। এটা কেবল কেন্দ্রীয় সরকারের বেলা নয়, রাজ্য সরকারের বেলাও। কেননা রাজ্যেও তো বহু সংখ্যালঘু ভাষাভাষী আছে। তারা অনেক সময় যোগ্যতর হয়েও প্রতিযোগিতায় হেরে যাবে, যদি রাজ্যের ভাষা তাদের প্রতিযোগীদের মাতৃভাষা হয়। আমি কেবল প্রতিযোগিতার মাধ্যম-টুকুর কথা বলছি। তার বাইরে বিস্তৃত ক্ষেত্র পড়ে রয়েছে। সে ক্ষেত্রে ইংরেজীর বদলে সংখ্যাগুরুদের মাতৃভাষা চালাও, সঙ্গে সঙ্গে সংখ্যালঘুদের মাতৃভাষাকেও অন্যতম সরকারী ভাষা করো, অন্তত কয়েকটি অঞ্চলে তাকে একটুখানি ঠাঁই দাও। এর অর্থ বিহারে প্রতিযোগিতার মাধ্যম হোক ইংরেজী, প্রধান সরকারী

ভাষা হোক হিন্দী, অন্যতম সরকারী ভাষা হোক বাংলা, কয়েকটি অঞ্চলের জন্যে অন্তত। তেমনি পশ্চিমবঙ্গে প্রতিযোগিতার মাধ্যম হোক ইংরেজী, প্রধান সরকারী ভাষা হোক বাংলা, অন্যতম সরকারী ভাষা হোক হিন্দী, কয়েকটি অঞ্চলের জন্যে অন্তত। সেক্যুলার ফরমুলার মতো আর-একটা ফরমুলা উদ্ভাবন করতে হবে আমাদের। এগুলি সেই নয়া ফরমুলার সূত্র। আরো কয়েকটি সূত্র চাই। ভাবছি।

মার্জারের পরেও এমনি একটি ফরমুলার আবশ্যক থাকবে। তা যদি হয় তবে দুদিন আগে থেকে ভেবে রাখলে ক্ষতি কী? বরং এর দ্বারা মার্জার নিবারিত হতে পারবে। মার্জার নিষ্প্রয়োজন বলে প্রমাণিত হতে পারবে। মার্জারে আসল আপত্তি তো এইখানে যে আমরা সংখ্যালঘুতে পরিণত হব। সুতরাং যেখানে যত সংখ্যালঘু আছে সকলের পূর্ণ বিকাশের সূত্র খুঁজতে হবে।

(১৩ই ফাল্গুন ১৩৬২, খ্রী ১৯৫৬)

(শ্রীকানাইলাল সরকারকে লিখিত পত্র)

নাটকের কথা

যাদের নিয়ে নাটক লিখছি তারা আপন আপন জীবন ভোগ করছে, কর্ম ভোগ করছে, বাঁচছে। তারা বাইরের লোককে দেখিয়ে দেখিয়ে বাঁচছে না। তারা সচেতন নয় যে বাইরের লোক দেখছে। সচেতন হলে তাদের জীবনটাই হতো অভিনয়। অর্থাৎ নিজেদের মতো করে বাঁচত না তারা, বাঁচার ভান করে যেত বাইরের লোকের খাতিরে। তা হলে যা হতো তা নাটক নয়। তা রঙ্গ।

এই পার্থক্যটুকু সব সময় মনে রাখতে হবে। নাটক হচ্ছে তাই যার পাত্র-পাত্রীরা আপনার জীবন আপনি বাঁচে। দর্শকের রুচি অনুসারে নয়, নীতি অনুসারে নয়, খুশি অনুসারে নয়। দর্শক বলে কেউ আছে কি না সে খবরে তাদের কাজ নেই। তারা তাদের আপনাদের জীবনলীলা নিয়ে তন্ময়। এই তন্ময়তা থেকে কত রকম পরিস্থিতির উদ্ভব। সেইখানেই নাটকের নাটকত্ব। কতক পরিস্থিতি আছে যার পরিণতি মর্মান্তিক হতে বাধ্য। কারও সাধ্য নেই যে তাকে রমণীয় করে। লেখক সেক্ষেত্রে নিরুপায়। তার হাত দিয়ে ট্র্যাজেডী আপনি আপনাকে লিখছে। কর্ম বা য়্যাকশন থেকেই কর্মফল বা ট্র্যাজেডী।

জীবনে আমরা প্রত্যহ এ দৃশ্য দেখছি। নাটক আমাদের চোখের সুমুখেই ঘটে যাচ্ছে। ঘটছে আমাদের চেনা মানুষদের জীবনে। আমাদেরই জীবনে। চোখ কান খোলা রাখলে নাটক লেখার উপাদান খুঁজতে হয় না। কিন্তু লিখতে গিয়ে নাটককে মাটি করি, রঙ্গ করে তুলি। কেন? তার কারণ বাইরের লোককে দেখানোর প্রশ্ন ওঠে। তাদের মর্জির প্রশ্ন ওঠে। তাদের রজতখণ্ডের প্রশ্ন

ওঠে। আবার অভিনেতা অভিনেত্রীর মেজাজ বুঝে কাজ করতে হয়। তাঁরা বিমুখ হলে নাটকের যবনিকা ওঠে না। দর্শক দর্শন পায় না।

নাটক প্রথমত নাটক হবে। দ্বিতীয়ত অভিনয়যোগ্য হবে। কিংবা প্রথমত অভিনয়যোগ্য হবে। দ্বিতীয়ত নাটক হবে। যেদিক থেকেই বিচার করা হোক না কেন নাটক হবে নাটক। রঙ্গ নয়। সাধারণত আমরা যাকে নাটক বলে জানি তা নাটকই নয়, তা রঙ্গ। তার ষোলো আনাই অভিনয়। এক আনাও জীবন নয়। জীবনকে অনুকরণ করলেই তা জীবন হয়ে ওঠে না। জীবন যে নিয়মে চলে দর্শকের হস্তক্ষেপ তাকে সে নিয়ম থেকে ভ্রষ্ট করে। কিংবা অভিনেতা অভিনেত্রীর হস্তক্ষেপ। কিংবা প্রযোজকের হস্তক্ষেপ। যার যা পরিণাম তা অক্ষুণ্ণ থাকে না। হস্তক্ষেপের দরুন ক্ষুণ্ণ হয়।

ধরো, দুজন মানুষ আনমনে পথ চলতে চলতে পাহাড়ের ধারে এসে দাঁড়িয়েছে। আর এক পা এগোলেই গভীর খাদ, পাগলা ঝোরা। এমন সময় তুমি দেখতে পেয়ে তাদের বাঁচালে। এই যে হস্তক্ষেপ এটা জীবনে সম্ভবপর। নাটকে নয়। নাটকে যদি তাদের বাঁচাতে হয় দেবতা বাঁচান। আগেকার দিনে যন্ত্র হতে দেবতার আবির্ভাব ঘটত। আজকাল তেমন কিছু ঘটবার জো নেই। হঠাৎ হুঁশ হলে মানুষ বাঁচে। নয়তো খাদে পড়ে অদৃশ্য হয়ে যায়। বাইরের হস্তক্ষেপ সংগত নয় নাটকে।

কিন্তু সাধারণত যা অসংগত তাই সকলে মিলে সম্ভব করে। তাতে হয়তো রঙ্গের স্বাদ পাওয়া যায়। নাটকেব নয়। দীর্ঘকাল পরে এক-আধখানা সত্যিকার নাটক লেখা হয়। তার অভিনয় হয় কি না সন্দেহ। এ কথা কেবল এ দেশ নয়, অন্যান্য দেশ সম্বন্ধেও বলা যায়। লেখকের সঙ্গে পাঠকের মন মেলে। কিন্তু প্রযোজকের মন মেলে না, অভিনেতার মন মেলে না, দর্শকের মন মেলে না। ক্বচিৎ এমন ঘটে যে লেখকও থিয়েটারের লোক, যেমন শেক্‌স্‌পীয়ার বা মোলিয়ের। কেমন করে দর্শকের মন পেতে হয়, অভিনেতার মন পেতে হয়, প্রযোজকের মন পেতে হয় সে বিষয়ে তাঁদের সাক্ষাৎ অভিজ্ঞতা। সঙ্গে সঙ্গে পাঠকের মন পেতেও তাঁরা নিপুণ। বস্তুত রঙ্গালয়ের অভিজ্ঞতা না থাকলে লেখকের পক্ষে অভিনয়-যোগ্য নাটক লেখা দুষ্কর।

অপর পক্ষে যাঁরা রঙ্গালয়ের সঙ্গে সংশিলষ্ট তাঁরা প্রযোজক অভিনেতা ও দর্শকের মন জানেন, কিন্তু পাঠকের মনের সঙ্গে অপরিচিত। তাঁদের রচনা হয়তো চারশ রাত ধরে অভিনীত হয়। কিন্তু সাহিত্য বলে গণ্য হয় না। কারণ ওটা নাটক নয়, রঙ্গ। নাটক হলে পাঠক থাকত। পাঠক থাকলে নাটক হতো। মোটামুটি নাটকেব এই বৈশিষ্ট্য। আর দর্শক জুটলে রঙ্গ হয়। রঙ্গ হলে দর্শক জোটে। মোটামুটি রঙ্গের এই লক্ষণ। বলা বাহুল্য একই রচনা নাটক ও রঙ্গ দুই হতে পারে। নাটক যদি রঙ্গ না হয় তা হলে তার পক্ষে রঙ্গালয়ে স্থান পাওয়া দুর্ঘট। সাধারণত তাকে স্থান দেওয়া হয় কেটে ছেঁটে জোড়াতালি দিয়ে বদলিয়ে বিকৃত করে। সিনেমায় এ রকম হামেশা দেখা যায়।

যে সমস্যার ইঙ্গিত দিলুম সে সমস্যা আজকাল সব দেশের সমস্যা। তার

যদি কোনো সমাধান থাকে তবে তা প্রযোজক অভিনেতা ও দর্শকের সঙ্গে লেখকের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ স্থাপন। সঙ্গে সঙ্গে পাঠকের সঙ্গে নিবিড় সাযুজ্য। জীবন ও জীবনের অভিনয় উভয়ের প্রতি উভয় চক্ষু খোলা রাখতে হবে। তার কমে চলবে না।

এর জন্যে চাই দেশের বৃহত্তর জীবনের বহুমুখী আয়োজন। সেই সঙ্গে চাই রাতের পর রাত অনন্যকর্মা অভিনেতা অভিনেত্রীর দ্বারা অধিষ্ঠিত থিয়েটার। সম্প্রতি দিল্লীতে যেতে হয়েছিল। সঙ্গীত নাটক আকাদেমির ড্রামা সেমিনারের কয়েকটি অধিবেশনে উপস্থিত থাকার সুযোগ মিলেছিল। ভারতের নানা প্রান্তের প্রতিনিধিদের মুখে একই অভিযোগ শোনা গেল। অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রোফেসনাল অভিনেতা নেই, প্রোফেসনাল অভিনেতা থাকে তো প্রোফেসনাল অভিনেত্রী নেই, প্রোফেসনাল অভিনেত্রী থাকে তো স্থায়ী থিয়েটার গৃহ নেই। স্থায়ী থিয়েটার গৃহ থাকে তো সাজসরঞ্জাম আলো ইত্যাদি নেই। সারা ভারতের আটত্রিশ কোটি নরনারীর জন্যে স্থায়ী থিয়েটার গৃহ আছে কালকাতায় চারটি, কটকে দুটি, পুরীতে একটি ও ব্রহ্মপুরে একটি। মণিপুরেও স্থায়ী থিয়েটার গৃহ আছে। এগুলিরও পড় পড় অবস্থা। একা মহারাষ্ট্রেই নাকি চল্লিশটি প্রোফেসনাল অভিনেতা দল আছে। এরা ঘুরে বেড়ায়, কারণ কোথাও এদের স্থায়ী থিয়েটার গৃহ নেই। অভিনয়ের পক্ষে সম্পূর্ণ অনুপযোগী হল-ঘর ভাড়া নিয়ে এরা দুধের সাধ ঘোলে মেটায়। সে সব হল-ঘরও ইদানীং সিনেমা-ওয়ালারা উচ্চ হারে লীজ নিয়েছে। সুতরাং নাটকওয়ালারা এখন পুরোপুরি বেদুইন। সুখের বিষয় পৃথ্বীরাজ কাপুর বোম্বাই শহরে একটি স্থায়ী থিয়েটার গৃহ করে প্রোফেসনালদের দিয়ে সপ্তাহে তিন দিন অভিনয়ের ব্যবস্থা করেছেন। পরীক্ষামূলক থিয়েটার চালাচ্ছেন আলকাজি ও মার্জাবান বোম্বাই শহরে। দীনা গান্ধীর দল কাজ করে যাচ্ছেন আহমেদাবাদকে কেন্দ্র করে, শম্ভু মিত্রের দল কলকাতাকে কেন্দ্র করে। এঁরা ঠিক এমেচার নন। ঠিক প্রোফেসনাল নন। মাঝামাঝি।

বাদবাকী সব এমেচার। এমেচারদের যোগ্যতা থাকলে কী হবে, প্রচুর অবসর নেই। সারা দিন অন্যত্র খেটেখুটে এসে তাঁদের শরীর মন শ্রান্ত। রিহার্সলের জন্যে দম থাকে না। জীবিকার জন্যে কে কোথায় ছিটকে পড়ে। দল ভেঙে যায়। কনটিনিউইটি বা ক্রমান্বয় ভঙ্গ হয়। এমেচারদের ভিতর থেকে বড়ো আর্টিস্ট উঠে আসেন, কিন্তু সেই বড়ো আর্টিস্ট যদি প্রোফেসনাল না হতে পান তা হলে তাঁর বিকাশ সেইখানেই শেষ। এমেচার গোষ্ঠী চিরকাল থাকবে, থাকা উচিত। কিন্তু যে দেশের সব আর্টিস্ট এমেচার বা ভবঘুরে সে দেশের লোক কোনো কালেই নাট্যকলাবিৎ হবে না। সে দেশের নাট্যকলা অর্ধ-বিকশিত থেকে যাবে। দৈবাৎ এক আধখানা ভালো নাটক লেখা হবে হয়তো. কিন্তু সে নাটক রঙ্গালয়ের অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবে না। সুতরাং শেক্সপীয়ার প্রভৃতির নাটকের সঙ্গে তুলনায় নিষ্প্রভ হবে। পাঠকমাত্রেরই সাধ দর্শক হতে। সে সাধ মিটবে না। ভালো নাটক সে সাধও মেটাতে চায়। পারেও।

আমরা তা হলে কী করব ? এ নিয়ে বিস্তর আলাপ আলোচনা হলো। সারা ভারত জুড়ে উৎসাহের উদ্যমের বান এসেছে। দেখে আনন্দ হলো। দুঃখও হলো এইজন্যে যে এঁরা অনেকে সরকারের কাছে হাতী ঘোড়া আশা করেছেন। কপালে আছে নিরাশা। তার চেয়ে জনসাধারণের দ্বারস্থ হলে কাজ বেশী হতো। দিল্লীর দোষই এই যে সেখানে যে যায় তার দৃষ্টি উর্ধ্বমুখী হয়। হওয়া উচিত কিন্তু নিম্নমুখী। কবে যে আমাদের শিল্পীদের শিক্ষা হবে! শুনে তাজ্জব লাগল যে সরকার এত কিছু করে দেবে কিন্তু কথা বলবে না। নিরঙ্কুশ স্বাধীনতা আর দেদার টাকা দুই মিলে যাবে সরকারী দরবারে। ধন্য! এখানে বলে রাখতে চাই যে সেমিনারের সকলে কিছু এরূপ আশাবাদী নন।

শোনা যায় মহাবীর আলেকজান্ডার এক সাধুর কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, আপনার জন্যে আমি কী করতে পারি ? সাধু উত্তর দিয়েছিলেন, দয়া করে আপনার ছায়াটা সরিয়ে নিন। সরকারের কাছে শিল্পীমাত্রেরই সেই একই অনুরোধ। দয়া করে তাঁর ছায়াটা সরিয়ে নিলেই শিল্পী স্বচ্ছন্দ হয়। দেশীয় সরকার কেন স্বাধীনতার পরেও সেনসরশিপ আইন বহাল রেখেছেন, কবে থানার দারোগার কাছে উদয়শঙ্করকে হাজিরা দিতে হয়েছিল, পুলিশের অনুমতি পাবার জন্যে কেমন করে নাজেহাল হতে হয়েছিল একজন প্রসিদ্ধ শিল্পীকে— শোনা গেল এসব স্বকর্ণে। স্বচক্ষেও দেখা আছে। সরকার যদি সদয় হন তবে নাট্যকলার পূর্ণ বিকাশের পথে যত রকম বাধা আছে সব একে একে অপসারিত করুন। আমোদ কর তুলে দিন।

কিন্তু সরকার মা বাপ হবেন আর শিল্পী স্বাধীন হবে এর মধ্যে কোথাও একটা ফাঁকি আছে। আমাদের থিয়েটারকে নিজের পায়ে দাঁড়াতে হবে। যেমন দাঁড়িয়েছে ইংলন্ডের থিয়েটার। সে দেশে লিলিয়ান বেলিস-এর মতো মহিলা জন্মেছেন। সারা জীবন পরিশ্রম করে তিনি ওল্ড ভিক থিয়েটারটিকে দাঁড় করিয়ে দিয়েছেন। ওল্ড ভিক লাভের জন্যে চালানো হয় না। তার পিছনে কোনো অর্থলোলুপ মালিক নেই। অতিদরিদ্রদের নাট্যপিপাসা মেটানোর জন্যেই তার সৃষ্টি। তার প্রধান অবলম্বন শেক্‌স্‌পীয়ার। বরং বলা যেতে পারে শেক্‌স্‌পীয়ারকে দীনজনলভ্য করার জন্যেই তার সৃষ্টি। অভিনেতা অভিনেত্রীরা প্রোফেসনাল, কিন্তু তাঁদের অর্থলালসা নেই। নটক যে একপ্রকার মিশন তা লিলিয়ান বেলিস প্রমাণ করে দিয়েছেন। তেমন প্রমাণ আরো আছে।

আমরা আশা রাখব যে আমাদের দেশে অনেকে থিয়েটারকে ধর্ম করবে, তার জন্যে আত্মনিবেদন করবে। দীনতম দর্শকের প্রয়োজনের উপর লক্ষ রাখতে হবে। উচ্চতম নাট্যকারের সঙ্গে যুক্ত থাকতে হবে। এ রকম দু'চারটি সম্প্রদায় থাকলেই যথেষ্ট। এঁরাই অগ্রণী।

(১৯৫৬)

প্রমথ চৌধুরী প্রসঙ্গে

আপনার আদেশে শ্রীজীবেন্দ্র সিংহরায় মহাশয়ের 'প্রমথ চৌধুরী' পড়ে দেখলুম। জীবেন্দ্রবাবুকে অভিনন্দন করা উচিত, আমরা কেউ যা করে উঠতে পারিনি তিনি তা পেরেছেন। চৌধুরী মহাশয়ের উপর বেশ বড়ো একখানি বই লিখেছেন। এ বই মোটের উপর সুলিখিত।···

এক জায়গায় তিনি লিখেছেন, "আমরা দেখেছি, প্রমথ চৌধুরী মানবিকতার ভাষ্যকার নন, তিনি ভাষ্যকার নাগরিকতার। তিনি বাঙলার আপামর জনসাধারণ নয়, নগরের একশ্রেণীর বুদ্ধিজীবী মানুষকে নিয়ে—তাদেরই জন্যে সাহিত্য রচনা করেছেন।"

এখানে মানবিকতা শব্দটি পারিভাষিক শব্দ। ইংরেজী হিউমানিজম শব্দের প্রতিশব্দ। হিউমানিজম কথাটির পিছনে পাঁচ শ বছরের ইতিহাস রয়েছে। আগেকার দিনের ভাবুকরা ডিভাইন-কে জীবনের কেন্দ্র করে ঘুরতেন। তার বদলে যাঁরা হিউমান-কে জীবনের কেন্দ্র করেন, গির্জায় না গিয়ে ল্যাবরেটরীতে বা লাইব্রেরীতে যান, টেলিস্কোপ ও মাইক্রোস্কোপ বানান, থিওলজির পরিবর্তে ফিলসফি চর্চা করেন, বিশ্ববিদ্যালয়ে ফিলসফির চেয়ার প্রতিষ্ঠা করেন, মানুষের প্রকৃত অধ্যয়নের বিষয় যে মানুষ এই মন্তব্য প্রচার করেন ও মানবনিয়তির ধ্যানে বিভোর থাকেন তাঁরাই হিউমানিস্ট ও তাঁদের মতবাদই হিউমানিজম। মতবাদ না বলে জীবনবেদ বলা যেতে পারে। তাঁরা ডিভাইনপন্থীদের মতো জনপ্রিয় ছিলেন না, জনতা তাঁদের বুঝতে পারত না, তাঁরাও জনতাকে বোঝাবার জন্যে বর্ণপরিচয় ও শিশুবোধক লিখতে নারাজ ছিলেন। নগর ও গ্রাম এ ক্ষেত্রে অপ্রাসঙ্গিক। গ্রামে বাস করলে বিদ্যাসাগরের মতো ঢিল খেতে হতো, গ্রামে তো ডিভাইনওয়ালাদের একচ্ছত্র শাসন। যেমন এ দেশে তেমনি ও দেশে। শহরেও যে নির্যাতন ছিল না তা নয়। তবু সেখানে আত্মগোপনের সুযোগ ছিল। পশ্চিমের হিউমানিস্টরা বেশীর ভাগই লেখাপড়ায় ও অনুসন্ধানে নিবিষ্ট থাকতেন। যেখানে তার ব্যবস্থা ছিল সেইখানেই তাঁদের স্থিতি ছিল। সাধারণত বিশ্ববিদ্যালয়ের আশেপাশে। বিশ্ববিদ্যালয় ব্যতীত আর-এক জায়গায় তাঁদের দৌড় ছিল। ধর্মাধিকরণ বা হাইকোর্ট। বলা বাহুল্য এসব নগরেই অবস্থিত। তা বলে তাঁরা নাগরিকতার ভাষ্যকার ছিলেন না। তাঁরা মানবিকতারই ভাষ্যকার। পাশ্চাত্ত্য হিউমানিস্টদের সঙ্গে যদি ঊনবিংশ শতাব্দীর বাঙালী হিউমানিস্টদের মিলিয়ে দেখা হয় তা হলে দেখা যাবে বিদ্যাসাগর বা প্রমথ চৌধুরী নগরে বাস করেও নাগরিকতাধর্মী নন, জনবল্লভ না হয়েও মানবিকতাধর্মী। জীবেন্দ্রবাবু পাশ্চাত্ত্য হিউমানিস্টদের জীবনের সঙ্গে চৌধুরী মহাশয়ের জীবন মিলিয়ে দেখলে আপামর সাধারণ ইত্যাদির মাপকাটি ব্যবহার করার কথা ভাবতে পারবেন না। ও মাপকাটি হিউমানিস্টদের জন্যে নয়।

(৮ই জানুয়ারী ১৯৫৫। শান্তিনিকেতন)

(শ্রীযুক্তা ইন্দিরা দেবীচৌধুরানিকে লেখা চিঠি)

সাম্যবাদ প্রসঙ্গে

সেদিন তুমি লিখেছিলে, "সাম্যবাদীরা বলেছেন যে, আপনারও সাম্যবাদী হবার সম্ভাবনা আছে। আপনার ভাষণে আপনি আধা-মার্কসিস্ট।"

এর উত্তর দিতে এক মাস হলো চেষ্টা করছি। উত্তরটা হয়তো আমার নিজেরই মনের মতো হবে না। সাম্যবাদীদের যদি না হয় আশ্চর্য হব না।

দু হাজার বছর আগে যীশু আশা দিয়ে গেলেন যে দীন যারা তারাই ধরিত্রীর উত্তরাধিকার পাবে। "The meek shall inherit the earth." প্রথম দিকে তাঁর শিষ্যেরা প্রাণপাত করছিলেন সে আশা পূর্ণ করতে। পরে দেখা গেল তাঁরা ইহলোকে সে আশা পূর্ণ করবেন না। করবেন পরলোকে। রেনেসাঁসের পর একদিন পরলোকে সংশয় এল। তখন সে আশা পূর্ণ করবার ভার নিলেন ফরাসী বিপ্লবের আদি পুরুষরা। নানা কারণে ফরাসী বিপ্লব অসমাপ্ত রইল। এই অসমাপ্তিকে সমাপ্তি দেবার ব্রত নিলেন মার্কস। তাঁর শিষ্য লেনিন রুশ বিপ্লব ঘটালেন। সেটা এক হিসাবে ফরাসী বিপ্লবের দ্বিতীয় অধ্যায়। দীনহীনদের হাতে এতখানি ক্ষমতা ইতিহাসে কোনো দিন আসেনি। সত্যি, এই বিপ্লব দিকে দিকে ব্যাপ্ত হয়ে যে আশা জাগিয়েছে তার তুলনা নেই। এর প্রতিপক্ষরা যদি অনুরূপ আশা না দেয়, সে আশা যদি মিথ্যা আশা হয়, তা হলে বিপ্লব বিশ্বব্যাপী হবে। কেউ রোধ করতে পারবে না। যীশু যথার্থই বলেছেন, আমি অক্ষরে অক্ষরে বিশ্বাস করি—"The meek shall inherit the earth."

সাম্যবাদীদের বিরুদ্ধে যেসব মামুলি বুলি শোনা যায় আমার মুখে কেউ তা শোনে না। তারা যদি ঈশ্বরবাদী না হয়ে থাকে তবে বৌদ্ধরাও কি তাই নয়? কেউ তো বলে না যে বৌদ্ধরা ধার্মিক নয়, তাদের ধর্ম নেই। সাম্যবাদেরও একটা আধ্যাত্মিক দিক আছে, আধ্যাত্মিক শক্তি না থাকলে লেনিনের মতো লোক অসাধ্যসাধন করতে পারতেন না। এ শক্তি অন্য অর্থে আধ্যাত্মিক। প্রচলিত অর্থে নয়। সুপারন্যাচারালকে আমরা আধ্যাত্মিক বলে ভ্রম করি। সেইজন্যে সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থ নিষ্কাম কর্তব্যনিষ্ঠ মানুষকে আধ্যাত্মিক বলে চিনতে পারিনে। বিদ্যাসাগরকে, লেনিনকে চিনতে ভুল করি। বুদ্ধকেও করা হয়েছিল একদিন। আসলে আধ্যাত্মিকতার কোনো সংজ্ঞা নেই, যেমন ঈশ্বরের কোনো সংজ্ঞা নেই। যারা সংজ্ঞা দিতে যায় তারাই ভ্রান্ত। আমার মতে যে ঈশ্বরের কাজ করে, ঈশ্বরের ইচ্ছা পূরণ করে, সে ঈশ্বর না মানলেও আধ্যাত্মিক। আর যারা ঐহিক বা পারত্রিক বাসনা কামনায় জর্জর, নিজেদের ইচ্ছাকেই ঈশ্বরের উপর চাপাতে চায়, ধর্মের সাহায্যে নিজেদেরই উদ্দেশ্যসিদ্ধি করে তারা আধ্যাত্মিক নয়, তারা সুপারন্যাচারালের উপাসক। অনেক সাধু সন্ন্যাসীর চেয়ে আমি মার্কসকে লেনিনকে আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে অগ্রসর ও উন্নত মনে করি। তবে সব সাম্যবাদীকে নয়।

অর্ধেক পৃথিবী থেকে যে আজ প্রফিট মোটিভ উঠে গেছে এর চেয়ে সুনীতি

আর কী হতে পারে? সম্পত্তিকে যে পবিত্র জ্ঞান করা হচ্ছে না এর চেয়ে সুনীতি আর কোথায়? নারীকে যে সম্পত্তি মনে করা হচ্ছে না এর চেয়ে সুনীতি কে কবে দেখেছে? বেশ্যাবৃত্তি তুলে দিয়েছে আর কোন নীতিনিপুণ? আমার মতে সাম্যবাদীরা নীতির ক্ষেত্রেও অনেকের চেয়ে অগ্রসর ও উন্নত। অবশ্য সব সাম্যবাদী নয়।

সাম্যবাদের স্বপক্ষে আরো লিখতে পারতুম, কিন্তু তা হলে তোমার বন্ধুরা ঠাওরাতেন আমার কনভারসন আসন্ন, আমার আত্মা তাঁদের মুঠোর মধ্যে পড়ল বলে। আমি চিরদিন যা ছিলুম আজও তাই রয়েছি, ভবিষ্যতেও তাই থাকব। আমি নৈরাজ্যবাদী। গত শতাব্দীতে মার্কসের সঙ্গে বাকুনিনের বিচ্ছেদ হয়ে যায় কী নিয়ে জানো তো? বাকুনিন রাষ্ট্র চাননি, মার্কস চেয়েছিলেন সাময়িকভাবে। রাশিয়ার দিকে চেয়ে কে বিশ্বাস করবে যে রাষ্ট্র দিন দিন শুকিয়ে যাচ্ছে বা যাবে! জগন্নাথের রথের মতো রাষ্ট্র যে কত মানুষকে, কত ব্যক্তিকে মাড়িয়ে গুঁড়িয়ে ক্ষতবিক্ষত করে চলেছে তার লেখাজোখা নেই। রথ চললেই হলো, লোকে টানলেই হলো, কে মরছে কে পঙ্গু হচ্ছে সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই। এ রথযাত্রা বন্ধ হবার নয়, আরো কত শত বছর চলবে। আমি এর মধ্যে নেই। আমি নৈরাজ্যবাদী। রাষ্ট্রের সুযোগ সুবিধা যথাসম্ভব কম নিয়েছি, ক্ষমতা যখন হাতে ছিল যথাসম্ভব কম ব্যবহার করেছি, স্বেচ্ছায় হাতছাড়া করেছি। নিরঙ্কুশ ক্ষমতাকে আমি একটা evil মনে করি। তা ইংরেজের হাতে থাকলেও evil, কংগ্রেসের হাতে থাকলেও evil, সাম্যবাদীদের হাতে থাকলেও evil। অঙ্কুশটা রাষ্ট্রের হাত থেকে কেড়ে নিয়ে সর্বজনের হাতে দিতে হবে। তারা যদি আত্মনিপীড়ন করে তবে তাদের হাত থেকে কেড়ে নিয়ে জলে ফেলে দিতে হবে।

আমি বুঝি যে নৈরাজ্যবাদের দিন আগত হতে কয়েক শতাব্দী দেরি। তত দিন যদিও আমি বাঁচব না তবু তার জন্যে বীজ বুনে যাব। আইডিয়ার বীজ। স্বপ্নের বীজ। ইতিমধ্যে সে পন্থাকেই শ্রেয় বলব যাতে হিংসা নেই বা থাকলে সব চেয়ে কম। যা বিনা বিচারে দণ্ড দেয় না, দণ্ড দিলে সব চেয়ে কম দণ্ড দেয়। যার বিচারপদ্ধতি সর্বদা সাক্ষ্যপ্রমাণের উপর নির্ভর করে, অভিযুক্তকে আত্মরক্ষার সুযোগ দেয়। যার শাসনপদ্ধতি শাসনতন্ত্রের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ও সংযত। যার শাসকরা নেহাৎ বাধ্য না হলে গুলী চালায় না, চালাতে বাধ্য হলে সব চেয়ে কম চালায়। যার আইন লোকপ্রতিনিধিদের দ্বারা তৈরি হয়, লোকপ্রতিনিধিরা প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটে নির্বাচিত হয়। যার লোকপ্রতিনিধিদের কাছে জবাবদিহির দায় আছে শাসকদের, নির্বাচকদের কাছে জবাবদিহির দায় আছে লোকপ্রতিনিধিদের।

অনুমান করতে পেরেছ আমি ডেমক্রেসির কথা বলছি। যে ডেমক্রেসি ইংলন্ডে বিবর্তিত হয়েছে ধাপে ধাপে, শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে। অন্যান্য দেশ তার কাছ থেকে শেখে, ইচ্ছামতো পরিবর্তন করে। মানবজাতির এত বড়ো একটা উত্তরাধিকারকে যদি কেউ এক কথায় নস্যাৎ করে দেয় এই বলে যে ওটা

ক্যাপিটালিজমের মুখোশ তা হলে সে জানে না সে কী বলছে। সন্দেহ নেই যে ধনীরা ওটা নিজেদের স্বার্থে লাগায়, কিন্তু আলো হাওয়া জল মাটি সবই তো ওরা নিজেদের স্বার্থে লাগায়। ইদানীং আরো অনেককে দেখছি হঠাৎ ডেমক্রাট সাজতে। অন্তত নামজপ করতে। এ-ও তো একপ্রকার স্বার্থসিদ্ধি। ডেমক্রেসির অভিজ্ঞতা যেসব দেশের জনসাধারণের বহু শতাব্দী ধরে হয়েছে তারা একদিন ঐ পদ্ধতিতেই ক্যাপিটালিজমকে মনার্কির মতো ফিউডালিজমের মতো নখদন্তহীন করবে। রাজা ও অভিজাতদের মতো ধনিকরাও শোভাবর্ধন করতে পারে, কিন্তু প্রকৃত ক্ষমতা তাদের হাত থেকে চলে যাবে। এটা সময়সাপেক্ষ, শিক্ষাসাপেক্ষ, আত্মবিশ্বাসসাপেক্ষ। চরিত্রসাপেক্ষ। যে দেশে ডেমক্রেসি বদ্ধমূল সে দেশে বিপ্লব হবে না। বিপ্লব আবশ্যক হবে না।

আমাদের দেশে ডেমক্রেসি নিতান্ত নাবালক। এর বিরুদ্ধে বহু পরস্পরবিরোধী শক্তি কাজ করছে। শক্তিগুলো পরস্পরবিরোধী বলেই রক্ষা। যদি কোনো দিন একজোট হয় তা হলে ডেমক্রেসি বোধ হয় আঠারো পেরোবে না। জার্মানীতে যেমন হয়েছিল। যাঁদেরই সঙ্গে কথা হয় তাঁরাই বলেন এ দেশে ডেমক্রেসি জবাহরলালের সঙ্গে সঙ্গে যাবে। তার জায়গায় আসবে ফাসিস্ট ডিকটেটরশিপ। জার্মানীর মতো। কমিউনিস্ট ডিকটেটরশিপের আশা কারো কারো থাকতে পারে, আশঙ্কা একজনেরও নেই।

জবাহরলালের মতো নেতা না থাকলে ডেমক্রেসি ব্যর্থ হতে পারে, এটা অমূলক নয়। কিন্তু ডেমক্রেসি সাধারণত ব্যর্থ হয় বিশ্বাসহীনতায়। জনসাধারণ যদি বিশ্বাস হারায়, শিক্ষিতরা যদি বিশ্বাস হারায়, নেতা বা দলপতিরা যদি বিশ্বাস হারান তা হলে ডেমক্রেসি টিকতে পারে না। ডেমক্রেসির ভিতরে স্বয়ংশোধনের শক্তি নিহিত। বিশ্বাস হারানোর অর্থ এই স্বয়ংশোধনের শক্তির উপর বিশ্বাস হারানো। এই শক্তির উপর যদি বিশ্বাস থাকে তা হলে বাহ্য রূপ যে কোনো দিন বদলানো যায়। ফর্ম যে সব দেশে এক রকম হবেই এমন কোনো বাধ্যবাধকতা নেই। কিন্তু অন্তঃসার সব ডেমক্রেসির এক। এ ব্যবস্থায় এক পক্ষ শাসন করে, এক পক্ষ সমালোচনা করে, প্রতিবাদ করে, আইনসম্মত ভাবে প্রতিরোধ করে। যদি বেআইনী ভাবে প্রতিরোধ করতে হয় তবে তা অহিংস হওয়া চাই। এই যে অন্তঃসার এ যদি অন্তর্হিত হয় তা হলে ফর্ম নিয়ে ডেমক্রেসি বাঁচে না। আমাদের এই নাবালক ডেমক্রেসির জীয়নকাটি যে কী আর মরণকাটি যে কোনটা আমাদের সকলের তা জেনে রাখা উচিত।

এ দেশে এখনো ডেমক্রেসি দৃঢ়মূল হয়নি বলে এখানে একদল নিঃস্বার্থ লোকের প্রয়োজন আছে যারা শাসক হতে চায় না, শাসক দলকে হারিয়ে দিয়ে তাদের জায়গা নিতে চায় না। এরা হবে কায়মনোবাক্যে স্বাধীন ও স্বতন্ত্র। এরা প্রত্যেকটি বিষয়ে সুবিবেচিত মত দেবে, কেউ গ্রহণ করুক বা না করুক। এরা এমন প্রতিপত্তির অধিকারী হবে যে দেশ এদেরই কথায় কান দেবে। একদল নিরপেক্ষ সৈনিক না হলে যেমন দেশরক্ষা হয় না একদল নিরপেক্ষ প্রহরী না

হলে তেমনি ডেমক্রেসি রক্ষা হয় না। এখানে 'দল' কথাটার অর্থ পার্টি নয়। জার্মানীতে প্রহরী ছিল না, ভারতে প্রহরী চাই।

(১৮ই জুলাই ১৯৫৫)

(শ্রীসুরজিৎ দাশগুপ্তকে লিখিত পত্র)

অন্যান্য প্রসঙ্গে

স্নেহের সুরজিৎ,

…দার্জিলিংএ আমরা দু'মাস থাকব। বিশেষ কোথাও যাব না, কারণ আমরা ঠিক বেড়াতে যাচ্ছিনে, যাচ্ছি আরো কাজ করতে, আরো ভাবতে।

কলকাতা আমি বড়ো একটা যাইনে, গেলে অবশ্য সোভিয়েট আর্ট প্রদর্শনী দেখা যেত। দুনিয়া জুড়ে যেখানে যত কাজ হচ্ছে সব কি কোনদিন দেখতে পাব? জীবনে অনেক দেখার মতো এ দেখাও বাদ গেল। তোমরা যারা দেখলে —তোমাদের চোখে আমিও দেখলুম।

প্রেমেন্দ্রবাবুর লেখা ছেড়ে দেবার সঙ্গত কারণ দেখছিনে। সরস্বতী কোনো-দিন তাঁর সেবকদের লক্ষ্মীর বাহনদের মতো ধনেপুত্রে ফুলে উঠতে দেন না। যারা সাহিত্যের দায় নেবে তারা হয়তো কোনো বছর কিছু বেশী পাবে, কোনো বছর কিছু কম—কিন্তু মোটের উপর তাদের পাওনা লক্ষ্মীমন্তদের চেয়ে বহু-গুণ অল্প। এ কথা জেনেই আমরা সাহিত্যের দায় নিয়েছি। যখন দেখেছি সংসার চলছে না তখন বাধ্য হয়ে অর্থকরী পেশা (চাকরি বা ওকালতী বা সিনেমা) অবলম্বন করেছি। কিন্তু তা বলে সাহিত্য ছেড়ে দিইনি বা তার উপর শ্রদ্ধা হারাইনি। আমরা লক্ষ্মীর ঘরের লোক নই, সরস্বতীর ঘরের ছেলে। জীবনের শেষের দিকে হঠাৎ সাহিত্যে বিতৃষ্ণা হলেই কি লক্ষ্মীর প্রসাদ জুটবে? আমার মনে হয় প্রেমেন্দ্র মিত্রের এটা ক্ষণিক অভিমান।

সাহিত্যের দায় না বলে সৌন্দর্যের দায় বলা ভালো। এ দায় আমি যে দিন নিই সে দিন আমি নিন্দা প্রশংসার কথা ভাবিনি। নিন্দাই হয়তো জীবনভর জুটবে, যদিও প্রশংসা বড়ো কম জোটে নি। কিন্তু আসল কথা সৌন্দর্য সৃষ্টি করা হচ্ছে কি না। এ বিষয়ে আমি নিজের উপর খুব সন্তুষ্ট নই। তবে পঁচিশ বছরে যা করেছি তাতে অসন্তোষেরও বিশেষ হেতু নেই। সাহিত্যে যেটা কম পড়েছে জীবনের ঘরে সেটা জমেছে। জীবনকে গভীর ভাবে উপলব্ধি করেছি। আর্টকেও চিনেছি।

তোমার নিজের জীবনের কথা যা লিখেছ তার মুখে উত্তর দেব, লিখে নয়। আমি হলে এগিয়েই যেতুম, যা থাকে কপালে। তবে নিজের শক্তি বুঝে কাজ করবে। সাধ্যাতীত কিছু করতে গেলে জীবনের তার ছিঁড়ে যাবে।…

শান্তিনিকেতন, ১৬ই এপ্রিল ১৯৫২…

॥ ২ ॥

তোমার চিঠি ও গল্প পেয়েছি।···

নীলাঞ্জন যে পূরবীকে অতিক্রম করে উঠেছে এটা আশাপ্রদ। এর পরে সে কতবার কত জনকে কাটিয়ে উঠবে, ছাড়িয়ে উঠবে, তার পরে পড়বে যার হাতে তার হাত থেকে নিষ্কৃতি নেই। সে যদি পরকীয়া হয়ে থাকে তা হলে সারা জীবন জ্বলতে হবে। যদি হয় স্বকীয়া তা হলেই এ জীবনে সুখের মুখ দেখবে।

স্বকীয়া পরকীয়া নিয়ে বৈষ্ণবেরা theorise করেছেন। আমাদের সমাজে যার সঙ্গে যার প্রেম হয়নি তার সঙ্গে তাকে জুড়ে দেওয়া হয় মন্ত্র পড়ে। তার সঙ্গে তার হয়তো সারা জীবন প্রেম হবে না, তার জন্যে সমাজের মাথাব্যথা নেই। ঘর সংসার চললেই হলো, পুত্রকন্যা হলেই হলো। অধিকাংশ স্ত্রীপুরুষ নাকি এতেই সুখী। কিন্তু এমন দু'দশ জন নরনারী পাওয়া যায় যারা এ ব্যবস্থায় সুখী নয়। তারা "স্বকীয়" বা "স্বকীয়া" নামে পরিচিত, প্রকৃতপক্ষে পরকীয় বা পরকীয়াকে ভালোবাসতে পারে না। ভালোবাসে "পরকীয়" বা "পবকীয়া" নামে পরিচিত প্রকৃতপক্ষে স্বকীয় বা স্বকীয়াকে। সমাজ তা দেখে অগ্নিশর্মা। এই হতভাগ্য প্রেমিক প্রেমিকাকে সকলে ঘৃণা করে। তবে বৈষ্ণবরা এদের প্রতি অনুকম্পাবশত সমাজের বাইরে একটুখানি জায়গা করে দিয়েছেন। বৈষ্ণববৈষ্ণবী হয়ে এরা অসামাজিক বা অর্ধসামাজিক জীবনযাপন করতে পাবে। জাতবোষ্টম বলে একটা নতুন সমাজের (সমাজের ঠিক নয়, জাতের) পত্তন হয়েছে। তারা অনেকটা উদার।

Theorise করেছেন বলেছি। তার মানে, বৈষ্ণবরাও কোনো সত্যিকার সমাধান খুঁজে পাননি। স্পষ্ট বুঝতে পারছ, আমাদের বিবাহপ্রথা অন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত। অপ্রেমিকের সঙ্গে অপ্রেমিকার বিবাহ রদ করা চাই। সে সাহস বৈষ্ণবদের ছিল না। তাঁরা ঐ অন্যায়টাকে মাথা পেতে নিয়েছিলেন। ওটাকে মেনে নিয়ে স্বকীয়াকে করেছিলেন তুচ্ছ, পরকীয়াকে উচ্চ। কিন্তু সমাজ সেটা স্বীকার করবে কেন? সে জন্যে দেখা যায় বড়ো বড়ো বৈষ্ণবেরা সকলেই সন্ন্যাসী, নারীর সঙ্গে কথা বলতেও তাঁদের মানা। চৈতন্যদেব তো এ বিষয়ে অত্যন্ত কঠোর ছিলেন। মুখে পরকীয়াতত্ত্ব আওড়ানো হচ্ছে, কার্যত স্বকীয়া বর্জন করা হচ্ছে, না স্বকীয়া না পরকীয়া কেউ কাছে আসতে পারছে না, বাস্তব জীবনে নারীর অংশ নেই, কেবল কল্পজীবনে আছেন রাধা কিংবা গোপিকারা— এ অবস্থায় যা হবার তাই হয়। সাধক নিজেকেই নায়িকা ভাবেন, শ্রীকৃষ্ণকে নায়ক।

ভবিষ্যতে আমাদের বিবাহপ্রথা ইংলণ্ডের বা আমেরিকার মতো হলে প্রেমিকা হবে "স্বকীয়া", প্রেমিক হবে "স্বকীয়", পরকীয় বা পরকীয়ার উপর অযথা উচ্চতা আরোপ করা হবে না। সাধনমার্গে স্বকীয়ার শ্রেষ্ঠতা বেদ উপনিষদ্ রামায়ণ মহাভারতের যুগে ছিল, তখন বিবাহ ছিল প্রণয়মূলক। মাঝখানের এই কদর্য অধ্যায়টা আমাদের মূল্যজ্ঞান বিকৃত করে দিয়েছে।···

শান্তিনিকেতন, ২৩শে এপ্রিল ১৯৫২

॥ ৩ ॥

…গান্ধী সম্বন্ধে সুন্দরলালজীর ধারণা এমন ধোঁয়াটে হবে এটা (তোমার রিপোর্টের উপর নির্ভর করে বলছি) আমি প্রত্যাশা করিনি। না হয় ধরেই নিলুম যে চীনা কমিউনিস্টদের ends ও গান্ধীজীর ends একই। কিন্তু means কি এক? Means বাদ দিলে গান্ধীবাদের কী থাকে? গান্ধী যেসব জিনিস চেয়েছেন তাঁর আগে আরো অনেকে তা চেয়েছেন—স্বাধীনতা, বিকেন্দ্রীকরণ, বিশ্বশান্তি ইত্যাদি। গান্ধীবাদের গুরুত্ব এসব জায়গায় নয়। তার গুরুত্ব এইখানে যে গান্ধীর হাতে অহিংসা ভিন্ন আর কোনো অস্ত্র ছিল না, থাকলেও তিনি তা ছুঁড়ে ফেলে দিতেন। আমার "মন পবনে" যে "জখ্‌মী দিল্‌" নামে গল্পটি আছে সেটিতে দেখবে সাবারকারকে গান্ধী বলেছিলেন, "I would drop the stick lest I should feel tempted to kill the snake."

হিংসার অস্ত্র স্বেচ্ছায় ত্যাগ করে অহিংস অস্ত্রের দ্বারা সংগ্রাম করে কোনোদিন এ দেশে নতুন সমাজের পত্তন হবে কি না ভবিতব্য জানে। আমার জীবনে আমি এ জিনিস দেখে যেতে পারব বলে মনে হয় না। গান্ধীহত্যার সঙ্গে সঙ্গে আমারও মন ভেঙে গেছে। তা বলে আমি চীনা কমিউনিস্টদের সমাজকে গান্ধীবাদী সমাজ বলে ভুল করব না, ভুল বকব না। আমরা বরং আরো দু'পাঁচশো বছর অপেক্ষা করব তার জন্যে, তবু গান্ধীর স্বপ্নকে ওভাবে ব্যঙ্গ করব না। চীনারা যদি সৈন্যদল ভেঙে দেয়, শহর ছেড়ে চলে যায় তা হলেই বুঝব ওরা গান্ধীবাদী। তেমন দাবি ওরা করছে না। ওদের হয়ে সুন্দরলালজী কেন করবেন?…

কালিম্পং, ৯ই জুন ১৯৫৩

॥ ৪ ॥

…চীনে যা হয়েছে, যা হচ্ছে, যা হবে তা প্রশংসনীয় হতে পারে, কিন্তু তা গান্ধীবাদের প্রয়োগ বা পরীক্ষা নয়। তার সঙ্গে গান্ধীর নাম জুড়ে দেওয়া বা ওর গায়ে গান্ধীবাদের ছাপ মেরে দেওয়া অত্যন্ত অন্যায়। যে রাষ্ট্রের পেছনে violent sanctions রয়েছে—তা সে চীন হোক বা ভারত হোক—সে রাষ্ট্র গান্ধীবাদী রাষ্ট্র নয়। গান্ধীবাদী রাষ্ট্রের পেছনে থাকবে non-violent sanctions অর্থাৎ রাষ্ট্র নির্ভর করবে না সৈন্যসামন্তের উপরে, পুলিশের উপরে। আজ পর্যন্ত দুনিয়ার কোনো মুল্লুকে সৈন্য উঠে যায় নি, পুলিশ উঠে যায়নি। তা বলে আদর্শ কেন বদলাবে? যদি বদলায় তবে গান্ধীবাদ বলে পরিচয় না দিয়ে সুন্দরবাদ (সুন্দরলালবাদ) বলে একটা নয়া মতবাদ প্রতিষ্ঠা করা উচিত। তার চেয়ে মার্ক্সবাদ ভালো।

তবে গান্ধীজীও রাতারাতি গান্ধীবাদী রাষ্ট্র স্থাপন করতে চাননি। দেশের লোক তার জন্যে তৈরি না হলে তা ধোপে টিকবে না—যেমন টিকল না

অশোকের রাজ্য। তিনি আশা করেছিলেন স্বাধীন ভারত সরকার সৈন্যসংখ্যা কমাবেন, সামরিক খরচ কমাবেন। তার বিপরীত দেখে তাঁর মন ভেঙে যায়। ঐ দারুণ দাঙ্গাহাঙ্গামার দিনে আমরা সবাই সৈন্য চেয়ে পাঠিয়েছি কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে, পুলিশ চেয়ে পাঠিয়েছি প্রাদেশিক সরকারের কাছে। আমি স্বয়ং পুলিশ নিয়ে জেলা শাসন করছি।…

কালিম্পং, ১৪ই জুন ১৯৫৩

॥ ৫ ॥

…"কন্যা" আমার ত্রিশ বছর ব্যাপী সাধনার ফল। সাধনার প্রথম ধাপে পা দেবার আগেই তুমি ওর শেষ ধাপের মর্ম কী বুঝবে? তবে আমি কাউকে পরামর্শ দেব না এই চারটি পথের পথিক হতে। বরং সতর্ক করব। ধরে নাও যে ও বইটাই একটা warning বা 'চেতাবনী'। ওর লাইনের ফাঁকে ফাঁকে অনেক কথা অনুক্ত রাখা হয়েছে। যারা পাবে তারা বুঝবে। ও সব অন্তরঙ্গ কথা প্রকাশ্যে বলা যায় না। যারা ও পথ দিয়ে যাবে তারা নিষ্কম্প অভিজ্ঞতার আলোয় দেখতে পাবে প্রত্যেকটি stage ঠিক-ঠিক দেওয়া হয়েছে। প্রত্যেকটি stage-এর clue খুঁজলে পাবে। ও বই শুধু চোখ বুলিয়ে যাবার জন্যে নয়। তবে যারা সাহিত্য হিসাবে পড়তে চায় তাদের জন্যে গল্প বলা হয়েছে গল্পের নিয়মে। আপাতত ওটাকে গল্পের বই বলেই বিচার করবে।

"রত্ন ও শ্রীমতী" নিয়ে মেতে আছি। আর "গান্ধী" নিয়েও। এখনো লিখতে বসিনি—কেবল নোট করছি। এখনো সব অস্পষ্ট, ধোঁয়াটে, গোলমেলে, জটিল। ক্ষণদীপ্তি, চকিত চমক জুড়ে জুড়ে তো বই হয় না।…

শান্তিনিকেতন, ৭ই মার্চ ১৯৫৪

॥ ৬ ॥

"…কন্যা" ও "রত্ন ও শ্রীমতী" প্রসঙ্গে আমার নোটবুক থেকে নিচে কিছু উদ্ধৃত হলো—এতে তোমার কৌতূহল মিটতে পারে।

"There is a basic difference between the ruling idea of 'Kanya' and that of 'Ratna O Srimati'. The latter is a love story concerning a Free Man and a Free Woman, The former is a quest for the Eternal Feminine. Imagine her as four women or aspects—she who has great physical beauty and charm but cannot be possessed for long; she who has spiritual and intellectual beauty shining through her face but is beyond our hero's reach; she who is capable of rare feats of heroism or is beautiful in action but becomes commonplace if possessed and

she who is everywhere and nowhere—the Women among Women—the womanly spirit or feminine principle—who is not to be possessed but felt.……"

শান্তিনিকেতন, ১২ই মার্চ ১৯৫৪

॥ ৭ ॥

…"একক"এর প্রবন্ধটি পড়েছি। ভদ্রলোক আমার পক্ষপাতী পাঠক, কাজেই কিছু বলতে পারছিনে, কিন্তু তিনি ঠিক গোড়ায় পেঁছিতে পারেননি। আমি চেয়েছিলুম ছড়া দিয়ে জনগণের অন্তরে পেঁছিতে, উপরন্তু মুখে মুখে ঘুরতে। কিন্তু তা তো হলো না, হয়ে উঠল সমসাময়িক রাজনীতির উপর ঝাঁঝালো মন্তব্য, ঝাঁঝের সঙ্গে ব্যঙ্গ মিশ্রিত। লাভ এইটুকু হয়েছে যে আমার ছন্দের হাত পেকেছে। পরে যা লিখব তা সহজ হবে। কোনো সাধনাই ব্যর্থ যায় না। জনগণের মন পাবার জন্যে আবার একদিন চেষ্টা করতে হবে, আগে "রত্ন ও শ্রীমতী" শুরু ও সারা হোক। বিশ্ববিদ্যালয়ের বক্তৃতা লিখতে বসব এইবার।…

শান্তিনিকেতন, ২২শে অক্টোবর ১৯৫৪

॥ ৮ ॥

কাল রাত্রে বড়ো একটা সিদ্ধান্ত নিলুম।

যত দিন না "রত্ন ও শ্রীমতী" শেষ হচ্ছে তত দিন অন্য কোনো কাজ হাতে নেব না—ব্যতিক্রম কেবল কবিতা, ছোটগল্প ও সাহিত্যিক প্রবন্ধ (সামাজিক রাজনৈতিক অর্থনৈতিক প্রবন্ধ নয়)। সাত আট বছর এই ভাবে চলবে।

তার পরে আমার প্রধান বাহন হবে কবিতা বা কাব্যনাট্য। ও ছাড়া আর যা হাতে নেব তা ছোটগল্প, সাহিত্যিক প্রবন্ধ ও বিনুর বই দ্বিতীয় তৃতীয় খণ্ড।

"গান্ধী" সম্বন্ধে চিন্তা করে দেখলুম যে ও বই "রত্ন ও শ্রীমতী"র সঙ্গে সমান্তরাল ভাবে চলতে পারে না। যদি লিখতেই হয় তবে পরবর্তী বয়সে। লিখবই যে এমন কোনো জেদ আমার নেই। যদি আর কেউ লিখতে রাজি হন ও আমার সাহায্য চান তা হলে সেই হবে সব চেয়ে ভালো। তা না হলে আমাকেই লিখতে হবে, কিন্তু আপাতত সাত আট বছর নয়, তার পরে রয়ে সয়ে কাজের ফাঁকে ফাঁকে।

কবিতার উপর আমার টান বাল্যকাল থেকেই। এক দিন আমি কবি ছিলুম। এখন যে কেউ আমাকে কবির পর্যায়ে ফেলে না, বড়ো জোর ছড়ার জন্যে স্মরণ করে, এটা আমার জীবনের অন্যতম আফসোস। কিন্তু এখনো আমার কাব্যে ফিরে যাবার সময় আসেনি, আমাকে উপন্যাসের রাজ্যে সৌন্দর্যের অন্বেষণ করতে হবে। তা ছাড়া কবিতা লিখতে বসলেই তো লেখা আপনি আসবে না,

কবিতার যা আবশ্যকীয় গুণ—স্বতঃস্ফূর্তি বা abandon—তা বহু ভাগ্যে আসে। তার জন্যে সবুর করব। মাঝে মাঝে দুটো একটা লিখব। তবে গোটা তিনেক বা চারেক বড়ো কবিতা লেখার পরিকল্পনা আছে, তাতে থাকবে আমার জীবনদর্শন বা "নিশ্চিতি"। বলতে পারো আমার Book of Faith বা Affiirmations. এর জন্যে কিছুমাত্র ত্বরা নেই। উপন্যাসটা আগে। বিশ বছরের পুরনো এনগেজমেন্ট।

দেখতেই পাচ্ছ এসব ভাবনার সঙ্গে তোমার সেই চিরন্তন জিজ্ঞাসা—dictatorship না অন্য কিছু—একেবারে বেখাপ। এসব জিজ্ঞাসার উত্তর কেউ তোমাকে দিতে পারে না। Aristotle-এর সময় থেকে লোকে এই নিয়ে তর্ক করে আসছে। তবে এইটুকু তোমাকে বলতে পারি, Ballot boxএর নিরাপত্তায় dictatorship হবে না, তার জন্যে bullet লাগবে। যারা মরতে ভয় পায় তারা dictatorshipএর স্বপ্ন দেখলে স্বপ্ন কখনো সত্য হবে না।···

শান্তিনিকেতন, ২৪শে অক্টোবর ১৯৫৪

॥ ৯ ॥

"জলার্ক" জীবনানন্দ সংখ্যা ভালোই হয়েছে। আমি জীবনানন্দকে "শুদ্ধতম কবি" বলেছিলুম, এ কথা কি জীবনানন্দকে তুমি জানিয়েছিলে? যদি জানিয়ে থাক তবে খুব ভালো কাজ করেছ। তাঁর মৃত্যুর পর যে উচ্ছ্বাস সর্বত্র দেখা যাচ্ছে এর একাংশ যদি তিনি দেখে যেতে পারতেন! এমনি হয়ে থাকে। Rilke'কে তাঁর জীবনকালে ক'জন প্রশংসা করত? Kafka'কে ক'জন চিনত? কেন, Keatsএর বেলায় কী হয়েছিল? আমি তো মনে করি সমসাময়িকদের কাছে তারিফ পেলে কবিরা বকে যায়, spoilt হয়। কবি—এখানে যে কোনো সাহিত্যিক। আমিও। দু'চারটি অনুরাগী পাঠক থাকলেই যথেষ্ট! এও যদি না জোটে তা হলে কবির জীবন সত্যি খুব দুঃখের।···

শান্তিনিকেতন, ১৮ই নভেম্বর ১৯৫৪

॥ ১০ ॥

···"কেন বাঁচব?" এই প্রশ্ন এই সঙ্কটকালের প্রথম প্রশ্ন। এর উত্তর না দিলে লোকে মরণের কথাই ভাববে, ভাবতে ভাবতে অসুখে পড়বে। সে অসুখ তো ডাক্তারী চিকিৎসায় সারে না। তোমাকেও এর উত্তর পেতে হবে। আমার কাছে "কেমন করে বাঁচব"টাই প্রধান। কিন্তু মাঝে একবার "কেন বাঁচব"টাও মন জুড়ো বসেছিল। এত দিনে আমি আমার উত্তর পেয়ে গেছি। সে উত্তর তোমার পছন্দ হবে না। স্বার্থপরতার মধ্যে বাঁচার সংকেত নেই। প্রেমের মধ্যেই সে সংকেত। প্রেম মানুষকে নিজের বাইরে আরেকজনকে, আরো অনেক জনকে, অগণ্য জনকে সুখী করতে শেখায়। সকলে সুখী হলে তবেই তোমার সুখ।

আমি যে আর্ট নিয়ে আছি এও তো সবাইকে সুখী করতে। বাঁচাতে। নিজের মধ্যে সুখ নেই, নিজেকে সুখী করার চেষ্টার মধ্যেও সুখ নেই। তবে "নিজে" শব্দটাকে যদি বৃহত্তর অর্থে "আত্মন্" বলে জানো তা হলে তার মধ্যেও সুখ আছে। কিন্তু সে এত বৃহৎ যে সবাই তার মধ্যে পড়ে।···

শান্তিনিকেতন, ৬ই জানুয়ারি ১৯৫৫

॥ ১১ ॥

···আমি প্রথমেই স্থির করি যে কারো মন রাখা কথা বলব না, আমার যা বক্তব্য তা অকপটে ব্যক্ত করব। যার ভালো লাগে লাগবে, যার না লাগে না লাগবে। সাহিত্য সম্বন্ধে যিনি যাই বলুন না কেন মতভেদের অবকাশ থাকবেই। এ তো বিজ্ঞান বা গণিত নয় যে সকলে একমত হতে বাধ্য। এর মূল্য সর্বজনের স্বীকৃতিতে নয়, এর মূল্য আমার অভিজ্ঞতার যাথার্থ্যে, আমার বিশ্বাসের দৃঢ়তায়। দীর্ঘ সাধনার দ্বারা বেশী না হোক একটুখানি প্রামাণিকতা (authority) তো অর্জন করেছি। এর মূল্য আমার সেই প্রামাণিকতায়।···

শান্তিনিকেতন, ২৫শে জানুয়ারী ১৯৫৫

॥ ১২ ॥

···আমি ইতিমধ্যে কলকাতা ঘুরে এলুম। M. C. Sarkar & Sons একটা আসর ডেকেছিলেন, বিশিষ্ট সাহিত্যিকেরা প্রায় সবাই ছিলেন।

···এর চেয়ে বড়ো কথা অধ্যাপক প্রশান্ত মহলানবিশের অতিথি হয়েছিলুম তাঁর ব্যারাকপুর ট্রাঙ্ক রোডের বাড়িতে। তাঁর সঙ্গে অনেকবার অনেক বিষয়ে কথাবার্তা হলো। তাঁর ওখানে আমেরিকান আর রাশিয়ান এক ঘাটে জল খায়। রাশিয়া চীন আমেরিকা ইংলণ্ড সব দেশে তাঁর গতিবিধি ও সমাদর। তবে তাঁর নিজের পক্ষপাত রাশিয়ার প্রতি—আবার ইংলণ্ডের প্রতি মমতাও সমান সত্য। একজন Citizen of the World-এর সঙ্গে পুরোনো আলাপটা ঝালিয়ে নেওয়া গেল।···

শান্তিনিকেতন, ২৬শে এপ্রিল ১৯৫৫

॥ ১৩ ॥

···কলকাতায় P. E. N.-এর সভায় গেছলুম। কাগজে বিবরণ পড়েছ? এই সব করতে গিয়ে আমার লেখার একাগ্রতা নষ্ট হচ্ছেই কিন্তু কী করে প্রতিরোধ করি ভালোবাসার ডাক? জুন মাসে যেতে হবে আরেকটা ব্যাপারে।

নারায়ণ চৌধুরীর প্রবন্ধ পড়িনি। আমার যে ভাষণের উপর তিনি ওটি

লিখেছেন সেটা আনন্দবাজারে বেরিয়েছিল সম্পাদকীর পৃষ্ঠায় ৫ই বৈশাখ ১৩৬২। *সেটা পড়লে দেখবে আমি যা বলেছি তা যথার্থ। Rudyard Kipling লিখেছিলেন, "O East is East and West is West and never the twain shall meet." নারায়ণ চৌধুরী এটা অক্ষরে অক্ষরে মানেন। আমি আদৌ মানিনে। আমার জীবনটাই এর প্রতিবাদ। এক্ষেত্রে আপোসের সম্ভাবনা নেই।...

শান্তিনিকেতন, ১৯শে মে ১৯৫৫

॥ ১৪ ॥

তোমার সাম্যবাদী বন্ধুরা ভারতীয় ঐতিহ্য আত্মসাৎ করতে গিয়ে যদি নিজেরাই আত্মসাৎ হয়ে যান তা হলে শেষ পর্যন্ত 'সনাতনী'দেরই জিৎ হবে। ভারতীয় ঐতিহ্য বলতে গত দেড়শ' বছরের renaissance, reformation ইত্যাদিও বোঝায়। ইংরেজকে ডিঙিয়ে মুসলমানকে ডিঙিয়ে হাজার বছর আগেকার ঐতিহ্যে ফিরে যাওয়া কোনো প্রকৃতিস্থ মানুষের কাজ নয়। ভারতের ঐতিহ্য এদেরকে বাদ দিয়ে নয়, এদেরকে নিয়ে। আমরা কয়েকজন একটা ট্রাস্ট, সোসাইটি ও পত্রিকা প্রতিষ্ঠা করতে যাচ্ছি যার জন্যে ইস্তাহার তৈরি করার ভার পড়েছে আমার উপরে। আমি লিখছি—

"ভারতপথিক রামমোহন রায় যে ধারা প্রবর্তন করেন তার স্বাভাবিক পরিণতি এমন এক ভারত যা হিউম্যানিস্ট, লিবারল, সেক্যুলার, ডেমক্রাটিক, স্বাধীন, নিরপেক্ষ, বিশ্বতোমুখ, জাতি বর্ণ সম্প্রদায় ও শ্রেণী-চেতনা বিরহিত। এই ধারাকে বহমান রাখা ও বেগবান করা প্রয়োজন বলে 'ভারতপথিক' ট্রাস্ট প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে।...'ভারতপথিক' সোসাইটি সংগঠিত হবে।...সোসাইটি প্রধানত 'ভারতপথিক' নামে একখানি পত্রিকা পরিচালনা করবেন।"...

শান্তিনিকেতন, ২৩শে মে ১৯৫৫

॥ ১৫ ॥

...প্রবন্ধটি ভালোই হয়েছে। আশা কোরো না যে তোমার শেষ সিদ্ধান্তের সঙ্গে আমি একমত হব। একটা কথা আমার বিশ্রী লেগেছে। ' Concubine" শব্দটা ওখানে খাটে না। গ্যেটের অন্য একজন পত্নী থাকলে Christianaকে "Concubine" বলা চলত। কিন্তু গ্যেটে আর কাউকে বিয়ে করেননি—আগেও না, পরেও না। ইউরোপে এরূপ স্থানে বলা হয় 'Common Law Wife' অর্থাৎ লোকাচারসম্মত পত্নী। উচ্চশ্রেণী নিম্নশ্রেণী বিবাহ তখনকার দিনে অচিন্তনীয় ছিল। নইলে তাঁদের আইনগত বিবাহে কোনো বাধা ছিল না। তা

* এই পুস্তকে প্রকাশিত "বাংলা সাহিত্যের নতুন ধারা"

ছাড়া সেকালে civil marriage প্রচলিত হয়নি, গির্জায় গিয়ে বিয়ে করতে গ্যেটের আপত্তি ছিল। তিনি ছিলেন ritualismএর বিপক্ষে। এখন পর্যন্ত কেউ গ্যেটেসঙ্গিনীকে "Concubine" বলেনি, অন্তত আমার চোখে পড়ে নি। তুমি কি ইতিহাস সৃষ্টি করবে?

বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধে ভেবে দেখেছি, তাঁকে liberal বলা চলে না, কিন্তু humanist বলা চলে। তা যদি হলো তবে মধ্যযুগীয় বলা অযৌক্তিক। বঙ্কিমচন্দ্র যে সব ধর্মগ্রন্থ লিখেছেন তার কোনোটিতে পূর্বসূরীদের authority মেনে নেননি। স্বাধীন মত দিয়েছেন। মধ্যযুগে এটা অসম্ভব ছিল। এ শুধু আধুনিক যুগেই সম্ভব। বঙ্কিমের উপন্যাসের অধিকাংশ নায়ক নায়িকা কায়স্থ কিংবা রাজপুত। ব্রাহ্মণ বড় একটা দেখিনে। যাদের দেখি তারা 'superior' নয়। (বরং শরৎচন্দ্রের লেখায় বামুন ও বামনাই বেশী।) ছোটলোকও বড়ো একটা নেই। থাকলেও 'inferior' নয়। ব্রাহ্মণ প্রাধান্য তাঁর লেখায় উঁকি মারছে না। তবে সন্ন্যাসীকে তিনি বড়ো ভক্তি করতেন। জ্যোতিষ মানতেন। জানতেন না যে ওটা গ্রীস থেকে আমদানী। ভারতের নয়। হিন্দুরও নয়। মুসলমানের অত্যাচারে তিনি বিরক্ত ছিলেন; কিন্তু মুসলমানের প্রতি তাঁর বিশেষ টান ছিল। এত রকম মুসলমান চরিত্র কোনো মুসলমানও আঁকেননি। আত্মসম্মানবোধ থেকে তিনি ইংরেজের উপর বিরূপ ছিলেন, কিন্তু ইংরেজী শিক্ষা ও সাহিত্য থেকে দু'হাতে ঐশ্বর্য সংগ্রহ করেছেন। উপন্যাসের বেলা ইংরেজের লেখা ইতিহাস ও Todএর লেখা "রাজস্থান" তাঁর সম্বল। দেশী পুঁথি নয়। তাঁর মূল্যবোধ মোটের উপর পশ্চিমমুখী ছিল। এক বিধবাবিবাহ ভিন্ন তাঁর সঙ্গে সমসাময়িক সংস্কারকদের তেমন কোনো মতবিরোধ ছিল না। বহুবিবাহের ছবি তিনি এঁকেছেন ঐতিহাসিক উপন্যাসে। আধুনিক উপন্যাসে বহুবিবাহের বিরুদ্ধতা করেছেন। মূর্তিপূজা নিয়ে কোথাও বাড়াবাড়ি নেই। রামকৃষ্ণভক্ত ছিলেন না।

মধ্যযুগীয় হিন্দু গোঁড়ামি এলো বঙ্কিমের পরে—বঙ্কিমকে সামনে রেখে। এর জন্যে বঙ্কিমের দায়িত্ব বেশী নয়। বঙ্কিমকে যারা নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করেছে তারাই দায়ী।···

শান্তিনিকেতন, ১৫ই জুন ১৯৫৫

॥ ১৬ ॥

আজ সকালে তোমার জন্যে চিঠি ডাকে দেবার পর তোমার পোস্টকার্ড হাতে এলো। "মূল্যবোধ" কথাটির মানে কী বলতে পারো? এই যদি নারায়ণবাবুর প্রশ্ন হয় তবে তার একটি সোজা উত্তর নিচে দিচ্ছি।

আমাদের পূর্বপুরুষদের বিশ্বাস ছিল যে-নারী পতির সঙ্গে চিতায় ওঠে সে যেমন সতী যে-নারী বিধবা হয়েও বেঁচে থাকে সে তেমন নয়। শুনেছি কাঠিয়াবাড়ের (সৌরাষ্ট্রের) গ্রামে গ্রামে সতী-চৌরা আছে সতীদাহের

স্মারকরূপে। এখনো রাজস্থানে কোনো মহিলা সহমৃতা হলে হাজার হাজার লোক দর্শনার্থী হয়, ভস্ম সঞ্চয় করে, পুণ্যবতীর বংশে সবাই পুণ্যবান হয়ে যায়। কিন্তু বাংলাদেশের মূল্যবোধ বদলে গেছে। যে-নারী সহমৃতা হয় তাকে আমাদের আইন আত্মঘাতিনী মনে করে, যারা তার সহায়ক হয় তাদের নামে ফৌজদারী মামলা রুজু করা হয়। অন্যান্য বিধবাদের চেয়ে সেই অধিকতর সতী একথা শুনলে আমাদের মন সায় দেয় না। তা হলে দেখা যাচ্ছে সহমরণকে আমরা তেমন মূল্য দিইনে। জীবন্ত বিধবা আমাদের চোখে কম মূল্যবান নয়। বরং বেশী।

বিধবা বিবাহের বিরুদ্ধে বঙ্কিম প্রভৃতির মনে বিরাগ ছিল এই জন্যে যে, সতী নারী কখনো দ্বিতীয়বার বিবাহ করতে পারে না, করলে সে সতী নয়, অসতী। বিদ্যাসাগর তা মনে করতেন না, আমরাও করিনে। তা হলে দেখা যাচ্ছে সতীত্বের সংজ্ঞা বদলে গেছে। বঙ্কিম পরবর্তীরা বদলে দিয়েছেন। নারী যদি স্বভাবত সতী হয় তবে দু'বার বিয়ে করলেও সতী, না করলেও সতী। ঝোঁকটা পড়ল 'স্বভাবে'র উপরে, 'একবারে'র উপর নয়। 'স্বভাব'টাই মূল্যবান, 'একবার'টা নয়। পুরুষের বেলায় এটা সর্বজনস্বীকৃত। মেয়েদের বেলা যত তর্ক।···

শান্তিনিকেতন, ১৬ই জুন, ১৯৫৪

সাহিত্যে সংকট

ভূমিকা

এতে আছে ছত্রিশটি প্রসঙ্গ। বারোটি প্রসঙ্গ নিয়ে একটি বক্তৃতা। তিনটি বক্তৃতা নিয়ে শরৎচন্দ্র স্মারক বক্তৃতামালা। ১৯৫২ সালে দেবার কথা। দেওয়া হয় ১৯৫৫ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বারভাঙ্গা হলে। পরে বিশ্ববিদ্যালয়ের সৌজন্যে "দেশ" পত্রিকায় সংশোধিত ও অংশত পরিবর্তিত হয়ে বাহির হয়। এখন বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমতিক্রমে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হলো। পরিমার্জিত হয়ে।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষের কাছে আমি কৃতজ্ঞ।

পরমাণু বোমা সম্পর্কে প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্টের দায়িত্ব অবান্তর বলে আলোচিত হলো না। উল্লেখ পরিত্যক্ত হলো।

শান্তিনিকেতন
২১শে ভাদ্র ১৩৬২

অন্নদাশঙ্কর রায়

শরৎচন্দ্র স্মরণ

প্রথমেই স্মরণ করি তাঁকে, যাঁর নামে এই বক্তৃতা। শরৎচন্দ্র যখন জনপ্রিয় ছিলেন না, তাঁর লেখা পড়ে বড়রা যখন বিস্মিত ও তপ্ত তখন আমরা ছেলেরা ছিলুম তাঁর ভক্ত। এ ভক্তি অনেক দিন পর্যন্ত গোঁড়া ভক্তি ছিল। বড়রা এক হিসাবে গোঁড়া। আমরা ছেলেরা আরেক হিসাবে গোঁড়া। তার পর এমন এক সময় এলো যখন বড়দের গোঁড়ামি চলে গেল। সঙ্গে সঙ্গে আমাদের গোঁড়ামি। গোঁড়া ভক্তি গিয়ে তার জায়গায় রইল শুধু ভক্তি।

দেশসুদ্ধ লোক এখন তাঁকে ভক্তি করছে। এ ভক্তি এখন ভারতব্যাপী। বাংলার বাইরে তাঁর গ্রন্থের বিভিন্ন ভাষায় অনুবাদ হয়েছে। সেসব পড়ে অবাঙালীরাও তাঁকে আপন করে নিয়েছেন। একবার একজন প্রশ্ন করেছিলেন, "আচ্ছা, শরৎবাবুর বই কি বাংলা ভাষায় তর্জমা হয়েছে!"

হাঁ, এরই নাম দিগ্বিজয়। শরৎচন্দ্র দেশকে অতিক্রম করেছেন। অন্তত প্রদেশকে। এখন তিনি ভারতীয় সাহিত্যিক। আধুনিক কালের ভারতীয় সাহিত্যিক।

দেশ এবং কাল

সাহিত্যের নামকরণ হয় দেশের নামে, যেমন পুত্রের নামকরণ হয় পিতৃকুলের নামে। কিন্তু সাহিত্যের আরো একটা নামকরণ সম্ভব। সেটা কালের নামে। সন্তানের যেমন মাতৃকুলের নামে।

আধুনিক বাংলা সাহিত্য একদিক থেকে বাংলা দেশের সাহিত্য। তেমনি আরেক দিক থেকে আধুনিক কালের সাহিত্য। দেশ যেমন প্রধান কালও তেমনি প্রধান। কালকে অপ্রধান মনে করা ঠিক নয়। তাকে অপ্রধান মনে করলেও সে তার ছাপ রেখে যায় দেহে মনে। আধুনিক কালকে আমরা বিদেশী বা পাশ্চাত্ত্য বলে বহুদিন উপেক্ষা করেছি। তার সঙ্গে সম্বন্ধ স্বীকার করিনি, করলে অত্যন্ত কুণ্ঠার সঙ্গে করেছি। এর কারণ আমাদের পরাধীনতা। পরাধীন মানুষের অপমানবোধ একান্ত প্রখর। আত্মসম্মানের খাতিরে আমরা অতীতকেই আপনার ভেবেছি, বর্তমানকে ইংরেজের বা পাশ্চাত্ত্যের। যাকে আধুনিক বলে চিহ্নিত করা উচিত তাকে বৈদেশিক বলে গণনা করেছি।

এখন তো পরাধীনতার গ্লানি অপনীত হয়েছে। এখন এসেছে আধুনিক কালের সঙ্গে সম্বন্ধ স্বীকার করার সময়। আমাদের সাহিত্য বাংলা সাহিত্য, কিন্তু সেই সঙ্গে আধুনিক কালের সাহিত্য। তার দুই কুল। দেশের পরিচয় তো সকলে জানে। কালের পরিচয় নেওয়া যাক। যে কালে আমরা বাস করছি সে কাল সব দেশের সাহিত্যের উপর ছাপ রেখে যাচ্ছে। যে সব ভাবনাকে আমরা মনে করেছি বিশেষ করে আমাদের দেশের ভাবনা সে সব ভাবনা চীন থেকে পেরু পর্যন্ত সব দেশের লোকের ভাবনা। দেশগত বৈশিষ্ট্য আছে নিশ্চয়, কিন্তু

কালগত বৈশিষ্ট্যও কম নয়। সেইজন্যে একটু কালপরিক্রমা করলে মন্দ হয় না।

কালের চাকা সারা পৃথিবীময় ঘুরছে। তার কেন্দ্র কিন্তু পশ্চিম ইউরোপ। ভবিষ্যতে হয়তো ভারতবর্ষ হবে। কিংবা রাশিয়া। কিন্ত আপাতত পশ্চিম ইউরোপকে তার প্রাপ্য গুরুত্ব দিতে হবে। আমার বক্তৃতা বাংলা সাহিত্যকে বাদ দিয়ে নয়। কিন্তু আধুনিক কালই আমার আলোচনার বিষয়। পশ্চিম-মুখো না হয়ে আমার উপায় নেই।

সঙ্কট ঃ জীবনে

সংকট শব্দটা লোকে যখন তখন ব্যবহার করে। অন্নসংকট বস্ত্রসংকট ইত্যাদি কত রকম সংকট। কিন্তু এর প্রকৃষ্ট প্রয়োগ হচ্ছে রোগীর যখন জীবনমরণ সমান অনিশ্চিত। যখন ডাক্তার বলে যান ক্রাইসিস চলছে।

অবশ্য এই একমাত্র প্রয়োগ নয়। মানুষের জীবনে যেমন রোগ আছে তেমনি আর্থিক ভাবনা আছে। আছে আত্মিক অশান্তি। আছে নৈতিক দোটানা। সেইজন্যে আমরা বলি, আমার এখন আর্থিক সংকট বা আত্মিক সংকট বা নৈতিক সংকট।

ব্যক্তির মতো জাতিরও নৈতিক সংকট বা আত্মিক সংকট উপস্থিত হয়। আর্থিক সংকট তো সুপরিচিত। জাতির মতো সভ্যতারও সংকট দেখা দিতে পারে। রবীন্দ্রনাথ সভ্যতার সংকট নিয়ে তাঁর মৃত্যুর অল্প দিন আগে আলোচনা করে গেছেন। সভ্যতা এখানে মানব সভ্যতা। এর সংকট সম্বন্ধে টলস্টয় মানুষকে সতর্ক করে দিয়ে গেছেন। রবীন্দ্রনাথের পরেও সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছেন বহু মনীষী।

মারণাস্ত্র নির্মাণের কৌশল এখন যেখানে গিয়ে ঠেকেছে তাতে মরণের সম্ভাবনাই জীবনের সম্ভাবনার চেয়ে বেশী। যে কোনো দিন মহামারী বেধে যেতে পারে। এবার যে বোমা পড়বে আণবিক বোমা তার কাছে কিছু নয়। সভ্যতা এখনো টিকে আছে, কিন্তু ক'দিন টিকবে তা কেউ বলতে পারে না। আশাটাও আশার ছলনা হতে পারে। তবু হাল ছেড়ে দেওয়া যায় না। যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ আশ, ততক্ষণ চেষ্টা।

এ ছাড়া প্রত্যেক দেশেই অসন্তোষ ভিতরে ভিতরে জমছে। সুখীদের চেয়ে দুঃখীদের সংখ্যাই বেশী, এমন কি খোদ রাশিয়াতেও। বিপ্লব সুখীদের রাতারাতি দুঃখী করতে পারে, কিন্তু দুঃখীদের রাতারাতি সুখী করতে পারে না। কোটি কোটি লোক সামরিক ভার বহন করতে বাধ্য হচ্ছে সব দেশে। ফলে তাদের ভোগসম্ভারে টান পড়ছে। আমেরিকার কুবের ভাণ্ডারও অফুরন্ত নয়। আভ্যন্তরিক অসন্তোষ সংকটকে ঘোরালো করেছে।

সংকট : সাহিত্যে

মানুষের জীবনে আজ সংকট। তা বলে সাহিত্যে সংকট কেন হবে! ইতিহাসে কতবার সংকট এসেছে, সাহিত্যে তো আসেনি। আবার সাহিত্যে যখন সংকট দেখা দিয়েছে জীবনে দেখা দেয়নি।

ঠিক। কিন্তু এবারকার সংকট বাইরের জীবনে নয়, ভিতরের জীবনেও— যা নিয়ে সাহিত্য। মাথার উপর Damocles-এর খড়্গ ঝুলছে। যুদ্ধ। পায়ের তলায় বাসুকির ফণা নড়লে ভূমিকম্প ঘটবে। বিপ্লব। এই অস্বস্তিকর অবস্থায় আপনি শ্বাস রুদ্ধ হয়ে আসে। কে কী লিখবে! কে কী পড়বে! যারা মন্দির গড়ত তারা দু'শো বছর হাতে রেখে গড়তে বসত। আজকের মানুষের হাতে দু'শো বছর দূরের কথা দু'শো মাসও নেই। এরা তাড়াহুড়ো করে যা গড়ে তা মন্দিরের মতো দেখতে, কিন্তু দেবযোগ্য নয়।

সাহিত্য হচ্ছে অমৃত, দেবভোগ্য। তার আয়োজন দীর্ঘকাল ধরে চলে। লেখার আগে দেখা, শেখা, ভাবা, ধ্যান করা। এর জন্যে সময় লাগে অনেক। লেখাও কলম কালি আর কাগজের ব্যাপার নয়। প্রাণ সঞ্চার। জীবন্যাস। এর জন্যেও সময় লাগে। যার হাতে অনন্ত কাল সেই লিখতে বসে উচ্চ কোটির সাহিত্য। উচ্চাঙ্গের সঙ্গীত কি পনেরো মিনিটে হয়?

লেখক বা পাঠক কেউ সময় দিতে পারে না। স্থায়ী জিনিস হবে কী করে? হবে কার জন্যে? গত ত্রিশ চল্লিশ বছরে পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায় যে সব গ্রন্থ লেখা হয়েছে তাদের মধ্যে ক্লাসিক হয়েছে বা হবার যোগ্যতা রাখে এমন বই আঙুলে গোনা যায়! কিংবা তাও নয়।

সবচেয়ে প্রবল যে মনোভাব সেটা কঠিন তিক্ত সীনিকাল ও পেসিমিস্টিক। হৃদয় অসাড়, মন অসুস্থ, আত্মা আছে কি নেই। প্রথম মহাযুদ্ধ মোহমুদ্গরের কাজ করে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের জন্যে মোহ খুব বেশী অবশিষ্ট ছিল না, তাই মোহভঙ্গের প্রশ্ন ওঠে না। বিপ্লবের একটা মোহ ছিল, সেটা কোনো কোনো মহলে এখনো বিদ্যমান, কিন্তু সাহিত্যিক মহলে বড় একটা নেই।

সংকটের সূচনা

সংকট ঘনাচ্ছে অনেক কাল থেকে। কম করে ধরলেও ষাট বছর, যখন থেকে চলছে এক হাতে যুদ্ধের অন্য হাতে বিপ্লবের প্রস্তুতি। আরো আগে থেকে— প্রায় পচাত্তর বছর আগে থেকে—টলস্টয় চেতাবনী দিচ্ছেন যে যুদ্ধ আসছে, বিপ্লব আসছে, যদি এড়াতে চাও তো জীবনযাত্রা বদলাও, সাহিত্যের ধারা বদলাও।

কিন্তু কেন এমন হলো?

অষ্টাদশ শতকের শেষ ভাগে যখন শিল্পবিপ্লব শুরু হয়, মানুষ বিজ্ঞানের দৌলতে সর্বশক্তিমান হবার স্বপ্ন দেখে তখন গ্যয়টে রচনা করেন তাঁর ফাউস্ট।

শয়তান মানুষকে সর্বশক্তির প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে, বিনিময়ে চাইছে মানুষের আত্মা। মানুষ কী করবে? সর্বশক্তিমান হবে, না আত্মাসমন্বিত হবে? ফাউস্ট শয়তানের সঙ্গে চুক্তি করল। তার মধ্যে একটু ফাঁক রেখে দিল। তুমি আমাকে যা দেখাবে যা দেবে তাতে যদি আমার বিন্দুমাত্র সন্তোষ জন্মায় তাতে যদি আমি আসক্ত হই তা হলেই আমার আত্মা তোমার হবে।

"Comfort and quiet !—no, no !
none of these
For me—I ask them not—
I seek them not.
If ever I enter upon the bed
of sloth
Lie down and rest, then be
the hour, in which
I so lie down and rest, my
last of life···
If ever time should flow so
calmly on,
Soothing my spirits into such
oblivion,
That in the pleasant trance I
would arrest,
And hail the happy moment
in its course,
Bidding it linger with me···
···then throw me into fetters—
Then willingly do I consent
to perish."

(Goethe : Faust Part 1)

শেষ পর্যন্ত ফাউস্টের আত্মা ফাউস্টেরই রইল, মাঝখান থেকে এলো সমস্ত ঐশ্বর্য, যাবতীয় ভোগ। ঊনবিংশ শতাব্দী জুড়ে ফাউস্ট জিততে থাকল, শয়তান হারতে থাকল। টলস্টয় দিব্যদৃষ্টিতে দেখতে পেলেন শয়তান অত সহজে ছাড়বে না। সামনে বিপদ। কিন্তু ফাউস্ট তা মানবে কেন? সে তো এক দিনের জন্যেও সন্তুষ্ট হয়নি, বিশ্রাম করেনি। তার দৃঢ় বিশ্বাস সে ঐশ্বর্যও পাবে আত্মাও রাখবে।

সংকটের আদি বলতে গেলে শক্তিমুগ্ধ ফলিতবিজ্ঞানের ও মুনাফালুব্ধ নয়া মূলধনের যোগাযোগে শিল্পবিপ্লব যখন আরম্ভ হয় তখন। অর্থাৎ অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে। কিন্তু ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগেই মালুম হয় যে সেটা

সংকটের কারণ। তাও সকলের কাছে নয়। টলস্টয়ের মতো অল্প কয়েকজনের কাছে। আর সকলে তখন প্রগতির স্বপ্নে বিভোর। এঁরা যাকে মনে করেন সংকটের নিদান ওঁরা তাকে মনে করেন প্রগতির বিধান।

অধিকাংশের চোখ ফুটল প্রথম মহাযুদ্ধের সময়। যাঁদের চোখ তাতেও ফুটল না তাঁদের চোখ ফোটাল রুশ দেশের বিপ্লব। এর আগে এত বড় যুদ্ধও আর হয়নি, এত বড় বিপ্লবও আর হয়নি। ফাউস্টের আত্মা কি তখন তার নিজের এক্তারে ছিল, না শয়তানের এক্তারে ?

মোহভঙ্গ

সাধারণের বিশ্বাস ছিল যুদ্ধের পরে আসছে নতুন জীবন, নতুন পৃথিবী। কিন্তু লক্ষ লক্ষ প্রাণের বিনিময়ে যা এলো তা যুদ্ধোত্তর বিশৃঙ্খলা, মুদ্রাস্ফীতি, মূল্যবৃদ্ধি, দুর্নীতি, কর্মহীনতা, গৃহাভাব, দুরারোগ্য ব্যাধি। কতক লোকের পৌষ মাস, অধিকাংশের সর্বনাশ। যারা হারল তাদের দুর্গতির সীমা রইল না, যারা জিতল তারাই বা এমন কী ভোগ করল! জাতীয় ঋণ পর্বত-প্রমাণ। ট্যাক্স জোগাতে জোগাতে প্রাণান্ত। সর্বত্র শ্রমিক ধর্মঘট। ঝি চাকর পাওয়া যায় না চড়া মজুরি না দিলে।

কিন্তু এসব খুচরো দুর্ভোগ তো আসল নয়। লোকে স্বপ্ন দেখত বিজ্ঞানের কল্যাণে সকলের কপালে সব কিছু জুটবে। কই, তেমন কিছু তো দেখা গেল না। স্বপ্নভঙ্গ হলো। এই স্বপ্নভঙ্গটাই আসল। প্রগতি তা হলে শান্তিতে হবার নয়। অশান্তিতেও কি হবার! বিজ্ঞান তা হলে লক্ষ লক্ষ লোকের প্রাণহানি ঘটায়, লক্ষ লক্ষ লোককে বিকলাঙ্গ করে! বিজ্ঞানের উন্নতি সত্ত্বেও আরো বেশী লোক বেকার! এই দুঃখদৈন্যের পরিবর্তে এমন কি পাওয়া গেল! এই যে ক্ষতিটা হলো এর পূরণ কী!

এতকাল একটা ধারণা ছিল যুদ্ধবিগ্রহে অপদার্থরাই মারা যায়। দুর্বলরাই কাটা পড়ে। যোগ্যতমের উদ্বর্তন। কিন্তু দেখা গেল সব চেয়ে জোয়ান সব চেয়ে বলবান ছেলেরাই ফৌত হলো। একটা আস্ত জেনারেশন হারিয়ে গেল। তাই তো, এমন তো কথা ছিল না। এ যে মনে হচ্ছে অযোগ্যতমের উদ্বর্তন।

না, আর যুদ্ধ চাইনে। কিন্তু যে ভাবে সন্ধিপত্র তৈরি হলো তা দেখে কারো সন্দেহ রইল না যে আর একটা যুদ্ধের সম্ভাবনা পনেরো আনা।

ওদিকে শ্রমিক শ্রেণীতে অসন্তোষ ঘনাতে থাকল। যাদের সাম্রাজ্যে সূর্য অস্ত যায় না, তাদেরি দেশে কিনা সাধারণ ধর্মঘট! কোনো কোনো দেশে ছোটলোকদের আর বাড়তে দেওয়া যায় না বলে রাতারাতি ডিক্টেটর গজালেন। ধর্মঘটীদের পিটিয়ে ঢিট করে দিলেন। আর যা যা করলেন তার ফলে গণতন্ত্রের দম বন্ধ। অথচ যুদ্ধ করা হয়েছিল গণতন্ত্রের নিরাপত্তার জন্যে। এই তার পরিণতি!

এমনি এক এক করে এক একটা মোহ ভাঙে। শয়তানের সঙ্গে চুক্তি করে

ফাউস্ট যা করায়ত্ত করেছিল তার অনেকখানি করভ্রষ্ট হয়। যারা মরল তারা বৃথা মরল। যারা বাঁচল তারা বৃথা বাঁচল। মরারও যেমন কোনো সার্থকতা নেই বাঁচারও তেমনি কোনো সার্থকতা নেই। অতীতের আদর্শগুলিকে ব্যঙ্গ করে মহৎ চরিত্রদের মহত্ত্বের মুখোশ খুলে একদল লেখক যা করলেন তার নাম debunking। নতুন কোনো আদর্শ বা মহৎ দৃষ্টান্ত সামনে তুলে ধরা হলো না। চার দিকে ভাঙন। বাইরেও, ভিতরেও। পরিবার ভাঙছে, শ্রেণী ভাঙছে, সমাজের কাঠামো ভাঙছে। কাজ করতে চাও কাজ পাবে না, কাজ যদি বা জুটল মনের মতো হবে না। জীবিকার জন্যে যে সময়টা কাটালে সেটা যেন জীবন থেকে কাটা গেল। জীবনের জন্যে তা হলে বাকী রইল কী? অবসর কাল। অবসর কালে দেখলে অবসাদ আর ক্লান্তি। সীরিয়াস কিছু করতে যাওয়া মানে মোমবাতি দু'দিক থেকে পোড়ানো। হালকা জিনিস দিয়ে আবার ঐ সময় ভরানো। ওটাও জীবন নয়। জীবন তা হলে কোথায়!

তার পর অন্যে অসুখী হবে তুমি সুখী হবে, এতেই বা কোন সুখ! এ তো আরো লজ্জার কথা। তুমি যে বেচে আছ এর জন্যে তুমি লজ্জিত। কেননা তোমার চেয়ে যোগ্যতর যারা তারা অকালে মারা গেছে। এর মধ্যে ন্যায় কোথায়! একটা অপরাধবোধ বা sense of guilt বিবেকের ঘরে বাসা বাঁধল। বিবেকের দংশন সহ্য হয় না, মরতে সাধ যায়। এর নাম মৃত্যু সাধ বা death wish।

"Endure what life God gives and ask no longer span ;

Cease to remember the delights of youth, travel-wearied aged man ;

Delight becomes death-longing if all longing else be vain···

Never to have lived is best. ancient writers say ;

Never to have drawn the breath of life, never to have looked into the eye of day ;

The second best's a gay goodnight and quickly turn away."

(Yeats : Oedipus at Colonnus)

মৃত্যু সাধ সমস্তক্ষণ মানুষকে মৃত্যুসচেতন করে, মৃত্যু নিয়ে ব্যাপৃত রাখে। বিশ্ববিধানে মৃত্যুর নিশ্চয় একটা স্থান আছে, কিন্তু যুদ্ধোত্তর যুগের মানুষ তাকে তার চেয়ে বেশী স্থান দেয়, বিশেষ করে সেই সব দেশের যেখানে জীবনকে নিয়ে বা সমাজকে নিয়ে নতুন কোনো পরীক্ষা চলছে না, যেখানে বিপ্লব ঘটেনি, বিপ্লবকে হাড়ে হাড়ে ভয়।

নৈতিক অরাজকতা

যুদ্ধের পর সব দেশেই অব্যবস্থা চলতে থাকে, কোথাও বেশী কোথাও কম। দিনের পর দিন যদি মন্দের রাজত্ব চলে, বাধা দেবার কেউ না থাকে, সাজা

দেবার কেউ না থাকে, তা হলে মানুষের নীতিবোধ এলিয়ে পড়ে। 'দুর্নীতি', 'দুর্নীতি' বলে কিছু দিন খুব হৈ চৈ পড়ে, তার পর দুর্নীতিটাই নীতি হয়ে ওঠে।

সমাজ যখন সরল ছিল, লোকে যখন গ্রামে বাস করত, সকলের সঙ্গে সকলের একটা প্রত্যক্ষ সম্পর্ক ছিল, তখন দুর্নীতির উপর জনমতের মুঠি শক্ত ছিল। কিন্তু শিল্পবিপ্লবের ফলে গ্রাম উজাড় হয়েছে, অধিকাংশ মানুষ চলে এসেছে শহরে বা গড়ে তুলেছে নতুন নতুন শহর, সেখানে পাশের বাড়ির লোকের সঙ্গেও আলাপ পরিচয় নেই—এমন কি পাশের ফ্ল্যাটের লোকের সঙ্গেও না। নিকটতম প্রতিবেশী যদি সমাজবিরোধী চক্রান্ত করে, এক দিনে লক্ষ লোককে পথে বসায় বা তিলে তিলে মারে তা হলে তুমি আমি টের পাব না, টের পেলেও মুখ ফুটে বলতে পারব না। বড় জোর পুলিসে খবর দেব। পুলিস যদি প্রমাণ না পায়, আদালত যদি প্রমাণাভাবে খালাস দেয় তাহলে তুমি আমি নিরুপায়। হয়তো পাল্টা তোমার আমার বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা বাধবে বা গুণ্ডা লাগবে। কেন, তোমার আমার এত গরজ কিসের? ক্ষতি যা হচ্ছে তা তো সমাজসুদ্ধ সকলের। কেবল তোমার আমার নয়। মাথা ঘামাতে হয় পার্লামেণ্ট ঘামাবে, গভর্নমেণ্ট ঘামাবে। ডাকঘরে একখানা বেনামী চিঠি লিখে ছেড়ে দাও। শাসিয়ে বলো, আসছে বার ভোট দেব না।

আদত কথা সমাজ তখনকার দিনে সাকার ছিল, এখন নিরাকার। কে যে কর্তা, কার কাছে গেলে যে প্রতিকার হবে তা শাসকরাও জানেন না। কত রকম আন্তর্জাতিক শক্তি সক্রিয়। সেগুলোও নিরাকার। সমাজ এখন দেশকেও অতিক্রম করে গেছে। কলকাতার মতো বিরাট শহরে সব দেশের লোক জড় হয়েছে। তাদের অনেকের ভারতের প্রতি আনুগত্য নেই, ভারতের সমাজের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক অতি ক্ষীণ। লণ্ডন নিউ ইয়র্ক প্যারিস—সর্বত্র ঐ রকম। একটা শিমুল গাছে যদি নানা দিগ্‌দেশাগত পাখী একসঙ্গে রাত কাটায় তবে কি তাদের সমাজবোধ থাকে? যে যার নিজের আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব পাত্রমিত্র নিয়ে থাকে, রাষ্ট্রের উপর ছেড়ে দেয় রক্ষণের ভার, রাষ্ট্রকে কর জোগায়, মাঝে মাঝে সৈন্যদলে যোগ দেয়—ব্যস্, এই হলো সমাজের প্রতি দায়িত্ব। অধিকাংশ মানুষই ছিন্নমূল। একটা বাড়ী করলেই মাটিতে মূল লেগে যায় না। সকলের সঙ্গে সকলের অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ থাকা চাই, সেটা অনুভব করা চাই। যুদ্ধের দিনে সেটা এক রকম মালুম হয়। শান্তির সময় কারো মনে থাকে না।

ধর্মে অবিশ্বাস

ধর্মে সংশয় ও ধর্মে অবিশ্বাস এক কথা নয়। সংশয়ের ভাষা ও অবিশ্বাসের ভাষা আলাদা। সংশয়ীরা বলে, "ভগবান যে আছেন সে বিষয়ে আমি নিশ্চিত নই। অথচ ভগবান যে নেই এ বিষয়েও আমি অনিশ্চিত।" অবিশ্বাসীরা বলে, "ভগবান যে নেই এ বিষয়ে আমি সুনিশ্চিত।"

সংশয়ীরা বলে, "মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে জীবন শেষ হয়ে যায় না একথা আমি নিশ্চিতভাবে জানিনে। অথচ মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে জীবন শেষ হয়ে যায় একথাও আমি নিশ্চিতভাবে জানিনে।" অবিশ্বাসীরা বলে, "মৃত্যুমাত্রেই জীবন শেষ হয়ে যায় একথা আমি সুনিশ্চিতভাবে জানি।"

সংশয়বাদ দর্শন বিজ্ঞানের পক্ষে অনুকূল। সংশয় মানুষকে নিশ্চিন্ত হয়ে বসে থাকতে দেয় না, অন্বেষণ করায়। সারা জীবন ধরে অন্বেষণ চলে। অন্তিম মুহূর্তে মানুষ বলে যায়, "কতটুকুই বা জানা গেল! আরো জানতে হবে। আলো, আরো আলো।"

অবিশ্বাস মরণ মারণের পক্ষে অনুকূল। অল্প বয়সেই মানুষের প্রত্যয় জন্মায় যে কোথাও কিছু নেই, সব ফাঁকা ও ফাঁকি। কালকেই মরণ, অতএব আজ এসো, খাই দাই ফূর্তি কবি। এই জীবনই শেষ, অনন্ত জীবন একটা অলীক ধারণা। ভোগবাসনা থেকে আমরাই সেটাকে বানিয়েছি। অপূর্ণ কামনাকে পূর্ণ করার অভিসন্ধি। আর ভগবান? সেও আমাদেরই মনগড়া। মৃত্যুভয় থেকে তার উদ্ভব। ভয় না থাকলে ভগবান থাকত না। ভগবানের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নেই।

ঊনবিংশ শতাব্দীর ভাবুকরা সংশয়বাদী ছিলেন। বিনা প্রমাণে কিছুই বিশ্বাস করতেন না, বিনা প্রমাণে কিছু অবিশ্বাস করতেন না, প্রমাণ খুঁজতে খুঁজতে সারা জীবন ভোর করে দিতেন। বিংশ শতাব্দীর গোড়াতেও সংশয়-বাদের জের চলছিল। কিন্তু প্রথম মহাযুদ্ধ এসে সব ওলটপালট করে দিয়েছে। তার পর থেকে সরাসরি অবিশ্বাস। অবিশ্বাসের জন্যেও তো যথেষ্ট প্রমাণ থাকা চাই। প্রমাণ কোথায় যে তুমি ভগবানে অবিশ্বাস করবে, অনন্ত জীবনে অবিশ্বাস করবে? প্রমাণ? ঐ যুদ্ধটাই প্রমাণ। ঐ দুর্গতিটাই প্রমাণ। মৃত্যু যে ঘোরতর বাস্তব। ভোগ বাসনা যে সম্পূর্ণ অতৃপ্ত। অতএব এসো, খাই দাই ফূর্তি করি। এই সব। আর সব আত্মপ্রতারণা।

ধর্মে সংশয় থেকে এক ধাপ এগিয়ে ধর্মে অবিশ্বাস পর্যন্ত আসা গেছে। একে ঠিক বৈজ্ঞানিক বা দার্শনিক মনোভাব বলা যায় না। এরা অন্বেষ্টা নয়। এরা কোথাও এক জায়গায় থামতে চায়। অবিশ্বাসও এক রকম থামা। এই থামাটা হচ্ছে ভোজনশালায় পানশালায় ভোগমন্দিরে। আজকের রাতটাই এরা বাঁচবে। কাল এদের ফাঁসি। এ হলো ফাঁসির খাওয়া। মৃত্যুই শেষ। তার পরে সব শূন্য। না আছে স্বর্গ, না নরক, না অনন্ত জীবন, না ঈশ্বর।

ফাউস্ট কি তা হলে এইখানেই থামবে? হেমিংওয়ের নায়কের মতো নিশ্চিত জানবে যে সব শূন্য, তার পরে শূন্য? "He knew all was nada y pues nada (nothing and after that nothing)", তাই যদি হলো তবে শয়তান কি এবার তার আত্মা দাবী করবে না? করবে বই-কি। তার লক্ষণ চারদিকে। যত রকম বীভৎস বিভীষিকার গল্প, তথাকথিত কমিক চিত্র, পৈশাচিক নাট্য, এসব কিসের লক্ষণ! মানুষ যে এই পথ্যের উপর বেঁচে আছে, ভাবতে গেলে স্তম্ভিত হতে হয়। অতি কুৎসিত অপরাধে দেশবিদেশ ছেয়ে যাচ্ছে। কারাগার

তো ভরে যাচ্ছেই, পাগলা গারদও ভরে উঠছে। মানসিক ব্যাধি এখন কায়িক ব্যাধির মতো ব্যাপক। সাহিত্য এর একটা কারণও বটে, পরিণামও বটে। একাধারে কার্য ও কারণ। আজকের সাহিত্যে মস্তিষ্কবিকৃতির ছোঁয়াচ লেগেছে। সেই সঙ্গে যৌনবিকৃতির।

অচেতন

মানসিক ব্যাধির নিদান অন্বেষণ করতে করতে ফ্রয়েড আবিষ্কার করেন যে, চেতনলোকের পাতালে এক অচেতন লোক আছে। রোগী নিজেও সে কথা জানে না। রোগীর সঙ্গে যাদের সম্বন্ধ তারা তো জানেই না। স্বপ্নের বৃত্তান্ত শুনে বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে বিশ্লেষণ করলে বোঝা যায় ব্যাধির বীজ কোথায়। রোগীকে প্রশ্ন করে তার জবানবন্দী শুনে আশ্চর্য আশ্চর্য তথ্য উদ্ধার করা যায়। ফ্রয়েডের গবেষণা, য়ুঙ্গের গবেষণা, য়্যাডলারের গবেষণা অচেতন মনস্তত্ত্ব বলে নতুন একটা বিদ্যার পত্তন করেছে। তার বয়স অল্প। তার সিদ্ধান্তগুলো এখনো সর্বস্বীকৃত নয়। ফ্রয়েড য়ুঙ্গ ইত্যাদির মধ্যেও গভীর মতভেদ। তা সত্ত্বেও বহু মানসিক ব্যাধির চিকিৎসা এই পদ্ধতিতে চলছে। চিকিৎসা জগতে এটা একটা যুগান্তর।

মানবাত্মার ইতিহাসেও। চেতনলোকের পাতালে এক অচেতন লোক আছে যার প্রভাব চেতনলোকের উপর পড়ছে, এ যদি সত্য হয় তবে শুধু কি ব্যাধির বেলা সত্য? জীবনের অপরাপর ক্ষেত্রে সত্য নয়? আমাদের ভাবনা চিন্তা কল্পনা কামনা সব কিছুই কি অচেতনের দ্বারা প্রভাবিত হচ্ছে না? অনেকের বিশ্বাস মানব ব্যবহারের রহস্য ঠিকমতো বুঝতে হলে অচেতন-লোকে অবতরণ করতে হবে। ফাউস্টকে যেতে হবে স্বর্গে নয়, পাতালে। এই পাতালযাত্রা কিন্তু পশুর স্তরে নামা নয়। পশু তো ইনস্টিংক্ট্ চালিত। মানুষ যার দ্বারা চালিত তার নাম রকমারি কমপ্লেক্স্। লিবিডো। ইড্।

অচেতনেরও আবার 'ব্যক্তি অচেতন' ও 'সমষ্টি অচেতন' আছে। একই মানুষের সত্তায় দুই প্রকার অচেতন কাজ করছে। এসব অচেতনের শিকড় চলে গেছে অতি প্রাচীন কালে, জন্মের পূর্বে, পূর্বপুরুষেরও জন্মের আগে। হয়তো দু' হাজার বছর আগে বিলুপ্ত হয়েছে এমন কোনো পুরাণ কল্পনা বা myth পাওয়া গেল এ কালের একজনের স্বপ্নে। স্বপ্নের অর্থ সে নিজে তো জানেই না, আর কেউ তাকে জানাতে পারে না, যারা পারত তারা দু হাজার বছর আগে মারা গেছে। গবেষণা করতে করতে এর একটা খেই মিলল।

অচেতন মনস্তত্ত্ব সাহিত্যের উপর অপরিসীম প্রভাব বিস্তার করেছে। প্রাচীন গ্রীক নাটকের যে ব্যাখ্যা এতকাল প্রচলিত ছিল তার বদলে এসেছে এক অর্বাচীন ব্যাখ্যা। এ ব্যাখ্যা প্রসারিত হয়েছে প্রাচীন কাব্যে, মধ্যযুগের নাটকে কাব্যে উপন্যাসে, আধুনিক যুগের সাহিত্যের প্রত্যেকটি বিভাগে। কবিদের মনে কী ছিল এত দিন আমরা তার সন্ধান নিয়েছি। এখন নিচ্ছি তাদের মনের পাতালে

অচেতনে কী ছিল তার সন্ধান। কবিরা যা গুপ্ত রাখতে চেয়েছে তা প্রকাশ হয়ে পড়ছে। অবশ্য এই প্রকাশ কার্যটি কবিদের প্রতি সুবিচার নাও হতে পারে। কবিদের তো আত্মরক্ষার সুযোগ দেওয়া হচ্ছে না।

একবার অচেতন মনস্তত্ত্বের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার পর যিনি যাই সৃষ্টি করছেন তার অঙ্গে এর ছাপ পড়ছে। যাঁরা এর সঙ্গে পরিচিত নন তাঁরাও যে আবহাওয়ায় নিঃশ্বাস নিচ্ছেন সে আবহাওয়ায় এর অদৃশ্য কণিকা মিশিয়ে রয়েছে। মার্সেল প্রুস্ত, জেমস জয়েস, টমাস মান, কাফ্‌কা প্রভৃতির উপন্যাসে সচেতন ও অচেতন এক প্রকার আলো-আঁধারি রচনা করেছে। যেমন সুড়ঙ্গের ভিতর দিয়ে রেলপথে যাওয়া আসা।

কিন্তু সাহিত্যে এর ব্যবহার রসোত্তীর্ণ হওয়া শক্ত। ইতিমধ্যেই সাধারণ পাঠকের ঔৎসুক্য অন্তর্হিত হয়েছে। তবে আজকাল 'subconscious', 'inhibition', 'split personality', 'inferiority complex' ইত্যাদি কথাগুলো সকলের মুখে মুখে ঘুরছে। সুতরাং সাহিত্য থেকে একেবারে বাদ দেওয়া যায় না। অসুখের মূল যে কোন্ পাতালে নেমে গেছে, সেখানে যে বিভিন্ন সংঘাতের কুরুক্ষেত্র, সেখান থেকে তাকে নির্মূল না করলে যে তার হাত থেকে পরিত্রাণ নেই, কোনো ব্যাধি যে কেবলমাত্র কায়িক নয়, কায়িকের পিছনে যে মানসিক ও মানসিকের পিছনে যে অচেতন কাজ করছে, এ জ্ঞান ধীরে ধীরে সাধারণ জ্ঞানের সামিল হয়ে উঠছে। তা ছাড়া ফ্রয়েড প্রভৃতির কল্যাণে লোকে সব কথা মুখ ফুটে বলতে শিখছে, ভব্যতার খাতিরে চেপে রাখছে না, এর ফলে আলাপ আলোচনা মোটের উপর স্বাস্থ্যকর হচ্ছে। সাহিত্য থেকে ক্রমশ জুজুর ভয় চলে যাচ্ছে। "চুপ চুপ" নীতির জুজু।

সঙ্গে সঙ্গে মনে রাখা উচিত যে জীবনটা কেবল অসুখের বা সংঘাতের নয়। সুখও আছে, শান্তিও আছে, কিন্তু তার সঙ্কেত এই নতুন শাস্ত্রে নেই।

প্রাগৈতিহাসিক

চেতন লোকের তলদেশে যেমন অচেতন লোক তেমনি ইতিহাসের মূলদেশে প্রাগৈতিহাসিক জগৎ। সকলে জানেন মহেঞ্জোদারো ও হরপ্পায় খননকার্যের ফলে আমাদের ইতিহাস আরো অনেকদূর পেছিয়ে গেছে। অর্থাৎ ইতিহাসের আরম্ভ আরো আগে ধরা হয়। তার চেয়ে পুরাতন কালের নির্ভরযোগ্য ইতিহাস নেই, কিন্তু কিংবদন্তী রূপকথা ইত্যাদির মধ্যে তার রেশ পাওয়া যায়। ইউরোপেও খননকার্যের ফলে নিত্য নতুন আবিষ্কার ঘটছে। ইজিপ্ট এশিয়া মাইনর ইত্যাদি অঞ্চলে অবিরাম খনন চলেছে। আর চলেছে পুরাণ কিংবদন্তী রূপকথা ইত্যাদির অনুসন্ধান। এখনো কোনো কোনো অঞ্চলের অধিবাসী প্রাগৈতিহাসিক কালের অধিকার অতিক্রম করতে পারেনি। এদের পুরাণ কিংবদন্তী রূপকথা ইত্যাদিতে এক একটা প্রাগৈতিহাসিক প্যাটার্ন এখনো অবিকৃতভাবে পাওয়া যায়।

এতদিন সাহিত্যিকদের পশ্চাদ্‌দৃষ্টি সীমাবদ্ধ ছিল গ্রীক ল্যাটিন সংস্কৃত ভাষায় প্রাচীন কাব্যনাটকে। এখন সীমানা আরো প্রসারিত হয়েছে। নৃতত্ত্ব-বিদ্‌দের গবেষণার ফল ইংরেজ সাহিত্যিকদের কাছে অন্য এক জগতের দরজা খুলে দিয়েছে। বিশেষত Frazer প্রণীত "Golden Bough" গ্রন্থ। সাহিত্যিকরা আদিকালের myth ও আদিমদের মধ্যে এখনো প্রচলিত myth আলোচনা করে নিজেদের কাব্য ও উপন্যাসের অঙ্গীভূত করছেন। সিম্বোলিজম আসছে কত হারিয়ে যাওয়া বিশ্বাস বা অনুভূতি বা কল্পনা থেকে। টি এস এলিয়ট রচিত Waste Land এর একটি প্রসিদ্ধ দৃষ্টান্ত। সেকালে রাজাকে মনে করা হতো রাজ্যের বা ভূমির স্বামী। রাজাই ভূমিকে উর্বরা করতেন। এই পুরোনো mythটিকে এলিয়ট নতুনভাবে কাজে লাগিয়েছেন। তেমনি আর একটি বিশ্বাস ছিল—এখনো আছে—নরবলি দিয়ে মৃতদেহ মাটিতে পুঁতে রাখলে অনুর্বর মাটিতে ফসল ফলে। এ যুগের যুদ্ধও তো নরবলি। যারা হত হচ্ছে তাদের দেহকেও তো মাটিতে পুঁতে রাখা হচ্ছে। তার থেকে কি নবজন্ম হবে না ? এই mythটিও এলিয়ট নিয়েছেন।

"In the summer after the battle of Linden, the most sanguinary battle of the seventeenth century in Europe, the earth, saturated with the blood of twenty thousand slain, broke forth into millions of poppies, and the traveller who passed that vast sheet of scarlet might well fancy that the earth had indeed given up her dead" (Frazer : Golden Bough)

"There I saw one I knew, and stopped him,
crying : Stetson!
You who were with me in the ships at Mylae ;
That corpse you planted last year in your garden
Has it begun to sprout ? Will it bloom this year ?"
(Eliot : Waste Land)

আমার কিন্তু মনে হয় প্রাগৈতিহাসিক মানুষের মন হচ্ছে ভয়ঙ্করের রাজ্য। অচেতন লোকও তাই। এসব গোলকধাঁধায় ঘুরে ফিরে কোনো মহৎ সত্যের সাক্ষাৎকার ঘটবে না। বিস্মৃতির অর্গল খুলে দিলে কত কী যে আসবে, যার আসার দরকার নেই বলেই তো বিস্মৃতি। আমরা ভুলি কেন ? বাঁচতে চাই বলেই তো ভুলি। আমার ভয় হয় যে এর পিছনে মৃত্যুকামনা বা death wish কাজ করছে।

নব ব্রহ্মাণ্ড

বৈজ্ঞানিকরা যেমন গত শতাব্দীতে বিবর্তনবাদ ও পরমাণুবাদ প্রভৃতি কয়েকটি তত্ত্ব প্রতিষ্ঠা করে সাহিত্যিকদের মানসেও বিপ্লব এনেছিলেন তেমনি এ

শতাব্দীতে Relativity ও Quantum Theory প্রভৃতি আরো কয়েকটি তত্ত্ব প্রতিষ্ঠা করে সাহিত্যিকদের মনকেও চঞ্চল করে তুলেছেন।

আগেকার দিনে স্পেস আর টাইম প্রত্যেকের তিনটি করে dimension ছিল, এখন স্পেস আর টাইম মিলে স্পেসটাইম হয়ে গেছে। এই স্পেসটাইম নামক অদ্বৈত continuum-এর চারটি dimension। একে যদি স্পেসের দিক থেকে দেখা হয় তা হলে চতুর্থ dimension-এর নাম টাইম। আর যদি টাইমের দিক থেকে দেখা হয় তা হলে চতুর্থ dimension-এর নাম স্পেস। ঐ স্পেসটাইম হলো সসীম বিশ্ব। তার সীমানা নেই, কিন্তু সীমা আছে।

আগেকার দিনে গ্রহ-নক্ষত্রের গতি-বিধিকে মাধ্যাকর্ষণের সাহায্যে বোঝানো হতো, এখন তার দরকার হয় না। স্পেসটাইমের গড়ন এমন যে গ্রহনক্ষত্র যেভাবে চলাফেরা করে সেইটেই তাদের পক্ষে স্বাভাবিক। ইউক্লিডের জ্যামিতির মতো সরল রেখা কোনোখানে নেই। রেখামাত্রেই বক্র। নিউটনের মাথায় ঘুরছিল সরল রেখা। আইনস্টাইনের মাথায় ঘুরছে বক্র রেখা। তারপর matter বলতে শেষ পর্যন্ত perticle বা কণিকা বোঝাত। এখন বোঝায় event বা ঘটনা। এর ফলে বৈজ্ঞানিকদের নিজেদেরই ধারণায় বিপ্লব ঘটে গেছে। সাহিত্যিকদের মধ্যে যাঁদের বিজ্ঞানের সঙ্গে পরিচয় আছে তাঁদেরও। Quantum Theory এনেছে continuity-র জায়গায় discontinuity। ঘটনার সঙ্গে ঘটনার পারম্পর্য না থাকায়, সুতো ছিঁড়ে যাওয়ায়, কার্যকারণ সম্পর্কের সনাতন ধারণাটাতেও সংশয় এসে পড়েছে। কার্যকারণ সম্পর্ক যদি না থাকে, তা হলে তা কেবল বিজ্ঞানের বেলায় খাটবে না, দর্শনে ইতিহাসে সাহিত্যে জীবনযাত্রায়ও খাটবে। অরাজকতা বাড়বে বই কমবে না। বৈজ্ঞানিকরা নিজেরাই কার্যকারণ সম্পর্ক অস্বীকার করতে অনিচ্ছুক।

আমরা একটা অদ্ভুত বিশ্বে বাস করছি। এ-বিশ্ব চিত্রনীয় নয়। এর ছবি আঁকা যায় না। এ বিশ্ব অতি দ্রুতবেগে প্রসারিত হচ্ছে। যে হারে প্রসারিত হচ্ছে, সে হার থেকে অনুমান করা যায়, এর আদি অপেক্ষাকৃত অল্পকাল হলো হয়েছে। এ অনাদি নয়। অসীম তো নয়ই, অনাদি যদি না হয় তবে এর অন্ত আছে।

তা হলে চিরন্তন বলে রইল কী? ঈশ্বর থাকলে ঈশ্বর, নইলে শূন্য। বিজ্ঞানকে আরো অন্বেষণ করতে হবে। এসব তত্ত্ব বিজ্ঞানের শেষ কথা নয়। তবু এগুলিকে শেষ কথা বলে মেনে নেওয়া হয়েছে। সাহিত্যিকরা বৈজ্ঞানিকদের গুরুর আসন দিয়েছে। সাহিত্যের উপর বিজ্ঞানের প্রভাব চোখে আঙুল দিয়ে দেখানো শক্ত। কিন্তু বহু লেখকের বহু রচনা যে গত শতাব্দীর বিবর্তনবাদের দ্বারা ও বর্তমান শতাব্দীর আপেক্ষিকতার দ্বারা প্রভাবিত তার সন্দেহ নেই। তা ছাড়া discontinuity বা ধারাভঙ্গ এ-কালের সাহিত্যের অন্যতম বিশেষত্ব।

"We are used to regarding certain processes as essentially continuous. Motion, for instance, we regard as a continuous process. We do not suppose that a moving body progresses by

discontinuous jumps, being annihilated at a point and re-created at another point a little further on. Similarly, we suppose that time progresses continuously, We do not suppose that there are timeless intervals between successive instants of time. Motion and time are merely two examples from the class of continuous quantities, all of which are characterised by the fact that they can be subdivided indefinitely...In fact we do not believe that any natural process whatever occurs in a continuous manner. Even time, it has been thought, may be atomic in constitution." (J. W. N. Sullivan).

বিজ্ঞান সব সময় পথ দেখাবে আর সাহিত্য তার পিছু পিছু চলবে, এটা ঠিক নয়। সাহিত্য তার নিজস্ব সত্যের অন্বেষণ করুক। এমন কি হতে পারে না যে, সাহিত্যই পথ দেখাবে, বিজ্ঞান অনুসরণ করবে? বিজ্ঞানে অচলা ভক্তি সাহিত্যিকের ধর্ম নয়। সাহিত্যিকের ধর্ম সত্যে অচলা ভক্তি।

বস্তুবাদী ব্যাখ্যা

বস্তু আছে কিনা, তাই এখন সন্দেহ। তবু বস্তুবাদী ব্যাখ্যার প্রেস্টিজ দিন দিন বাড়ছে। কারণ এই ব্যাখ্যার উপর ভিত্তি করে দু-দুটো মহাবিপ্লব ঘটে গেছে রুশ দেশে আর চীন দেশে। ওসব দেশের সাহিত্যিকদের কাছে বস্তুবাদী ব্যাখ্যা একেবারে অভ্রান্ত। বেদ কিংবা কোরানের মতো। অন্যান্য দেশের সাহিত্যিকদেরও জীবনের একটা অধ্যায় এর দ্বারা প্রভাবিত। এ শতাব্দীর তৃতীয় দশকের কথা বলছি।

At a certain stage of development the material productive forces of society come into conflict with the existing productive relations, or (to express the matter in legal terminology), with the property relations within which they have hitherto moved. These relations, which have previously favoured the development of the forces of production, now become fetters on production. A period of social revolution then begins. Concomitantly with the change in the economic foundation, the whole gigantic superstructure is more or less repidly transformed." (Marx quoted by Plekhanov : "Fundamentals of Marxism.")

"Political. legal, philosophical, literary, artisic, etc. development is grounded upon economic development. But all of them react, conjointy and separately, one upon another, and upon the economic foundation." (Engels quoted by Plekhanov : "Funda-

mentals of Marxism.")

আচ্ছা, ধরে নেওয়া যাক যে, এসব থিওরি অভ্রান্ত। যুগে যুগে উৎপাদনের প্রণালীগুলোর উন্নতি হয়, তখন উৎপাদনে নিযুক্ত শ্রেণীগুলোর সামাজিক সম্পর্কগুলোয় সংঘর্ষ বেধে যায়। সংঘর্ষে একদা বুর্জোয়ার জয় হয়েছে, এবার শ্রমিকের জয় অবশ্যম্ভাবী। অর্থনৈতিক ভিত্তি বদলে গেলে ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে থাকা প্রাচীর ও চূড়া পর্যন্ত বদলে যাবেই। সাহিত্য বলো, ধর্ম বলো, দর্শন বলো, রাজনীতি বলো সবকিছুর রূপান্তর ঘটবেই। তা তো হলো, কিন্তু রুশ বিপ্লবের পর আটত্রিশ বছর কাটল। ভিত্তির পরিবর্তন যা হলো, তা আশ্চর্য ব্যাপার। কিন্তু প্রাচীর-চূড়ার রূপান্তর যা হলো, তা তেমন কিছু নয়। এমন ক'খানাই বা বই লেখা হলো, যা ক্লাসিক হয়েছে বা হবে? টলস্টয়, ডস্টয়েভস্কি, টুর্গেনিভ, চেখভ প্রভৃতির কীর্তিকে অতিক্রম করেছে বা করবে? নতুন কোনো আর্টফর্মের উদ্ভব হয়েছে বলেও শোনা যায়নি। হবার মধ্য হয়েছে নতুন উপাদান, কিন্তু উপাদানের ব্যবহারে দক্ষতা ও স্বাধীনতা না থাকলে, কোনটার কী মূল্য জানা না থাকলে বৃহৎ সৃষ্টি সম্ভবপর কি? অবশ্য আটত্রিশ বছর এমন কিছু বেশী সময় নয়। পরে হয়তো মহৎ সৃষ্টি হবে। তবু একথা স্বীকার করা ভালো যে, পদার্থ বিজ্ঞানে যে ব্যাখ্যা খাটে প্রাণীবিজ্ঞানে তা খাটে না, প্রাণী-বিজ্ঞানে যে ব্যাখ্যা খাটে সমাজবিজ্ঞানে তা খাটে না, সমাজবিজ্ঞানে যে ব্যাখ্যা খাটে দর্শনে বা সাহিত্যে সে ব্যাখ্যা খাটে না। একই চাবি দিয়ে সব কটা তালা খুলবে, এ দাবী অচল। ধর্মশাস্ত্রীদেরও অনুরূপ দাবী ছিল, এখনো মন থেকে যায়নি।

তার পর অর্থনীতি যদি দর্শন, ধর্ম, সাহিত্য ও ললিতকলার ভিত্তিশিলা হয় অর্থনীতির ভিত্তিপাষাণ হবে প্রাণীবিজ্ঞান আর প্রাণীবিজ্ঞানের ভিত্তিশৈল পদার্থ বিজ্ঞান। খোদ পদার্থ বিজ্ঞানেরই যদি আমূল পরিবর্তন ঘটে, তবে এসব থিওরি খাড়া থাকে কিসের জোরে! আসল কথা, আজকের সমাজে ন্যায় নেই, ন্যায় চাই। স্যোশ্যাল জাস্টিসই বস্তুবাদের প্রেরণা জোগায়। সামাজিক সুবিচার প্রতিষ্ঠিত হলে বস্তুবাদী ব্যাখ্যার অবসান হবে।

অমানবিকতা

প্রথম মহাযুদ্ধের শেষ থেকে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের প্রারম্ভে পৌঁছতে একুশ বছর লাগল। এই একুশ বছর যে প্রকৃতপক্ষে একটা যুদ্ধবিরতি, কখনো একথা আমাদের মনে হয়নি। আমরা কেউ কল্পনা করিনি যে, আবার যুদ্ধ বাধবে ও শিবির দুটো মোটামুটি একই রকম হবে। কল্পনা যারা করত তাদের ধারণা ছিল যুদ্ধ বাধবে বিপ্লবী শক্তির সঙ্গে প্রতিবিপ্লবী শক্তির। শিবির দুটো অন্যভাবে গঠিত হবে।

যেভাবে শিবির বিভক্ত হলো তা বিস্ময়কর। কিন্তু তার চেয়েও বিস্ময়জনক যেভাবে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ পরিচালিত হলো। জার্মানীর মতো শিক্ষাদীক্ষায়

অগ্রসর দেশ ক'টা আছে ? পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার গৌরব যাঁরা, তাঁদের অনেকের জন্মভূমি জার্মানী। দর্শনে বিজ্ঞানে সঙ্গীতে ও সাহিত্যে জার্মানদের কীর্তি অবিনশ্বর। সেই দেশেই লক্ষ লক্ষ নাগরিককে বিনা বিচারে কয়েদ করা হলো, কয়েদীদের গ্যাস দিয়ে হত্যা করা হলো। এদের কতক ইহুদী, কতক খাঁটি জার্মান। জার্মানীর বাইরে পোলাণ্ডে হত্যা করা হলো যাদের, তাদের কতক ইহুদী, কতক স্লাভজাতীয় পোল। এরূপ ঘটনা বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে সংঘটিত হতে পারে এটা স্বয়ং জার্মানদেরই অবিশ্বাস্য। সব ইউরোপীয় জাতির এতে মাথা হেঁট। সভ্যতার গর্ব ধুলোয় মিশিয়ে গেছে। যুদ্ধক্ষেত্রে অবশ্য অনেক অঘটনই ঘটে থাকে, কিন্তু সেসব যারা করে তাদের রক্ত গরম, তারা ক্রোধান্ধ। এক্ষেত্রে দেখা গেল মাথা ঠাণ্ডা রেখে অঙ্ক কষার মতো মশা মাছি মারা হয়েছে।

সভ্য জগৎ জার্মানীকে একঘরে করতে পারত, কিন্তু কে কাকে একঘরে করবে ? আমেরিকাকেও শেষ পর্যন্ত দেখা গেল পরমাণু বোমা ফেলতে। লাখখানেক জাপানীর উপর যেন ইনসেক্টিসাইড ছড়িয়ে দেওয়া হলো। অধিকাংশই নিরীহ নিরস্ত্র বালবৃদ্ধবনিতা। যারা বাঁচল তাদের যন্ত্রণার সীমা নেই।

এই যদি সভ্যতা হয় তবে অসভ্যতার সংজ্ঞা কী ?

অথচ যুদ্ধ বাধলে যুদ্ধজয়ের প্রয়োজনে যে যত দূর যেতে পারে, তত দূর যাবেই, ধর্মের কাহিনী শুনবে না। সভ্যতা যদি ধ্বংস হয় হবে। তার জন্যে মাথাব্যথা নিষ্প্রয়োজন। প্রয়োজন হচ্ছে যুদ্ধজয়। একবার যুদ্ধজয়ের প্রয়োজন স্বীকার করে নিলে তার পরে মানুষের ইচ্ছা-অনিচ্ছা, সম্মতি-অসম্মতি ইত্যাদি অবান্তর। লক্ষ লক্ষ লোকের মনোনয়ন বা সিদ্ধান্ত বলে কিছু নেই। তারা ইচ্ছা করলে স্থানত্যাগ করতে পারে না, করলেও যেখানে যাবে সেখানেও তাদের মাথার উপর ইনসেক্টিসাইড ছড়ানো হতে পারে কিংবা সেখানেও কীটমারীর ক্রিয়া চলতে থাকা অসম্ভব নয়। যারা ছড়াবে তাদেরও কি মনোনয়ন বা সিদ্ধান্ত বলে কিছু আছে ! তারা কনস্ক্রিপ্ট বা আজ্ঞাদাস। আজ্ঞা আসবে দু'চারজন রাষ্ট্র-বিধাতার মস্তিষ্ক থেকে। সে মস্তিষ্কে বিবেকের ঘরে শূন্য। যুদ্ধজয়ই সে মস্তিষ্কের একমাত্র সঞ্চালিকা শক্তি।

আগেকার দিনে তবু যুদ্ধের সময় যুদ্ধ, শান্তির সময় শান্তি ছিল। এখন দেখা যাচ্ছে, শান্তির সময় শান্তি নয়, শীতল যুদ্ধ। এক্ষেত্রেও যুদ্ধজয়ের প্রয়োজন আছে। সেই প্রয়োজন থেকে প্রচারণা বা প্রোপাগাণ্ডা। মিথ্যা বলতেই হবে, কারণ সত্য বললে যুদ্ধে পরাজয় ঘটবে। ইচ্ছা-অনিচ্ছা বা সম্মতি-অসম্মতি অবান্তর। মনোনয়ন বা সিদ্ধান্ত সাধারণের জন্যে নয়। মিথ্যা বলতে হবে, শুনতে হবে, পড়তে হবে, সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বাস করতে হবে যে, ওই সত্য। আসল সত্যকে চাপা দিতে হবে, নেহাত যদি সেটা সম্ভব না হয়, তবে তার সঙ্গে মিথ্যার ভেজাল দিতে হবে, অর্ধ সত্যকে প্রকৃত সত্য বলে চালাতে হবে। বিবেকের প্রশ্ন তুললে দেশ দুর্বল হয়ে যাবে, ধর্মের কাহিনী শোনালে

দেশের লোক কাপুরুষ বনে যাবে। সুতরাং ওসব তোলা থাক অনির্দিষ্টকাল।

যেসব প্রতিজ্ঞার উপর মানবিকতা বা হিউমানিজম প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল সেসব একে একে পরিত্যক্ত হচ্ছে। কথায় না হোক কাজে। মানুষের প্রাণ মূল্যবান, তার স্বাধীনতা মূল্যবান। বিনা বিচারে কেউ তার প্রাণ কেড়ে নিতে পারবে না, তার স্বাধীনতা হরণ করতে পারবে না। তার ইচ্ছা না থাকলে কেউ তাকে দিয়ে হত্যা করাতে পারবে না, মিথ্যা বলাতে পারবে না। তার বিবেক মূল্যবান, তার মনোনয়ন মূল্যবান। তার সিদ্ধান্ত মূল্যবান। আদেশ যদি তার বিবেক-বিরোধী হয় বা মনোনয়নের অপেক্ষা না রাখে বা সিদ্ধান্তের প্রতি গুরুত্ব না দেয় আর সে আদেশ যদি সে মানে বা মানতে বাধ্য হয়, তা হলে তাকে মানবিক বলা চলবে না।

দৈবের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে গিয়েই আধুনিকতার ও মানবিকতার উদয় হয়। আধুনিকতা বলতে সময় অনুসারে আধুনিকতা বোঝায় না, বোঝায় মনোভাবের দিক থেকে আধুনিকতা। আর মানবিকতা বলতে সব মানুষের এক-একটা মোটরগাড়ি আর রেডিও আর থাকা-খাওয়ার সুবন্দোবস্ত বোঝায় না, বোঝায় সব মানুষের নিজের মনের মতো করে বাঁচা, নয়তো নিজের মনের মতো করে মরা।

মুষলপর্ব

মনে হয় ফাউস্ট ইতিমধ্যে তার আত্মা হারিয়ে বসে আছে। তার প্রগতির তা হলে মূল্য কী? এই প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে প্রগতির উপর এখনো যাঁদের বিশ্বাস আছে, তাঁদের সবাইকে। গত কয়েক শতাব্দীর মানবগৌরব যে হঠাৎ এভাবে ধূলিসাৎ হলো এর ফলে হিউমানিস্টদের আত্মপ্রত্যয় কমে আসছে। কী করে যে হিউম্যানিজমকে আবার মাটি থেকে তুলে দাঁড় করানো যায়, এ ভাবনা এখন তাঁদের চিত্ত জুড়েছে। এতদিন তাঁরা নিশ্চিত ছিলেন যে, তাঁদের পয়লা নম্বর প্রতিপক্ষ ক্যাথলিক ধর্মসঙ্ঘ। দোসরা নম্বর প্রতিপক্ষ কমিউনিস্ট মতবাদ। এখনো তাঁরা Liberty, Justice, Reason এই ক'টি কথা জপমালার মতো জপছেন। যেন দুনিয়া এখনো দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পূর্ববর্তী অবস্থায় আছে।

মানুষকে যে শান্তিকালেও কনস্ক্রিপ্ট করা হচ্ছে, যুদ্ধকালে তার মাথায় ফেলার জন্যে যে হাইড্রোজেন বোমা নির্মাণ করা চলেছে, এর চেয়ে বড় প্রতিপক্ষ আর কে হতে পারে! এ যে সমুদায় মানবমূল্য সম্পূর্ণ অস্বীকার করা। এরকম অস্বীকৃতির উপর সাহিত্য দাঁড়াতে পারে না। সাহিত্যের একটা অদৃশ্য ভিত্তি আছে। মানবমূল্য। মানুষ মূল্যবান বলেই সাহিত্য মূল্যবান। মানুষের যদি মূল্য না থাকে, সে যদি হয় কীটপতঙ্গ বা ক্রীতদাস, তা হলে সাহিত্যেরও মূল্য নেই।

হিউমানিজমের তেসরা প্রতিপক্ষ আজকের দিনের উভয় তাঁবুর অভ্যন্তরেই। কী করে মারণাস্ত্রের উপর কন্ট্রোল স্থাপন করা যায়, এইটেই মুখ্য। কন্ট্রোল

স্থাপন করা না করার উপর হিউম্যানিজমের ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে। শুধু হিউম্যানিজমের নয়, হিউম্যানিটিরও। মানবমূল্য লোপ পেলে যা থাকবে, তা দানবমূল্য। আর মানব জাতি লোপ পেলে যা থাকবে তা কার কোন কাজে লাগবে!

এখানে হিউম্যানিজম সম্বন্ধে গোড়ার কথা বলা দরকার। মানবিকতাবাদ মানব ইতিহাসে প্রচ্ছন্নভাবে বরাবরই ছিল, কিন্তু তার প্রকাশ্য অনুশীলন পঞ্চদশ শতাব্দী থেকে। একদা ডিভাইনকে কেন্দ্র করে যাবতীয় ব্যাপার চলত, যারা চালাত তাদের অথরিটির উৎস ছিল ডিভাইন বা সুপারন্যাচারাল। অন্তত তারা তাই দাবী করত। ডিভাইনকে না করে হিউম্যানকে কেন্দ্র করে সমস্ত ব্যাপার চলবে, এই বিদ্রোহ থেকে হিউম্যানিজমের সূত্রপাত। প্রাচীন গ্রীক নাটকে প্রোমিথিউসের বিদ্রোহের সঙ্গে এর তুলনা। এবার প্রোমিথিউস বন্দী নয়, প্রোমিথিউস বন্ধনমুক্ত। শেলীর সেই বিখ্যাত নাটকে হিউম্যানিজমের মর্মকথা ব্যক্ত হয়েছে। কিন্তু বন্ধনমুক্তকে যে আবার বন্দী করার তোড়জোড় চলেছে। যুদ্ধে কে জিতবে জানা নেই, কিন্তু তার আগেই শৃঙ্খলিত হবে প্রোমিথিউস।

প্রাঙ্‌মানবিকতা

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় তার বিরুদ্ধে সত্যাগ্রহ করে ভারতের লোক যে নৈতিক উচ্চতায় উঠেছিল তার নজির নেই। গৌরবে আমাদের মাথা আকাশে ঠেকেছিল, কিন্তু তার পরে যেসব ঘটনা ঘটল তাতে আমাদের সকল অহঙ্কার চোখের জলে ডুবল।

অন্যত্র যা দেখা গেল তা অমানবিকতা। এখানে যে দৃশ্য দেখলুম তা প্রাঙ্‌মানবিকতা। কারণ বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ধর্ম নিয়ে হানাহানি মানুষের মনকে পাঁচ শতাব্দী আগে নিয়ে যায়। যখন মানবিকতার পত্তন হয়নি। যখন অন্ধকার যুগ চলছে।

ওখানকার মানবিকতার সমস্যা হচ্ছে কণ্ট্রোল, আর এখানকার মানবিকতার সমস্যা হচ্ছে সেক্যুলার মনোভাব। আমরা এ বিষয়ে সচেতন হয়েছি, তবু আত্মসন্তোষের সময় এখনো আসেনি। সাহিত্য তো আকাশকুসুম নয়, আসমানে ফোটে না, তার জন্যে জমিন চাই। আধুনিক সাহিত্যের জমিন সব দেশেই সেক্যুলার। নয়তো সে আধুনিক নয়, মধ্যযুগের অবশেষ।

সেক্যুলারিজম সম্বন্ধে একটা ভ্রান্তি আছে। সেইজন্যে পরিষ্কার করে বলা দরকার ও জিনিস ধর্মে অবিশ্বাস নয়, ধর্মে সংশয় নয়, রাজনীতি থেকে ধর্মের নির্বাসন নয়। রাষ্ট্রকে বিশেষ একটি ধর্মবিশ্বাসের সঙ্গে অভিন্ন করে দেখার বিরুদ্ধেই ওর অভিযান। রাষ্ট্র অধিকাংশের নয়, সর্বসাধারণের। নাস্তিকেরও, সংশয়বাদীরও। অধিকাংশের বিশ্বাস অধিকাংশের থাকুক, কিন্তু বাদবাকীর উপর যেন তা চাপিয়ে দেওয়া না হয়। চাপিয়ে দেওয়ার অনেক রকম পদ্ধতি আছে। ছল বল কৌশল এর যে কোনো একটি পদ্ধতি নিন্দনীয়।

আধুনিক সাহিত্যের অদৃশ্য ভিত্তি মানবিকতা। আমাদের এ দেশে রাম-

মোহনের সময় এর গোড়াপত্তন হয়েছে। এই ভিত্তিকে দৃঢ় করে গেছেন রবীন্দ্রনাথ। আমরা যদি একে দৃঢ়তর না করতে পারি তা হলে দুই দিক থেকে এর উপর আঘাত আসবে। একটা অমানবিকতা। আর একটা প্রাঙ্‌মানবিকতা। এবং আঘাতে আঘাতে এ-ভিত চৌচির হয়ে যাবে। তখন আমরা কী সাহিত্য গড়ব ? কিসের উপর গড়ব ?

ইউরোপীয় সাহিত্যগুলোর মধ্যে এ সমস্যা একমাত্র জার্মান সাহিত্যে এসেছে। ইহুদীবিরোধী মনোভাব প্রাঙ্‌মানবিক। আর গ্যাসচেম্বার সমর্থক মনোভাব অমানবিক। তাই সে সাহিত্যে বিশেষ কিছু হচ্ছে না। গ্যয়টের দেশের সাহিত্যের যদি দেড়শো বছর পরে এমন দশা হয়, তা হলে রবীন্দ্রনাথের দেশের সাহিত্যের কেমন দশা হবে তা অনুমান করা কঠিন নয়। আমরা মানুষ হিসেবে যতটা নেমে যাব, মানুষকে যতটা সস্তা করব, আমাদের সাহিত্য ঠিক ততটা মূল্যহীন হবে।

নির্মোহ

এবারকার মহাযুদ্ধের পর মোহভঙ্গ ঘটেনি। মোহ থাকলে তো মোহভঙ্গ ঘটবে ! মোহ যেটুকু ছিল সেটুকু আমাদের মতো লোকের ছিল। স্বরাজের স্বরূপ সম্বন্ধে আমাদের স্বপ্ন ছিল স্বর্ণ যুগের বা সত্য যুগের পুনরাবৃত্তি। তেমনি বিপ্লবের স্বরূপ সম্বন্ধে আমাদের বন্ধুদের স্বপ্ন। সে স্বপ্ন এখনো মধুর। অবশ্য সেটা পুনরাবৃত্তির নয়, নব আবির্ভাবের।

মানুষ এখন ঘরপোড়া গোরুর মতো সন্দিগ্ধ। মোহ একদা মানুষকে সৃষ্টির প্রেরণা দিয়েছে। ঊনবিংশ শতাব্দীর মতো এত রকম স্বপ্নই বা কোথায় ! এত রকম সৃষ্টিই বা কোথায় ! বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে স্বপ্ন দেখতে সাহস হয় না, সৃষ্টি করতে গেলে দেখি প্রেরণার অভাব। নিতান্ত আটপৌরে বাস্তব নিয়ে কি সাহিত্য হয় ? সাহিত্যে বাস্তবের সঙ্গেও ধ্যান মেশানো থাকে। সেকালের রিয়ালিস্টদেরও একটা না একটা ধ্যান ছিল। একটা না একটা আদর্শ ছিল। নইলে বাস্তববাদী সাহিত্যিক Zola কেন করতেন Dreyfus নামক অচেনা অজানা অবিচারিতের জন্যে নিঃস্বার্থভাবে সংগ্রাম, স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে সংগ্রাম ?

আমাদের দৃষ্টি এখন এই শতাব্দী অতিক্রম করতে পারছে না। সামনে ফাঁড়া। এ ফাঁড়া না কাটলে আমরা ভাবতে পারছিনে একবিংশ শতাব্দীতে কী আসছে, কী আসা উচিত, কী এলে আমরা তৃপ্ত হব। ন বিত্তেন তর্পণীয়ো মনুষ্যঃ। সকলে স্বচ্ছল অবস্থায় দিনপাত করবে এটা এমন কী একটা বড় কথা ! ইংলণ্ডে আজকাল অধিকাংশ ব্যক্তির স্বচ্ছল অবস্থা। কিন্তু ইংরেজ সাহিত্যিকরা আজ সৃষ্টির প্রেরণা পাচ্ছেন না। নূতন কোনো স্বপ্ন না দেখলে জীবনটা নিতান্তই মামুলি লাগবে। নিত্য নতুন ব্যসন বা অপরাধ দিয়ে তাকে ভরিয়ে তুললে উত্তেজনার অভাব হয় না, কিন্তু সাহিত্য চায় অন্তর্জীবনের সমৃদ্ধি। সেই জন্যে কারো কারো নতুন করে ধর্মে মতি হচ্ছে। এখানেও।

ধর্মে মতি যদি সাহিত্যে সোনার ফসল ফলায় তা হলে মন্দ কী! সোনার ফসল কিন্তু লেখকের বা প্রকাশকের সিন্দুক ভরানোর মতো সোনা নয়। সাহিত্যের আঁচল ভরানোর মতো সোনা। সাহিত্য আজ যেখানে এসে পেঁছেছে সেখানে দেবতার চেয়ে মানবেরই মূল্য বেশী। নারায়ণের চেয়ে নরেরই মাহাত্ম্য বেশী। আধুনিক সাহিত্য মধ্যযুগের মতো ডিভাইন কেন্দ্রিক নয়, হিউমান কেন্দ্রিক। এর কেন্দ্র আবার সেই পাঁচশো বছর আগে ফিরে গেলে প্রাঙ্‌মানবিক মূল্যগুলোকে সাহিত্যে ফিরিয়ে আনা হবে। মানবিক মূল্যগুলোকে সাহিত্য থেকে বহিষ্কার করা হবে। দর্শন হয়ে দাঁড়াবে থিওলজি, কাব্য হয়ে দাঁড়াবে মঙ্গলকাব্য, কথাও হয়ে দাঁড়াবে ব্রতকথা।

আধুনিক সাহিত্যের কারবার মানুষকে নিয়ে, ভালোয় মন্দে মেশা রক্তে-মাংসে তৈরি স্বাধীন ইচ্ছাচালিত স্বভাবসুস্থ বিবেকসম্পন্ন আত্মসমাহিত মানুষকে নিয়ে। আমরা দেবতা গড়তে বসিনি, মানুষ আঁকতে বসেছি। দেবতা যদি গড়তে চাও তো দেবতাকে মানুষ করো। মানুষকে দেবতা কোরো না। সে কাজ আধুনিক সাহিত্যের নয়।

কেন বাঁচব ?

ভরা ভোগের মাঝখানেও একটি প্রশ্ন দিন দিন জরুরি হয়ে উঠছে। কেন বাঁচব ?

প্রথম মহাযুদ্ধের পর একুশ বছর বাঁচবার মেয়াদ পাওয়া গেছল। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর ততদিন পাওয়া যাবে এ ভরসা নেই। জীবনকাল যদি সংক্ষিপ্ত হয়ে থাকে, তা হলে কেন বাঁচব এই প্রশ্নের উত্তর জেনে কী হবে ?

হাইড্রোজেন বোমা অবশ্য কাল সকালে পড়ছে না, কিন্তু তার পড়া না-পড়ার উপর সাধারণ মানুষের হাত নাই। আগে তবু পালাবার পথ ছিল। এবার তাও বন্ধ। সুতরাং লোকে বেবাক অদৃষ্টবাদী। তাই যদি হলো তবে কেন বাঁচব এ প্রশ্ন কেন ওঠে ?

তবু ওঠে। মানুষ স্বভাবত বাঁচতে চায়। কিন্তু কোনো কোনো যুগে এর বিপরীতটাও দেখা যায়। মানুষ মরতে চায়। সে যদি তার নিজের মনের মতো করে বাঁচতে না পারে, কিংবা সার্থকভাবে বাঁচতে না জানে, তা হলে বিপরীত ইচ্ছাটাই তার পক্ষে স্বাভাবিক। মরণকামনা বা death wish এ যুগের মানুষের ভিতর কাজ করছে। অনেকের মতে এটা যুদ্ধবিগ্রহের ফল নয়, বরং এইটেই যুদ্ধবিগ্রহের মূল। মানুষ মরতে চায় বলে যুদ্ধ চায় ও যুদ্ধে যায়। পতঙ্গ যেমন আগুনের দিকে ছুটে যায় মানুষ তেমনি মৃত্যুর দিকে। সেই জন্যেই যুদ্ধ এড়াতে বা নিবারণ করতে তার তেমন চাড় নেই। নইলে এত ঘন ঘন যুদ্ধ বাধত না। আর যেসব কারণ ইতিহাসে লেখে সেসব অগভীর। এইটেই গভীর। আধুনিক জীবনযাত্রায় এত বেশী বিশ্বাসভঙ্গ আশাভঙ্গ মোহ-ভঙ্গ, এত বেশী frustration যে মানুষ মানে মানে মরতে পেলে বাঁচে! যুদ্ধে মরার মতো সম্মান তো আর নেই।

শিল্পবিপ্লবের পর থেকে কর্মবিভাগ এমনভাবে হয়েছে যে কোনো একজন মানুষ আস্ত একটা কাজ করতে পায় না। টুকরো টুকরো কাজ পুনঃ পুনঃ করতে করতে তার কাজে অরুচি ধরে যায়। সে কাজ তার স্বধর্ম নয়। দিনের পর দিন পরধর্ম আচরণ করতে করতে তার জীবনে বিতৃষ্ণা আসে। তারপর কাজের মজুরি ক'জনের বেলায় জীবনধারণের পক্ষে যথেষ্ট ? কোনো কারণে কাজটাই যদি চলে যায় তা হলে তার অবলম্বন চলে যায়, আত্মবিশ্বাস চলে যায়। ঈশ্বরে বিশ্বাস না থাকলে কেন বাঁচব এ প্রশ্ন উঠবেই।

সাহিত্যিকরা এর খুব সন্তোষজনক উত্তর দিতে পারছেন না। কেবল বস্তুবাদীদের একটা বাঁধা উত্তর আছে। সমাজবিপ্লবেই অভিনব জীবন। অর্থপূর্ণ জীবন। কথাটা মিথ্যা নয়। সমাজবিপ্লবে অভিনবত্ব আছে, অর্থ আছে। সমাজবিপ্লব গতানুগতিকের উপর রং ফলানো নয়। কোনো মতে টিকে থাকার মতো নিরর্থক নয়। বস্তুবাদী সাহিত্যিকরা যে আজ উৎসাহের সঙ্গে কাজ করে যাচ্ছেন আর অন্যান্য সাহিত্যিকরা স্বপ্নভঙ্গের পর নতুন কোনো স্বপ্ন দেখতে পারছেন না, কেবল ষষ্ঠীপূজা আর লক্ষ্মীপূজা করে যাচ্ছেন, এটা তো প্রত্যক্ষ সত্য। গালাগালি দিয়ে এটাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করা যায় না।

তবু যারা সাহিত্যের কাছে গভীর সুরে প্রশ্ন করছে, কেন বাঁচব, কেমন করে বাঁচব, তারা গভীর সুরে উত্তর পাচ্ছে না কারো কাছে। লক্ষ্মীপূজক বা ষষ্ঠীপূজকদের কাছে তো নয়ই, সমাজবিপ্লবীদের কাছেও না। জীবনের যে নকশা এঁরা আঁকছেন, এঁকে দেখাচ্ছেন, তাতে জীবনে উৎসাহ জাগে না কোনো সত্যিকারের জীবনজিজ্ঞাসুর। উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্যে সব রকম উপায় অবলম্বন করতে হবে, End justifies means, এই হলো এঁদের নীতি। ক্ষমতা হাত করার জন্যে মিথ্যা বলো, খুন করো, ঘরে আগুন দাও, লুট করো—পাপ হবে না। ক্ষমতা হাতে পেয়ে লক্ষ লক্ষ লোককে নিপাত করো, বিনা বিচারে গুলি করো, নামমাত্র বিচারে ফাঁসি দাও—পাপ হবে না। এর মধ্যে জীবনজিজ্ঞাসার উত্তর কোথায় !

কেমন করে বাঁচব

জীবনের অর্থ কী ? উদ্দেশ্য কী ? এসব প্রশ্নও সঙ্গে সঙ্গে ওঠে। জীবন কি কেবল প্রাণধারণ ? দেহধারণ ? কোনো মতে বেঁচেবর্তে থাকা ? বংশরক্ষা করা ? অনধিকার প্রবেশকারীর মতো যেখানে যতটুকু সুখ পাওয়া যায় লুটেপুটে নেওয়া ? আমরা কি আকস্মিকভাবে জন্মেছি ? আকস্মিকভাবে মরব ? বাঁচাটাও আকস্মিক ?

অথবা একটা কিছু সাধন করার জন্যে এখানে প্রেরিত হওয়া ? কোনো এক ব্রত ? হোক না কেন নিতান্ত সামান্য। তবু তো একটা ব্রত। একটা কৃত্য। ছোট হলেই তুচ্ছ হয় না। সেতুবন্ধের দিন কাঠবিড়ালীর কৃত্য সামান্য ছিল, কিন্তু তুচ্ছ ছিল না।

মানুষকে এর উত্তর দিতে হবে। সাহিত্যের কাছে মানুষ এর উত্তর চাইবে। সাহিত্যিককে এর উত্তর জোগাতে হবে। কী উত্তর আছে তার ঝুলিতে?

এর পরের প্রশ্ন, কেমন করে বাঁচব?

এ প্রশ্নের উত্তর গ্যয়টে একভাবে দিয়েছেন, টলস্টয় আরেকভাবে, রবীন্দ্রনাথ আরো একভাবে। এসব উত্তর যে এরই মধ্যে তামাদি হয়ে গেছে তা নয়। কিন্তু এটাও ঠিক যে, এঁরা কেউ আমাদের মতো অদ্ভুত অবস্থায় পড়েননি। মাথার উপর Damocles-এর খড়্গের মতো যুদ্ধ ঝুলছে, পায়ের তলায় বাসুকির ফণার মতো বিপ্লব যে কোনো দিন নড়ে উঠবে, এই অপরূপ অবস্থায় কেমন করে বাঁচতে হয় তার দৃষ্টান্ত পূর্বসূরীরা কেউ দেখিয়ে দিয়ে যাননি। এটা ইতিহাসে অভূতপূর্ব।

আজকের জগতে সেই সুখী হবে যে আদৌ ভাবে না, যে সম্পূর্ণরূপে অদৃষ্টবাদী অথবা যে একান্তভাবে ভগবানের ইচ্ছা বা ইতিহাসের ইচ্ছা মেনে নিতে শিখেছে। কিন্তু এরা তো কেউ সাহিত্যসৃষ্টির দায় স্বীকার করেনি। সাহিত্যিক যারা তারা কেমনভাবে বাঁচবে তার এরা কী জানে? শুধু সাহিত্যিকের না, দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক প্রভৃতির জীবনও অত্যন্ত দায়িত্বপূর্ণ। দায়িত্বের সঙ্গে বাঁচতে হয় এদের সবাইকে, দায়িত্বহীনের মতো নয়। দায়িত্বটা ভগবানের বা ইতিহাসের, আর এরা শুধু হাতের পুতুল বা দাবার বোড়ে, তাই যদি হতো, তবে কথা ছিল না। তা হলে প্রশ্নই উঠত না কেমন করে বাঁচব!

যে লোকটিকে পরমাণুবোমা ফেলতে বলা হয়েছিল, যে লোকদের বলা হয়েছিল গ্যাসচেম্বারে বন্দীহত্যা করতে, তারাও তো দোহাই দিতে পারে রাষ্ট্রের ইচ্ছার, ভগবানের ইচ্ছার। নিমিত্তমাত্রো ভব সব্যসাচী এই যদি হয় তাদের সাফাই তা হলে এর উপর বলবার কী আছে? কিন্তু মানুষ কখনো অতটা দায়িত্বহীন হতে পারে না যে, এই দায়িত্বহীনদের চিরদিন সমর্থন করবে। এদের নিয়ে যদি কোনোদিন সাহিত্য রচা হয়, তবে সে সাহিত্য মানুষ গ্রহণ করবে না, যদি তাতে এই দায়িত্বহীনদের সমর্থন থাকে। মানুষের সহানুভূতি হিরোশিমা ও নাগাসাকির নিহতদের প্রতি, বেলজেন ও বুকেনওয়ালডের বধ্যদের প্রতি চিরকাল ধাবিত হবে, হন্তা বা ঘাতকদের প্রতি কদাচ নয়।

দায়িত্বহীনদের মতো বাঁচা আমাদের সমর্থন পাবে না, কিন্তু দায়িত্ববানের মতো বাঁচব যে তার নক্‌শা কই, ব্লু প্রিন্ট কই, দৃষ্টান্ত কই? দৃষ্টান্ত কে দেখাবে, নক্‌শা কে আঁকবে, ব্লু প্রিন্ট কে তৈরি করবে?

জীবনের সমালোচনা

কেন বাঁচব, এ প্রশ্ন জরুরি। কারণ এর উত্তর বা পেলে মানুষ বাঁচতে চাইবে না, মরতে চাইবে, মরণকামনা থেকে আসবে যুদ্ধবিগ্রহ।

কেমন করে বাঁচব, এ প্রশ্ন কম জরুরি নয়। কারণ এর উত্তর না পেলে মানুষ দায়িত্বহীনের মতো বাঁচবে, নির্বিকারচিত্তে অমানবিক কর্ম করবে।

সাহিত্যকে এসব প্রশ্ন নিয়ে মাথা ঘামাতে হয়। সাহিত্য তো কেবল জীবনের প্রতিকৃতি নয়, জীবনের সমালোচনাও বটে। মহাভারত যিনি রচনা করেছেন তিনি তখনকার দিনের জীবন দেখিয়েছেন, সঙ্গে সঙ্গে ইঙ্গিত দিয়েছেন জীবন কেমন হলে ভালো হতো। ঐ মহাযুদ্ধের নায়ক যুধিষ্ঠির এমন সত্যনিষ্ঠ যে কোনো দিন একটি মিথ্যা কথা বলেননি। ফলে অনেক দুঃখ পেয়েছেন। যুদ্ধের মাঝখানে যুদ্ধজয়ের প্রয়োজনে সেই সত্যবাদীকেও একটি অর্ধসত্য উচ্চারণ করতে হলো। দ্রোণ যদি জানতেন যে, লোকটা আর দশজন যোদ্ধার মতো প্রয়োজনবাদী তা হ'লে ও কথা কানে তুলতেন না। কিন্তু যুধিষ্ঠির তাঁর শত্রু-পক্ষীয় হলেও সত্যসন্ধ, তাঁর কথা তো অসত্য হতে পারে না। বেচারা দ্রোণ যুধিষ্ঠিরের অর্ধসত্যের দ্বারা প্রতারিত হয়ে প্রাণ হারালেন। মহাভারতকার এর জন্যে যুধিষ্ঠিরকে ক্ষমা করেননি, তাঁকে সশরীরে স্বর্গে নিয়ে যাবার মহত্তম সৌভাগ্য দিয়ে অমর করে দিলেন, কিন্তু একদিনের জন্য নরকে নিয়ে যেতে দ্বিধা করলেন না। প্রাচীনদের সত্যবোধ ন্যায়বোধ এমনি কঠোর ছিল।

রামায়ণও তেমনি সত্যকে সর্বোচ্চ মূল্য দিয়েছে। পিতৃসত্যের জন্যে যুবরাজ রাম রাজা হলেন না, বনে বনে ঘুরলেন, অশেষ দুঃখ পেলেন। সেই রামকেই সরযুর জলে আত্মহত্যা করতে হলো। সতীর প্রতি প্রজারঞ্জনকারীর প্রতারক-তুল্য ব্যবহার ক্ষমার অযোগ্য। বাল্মীকি তাঁকে সমর্থন করেননি। তাঁকে রাবণের উপর জিতিয়ে দিলেন, কিন্তু সীতার উপর জিতিয়ে দিলেন না। রামায়ণে শেষ পর্যন্ত সীতারই জিত।

প্রাচীনদের মতো আধুনিকদেরও জীবনের প্রতিকৃতি আঁকতে হবে, সঙ্গে সঙ্গে সমালোচনা দিয়ে যেতে হবে। কেমন করে বাঁচতে হবে তার নিশানা। অত কথায় নয়, আভাসে ইঙ্গিতে। যুগ বদলে গেছে। এ যুগের জীবনের শরিক শুধু উপরের দিকের মুষ্টিমেয় অভিজাত নয়, যারা এতদিন তলার দিকে ছিল সেই উপেক্ষিত অবজ্ঞাত জনগণ এখন জাগ্রত। এবং প্রধানত পুরুষ নয়, যাদের এত-দিন দেবী বলে কপট ভক্তি দেখানো হয়েছে, নরকের দ্বার বলে মনে মনে ঘৃণা করা হয়েছে সেই অবলা এখন প্রবলা।

জনগণের অভ্যুত্থান

জনগণের রাজ্যলাভ আমাদের যুগের একটা অতি বৃহৎ ঘটনা। কী রাশিয়ায়, কী চীনে, কী ভারতে, কী ইংলণ্ডে সর্বত্র জনগণের একচ্ছত্রতা স্বীকৃত হয়েছে বা হচ্ছে।

উনবিংশ শতাব্দীর অন্যতম বৃহৎ ঘটনা ছিল দাসপ্রথা বা সার্ফ প্রথার অবসান। তেমনি বিংশ শতাব্দীর অন্যতম বৃহৎ ঘটনা দাস বা সার্ফ শ্রেণীর লোকের ভোটঅধিকার। যেখানে ভোটঅধিকার লঙ্ঘিত সেখানে বিপ্লবের দ্বারা রাজ্য অধিকার।

সাহিত্যে এসব ঘটনা প্রতিফলিত হবেই। না হয়ে পারে না। কৃষক শ্রমিক-

শ্রেণী থেকে বহু লেখকের আবির্ভাব হবে। গত শতাব্দীতে যেমন মধ্যবিত্ত শ্রেণী থেকে হয়। তারা যখন আসবে তখন তাদের নিজেদের জীবনের অভিজ্ঞতাও আসবে। এসব অভিজ্ঞতা অপরের আয়ত্ত নয়। সাহিত্যে এর জন্যে স্থান খালি রয়েছে। যে স্থান মধ্যবিত্তরা পূরণ করতে পারবে না। হাজার দরদী সাহিত্যিক হলেও যার ঘরের কথা তার মতো করে বলা যায় না, যার মনের কথা তার মতো করে বোঝানো যায় না।

তবে সাহিত্যের স্বকীয় মূল্য না মানলে সকলের সব লেখা সাহিত্য হবে না। তা যদি না হলো তবে স্থান অপূর্ণই রয়ে গেল। জনগণের লেখকদেরও সাহিত্যের স্বকীয় নিয়ম, স্বকীয় মূল্য স্বকীর করতে হবে। নয়তো এমন কোনো নতুন নিয়ম নতুন মূল্য প্রবর্তন করতে হবে যা সাহিত্যের স্বকীয় নিয়ম স্বকীয় মূল্য বলে সকলে স্বীকার করে নেবে।

নানাদিক দিয়ে সাহিত্যের রূপান্তর ঘটবে তা বেশ বুঝতে পারা যায়। তবে হাজার রূপান্তর ঘটলেও একটা ধারাবাহিকতা থাকবে, এবং জীবনের গভীরতর অভিজ্ঞতাগুলো হাজার বছরেও বদলাবে না। সুতরাং গভীরতর অভিজ্ঞতাগুলো নিযে যারা কাজ করবে তারা চিরদিন কল্‌কে পাবে, কোনো দিন অপাংক্তেয় হবে না। তাদের নায়কনায়িকারা হয়তো জনগণের সামিল নয়, তা বলে তাদের সাহিত্যিক মূল্য বা মানবিক মূল্য কারো চেয়ে কম নয়। রামায়ণ পড়বাব সময় কেউ কি ভাবে যে, রাম ও সীতা অভিজাত শ্রেণীর নায়কনায়িকা? যাদের মনে সেরূপ প্রশ্ন জাগে তারা সাহিত্য উপভোগের উপযুক্ত নয়। সাহিত্যে সকলের স্থান আছে, মান আছে, অধিকার আছে। নতুন একটা শ্রেণী সেখানে স্বাগত, কিন্তু পুরাতন একটা শ্রেণী সেখানে প্রত্যাখ্যাত নয়। যার যা অভিজ্ঞতা সে তা দিয়ে যাবে, যা থাকবার তা থাকবে।

যাদের এতদিন শূদ্র বলা হয়েছে, অন্ত্যজ বলা হয়েছে, অনাচরণীয় বলা হয়েছে, হঠাৎ শুনছি তারা নাকি গণদেবতা। সাবহিউমান থেকে ডবল প্রোমোশন পেয়ে সুপারহিউমান হবার আগে তারা কি একবার হিউমান হতে পারে না? সেইখানেই কিন্তু সত্যিকার মহত্ত্ব।

নারীর অভ্যুদয়

সাহিত্যে জনগণ নবাগত। নারী কিন্তু নবাগতা নয়। নারীকে আমরা আদি-কাল থেকেই কাব্যে আর নাটকে পেয়ে আসছি। তার পরে উপন্যাসে। বর্তমানে ছোট গল্পে। নারী না থাকলে এর কোনোটাই জমে না।

কিন্তু নারীর জন্যে যে সংকীর্ণ সীমা নির্দিষ্ট হয়েছিল তার বাইরে তাকে যেতে দেওয়া হতো না। কেউ যদি সে সীমা অতিক্রম করত সমাজ তেড়ে আসত। সমাজের ভয়ে লেখকরাও সীমা লঙ্ঘন করাতে সাহস পেতেন না। সব দেশেই এই ইতিহাস। যেখানে কোনো নারী সীমার বাইরে গেছে সেখানে তার কলঙ্কের সীমা নেই। কলঙ্কিনীকে সাহিত্যে ঠাঁই দিয়ে কোনো কোনো লেখকও

কলঙ্কী হয়েছেন, সাজা পেয়েছেন। তবে বরাবরই এক শ্রেণীর নারীর জন্যে সমাজের বাইরে একটা ঘৃণ্য স্থান বরাদ্দ ছিল। সাহিত্যে এরাও মাঝে মাঝে প্রবেশ করেছে, সেখানেও লেখক এদের ঘৃণ্য করে দেখিয়েছে। নইলে তাকেও যে পাঁচজনের চোখে ঘৃণ্য হতে হবে।

আমাদের যুগের সমাজে ও সাহিত্যে নারীর জন্যে নির্দিষ্ট সীমা বহু দূর প্রসারিত হয়েছে। যুদ্ধ আর বিপ্লব এদিক থেকে নারীর সহায় হয়েছে। শান্তি-কালে পুরুষেরা যেসব কাজ করত যুদ্ধকালে মেয়েরা সেসব কাজ করে। নতুবা আপিস ব্যাঙ্ক দোকানপাট অচল হয়। বিপ্লবের দিন মেয়েরা পুরুষদের পাশে এসে দাঁড়ায়, ব্যারিকেড বানায়, মিছিল নিয়ে বেরোয়, মেশিনগানেব সম্মুখে বুক পেতে দেয়। সমাজপতিরা এদের ঠেকাতে পারবেন কেন? যে যার জান-মাল সামলাতে ব্যস্ত।

বিগ্রহের শেষে বা বিপ্লবের পরে নারীকে আর পুরোনো সীমায় ফিরিয়ে আনা যায় না। নারী একবার সীমা লঙ্ঘন করলে সীমাই বেড়ে চলে, নারী ফিরে চলে না। তারপর ঐ যে একদল নারীকে পতিতা বলে আবহমান কাল ঘৃণা করা হয়েছে তাদেরও মানুষ বলে গণ্য করা হয়। আমাদের সাহিত্যে শরৎ-চন্দ্র এর পথপ্রদর্শক। বহু অপমান সহ্য করে তিনি অপমানিতাকে মান দিয়ে গেছেন। লোকে যাদের ঘৃণ্য বলে তিনি তাদের মধ্যেও মহত্ত্ব আবিষ্কার করেছেন। ব্যাসদেবের সাবিত্রীর সঙ্গে শরৎচন্দ্রের সাবিত্রীও সাহিত্যে লোকস্বীকৃতি পেলো। সাহিত্যের শ্রীক্ষেত্রে সতী ও অসতী একসঙ্গে তীর্থ করতে যাচ্ছে, কেউ মন্দিরের দ্বার রোধ করছে না এই অস্পৃশ্যার জন্যে। আধুনিক সাহিত্য ভ্রমরকে মর্যাদা দেয়, তা বলে রোহিণীকে গুলি করে মারে না। বঙ্কিমের সমসাময়িক টলস্টয় তাঁর আনা কারেনিনাকে রেলগাড়ির তলায় আত্মহত্যা করালেন। শরৎচন্দ্রের সমসাময়িক গলসওয়ার্দি এটাকে অবশ্যম্ভাবী বলে মেনে নিতে নারাজ হলেন। আধুনিক পাঠক গলসওয়ার্দির সঙ্গেই একমত হবে, টলস্টয়ের সঙ্গে নয়।

ঐতিহ্য

ঐতিহ্য বলতে যাঁরা অজ্ঞান তাঁরা ঐতিহ্যগত মূল্যগুলোকে আধুনিক মানুষের ঘাড়ে নির্বিচারে চাপাতে চান। আধুনিক মানুষ চায় বিচার করতে, বিবেচনা করতে, যাদের প্রতি যুগে যুগে অন্যায় করা হয়েছে, তাদের প্রতি সুবিচার করতে। সুবিচার করতে গিয়ে সহানুভূতিবশত হয়তো কিছু অতিরিক্ত মূল্য দিয়ে বসে। তার ঐ আতিশয্য কালক্রমে সংশোধিত হয়। কিন্তু ঐতিহ্য-পূজারীদের অবিচারের চেয়ে এই অতিমাত্রিক সুবিচার ভালো।

ঐতিহ্যকে নির্বিচারে নাকচ করা ঠিক নয়। কিন্তু ঐতিহ্যের মধ্যে যে অংশটা শাশ্বত নয়, যেটা কালচিহ্নিত, সেটা যদি ধীরে ধীরে কালের কবলে পড়ে শেষে একদিন অপ্রচলিত হয়ে যায় তা হলে আফসোস করার কী আছে! যা পুরাতন তার সবটাই সনাতন নয়, সবটাকে সনাতন বলে জাহির করাও আতি-

শয্য, এবং অমার্জনীয় আতিশয্য। এর সংশোধন কি কোনো দিন হবে না? নিশ্চয় হবে। যা নিছক পুরাতন তা সনাতন বলে পরিচয় দিলেও তার আয়ু ফুরিয়ে আসবে। এই ত্রিশ চল্লিশ বছরে আমরা তা প্রত্যক্ষ করলুম। বেঁচে থাকলে আরো দেখব।

ঐতিহ্যের সঙ্গে ধারাবাহিকতা রক্ষা করতে হবে। আর ঐতিহ্যের মধ্যে যা সত্যি সনাতন তাকে নিত্য নূতনভাবে উপলব্ধি করতে হবে। এই সব নয়। যা নিছক নতুন, যা সনাতন নয়, তাকে তার আয়ুষ্কালটুকু ভোগ করতে দিতে হবে। হয়তো পাঁচ দশ বছর তার পরমায়ু। তারপরে সে বুদ্বুদের মতো মিলিয়ে যাবে। কিন্তু যেটুকু সময় সে আছে সেটুকুর উপর তার অধিকার আছে। একালে অজস্র নভেল লেখা হচ্ছে, কবিতা ও ছোট গল্প লেখা হচ্ছে। হোক। যার যে ক'দিন আয়ু তাকে সে ক'দিন ভোগ করতে দাও। আর কিছু না হোক নতুন মূল্যের প্রতিষ্ঠা হচ্ছে। সেটারও দরকার। নতুনের উপর স্নেহদৃষ্টি চাই, যেমন নবজাতকের উপর। আমরা কংসরাজা নই যে, নতুন দেখলেই কোতল করব।

নতুনের মধ্যে যদি সনাতন কিছু থাকে তবে তা অমর। কেউ তাকে ধ্বংস করতে পারে না। নতুনের সাজ পরে যে এসেছে সে কি চিরন্তন না সে নিতান্তই ইদানীন্তন? আমাদের আজকের দিনের সাহিত্য কি পঞ্চাশ বছর পরে, একশো বছর পরে এমনি আনন্দ দিতে থাকবে, যেমন দিচ্ছে আজ? না তার শুধু একটা ঐতিহাসিক মূল্য থাকবে গবেষকদের চক্ষে? যা চিরন্তন তার কাছে এক আধ শতাব্দী কিছু নয়। তা হাজার বছর পেরিয়ে যায়, দু' হাজার ছাড়িয়ে যায়। তার মূল্য সেইজন্যে সনাতন।

চিরন্তন মূল্য

কিন্তু চিরন্তন মূল্য বলে কিছু আছে কি? আধুনিকরা ক্রমে এর উপর বিশ্বাস হারাচ্ছে। বাইরের সংকটের চেয়েও আভ্যন্তরিক এই সংকট তাদের পক্ষে অনিষ্টকর। মানুষের বড় বড় শত্রুগুলো তার নিজের ভিতরে। বাইরে ঝড় গর্জে গেলেও নৌকা ভেসে থাকতে পারে, কিন্তু ভিতরে ছিদ্র থাকলে ঝড়ের দরকার করে না, নিস্তরঙ্গ সলিলই তার সমাধি রচনা করে।

মানুষ যদি নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়, পৃথিবী যদি ধ্বংস হয়, বিশ্ব যদি শূন্যে মিলিয়ে যায়, তা হলেও কিছু থাকবে। তা এই দৃশ্যমান জগতের অন্তরালে নিহিত, অন্তরে স্থিত রিয়ালিটি। সেই রিয়ালিটি যখন সাহিত্যের অন্তরালে নিহিত হয়, অন্তরে স্থিতি পায়, তখন সাহিত্যও কাল পারাবার পার হয়ে যায়।

যা আজ আছে কাল নেই তা সত্য। কিন্তু যা আজ আছে কালও আছে পরশুও আছে, এক হাজার বছর পরেও আছে, এক লাখ বছর পরেও আছে, তার সত্যতা উপলব্ধি করতে হবে। এর জন্যে চাই আর এক জোড়া চোখ— অন্তর্দৃষ্টি। দর্শনের মতো সাহিত্যেও appearance বনাম reality-র প্রশ্ন

আছে। চোখ যদি appearance-এ ধাঁধিয়ে যায়, তা হলে চিরন্তনকে কোনো দিনই আবিষ্কার করবে না। সাহিত্যের আবিষ্কার বিজ্ঞানের আবিষ্কারের মতো নয়। সাহিত্যের দৃষ্টি মর্মভেদী। সাহিত্য চলে যায় গভীর থেকে গভীরতরে, সেখান থেকে গভীরতমে। সেখানে রয়েছে অন্তঃসার। সে অন্তঃসার কেবল সত্য নয়, তা সুন্দর। যা সত্য, যা সুন্দর তা কি শিব না হয়ে পারে? কিন্তু সংসারের বিবেচনায় তা হয়তো শিব নয়। সংস্কারবন্ধ চশমায় তা হয়তো সুন্দর নয়। দূরবীক্ষণ বা অনুবীক্ষণ দিয়ে দেখলে তা হয়তো সত্য নয়।

একালের লোকের দোষ হচ্ছে এরা বিজ্ঞানের পদ্ধতি সাহিত্যেও খাটাতে চায়। দর্শনেও খাটাতে চায়। ঐ একই চাবি দিয়ে এরা সব কটা তালা খুলবে। তা হয় না। বাউলরা বলে, 'কমল বনে কে আসিল সোনার জহুরী নিকষে ঘষয়ে কমল আ মরি আ মরি।" সোনার বেলায় নিকষ আবশ্যক, কমলের বেলায় অনাবশ্যক। সাহিত্যের পদ্ধতি যে বহির্দৃষ্টিকে বাদ দেয় তা নয়, কিন্তু এখানে অন্তর্দৃষ্টির প্রাধান্য। অন্তর্দৃষ্টি না থাকলে ধরা পড়ে না যে ঘটনার তলে তলে নিয়তির অন্তঃস্রোত প্রবাহিত হচ্ছে। নিয়তি সম্বন্ধে অবহিত না হলে রামায়ণ মহাভারত লেখা যেত না, ইলিয়ড অডিসি লেখা যেত না, গ্রীক ট্র্যাজেডী লেখা যেত না। নিয়তি যাকে বলছি তা অন্ধ খামখেয়াল নয়। সেখানে একটা কোনো নৈতিক নিয়ম কাজ করছে। একটা moral law।

তেমনি ইনটুইশন না থাকলে ভগবানের লীলা প্রত্যক্ষ করা যায় না। সেটাও অন্ধ খামখেয়াল নয়। সেখানেও কাজ করছে একটা কোনো নিয়ম। কিন্তু নিয়ম কথাটা সে ক্ষেত্রে অপ্রযোজ্য। নীতির পরিভাষায় পরম রহস্যকে তর্জমা করা যায় না। সাহিত্য চেষ্টা করে অন্য ভাবে বোঝাতে। সাহিত্যে মরমিয়া ভাবের, mysticism-এর স্থান আছে। সেও রিয়ালিটির মর্মোদ্ঘাটন। কেউ যদি মনে করে ওটা পলায়নীবৃত্তি তবে ভুল করে। বাহির থেকে ভিতরে যাওয়া পলায়ন নয়।

নীতির জগৎ

চিরন্তন মূল্য নির্ণয় করতে একালের সাহিত্যিকদের প্রাণে ব্যাকুলতা জেগেছে। পলায়নে সুখ নেই। অবশ্য পলায়ন যে কেউ করছে না, তা নয়। অনেকেই করছে। ঝুটা আধ্যাত্মিকতা, ঝুটা mysticism অনেকেরই পলায়নের পথ।

সঙ্কট শুরু হবার আগেই বিজ্ঞান এসে তার পদ্ধতিকেই একমাত্র পদ্ধতি বলে জাহির করেছিল। বিজ্ঞানের সাফল্য দেখে সাহিত্যিকরাও স্থির থাকতে পারেনি। এখন ধীরে ধীরে স্থিতি ফিরিয়ে আনতে হবে। রীতি বদলে দিতে হবে। চিরন্তনকে নতুন করে আবিষ্কার করতে হবে। তেমনি আর একটি বিষয় একালের সাহিত্যিকদের উম্মনা করেছে। Moral law কি কোথাও কাজ করছে না? সর্বত্র নিষ্ক্রিয়? Moral law বলতে আগেকার দিনে বোঝাত ধর্মশাসিত Moral code—একরাশ বিধিনিষেধ। 'Thou shalt' আর 'Thou shalt

not'। কেন 'shalt' আর কেন 'shalt not' তার তাৎপর্য কেউ বোঝাতে পারে না। বুঝলে তো বোঝাবে ? কেউ বা তা মেনে চলছে ! ভণ্ডের দল !

কিন্তু সে রকম একটা moral code নাই বা হলো, বিশ্বের অস্তিত্বের পশ্চাতে কি কোনোরূপ moral law নেই ? এটা কি শুধু একটা physical universe ? এ কি moral universe নয় ? এখানেও বিজ্ঞান মানুষের মাথা খেয়েছে। যা প্রত্যক্ষ নয় তার অস্তিত্ব নেই। তুমি যদি অস্তিত্ব কল্পনা করো তুমি সেকেলে সেকেলে হতে আমাদের ঘোর আপত্তি। আবার কি আমরা নীতি-ধার্মিকদের 'Thou shalt' আব 'Thou shalt not'-এর খপ্পরে পড়ব ? না, অন্ধ আনুগত্যে আমাদের অরুচি ধরে গেছে।

মানুষকে একদিন বিশ্ববিধানের অন্তর্নিহিত moral law আবিষ্কার করতে হবে। যা প্রত্যক্ষ নয় তা নেই—এটা কুযুক্তি। আছে, আছে অপ্রত্যক্ষ নীতির জগৎ। তাকে আবিষ্কার করে তাতে বিশ্বাস স্থাপন করতে হবে। সব মানুষকে। সাহিত্যিককেও। তারপর সাহিত্যিকরা দেখবে আর দেখাবে তার ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া, তার ঘাত প্রতিঘাত। তা না হলে মহাকাব্য হবে না, নাটক হবে না, উপন্যাস হবে না, সেসবের সম্ভাবনা ফুরিয়ে আসছে। ক্রমশ তা দ্বিতীয় শ্রেণীতে নামবে, তারপর তৃতীয় শ্রেণীতে, তারপর এত নিচে নেমে যাবে যে, তাকে আর সাহিত্য বলা চলবে না। তার বাংলা নাম বটতলা। যদিও তা ইংরেজী বা ফরাসী ভাষায় লেখা। অথবা রাশিয়ান।

তা বলে কিছুই হবে না তা নয়। হবে, ছোট গল্প হবে, ছোট কবিতা হবে, রম্য রচনা হবে। এসবের সম্ভাবনা অফুরন্ত। আমরা কি তা হলে এই নিয়ে তৃপ্ত থাকব ? না। নাল্পে সুখমস্তি। আমরা মহাকাব্য লিখব, নাটক লিখব, উপন্যাস লিখব উচ্চতম কোটির। তার জন্যে সর্বতোভাবে প্রস্তুত হব। সেই প্রস্তুতির অঙ্গ নীতির জগৎ সম্বন্ধে নিশ্চিতি। নীতির জগৎ প্রকৃতিরই মতো সত্য। নীতিবোধ না থাকলে মানুষ মানুষই থাকবে না, তা হলে কাকে নিয়ে সাহিত্য হবে ! সাহিত্য কি homo sapiens নামক প্রাণী-বিশেষের বর্ণনা ? এক প্রকার প্রাণীতত্ত্ব ?

সাহিত্যের বর্তমান অবস্থা

পৃথিবীতে মানুষের সংখ্যা বাড়ছে, সেইসঙ্গে শিক্ষিত লোকের সংখ্যা বাড়ছে, সেইসঙ্গে পাঠযোগ্য পুস্তকের সংখ্যা বাড়ছে। এ দিক দিয়ে আমরা বাড়তির পথে চলেছি। যুদ্ধ এসে মাঝে মাঝে কমতি ঘটালেও মোটের উপর কমতি ঘটছে না, যেটুকু ঘটছে সেটুকু সাময়িক। এই মুহূর্তে কমতির লক্ষণ নেই, যদি বা থাকে কাগজ পাওয়া গেলে ছাপবার খরচ পোষালে কেনার সঙ্গতি জুটলে আর থাকবে না। যদি না আবার যুদ্ধ বাধে।

বাড়তির পথেই আমরা চলেছি, বোধ হয় চলতে থাকব। কিন্তু এই যে বাড়তি এটা সংখ্যা বা পরিমাণগত। কেউ যদি বলে মানুষের সত্যের উপলব্ধি

বেড়ে গেছে তা হলে কথাটা হয়তো দর্শনবিজ্ঞানের বেলায় অপ্রযুক্ত হবে না, কিন্তু সাহিত্যের বেলায় বুকে হাত রেখে বলা দুরূহ হবে। সত্যের উপলব্ধি যদি বেড়ে গিয়ে থাকে, তবে তা এখনো অপ্রকাশিত বা অলিখিত।

তেমনি কেউ যদি বলে মানুষের সৌন্দর্যের উপলব্ধি বেড়ে গেছে তা হলে কথাটা হয়তো চিত্রকলা বা সঙ্গীতের বেলায় সুপ্রতিষ্ঠিত, কিন্তু সাহিত্যের বেলায় সংশয়ান্বিত। তেমনি কেউ যদি বলে মানুষের কল্যাণের উপলব্ধি বেড়ে গেছে তা হলে কথাটা হয়তো আইন বা কনস্টিটিউশনের ক্ষেত্রে সুস্পষ্ট, কিন্তু সাহিত্যক্ষেত্রে অপরিস্ফুট।

যুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ, দাঙ্গাহাঙ্গামা, দেশ-বিভাগ ইত্যাদি বিরাট বিরাট ঘটনা আমাদের জীবনে ঘটেছে। আমরা তা নিয়ে বিরাট সাহিত্য সৃষ্টি করিনি। করেছি বিরাট জটলা ও খুঁতখুঁত ও হায় হায়। সাহিত্যের উপাদান হিমালয়ের মতো স্তূপাকার। আমরা তা দিয়ে খবরের কাগজ ভরেছি, আর খবরের কাগজকে ভাঁজ করে বই বলে চালিয়েছি। যা লিখেছি তাকে সম্পাদকীয় মন্তব্য বা বিশেষ প্রতিনিধিদের রিপোর্ট বললে হয়তো খুব বেশী অবিচার হবে। আচ্ছা, তাহলে বলা যাক ডকুমেন্টারি সাহিত্য। যেমন ডকুমেন্টারি ফিল্ম। কেমন? অন্যায় হবে?

অনেক সময় ডকুমেন্টারি ফিল্ম দেখবার মতো, মনে রাখবার মতো হয়। আমরা যা লিখছি তাও পড়বার মতো, মনে রাখবার মতো হতে পারে। কিন্তু সাহিত্য হলো আর্ট, আর আর্ট হলো সৃষ্টি, আর সৃষ্টি হলো উপাদানের রূপান্তর। রস আর আলো দিয়ে রূপান্তর। যা রূপান্তরিত হয়নি তার মূল্য নেই তা নয়, কিন্তু তা যেন অর্ধপক্ক অন্ন বা লবণহীন ব্যঞ্জন। পুষ্টিকর নিশ্চয়, কিন্তু গিলে খেতে হয়। চেখে চেখে তারিয়ে তারিয়ে খাওয়া যায় না। পাঁচশো পৃষ্ঠার একখানা উপন্যাস গোগ্রাসে গিলে পাঁচ ঘণ্টায় শেষ করো, তারপর ভুলে যাও লেখকের নাম, গ্রন্থের নাম, নায়ক-নায়িকার নাম, কাহিনীটাও।

দু' দণ্ড চেয়ে দেখবার মতো সুন্দর লেখা কোথায়? কোথায় সেই সব নায়ক-নায়িকা যাদের ভুলে যাওয়া অসম্ভব? অবিস্মরণীয় চরিত্রের, ঘটনার, বর্ণনার, বাক্যের, ছন্দের, ধ্বনির সংখ্যা বেশী নয়। এ দিক দিয়ে আমরা কমতির পথে চলেছি।

পতন অভ্যুদয় বন্ধুর পন্থা। সুতরাং শোক করবার কিছু নেই। মানুষের ইতিহাসে এক একটা যুগ গেছে যখন সভ্যতার বাতি নিবে গেছে, নিবিয়ে দিয়েছে যুদ্ধবিগ্রহ, বর্বরতা, বিকৃত রুচি। আমাদের এ যুগে বাতি এখনো নিবে যায়নি, আশা করি, যাবে না। ঝড়-ঝাপটায় আঁচল ঢাকা দিয়ে প্রদীপ জ্বালিয়ে রাখতে হবে, একটি হলেও ক্ষতি নেই, একটির থেকে এক সহস্রটি জ্বলবে। আপাতত এই আমাদের ব্রত।

সাহিত্যিকের কাছে প্রত্যাশা

একজন পাঠক আছে তাহার নাম ultimate reader বা অন্তিম পাঠক। সে আমার কাছে কী প্রত্যাশা করে?

সে প্রত্যাশা করে আমার সত্য। এর কম সে নেবে না। সে চায় আমার আপন উপলব্ধি যা আমি অনেক কষ্টে পেয়েছি। কিংবা অনেক ভাগ্যে। এ সত্য আমি কাউকে না দিয়ে সঙ্গে করে নিয়ে যেতে পারিনে। যাকে দিয়ে যেতে চাই সে নেবে কেন যদি কোথাও এতটুকু ফাঁকি থাকে? আর যাকে ঠকাতে পারি ঠকাব, কিন্তু অন্তিম পাঠককে ঠকাতে গেলে ঠকব। সে ধরে ফেলবে একদিন। সেইজন্যে আমার উচিত খাঁটি সত্যটুকু দেওয়া। সত্য এখানে তথ্য নয়। তথ্যের এদিক ওদিক হলে কিছু আসে যায় না। সাহিত্য ইতিহাস নয়। বিজ্ঞান নয়। সাহিত্য হলো রূপান্তর। সুতরাং এখানে সত্য হলো তথ্যের রূপান্তর।

বলেছি সে এর কম নেবে না। কিন্তু এই নিয়েই কি সে তৃপ্ত হবে? সে চায় এর বেশী। সে প্রত্যাশা করে আমার রূপ। সে তো আমাকে চোখে দেখতে পায় না, অথচ আমাকে দেখতে তার সাধ। কী করে দেখবে যদি আমি না দেখাই? কী করে দেখাব যদি সমস্ত সত্তা দিয়ে না লিখি? রূপ এখানে কায়িক রূপ নয়, মানসিক ও বাচনিক রূপ। তাই সব নয়। অনির্বচনীয় রূপ। একশো বছর পরে আমি থাকব না, আমার রূপ থাকবে। পাঁচ হাজার মাইল দূরে আমি যেতে পারব না, আমার রূপ যাবে। এ রূপ ফোটোতে ধরা যায় না। ফোটো থাকলেও এ রূপ থাকবে না, কিন্তু সাহিত্য থাকলে এ রূপ থাকবে। আর সত্য থাকলে সাহিত্য থাকবে।

সত্য পেয়ে, রূপ পেয়ে কি তার প্রত্যাশা পূরল—অন্তিম পাঠকের? না। সে আরো কিছু চায়। সে চায় সৌন্দর্য। সত্যের সঙ্গে বা সত্যের মধ্যে যদি সৌন্দর্য না থাকে তা হলে পাঠকের আনন্দ অপূর্ণ থাকে। রূপের সঙ্গে বা রূপের মধ্যে যদি সৌন্দর্য না থাকে তা হলে পাঠকের সুপরিতৃপ্তি হয় না।

এই কি সব? না। এই সব নয়। অন্তিম পাঠকের অন্তিম প্রত্যাশা এর পরেও থাকে। সে চায় সাহিত্যের 'হওয়া'। আমার কবিতাটি হয়েছে কি না। গল্পটি হয়েছে কি না। যখন সে বলে, হয়েছে, তখন আমি জানি, হয়েছে। যখন সে বলে, হয়নি, তখন আমি জানি, হয়নি। এই যে হয়েছে বা হয়নি এর উপর আপীল নেই। কেন হয়েছে, কেন হয়নি, এই কেন আমার কাছে প্রহেলিকা। 'হওয়া'টাই সৃষ্টির শেষ রহস্য। যেমন বিশ্বসৃষ্টির তেমনি শিল্পসৃষ্টির। এ রহস্য ভেদ করা আমার সাধ্য নয়।

উপরে যে ultimate reader বা অন্তিম পাঠকের কথা বলা হলো তাকে আমি দেখতে পাইনে, দেখলেও চিনতে পারিনে। যাকে নিয়ে আমার কারবার তার নাম immediate reader বা অব্যবহিত পাঠক। সে আমার ঘরের লোক, আমার বন্ধু, আমার প্রকাশক, আমার সম্পাদক, আমার দেশের পুলিস, আমার দেশের সমাজ, আমার দেশের জনগণ। এদের প্রত্যাশার তালিকাটি ছোট নয়।

এদের ফরমাশ শুনতে শুনতে কান ঝালাপালা। এদের খুশি করতে না পারি ক্ষুণ্ন করতে পারিনে। ক্ষুণ্ন যদি বা করি নেহাত অনিচ্ছাসত্ত্বে করি। কিন্তু এদের প্রত্যাশা পূরণ করতে গিয়ে যেন চূড়ান্ত পাঠকের অস্তিত্ব ভুলে না যাই। তেত্রিশ কোটি দেবতাকে প্রণাম করতে করতে একমাত্র দেবতার অস্তিত্ব ভুলে যাওয়ার মতো। ভুলে গেলে লক্ষ্যভ্রষ্ট হই।

সে অতি দুর্লভ লেখক যে অব্যবহিত ও অন্তিম উভয়ের প্রত্যাশা পূরণ করে উভয়ের স্বীকৃতি পায়। অধিকাংশই অব্যবহিত নিয়ে ব্যাপৃত। অল্পাংশ অব্যবহিত ছেড়ে অন্তিম নিয়ে নিবিষ্ট। ক্বচিৎ এক আধ জনকে দেখা যায় যাদের এক চোখ অব্যবহিতের দিকে আরেক চোখ অন্তিমের উপরে।

সাহিত্যিকের দায়িত্ব

এতক্ষণ পাঠকের প্রত্যাশার কথা বলা হলো। প্রকৃতিরও কি কিছু প্রত্যাশা নেই? এই যে পৃথিবীতে এত সৌন্দর্য আছে, কে এসব দেখবে, আমি যদি না দেখি? কে দেখাবে আমি যদি না দেখাই? এত প্রেম আছে, কে অনুভব করবে আমি যদি না করি? কে অনুভব করাবে আমি যদি না করাই? এত মাধুরী আছে, কে আস্বাদন করবে আমি যদি না করি? কে আস্বাদন করাবে আমি যদি না করাই? এত আনন্দ আছে, কে উপলব্ধি করবে আমি যদি না করি? কে উপলব্ধি করাবে আমি যদি না করাই?

আর বাড়িয়ে কী হবে? আছে প্রকৃতিরও প্রত্যাশা। তেমনি ইতিহাসের বা নিয়তির। কী একটা অমোঘ নিয়ম কাজ করে যাচ্ছে চুপি চুপি তলে তলে। পাঁচ দশ বছর তার কাছে কিছু নয়। শতাব্দীও সামান্য কাল। মানুষ এই নিয়ম মানতেও পারে, না মানতেও পারে, মানা না মানার স্বাধীনতা তাকে দেওয়া হয়েছে। দেওয়া হয়েছে বলেই তো ট্র্যাজেডী বা তামাশা। অথচ কীই বা তার স্বাধীনতা, কতটুকুই বা স্বাধীনতা! কিন্তু যে কাণ্ডটা ঘটছে মানুষের জীবনে কেই বা সেটা লক্ষ্য করবে আমি যদি না করি? কেই বা লক্ষ্য করাবে আমি যদি না করাই।

তেমনি আছে ঈশ্বরেরও প্রত্যাশা। ঈশ্বর না বলে বিধাতা, বিধাতা না বলে স্রষ্টা, স্রষ্টা না বলে আদি কারণ, যে নামেই ডাকো না কেন গোলাপ তেমনি সুগন্ধ দেয়। তর্কবুদ্ধি উড়িয়ে দিতে পারে, কিন্তু জীবনে অন্তত একটিবার যার অন্তর উদ্ভাসিত হয়েছে সে তো পারে না উড়িয়ে দিতে। আর যে নিত্য ভালোবাসা পাচ্ছে সে কি জানে না এ প্রেম কোন উৎস থেকে উৎসারিত হচ্ছে? হাঁ, ঈশ্বরেরও প্রত্যাশা আছে। তাঁর লীলা কে চাক্ষুষ করবে আমি যদি ধ্যান-নেত্রে চাক্ষুষ না করি? কে চাক্ষুষ করাবে আমি যদি না করাই?

থাক। যথেষ্ট হয়েছে। যা বলতে চাই তা এই যে লেখকের কাছে প্রত্যাশা কেবল পাঠকের নয়, প্রকৃতির, ইতিহাসের বা নিয়তির, ঈশ্বরের বা অন্তরাত্মার। সব ছাপিয়ে তার নিজেরও একটা প্রত্যাশা রয়েছে। কানে কানে বলছি—

অমরত্বের। এসব প্রত্যাশার দ্বারাই লেখকের দায়িত্বের পরিমাপ হয়। যার কাছে প্রত্যাশা যত বৃহৎ তার দায়িত্ব তত বৃহৎ। সে ঐ দায়িত্বের যোগ্য কি না সে কথা স্বতন্ত্র। কিন্তু আছে একটা দায়িত্ব। সেটা প্রত্যাশার দ্বারা নির্ণয় করতে হয়। যার কাছে কারুর কোনো প্রত্যাশা নেই তার দায়িত্ব বলতে কিছু নেই। সে দায়িত্বহীনভাবে যা খুশি লিখে যেতে পারে, যতক্ষণ না দেশের আইন বা জনমত বাধা দেয়। বাধা দেওয়া উচিত কিনা সে কথাও স্বতন্ত্র। কিন্তু দায়িত্বহীনের পক্ষ সমর্থন করবে এমন দায়িত্বহীনই বা ক'জন আছে ?

লেখক খোঁজ রাখবে তার কাছে কার কী প্রত্যাশা, তার নিজেরই বা প্রত্যাশা কীরূপ। অল্প বয়সে প্রত্যাশাবোধ থাকে না, যা লিখতে ইচ্ছা করে তাই লেখা যায়। লেখক তখন নতুন একটা শক্তি আবিষ্কার করেছে। লিখনশক্তি। আমার ছোট মেয়ের ছড়া বানানোর মতো। মুখে মুখে বানিয়ে যায় কিছু না ভেবে-চিন্তে। একটা না একটা উতরে যায়। ধীরে ধীরে প্রত্যাশাবোধ জাগবে। তখন আসবে দায়িত্ববোধ। তবে সেই দায়িত্ববোধ যেন স্বতঃস্ফূর্তি হরণ না করে। সব সময় দায়িত্ব সচেতন হলে লিখতে সাহস হয় না। লেখা আপনি বন্ধ হয়ে যায়। কেউ যে বাধা দেয় তা নয়। অবাধ স্বাধীনতা পেয়েও লেখক সৃষ্টি করতে পারে না, কারণ তার দায়িত্ব সচেতনতা তার স্বতঃস্ফূর্তিকে আড়ষ্ট করে। তার চেয়ে বরং দায়িত্বহীন হওয়া ভালো। তবু তো দু'চারটে লেখা উতরে যায়।

সঙ্কটকালের দায়িত্ব

আমার বন্ধুকে আমি কলম ধরাতে পারছিনে। ছ'মাস বা ন'মাস অন্তর তাকে তাগিদ দিই। প্রত্যেক বারই একটা না একটা অজুহাত। লিখব যে লেখার ভাষা কী রকম হবে, শৈলী কেমনতর হবে ? আঙ্গিকের প্রশ্ন আছে। হাঁ, এগুলোও লেখকের দায়িত্বের মধ্যে পড়ে। যার দায়িত্ববোধ আছে সে যেমন তেমন করে লেখে না। কেমন করে লিখব এ জিজ্ঞাসা তাকে অহরহ জ্বালায়। কিছুকাল থেকে আমাকেও জ্বালাচ্ছে। একখানা বই আরেকখানা বইয়ের মতো হবে না, এটা আমার কাছে স্বতঃসিদ্ধ। অন্যের কাছে নয়। এই স্বতঃসিদ্ধ আমাকে দু'লাইন লিখতে দেয় না। লিখলেই আমার ঘরোয়া আইনে বাধে, আমার ব্যক্তিগত জনমত বিরূপ হয়। আমার এই গৃহযুদ্ধ বা জনযুদ্ধ আমার কাছে একান্ত সীরিয়াস। অন্যের কাছে হাস্যকর। কেন লিখিনে, কেন এত কম লিখি, কাকে বোঝাব, কেই বা বুঝবে! কিন্তু এটাও দায়িত্বের অন্তর্গত। দায়িত্বহীন হলে এসব প্রশ্ন উঠতেই দেওয়া যেত না। উত্তর দেওয়া তো দূরের কথা।

লেখকের দায়িত্ব নানা দিক থেকে অতি গুরুতর ব্যাপার। দু'হাজার বছর আগেও এ রকম ছিল। দু'হাজার বছর পরেও এ রকম থাকবে। এটা সর্বকালীন দায়িত্ব। কিন্তু এ ছাড়া আর একটি দায়িত্ব থাকতে পারে। সেটা সঙ্কটকালীন দায়িত্ব। সে যে দেশে বাস করছে, যে জগতে বাস করছে, যে যুগে বাস করছে

তাদের যদি কোনো বিশেষ প্রত্যাশা থাকে তবে সেই বিশেষ প্রত্যাশা থেকে ওঠে বিশেষ দায়িত্বের প্রশ্ন। কিন্তু বিশেষ দায়িত্ব যদি সমস্ত মনোযোগ কেড়ে নেয়, যদি সাধারণ দায়িত্বের জন্যে লেশমাত্র স্থান ছেড়ে না দেয় তা হলে সংকটকালীন দায়িত্বের সঙ্গে সর্বকালীন দায়িত্বের বিরোধ বাধে। তাতে যদি সর্বকালীন দায়িত্বের হার হয় তা হলে লেখকের পক্ষে তার চেয়ে বড় পরাজয় আর নেই। পরাজয়বোধ একদিন তীব্র অনুশোচনা আনে। কিন্তু হারিয়ে ফেলার সুযোগ দ্বিতীয়বার আসে না।

সংকটকাল দু'চার বছর স্থায়ী হলে তবু কথা ছিল। কিন্তু যেখানে সংকটের শেষ দেখা যায় না, যেখানে সংকটের স্থায়িত্ব অনির্দিষ্ট কাল, হয়তো পঞ্চাশ বছর, সেখানে লেখক কার প্রত্যাশা পূরণ করবে? সংকটকালের প্রত্যাশা না সর্বকালের প্রত্যাশা? কার প্রতি তার প্রথম দায়িত্ব? সংকটকালের প্রতি না সর্বকালের প্রতি?

লেখকের হয়েছে উভয়সংকট। সে কি শ্যাম রাখবে না কুল রাখবে? শ্যাম রাখলে কুল থাকে না। সংকটকালের জন্যে লিখলে সর্বকালের জন্যে সৃষ্টি করা হয় না, সর্বকালের জন্যে সৃষ্টি করলে সংকটকালের জন্যে লেখনী চালনা হয় না। দৈবাৎ এক আধ জন হয়তো শ্যামও রাখে কুলও রাখে, এক হাতে লেখে সংকটকালের জন্যে আরেক হাতে সর্বকালের জন্যে। একই রচনা হয়তো উভয় কালের জন্যে। কিন্তু এই এক আধ জন তো সাধারণ লেখক নয়। সাধারণ লেখকের দায়িত্ব নির্দেশ করতে হলে নির্দেশনামাটা কী রকম হলে ভালো হয় বলছি।—তুমি যদি সর্বকালের জন্যে লিখতে চাও তবে সংকটকালের জন্যে না লিখলেও চলে। তেমন কোনো দায়িত্বভার তোমার স্কন্ধে চাপবে না। পক্ষান্তরে তুমি যদি সংকটকালের জন্যে লিখতে চাও তবে সর্বকালের জন্যে লেখার আশা ছেড়ে দাও। সে দায়িত্ব তোমার উপর নেই।

নির্বন্ধটা লেখকদের নিজেদের হলে কারুর কোনো ক্ষোভ থাকে না। কিন্তু প্রজাপতির নির্বন্ধের মতো প্রজাপুঞ্জের পতির নির্বন্ধ লেখকদের স্বয়ংবরের অধিকার অস্বীকার করছে বা খর্ব করছে। এ এক নতুন উপদ্রব। আগেকার দিনে ছিল নিষেধ। এটা লিখতে নেই, ওটা লিখতে নেই, লিখলে বই বাজেয়াপ্ত হবে, লেখকের সাজা হবে। এখনকার দিনে এসেছে বিধি। এটা লিখতে হবে, ওটা লিখতে হবে, না লিখলে কর্তারা বিরক্ত বা বিরূপ হবেন। হয়তো রুটি মারা যাবে। নয়তো এমন কোনো কাজে লাগিয়ে দেওয়া হবে যাতে লেখকের দফা রফা। কিংবা বই লেখা হলেও ছাপতে দেওয়া হবে না, যতক্ষণ না কর্তার ইচ্ছায় কর্ম হচ্ছে।

বাক্ স্বাধীনতা

ইংরেজী ও ফরাসী সাহিত্যের অসাধারণ উন্নতির মূলে রয়েছে বাক্ স্বাধীনতা। এর জন্যে তারা চির দিন সজাগ। স্বাধীনতার মূল্য চির সজাগ থাকা।

আর সব কিছু আছে, বাক্ স্বাধীনতা নেই, এমন যদি হতো তা হলে আর সব কিছু কোনো কাজে লাগত না, কেউ কাজে লাগাতে সাহস পেত না, কেউ লিখত না, কেউ ছাপত না, কেউ কিনত না, কেউ পড়ত না। মাটির তলায় লুকিয়ে থেকে আর যাই হোক সাহিত্যসৃষ্টি হয় না। হলে সেটা ব্যতিক্রম। বরং কারাগারে থেকে সাহিত্যসৃষ্টি হয়।

আবহমান কাল ইংরেজরা ফরাসীরা বাক্ স্বাধীনতার জন্যে আন্দোলন চালিয়ে এসেছে। ত্যাগ স্বীকার করেছে। আমেরিকায় তো প্রথম থেকেই এ অধিকার স্বীকৃত হয়েছে। যখনি এ অধিকার বিপন্ন হয়েছে তখনি সাহিত্যিকরা নিজেদের বাদ-বিসম্বাদ ভুলে একসঙ্গে আন্দোলন করেছে। "তোমার সঙ্গে আমার মত একটুও মেলে না, তা হলেও তোমার মত প্রকাশের স্বাধীনতার জন্যে আমিও প্রাণপণ লড়াই করব।"

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের একটা ইস্যু ছিল বাক্ স্বাধীনতা। তৃতীয় মহাযুদ্ধের ইস্যু তৈরি করার সময় বাক্ স্বাধীনতার উপর জোর দেওয়া হচ্ছে।

স্বাধীনতা যে কেবল লেখকের পক্ষেই জীবনমরণের প্রশ্ন তাই নয়, পাঠকের পক্ষেও তাই। লেখকের থাকবে বলবার স্বাধীনতা, লেখবার স্বাধীনতা, পাঠকের থাকবে শোনবার স্বাধীনতা, পড়বার স্বাধীনতা। পাঠককে যদি হুকুম করা হয়, তুমি এই এই কথা শুনবে, এই এই কথা শুনবে না, এই এই লেখা পড়বে, এই এই লেখা পড়বে না, তা হলে ধরে নেওয়া হয় যে পাঠক স্বাধীন নয়, সাবালক নয়। লেখক যা লিখতে চায় তাকে তা লিখতে না দেওয়ার অর্থ পাঠক যা পড়তে চায় তাকে তা পড়তে না দেওয়া। লেখক যা লিখতে চায় না তাকে তা লিখতে বাধ্য করার অর্থ পাঠক যা পড়তে চায় না তাকে তা পড়তে বাধ্য করা। বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন রাষ্ট্র লেখকের উপর জোরজুলুম করেছে, সেটা প্রকারান্তরে পাঠকের উপর জোরজুলুম, আখেরে সাহিত্যের উপর জোরজুলুম। শুধু যে রাষ্ট্র এ কাজ করেছে তা নয়, ধর্মসঙ্ঘও করেছে। মানুষকে জ্যান্ত পুড়িয়েছে, সাহিত্যকে ভস্মসাৎ করেছে। যেখানে আইন বা ধর্ম বাধা দিতে পারছে না সেখানে রক্ষণশীলরা নানাভাবে বাধা দিয়েছে, প্রকাশকের উপর চাপ দিয়েছে, বিক্রেতার উপর চাপ দিয়েছে, ক্রেতার উপর চাপ দিয়েছে।

তবে কোনো কালেই রাষ্ট্র বা সঙ্ঘ বা রক্ষণশীল সমাজ লেখকদের দিয়ে তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে বই কাগজ লেখাতে পারেনি, এ কালে যেমন লেখাচ্ছে। "Thou shalt not" যথেষ্ট খারাপ। তার চাইতেও খারাপ "Thou shalt"। রুজি বা চাকরি যাবার ভয়ে কত সাংবাদিক প্রত্যহ এই দুই অনুশাসন মানতে বাধ্য হচ্ছেন। যা বিশ্বাস করেন তা লিখতে পারছেন না, যা বিশ্বাস করেন না তাই লিখছেন। ইংলণ্ডে আমেরিকায় ভারতবর্ষে যখন এই চলেছে তখন রুশ দেশে বা চীন দেশে চলবে এতে আশ্চর্যের কী আছে!

'মা ব্রূয়াৎ সত্যমপ্রিয়ম্' একপ্রকার গা-সওয়া হয়ে গেছে। কিন্তু এই 'অনৃতং ব্রূয়াৎ' এখনো সহ্য হয় না। সইতে সইতে এটাও সয়ে যাবে। কিন্তু সওয়াটা কি ভালো? পাঠকের সঙ্গে সত্যরক্ষার দায় নেই কি?

বাক্যের ব্যবহার অপব্যবহার অব্যবহার

পাঠকের সঙ্গে সত্যরক্ষা করতে হবে। সাংবাদিকরা এটা বিস্মৃত হতে পারেন, প্রচারকরা এটা ভুলে যেতে পারেন, কিন্তু সাহিত্যিকদের মনে রাখতে হবে, কারণ সাহিত্যিকদের কারবার দু'দিনের পাঠকের সঙ্গে নয়, নিত্যকালের পাঠকের সঙ্গে। এক দেশের বা এক শ্রেণীর পাঠকের সঙ্গে নয়, সব দেশের ও সব শ্রেণীর পাঠকের সঙ্গে।

জেনেশুনে মিথ্যা বললে বা সত্য গোপন করলে এক দিন না এক দিন এক দেশে না এক দেশে তা ধরা পড়বেই। সাহিত্যিক নিজের হাতে নিজের কলম দিয়ে যে দলিলটি বানিয়ে রেখে যাচ্ছেন সেটি যদি জাল দলিল বা ঝুটা দলিল হয় তবে তো তিনি নিজের হাতে নিজের বিরুদ্ধে প্রমাণ তৈরি করে রেখে যাচ্ছেন।

সাংবাদিক বা প্রচারক ক্ষণজীবী। তিনি নিজেই জানেন তাঁর আয়ু ক্ষীণ। কিন্তু সাহিত্যিক হচ্ছেন চিরযুবা ও চিরজীবী। শতাব্দী তাঁর কাছে কিছু নয়। হাজার বছরও অল্পকাল। তাঁর নাম যখন লুপ্ত হয়ে যায় তাঁর বাক্য তখনো অক্ষয় থাকে।

এত বড় ভাগ্য যাঁর জন্য নির্দিষ্ট হয়েছে, এত বড় ক্ষমতা যাঁকে দেওয়া হয়েছে তিনি যদি সত্য রক্ষা না করেন তবে তিনিই বিড়ম্বিত হলেন। রাষ্ট্রের কী আসে যায়! অনুশাসকদের কী আসে যায়!

দুটি অলিখিত নিয়ম জগতের সর্বত্র কাজ করছে। যাকে ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে সে যদি ক্ষমতার অপব্যবহার করে তবে তার ক্ষমতা কেড়ে নেওয়া হয়। ভগবান কেড়ে নেন, প্রকৃতি কেড়ে নেয়। কেড়ে নেয় ইতিহাস, কেড়ে নেয় নিয়তি। যাকে ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে সে যদি ক্ষমতার ব্যবহার আদৌ না করে তা হলেও তার ক্ষমতা আপনি চলে যায়। যেমন হাত পা ব্যবহার না করলে হাত পা অসাড় হয়ে যায়, অব্যবহার্য হয়ে যায়।

অপব্যবহার ও অব্যবহার দুটোকেই এড়াতে হবে। যাকে যে ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে তাকে তার সদ্ব্যবহার করতে হবে। সদ্ব্যবহারটাই বিরল। সাধারণত যা দেখা যায় তা অব্যবহার বা অপব্যবহার। এ দুটোর মধ্যে যদি বেছে নিতে হয় তবে অব্যবহারই মন্দের ভালো। আমি বরং লেখা বন্ধ করে দেব, সাহিত্যের কাজ ছেড়ে দিয়ে আর কিছু করব তবু বাক্যের অপব্যবহার করব না, পাঠকের সঙ্গে সত্যভঙ্গ করব না।

আইনস্টাইন সেদিন বলেছেন আজকের জগতে বৈজ্ঞানিকদের দিয়ে যেসব কাজ করিয়ে নেওয়া হচ্ছে, তাঁদের সঙ্গে যে ব্যবহার করা হচ্ছে তা দেখে তাঁর মনে

হচ্ছে তিনি বৈজ্ঞানিক না হয়ে মিস্ত্রি হলে ভালো করতেন। আমিও অনেক সময় ভাবি যে লেখকের উপর জোরজুলুম মেনে নেওয়ার চেয়ে লেখা ছেড়ে দিয়ে গোরু চরানো ভালো। ধেনু চরানোর সঙ্গে সঙ্গে বেণু বাজানোও চলবে। বেণু শুনে কে জানে কোন গোপিনীর মন ভুলবে। আইনস্টাইন মিস্ত্রি হতে চান হতে পারেন, আমি কিন্তু মনে মনে ঠিক করে রেখেছি ব্রজের গোপবালক হব।

বাক্যের মূল্য

প্রচারভয়ে যখন পুঁথি পোড়ানো বা পুঁথি বাজেয়াপ্ত করা হয় কিংবা প্রচারের জন্যে যখন পুঁথি লেখানো হয় তখন এই কথাটাই প্রকারান্তরে স্বীকার করা হয় যে বাক্যের মূল্য অসীম। তাই যদি না হতো তবে কোটি কোটি টাকা প্রোপাগান্ডার খাতে খরচ করা হতো কেন যুদ্ধের সময় সব দেশে? শান্তির সময় কোনো কোনো দেশে? কিংবা এত লেখকের এত বই নিষিদ্ধ হতো কেন ক্যাথলিক ধর্মসঙ্ঘের দপ্তরে? বিভিন্ন রাষ্ট্রের দপ্তরে?

বাক্যের মূল্য অসীম। কোহিনুর হীরকের চেয়েও বেশী। কাচের দামে কাঞ্চন বিকিয়ে যায়। লেখার জন্যে লেখক যা পায় তা সাধারণত অকিঞ্চিৎকর। লেখক বঞ্চিত হয়, কিন্তু পাঠককে বঞ্চিত করে না, বঞ্চনা করে না। বঞ্চনা করলে হয়তো কাঞ্চনের দামে কাচ বিকোত। কিন্তু কাচ কিনে পাঠক করত কী? ভেঙে ফেলত। ফেলে দিত।

লেখক যদি নিজের লেখার মূল্য নিজে না দেয়, বাক্যের অপব্যবহার করে তা হলে পাঠক সে লেখা একবার পড়ে, দু'বার পড়ে না। যা পড়ে তা মনে রাখে না। আর যদি আদৌ না লেখে, কিংবা লিখলেও বাক্যের ব্যবহার না জানে তা হলে তো সে লেখকই নয়।

বাক্যের শক্তি অসীম। আণবিক শক্তির চেয়েও বেশী। বাক্য নিজেই কর্ম বা য়্যাকশন। আমি যদি আর কিছু না করি, শুধু বাক্য রচনা করি, বাক্যের সদ্‌ব্যবহার করি সেই বাক্যই হাজার হাজার লোককে মারতে পারে বাঁচাতে পারে কাঁদাতে পারে হাসাতে পারে ভাবাতে পারে ভাবনা থেকে মুক্তি দিতে পারে। বাক্য হচ্ছে বীজ। এক একটি বীজ থেকে এক একটা অরণ্যের উৎপত্তি হতে পারে।

বাক্যের ভিতর ডাইনামাইট পোরা। কত কী যে গুঁড়িয়ে দিতে পারে টলিয়ে দিতে পারে তার অন্তর্নিহিত তাপ লেখক নিজে তা দেখে যেতে পারে না। যারা থাকে তারা দেখে। এ কালের ঋষিবাক্য থেকে ফরাসী বিপ্লব ঘটেছে, রুশ বিপ্লব ঘটেছে। এসেছে আমেরিকার স্বাধীনতা, ভারতের স্বাধীনতা। গেছে নিগ্রো দাসত্ব, যাচ্ছে নারীর দাসীত্ব।

এক্ষেত্রেও সদ্‌ব্যবহার অপব্যবহারের প্রশ্ন আছে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের মূলে কাজ করছিল আর এক প্রকার ঋষিবাক্য। ঋষিটি দুর্বাসা। তাঁর নাম নীট্‌শে। হিটলার তাঁর মানসসন্তান। সুতরাং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মূলেও তিনি

সক্রিয়। তেমন কোনো শক্তিশালী দুর্বাসার দুর্বাক্য না থাকায় তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ নাও বাধতে পারে। প্রচারক শ্রেণীর লোক ঋষি নয়। তাদের দুর্বাক্য ঋষির দুর্বাক্য নয়। তাদের বাক্যের অপক্ষমতাও সেইজন্যে অসীম নয়।

বাক্যের সাধনা

সাহিত্যিকের নিজের কাজ হচ্ছে এক মনে সত্যের ও সৌন্দর্যের অন্বেষণ। রিয়ালিটিকে জানতে হবে, ধরতে হবে। সে রিয়ালিটি কেবল সত্য নয়, তা সুন্দর। চলতি ধারণায় নয়, আরো গভীর অর্থে। যারা উপরে উপরে ভাসে তারা এর তল পাবে না।

এটা কেবল সাহিত্যিকের নয়, চিত্রকরেরও সাধনা, সঙ্গীত-শিল্পীরও সাধনা। শিল্পী মাত্রেরই সাধনা। কিন্তু সঙ্গীতকারের যেমন সুর, চিত্রকরের যেমন রেখা, সাহিত্যিকের তেমনি বাক্য বা word, সত্যকে সৌন্দর্যকে বাক্য দিয়ে ব্যক্ত করতে হবে। নইলে তা অব্যক্ত রয়ে যাবে। কাব্য হবে না, সাহিত্য হবে না।

সুতরাং অন্বেষণের সঙ্গে সঙ্গে সৃষ্টিও চাই। যে শুধু অন্বেষণই করে গেল সৃষ্টি করে গেল না সে তার অর্ধেক কাজ বাকী বেখে গেল। সে কাজ এমন কাজ যা আর কেউ সারা করতে পারবে না। এ তো বাড়ি তৈরি নয় যে আমি ভিত গেঁথে গেলুম, তুমি দেয়াল তুললে ছাদ পেটাই করলে। এর আগাগোড়া সমস্তটাই একজনের কাজ। আমিই অন্বেষণ করলুম, অন্বিষ্টকে অন্তরে পেলুম, অন্বিষ্টকে নিত্যকালের পাঠকের জন্যে বাক্য দিয়ে ব্যক্ত করে গেলুম। এই ব্যক্ত করাও ধরে রাখা। এ না হলে ঠিকমতো ধরা যায় না। যা ব্যক্ত হয় না তা পালিয়ে যায়।

ব্যক্ত করার মতো কঠিন কাজ অল্পই আছে। বাক্য ভাঙাগড়া যত কঠিন, রাজ্য ভাঙাগড়াও তত কঠিন নয়। বাক্যের সাধনা যারা করে তারা রাজ্যের সাধনার চেয়ে দুরূহ কর্মে নিযুক্ত। আমাদের এই রাজনীতিপ্রধান যুগে একথা সহজে কেউ মানবে না। কিন্তু মানুষের ইতিহাস তো এই যুগেই শেষ হয়ে যাচ্ছে না, অবশ্য হাইড্রোজেন বোমা যদি হঠাৎ একদিন খতম করে না দেয়। রাজনীতির আবর্তে পড়ে সাহিত্যিকরা যদি লক্ষ্যভ্রষ্ট হয় তা হলে একদা বাধ্য হয়ে মানুষকে স্বীকার করতে হবে যে বাক্য না থাকলে রাজ্য সম্পদ অসার।

তা বলে বাক্‌সর্বস্ব হওয়াও সাধনা নয়। কাকে বাক্য দিচ্ছি তার সঙ্গে সম্বন্ধ রাখা চাই। বাক্য দিচ্ছি সত্যকে, সৌন্দর্যকে। যে সত্য, যে সৌন্দর্য আমারই অন্বেষণের দ্বারা লভ্য। অপরের নয়। চেখভ কিছুদিন টলস্টয়পন্থী হয়েছিলেন। ও পথ ছেড়ে দিলেন। টলস্টয়ের সত্য টলস্টয় ব্যক্ত করবেন। চেখভের সত্য চেখভ ব্যক্ত করবেন। তেমনি রবীন্দ্রনাথেব সত্য রবীন্দ্রনাথ, আমাদের সত্য আমরা। সাহিত্যে অনুকরণ বা অনুসরণের স্থান নেই।

সংকট কবে শেষ হবে ঃ জীবনে

সংকট কবে শেষ হবে ? জীবনে যে সংকট এসেছে তার অবসান হবে সেই দিন যে দিন মানুষ বাঁচতে শিখবে। এতদিন তাকে মরতে শেখানো হয়েছে। বলা হয়েছে দেশের জন্যে মরতে, জাতির জন্যে মরতে, স্বাধীনতার জন্যে মরতে, গণতন্ত্রের জন্যে মরতে, সাম্যবাদের জন্যে মরতে। মরবে যে সে কি অমনি মরবে ? সে মেরে মরবে। মরতে বলার অর্থ দাঁড়ায় মারতে বলা। মরতে শেখানো মানে মারতে শেখানো। গান্ধীজী এর ব্যতিক্রম।

একদিন মানুষ বাঁচতে শিখবে। বাঁচতে শেখার অর্থ বাঁচাতে শেখা। যে বাঁচায় সেই বাঁচে। বাঁচতে শিখবে তারাই যারা বাঁচাতেও শিখবে। এ শিক্ষা মিলিটারি ট্রেনিংয়ের মতো কঠিন। বোধ হয় আরো কঠিন। এর জন্যে কোনো দেশেই এক পয়সা খরচ করা হয় না, কোথাও এর জন্যে ব্যবস্থা নেই। অথচ মানুষ মারার জন্যে কী খরচটাই না হচ্ছে। ব্যবস্থাও কত রকম। কে বলবে মানুষ বাঁচতে চায় !

মোড় একদিন ঘুরে যাবেই। এভাবে চিরকাল চলতে পারে না। চললে মানুষ জাতটাই ডাইনোসরের মতো বিলুপ্ত হয়ে যাবে। পৃথিবীও হাঁফ ছেড়ে বাঁচবে। এদের জ্বালায় পৃথিবীও তো কম বিপন্ন নয়। কোনোদিন হয়তো radioactive হয়ে নিরস্তপাদপ নিরস্তৃণ নিরস্তপ্রাণী নিরস্তপানীয় হবে। মানুষ কেবল মানুষের নয়, জীবজগতের আতঙ্ক হয়ে উঠেছে। প্রকৃতি কখনো এতটা সহ্য করবে না। জীবজগতের বিবর্তন তার অভীষ্ট। বিনষ্টি নয়। তার আগে মানুষের চৈতন্য উদ্রেক করবে।

মানুষ বাঁচতে শিখবে। বাঁচাতে শিখবে। বাঁচবে ও বাঁচাবে কিসের জন্যে ? কী কী তার কাম্য ? অন্নবসন আশ্রয়কে জীবনের কাম্য বলা যায় না, বলা যেতে পারে কাম্যলাভের সহায়। কাম্য যার স্থির হয়নি কাম্যলাভের সহায় নিয়ে সে কী করবে ? সুতরাং প্রথমে স্থির করতে হবে কাম্য কী কী। প্রেমহীন জীবন বহন করা যায় না, কুবেরের ঐশ্বর্য নিয়েও। মুক্তিহীন জীবন বহন করা যায় না, রুদ্রের ক্ষমতা নিয়েও। ন্যায়হীন জীবন বহন করা যায় না, ইন্দ্রের সম্ভোগ সত্ত্বেও। আনন্দহীন জীবন বহন করা যায় না, বিশ্বকর্মার যন্ত্রনৈপুণ্য সত্ত্বেও। সত্যহীন কল্যাণহীন সৌন্দর্যহীন জীবন বহন করা যায় না, ভূষণ্ডীর পরমায়ু সত্ত্বেও।

কাম্য যা তা প্রথমে স্থির করো। কাম্যলাভের উপায় যা তাকে দিন দিন শুদ্ধ করো। যেখানে সত্যই কাম্য সেখানে মিথ্যা কখনো উপায় হতে পারে না। যেখানে কল্যাণই কাম্য সেখানে হিংসা কখনো উপায় হতে পারে না। সেখানে সৌন্দর্যই কাম্য সেখানে বীভৎসতা কখনো উপায় হতে পারে না। যেখানে ন্যায়ই কাম্য সেখানে অন্যায় কখনো উপায় হতে পারে না। যেখানে প্রেমই কাম্য সেখানে ঘৃণা কখনো উপায় হতে পারে না। যেখানে মুক্তিই কাম্য সেখানে আজ্ঞাতন্ত্র কখনো উপায় হতে পারে না। যেখানে আনন্দই কাম্য সেখানে নিষ্ঠুরতা কখনো উপায় হতে পারে না।

মানুষকে কাম্য সম্বন্ধে মনঃস্থির করতে হবে। উপায় সম্বন্ধেও মনঃস্থির করা চাই। তখন তার জীবন থেকে সঙ্কটের ছায়া সরে যাবে।

সঙ্কট কবে শেষ হবে ঃ সাহিত্যে

আর সাহিত্য থেকে? সাহিত্য সব সময় জীবনের অনুসরণ করে না। কখনো কখনো জীবনের আগে আগে চলে। ইচ্ছা করলে সাহিত্য জীবনের জন্যে অপেক্ষা না করে রাহুমুক্ত হতে পারে। তারপর জীবন রাহুমুক্ত হবে।

সাহিত্যে যে সংকট এসেছে তা আরো আগে সরে যেতে পারে যদি লেখকরা ভাবতে শেখেন যে, তাঁদের সামনে নিরবধি কাল ও বিপুলা পৃথ্বী পড়ে রয়েছে। বিধাতা যাঁদের হাতে সৃষ্টি করার ক্ষমতা দিয়েছেন, যাঁরা স্রষ্টা, তাঁরা মাটিতে পা রাখলেও আকাশের নাগরিক। আকাশের আলোর মতো তারা ঝড়ঝাপটার ঊর্ধ্বে। জীবনে তাঁরা আর দশজন মানুষের মতো সংকটের অবসানের জন্যে অপেক্ষা করতে বাধ্য। সে অপেক্ষা হয়তো তাঁদের জীবিতকালে সমাপ্ত হবে না। কিন্তু সাহিত্যে তাঁরা অপেক্ষা করতে বাধ্য নন। ইচ্ছা করলেই তাঁরা সংকটের ঊর্ধ্বে উঠতে পারেন। যে পরিমাণে তাঁদের মন তৈরি হবে সেই পরিমাণে তাঁরা ঊর্ধ্বে উঠবেন।

এ কালের সাহিত্যিকদের পক্ষে মন তৈরি করাটাই শক্ত। মন তাঁদের বিভ্রান্ত, উদ্‌ভ্রান্ত, দিশাহারা। আর দশজন মানুষের মতো তাঁরাও তলে তলে বিশ্বাস করেন যে, সাহিত্যই সাহিত্যের উদ্দেশ্য নয়, সাহিত্য একটা উপায়মাত্র, উদ্দেশ্য হচ্ছে সামাজিক পরিবর্তন বা কল্যাণ। 'সমাজ' এবং 'কল্যাণ' এই দুটি সত্তা তাঁদের দুই কাঁধে ভর করেছে। কিছুতেই নামছে না। ভারাক্রান্ত মন নিয়ে তাঁরা ঊর্ধ্বে উঠতে পারছেন না। সাহিত্য যতদিন উপায়স্থানীয় হবে, উদ্দেশ্য-স্থানীয় না হবে, ততদিন মনের ভার নামবে না।

তা বলে অসামাজিক বা অকল্যাণকর হওয়াও সাহিত্যের লক্ষ্য নয়। সাহিত্যের লক্ষ্য হচ্ছে সাহিত্য হওয়া। শুধুমাত্র 'হওয়া'। সৎ বা অসৎ, সামাজিক বা অসামাজিক কোনো রকম বিশেষণ তার পূর্বে বসবে না। 'হওয়া'ই তার লক্ষ্য। 'হয়ে'ই তার লক্ষ্যভেদ। ঈশ্বরের সৃষ্টির মতো মানুষের সৃষ্টিও আপনি আপনার উদ্দেশ্য। সমাজবাদী বা কল্যাণবাদীরা এটা স্বীকার করতে অনিচ্ছুক, কিন্তু রস পেলেই যারা খুশি হয় তাদের কাছেই আমাদের রসের নিবেদন।

আমরা তা হলে কী করব

আমরা তা হলে কী করব?

প্রথমত বাঁচব। দ্বিতীয়ত, লিখব। বাঁচা আজকের দিনে দুর্ঘট। কেন দুর্ঘট সকলেই জানে। তবে এটাও জেনে রাখা ভালো যে, বাঁচানোর কথা না ভাবলে

শুধু বাঁচার কথা ভেবে আমরা বাঁচব না। আমি বাঁচব, আমি বাঁচব, ভাবতে ভাবতে মানুষ পাগল হয়ে যাবে, তবু আর কাউকে বাঁচাবে না, বাঁচাবার কথা ভাববে না, এই যদি হয়ে থাকে মানবপ্রকৃতি তবে আমরা কোন মন্ত্রবলে বাঁচব! আমার বিশ্বাস এটা মানবপ্রকৃতি নয়। যে বাঁচায় সেই বাঁচে। সবাইকে বাঁচাব, সেই সঙ্গে আমরাও বাঁচব।

তারপর লেখা। লেখাও আজকের দিনে দুর্ঘট। সময় পাওয়া যায় না। সময় পেলেও শক্তি পাওয়া যায় না। প্রেরণা পাওয়া যায় না। নিরিবিলি পাওয়া যায় না। ব্যাঘাত অত্যন্ত বেশী। বিক্ষেপ অত্যধিক। তার উপর আমরাই আমাদের শত্রু। যেখানে একখানা বই লিখতেই সারা জীবন লেগে যাওয়া উচিত সেখানে বছরে চারখানা বই লিখছি। এর অনিবার্য পরিণাম দুধে জল মেশানো। গুঁড়ো মেশানো। দুধের স্বাদ ওতে মেটে না। ফলে অতৃপ্তি। আমাদের অর্থের প্রয়োজন না হয় মিটল, কিন্তু পাঠকদের রসের প্রয়োজন যে মিটল না। অর্থের জন্যে আর কোনো বৃত্তি খুঁজতে হবে। তাতে হয়তো লেখার ব্যাঘাত হবে, কিন্তু লেখা যেটুকু হবে সেটুকু খাঁটি হবে। সাহিত্যের বিচার পরিমাণ দিয়ে হয় না। হয় উৎকর্ষ দিয়ে।

তারপর আজকের জীবনের বিকট বীভৎস রূপ এত বেশী দেখে ও দেখিয়ে তুমি কার কী উপকার করবে? নিছক রসসৃষ্টি বা রূপসৃষ্টি হিসাবে কতটুকু এর মূল্য! কুশ্রীতা দিয়ে সাহিত্য সৃষ্টি একেই তো কঠিন, তার উপর দিন রাত ঐ নিয়ে থাকলে তুমি নিজেও তো কুশ্রী হয়ে যেতে পারো। যে লেখক ক্রমাগত কুশ্রীতার কথা ভাবে আর লেখে সে যতই বলুক যে তার পক্ষপাত নেই, যতই বোঝাক যে সে যা দেখছে তাই লিখছে, ভাবীকালের ভবী ভুলবে না।

কুৎসিতকে সমস্তক্ষণ এড়িয়ে যাওয়া অবশ্য অনুচিত। যে কোনো একটা পুরো মাপের ছবিতে কুৎসিত কিছু থাকবেই। সেটাও সৌন্দর্যের অঙ্গ। তা বলে তাকেই সৌন্দর্যের আসনে বসানো যায় না। সে সৌন্দর্য নয়। তাকে নিয়ে সৌন্দর্য। এই সূক্ষ্ম তফাতটুকু যদি স্বয়ং লেখকদের জানা না থাকে তা হলে পাঠকদের অপরাধ কী! তাদের পক্ষে না জানাই স্বাভাবিক।

কুৎসিতকে পাশ কাটিয়ে যাওয়া উচিত নয়, কিন্তু দিনরাত তার সংসর্গ করাও উচিত নয়। এর জন্যে তোমাকে যদি পালাতে হয় তবে পালাও। তেমন পলায়নকে পলায়নীবৃত্তি বলে না। গ্যয়টে, শেলী, রবীন্দ্রনাথ সকলেই পালিয়েছেন। নয়তো সৃষ্টি করতে পারতেন না।

তারপর ঐ যে নতুন একটা ধারণা—তুমি তোমার লেখা দিয়ে দুনিয়াটাকে বদলে দিতে শুধরে দিতে পারো, অতএব তাই তোমার করণীয়—ও ধারণা হয়তো একেবারে ভুল নয়, তবু আজকের জীবনের জটিলতা অনুধাবন করে ও ধারণায় অটল থাকা যেন ফরাসী বালক কাসাবিয়াংকার মতো জ্বলন্ত জাহাজের পাটাতনে ঠায় দাঁড়িয়ে থাকা। আগে অর্জন করো তোমার কণ্ঠস্বর, তার পরে তার দ্বারা অসাধ্যসাধন করবে। যার কণ্ঠস্বর ক্ষীণ তার পক্ষে গলা ফাটানো মূঢ়তা। দুনিয়া বদলাবে না, তুমিই তোমার ফাটা গলা নিয়ে অকেজো হবে।

সমাপনী

আমাদের লেখকরা চুপ করে বসে নেই। তাঁরা লিখে যাচ্ছেন। তাঁদের হাত দিয়ে যা হচ্ছে তা অনবদ্য না হতে পারে, কিন্তু তুচ্ছ নয়। যে সঙ্কট মাথায় করে তাঁদের বাঁচতে হচ্ছে সে সঙ্কট যদি না থাকত তা হলে হয়তো তাঁদের কাছে আরো মহৎ সৃষ্টি পাওয়া যেত। কিংবা এমনও হতে পারে যে, এই সঙ্কটের ভিতর দিয়ে যেতে যেতে তাঁদের মধ্যে বহু সদ্‌গুণের বিকাশ হবে। সঙ্কট না থাকলে সেটা হতো না।

বাংলা সাহিত্যের কথা বিশেষ করে বলছি। এ সাহিত্য ভীষণ দুর্যোগের মুখে দুর্বল দীপশিখার মতো নিবে যেতে পারত, নিবে গেলে কেউ আশ্চর্য হতো না। কিন্তু নিবে তো এ যায়নি। বরং ক্রমে সামলে নিচ্ছে। আপাতত প্রাচুর্যের লক্ষণ দেখছি। এর পরে দেখব অমৃতের সংকেত। আমি আশাবাদী। দেশ হয়তো জোড়া লাগবে না, অন্তত আমাদের জীবদ্দশায় নয়। কিন্তু সাহিত্যের ভাণ্ডার যেমন এজমালি ছিল তেমনি এজমালি রয়েছে।

পূর্ববঙ্গের সঙ্গে আমার যোগ আছে। সেখানেও কাজ হচ্ছে। সেখানকার লেখকদের মস্ত বড় পাথেয় জনগণের ভাষাপ্রেম। এ প্রেমের মর্যাদা রাখতে হবে সত্যিকারের জনসাহিত্য বা পীপ্‌ল্‌স লিটারেচার দিয়ে। পপুলার লিটারেচার তো পীপ্‌ল্‌স লিটারেচার নয়। পক্ষান্তরে অর্থনৈতিক অভাব অভিযোগ বা শ্রেণীবিদ্বেষও জনসাহিত্যের প্রকৃত উপাদান নয়। পদ্মা মেঘনা যমুনা প্রভৃতি নদীর কূলে ও বুকে যে বৃহৎ জীবন সুপ্ত রয়েছে তাকে সোনার কাটি দিয়ে জাগাতে হবে। বঙ্গোপসাগর থেকে যাত্রা শুরু করে সপ্ত সাগরে যারা জাহাজ চালায় তাদের জীবনের সন্ধান নিতে হবে। বহুদিন থেকে আমার বদ্ধমূল ধারণা সত্যিকারের জনসাহিত্য আসবে পূর্ববঙ্গের চাষী জেলে মাঝি মাল্লার জীবন থেকে। প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের বিচিত্র সম্বন্ধ, মানুষের সঙ্গে মানুষের বিভিন্ন সম্পর্কে, নিয়তির সঙ্গে পুরুষকারের নিত্য পাশা খেলা—যে সাহিত্যে এসব নেই তা জনসাহিত্য হতে পারে না। কারণ যে জীবনে এসব নেই তা জনজীবন নয়। আমরা তার থেকে দূরে ছিলুম ও রয়েছি। কাছে যাবার কথা ভাবতে হবে।

পশ্চিমবঙ্গ দ্রুতবেগে নগরপ্রধান ও শিল্পমুখর হয়ে উঠছে। জনসাহিত্য সম্বন্ধে আমার যে ধারণা তার সঙ্গে এর মেলে না। কলকাতা শহরে বিপুল বিত্তের পাশাপাশি বিশাল দৈন্য বিরাজ করছে। বারুদের পাশাপাশি রাখলে যা হয় তাই হবে একদিন। বিস্ফোরণ। তখন জনসাহিত্যের রূপ কেমন হবে জানিনে। সুরূপ নিশ্চয় নয়। এর সমাধান আমাদের হাতে নেই। আমাদের হাতে অন্য কাজ। সে কাজ এত দরকারী, এত জরুরি ও এত গুরুত্বসম্পন্ন যে আর কোনো দিকে মন দিতে আমরা অক্ষম ও অনিচ্ছুক। সমস্ত শক্তি দিয়ে হাতের কাজ সেরে নেওয়া যাক। জানি আমাদের পরিবেশ অনুকূল নয়। তা নিয়ে অনর্থক হাহুতাশ করব না। দিতে যেটুকু পারি দিয়ে যাব। এও একদিন

জনগণের স্বীকৃতি পাবে। জনসাহিত্য হবে না যদিও।

রস সম্বন্ধে আমার ধারণা এই যে, রস হবে অনলস্রোতের মতো জ্বালাময় অথচ তৃষ্ণার জলের মতো শীতল। এমন যে রস তার স্বীকৃতি সর্বকালে ও সর্বদেশে। এ রস যদি কারো অন্তরে থাকে তবে সে এই দিয়ে যাক। এই দিয়ে যাক আর কোনো দিকে না তাকিয়ে। ধরণী তৃষ্ণার্ত।

১৯৫৫

শিক্ষার সংকট

ভূমিকা

একদিন আমি একটা অদ্ভুত স্বপ্ন দেখি। আপনা হতে লেখা হয়ে যাচ্ছে সাদা জমির উপর কালো কালির লিখন। আগাগোড়া ইংরেজীতে। সে ইংরেজী আমার নয়। আমার ইংরেজীতে বিস্তর কাটাকুটি থাকে। সেই বিশুদ্ধ ইংরেজী আমার অবচেতন মন থেকেও আসতে পারে না। তবে কি কোথাও পড়েছি, ভুলি গেছি। না, তাও নয়। বাক্যের পর বাক্য স্রোতের মতো বয়ে চলেছে। এতদিন পরে তার পুনরুদ্ধার অসম্ভব। বছর তিন চার পরে লিখছি। মর্মটুকুই স্মরণ আছে।

"দু'শো বছর আগে স্থির হয়ে যায় মানুষের শিক্ষাব্যবস্থা কী রকম হবে। ক্রমে ক্রমে একটার পর একটা দেশ সেই ব্যবস্থা স্বীকার করে নেয়। এখন আর পেছিয়ে যাবার পথ নেই। যেতে হলে এগিয়ে যেতে হবে। আবার সব দেশের মানুষ যেটা মেনে নেবে সেটাই হবে ভবিষ্যৎ শিক্ষাব্যবস্থা।"

এখন এই আশ্চর্য স্বপ্নের অর্থ কী তা শিক্ষাবিদ্‌রা বিচার করে দেখুন। আমি স্বপ্ন দেখেই খালাস। এক এক দেশের শিক্ষার ঐতিহ্য এক এক রকম। কিন্তু নিয়ামক হবে কি ঐতিহ্য না আধুনিকতা? আদর্শ না বাস্তব? জাগতিক রিয়ালিটির থেকে বিযুক্ত হয়ে কোনো দেশের কোনো যুগের শিক্ষা ব্যবস্থাই চিরন্তন হতে পারে না, সার্বজনীন হতে পারে না। অথচ প্রাচীন ভারতের বা প্রাচীন গ্রীসের আদর্শকেও অবান্তর বলে খারিজ করা যায় না। নৈমিষারণ্য, তক্ষশীলা, অ্যাথেন্স এখনো মানুষের মেঘাচ্ছন্ন জীবনে এক একটি আলোকস্তম্ভ।

আজকের মানুষ বৃত্তির উপরে এক চোখ রেখে, সংস্কৃতির উপর আরেক চোখ রেখে ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া শেখায়। ব্যক্তিগত ক্ষেত্রে আমি এর ঊর্ধ্বে উঠতে চেষ্টা করেছি। সে চেষ্টা বিফল হয়েছে। শিক্ষা প্রসঙ্গে দু'কথা বলার অধিকার যদি আমার মতো অব্যাপারীর থাকে তবে সেটা এইজন্যেই যে, আমিও এককালে এক্সপেরিমেণ্ট করেছি। জ্যেষ্ঠ পুত্র ও জ্যেষ্ঠ কন্যাকে নিয়ে। লোকে কেমন অবলীলার সঙ্গে ত্রিভাষী সূত্রের কথা আওড়ায়। আমার ছিল একভাষী সূত্র। আমি এখনো বিশ্বাস করি যে, শতকরা সত্তরজন নিরক্ষর দেশবাসীকে প্রাথমিক শিক্ষায় শিক্ষিত করতে হলে একভাষী সূত্রই একমাত্র সূত্র। মাধ্যমিক শিক্ষা দ্বিভাষীও হতে পারে, ত্রিভাষীও হতে পারে। কিন্তু কাউকেই বাধ্য করা উচিত নয়।

শিক্ষার সংকট

আধুনিক শিক্ষা বলতে যা বোঝায় সে জিনিস ইউরোপ থেকে ভারতে এসেছে। ইউরোপেও তার সূত্রপাত বেশীদিন আগে নয়। এখানের মতো সেখানেও ইতর সাধারণের জন্যে ছিল একটু পড়তে শেখা, একটু লিখতে শেখা, একটু যোগ বিয়োগ গুণ ভাগ করতে শেখা। আর ব্রাহ্মণ বা পাদ্রীর জন্যে শাস্ত্রাধ্যয়ন। ইতর সাধারণ শিখত মাতৃভাষায় আর ব্রাহ্মণ বা পাদ্রীরা সংস্কৃত বা লাটিন ভাষায়। উচ্চশিক্ষা আর নিম্নশিক্ষার মাঝখানে ছিল অলংঘ্য প্রাচীর।

ব্যতিক্রম হিসাবে ছিল আরো একপ্রকার শিক্ষা। সেটা হতো বড়লোকদের বাড়ীতে গৃহশিক্ষকের কল্যাণে। পাঠশালায় বা টোলে বা পাদ্রীদের স্কুল কলেজে তার জন্যে ব্যবস্থা ছিল না। থাকলেও গৌণভাবে। সেটা হলো কাব্যপাঠ বা ক্লাসিক চর্চা। সংস্কৃত, লাটিন, গ্রীক ভাষায়। রাজসভার সভাসদ বা অভিজাত শ্রেণীর দু'চারজন ব্যক্তি বহুব্যয়ে কালিদাস বা ভবভূতি, ভার্জিল বা অ্যারিস্টটল পড়তেন। রাজসভায় বা জমিদারের বৈঠকখানায় তা নিয়ে আলাপ আলোচনাও হতো।

ইউরোপে যখন ছাপাখানার প্রবর্তন হয় তখন শাস্ত্র অশাস্ত্র সবরকম কেতাব স্বল্পমূল্যে পাওয়া যায়। কেনে যারা তারা দোকানদার কারিগর শ্রেণীর লোক। ততদিনে শহরের বিস্তার, বাণিজ্যের বিস্তার হয়েছিল। রাজারাজড়া নয়, অভিজাত নয়, ব্রাহ্মণ বা পাদ্রী নয়, এমন কতক লোক মুদ্রিত পুস্তক কেনে ও পড়ে। সেইভাবে ঘরে ঘরে বিদ্যাবিস্তার হয়। বলা বাহুল্য ধর্মগ্রন্থেরই চাহিদা ছিল বেশী, কিন্তু গ্রীক লাটিন সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ কীর্তিও বহুল প্রচারিত হয় ও তার ফলে রেনেসাঁস ঘটে। বিজ্ঞানচর্চাও বেড়ে যায়। বিচিত্র বিষয়ের চাহিদা যখন দেখা দিল যোগানও সেইসঙ্গে উপস্থিত হলো। পাদ্রীদের প্রতিষ্ঠিত স্কুল কলেজ ও ইউনিভার্সিটিতে কাব্যচর্চা, দর্শনচর্চা আইনচর্চা ও পরে বিজ্ঞানচর্চা প্রবর্তিত হলো। ধীরে ধীরে সে সব প্রতিষ্ঠান সেকুলার হয়ে গেল। গত শতাব্দীর প্রথমার্ধেও লাটিন না জানলে ও বাইবেল পড়া না থাকলে অক্স্‌ফোর্ডে বা কেমব্রিজে ঢুকতে দিত না।

যে শিক্ষা সমাজের ঊর্ধ্বতন স্তরে আবদ্ধ ছিল সে শিক্ষা মধ্যবর্তী স্তরেও ছড়িয়ে যায়। যে কোনো মধ্যবিত্ত ব্যক্তি ইচ্ছামতো বই কিনতে পারেন, না পারলে লাইব্রেরীতে পড়তে পান। মাসিক ও ত্রৈমাসিক পত্রের গ্রাহক হয়েও সেই-সূত্রে জ্ঞানলাভ করেন। দৈনিকপত্রের পাঠক হন। শিক্ষিত বলে গণ্য হতে হলে রাজরাজড়া বা সভাসদ্‌ বা বড়লোক হতে হবে, অথবা হতে হবে পাদ্রী, এরকম কোনো বাধ্যবাধকতা থাকে না। এই অধ্যায়ে ইউরোপের নবপর্যায়ের শিক্ষা ভারতেও প্রবর্তিত হয়, তারপরে অন্যান্য দেশেও। এখন তো দুনিয়ার সর্বত্র সেই ধরনের স্কুল কলেজ ইউনিভার্সিটি, তেমনি সেকুলার।

ইতিমধ্যে ইংলণ্ডে শিল্পবিপ্লব ঘটে যায়। ক্রমে ক্রমে অন্যান্য দেশেও

অনুরূপ ঘটনা ঘটে। তখন এতকাল যাদের ইতর সাধারণ বলে শুধু একটু পড়তে বা লিখতে বা আঁক কষতে শেখানো হতো তাদের মধ্যেও বিদ্যাবিস্তারের প্রশ্ন ওঠে। তারাও আরো কম দামের বই কাগজ কেনে। বিশেষত নভেল বা রোমান্স। জাপানের দৈনিক পত্রিকায় ইতরজন পাঠ্য অলীক কাহিনী ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। ইতরজন পড়ে। উনবিংশ শতাব্দীর চিন্তাশীলরা ফতোয়া দেন যে ইতর ভদ্র সবাইকে স্কুলে পাঠাতে হবে, না পাঠালে বাধ্য করা হবে। তবে স্কুলের পর কলেজে পাঠাবার জন্যে তেমন কেউ ব্যস্ত ছিলেন না। কলেজ হবে সর্বসাধারণের জন্যে নয়, মধ্যবিত্তদের বা ঊর্ধ্বতন স্তরের জন্যে। ইউনিভার্সিটিও তাই। সেক্ষেত্রে বাধ্যতার প্রশ্ন ওঠে না।

সেই যে একটু পড়ানো, একটু লেখানো, একটু আঁক কষানো সেটা এখন উন্নত দেশগুলির শিক্ষাব্যবস্থার নিম্নতম স্তরেও অপ্রচলিত। ওইটুকু শিক্ষা দিয়ে কোনো নাগরিককেই বিদায় দেওয়া হয় না। তার ইচ্ছা থাক আর নাই থাক তাকে চোদ্দ বছর বা ষোলো বছর বা আঠারো বছর পর্যন্ত অনেক রকম বিদ্যা শেখাতেই হবে। তবে তাকে কলেজে যেতে বাধ্য করা হবে না। কলেজের বিকল্পও আছে। যেখানে সে কারিগরি শিখতে পারে, মিলিটারি ট্রেনিং পেতে পারে, ব্যবসা বাণিজ্যের জন্যে তালিম পেতে পারে। তবে মুখ্য স্রোতটা কলেজমুখী। কলেজে যারা যেতে চায় তারা যোগ্য হয়ে থাকলে সরকারী বেসরকারী স্কলারশিপ পায়। অক্সফোর্ড কেমব্রিজের শতকরা আশিজন ছাত্রই নাকি স্কলারশিপের টাকায় পড়াশুনা চালায়। নইলে ঘরের খরচে পড়া অত্যন্ত ব্যয়সাধ্য ব্যাপার।

উন্নত দেশগুলিতে যে প্যাটার্ন লক্ষিত হচ্ছে তা অল্প কথায় এই যে, স্কুলের শিক্ষা হবে সার্বজনীন ও বিনামূল্যে লভ্য। কলেজের শিক্ষা হবে অধিকাংশ ছাত্রের অধিগম্য, কিন্তু বিনামূল্যে নয়। হয় ঘরের টাকায় নয় স্কলারশিপের টাকায়। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা অপেক্ষাকৃত কম ছাত্রের জন্যে। তাদের বেশীর ভাগই স্কলারশিপ পায়।

উন্নত দেশ বললে এটাও বোঝায় যে তার অর্থনীতি শিক্ষার ব্যয় বহন করতে সক্ষম। যেখানে অক্ষম সেখানে হয় নিম্নশিক্ষা নয় অবহেলিত হয় উচ্চ-শিক্ষা। আমাদের এদেশে এখনো নিরক্ষরের অনুপাত ভয়াবহ। বোধহয় শতকরা সত্তর। স্কুলের প্রাথমিক সোপানও সার্বজনীন নয়, বাধ্যতার প্রশ্নও ওঠে না। আমাদের ধনবল যেমন কম তেমনি উপযুক্ত শিক্ষকেরও অপ্রাচুর্য। একটু পড়াতে, একটু লেখাতে, একটু কষাতে সকলেই পারেন, কিন্তু তার চেয়ে বেশী পারতে হলে নিজেকেই ট্রেনিং নিতে হবে। কোথায় এত ট্রেনিং পাওয়া শিক্ষক?

স্কুলের শিক্ষা যদি কাঁচা থেকে যায় তবে সেইসব কাঁচা ছাত্রদের কলেজে ঢুকতে দেওয়াই ভুল। কিন্তু তারা যাবেই বা কোথায়! কলেজের যতগুলো বিকল্প অন্যান্য উন্নত দেশে দেখা যায় এদেশে ততগুলো নয়। আর দেখা গেলেই বা কী? যারা কলেজের পক্ষে কাঁচা তারা তার বিকল্পগুলির পক্ষেও অনেক সময় কাঁচা।

স্কুলের শিক্ষার সংস্কার না করে কলেজের শিক্ষার সংস্কার যেন গোড়া কেটে আগায় জল। অনুপযুক্ত ছাত্রদের দিয়ে একটি কি দুটি বাদে প্রায় প্রত্যেকটি কলেজ ভরে গেছে। তারা গায়ের জোরে ডিগ্রী আদায় করতে পারে, কিন্তু ডিগ্রীলাভ আর শিক্ষালাভ তো একই জিনিস নয়। ডিগ্রীলাভ করে তারা যে চাকরিবাকরির যোগ্য হবে এটা তাদের মনের মরীচিকা। গায়ের জোরে হয়তো চাকরিও আদায় করবে ও তাতে টিকেও থাকবে, কিন্তু জনসাধারণকে তাদের প্রদত্ত করের বিনিময়ে সেবা দিতে পারবে না। জনসাধারণ মাথার ঘাম পায়ে ফেলে রক্ত জল করে যে ট্যাক্স যোগাবে তা দিয়ে লক্ষ লক্ষ সাদা হাতী পোষা হবে। আজ আমরা ছাত্রবিদ্রোহ দেখছি, কাল আমরা গণবিদ্রোহ দেখব।

যে ট্যাক্স যোগায় সেই হচ্ছে আসল মালিক। তার সেবার জন্যেই সরকারের এতগুলো বিভাগ। সে যদি দেখে যে এসব বিভাগের উদ্দেশ্য জনসেবা নয়, শ্বেতহস্তী পোষণ, মধ্যবিত্তশ্রেণীর অপদার্থ সন্তানদের বোঝা বহন, তা হলে সে সত্যি সত্যি বাসুকীর মতো মাথা ঝাড়া দেবে আর ঘটে যাবে একটা ভূমিকম্প। ধনিকদের বিতাড়ন করে মধ্যবিত্তদের তাদের জায়গায় বসানোই বিপ্লবের শেষ কথা নয়। সে অধ্যায়ের পর আরো অধ্যায় আছে।

এখানে পরিষ্কার করে বলি যে আগেকার দিনে শিক্ষার উদ্দেশ্য ছিল শিক্ষা, জীবিকা উপার্জন নয়। কিন্তু এখনকার দিনে জীবিকা উপার্জনও শিক্ষার অন্যতম উদ্দেশ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। অনেকের বেলা একমাত্র উদ্দেশ্য। জীবিকাকে শিক্ষার বাইরে রাখা আজকের দিনে আর সম্ভব নয়। শিক্ষার ব্যবস্থা যাঁরা করবেন জীবিকার ব্যবস্থাও তাঁদেরকেই করতে হবে। কিন্তু এ প্রস্তাবে সরকার এখনো রাজী নন।

গত শতাব্দীর গোড়ার দিকে যখন ইংরেজী শিক্ষা প্রবর্তিত হয় তখন ইংরেজদের মধ্যেই অনেকে এর বিরুদ্ধতা করেন। তাঁদের একভাগ বলেন প্রাচ্য শিক্ষাই ভারতের আদর্শ, পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রবর্তিত হলে আদর্শভ্রংশ ঘটবে, আদর্শভ্রংশ ঘটলে একূল ওকূল দুকূল যাবে, সেটা কি ভালো হবে? আরেক ভাগ বলেন, ইংরেজী শিক্ষা পেয়ে এরা চাইবে ইংরেজের মতো চাকরি, কোথায় এত চাকরি? চাকরি না পেলে এরা অসন্তুষ্ট হবে, কেমন করে রোধ করা যাবে এদের অসন্তোষ? যে শিক্ষা প্রবর্তিত হলে বেকার সমস্যা অবশ্যম্ভাবী সে শিক্ষা প্রবর্তন করা মানেই তো যে সমস্যা নেই তাকে সৃষ্টি করা।

ইংরেজী শিক্ষার স্বপক্ষে যাঁরা ছিলেন তাঁরাই জিতলেন। মেকলের কাস্টিং ভোটের জোরে। মেকলের উদ্দেশ্য ছিল একটি ইংরেজী শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উদ্ভব ও প্রভাববিস্তার। সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়। কিন্তু ক্রমবর্ধমান অসন্তোষ তাকে ক্রমেক্রমে ইংরেজবিরোধী করে তোলে। সেই শ্রেণীর নেতৃত্বেই ইংরেজ রাজত্ব হটে যায়। বাহাদুর শা জাফর বা নানাসাহেবের নেতৃত্বে নয়। তারপরে সেই শ্রেণীই এখন ব্রিটিশবর্জিত ভারতের হর্তাকর্তা হয়ে বসেছে। সঙ্গে সঙ্গে বলছে সে আর ইংরেজী শিখবে না, তার বদলে শিখবে হিন্দী ইত্যাদি ভাষা। যেন ইংরেজী শিক্ষা কেবল ভাষাশিক্ষার ব্যাপার।

ইংরেজী শিক্ষা বলতে তখনো বোঝাত, এখনো বোঝায়, আধুনিক পদ্ধতির শিক্ষা। যাতে স্কুল আছে, কলেজ আছে, বিশ্ববিদ্যালয় আছে। যাতে বিজ্ঞান আছে, পাশ্চাত্ত্য দর্শন আছে, ইতিহাস ভূগোল আছে। যাতে ম্যাট্রিকুলেশন আছে, বি. এ. আছে, এম. এ. আছে। এটা এখন সারা দুনিয়ার পদ্ধতি। এ সব ডিগ্রী এখন আন্তর্জাতিক মান নির্ণয়ের দণ্ড। তুমি তোমার খুশিমতো ডিগ্রী বিতরণ করতে পারো, কিন্তু তোমার ডিগ্রীধারীরা অন্যত্র স্বীকৃতি পাবে না। তোমার কাছেই ফিরে আসবে আর তোমারই শিলনোড়া দিয়ে তোমারি দাঁতের গোড়া ভাঙবে। আমাদের আজকের শিক্ষাব্যবস্থা ধীরে ধীরে আন্তর্জাতিক ধারা ধরে অনেক দূর এগিয়ে গেছে, একে আর কোনোমতেই পিছু হটানো যাবে না।

আন্তর্জাতিক মানই এখন অন্তর্ভারতীয় মান। ভারতের জন্যে আলাদা একটা পদ্ধতি প্রণয়নের প্রত্যেকটি চেষ্টাই নিষ্ফল হয়েছে। যেমন রবীন্দ্রনাথের, তেমনি গান্ধীজীর, তেমনি গুরুকুলের, তেমনি স্বদেশীযুগের ন্যাশনাল কাউন্সিলের। দেশের লোক গ্রহণ করেনি কিংবা গ্রহণ করলেও সার গ্রহণ করেনি, খোসা গ্রহণ করেছে। প্রচলিত শিক্ষাপদ্ধতির অসংখ্য দোষত্রুটি গত সত্তর বছর ধরে সর্বত্র আলোচিত হয়েছে, অথচ আজকাল গ্রামে গ্রামে ইংরেজী মডেলের স্কুল কলেজ গজিয়ে উঠছে। গঙ্গলিকার মতো ছেলেমেয়েরা ছুটেছে সেখানে। জানে বেকার হবে, কোথাও পাত্তা পাবে না, তবু একটা সার্টিফিকেট বা একটা ডিগ্রী তাদের চাই। আর কিছু না হোক সমাজে তো মান বাড়বে। লোকে তো শিক্ষিত বলে সমীহ করবে। ফেল করলেও তো বলতে পারা যাবে, আমি কলেজে পড়েছি।

এর প্রসার কেউ রোধ করতে পারবে না। কারণ মানুষমাত্রেই সমাজে উঠতে চায়। একটি ডোম আমার কাছে মোড়া বেচতে আসত। সেও কথায় কথায় ইংরেজী বুকনি দিত। আমি তাকে যতই বাংলা প্রতিশব্দ শোনাই সে ততই ইংরেজী বিদ্যা ফলায়। এর কারণ সেও বোঝাতে চায় যে সে সাধারণ ডোম নয়, শিক্ষিত ভদ্রলোক হতে তার সাধ।

একবার ইংরেজী শিক্ষার স্বাদ পেলে গ্রামের ছেলে আর গ্রামে ফিরে যায় না, চাষীর ছেলে আর চাষে ফিরে যায় না। সকলেই চায় শহুরে ভদ্রলোক হতে। ইংরেজী শিক্ষার বদলে যেসব প্রদেশে হিন্দী শিক্ষা প্রবর্তিত হয়েছে সেসব রাজ্যেও একই হাল। বিহারের দেহাতী ছেলেদের লক্ষ্য চাপরাসী বা পিয়ন হওয়া, দু'পয়সা উপরি রোজগার করা ও শিক্ষিত ভদ্রলোক বলে গণ্য হওয়া। তাতে তাদের সামাজিক মর্যাদা বেড়ে যায়। বিয়েতে বিহারীরা পণ নিত না বাঙালীরা নিত বলে রাজেন্দ্রপ্রসাদজী একবার বাঙালীদের উপর একহাত নিয়েছিলেন। "এই দেখ, বাঙালীরা শিক্ষাদীক্ষার এত গর্ব করে, তবু পণ সমস্যার সমাধান করতে পারল না, আর আমরা মুখ্যু বিহারী, আমাদের মধ্যে ও পাপ নেই।" কিন্তু ইদানীং লেখাপড়া শিখে ইতর ভদ্র সকলেই পণ নিতে শুরু করেছে তাঁর সাধের বিহারে। আমার চাকর বলছিল যে আজকাল সাইকেলে কুলোয় না, মোটর সাইকেল দিতে হয় জামাইকে।

শিক্ষা, তা সে সেকালের ইংরেজী শিক্ষাই হোক আর একালের হিন্দী শিক্ষাই হোক, ছাত্রদের পল্লীবিমুখ ও কায়িক শ্রমবিমুখ করে। আর তাদের শিক্ষিত ভদ্রলোকে পরিণত করে। সেই সঙ্গে এনে দেয় এমন এক স্বাচ্ছন্দ্যের মান যার খরচ যোগাতে না পেরে তারা ধরে ঘুষ, দাবী করে পণ, অল্পে সন্তুষ্ট হয় না। রাজেন্দ্রপ্রসাদজী বেঁচে থাকতেই এ পতন শুরু হয়েছিল। দুঃখের বিষয় মুসলিম সমাজেও শিক্ষার প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে পণপ্রথার প্রসারও দেখা যাচ্ছে।

এখনো দুধে হাত পড়েনি। শতকরা সত্তরজন ভারতীয় এখনো নিরক্ষর। তাদের ধরেবেঁধে স্কুলে পাঠাবার পর দেখা যাবে যে তারাও চায় শিক্ষিত ভদ্রলোক হতে, শহরে বাস করতে ও দু' হাতে রোজগার করতে। সে সব পন্থা যদি বন্ধ করে দেওয়া হয় তবে তারাও ধর্মঘট করবে, কাজকর্ম বন্ধ করবে। তাদের মধ্যে যারা চরমপন্থী তারা বোমাও ফাটাবে। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের উপর হামলাও করবে। পরীক্ষার হলে নকল করার অধিকার দাবী করবে। পাশ সবাইকে করিয়ে দিতে হবে, ডিগ্রী সবাইকে পাইয়ে দিতে হবে, চাকরি সবাইকে জুটিয়ে দিতে হবে। পরে পণ ইত্যাদি ওরা আপনি আদায় করে নেবে।

একই ব্যাপার চলেছে ইউরোপে। সেখানে আর গ্রামে ফিরে যাবার প্রশ্ন ওঠে না। গ্রাম ক'টাই বা আছে! শহর এখন প্রকাণ্ড হাঁ করে গ্রামের দিকে তেড়ে যাচ্ছে। সেখানে সবাই চায় শহরে বা শহরতলীতে থেকে মোটর হাঁকিয়ে আপিসে বা কারখানায় যেতে, বাড়ী ফিরে টেলিভিসন দেখতে। ওরা উপরি নেয় না, বাড়তি খাটুনির জন্যে ওভারটাইম নেয়। ইউরোপেও আজকাল মাওবাদীর আবির্ভাব হয়েছে। সমাজসুদ্ধ সবাই বুর্জোয়া হয়ে যাচ্ছে দেখে এরা তাদের উদ্ধার করতে চায়। তা ছাড়া কতক লোক হিপি হয়ে গিয়ে প্রকারান্তরে প্রতিবাদ জানাচ্ছে এই বলে যে ধরেবেঁধে স্কুলে পাঠানো, কারখানায় পাঠানো, যুদ্ধে পাঠানো বস্তুগতভাবে লাভজনক হলেও নীতিগতভাবে লাভজনক নয়। যেখানে কলকারখানা ভিন্ন অন্য জীবনোপায় নেই সেখানে কলকারখানায় সবাই স্বেচ্ছায় যায় না। অনেকে নিরুপায় হয়েই যায়। সেটাও একপ্রকার ধরেবেঁধে পাঠানো। যুদ্ধে তো আইন করে ধরেবেঁধে পাঠানো হয়ই।

পাশ্চাত্য সভ্যতা যেমন অপরিমিত সুখস্বাচ্ছন্দ্যের সত্র খুলে দিয়েছে তেমনি তার অলিখিত শর্ত হচ্ছে সবাইকে কনফর্ম করতে হবে। এত বেশী কনফর্ম করলে মৌলিকতা বলে কিছু থাকে না। সমাজে বিদ্রোহের কারণ থাকলে ছাত্রদের মধ্যেও সঞ্চারিত হয়। ওরাই সকলের আগে প্রতিরোধ করে। পঠদ্দশার পর ছাত্ররা সবাই একভাবে না একভাবে নিযুক্ত হয়। জীবিকা সকলেরই জোটে। কিন্তু তাতেও তারতম্য আছে। বিজ্ঞানী বা টেকনোলজিস্টদের যা কদর সাহিত্যের বা ইতিহাসের বা দর্শনের কৃতী ছাত্রদের তা নয়। সিভিল সার্ভিসে যারা যায় তাদের চেয়ে অনেক বেশী পায় যারা সওদাগরী প্রতিষ্ঠানে যায়। শিক্ষিত মধ্যবিত্তরা সেদেশেও হালে পানী পায় না। অথচ তথাকথিত নিম্নশ্রেণীর আয় বেড়েই চলেছে। সঙ্গে সঙ্গে চালও। আর বড়লোকদের

তো কথাই নেই। তা হলে আর সামাজিক সাম্য কোথায় ?

এইসব কারণে সামাজিক ন্যায়ের প্রশ্ন ওঠে আর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণেও অনর্থ সৃষ্টি করে। সমাজের কাঠামো পাল্টানো মুখের কথা নয়। যুদ্ধ আর বিপ্লব মিলে সাহায্য না করলে পরিবর্তন যা হয়েছে তাও হতো না। বিপ্লব বলতে শিল্পবিপ্লবও বোঝায়। পাশ্চাত্ত্য সভ্যতা সচ্ছল হলেও সুস্থ নয়। ওরাও বলছে যে ওদের সমাজ অসুস্থ সমাজ। শিক্ষায় তার প্রতিফলন পড়বেই। তা ছাড়া জীবনের সর্বত্র প্রতিযোগিতা। প্রতিযোগিতায় এগিয়ে যাচ্ছে যত লোক হটে যাচ্ছে তার শতগুণ। এই যে 'ইঁদুরের দৌড়' এটা শিক্ষার ক্ষেত্রেও অশান্তি ডেকে এনেছে।

তা বলে আমাদের এদেশের মতো অরাজকতা নয়। আমরা এমন এক পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছি যা জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রের মতো শিক্ষাক্ষেত্রকেও করেছে অরাজক। বরঞ্চ আরো কিছু বেশীরকম অরাজক। কেরানীদের তবু একটা ভবিষ্যৎ আছে, ছাত্রদের কী ভবিষ্যৎ ? ভালো পাশ করলেও কি ভালো চাকরির স্থিরতা আছে ? তা ছাড়া পড়ানো যা হয় তা নমো নমো করে হয়। পরীক্ষাগুলো ভীতিপ্রদ ব্যাপার। ছাত্রদের বেলা যা জীবনমরণ সমস্যা অধ্যাপকদের বেলা তা ছেলেখেলা। খালি ছাত্রদেব দোষ দিয়ে কী হবে ? শিক্ষকদেরই অগ্রণী হয়ে ছাত্রদের অন্তর জয় করতে হবে। কিন্তু নাই দিয়ে নয়।

ইউরোপে পরিকল্পিত এই শিক্ষাব্যবস্থা একদা নির্দিষ্টসংখ্যক উচ্চবিত্ত ও মধ্যবিত্তের ছেলেদের জন্যেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। তারপর যখন ভারতে প্রবর্তিত হয় তখনো তেমনি উচ্চবিত্ত ও মধ্যবিত্ত ঘরের নির্দিষ্টসংখ্যক ছাত্রের জন্যেই। কেউ তখন কল্পনা করতে পারেনি যে স্কুলকলেজের সংখ্যা ও ছাত্রসংখ্যা এত বেশী বেড়ে যাবে। এমন কি এই শতাব্দীর গোড়ার দিকেও না। স্যার আশুতোষ তাঁর গ্রাজুয়েট তৈরির কারখানায় যে ওভার-প্রোডাকশন ঘটান অনেকে তার জন্যে তাঁর নিন্দাবাদ করেছে। এখন তো আরো অনেক কারখানা স্থাপন করা হয়েছে কাঁহা কাঁহা মুলুকে। সে সব কারখানা আরো বেশী মাল উৎপাদন করছে। আরো বেশী নিরেশ মাল। হিন্দী বাংলা তামিল লেবেল আঁটা। এই সর্বব্যাপী অতি উৎপাদন রোধ করবে কে ? সরকারেরই বা সে সাধ্য কোথায় ?

মাও ৎসে তুং এর একটা সমাধান দেখিয়েছেন। কিন্তু আমরা যদি তাঁর অনুসরণ করতে যাই ব্যর্থ হব। বিপ্লবী সরকার না হলে অতখানি কঠোর আর কেউ হতে পারে না। হতে গেলে গণেশ ওলটাবে। চেয়ারম্যান মাও শহর পছন্দ করেন না, ভদ্রলোক পছন্দ করেন না, শহুরে ভদ্রলোক উৎপন্ন যাতে হয় তার মুলোচ্ছেদ করতে চান। ছেলেরা চালান যায় গ্রামে আর সেখানে চাষ করতে শেখে। ঠিক যেন গান্ধীজীর বুনিয়াদী শিক্ষা। আমরা গান্ধীকে সরিয়েছি, মাওকে ডেকে আনতে পারিনে। অথচ অরাজকতায় দিশেহারা হচ্ছি। বোমার সঙ্গে মোকাবিলা করার বরাত দিয়েছি পুলিশের উপরে।

তলিয়ে ভাবতে হবে আমাদের। চোখ বুজে পশ্চিমের অনুসরণ করলে

চলবে না। একদিন অতি সঙ্গত কারণেই পশ্চিমের পদ্ধতি প্রবর্তন করেছিলুম। সে পদ্ধতি বাতিল করার মতো কারণ দেখছিনে। কিন্তু যে পদ্ধতি সমাজের ক্ষুদ্র একটি স্তরের পক্ষে ভালো সেই পদ্ধতিই যে সর্বসাধারণের পক্ষেও ভালো এ যুক্তি মেনে নিলে কোনো পক্ষেরই মঙ্গল হবে না। যে যেমন শিক্ষার যোগ্য সে তেমন শিক্ষা পাবে। যে কলেজে পড়ার যোগ্য নয় সে কলেজে যাবে না, আর কোথাও যাবে। যে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার যোগ্য নয় সে বিশ্ববিদ্যালয়ে যাবে না, আর কোথাও যাবে। কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা ও ছাত্রসংখ্যা সীমাবদ্ধ না করে উপায় নেই। যোগ্যতার টেস্ট স্কুলেও প্রয়োগ করতে হবে। যোগ্যাযোগ্য বিনিশ্চয় অপ্রীতিকর। কিন্তু তা না করলে যা হবে তা মাওবাদী ব্যবস্থা। মাঠে ময়দানেই পাঠাতে হবে অধ্যাপক ও ছাত্রদের। আমরা যদি মেরুদণ্ডের পরিচয় না দিই ইতিহাস সেই অভিমুখেই যাত্রা করবে। আজ আমরা নিজেরাই পরীক্ষাধীন। আমার মনে হয় অধিকাংশ ছাত্রকে ষোল বছর বয়সের পর যে কোনো প্রকার জীবিকায় ভর্তি করে দিতে হবে। উচ্চশিক্ষা তারা চায় তো অবসর সময়ে প্রাইভেট ছাত্ররূপে পাবে।

শিক্ষার আদি উদ্দেশ্য জ্ঞানার্জন, তার সঙ্গে সংযোজিত হয়েছে জীবিকার্জন। কালক্রমে জ্ঞানার্জনের চেয়ে বড় হয়েছে জীবিকার্জন। জ্ঞানবানরা এখন দেশ ছেড়ে বিদেশে প্রস্থান করছেন আরো উপার্জনের আশায়। ইংলণ্ডের বিদ্বানদের লক্ষ্য আমেরিকা। ভারতীয় বিদ্বানদের লক্ষ্য ইংলণ্ড, আমেরিকা, কানাডা। এব নাম ব্রেন ড্রেন। একে থামাতে গেলে বহু বিদ্বান ব্যক্তির উপর অবিচার করা হয়। অনেকে ভারতীয় শিক্ষাব্যবস্থায় যথাযোগ্য স্থান পেলে থেকে যেতেন। যথাযোগ্য দূরের কথা ন্যূনতম স্থানও পাননি। সে ব্যবস্থা এমন সব লোকের হাতে পড়েছে যাঁরা আপনজন ছাড়া আর কাউকে চান না। কাজেই আপনার স্থান খুঁজতে হয় বিদেশে অনাত্মীয় জনদের মধ্যে। মিলেও যায়। আমি এই ব্রেন ড্রেনের নিন্দা করি কোন মুখে! যখন দেখি যে যোগ্যতর উপেক্ষিত হচ্ছে, কম যোগ্য খুঁটির জোরে ঘাঁটি গেড়ে বসছে। আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থা এমন একটা আস্তাবল যাকে সাফ করতে হলে একাধিক হারকিউলিসের দরকার। এই শিক্ষাব্যবস্থাকে কেন্দ্রীয় শাসনের আমলে আনলে হয়তো সেটা সুগম হবে। অপরপক্ষে যেখানে যেটুকু ভালো কাজ হচ্ছে কেন্দ্রের চাপে সেটুকুরও ক্ষতি হতে পারে।

শিক্ষাব্যবস্থার স্তরে স্তরে এত অন্যায়, এত অবিচার জমেছে যে সময়মতো প্রতিকার না করলে এর নৈতিক ভিত্তিটাই ধ্বসে পড়বে। কেবলমাত্র ইনটেলেক-চুয়াল প্রয়োজন মেটানোর জন্যেই স্কুল কলেজ ইউনিভার্সিটি নয়। মনুষ্যত্বেরও চাহিদা মেটাতে হবে। মানুষ হিসাবে যে খাটো সে কি মানুষের ছেলেকে মানুষ করতে পারে! আর এই মানুষ করার কথাটাও উনবিংশ শতাব্দীতে প্রবর্তিত শিক্ষাব্যবস্থার অন্তর্গত ছিল ও প্রায়ই শোনা যেত। বিলেতের ডাক্তার আরনল্ড প্রমুখ প্রধান শিক্ষকরা বিদ্যাশিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে মনুষ্যত্বকেও যে গুরুত্ব দেন বাংলার রাজনারায়ণ বসু, রামতনু লাহিড়ী প্রমুখ প্রধানশিক্ষক তথা

অধ্যাপকরাও সেই গুরুত্ব দেন। আধুনিক শিক্ষা বিদেশ থেকে আমদানী করার সময় কিছু পরিমাণে মনুষ্যত্বও আমদানী করা হয়েছিল। সেটা ধীরে ধীরে ক্ষয়ে এসেছে বলে ভয় হয়। নইলে ছাত্রদের এমন আস্পর্ধা হতো না যে তারা মাস্টারদের অশ্লীলভাষায় গালাগাল দিত, অধ্যাপকদের তুইতোকারি করত।

ছাত্রদের এতকাল নিষ্ঠুরভাবে পেটানো হয়েছে, এবার তাদের হাতে পিটুনি খেতে হচ্ছে। ইতিহাসের পরিহাস। এখন প্রহসনটার ষোলকলা পূর্ণ হয় যদি পুলিশকে এর মধ্যে টেনে আনা হয়। অবশ্য না ডাকলেও আসতে বাধ্য তারা। কোথাও অপরাধ অনুষ্ঠিত হলেই পুলিশকে সেখানে যেতে হয় ও আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করতে হয়। এটা মধ্যযুগও নয়। বিশ্ববিদ্যালয়গুলিও গির্জা বা মন্দির নয়। তা হলেও আমি দুঃখিত।

জ্ঞানবৃক্ষের ফল

জ্ঞানবৃক্ষের ফল খেতে নিষেধ করা হয়েছিল আদিমানব আদমকে। নিষেধ অমান্য করে সে আর তার স্ত্রী স্বর্গভ্রষ্ট হয়। তা সত্ত্বেও তাদের সন্ততি পুরুষানুক্রমে জ্ঞানবৃক্ষের ফল খেয়ে আসছে। এবার স্বর্গে নয়, মর্ত্যে। পাঠশালায়, স্কুল-কলেজে, বিশ্ববিদ্যালয়ে। এখন এর পরিণাম কী হয়েছে শুনুন।

এক প্যারিস শহরেই চল্লিশ হাজার পুলিশ চিরস্থায়ীভাবে মোতায়েন হয়েছে, পাছে বিদ্যার্থীরা দু'বছর আগের মতো আবার এক বিপ্লব বাধায়। সেবার পুলিশের বিরুদ্ধে নালিশ ছিল যে পুলিশ খুব মেরেছে। এই দু'বছরে পুলিশের কোনো অন্তঃপরিবর্তন হয়েছে বলে শোনা যায় না। সেদিন এক ফরাসী ভদ্রলোককে হাতের কাছে পেয়ে জিজ্ঞাসা করি, "ফরাসী বিপ্লবের খবর কী? আবার কবে বাধছে?" হাসিখুশি মানুষটি এতক্ষণ রসিয়ে রসিয়ে কথাবার্তা বলছিলেন, কিন্তু আমার প্রশ্ন শুনে হঠাৎ গম্ভীর হয়ে যান, বলেন, "আর বাধবে না। পুলিশ ভয়ানক কড়া।"

বাঙালীদের সম্বন্ধে বলা হয় ওরা ভারতবর্ষের ফরাসী। তাই যদি হয় তবে কলকাতা হচ্ছে ভারতবর্ষের প্যারিস। স্বয়ং লেনিন নাকি একবার ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে, "বিপ্লব পিকিং থেকে প্যারিসে যাবে, কলকাতা হয়ে"। তাঁর ভবিষ্যদ্বাণী যে হেসে উড়িয়ে দেবার নয় তা তো আমরা আজ হাড়ে হাড়ে অনুভব করছি। সেইজন্যেই কি কলকাতা শহরে প্যারিসের মতো পুলিশ মোতায়েন শুরু হয়ে গেছে? এটাও কি সেইরূপ এক চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত?

প্যারিসে ছাত্রবিদ্রোহ অতদূর গড়াত না, যদি না কলকারখানার শ্রমিকরা তাদের পক্ষ নিয়ে ধর্মঘট করত। ইতিমধ্যে শ্রমিকদের অনেকরকম সুযোগসুবিধা দেওয়া হয়েছে। তার ফলে তারা আর ছাত্রদেয় সঙ্গে গোলে হরিবোল দিতে রাজী নয়। সেদিন একজন প্যারিসের শ্রমিকদের সম্বন্ধে লিখেছেন যে ওরা মোটরগাড়ী

টেলিভিসন সেট ইত্যাদি পেয়েছে, ছাত্রবিদ্রোহে ওরা যোগ দেবে না, তবে ওদের নিজেদের স্বার্থে দরকার হলে লড়বে। তার মানে পরের জন্যে ওরা পুলিশের মার খাবে না। খেলে নিজের জন্যে খাবে।

মার্কস মুনির উত্তরসুরী হচ্ছেন মারকুস মুনি। বিপ্লব বাধাবে কেটা, এই প্রশ্নের উত্তর মার্কস দিয়েছিলেন একভাবে, মারকুস দিচ্ছেন আরেকভাবে। মার্কসের আশাভরসা ছিল কলকারখানার শ্রমিকশক্তি। মারকুসের আশাভরসা স্কুল-কলেজের ছাত্রশক্তি।

এখন মুশকিল হলো এই যে ফরাসীরা আগেভাগে সতর্ক হয়ে নিবারণী ব্যবস্থা করে বসে আছে। পুলিশ সমস্তক্ষণ বন্দুকের ঘোড়ার উপর আঙুল রেখে তৈয়ার। যাদের হাতে বন্দুক দেওয়া হয়নি তাদের হাতে রবারের ট্রাঞ্চন। বন্দুকের নল থেকে ক্ষমতা আসে, এই মহাতত্ত্ব ওরাও জেনে গেছে। আর ওরাই তো বন্দুকপাণি। গণতান্ত্রিক সমাজে পুলিশকে কড়া হাতে সংযত করাটাই নিয়ম, কিন্তু যেমন দেখা যাচ্ছে যে-কোনো মুহূর্তে সংযমের বাঁধ ভেঙে যাবে, যদি পুলিশের উপর বোমা পড়ে বা শহরের শান্তি বিপন্ন হয়।

প্যারিসের মতো শহরেই এই ব্যাপার। আমেরিকার হালচালও ওরই উনিশ বিশ। গণতন্ত্রের নখ আছে, দাঁত আছে। স্বাভাবিক সময়ে সে পোষা বেড়াল। সংকটের দিন বনবেড়াল। তার চোখে ধুলো দিয়ে একদল ছাত্র বা একদল শ্রমিক রাতারাতি বিপ্লব বাধিয়ে ক্ষমতা কেড়ে নেবে এটা সম্ভবপর নয়। সে তার নখদন্ত ব্যবহার করবেই। করলে যে পরের বার ভোট পাবে না তাও নয়। প্যারিসের ছাত্রবিদ্রোহের পর ফ্রান্সে যে সাধারণ নির্বাচন হয় তাতে দ্য গলের পার্টিই জয়লাভ করে।

গণতন্ত্রী দেশে অধিকাংশ ভোটদাতার হাতেই ক্ষমতার চাবী। তাদের ভাঁওতা দেওয়া, ভয় দেখানো ইত্যাদি বাদ দিলে যেটা থাকে সেটা হলো তাদের স্বাধীন ইচ্ছায় ভোটদান। বুলেট নয়, ব্যালট সেখানে নিয়ামক। কেউ যদি বুলেটকেই নিয়ামক ভাবে তবে তাকে পুলিশের সম্মুখীন হতে হবে। তখন আর কান্নাকাটি করা চলবে না যে, "বড্ড লেগেছে"।

যে দেশে গণতন্ত্রের পাট নেই সে দেশে বিদ্রোহ বা বিপ্লব করলে জনসাধারণের অধিকার খর্ব করা হয় না। কিন্তু যেখানে জনগণ ভোটের অধিকার পেয়ে গেছে ও তার ব্যবহারও ভালো করে জেনেছে সেখানে বিদ্রোহ বা বিপ্লব জনগণের হাত থেকে তাদের একটি মূল্যবান অধিকার হরণ করে। ফরাসী নির্বাচকমণ্ডলী তাই দ্য গলকেই সমর্থন করেছে, তাঁর পার্টির উপরেই শাসনের বরাত দিয়েছে। ছাত্ররা পিটুনি খেলে সরকার জনসাধারণের আস্থা হারাবে না। জনমত সরকারের দিকেই যাবে। মাঝখান থেকে শায়েস্তা হবে ছাত্রের দল। জনতাকে সঙ্গে না নিয়ে ছাত্ররা এগোতে পারে না। অথচ জনতা তাদের সঙ্গে চলতে রাজী নয়।

সবাই আজকাল চালাক হয়ে গেছে। জনতাও কম চালাক নয়। জনতা যদি জানতে চায়, 'তোমরা বন্দুকের নলের ভিতর থেকে ক্ষমতা বার করে নিয়ে নিজেরাই ভোগ করবে তো? আমাদের তাতে কী লাভ? এই যে আমরা

ভোটাধিকার খাটিয়ে রাজা উজীর মারছি, একদলকে হটাচ্ছি, আরেক দলকে বসাচ্ছি এ অধিকার তো হারাব"—তবে এর কী জবাব দেবে ছাত্ররা ?

ছাত্ররা কেউ কাস্তেও ধরবে না, হাতুড়িও ধরবে না, চাষীর মেয়ে বিয়ে করবে না, মজুরের সঙ্গে বোনের বিয়ে দেবে না। এরা যদি স্বতন্ত্র একটা শ্রেণী হয়ে থাকে তো সেটা যে ক'বছর স্কুল কলেজে কাটে সেই ক'বছরের জন্যে। তারপরে এদের চাকরি-বাকরি বা ওকালতী ডাক্তারি অনুসারে এদের শ্রেণী নির্ণয় হয়ে যায়। তখন আর ছাত্রশক্তি নয়, উকীলশক্তি বা ডাক্তারশক্তি বা চাকুরেশক্তিই এদের শক্তি। শ্রমিক বা কৃষক শ্রেণীর সঙ্গে এইসব মধ্যবিত্ত ঘরের চাকুরে বা ডাক্তারদের এমন কী চিরস্থায়ী সম্পর্ক আছে যে এদের জন্যে শ্রমিক তার জীবিকা বিপন্ন করবে বা কৃষক তার প্রাণ বিপন্ন করবে ?

এটা একপ্রকার সেয়ানে সেয়ানে কোলাকুলি। কদাচ কখনো ছাত্রদের সঙ্গে শ্রমিকরা বা কৃষকরা একই আসরে নামতে পারে. কিন্তু কাজ ফুরোলেই যে যার নিজের স্বার্থ বুঝে নেয়। স্বার্থে স্বার্থে বিরোধও বাধতে পারে। ছাত্ররা স্বতন্ত্র একটা শ্রেণীও নয়, তারা যে শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত সে শ্রেণী ক্ষণকালের জন্যে সংগ্রামীব খাতায় নাম লেখালেও তার স্বার্থ শ্রমিক স্বার্থ বা কৃষক স্বার্থ নয়। শ্রেণীযুদ্ধ যদি সত্যি সত্যি বাধে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সঙ্গে সঙ্গে ছাত্ররাও কাটা পড়বে। কেউ বিশ্বাস করবে না যে তাদেব বাপ খুড়োরা শত্রু হলেও তারা শত্রু নয়, মিত্র। তাদের আত্মীয়গোষ্ঠী দৈত্যকুল হলেও তারা এক একটি প্রহ্লাদ। যেহেতু তারা ছাত্র। ছাত্রই বা কেমন করে তাদের বলা হবে যখন তারা ভুলেও পড়াশুনা করে না, কলেজে গেলে পড়াশুনার জন্যে যায় না, যায় ঝগড়া করতে, তাণ্ডব নাচতে !

এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে ছাত্রদের নিজস্ব কয়েকটি সমস্যা আছে যার জন্যে তারা অশান্ত। ছাত্র অশান্তি যেমন করে হোক দূর করতেই হবে। দূর করবে সমাজ, করবে রাষ্ট্র। কিন্তু নিজস্ব সমস্য আছে বলেই তারা শ্রেণীযুদ্ধ বা বিপ্লব করবে এটা একটা উৎকট দাবী। দাবী যদি ন্যায্যতার সীমা ছাড়িয়ে যায় তবে কারো কাছে সহানুভূতি পাবে না। তাদের শ্রেণী-মিতারাও একদিন তাদের পরিত্যাগ করবে। তখন মোহভঙ্গ অবশ্যম্ভাবী।

শিক্ষার পুনর্গঠন ফ্রান্সে অত্যাবশ্যক হয়েছিল। ছাত্রবিদ্রোহের ফলে পুনর্গঠনের দিকে সরকারের ও সমাজের নজর পড়েছে। ছাত্রবিদ্রোহ সে-হিসাবে ব্যর্থ হয়নি। এটাও সত্য যে সমাজের তথা রাষ্ট্রের পুনর্গঠন খুব বেশীদূর যাবে না। ছাত্ররা আবার বিদ্রোহী হবে। অপর পক্ষে এটাও মনে রাখতে হবে যে ফ্রান্সের মতো রক্ষণশীল সমাজ ছাত্রদের ভয়ে ভীত হবে না। এসব হলো সামঞ্জস্যের ব্যাপার। সামঞ্জস্য রাতারাতিও হয় না একতরফাও হয় না। যাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ তাদের স্বার্থও বিবেচনা করতে হবে। তাদের স্বার্থ তারা অংশত ছাড়তে পারে, সম্পূর্ণ ছাড়বে না। শিক্ষাসংস্কার তাই কিস্তিবন্দী ভাবে হতে পারে, সমাজের পরিবর্তনও তেমনি দফায় দফায়। বিপ্লব এর নাম নয়।

সমাজটা পচনধরা বুর্জোয়া প্রতিক্রিয়াশীল, অতএব ছাত্রদের উপরেই

ইতিহাস বরাত দিয়েছে যে তোমরাই এ-যুগে বিপ্লব আদি ঘটাবে, এটা একটা মোহ। যারা পড়াশুনায় ভালো তাদের মধ্যেই এ মোহটার প্রাদুর্ভাব বেশী। কারণ তারা জ্ঞানবৃক্ষের ফল খেয়েছে। আমাদের প্রেসিডেন্সী কলেজের সেরা ছেলেরাই নাকি ছাত্রশক্তির বৈপ্লবিক ভূমিকায় নিঃসন্দেহ। এতদিন পর্যন্ত আমাদের জানা ছিল যে বেশী পড়াশুনা করলে মানুষ সংশয়বাদী হয়, মানুষের ঝোঁকটা যায় তর্কে বিতর্কে। এখন দেখা যাচ্ছে মানুষ অন্ধবিশ্বাসীও হয়। বিশ্বাসে মিলায় বিপ্লব, তর্কে বহুদূরে।

এর মধ্যে ভরসার কথা এই স্কুল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় হামলার ভয়ে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। জ্ঞানবৃক্ষ থাকলে তো ছেলেরা জ্ঞানবৃক্ষের ফল ভক্ষণ করবে। আমাদের এই গরীব দেশে আমরা এক কলকাতা শহরেই চল্লিশ হাজার পুলিশ মোতায়েন করতে পারব না, তার চেয়ে পড়াশুনার পাট একেবারেই তুলে দেব। যার ইচ্ছা সে ঘরে মাস্টার রেখে পড়বে। অধ্যাপকরা সেইভাবেই প্রতিপালিত হবেন। যাঁরা উদ্যোগী পুরুষ তাঁরা টিউটোরিয়াল হোম খুলে অধ্যাপনা চালাতে পারেন। সেকালের চতুষ্পাঠীর আধুনিক সংস্করণ। তারপর কাব্যতীর্থ ব্যাকরণ-তীর্থ ইত্যাদি উপাধি বিতরণ করতে পারেন। তার জন্যে পরীক্ষার কী দরকার? পরীক্ষা পণ্ড করারও প্রয়োজন হবে না।

এখানে বলে রাখি যে সব দেশে শিক্ষাব্যবস্থা বিবর্তনশীল। কোথাও বৈপ্লবিক নয়। ছাত্রদের হাতে বিপ্লবের ভার কেউ দেয় না। এমন কি রুশ চীনও না। ছেলেরা আগে পড়াশুনা করবে, তার পরে কাজকর্ম করবে, কেউ কেউ রাজনীতিতে যোগ দেবে। সে রাজনীতি কোন কোন দেশে বৈপ্লবিক। আমাদের এদেশে আধা-বৈপ্লবিক। কিন্তু পড়াশুনা ছেড়ে কাজকর্ম ছেড়ে কেবলমাত্র বৈপ্লবিক রাজনীতি নিয়ে থাকা কোথাও কখনো লক্ষ লক্ষ ছাত্রের পক্ষে স্বাভাবিক হতে পারে না। ইতিহাসে আর কোথাও এর নজীর নেই।

সুতরাং ছাত্রশক্তি বলে সম্প্রতি যে তত্ত্ব প্রচারিত হচ্ছে সে তত্ত্ব ভিত্তিহীন। তার পেছনে সত্য যদি কিছু থাকে তবে সেটা এই যে ছাত্রদের আসরে নামতে দেখে শ্রমিকরাও আসরে নামবে, তা দেখে কৃষকরাও নামবে। কিন্তু শ্রমিকরা যদি সরে দাঁড়ায় তা হলে কী হবে? ছাত্রদের নিজেদের দৌড় কতদূর?

বিপ্লবের দাবী নিয়ে আসরে নামা প্যারিসে বন্ধ হয়ে গেছে, আর কোথাও বিপ্লবের ডাকে সাড়া পাওয়া যাচ্ছে না। বিপ্লব ছাড়া আরো একটা জিনিস আছে। বিবর্তন। বিবর্তন কোনোখানেই বন্ধ হয়ে যায়নি, বন্ধ হতে পারে না, বিবর্তনের উপর যাদের আস্থা আছে তারা সব দেশেই সব সময় সক্রিয়।

ভারত বিবর্তনের পথ বেছে নিয়েছে। এ পথ বিপ্লবের মতো রাতারাতি ফল দেয় না। সেই কারণে এ পথ মনকে নাড়া দেয় না, যৌবনকে দোলা দেয় না। কিন্তু এ পথ প্রতিবিপ্লবের বিভীষিকার হাত থেকে বাঁচায়। বিপ্লব হলে প্রতিবিপ্লবও অবশ্যম্ভাবী। গৃহযুদ্ধ তো বাধবেই, বিদেশী সৈন্যরাও এসে ঘাঁটি গেড়ে বসবে। যারা এদেশকে ভিয়েৎনামে পরিণত দেখলে খুশি হয় তারা কি কল্পনা করতে পারে না যে, এই কলকাতা শহরই একদিন বিদেশী ঘাঁটি হবে?

বাস্তববাদী যাঁরা তাঁরা সকলেই জানেন যে বিপ্লবের পরের দিন প্রতিবিপ্লবও হবে আর উভয়ের মল্লযুদ্ধে লক্ষ লক্ষ মানুষের মহতী বিনষ্টি ঘটবে। সেই মহতী বিনষ্টিও একপ্রকার জুয়াখেলা। খেলার শেষে হয়তো দেখা যাবে যে প্রতিবিপ্লবই জয়ী হয়েছে। অমন করে লক্ষ লক্ষ মানুষের প্রাণ নিয়ে জুয়াখেলার অধিকার কি কোনো একটি দলের বা কোনো একটি শ্রেণীর আছে? অবশ্য এমন এক পরিস্থিতির উদ্ভব হতে পারে যখন লক্ষ লক্ষ মানুষ একভাবে না একভাবে মরবেই। তেমন এক পরিস্থিতিতে বিভিন্ন বিকল্পের মধ্যে বিপ্লবও একটা বিকল্প। জাপান যেদিন বর্মা দখল করে ভারতের দিকে পা বাড়ায় সেদিন যদি আমাদের বিপ্লবীরা বিপ্লব বাধাতেন তা হলে লক্ষ লক্ষ মানুষ মরত, কিন্তু সে মরণ অবশ্যম্ভাবী বলে মেনে নেওয়া সহজ হতো। আমার জীবনে সেই একটি-বার আমি সত্যিকার বৈপ্লবিক পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়েছি। সেদিন এগিয়ে আসেন গান্ধীজী। মার্কস্ কিংবা মারকুস না।

তেমন একটা বৈপ্লবিক পরিস্থিতিকে হাতছাড়া হতে দিয়ে অসময়ে বিপ্লবের আবাহন করলে কি বিপ্লব আসবে? যদি আসেই তবে প্রতিবিপ্লবও আসবে। লক্ষ লক্ষ মানুষ মরণের মুখে দাঁড়াবে। তখন কে জানে তারা কোন্ দিকে ঝাঁপ দেবে! প্রতিবিপ্লবের দিকেও ঝাঁপ দিতে পারে। যদি তাতে প্রাণ বাঁচে। এত বড়ো একটা দেশের সমস্তটাই রাতারাতি লাল হয়ে যাবে না। মানচিত্রের কতক অংশ লাল হলেও বাকী অংশ হলদে কালো হওয়া সম্ভবপর। পশ্চিমবঙ্গ কোণঠাসা হয়ে বেশী দিন বিপ্লব রক্ষা করতে পারবে না। যদি না চীন সঙ্গে সঙ্গে আক্রমণ করে ও সে-আক্রমণ অপ্রতিরোধ্য হয়। তেমন কিছু ঘটলে অন্যরাও আক্রমণ করবে ও দেশ হবে যুদ্ধক্ষেত্র। ভগবান আমাদের সুমতি দিন।

আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা

আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা যুগ যুগ ধরে বিবর্তিত হয়নি, ঊনবিংশ শতাব্দীতে প্রবর্তিত হয়েছে। প্রবর্তকদের মধ্যে যেমন বেসরকারী ইউরোপীয়রা ছিলেন, তেমনি ছিলেন যুগসচেতন ভারতীয়রা। সরকার এ বিষয়ে মনঃস্থির করবার পূর্বেই পাশ্চাত্ত্য স্কুল কলেজ বেসরকারী উদ্যোগে স্থাপিত হয়।

সেকালে হিন্দুর ছেলেরা যেত পাঠশালায়, তার পরে তাদের মধ্যে যারা ব্রাহ্মণ বা বৈদ্য তারা যেত চতুষ্পাঠীতে বা টোলে। আর মুসলমানের ছেলেরা যেত মক্তবে, তার পরে মাদ্রাসায়। মুসলমানদের মক্তব ও মাদ্রাসার দুয়ার হিন্দুর ছেলেদের জন্যে খোলা থাকত। তারা আরবী ফারসী শিখে সরকারী চাকরির শরিক হতো। এইরূপ উদারতা হিন্দু শিক্ষায়তনগুলির ছিল না। মুসল-মানদের প্রতি উদার হওয়া দূরে থাক হিন্দু সমাজের তথাকথিত নিম্নবর্ণের উপর তারা উদার হয়নি। পাঠশালা অবধিই ছিল তথাকথিত নিম্নবর্ণের দৌড়।

মুসলমানরা উদার হলেও তাদের মাদ্রাসা ও মক্তবগুলিতে যা শেখানো হতো তা টোল চতুষ্পাঠীগুলির মতোই সেকেলে। নতুন বিদ্যা, নতুন জ্ঞান, নতুন চিন্তা, নতুন বিচার তাদের কাছে তেমনি বর্জনীয় ছিল যেমন হিন্দুদের কাছে। শিক্ষার সুযোগ যারা পেতো তারা মধ্যযুগেই নিঃশ্বাস নিত, আধুনিক যুগে নয়। অথচ আধুনিক যুগ ইউরোপে আরম্ভ হয়ে যায় পঞ্চদশ শতাব্দীতেই। তার মানে চার শতাব্দী কাল ভারতের টোল চতুষ্পাঠী মাদ্রাসা ইমামবাড়া মধ্যযুগেরই মানসলোকে অবস্থান করছিল।

পরিবর্তনের প্রয়োজন ছিল, কিন্তু টোল চতুষ্পাঠী মাদ্রাসা ইমামবাড়াকে আধুনিক শিক্ষার আয়তনে পরিণত করা কারো সাধ্য ছিল না। সেইজন্য আধুনিক শিক্ষার আয়তন হিসাবে পাশ্চাত্ত্য আদর্শের স্কুল কলেজ প্রবর্তন করাই শ্রেয় বিবেচিত হয়। যার ইচ্ছা সে প্রাচীন আদর্শের শিক্ষায়তনে যাক, যার ইচ্ছা সে আধুনিক আদর্শের শিক্ষায়তনে যাক। এই মনোভাব পরে সরকারী নীতিতেও প্রতিফলিত হয়। সরকার প্রাচীনপন্থীদের জন্যে কলকাতা মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন, সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন। কিন্তু কলকাতার হিন্দু কলেজের প্রতিষ্ঠাতা সরকার নন, বেসরকারী ভারতীয় ও ইউরোপীয়রা। সরকারের শিক্ষানীতি পাশ্চাত্ত্য আদর্শের দিকে মোড় নিতে আরো সময় লাগে।

সরকারের পক্ষপাত গোড়ায় পাশ্চাত্ত্য শিক্ষাব্যবস্থার উপর তো ছিলই না, বরঞ্চ তার বিপরীত। সরকারী মহলের মতে ভারতীয়দের পক্ষে ভারতীয় ব্যবস্থাই ভালো, নইলে খরচ বাড়ে। পাশ্চাত্ত্য ব্যবস্থা অপেক্ষাকৃত ব্যয়বহুল। তা ছাড়া পাশ্চাত্ত্য আলোক পেয়ে তো পেট ভরবে না, বিদ্যার্থীরা দু'দিন বাদে কর্মপ্রার্থী হবে। তাদের জন্যে তো ইংরেজরা নিজ নিজ পদ ছেড়ে দেবে না, নতুন নতুন পদ সৃষ্টি করতে হবে। তার প্রয়োজন কোথায়? সঙ্গতিই বা কোথায়? দিতে পারা যায় এক কেরানীর পদ। তার জন্যে না হয় গোটাকতক স্কুল খুলে দেওয়া যাবে, কিন্তু কলেজ কেন? কলেজের পড়ুয়াদের অভুক্ত রাখলে তারা কি অশান্ত হবে না?

সরকার পরে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট প্রভৃতি পদ সৃষ্টি করে দেশীয়দের উচ্চাভিলাষ পূর্ণ করেন। পরে সরকারের বিভাগ সংখ্যা বেড়ে যায়। ডাকঘর প্রভৃতির জন্যে লোকের দরকার হয়। ঊনবিংশ শতাব্দী জুড়ে যেসব উদ্ভাবন ইউরোপের চেহারা বদলে দেয় ভারতেও তাদের প্রবর্তন হয়। রেল, স্টীমার, ট্রাম, টেলিগ্রাফ, কলকারখানা, কয়লার খনি, ইলেকট্রিক পাওয়ার প্রভৃতি মিলে দেশের চেহারা বদলে দিলে বহু শিক্ষিত ব্যক্তির কর্মসংস্থান হয়।

কাজেই যথাকালে বিশ্ববিদ্যালয়ের আবির্ভাব হয়। ও জিনিস ভারতবর্ষে কোনো এক কালে ছিল, কিন্তু নালন্দা ও বিক্রমশিলার পতনের পর অন্তর্হিত হয়। আধুনিক অর্থে বিশ্ববিদ্যালয় বলতে যা বোঝায় তা ধর্মের আঁচলঘেঁষা নয়, বরং তার বিপরীত। ধর্ম আর দর্শন একই বিষয় নয়, এই উপলব্ধি আসে ষোড়শ শতাব্দীতে। থিওলজির চেয়ার থেকে স্বতন্ত্র এক চেয়ার সৃষ্টি হয়। সেটা ফিলসফির চেয়ার। একবার ফিলসফিকে স্বতন্ত্র স্বীকৃতি দেবার পর

থিওলজির চেয়ে ফিলসফিই হয়ে ওঠে আরো আকর্ষণীয় বিষয়। ফিলসফির থেকে আসে ন্যাচারাল ফিলসফি বা সায়েন্স। সায়েন্স ক্রমে ক্রমে বহুভাগে বিভক্ত হয়। যে কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে দর্শন বিজ্ঞানের অধ্যয়ন অধ্যাপনার ব্যবস্থা রাখতে হয়।

ইউরোপীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে থিওলজিও থাকে, তবে ঊনবিংশ শতাব্দীতে যখন রাষ্ট্রের উপরে স্কুল কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনার দায় উত্তরোত্তর বর্তায় তখন রাষ্ট্র বিশেষ কোনো একটি ধর্মবিশ্বাসের সঙ্গে একাত্ম হতে কুণ্ঠিত হয়। যে যার সাম্প্রদায়িক বিদ্যালয় বা মহাবিদ্যালয় পরিচালনা করতে পারে, কিন্তু রাষ্ট্রীয় বিদ্যালয় বা মহাবিদ্যালয় হবে অসাম্প্রদায়িক বা ধর্মনিরপেক্ষ। সেখানে নাস্তিক বা অজ্ঞেয়বাদীও পড়তে বা পড়াতে পারবে। বিশ্ববিদ্যালয় যদি রাষ্ট্রীয় হয় তো তার ছাত্র ও অধ্যাপকদের ধর্মমতে বা বিবেকে হস্তক্ষেপ করা চলবে না। ইউরোপে এসব পরিবর্তন একদিনে আসেনি, আসতে বহু শতাব্দী লেগেছে।

ভারতে যখন পাশ্চাত্ত্য আদর্শের আধুনিক বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয় তখন ঊনবিংশ শতাব্দী তার মধ্যগগনে। এ শতাব্দী শিক্ষাকে ধর্মের আঁচলমুক্ত করে দর্শন বিজ্ঞানের সঙ্গে একসূত্রে গাঁথে। তারপর তাকে করে বহুজন হিতায় চ। মুষ্টিমেয় ধর্মযাজক বা অভিজাত সন্তানের জন্যে নয়, তাদের চেয়ে সংখ্যায় বেশী অথচ অন্যের চেয়ে সংখ্যায় কম। উচ্চমধ্যবিত্তের জন্যেও নয়। সাধারণের জন্যে। এমন কি শ্রমিক কৃষকদের জন্যেও। তবে কার্যত সাধারণ বলতে বোঝায় মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলে। এদের সংখ্যা নেহাৎ কম নয়, এরাই স্কুল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় ভরিয়ে ফেলে। শতাব্দীর শেষে দেখা যায় ভারতেও সেই একই অবস্থা। শিক্ষায়তন-গুলি মধ্যবিত্তদের দিয়ে ঠাসা। ইংরেজী মাধ্যমের কঠোর প্রতিবন্ধককেও তারা অতিক্রম করেছে। সেটা যদি না থাকত, তার বদলে থাকত মাতৃভাষার মাধ্যম তা হলে আরো অনেক বেশী স্কুল কলেজ স্থাপন করতে হতো, আরো বেশী পড়ুয়া বেকার হতো। তাদের সকলের জন্য কর্মসংস্থান সম্ভব হতো না।

মাতৃভাষার মাধ্যম আগেকার দিনে ইউরোপেও ছিল না কি? না, লাটিন ছিল শিক্ষার মাধ্যম ইউরোপের সর্বত্র। জার্মানরা জোর করে মাতৃভাষা চালিয়ে দেয়। তারপর থেকে ফরাসী প্রভৃতি জাতে ওঠে। তার জন্যেও কয়েক শতাব্দী লেগে যায়। উপযুক্ত পাঠ্যপুস্তকের অভাব এর একটা কারণ। সব শিক্ষায়তনে একই রকম স্টাণ্ডার্ড চাই, এটাও আরেকটা কারণ। ইউরোপের এক দেশের ছাত্র অন্যান্য দেশে গিয়ে পড়াশুনা করত, অধ্যাপকরাও ঘুরে ঘুরে পড়াতেন। লাটিন মাধ্যম ছিল বলেই এটা সম্ভব ছিল। মাতৃভাষা মাধ্যম হওয়ায় ছাত্রদের বিদেশ যাত্রা কমে যায়, অধ্যাপকরাও স্বদেশে আবদ্ধ হন। এতে ইউরোপীয় মানসিকতা হ্রাস পায়, তার বদলে আসে জার্মান বা ইংরেজ বা ফরাসী মানসিকতা। ফলে ইউরোপের যেটুকু ঐক্য ছিল সেটুকুও বিপন্ন হয়।

একই সমস্যার উদ্ভব হয়েছে এদেশে। হিন্দীভাষীরা জোর করে হিন্দী মাধ্যম চালিয়ে দিয়েছে। তামিলভাষীরা পেছিয়ে থাকছে না। বাংলা, ওড়িয়া,

অসমীয়া প্রভৃতি কেউ বাদ দিচ্ছে না। উপযুক্ত পাঠ্যপুস্তকের অভাব না থাকলে এ প্রক্রিয়া আরো দ্রুত হতো। কিন্তু এর নীট ফল হবে ছাত্র ও অধ্যাপকদের এক প্রদেশ থেকে অপর প্রদেশে যাওয়া বন্ধ। যদি না ইংরেজী মাধ্যমও সঙ্গে সঙ্গে চলে বা হিন্দী মাধ্যমও সঙ্গে সঙ্গে প্রচলিত হয়। ভারতের ঐক্যের খাতিরে হিন্দীর প্রয়োজন যদি থাকে ইংরেজীরও প্রয়োজন থাকবে, কারণ ইংরেজী মাধ্যমে যত কিছু শেখা যায় হিন্দী মাধ্যমে ততকিছু নয়।

জগতের জ্ঞানবিজ্ঞান প্রতিদিনই বেড়ে যাচ্ছে। তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে দৌড়নোর সাধ্য ভারতের ক'টা ভাষারই বা আছে! পাঠ্যপুস্তক ফী বছরই বাসি হয়ে যায়। এত বই লিখবেই বা কে, ছাপবেই বা কে, কিনবেই বা কে? মাতৃ-ভাষার পক্ষপাতীরা যদি এসব প্রশ্নের উত্তর না দিতে পারেন তবে মাতৃভাষার দৌড় উচ্চতম স্তরে পৌঁছনোর আগেই থেমে যাবে। তা না হলে যা হবে তা নিচু মানের শিক্ষা। যারা ডিগ্রী পাবে তাদের ডিগ্রীর মান থাকবে না।

ইতিমধ্যে সমাজের অন্যান্য শ্রেণীর ছেলেরাও, সমস্ত শ্রেণীর মেয়েরাও শিক্ষায়তনে প্রবেশ করেছে। তাদের নিষেধ করাও যায় না, কারণ বিশ্ববিদ্যালয় বলতে যেমন সর্ব বিদ্যা বোঝায় তেমনি সর্বজন যার অধিকারী সে বিদ্যাও বোঝায়। আগেকার দিনে অধিকাংশ মানুষকে অনধিকারী বা নিম্ন অধিকারী বলে বাইবে রাখা হয়েছিল। একালের শ্রীক্ষেত্রে সকলেই সম অধিকারী। পুরীর জগন্নাথ মন্দিরে এখনো কতক লোক অচ্ছুৎ। তাদের প্রবেশ মানা। কিন্তু পৃথিবীর বিশ্ববিদ্যালয়গুলো সকলের কাছেই মুক্তদ্বার। কিন্তু তার দুটি শর্ত। প্রত্যেককে পরীক্ষা করে নেওয়া হবে। পরীক্ষায় পাশ না করতে পারলে দরজা বন্ধ। পড়াশুনার ব্যয় বহন করতে হবে। না পারলে ছাত্রবৃত্তি যোগাড় করতে হবে। না পারলে সঙ্গে সঙ্গে চাকরিবাকরি জোটাতে হবে। না পারলে বিশ্ববিদ্যালয়ে স্থান হবে না। অত্যন্ত নির্মম শর্ত।

আজকাল বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা বাড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে দুনিয়ার সব দেশেই। তা সত্ত্বেও যারা বাইরে থেকে যাচ্ছে তাদের জন্যে রেডিও টেলিভিসন বা করেস-পণ্ডেন্স কোর্স প্রবর্তিত হচ্ছে। বাড়ী বসেই উচ্চশিক্ষা পাওয়া সম্ভব হচ্ছে। যারা ডিগ্রী চায় তারা পরীক্ষা দিয়ে ডিগ্রীও পাচ্ছে। তবে বিশ্ববিদ্যালয়ে তো আমরা শুধু ডিগ্রীর জন্যে যাইনে। যাই বড়ো বড়ো অধ্যাপকের সংস্পর্শে এসে তাঁদের দীপশিখা থেকে আমাদের দীপগুলি জ্বালিয়ে নিতে। যাই সমবয়সীদের সংস্পর্শে এসে তাঁদের কাছ থেকেও কিছু শিখতে ও তাঁদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় নেমে নিজেদের যোগ্যতা যাচাই করে নিতে। যে ক'টি বছর বিশ্ববিদ্যালয়ে কাটাই সে ক'টি বছর জীবনের স্মরণীয় সময়। জীবিকার জন্যে একটা ছাপ চাই, এটা সত্য। কিন্তু আরো বড়ো সত্য, জীবনের জন্যেও একপ্রকার প্রস্তুতি চাই যা বিশ্ববিদ্যালয় ভিন্ন আর কোথাও হয় না। একদিন হয়তো জীবিকার জন্যে অন্য কোনো ব্যবস্থা হবে, যেমন কারিগরি শিক্ষায়তন। সেইভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপর থেকে চাপ কমবে। তবু বিশ্ববিদ্যালয়ের আকর্ষণ কমবে না। জীবনের সিংহদ্বার হচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয়।

বিত্তের জন্যে বিদ্যা নয়, বিদ্যার জন্যেই বিদ্যা। প্রাচীনকাল থেকে আজ অবধি এটা স্বীকৃত হয়ে এসেছে। ঋষিদের আশ্রমে যারা যেত তারা বিদ্যার জন্যেই যেত, বিত্তের জন্যে নয়। সাধু-সন্ন্যাসীদের মঠ বাড়ীতে যারা যেত তারাও যেত বিত্তের জন্যে নয়, বিদ্যার জন্যেই। পণ্ডিতদের টোল চতুষ্পাঠীতে যারা যেত তাদেরও ছিল বিদ্যার উপরে দৃষ্টি। এটা কেবল ভারতের নয়, ইউ-রোপেরও ঐতিহ্য। ইউরোপে যখন বিদ্যার বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যাস্থানেরও বিবর্তন হয়, স্কুল কলেজ তথা ইউনিভার্সিটিতে ধর্মের পরিবর্তে মানবিকতার সঞ্চার হয়, বিদ্যার্থীদের পঠনীয় হয় গ্রীক সাহিত্য দর্শন রাজনীতি প্রভৃতি উপেক্ষিত বা অবজ্ঞাত বিষয়, শিক্ষণীয় হয় আধুনিক বিজ্ঞান তখনো সেই ঐতিহ্যের জের টেনে চলা হয়। যে ঐতিহ্যের মূলকথা বিদ্যার জন্যেই বিদ্যা।

অথচ এটাও সকলের জানা যে অধ্যয়নপর্ব শেষ হলে অর্জনপর্ব শুরু হয়। আগেকার দিনে যাকে বলত ব্রহ্মচর্যের পর গার্হস্থ্য এখনকার দিনে তাকে বলে শিক্ষার পর জীবিকা বা কেরিয়ার। এমন কোন্ ছাত্র আছে যে সারাজীবনটা জ্ঞানাঙ্গনেই কাটিয়ে দিতে চায়, একদিন না একদিন কর্মাঙ্গনে প্রবেশ করতে চায় না? যারা জ্ঞানাঙ্গনেই থেকে যেতে চায় তারাও চায় অধ্যয়ন থেকে অধ্যাপনা। অন্ততপক্ষে ফেলোশিপ। একালের বিশ্ববিদ্যালয়ের মুখ্য ভাবনা যদিও বিদ্যার সংরক্ষণ, বিকাশ ও দান তা হলেও গৌণ ভাবনা হচ্ছে বিদ্যার্থীদের জীবিকার ক্ষেত্রে যা কাজে লাগতে পারে তেমন কিছু জোগানো। তেমন কিছুর অন্য নাম হচ্ছে ডিগ্রী বা ডিপ্লোমা বা সার্টিফিকেট। অতি বড়ো বিদ্বানকেও লোকে বিদ্বান বলে স্বীকার করবে না যদি না তাঁর গলায় থাকে একগাছা পৈতে। অর্থাৎ ডিগ্রী বা ডিপ্লোমা বা সার্টিফিকেট। একালে এইটুকু পরিবর্তন হয়েছে যে জাতিবর্ণ নির্বিশেষে যে কোনো বিদ্যার্থী বিশ্ববিদ্যালয়ের হাত থেকে উপ-বীত গ্রহণ করতে পারে, যদি পরীক্ষায় সফল হয়।

পরীক্ষা বলে এই যে আপদটি এটি মানব ইতিহাসে অপেক্ষাকৃত নতুন। তবে একেবারে অজানা নয়। ক্ষত্রিয়দের জন্যে ছিল অস্ত্রপরীক্ষা। ব্রাহ্মণদের নানাভাবে গুরুর মনস্তুষ্টি বিধান করতে হতো। মহাভারতে সে সব উপাখ্যান আছে। কারিগর শ্রেণীর ছেলেরাও শিক্ষানবীশী করে হাতের কাজের পরীক্ষা দিত। একেবারে আনাড়ি কেউ নয়, চাষীর ঘরের ছেলেরাও নয়। কিন্তু ইদানীং একটা ধুয়ো উঠেছে যে পরীক্ষা বলে একটা আপদ আদৌ থাকবে না, থাকলে সেটা হবে নামে মাত্র পরীক্ষা। তাও একজন আধজনের ক্ষেত্রে নয়, শত সহস্র বিদ্যার্থীর ক্ষেত্রে। এই প্রশ্নের সম্যক মীমাংসা না হলে বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থাটাই ভেঙে পড়বে। যারা তৃতীয় বিভাগেও পাশ করার যোগ্য নয় তাদের জন্যে কলেজের সংখ্যা বাড়াতে হবে। যারা পাশ কোর্সের গ্রাজুয়েট হবারও অযোগ্য তাদের জন্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা বাড়াতে হবে। সেখান থেকে একটা ছাপ নিয়ে বেরিয়েই বা তারা করবে কী? কর্মক্ষেত্রে তাদের ক'জনেরই বা সুবিধা হবে? মাঝখান থেকে ডিগ্রীর কদর কমে যাবে। সত্যিকার বিদ্বান যারা তাদের বাজারদর নেমে যাবে।

সমস্যাটা কেবল পশ্চিমবঙ্গে নয়, কেবল ভারতেও নয়, প্রায় সব দেশেই দেখা দিয়েছে। সেদিন তানজানিয়া ফের্তা এক অধ্যাপকের মুখে শুনলুম সেদেশে চমৎকার একটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা হয়েছে, কিন্তু ছাত্রসংখ্যা পাঁচশো অতিক্রম করতে দেওয়া হবে না। বলা বাহুল্য সেই পাঁচশো জনকে পরীক্ষা করে নেওয়া হবে। তা হলে আদ্য পরীক্ষার ফলাফলের উপরেই উচ্চতর শিক্ষা নির্ভর করছে। অন্ত্য পরীক্ষার উপরেই নির্ভর করছে বড়ো বড়ো চাকরি। শতখানেক বছর আগে এদেশেও সেই রীতি ছিল। বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্ত্য পরীক্ষায় যারা উত্তীর্ণ হতো তারা অল্পসংখ্যক ছিল বলেই সঙ্গে সঙ্গে বড়ো বড়ো চাকরি পেয়ে যেত। আর নয়তো ওকালতী শিক্ষকতা করত।

সরকারী চাকরি, ওকালতী প্রভৃতির সংখ্যা ও আয় চিরকাল সমান থাকে না। একদা হয়তো সকলের জন্যে যথেষ্ট পরিসর ছিল, এখন তা নেই। হয়তো সমাজের পরিবর্তনের ফলে আবার যথেষ্ট পরিসর জুটবে! সমাজতন্ত্রী দেশগুলি সেরূপ আশা দিচ্ছে। তাদের দেখাদেখি ধনতন্ত্রী দেশগুলিও অধিকতর সুযোগ সৃষ্টি করছে। সমস্যাটা এক এক দেশ এক এক ভাবে সমাধান করছে। চীনদেশে তো শুনেছি বছর তিনেক আগে সাংস্কৃতিক বিপ্লবের ঝড়ে সব ক'টা বিশ্ববিদ্যালয়ই দরজা বন্ধ করেছে। এখন আবার একে একে খুলছে। কিন্তু নিয়ম করে দেওয়া হয়েছে যে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হতে হলে তার আগে তিন বছর থেকে পাঁচ বছর হয় কৃষিক্ষেত্রে নয় কলকারখানায় হাতে কলমে কাজ করা চাই। বুদ্ধিজীবী বলে কাউকে রেয়াৎ করা হবে না। মান্দারিন নামক সেই যে শ্রেণীটা সারা ইতিহাস জুড়ে চীনদেশে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল সেটাকে চাষী মজুরের সমান স্তরে নামিয়ে অসম প্রতিযোগিতার সম্মুখীন করা হবে। সে প্রতিযোগিতায় চাষী মজুরদেরই জিৎ হবে।

ইতিহাস কোন্ দিকে যাচ্ছে তা যদি মনে রাখি তো সময়ে সাবধান হব। বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থা যদি আপনার ভাবে আপনি ভেঙে পড়ে তা হলে তার শূন্যতা পূরণের জন্যে এবার প্রবর্তিত হবে পাশ্চাত্য নয়, চৈনিক শিক্ষাব্যবস্থা। পূর্বেও আমাদের দেশে একটা শূন্যতা দেখা দিয়েছিল, নইলে পাশ্চাত্য ব্যবস্থা প্রবর্তিত হতোই বা কেন? নালন্দা বিক্রমশীলার ধ্বংসের ইতিবৃত্ত আমরা ঠিক জানিনে। তবে সেখানকার ছাত্রদের সংখ্যা এত বেশী ছিল আর তাদের খাওয়া পরার এমন এলাহী বন্দোবস্ত ছিল যে চারদিকে অবস্থিত শত শত গ্রামকে তার জন্যে দোহন করা হতো। দেবোত্তর ও ব্রহ্মোত্তর সম্পত্তির মতো সেগুলিও ছিল শোষণমূলক। মধ্যযুগের মঠবাড়ীও তাই। বৌদ্ধ শাসনের পর যখন মুসলিম শাসন আসে তখন সে ব্যবস্থা আপনি রহিত হয়ে যায়। চীনদেশেও শাসন পরিবর্তনের ফলে ব্যবস্থার পরিবর্তন হয়েছে। এদেশেও হতে পারে।

বিদ্যার অধ্যয়নে ও অধ্যাপনায় যারা নিযুক্ত সব দেশে ও সব যুগেই তারা ছিল ও থাকবে। জ্ঞান বিনা কোনো সমাজ সভ্য সমাজ হতে পারে না, জ্ঞানের উন্নতিতেই সমাজের উন্নতি। সেইজন্যে সব সমাজেই এমন কতক লোক থাকে যাদের কাজ হচ্ছে লব্ধ জ্ঞানের সংরক্ষণ, বিকাশ ও বিতরণ। অমনি করে একের

জ্ঞান অপরের মধ্যে সঞ্চারিত হয়, এক পুরুষের জ্ঞান অপর পুরুষের মধ্যে। অমনি করে জ্ঞানের পরম্পরা অভগ্ন হয়। তারপর আরো একটি কাজ তাদের উপর বর্তায়। সমাজকে নেতৃত্ব দিয়ে নতুন নতুন আন্দোলনের জন্ম দেওয়া। মধ্যযুগের ইউরোপে এঁরা না থাকলে রেনেসাঁস হতো না। অষ্টাদশ শতাব্দীর ফ্রান্সে এঁরা না থাকলে এনলাইটেনমেণ্ট হতো না। ফরাসী বিপ্লবটাই হতো না। এদেশেও সারা ঊনবিংশ শতাব্দী জুড়ে যে জাগরণটি ঘটেছে সেটির মূলেও এঁরাই। সুতরাং এই শ্রেণীটিকে মান্দারিন বলে বা বুর্জোয়া বলে নিপাত করা বা কায়িক শ্রমের প্রতিযোগিতার ভিতর দিয়ে বাছাই করা সমাজের পক্ষে শ্রেয় নয়।

অথচ এটাও তো শ্রেয় নয় যে চার পাঁচ বছর বয়স থেকে চব্বিশ পঁচিশ বছর বয়স পর্যন্ত প্রত্যেকটি মানুষকে উৎপাদনের ক্ষেত্র থেকে সরিয়ে রেখে অপরের উৎপাদনভোগী করে তোলা হবে। বিদ্যার্থীর সংখ্যা যেখানে পাঁচশো হলে সমাজের ক্ষতি হয় না সেখানে পাঁচ লাখ হলে নিশ্চয়ই ক্ষতি হয়। এই পাঁচ লাখ কি সত্যিই জ্ঞানের জন্যে এসেছে, না উপবীতের জন্যে, উপবীত দেখিয়ে মোটা দক্ষিণার জন্যে? এদের বিরাট বোঝাটি তো শেষ পর্যন্ত পড়ে চাষী মজুর কারিগরের ঘাড়ে। তারাই বা সহ্য করবে কেন? তাদের স্বার্থ প্রাথমিক শিক্ষা, বড়জোর মাধ্যমিক শিক্ষা। উচ্চতর শিক্ষায় তাদের প্রত্যক্ষ স্বার্থ কতটুকু? যদি না তাদের ছেলেরা উচ্চাভিলাষী হয়।

উপভোগের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে উৎপাদন যদি ক্রমাগত বাড়তে না থাকে তা হলে শিক্ষাবিস্তারের অবশ্যম্ভাবী পরিণাম শিক্ষিত বেকারসংখ্যা বৃদ্ধি ও যারা বেকার হতে বাধ্য তাদের উচ্ছৃঙ্খলতা ও বৈনাশিকতা। দুর্গতি থেকে আসে দুর্মতি, দুর্মতি থেকে দুর্গতি। এটা একপ্রকার দুষ্ট বৃত্ত। এতে বেকারদেরও আখেরে মঙ্গল হবে না। একদিন দুষ্ট বৃত্ত ভেদ করতে হবেই। চীনের চেয়ারম্যান তার দৃষ্টান্ত দেখিয়েছেন। ভারতের মহাত্মা গান্ধী দেখিয়েছিলেন অপর এক দৃষ্টান্ত। তাঁর আশ্রম ছিল মধ্যযুগের সাধুসন্তদের মঠবাড়ীর মতো। জাপানে একটি জেন (Zen) বৌদ্ধ মন্দিরে আমাকে যে পথ দিয়ে নিয়ে যাওয়া হয় তার প্রত্যেকটি শিলা মঠাধ্যক্ষের স্বহস্তে খচিত। যখন তিনি বয়সের ভার আর বইতে পারছেন না তখনো সমানে কাজ করে যাচ্ছেন দেখে তাঁর শিষ্যরা তাঁকে নিরস্ত করতে চেষ্টা করেন। তাতে ব্যর্থ হলে তাঁর হাতিয়ার কেড়ে নিয়ে লুকিয়ে রাখেন। তখন তিনি অনশন শুরু করে দেন। বলেন, "না কাজ তো না আহার।" শিষ্যরা তাঁকে তাঁর হাতিয়ার ফিরিয়ে দেন। তিনিও জীবনের শেষদিনটি পর্যন্ত অন্ন উপার্জন করে যান। খ্রীস্টানরা একে অন্নশ্রম বলে অভিহিত করেন। গান্ধীজীও তাঁর জীবনের শেষদিনটিতেও অন্নশ্রম করে গেছেন। তাঁর অন্নশ্রম চরকা কাটা। আপনি আচরি ধর্ম জীবেরে শেখায়।

আমাদের বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থা তার হাজার ত্রুটি সত্ত্বেও জ্ঞানের ঐতিহ্য রক্ষা করে এসেছে, কিন্তু কর্মের থেকে বিযুক্ত হলে তার পতন অনিবার্য। কর্ম ছাড়া মানুষ বাঁচতেও পারে না। সরাই যদি শিক্ষিত হতে গিয়ে নিষ্কর্মা হয় তবে তো

সমাজেরও পতন ঘটবে। শিক্ষাসূত্রে সবাইকে ডাক দিয়ে তা হলে কি আমরা নৈষ্কর্ম ডেকে আনব? নৈষ্কর্ম্য থেকে নৈরাজ্যও আসবে। তার সূচনা দেখা যাচ্ছে। তরুণেরা চায় অ্যাকশন। সেটাও একপ্রকার কর্ম। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণ যদি অ্যাকশনের ময়দান হয় তবে জ্ঞান তার ত্রিসীমানা ছেড়ে পালাবে। অপর পক্ষে মানুষের স্বাভাবিক কর্মস্পৃহাকেও সব বয়সেই পরিসর দিতে হবে। কোনো বয়সই বাদ যাবে না। একদিক থেকে যে একজন ছাত্র আরেকদিক থেকে সে একজন তরুণ। সে একজন নাগরিক। সে সমাজের একজন। তার সমস্ত সময়টা বিদ্যাচর্চায় অতিবাহিত হয় না, বিশ্ববিদ্যালয় তার কাছে তত বেশী দাবীও করে না। তা হলে তার বাকী সময়টা নিয়ে সে করবে কী, যদি শ্রমসাধ্য কায়িক কর্ম পরিহার করে? আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থা ধর্মকে বাদ দিয়েও চলতে পারে, কিন্তু ধর্মকে বাদ দিলে অচল হয়ে উঠবে। এই রাষ্ট্র একদিন শ্রমিকের হাতে আসবেই। তারা সবাই যখন বাবু হতে চাইলেও বাবু হতে পারবে না, অনেকেই বিদ্যালয়ের পরীক্ষায় ফেল করবে, তখন বাবুদেরই টেনে নামাবে ও কিষাণ মজদুর বানাবে। চীনের সাংস্কৃতিক বিপ্লবের মর্মই ওই। তোমরা আমাকে বাবু হতে দেবে না। আচ্ছা, দাঁড়াও, তোমাদেরই আমরা ওয়ার্কার হতে শেখাব।

শিক্ষার অধিকার সব মানুষের আছে, কাউকেই তার থেকে বঞ্চিত করা উচিত নয়। কিন্তু শিক্ষণীয় বিদ্যারও প্রতিনিয়ত বৃদ্ধি চাই। দর্শন বা বিজ্ঞান, সাহিত্য বা অর্থনীতি কখনো স্থিতিশীল হতে পারে না। খবর যেমন প্রতিদিন টাটকা বিদ্যাও তেমনি প্রতিদিন তাজা। যেটা দশ বছর আগে চলতি ছিল সেটা আজ আর চলতি নয়। এক ধর্মশাস্ত্র বা ক্লাসিক্স বা গণিতের কয়েকটি মূলসূত্র ব্যতীত আর সমস্তই তো যুগে যুগে বদলায়। বিশ্ববিদ্যালয় এ পরিবর্তনকে মেনে নেয়, নইলে সেকেলে হয়ে যায়। একরাশ সেকেলে বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ে কোনো দেশ শিক্ষিত হতে পারে না। শিক্ষিত বলতে যদি বোঝায় অচলিত শিক্ষায় শিক্ষিত তা হলে টোল চতুষ্পাঠীর শিক্ষিতরা কী দোষ করলেন? আমরা তা হলে সাবেক ব্যবস্থায় ফিরে যাই না কেন?

শিক্ষা হবে যুগোচিত। সে চলবে যুগের সঙ্গে তাল রেখে। বেতালা হলেই তাকে বাতিল করতে হবে, তা সে সংস্কৃতভিত্তিকই হোক আর মাতৃভাষাভিত্তিকই হোক। ইংরেজীকে কেউ চিরন্তন মনে করে না, কিন্তু যুগের সঙ্গে তাল রাখবার জন্যে হাতের কাছে ও ছাড়া আর কোনো ভাষাকে পাচ্ছে না বলেই ইংরেজীকে আঁকড়ে ধরছে। ইংরেজীর ভিতর দিয়ে নিজের যুগকে পাওয়া যায়। ইংরেজীর মতো বাংলা যেদিন এ যুগের শ্রেষ্ঠ চিন্তার ভাণ্ডার হবে সেদিন বাংলাই হবে উচ্চতম শিক্ষার বাহন। ইংরেজীর থেকে তর্জমা করে বা তার অনুসরণে পাঠ্যপুস্তক তৈরি করলে মননের প্রমাণ পাওয়া যাবে না। মনীষার পরিচয় দেওয়া হবে না। বিদ্যার্থীদের দীপগুলিকে জ্বালিয়ে দিতে হলে নিজেদের দীপগুলিকেও জ্বালিয়ে রাখতে হবে। অধ্যাপকদেরই অধ্যয়ন করতে হবে তার আগে। এদেশে ইংরেজী ভিন্ন আর কোন্ বাহন আছে যাতে অধিকতর ও অভিনব অধ্যয়ন সম্ভব?

তার চেয়ে বড়ো কথা আধ্‌নিক মানবিকতার উত্তরাধিকার থেকে ভ্রষ্ট না হওয়া। প্রাচীন স্বাদেশিক উত্তরাধিকারই মান্‌ষের একমাত্র উত্তবাধিকার নয়। আমরা মান্‌ষ, মান্‌ষমাত্রেবই উত্তরাধিকারী। বিশ্বের যেখানে যা কিছ্‌ জানা গেছে, ভাবা গেছে, আবিষ্কার করা হয়েছে, উদ্ভাবন করা হয়েছে সব কিছ্‌ই আমাদের। সেইজন্যে আমাদের উচ্চতম বিদ্যাপীঠগ্‌লিকেও হতে হবে সর্ব-মানবিক। বিশ্ববিদ্যালয় একটা আন্তর্জাতিক তীর্থ। আন্তর্জাতিক ম্‌লস্রোত থেকে বিচ্ছিন্ন হলে সে মরা গাঙে পরিণত হবে। আন্তর্জাতিক ম্‌লস্রোত থেকে বিচ্ছিন্ন হলে য্‌গের সঙ্গেও তাল রাখা যাবে না। আমবা পেছিয়ে পডব। আমাদের ইতিহাসে পেছিয়ে পড়ার নজির আছে। নালন্দা বিক্রমশীলার য্‌গ অবধি ভারত এগিয়ে রয়েছিল। নানা দেশের বিদ্যার্থীরা আসত ভারতে। পরে দেখা গেল আর কেউ শিখতে আসে না। শেখাতে আসে। প্রথমে আরবী ফারসী। তাবপরে ইংরেজী।

আমাদের অধ্যাত্ম বিদ্যার ক্ষেত্রে কোনোদিন ক্রমভঙ্গ ঘটেনি। কিন্তু জাগতিক বিদ্যার ক্ষেত্রে ঘটে প্রায় হাজার বছর আগে। নতুন করে জানা, নতুন পরে ভাবা, নতুন কিছ্‌ আবিষ্কার বা উদ্‌ভাবন করা ধীরে ধীরে থেমে যায়। জগতের সঙ্গে পা মিলিয়ে নিতে হলে দেশের বাইরে গিয়ে শিক্ষা নিতে হতো। জাত হারানোর ভয়ে সে সময় আমরা দেশ দেশান্তরে যাইনি, সম্‌দ্রযাত্রা করিনি। ফলে আমাদের উচ্চতম শিক্ষায় ক্রমভঙ্গ ঘটে। মাদ্রাসা দিয়েও তার প্‌নর্‌দ্ধার হয়নি। হয়েছে পাশ্চাত্য আদর্শের কলেজ দিয়ে, বিশ্ববিদ্যালয় দিয়ে। সতর্ক থাকতে হবে আবার যাতে ক্রমভঙ্গ না ঘটে। আমাদের বিদ্যার্থীরা যদি বাইরে না যেতে পায়, বাইরের বিদ্বানরা যদি এদেশে আসতে না পান তবে আরো একবার ক্রমভঙ্গ ঘটবে। কায়িক অর্থে কলেজও থাকবে, বিশ্ববিদ্যালয়ও থাকবে, কিন্তু তাদের অবস্থা হবে টোল চতুষ্পাঠীর মতো। অতীতকে নিয়েই তাদের গর্ব, বর্তমানকে নিয়ে নয়।

আমাদের শিক্ষাব্যবস্থাকে আরো আধ্‌নিক, আরো আন্তর্জাতিক, আরো মানবিক করতে হবে। যারা স্বাদেশিকতার অন্‌রাগী তাঁরা টোল চতুষ্পাঠীর প্‌নর্‌জ্জীবন বিবেচনা করে দেখতে পারেন। আর যাঁরা ব্‌র্জোয়ার ছোঁওয়া এড়াতে চান তাঁরা আর একটা বিকল্প ব্যবস্থা প্রবর্তন করে দেখতে পারেন। আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার ডালপালা ছাঁটতে চাইলে আমার আপত্তি নেই, কিন্তু ম্‌লোচ্ছেদ করতে গেলে আমার আপত্তি আছে। কারণ এটা বিদেশ থেকে আনীত হলেও বিষব্‌ক্ষ নয়। মধ্যবিত্তরা এর ফল পেড়ে খাচ্ছে বলে সে ফল আঙ্‌রের মতো টক নয়।

সমালোচক যারা তারাও মধ্যবিত্ত। বৈনাশিক যারা তারাও মধ্যবিত্ত সন্তান। ম্‌খে এরা যাই বল্‌ক এদের মনের কথা হলো আঙ্‌র পেড়ে খাওয়া। সে আঙ্‌র সকলের ভাগে জ্‌টছে না। তাই সে ফল টক। বিদ্যা যদি সত্য হয়ে থাকে তবে তা কখনো টক হতে পারে না। তবে সে বিদ্যা যদি সংসারের কাজে না লাগে তবে তার উপরে বিদ্বেষ জাগবে, এটা স্বাভাবিক। তা বলে তাকে ঝেঁটিয়ে সাফ

করাও মূর্খতা। করলে দেশ অন্ধতায় ছেয়ে যাবে। দারিদ্র্য দূর করতে গিয়ে অজ্ঞতার আবাহন করা দূরদর্শিতা নয়। এই ব্যবস্থাই সংশোধিত হলে শ্রমিক কৃষকের গ্রহণযোগ্য হবে।

সভ্যতা ও শিক্ষা

বাঘ ভালুকের মতো মানুষও ছিল অরণ্যচারী মৃগয়াজীবী অনিকেত ও নিরাবরণ একটি প্রাণী। ক্রমে ক্রমে সে হয়ে উঠল কৃষিজীবী পল্লীবাসী গৃহস্থ। চাষের সঙ্গে বাস, বাসের সঙ্গে বেশ, আগুন জ্বালিয়ে রন্ধন, ধাতু আবিষ্কার করে অস্ত্রনির্মাণ, চক্র উদ্ভাবন করে রথনির্মাণ, গাড়িতে ও নৌকায় করে আমদানী রফতানী, হরেক রকম কারুশিল্প উৎপাদন, সমাজ ও রাষ্ট্রগঠন, নগর পত্তন, হাট বাজার, ক্রয় বিক্রয়, মুদ্রার ব্যবহার, অর্থের বিনিয়োগ। এই যে প্রোসেস একেই বলা হয় সভ্যতা।

সভ্যতার স্তরে সব দেশের মানুষ একসঙ্গে বা একদিনে পৌঁছয়নি। যতদূর জানা যায় প্রথমে পৌঁছয় সুমেরিয়ার লোক। তারপর মিসরের। তারপরে সিন্ধু উপত্যকার। তারপরে চীনের। চার হাজার বছর আগেই চারটি সভ্যতার সাধারণ বিকাশ হয়। পৃথক পৃথক বিকাশ আরো আগে। কতকগুলি সাধারণ লক্ষণ দেখে আমরা বিচার করি সভ্যতা বলতে কী বোঝায়। এক দেশের অনুকরণে অপর দেশ সভ্য হয়ে ওঠে। আজকাল প্রায় সব দেশই সভ্য দেশ বলে দাবী করে। এমন দেশ নেই যেখানে মোটরকার নেই, যেখানে বিমান চলাচল নেই, যেখানে রেডিও নেই। যারা লিখতে পড়তে জানে না বা লেখাপড়ায় কাঁচা তারাও পেট্রোল উৎপাদন ও বিক্রয় করে বড়লোক হয়ে গেছে ও বড়লোকের জীবন যাপন করছে। যাদের দেশেও শহর গড়ে উঠেছে, আকশচুম্বী অট্টালিকায় শহর ছেয়ে যাচ্ছে। সভ্যতার সঙ্গে সমান্তরাল ভাবে বিকশিত হয়েছে সংস্কৃতি। বোবা প্রাণী শিখেছে কথা বলতে, গান গাইতে, ছবি আঁকতে, নাচতে, অভিনয় করতে, মূর্তি গড়তে, লিপি উদ্ভাবন করে পড়তে ও লিখতে। মনন ও কল্পনা, রসবোধ ও রূপবোধ, ধর্মবিশ্বাস ও নীতিবিচার, জ্ঞানবিজ্ঞান ও ললিত কলা দেশে দেশে যুগে যুগে বিবর্তিত হয়েছে। সভ্যতার মতো সংস্কৃতিও ব্যাপ্ত হতে পারে, তবে সভ্য হওয়া যত সহজ সংস্কৃতিমান হওয়া তত সহজ নয়। সংস্কৃতির চেয়ে সভ্যতা আরো সুলভ। মূল্যবান ধাতুর আবিষ্কার কঙ্গোদেশকে বঙ্গদেশের চেয়ে সভ্য করতে পারে, কিন্তু সংস্কৃতিমান করতে পারবে না। তার জন্যে চাই সুপ্রাচীন ঐতিহ্য, বহুকালের ও বহুজনের সাধনা, স্বভাবসিদ্ধ রসবোধ ও রূপবোধ, সত্যের জন্যে ন্যায়ের জন্যে ত্যাগস্বীকার, ধনের চেয়ে জ্ঞানের অধিকতর মূল্য, ক্ষমতার চেয়ে করুণার অধিকতর মূল্য, সর্বপ্রাণীর প্রাণের প্রতি শ্রদ্ধা। সভ্য মানুষ অমানুষও হতে পারে, কিন্তু সংস্কৃতিমান মানুষ অমানুষ

হয় না, হলে তার সংস্কৃতির অধঃপতন ঘটে। তবে সভ্যতারও একটা মাপকাটি স্থির হয়ে গেছে। সভ্য মানুষ আইন ও শৃঙ্খলা মেনে চলে, জঙ্গলের আইনে ফিরে যায় না। সেটা বর্বরতা।

সভ্যতা দিন দিন এমন আকার নিচ্ছে যে বিজ্ঞান ও টেকনোলজি বিনা গতি নেই, তাই শিক্ষার ঝোঁকটাও তারই উপরে। এক্ষেত্রে কঙ্গোদেশের সঙ্গে বঙ্গদেশের কোনো ভেদ নেই, যদি থাকে তবে দুদিন বাদে থাকবে না। কঙ্গোদেশ বিজ্ঞান ও টেকনোলজির পেছনে অনেকবেশী খরচ করছে, ছাত্রদের তালিম করার জন্যে বিদেশ থেকে বিশেষজ্ঞ আনাচ্ছে, আরো পাকা তালিমের জন্যে বিদেশে পাঠাচ্ছে। জাপান যেমন করে পাঁচশো বছরের পথ একশো বছরে অতিক্রম করল কঙ্গোও তেমনি করে পঞ্চাশ বছরে অতিক্রম করতে পারে।

এটা এমন একটা ক্ষেত্র যেখানে হিন্দুর সঙ্গে মুসলমানের বা ব্রাহ্মণের সঙ্গে হরিজনেরও কোনো ভেদ নেই। কিংবা নেই উচ্চতর শ্রেণীর সঙ্গে তথাকথিত নিম্নতর শ্রেণীরও। পেছনে যদি রাষ্ট্র থাকে, সে রাষ্ট্র যদি পশ্চাৎপদদের অধিকতর মাত্রায় সুযোগ দেয় তা হলে তারা কত দ্রুত এগিয়ে যেতে পারে তার দৃষ্টান্ত সোভিয়েট রাশিয়ার একদা পশ্চাৎপদ জনগণ। এর মধ্যেই দেখতে পাওয়া যাচ্ছে পূর্ববঙ্গের মুসলমানরাও পশ্চিমবঙ্গের হিন্দুদের চেয়ে আগের মতো পেছিয়ে নেই। বিজ্ঞানে ও টেকনোলজিতে তাদের অগ্রগতি আরো দ্রুত হবে বলেই মনে হয়।

কিন্তু শিক্ষা বলতে কি কেবল বিজ্ঞান ও টেকনোলজি শিক্ষা বোঝায়? আর্টস বা কলা, হিউম্যানিটিজ বা মানবিক বিদ্যা এ না থাকলে ন্যায় অন্যায় ভালো মন্দ সুন্দর অসুন্দর সত্য অসত্যের বিচার বিবেচনা থাকবে না। স্বাধীনভাবে অনুসন্ধান করা, স্বাধীনভাবে পরীক্ষা করা, স্বাধীনভাবে চিন্তা করা, স্বাধীনভাবে প্রকাশ করা, স্বাধীনভাবে কাজ করা এসবও কি থাকবে? অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতাব্দীর ইউরোপ এই দিকটার উপরেই ঝোঁক দিয়েছিল। ঊনবিংশ শতাব্দীর ভারতীয় শিক্ষানায়করাও ইউরোপের অনুসরণ করেছিলেন। ইতিমধ্যে ইউরোপের নানা দেশে ও আমেরিকায় শিল্পবিপ্লব তথা টেকনোলজিকাল রেভলিউশন ঘটে যাওয়ায় জাপানের তথা ভারতের ঝোঁকটাও বদলে গেছে।

পারমাণবিক বিস্ফোরণের দ্বারা যে নতুন যুগের সূচনা হলো তার প্রভাব হবে শিক্ষার উপরেও সুদূরপ্রসারী। পারমাণবিক শক্তিকে শান্তিপূর্ণ কর্মপ্রচেষ্টায় প্রয়োগ করতে গেলে হাজার হাজার কর্মীর প্রয়োজন হবে। তাদের শিক্ষার ধারাটাই হবে ভিন্ন। তাদের প্রয়োজন বেশী বলে মজুরিও বেশী হবে, মজুরি বেশী বলে মর্যাদাও বেশী হবে। মানবিক বিদ্যার ছাত্ররা এমনিতেই কাজ জোটাতে পারছে না। মাদ্রাজের প্রেসিডেন্সী কলেজে নাকি দর্শনের ছাত্র হয় না, তাই বিভাগটাই উঠে গেছে। বিশ্বভারতীও এখন দোটানায় পড়েছে। বিজ্ঞান রাখবে কি রাখবে না। রাখলে ওইদিকেই ঝোঁক পড়বে। না রাখলে ছাত্র হবে না। ছাত্ররা পাশ করে খাবে কী?

পাশ করে খাবে কী এখন ভারতের অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ও তাদের

অভিভাবকদের সকলেরই ভাবনা। যারা গণিতে কাঁচা, বিজ্ঞানের বা প্রযুক্তি বিদ্যার স্রোত তাদের টানে না। তাদের কতক যায় বাণিজ্যের স্রোতে ভেসে। আর কতক ভেসে বেড়ায় মানবিক বিদ্যার স্রোতে। অর্থনীতিও আজকাল গণিতনির্ভর হয়ে উঠেছে। গণিতে দক্ষ না হলে অর্থনীতিতেও দক্ষতা অর্জন করা শক্ত। যেদিক থেকেই দেখি না কেন গণিতই একালের পরাবিদ্যা। যুদ্ধ-ক্ষেত্রেও এর মূল্য অসীম। বাণ ছুঁড়তে হলে অঙ্ক কষে ছুঁড়তে হয় যাতে শত্রুর সুরক্ষিত অবস্থানের উপর পড়ে। যুদ্ধটা এখন মস্তিষ্কের যুদ্ধ। ষণ্ডা গুণ্ডা না হলেও চলে, যদি অঙ্কে মাথা খেলে। বেহিসাবী অস্ত্রবর্ষণ একালে জয় এনে দেয় না। তাই যুদ্ধবিদ্যাও এখন গণিতনির্ভর। তবে চিরকাল যেমন এখনো তেমনি সাহসের মূল্যই সর্বাধিক।

অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতাব্দীর আদর্শে গঠিত স্কুল কলেজগুলোকে বিংশ শতাব্দীর শেষ পাদের আদর্শে পুনর্গঠন করতে হবে। একাজ অন্যান্য দেশে আরম্ভ হয়ে গেছে। "ভারত কেবলি ঘুমায়ে রয়।" সব ছাত্রের জন্যে একই ব্যবস্থা সম্ভবও নয়, সঙ্গতও নয়। কিন্তু বেশীর ভাগ ছাত্রকেই তিনটি বিষয় গোড়া থেকে ভালো করে শেখানো দরকার। একটি তো গণিত। আর একটি মাতৃভাষা। আর একটি ইংরেজী। কিন্তু কোনোটিকেই আবশ্যিক করা উচিত নয়। ধর্মে যেমন কম্‌পালসন নেই শিক্ষাতেও তেমনি কম্‌পালসন থাকবে না। তুমি শিখতে চাও না? বেশ তো, তুমি শিখবে না। বাড়ী গিয়ে খেলা কর। আর যদি স্কুলে পড়ার ইচ্ছা থাকে তবে এই এই বিষয় তোমাকে শেখাতে পারি। কোন্ কোন্ বিষয় শিখতে চাও তা তুমিই বল। কিছুদিন একটা বিষয় শিখে সেটা যদি ছেড়ে দিতে চাও তাতেও আমরা বাধা দেব না। যেটুকু শিখলে সেই-টুকুই লাভ। তবে পরীক্ষা পাশ করার ইচ্ছা থাকলে তোমাকে তিন-চার রকম কোর্সের থেকে একটা বেছে নিতে হবে। বেছে নিলে লেগে থাকতে হবে। তৈরি না থাকলে পরীক্ষা দিয়ো না। পরে আবার সুযোগ পাবে। কিন্তু আর পাঁচ-জনকে বাধা দিয়ো না। তোমার স্বাধীনতাকে আমরা মূল্য দিয়েছি। অন্যের স্বাধীনতাকেও তুমি মূল্য দাও। পরীক্ষা নির্দিষ্ট সময়েই হবে। যারা তৈরি থাকবে তারা পরীক্ষা দেবে। টোকাটুকি করলে বুঝতে হবে তারা সত্যি তৈরি নয়। তা হলে আরো ক'মাস সময় নিক। আবার পরীক্ষার প্রবেশপত্র পাবে। প্রত্যেককে তিনবার সুযোগ দেওয়া হবে। একটি বিষয়ে পাশ করলে দ্বিতীয়বার সে বিষয়ে পরীক্ষা দিতে হবে না। বাকী বিষয়গুলোর উপর জোর দিতে পারা যাবে।

বলা বাহুল্য তিনটি মূল বিষয়ের নাম করেছি বলে সেই ক'টি বিষয়ই পুরো কোর্স নয়। কোর্স সংখ্যা দশটাও হতে পারে, বিশটাও হতে পারে। প্রাথমিক পর্যায়ে যে কোনো পাঁচটা বিষয় নিয়ে এক একটা কোর্স। বিষয় তালিকায় থাকবে ছবি আঁকা, মূর্তি গড়া, নাচ গান বাজনা, সুতো কাটা, তাঁত বোনা, কাঠের কাজ, চামড়ার কাজ, চাষের কাজ, গোপালন, রন্ধন, প্রসাধন, গৃহস্থালীর কাজ ইত্যাদি। তা ছাড়া সাধারণত যা পড়ানো হয়। তেমনি

মাধ্যমিক পর্যায়েও পাঁচটি বিষয় নিয়ে একটি কোর্স। বিষয়তালিকাও তেমনি বিচিত্র। কলেজে পাঁচটির থেকে তিনটি হবে। শিক্ষা আরো নিবিড় হবে। স্নাতকোত্তর পর্যায়ে একটি। শিক্ষা নিবিড়তম।

কিন্তু দেশশুদ্ধ লোক যদি প্রতিজ্ঞা করে থাকে যে সবাই হবে নগরবাসী আর সমাজশুদ্ধ মানুষ যদি ব্রত নিয়ে থাকে যে সকলেই হবে ভদ্রলোক তা হলে সভ্যতা ও সংস্কৃতি আপনার ভারে আপনি ভেঙে পড়বে। গ্রামকে মেরে শহর নয়, চাষকে ও কারিগরিকে মেরে যন্ত্রশিল্প নয়, চাষী ও কারিগরকে মেরে ভদ্রলোক নয়। আগে গ্রাম তারপরে শহর। আগে চাষ ও কারিগরি, তার পরে যন্ত্রশিল্প, আগে চাষী ও কারিগর, তারপরে ভদ্রলোক। এই অগ্রপশ্চাৎ জ্ঞান ক্রমেই হারিয়ে যাচ্ছে। এর পরিণাম হবে ঘোরতর সংকট। সংকট মোচনের জন্যে চীনের মতো শহরকে শহর খালি করে দিতে হবে। স্কুলকে স্কুল, কলেজকে কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়কে বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ করে দিতে হবে। বিকেন্দ্রীকরণ সর্বাঙ্গীণ হলে তারপরে স্থির করা যাবে কত ধানে কত চাল। ক'টা গ্রামে ক'টা শহর। ক'জন কারিগরে ক'জন যন্ত্রশিল্পী। ক'জন চাষীতে ক'জন ভদ্রলোক। শিক্ষাব্যবস্থাও সেই অনুসারে ঢেলে সাজতে হবে।

নির্বিচারে পরিবারবৃদ্ধির মতো নির্বিচারে স্কুল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় বৃদ্ধি শিক্ষাকে দিকে দিকে প্রসারিত করছে, কিন্তু তার উৎকর্ষ দিন দিন নিম্নমুখী হচ্ছে। আজকালকার একটা টাকা যেমন আসলে পাঁচ আনা তেমনি একজন গ্রাজুয়েটও আসলে একটি ম্যাট্রিকুলেট। এর নাম অবমূল্যায়ন। এ পথে চললে আরো অবমূল্যায়ন হবে। যাঁরা কৃষির গ্রাজুয়েট তাঁরা মাঠে নামবেন না, হাত লাগাবেন না, চাষীদের উপদেশ দিয়েই ক্ষান্ত। যাঁরা টেকনোক্রাট তাঁদেরও একই মানসিকতা। মানুষকে হাত দেওয়া হয়েছে শুধু আফিসে কলম ধরার জন্যে আর বাড়ীতে ছুরি কাঁটা ধরার জন্যে। যাঁরা সাহেব নন, বাবু, তাঁদের বাবুয়ানাও কায়িক শ্রমের থেকে শত হস্ত দূরে। শেষে এমন হয়েছে যে আফিসের বেয়ারা বা চাপরাসীও ফাইল বহন করবে না, জল গড়িয়ে দেবে না। কারণ তারাও স্কুলে গিয়ে লেখাপড়া করেছে। কেউ কেউ কলেজেও গেছে। কেন তা হলে তারা বাবুদের সঙ্গে সমান হবে না ?

সাম্যই যদি কাম্য হয় তবে সাহেবদেরই বাবুদের সঙ্গে সমান হতে হবে, বাবুদেরও চাপরাসী বেয়ারাদের সঙ্গে সমান হতে হবে, ইঞ্জিনিয়ারদেরও মিস্ত্রীদের সঙ্গে সমান হতে হবে, জোতদারদেরও হাল লাঙল ধরতে হবে। শিক্ষাও হবে তার অনুরূপ। বিদ্যার উপর ততটা নয়, কর্মিষ্ঠতার উপর যতটা জোর দিতে হবে।

সাম্যের প্রশ্ন আজকের দুনিয়ার সব চেয়ে বিতর্কিত প্রশ্ন। এক এক দেশ এক এক ভাবে এর উত্তর দিতে চেষ্টা করছে। কোন কোন দেশে ঘোরতর সামাজিক বিপর্যয় ঘটে গেছে। যাকে বলে বিপ্লব। কিন্তু এখনো স্থিতি আসেনি। চীনের সর্বময় কর্তা একবার মাত্র বিপ্লবে সন্তুষ্ট নন। তাঁর মতে বিপ্লব বার বার ঘটাতে হবে। দ্বিতীয়বারের বিপ্লবের নাম দেওয়া হয়েছে

সাংস্কৃতিক বিপ্লব। ওটা জমিদার বা পুঁজিপতিদের বিরুদ্ধে নয়, উচ্চশিক্ষিত উচ্চপদস্থ উচ্চবংশীয়দের বিরুদ্ধে। যদিও তাঁরা সবাই কর্তাভজা মার্কসবাদী। এখন শোনা যাচ্ছে শূন্যতা পূরণের জন্যে তাঁরাই এক এক করে ফিরে আসছেন, কর্তার সেটা অসহ্য। তাই তৃতীয়বারের পূর্বলক্ষণ দেখা যাচ্ছে। পরশুরাম সমাজকে একশবার নিঃক্ষত্রিয় করেছিলেন। এঁরা ক'বার নির্মান্দারিন করবেন কে জানে! মান্দারিনরাই চীনদেশের ব্রাহ্মণ।

কিন্তু সাম্যের প্রশ্নই একমাত্র বিতর্কিত প্রশ্ন নয়। রুশো যে প্রশ্ন তুলেছিলেন সে প্রশ্নের উত্তর এখনো মেলেনি। শিশু কি প্রকৃতির শিশু নয়? প্রকৃতির পাঠশালায় না পড়ে মানুষের পাঠশালায় পড়লে তার কি পূর্ণ বিকাশ হবে? মধ্যযুগের শিক্ষাব্যবস্থাকে আধুনিক যুগের উপযোগী করলে তাদের কী লাভ হবে যারা প্রকৃতির সন্তান? যারা পাহাড়ে জঙ্গলে থাকে? যারা থাকে দুর্গম পল্লীতে? শহরে স্কুল কলেজের পুঁথিপোড়ো শিক্ষিত মানুষ তাদের কাছে শিক্ষার আলোক নিয়ে যাবে এটা এক হাস্যকর ধৃষ্টতা। শিক্ষার আলোকের জন্যে তাদের শহরে টেনে আনতে চাওয়াটাও কি হাস্যকর স্পর্ধা নয়? চীনের শহুরে শিক্ষিতদের এখন লাখে লাখে গ্রামে পাঠানো হচ্ছে। তাতে প্রকৃতির সঙ্গে যোগাযোগও বহুপরিমাণে সুগম হবে। সভ্যতা বলতে যদি বোঝায় প্রকৃতির উপর খোদকারী তাহলে এটা তার উজানযাত্রা। সংস্কৃতি বলতে যদি বোঝায় বিকৃতি বা বিনাশ তা হলে এটা তার সংশোধন। প্রকৃতির সঙ্গে সামঞ্জস্য কেমন করে হবে এ প্রশ্ন রবীন্দ্রনাথকেও ভাবিয়েছিল। তাঁর উত্তর তপোবন পুনঃপ্রতিষ্ঠা। শান্তিনিকেতন এখন আর বনস্থলী নয়। শহরতলী। দেশের সর্বত্র বন কেটে বসত হচ্ছে। বসত হয়ে উঠছে শহরতলী। প্রকৃতি হটে যাচ্ছে। প্রকৃতি কি এর প্রতিশোধ নেবে না? এ প্রশ্নও সাম্যের প্রশ্নের মতো বুনিয়াদী প্রশ্ন।

এ ছাড়া আরো এক বুনিয়াদী প্রশ্ন আছে। অ্যাথেন্স না স্পার্টা? কোন্‌টা বরণীয়? এ প্রশ্ন যুগে যুগে দেশে দেশে মানুষের মনে জেগেছে। ইংরেজদের মতো আমরাও হয়েছি স্পার্টার চেয়ে অ্যাথেন্সের অনুরাগী। কিন্তু সেই একমাত্র প্রভাব নয়। স্পার্টাও কাজ করে যাচ্ছে। আমাদের উত্তরপুরুষ কোন্‌দিকে ঝুঁকবে কে জানে!

ভারতীয় সংস্কৃতির ধারা

আমাদের বদ্ধমূল সংস্কার ভারতবর্ষ আর্যদের দেশ, আর্যরাই ভারতবর্ষের আদি অধিবাসী বা প্রকৃত অধিবাসী, তারা আর কোনো দেশ থেকে আসেনি, তারা কোনোদিনই বহিরাগত ছিল না, ভারতীয় সভ্যতার উন্মেষ হয়েছে তাদের সঙ্গেই, তাদের পূর্বে নয়, ভারতের সংস্কৃতির মূল হচ্ছে বেদ, বেদে সব কিছু আছে, বেদজ্ঞ যাঁরা তাঁরা সর্বজ্ঞ, বেদ যে ভাষায় রচিত সে ভাষা হচ্ছে দেবভাষা, আর

সব ভাষা সে ভাষার সন্তান অথবা তার তুলনায় নিকৃষ্ট, সংস্কৃতভিত্তিক সংস্কৃতিই ভারতীয় সংস্কৃতি, তাকে হিন্দু সংস্কৃতিও বলা যায়, যে হিন্দু সে ভারতীয়, যে ভারতীয় সে হিন্দু, মুসলিম বা ইউরোপীয় বহিরাগত বলেই অভারতীয় তথা অহিন্দু, তাদের বাদ দিলেও ভারতের সংস্কৃতির সম্পূর্ণতা-হানি হয় না, হাজার বছর আগেই ভারতের সংস্কৃতি সম্পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়েছে, তার পরে যদি সে ক্ষীণ হয়ে থাকে তবে সেটা বিদেশী ও বিধর্মীদের অনধিকার প্রবেশের ফলে, এখন যেটা চাই সেটা হলো তার পুনরুজ্জীবন বা রিভাইভাল, তাতে মুসলিমের বা পাশ্চাত্ত্যের কোনো ভূমিকা নেই, পশ্চিমের মতো একটা রেনেসাঁস হয়েছে বা হওয়া উচিত যারা বলে তারা ভ্রান্ত, ভারত কারো ধার ধারে না ও ধারবে না, ভারতীয় সংস্কৃতি পুরাতন তথা সনাতন, সুতরাং নূতন হবে কী করে ?

উপরে যে সংস্কারের কথা বলা হলো তার বিরুদ্ধে গত দুশো বছরে অসংখ্য প্রমাণ জমেছে। ভারতবর্ষ প্রধানত আর্যদের দেশ, অনার্যরাই তার আদি অধিবাসী, তাদের কেউ বা অস্ট্রীক, কেউ বা মঙ্গোল, কেউ বা দ্রাবিড়, আর্যরা বাইরে থেকে এসেছে, আর্যরা যেমন ভারতে এসেছে তেমনি ইরানে গেছে, ইউ-রোপে গেছে, আর্য সভ্যতা ভারত থেকে আয়ারল্যান্ড পর্যন্ত বিস্তৃত, এখন তো আমেরিকা পর্যন্ত, আর্যরা যেখানেই গেছে সেখানেই আর্যপূর্ব সভ্যতার সঙ্গে বিরোধ বেধেছে, পরে সন্ধি হয়েছে, সন্ধির ফলে আর্যরা হয়েছে অনার্যীকৃত ও অনার্যরা আর্যীকৃত, মিশ্র সভ্যতার উদ্ভব ঘটেছে, সংস্কৃতিও হয়েছে দেশো-চিত ও কালোচিত, যুগে যুগে তার পরিবর্তন ঘটেছে, আর্যেতর ভূভাগ থেকে খ্রীস্টধর্ম ও সংস্কৃতি এসে ইউরোপের গ্রীক রোমক ধর্ম ও সংস্কৃতিকে আচ্ছন্ন করেছে, হাজার বছর পরে রেনেসাঁসের কল্যাণে সেই আচ্ছন্ন ভাবটা কেটে গেছে, লোকে আর বিশ্বাস করছে না যে বাইবেলে সব কিছু আছে বা যাঁরা বাইবেলজ্ঞ তাঁরা সর্বজ্ঞ, জ্ঞান বিজ্ঞান ও যুক্তিতর্কের বন্ধ দুয়ার খুলে যাওয়ায় মধ্যযুগের অন্ধকার ঘুচে গেছে ও আধুনিক যুগের আলোয় দশদিক উজ্জ্বল হয়েছে, লাটিন হটে গেছে, ইংরেজী ফরাসী প্রভৃতি এগিয়ে গেছে।

ভারতের ইতিহাস নতুন করে লেখার সময় এসেছে। এদেশ আর্যদের অধিকারে আসার আগে যাদের অধিকারে ছিল তারাও বহু পরিমাণে সভ্য ছিল। তারা যে কী পরিমাণ উৎকর্ষ লাভ করেছিল তার প্রমাণ মোহেনজোদরো ও হরপ্পার নাগরিক সভ্যতা। খননকার্য এখনো সমাপ্ত হয়নি, হলে দেখা যাবে যে সিন্ধু উপত্যকার সেই দুটি নগরের মতো আরো কত নগর অন্যান্য নদীকূলে বা সমুদ্র-কূলে অবস্থিত ছিল। আর্যদের আগমনের কাল খ্রীস্টপূর্ব বিংশ থেকে পঞ্চদশ শতাব্দী বলেই অনুমান করা হয়। সিন্ধু উপত্যকার সভ্যতা তার আগেই পূর্ণতা লাভ করেছিল। ওরকম একটি সভ্যতা হাজার বছরের কমে পূর্ণতা লাভ করে না। কৃষি থেকে শুরু করতে হয়। তার সঙ্গে যোগ দেয় কারুশিল্প। বাণিজ্যের প্রয়োজন হয়। তার উপযোগী যানবাহন আবশ্যক হয়। নদীপথে নৌকা, স্থলপথে গাড়ি বলদ হাতি ঘোড়া উট। পণ্য বিনিময় থেকে ভাব বিনিময় আসে।

লিপির উৎপত্তি, মুদ্রার উৎপত্তি ঘটে। সভ্যতার সঙ্গে সঙ্গে সংস্কৃতিও বিবর্তিত হয়। রন্ধন, বেশভূষা, মাটির পাত্র, ধাতু নির্মিত অস্ত্র থেকে লোকসংস্কৃতি, লোকসংস্কৃতির থেকে উচ্চতর সংস্কৃতি, কবিতা সঙ্গীত নৃত্য নাট্য চিত্রকলা ভাস্কর্য স্থাপত্য দর্শন ধর্মশাস্ত্র।

আমার অনুমান আর্যদের আগমনের পূর্বেই ভারতের নদী ও সমুদ্রকূলে ছোট বড়ো শহর গঞ্জ বন্দর গড়ে উঠেছিল, গ্রাম গড়ে উঠেছিল আরো আগে। লোকসংস্কৃতি তো বিবর্তিত হয়েছিলই, সঙ্গীত নৃত্য নাট্য কবিতা প্রভৃতি উচ্চতর সংস্কৃতিরও বিবর্তন ঘটেছিল। আর্যরাই এসে এসব প্রবর্তন করে এমন নয়। দক্ষিণ ভারতের দ্রাবিড় সভ্যতা ও সংস্কৃতি আর্যদের আগমনের পূর্বেই বহুদূর প্রগতি করেছিল। আমার তো মনে হয় বাংলাদেশের আর্যপূর্ব সভ্যতা ও সংস্কৃতিও বঙ্গোপসাগরের অপর পারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ স্থাপন করেছিল। পাণ্ডববর্জিত দেশ বলে এ দেশ সভ্যতা ও সংস্কৃতিবর্জিত ছিল না। আর্যরা কবে আসবে না আসবে তার জন্যে দেশের সভ্যতা বা সংস্কৃতি অপেক্ষা করে বসে থাকেনি। নিজেই উদ্যোগী হয়ে সিংহলে গেছে, যবদ্বীপে গেছে। আর্য দেবদেবীর চেয়ে লৌকিক দেবদেবীর সংখ্যা ও প্রভাব এ দেশে তখনো বেশি ছিল, এখনো বেশি। বেদের চেয়ে তন্ত্রের প্রভাব বেশি এদেশে। ব্রাহ্মণপ্রাধান্য দেড় হাজার বছরের আগে ছিল না। তার পূর্বে বৌদ্ধপ্রাধান্য জৈনপ্রাধান্য ছিল। যে সময়ের কথা বলা হচ্ছে সে সময় বাংলাদেশ একটা প্রদেশে পরিণত হয়নি। ভারতকেও দেশ বলা হতো না। 'বর্ষ' প্রায় মহাদেশের মতো।

আর্যপূর্ব সংস্কৃতির বহমান ধারার সঙ্গে আগন্তুক আর্য সংস্কৃতির বহমান ধারা সম্মিলিত হয়ে যে যুক্তবেণী রচনা করে রামায়ণ মহাভারত তারই সৃষ্টি। ততদিনে আর্য ও অনার্য বহুল পরিমাণে বিমিশ্র হয়েছে। তাকে আর অমিশ্র করবার উপায় নেই। তবু বর্ণশুদ্ধির জন্যে ও বর্ণসাঙ্কর্যের ভয়ে যত রকম কঠোর বিধান জারী করা হয়। আর্যপূর্ব যুগেও কতক লোক পৌরোহিত্য করত। কতক লোক করত রাজ্যশাসন ও যুদ্ধ। কতক লোক বাণিজ্যে লিপ্ত থাকত। এরাও আর্যদের ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যবর্ণের অন্তর্ভুক্ত হয়। গোড়ার দিকে এই তিন বর্ণের মধ্যে বিবাহ চলত। এই তিন বর্ণ অর্থাৎ দ্বিজাতি এক দিকে ও চতুর্থ বর্ণ শূদ্র অন্যদিকে। শূদ্ররা সাধারণত আর্যপূর্ব সমাজেরই বৃহত্তর অংশ। চাষী আর কারিগর আর মজুর শ্রেণীর লোক, যাদের না হলে জগন্নাথের রথ চলে না। অথচ চালক তারা নয়। তারা চালিত। আমেরিকার দরিদ্র শ্বেতাঙ্গদের মতো ভারতের দরিদ্র আর্যরাও তাদের সঙ্গে ছিল। উচ্চতর সংস্কৃতিতে তাদের ভাগ সামান্য হলেও লোকসংস্কৃতিতে অসামান্য।

ভারতের আর্যোত্তর সংস্কৃতির উচ্চতর স্তর মোটের উপর আর্য ও আর্যপূর্ব পুরোহিত ও সৈনিক বণিকদের নেতৃত্বে চালিত ও বিকশিত "এলিৎ" সংস্কৃতি। রামায়ণ মহাভারতের কল্যাণে সে সংস্কৃতি সর্বস্তরে ব্যাপ্ত হয়। আর বৌদ্ধ জৈন ধর্মের শিক্ষায় সে সংস্কৃতি দীন হীন পতিত পাতিত শূদ্র ও অন্ত্যজকেও দুই হাত বাড়িয়ে কোলে টেনে নেয়। বৈদিক দেবতাদের উপাসকদের মধ্যেও ক্রমে

ভক্তিবাদের প্রাবল্য হয়। তখন ভক্তির তরঙ্গ উঠে জাতিবর্ণের বেড়া ভেঙে দেয়। তবে সমভূম করে না সমাজকে। পরবর্তীকালে যাকে হিন্দু বলে অভিহিত করা হয় তার যেটি উদারতর ধারা সেটি বৌদ্ধ সাধনার মতো ভারতের বাইরেও প্রসারিত হয়। তার গতিবেগ চীন জাপান মালয় ইন্দোনেশিয়া তিব্বত মধ্য-এশিয়া বর্মা ইন্দোচীনেও অনুভূত হয়। কিন্তু প্রসারণের পরে আসে সঙ্কোচনের যুগ। সব সভ্যতার ইতিহাসে এটা দেখতে পাওয়া যায়। ভারতীয় আর্যপ্রভাবিত দ্বিজাতি পরিচালিত বৈদিক বৌদ্ধ উদারনৈতিক সংস্কৃতিভিত্তিক সংস্কৃতি একদা তার চূড়ান্ত পর্যায়ে উত্তীর্ণ হয়ে ধীরে ধীরে নেমে আসে, থেমে আসে, আপনাকে গুটিয়ে আনে। চূড়ান্ত পর্যায়ের কাল আমাদের ইতিহাসের স্বর্ণ যুগ। গুপ্ত-বংশীয় রাজাদের যুগ। এই যুগে সাগরপারের ভারতীয় সভ্যতা তার সুদূর-তম সীমায় পেঁাছায়। হিমালয় পারের ভারতীয় সভ্যতাও।

এর পরের অধ্যায় কূপমণ্ডুকতা। সমুদ্রযাত্রা নিষিদ্ধ হয়ে যায়। হিমালয় অতিক্রম করাও তাই। হিন্দুসমাজের নিয়মকানুন দিন দিন আরো কড়া হয়। কেউ তো বিদেশে যাবেই না বিদেশ থেকে কেউ এলে তাকেও সমাজে নেওয়া হবে না। যেমন গ্রীকদের শকদের কুশানদের হূনদের নেওয়া হয়েছিল। এই কূপ-মণ্ডুক অবস্থায় ভারতের দুর্বলতা ইসলামকে সহজে পথ ছেড়ে দেয়। সংস্কৃত-ভিত্তিক সংস্কৃতির ঘরে নূতনত্বের অভাবও ছিল, সেটা ভরাবার জন্যে আরব্য তথা পারসিকভিত্তিক সংস্কৃতির প্রয়োজনও ছিল। আরো পরে ইংরেজীভিত্তিক সংস্কৃতির।

ভারতের মধ্যযুগ সুরু হয় ইউরোপের মধ্যযুগেরই প্রায় সমসাময়িককালে। শেষ হয়ও তেমনি সমসাময়িককালে। প্রায় 'সমসাময়িক' বলেছি এই জন্যে যে ভারতের মধ্যযুগ শ-দুই বছর বিলম্বে আসে, শ-দুই বছর বিলম্বে যায়। আমাদের মধ্যযুগের প্রথম আধখানা জুড়ে ছিলেন রাজপুত রাজন্যরা, আর আধখানা তুর্ক ও মুঘল সুলতান ও বাদশাহরা। ভারতের মুসলিম শাসন গোটা মধ্যযুগটা অধিকার করেনি। ইংরেজ অধিকার তো তারও তিনভাগের একভাগ। তবে যত কম সময়ই থাকুক না কেন ইংরেজরাই এসেছিল আধুনিক যুগের বার্তা নিয়ে। ওরাই প্রবর্তন করে ভারতের আধুনিক যুগ।

মধ্যযুগীয় হিন্দু তথা মুসলিম শক্তিতে নিশ্চয়ই তফাৎ ছিল কিন্তু উভয়েই মধ্যযুগীয়। অপর পক্ষে ওদের সঙ্গে ইংরেজদের তফাৎ শুধু যে ধর্মে ধর্মে বা ঐতিহ্যে ঐতিহ্যে তফাৎ তাই নয়, যুগে যুগে তফাৎ। সে তফাৎ জ্ঞান-বিজ্ঞানের সঙ্গে বস্তুগত অজ্ঞানের। ইংরেজরা যে সময় এই উপমহাদ্বীপে আসে তার আগেই তাদের মহাদেশের পশ্চিমাংশে রেনেসাঁস ও এনলাইটেনমেন্ট ঘটে যায়। এই দুটি আলোকবর্তিকা থাকে তাদের হাতে। তাদের মশাল থেকে আমরাও আমাদের মশাল জ্বালিয়ে নিই। তখন আমাদের এখানেও ঘটে রেনেসাঁস তথা এনলাই-টেনমেন্ট। তবে তেমন উজ্জ্বলভাবে নয়। তার কারণ কি আমাদের পরাধীনতা, না আমাদের অতীতমুখীনতা? পুরাতনকেই আমরা সনাতন বলে ভাবি, নতুনকে ক্ষণিকের বলে উড়িয়ে দিই। এটা কী হিন্দু কী মুসলমান উভয়েরই

মজ্জাগত। ইউরোপের ছোঁওয়া না লাগলে, দোলা না লাগলে, ধাক্কা না লাগলে আমরা যে তিমিরে ছিলুম সেই তিমিরেই থাকতুম। আমাদের প্রতিবেশী চীন জাপানের সম্বন্ধেও সেই কথা খাটে। তেমনি ইরান তুর্ক আরব প্রতিবেশীদের সম্বন্ধেও। সাম্রাজ্যবাদী হয়ে যারা আমাদের আঘাত করেছে তারাই প্রগতিবাদী হয়ে আমাদের জাগিয়েছে।

তুর্ক মুঘল প্রভৃতি ইসলামপন্থীদের আগমনের পূর্বেই আমাদের সংস্কৃত-ভিত্তিক সংস্কৃতি বস্তুজ্ঞান হারিয়েছিল। বস্তুজ্ঞান না থকেলে কি ব্রহ্মজ্ঞান থাকে? ব্রহ্মজ্ঞান থাকলে আরো কয়েকখানি গীতা উপনিষদ্ লেখা হতো, রাশি রাশি টীকাভাষ্য নয়। আরো কয়েকটি দর্শনের উৎপত্তি হতো, রাশি রাশি ভক্তি-গ্রন্থের বা পুরাণের নয়। ভক্তিও মহামূল্য নিধি, ভক্তিকে খাটো করা উচিত নয়, তবু একথাও মানতে হবে যে জ্ঞানবিজ্ঞান তথা মৌলিক সৃষ্টির দিক থেকে সংস্কৃত সাহিত্য দীর্ঘকাল ধরে পায়চারি করতে থাকে। এমন সময় হাজির হয় পারসিক বা ফারসীভিত্তিক সংস্কৃতি, তার সঙ্গে আরব্য সংস্কৃতি। আরব্য সংস্কৃতি যে কোরানসর্বস্ব ছিল তা নয়। তার অঙ্গে অঙ্গীভূত গ্রীক দর্শন, চিকিৎসাবিদ্যা, জ্যোতিষ। আরবী ফারসী শিক্ষার দ্বার হিন্দুদের কাছেও মুক্ত ছিল। যারা টোল চতুষ্পাঠীতে প্রবেশ পেতো না তারা মক্তবে মাদ্রাসায় প্রবেশ পেতো। শূদ্ররা সংস্কৃত থেকে বঞ্চিত ছিল। আরবী ফারসী থেকে বঞ্চিত হলো না। রাষ্ট্র যেখানে মুসলমানের হাতে সেখানে সংস্কৃত তেমন অর্থকরী নয়, ফারসী যেমন। কায়স্থ প্রভৃতি জাতের ছেলেরা এই প্রথম মাথা তোলার সুযোগ পায়। তুর্ক ও মুঘল শাসনে হিন্দুদের ভাগ্যে যেসব পদ জোটে সেসব আর ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়দের একচেটে নয়, হিন্দু সমাজের নিম্নতর অংশও তার শরিক হয় ও প্রতিযোগিতায় আরো উচ্চে ওঠে। মুসলিম শাসন এদিক থেকে বৈপ্লবিক। ব্রিটিশ শাসনও।

আরো একদিকে প্রগতিশীল ছিল, তবে শুধু মুসলিম শাসন নয়, অবশিষ্ট হিন্দু শাসনও। সর্বত্র দেখা যায় সংস্কৃত কোণঠাসা হচ্ছে, তার জায়গা নিচ্ছে বাংলা হিন্দী মরাঠী তামিল তেলুগু প্রভৃতি অসংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্য। সংস্কৃত থেকে ভাবানুবাদ হয়ে যায় রামায়ণ মহাভারত প্রভৃতি বিবিধ গ্রন্থের, লোকে তাদের জন্যে সংস্কৃতের মুখাপেক্ষী হয় না। সংস্কৃতি এইভাবে সর্বস্তরে ছড়িয়ে যায়। বেদ কিন্তু গুহায় নিহিত থাকে, কোরানও। তার জন্যে আরো একটা বিপ্লবের প্রয়োজন ছিল। ইংরেজী শিক্ষার। বেদ ও কোরান ইংরেজীতে তর্জমা হয়ে যায়। তার থেকে আসে বাংলা হিন্দী ভাষায় মূলের অনুবাদ বা অনুবাদের অনুবাদ।

আর্যপূর্বেরা যেমন করে আর্যীকৃত হয়েছিল, আর্যরা যেমন আর্যপূর্বীকৃত হয়েছিল, হিন্দুরাও তেমনি করে মুসলিম প্রভাবিত হয়, মুসলিমরাও তেমনি করে হিন্দু প্রভাবিত, উভয়েই পাশ্চাত্ত্য প্রভাবিত তথা আধুনিকত্বে উপনীত। এই যে উপনয়ন এটা হাজার কি বারো শ বছর পরে মধ্যযুগ থেকে আধুনিক যুগে উত্তরণ। আরবী ফারসী শিক্ষার চেয়ে ইংরেজী শিক্ষার প্রতিপত্তি ও প্রসার

বেড়ে যায়। ইউরোপের সঙ্গে গভীরতর গ্রন্থিবন্ধন হয়। সে গ্রন্থি ব্রিটিশ অপসরণের পরেও ছিন্ন হয় না। এখন তো সংস্কৃত শিক্ষার উপর কোনোরকম বাধানিষেধ নেই, তবু লোকে ইংরেজী শিক্ষাকেই অগ্রাধিকার দেয়। যেখানে অর্থকরী নয় সেখানেও। 'এলিৎ' বলতে একদা সংস্কৃতশিক্ষিত বোঝাত, পরে আরবী ফারসী শিক্ষিত, আরো পরে ইংরেজী শিক্ষিত। এখনো তাই। যেদিন বাংলাশিক্ষিত কি হিন্দীশিক্ষিত বোঝাবে সে দিনের কত দেরি!

উচ্চতর সংস্কৃতি এখনো 'এলিৎ' কিন্তু সেই 'এলিৎ' নয়। সংস্কৃতির যে অংশটা লোকসংস্কৃতি সেটার সঙ্গে উচ্চতর সংস্কৃতির বিভেদ আদিযুগেও ছিল, মধ্যযুগেও ছিল, আধুনিক যুগেও রয়েছে। এ বিভেদ কি শিল্পায়ন তথা নগরায়নের দ্বারা দূর হবে বা হ্রাস পাবে? নতুন কোনো 'এলিৎ' উঠবে, না ওই শ্রেণীটাই লোপ পাবে? ওদের স্থান কি জনগণ নিতে পারবে?

আর্যপূর্ব সংস্কৃতির বহমান ধারার সঙ্গে আগন্তুক আর্য সংস্কৃতি বহমান ধারা সম্মিলিত হয়ে যেমন একটি যুক্তবেণী রচনা করেছিল তেমনি আর একটি যুক্তবেণী রচনা করত মুসলিমপূর্ব হিন্দু সংস্কৃতির বহমান ধারার সঙ্গে আগন্তুক মুসলিম বা পারসিক তথা আরব্য সংস্কৃতির বহমান ধারার সঙ্গম। সেদিকে কিছু দূর অগ্রসর হওয়ার পর আর অগ্রসর হওয়া গেল না। ইউরোপ এসে পড়ল। ইংরেজপূর্ব হিন্দু মুসলিম মধ্যযুগীয় সংস্কৃতির বহমান ধারার সঙ্গে আগন্তুক পাশ্চাত্য তথা আধুনিকযুগীয় সংস্কৃতির বহমান ধারার সঙ্গমও কিছুদূর অগ্রসর হয়। এমন সময় পরাধীনতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম শুরু হয়ে যায়। নইলে আরো একটি যুক্তবেণী রচিত হতে পারত। তিনটি যুক্তবেণীর রচনা সমাপ্ত হলে ভারতীয় সংস্কৃতি হতো তিনজোড়া সংস্কৃতির ত্রিবেণীসঙ্গম। আর্যপূর্ব আর আর্য মিলে প্রাচীন হিন্দু। হিন্দু আর মুসলিম মিলে মধ্যযুগীয় হিন্দুস্থানী। ভারতীয় আর আধুনিক পাশ্চাত্ত্য মিলে আধুনিক ভারতীয়।

যে দুটি বেণীরচনা অসমাপ্ত থেকে গেল সে দুটি কি চির অসমাপ্ত থেকে যাবে? না, আবার চেষ্টা করা যাবে যাতে সমাপ্ত হয়। আমাদের পূর্বপুরুষদের আরব্ধ অথচ অসমাপ্ত কাজ আমাদের উপরেই বর্তায়। আমরা না পারলে আমাদের উত্তরপুরুষদের উপর। একদা আমার ধারণা ছিল যে হিন্দু মুসলমানের সাংস্কৃতিক মিলন হিন্দুস্থানী সঙ্গীতে তথা ইন্দো-পারসিক স্থাপত্যে তথা উর্দু সাহিত্যে মূর্ত হয়েছে। তা ছাড়া বেশভূষায় আদবকায়দায় চালচলনে অভিজাত মহলের হিন্দু মুসলমানের একত্ব ঘটেছে। কিন্তু সে ধারণা একেবারে ভুল না হলেও পুরোপুরি ঠিক নয়। ভারতীয় মুসলমানদের একজোড়া উত্তরাধিকার। একটা তো ভারতীয়, আর একটা মধ্যপ্রাচ্য। তাদের সেই মধ্যপ্রাচ্য উত্তরাধিকারের অল্পই হিন্দুরা পেয়েছে। তেমনি হিন্দুদের উত্তরাধিকারেব যেটা প্রাচীনতর অংশ তার ভাগও মুসলমানরা অল্পই পেয়েছে। অল্পের সঙ্গে অল্প মিলে কতটুকু মিলন ঘটাতে পারে! অজ্ঞতার সঙ্গে অজ্ঞতা মিলে তার চেয়ে বহুগুণ অমিল ঘটিয়েছে।

প্রাচীন গ্রীস ও প্রাচীন রোম সম্বন্ধে আমরা সামান্যই জানি। তেমনি খ্রীস্ট-

ধর্ম সম্বন্ধেও আমাদের জ্ঞান পরিমিত। তাদের বাদ দিয়ে আধুনিক ইউরোপের সঙ্গে প্রাচীন ভারতের মিলন কি সম্ভব? অথচ এই ছিল আমাদের ধ্যান। এ ধ্যান ব্যর্থ হয়েছে। প্রাচীনের সঙ্গে প্রাচীনের ও আধুনিকের সঙ্গে আধুনিকের মিলনই সম্ভব ও সঙ্গত। এখন তারই ধ্যান করতে হবে।

ভারতীয় সংস্কৃতি বরাবরই মেলাবার সাধনা করেছে। কখনো পেরেছে, কখনো পারেনি, কিংবা খানিকটা পেরেছে। তার পরিপূর্ণতার জন্যে বাকিটার প্রয়োজন আছে। তাই তার পক্ষে আত্মসন্তুষ্ট হওয়া সাজে না।

আমাদের পাঁচ হাজার বছরের সংস্কৃতি ছয়টি মহান যুগ অতিক্রম করে এসেছে। প্রথমটি হরপ্পা মোহেনজোদরোর সিন্ধু সভ্যতার বিস্মৃত যুগ। আর্য আগমনের পূর্ববর্তী ভারত ছিল সুমেরিয়া ও মিশরের পর তৃতীয় প্রাচীনতম সভ্যতার বিকাশক্ষেত্র। দ্বিতীয়টি আর্য আগমনের পরবর্তী বেদ উপনিষদ্ বৌদ্ধ জৈন ও ব্রাহ্মণ্য ধর্ম ও দর্শনের সিন্ধু থেকে গঙ্গামুখী ও উত্তর থেকে দক্ষিণমুখী অভিযানের যুগ। তৃতীয়টি রামায়ণ মহাভারতের পুরাকাহিনীকে শাশ্বত কাব্যে গ্রথিত করার ও বৌদ্ধধর্মকে সুদূরপ্রসারী করার যুগ, যে যুগে ভারতীয় হিন্দু-বৌদ্ধ সংস্কৃতি এশিয়ার অধিকাংশ দেশে পরিব্যাপ্ত হয়। প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় প্রত্যেকটি যুগের স্থায়িত্ব কমবেশী এক সহস্রাব্দী। চতুর্থটি গুপ্তবংশের পরবর্তী রাজপুত ও পাল যুগ। এ যুগ ছয় শতাব্দীর মধ্যে শেষ হয়। সঙ্গে সঙ্গে প্রাচীন ভারতীয় বা হিন্দু-বৌদ্ধ সংস্কৃতিও নিঃশেষিত হয়ে যায়। বাইরে থেকে প্রেরণা সংগ্রহের প্রয়োজন ছিল। সে প্রেরণা একদিক না আরেকদিক থেকে আসত। প্রথমে এল মধ্যপ্রাচী থেকে। এশিয়ার সেই ভূখণ্ডও ভারতের মতো বহুকালের সভ্যতা ও সংস্কৃতিসম্পন্ন। আর্য ও সেমিটিক ধারা মিলে সেখানেও যুক্তবেণী রচনা করেছিল।

মধ্যপ্রাচী থেকে নতুন প্রেরণা পেয়ে ভারতীয় সংস্কৃতি আবার পুষ্পিত হয়। পঞ্চম যুগে উপনীত হয় ভারতের ইতিহাস। এ যুগ আকবর শাহজাহানের যুগ। নানক কবির চৈতন্যের যুগ। চণ্ডীদাস বিদ্যাপতি মীরাবাই তুলসীদাসের যুগ। বাংলা হিন্দী মরাঠী গুজরাটী প্রভৃতি সাহিত্যের বিকাশের যুগ, হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের গৌরবের যুগ। কিন্তু এ যুগও ছয় শতাব্দীর মধ্যেই নতুন প্রেরণার অভাবে প্রাণহীন হয়ে পড়ে। তখন অভিনবতর প্রেরণা আসে সাগরপার থেকে। কখনো কেউ কল্পনা করতে পারেনি যে ইংলণ্ড ফ্রান্স প্রভৃতি অর্বাচীন দেশ কালক্রমে সুসভ্য ও সুসংস্কৃতিমান হয়ে ভারতকে চীনকে জাপানকে প্রেরণা জোগাবে। এটা যে সম্ভব হলো তার কারণ এসব দেশের রেনেসাঁস ও এনলাইটেনমেণ্ট। ভারতে ঠিক এই জিনিসটির অভাব ছিল। চীন জাপানেও।

ষষ্ঠ যুগ আমাদের ঊনবিংশ তথা বিংশ শতাব্দীর নব জাগরণ। এ যুগ এখনো সমাপ্ত হয়নি। যে জাগরণ এসেছে সংস্কৃতিক্ষেত্রে তার শ্রেষ্ঠ প্রতিভূ রবীন্দ্রনাথ। কিন্তু শেষ প্রতিভূ তিনি নন। মাত্র দুশো বছরে একটা সাংস্কৃতিক যুগের অবসান হয় না। ঊনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর সম্ভাব্যতা এখনো নিঃশেষিত হয়নি। হতে পারে যে মধ্যবিত্তরা অবক্ষয়গ্রস্ত। কিন্তু তাদের অবসাদ

তো সারা দেশের জনগণের অবসাদ নয়। জনগণের দিকে তাকালে আমি অসীম সম্ভাবনা দেখতে পাই। যুগ এখনো অসমাপ্ত। এখন শুধু পশ্চিম ইউরোপ থেকে নয় পৃথিবীর সব দিক থেকে প্রেরণা আসছে। আমাদের সৃষ্টি বাইরে সম্প্রসারিত হচ্ছে। এর পরে আসবে সপ্তম যুগ। জনগণের ভিতর থেকে উদ্ভব হবে নতুন সংস্কৃতির।

শিক্ষা প্রসঙ্গে

আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা আমাদের অতীতকালের শিক্ষাব্যবস্থার থেকে বিবর্তিত হয়নি। সে ব্যবস্থা ছিল মধ্যযুগীয় স্কলাস্টিক ব্যবস্থা। ইউরোপের মতো এদেশেও অচলায়তন সৃষ্টি করেছিল। পরিবর্তনশীল জগতের সঙ্গে সামঞ্জস্যহীন সে ব্যবস্থা যেমন ইউরোপে রহিত হয় তেমনি এদেশেও। তার জায়গা নেয় আধুনিক যুগোপযোগী মানবিকবাদী এই ব্যবস্থা। রামমোহন, বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র প্রমুখ চিন্তাশীলরা এর পক্ষপাতী ছিলেন। আশুতোষ তো ছিলেনই। শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সমর্থন না পেলে এ ব্যবস্থা কখনো এতকাল টিকে থাকত না। আমরা পাঁচ পুরুষ ধরে এই ব্যবস্থায় মানুষ বা অমানুষ হয়েছি।

এ ব্যবস্থা যুগোপযোগী হতে পারে, কিন্তু দেশোপযোগী নয়, সমালোচকদের এই ছিল এক নম্বর নালিশ। স্বাধীনতার আগের দিন পর্যন্ত এ নালিশ শোনা গেছে, কিন্তু স্বাধীনতার পরেও যখন দেখা গেল যে গ্রামে গ্রামে এই ব্যবস্থাই ছড়িয়ে পড়েছে, দেশজ কোনো বিকল্প ব্যবস্থা নয়, তখন বোঝা গেল অশিক্ষিত অমধ্যবিত্তরাও এর সমর্থক।

দুনম্বর নালিশ ছিল এ ব্যবস্থা গণোপযোগী নয়। জনগণের চাই এমন এক শিক্ষা যাতে মাথার সঙ্গে সমানে খাটবে হাত। ওরাও যদি হাতের অনুশীলন ভুলে যায় তো ক্ষেতখামার কলকারখানা কোথাও কিছু গড়ে উঠবে না, উৎপন্ন হবে না। বাবুসমাজ মাথার অনুশীলন করে এই বুনিয়াদী সমস্যার সমাধান করতে পারবে না। তার জন্যে চাই বুনিয়াদী শিক্ষা। গান্ধীজীর বুনিয়াদী শিক্ষা তাঁর সঙ্গে সহমরণে গেছে, সেই নামে যা চলছে তাকে সেই বস্তু বলা সঙ্গত নয়। বুনিয়াদী বিদ্যালয় থেকে যারা বেরিয়ে আসছে তারাও বাবু হতে চায়। তাদের দেখে চেনা যায় না যে তারা কামার কুমোর তাঁতী ছুতোর ইত্যাদির মতো জনগণের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ। চাষবাসের শরিকও নয় তারা।

আজকের সমাজে হাতের চেয়ে মাথার কদর বেশী এটা প্রমাণ করা শক্ত। আমরা দেখছি একজন মিস্ত্রি যা রোজগার করে তা একজন দারোগার চেয়ে কম নয়। একজন মুদির রোজগার একজন হাকিমের চেয়ে বেশী। এরা কেউ ট্যাক্স দেয় না। তাই আরো স্বচ্ছল। নিজেরা স্কুল কলেজে যায়নি বলে এদের মনে

একপ্রকার হীনতাবোধ আছে। সেইজন্যে ছেলেমেয়েদের স্কুল কলেজে পাঠায়। যাতে সমাজে উঠতে পারে। শুনতে পাই ইংরেজীর মাধ্যমই এদের পছন্দ। তার জন্যে মোটা স্কুল ফী জোগায়।

বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থা যেমন মাথাভারী হয়ে উঠছে তাতে এর সম্বন্ধে নিরুদ্বেগ হওয়া সম্ভব নয়। আমিও চিন্তাকুল। কিন্তু সেই যে একটা কথা আছে, "হাতীঘোড়া গেল তল মশা বলে কত জল ?" শিক্ষাজগতে আমি একটি মশা। আমার অযোগ্যতা সম্বন্ধে আমি সজাগ। তাই মূল সমস্যায় সাধারণত কণ্ঠক্ষেপ করিনে। শাখা সমস্যা নিয়ে মাঝে মাঝে দুটি একটি কথা বলি। যদি তার সঙ্গে সংস্কৃতির সম্পর্ক থাকে।

আমি সংস্কৃতির রাজ্যের লোক। আমাদের বর্তমান সংস্কৃতি হচ্ছে একপ্রকার গঙ্গাসাগর সঙ্গম। এতে যেমন স্বদেশের গঙ্গা আছে তেমনি আছে স্বকালের সাগর, যে-সাগর সারা পৃথিবীর একপ্রান্ত থেকে অপরপ্রান্ত অবধি প্রসারিত। গঙ্গাই শুধু থাকবে, সাগরকে বর্জন করতে হবে, এ প্রস্তাবে আমি কোনোদিন রাজী হইনি, কোনোদিন হব না। কারণ এতে আমাদের বর্তমান সংস্কৃতির ক্ষতি করবে। আমাদের পূর্বপুরুষেরা সমুদ্রযাত্রা বারণ করেছিলেন, পাছে আমাদের জাত যায়। সেই আত্মঘাতী ব্যবস্থা যদি আজ অবধি বলবৎ থাকত তাহলে হয়তো আমাদের জাত থাকত, কিন্তু আমরা জাতি হতে পারতুম না, জাতীয় স্বাধীনতা অর্জন করতে পারতুম না, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে কল্কে পেতুম না। সেই আত্মঘাতী ব্যবস্থাকে খিড়কির দরজা দিয়ে আবার ঘরে নিয়ে আসছেন যাঁরা তাঁরা কি জানেন সংস্কৃতির উপর এর প্রতিক্রিয়া কী হবে ? তেমন এক কূপমণ্ডুক সংস্কৃতি নিয়ে কোথায় আমরা দাঁড়াব ? অষ্টাদশ শতাব্দীতে ?

বিশ্ববিদ্যালয় প্রসঙ্গে

অনেকদিন থেকে আমি ভাবছি, কিন্তু লিখতে ভরসা পাচ্ছিনে যে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তার বর্তমান আকারে আর চলতে পারে না। হয় তাকে বিকেন্দ্রীকৃত হতে হবে, নয় তাকে দু'ভাগে বিভক্ত হতে হবে। বিকেন্দ্রীকরণের রকমারি প্রস্তাব সম্প্রতি উপস্থাপিত হয়েছে। তাতে যদি কাজ হয় তবে বিভক্তীকরণের প্রয়োজন হবে না। আমিও অত বড়ো একটা সীরিয়াস অপারেশন প্রস্তাব করব না।

কিন্তু আমার সত্যি সত্যি বিশ্বাস হয় না যে বিকেন্দ্রীকরণের ফলে পড়াশুনার ও পরীক্ষার মান উন্নত হবে, ডিগ্রীর অবমূল্যায়ন রোধ হবে, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাপ পাওয়া ছাত্ররা অন্যত্র কল্কে পাবে। সেইজন্যে আমি সময় থাকতে বিভক্তীকরণের স্বপক্ষে দু'টি একটি কথা নিবেদন করতে চাই।

করতে ভরসা পাচ্ছি আরেকজনের লেখা পড়ে। তিনি প্রস্তাব করেছেন যে প্রেসিডেন্সী কলেজকে একটি স্বশাসিত প্রতিষ্ঠানে পরিণত করা হোক। সেটি হোক একাই একটি বিশ্ববিদ্যালয়।

আমার নিবেদন, বিশ্ববিদ্যালয় হবে দুটি। একটির বাহন ইংরেজী। প্রেসিডেন্সী কলেজ তথা তারই মতো আরো কয়েকটি কলেজ হবে এই বিশ্ব-বিদ্যালয়ের সামিল। অপরটির বাহন বাংলা। অবশিষ্ট কলেজগুলি সেই বিশ্ববিদ্যালয়ের সামিল। কোন কলেজ কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের সামিল হবে সেটা স্থির করবে সেই কলেজের ছাত্ররা। তাদের ভোট নেওয়া হবে। যারা বাংলা চায় তারা একদিকে। যারা ইংরেজী চায় তারা অন্যদিকে। ভোটে যারা হেরে যাবে তারা কলেজ পরিবর্তন করতে পারবে। প্রেসিডেন্সি কলেজ যদি ইংরেজী বাহনের পক্ষে ভোট দেয় তবে বাংলার পক্ষপাতীরা ট্র্যান্সফার সার্টিফিকেট নিয়ে অন্যান্য কলেজে ভর্তি হবে। তেমনি বিদ্যাসাগর কলেজ যদি বাংলার পক্ষে ভোট দেয় তবে ইংরেজীর পক্ষপাতীরা প্রেসিডেন্সীতে বা তার মতো ইংরেজী মাধ্যম কলেজে স্থানান্তর চাইবে।

একবার এই ভাগাভাগির পালা শেষ হলে পরে দুই বিশ্ববিদ্যালয় যে যার রুচি অনুসারে নিয়মকানুন প্রবর্তন বা পরিবর্তন করবে। ছাত্ররা সেটা মেনে নেবে। পুরাতন ঐতিহ্য কারো পক্ষে বলবৎ হবে না। নতুন করে আরম্ভ করার সুযোগ উভয়েই পাবে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় নামটাও ভাগ হয়ে যেতে পারে। কলকাতা বাংলা বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা ইংরেজী বিশ্ববিদ্যালয়। যেমন প্রাগ নগরের চেক বিশ্ববিদ্যালয়, জার্মান বিশ্ববিদ্যালয়। হিন্দীর জন্যে তৃতীয় একটা বিশ্ববিদ্যালয়ও স্থাপন করা যেতে পারে।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতারা জানতেন না যে কালক্রমে এর কলেজ সংখ্যা, ছাত্র সংখ্যা ও পঠনীয় বিষয়সংখ্যা বহুগুণে বেড়ে যাবে। তা ছাড়া বিশ্ব-বিদ্যালয় কেবল পরীক্ষা নেবে না, পড়ানোর দায়িত্বও নেবে। টীচিং ইউনিভার্সিটি হবে। মাধ্যমের প্রশ্নও দিন দিন তীব্র হবে। আজকাল স্কুলের মাধ্যম কয়েকটি ব্যতিক্রম বাদে সর্বত্র বাংলা। অথচ কলেজে সেই সনাতন ইংরেজী। বাংলা মাধ্যম স্কুল থেকে যারা বেরিয়েছে তারা বাংলায় পড়তে চায়, প্রশ্নপত্র চায়, উত্তর দিতে চায়। তাদের সে ইচ্ছা আংশিকভাবে পূরণ করা হলেও ইংরেজীর মতো মর্যাদার সঙ্গে নয়। বিশ্ববিদ্যালয়কে তাদের খাতিরে পুরোপুরি বঙ্গীকৃত করা দরকার। কিন্তু সে পথে কয়েকটি বাধা আছে।

প্রথমত, এমন অনেক বাঙালীর ছেলে আছে, অবাঙালীর ছেলে তো আছেই, যাদের দিক থেকে ইংরেজীই বেশি সুবিধের। ইংরেজীতে অসংখ্য বই পাওয়া যায়, অনুবাদের আশায় বসে থাকতে হয় না। অনুবাদও তো দু'চার বছরের মধ্যে সেকেলে হয়ে যায়। বি. এ., এম. এ. প্রভৃতি ডিগ্রীগুলি আন্তর্জাতিক মর্যাদাসূচক ডিগ্রী। ইংরেজী মাধ্যমের মান অনেকটা আন্তর্জাতিক মান। বাংলা মাধ্যমের মান কি অতটা উঁচু হবে? সময় ও অর্থ ব্যয় করে কেন নিরেস ডিগ্রী নেওয়া? তাকে কি ভবিষ্যতে কর্মসংস্থান সুগম হবে? এসব ছাত্রদের প্রতিও

সমাজের দায়িত্ব আছে। এরা বাইরে গিয়ে প্রতিযোগিতায় নামবে। এদের জন্যে ইংরেজী মাধ্যম স্কুল যদি থাকে কলেজও থাকবে, বিশ্ববিদ্যালয়ও থাকবে।

দ্বিতীয়ত, একটি ছাত্র বাংলা মাধ্যম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাশ করেছে শুনলেই বাংলার বাইরে তাকে না নেবে কেউ উচ্চতর শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে, না দেবে কেউ চাকরি। যদি না সে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়। পশ্চিমবঙ্গ কতটুকু জায়গা! আর সেখানকার প্রাইভেট সেকটরটিও তো অবাঙালীদের দখলে। পড়াশুনার মান নেমে গেলে, পরীক্ষার মূল্য কমে গেলে বি. এ. এম. এ. ডিগ্রীর কদরও হবে কাব্যতীর্থ ব্যাকরণতীর্থের মতো।

আসলে আমাদের শিক্ষাব্যবস্থাটাই বিদেশ থেকে আমদানী আন্তর্জাতিক ব্যবস্থা। এটি জাতীয় ব্যবস্থা নয়। আমরা যদি এর খোল নলচে বদলে দিই তা হলে বাইরের লোক আমাদের আধুনিকতায় সন্দেহ পোষণ করবে। আমাদের ছাত্রদের আরেক দফা পরীক্ষা করে দেখবে তারা সত্যিই যোগ্য কি না। এরা কি সে পরীক্ষায় দেশের মান রাখতে পারবে?

তা সত্ত্বেও আমি বাংলা মাধ্যম বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজী বিশ্ববিদ্যালয়ও রাখতে হবে। ছাত্রদের যেখানে খুশি পড়বার অধিকার মেনে নিতে হবে। যেমন স্কুলের বেলা মেনে নেওয়া হয়েছে। কলকাতায় ইংরেজী মাধ্যম সরকারী স্কুল নেই, বেসরকারী স্কুল আছে, সেখানে দিব্যি ভিড়। বোঝা যায় চাহিদা আছে।

কলকাতা, বোম্বাই, মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয় যে সময় প্রতিষ্ঠিত হয় সে সময় খোদ ইংলণ্ডেই তিনটিমাত্র বিশ্ববিদ্যালয় ছিল। অক্সফোর্ড, কেম্‌ব্রিজ ও লণ্ডন। ইতিমধ্যে ইংলণ্ডেও বহুসংখ্যক বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, বিশেষত দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর থেকে। একই দৃশ্য দেখা যাচ্ছে জার্মানীতে, জাপানে। যতদূর মনে পড়ছে এক টোকিওতেই সতেরোটি কি আঠারোটি বিশ্ববিদ্যালয়। প্রকৃতপক্ষে এগুলি বড়ো মাপের কলেজ, যেখানে পোস্টগ্রাজুয়েট বিভাগও থাকে। গবেষণার ব্যবস্থাও থাকে। যার যার নিজের দেওয়া ডিগ্রী। জিজ্ঞাসা করিনি বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রীর মান সমান কি অসমান।

টোকিওর অনুসরণ করলে কলকাতার বিদ্যাসাগর, বঙ্গবাসী, সিটি, সুরেন্দ্রনাথ প্রমুখ কলেজগুলিতে পোস্টগ্রাজুয়েট বিভাগ খুলে সেগুলিকেও বিশ্ববিদ্যালয়ের স্তরে উন্নীত করা যায়। কিন্তু ততদূর আমি যাব না। আমি শুধু বলব কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্ভুক্ত কলেজগুলিকে দুই ভাগে বিভক্ত করে পোস্টগ্রাজুয়েট বিভাগটিকেও দুই ভাগে ভাগ করতে। কলকাতা বাংলা ও কলকাতা ইংরেজী এই হবে নামকরণ। নামকরণ থেকেই বোঝা যাবে কেন এই ভাগকরণ। বাংলাকে তার উপযুক্ত মর্যাদা না দিলেই নয়। বাংলাদেশে দেওয়া হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গেও দিতে হবে। জনমত সেইদিকেই যাচ্ছে। ওকালতী যদি করতে হয় ইংরেজী মাধ্যম বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষেই করতে হবে। কলকাতা একটি সর্বভারতীয় নগরী।

যেমন দেখা যাচ্ছে ইংরেজী মাধ্যম বিশ্ববিদ্যালয় সারা ভারতে পাঁচটির বেশী

থাকবে না। কলকাতা, বোম্বাই, মাদ্রাজ, দিল্লী সম্বন্ধে মোটামুটি নিশ্চিত হতে পারা যায়। বেনারস ও আলীগড় সম্বন্ধে নিশ্চিত হওয়া যায় না। বিশ্বভারতী সম্বন্ধে আমার ধারণা ওর আন্তর্জাতিক খ্যাতির জন্যে ওখানে ইংরেজী মাধ্যমই চলবে। বাংলা যাঁরা পছন্দ করেন তাঁরাও আশঙ্কা করেন যে ইংরেজী মাধ্যম উঠে গেলে হিন্দী উড়ে এসে জুড়ে বসবে। হিন্দীর জন্যে তাঁরা প্রস্তুত নন। বিশ্বভারতীকে বাংলা মাধ্যম বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত করতে হলে তাকে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারের আমলে আনতে হবে। বাংলা মাধ্যম হলে সে আর কেন্দ্রীয় সরকারের আমলে থাকবে না। তা হলে ইংরেজী মাধ্যম বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা আরো একটি কমবে।

আমার বিশ্বাস ইংরেজীর পক্ষেও জনমতের একাংশ রয়েছে। ভারতের মতো বহুভাষী রাষ্ট্রে হিন্দীই একমাত্র যোগসূত্র হতে পারে না, ইংরেজীকেও অন্যতম যোগসূত্ররূপে রাখতে হবে, অন্তত নাগাল্যান্ড, মেঘালয়, মিজোরাম, পশ্চিমবঙ্গ ও তামিলনাড়ুর খাতিরে। শুনছি শিলংয়ে একটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হবে। সেটি যে ইংরেজী মাধ্যম বিশ্ববিদ্যালয় হবে এতে সন্দেহ নেই। পার্বত্য ভাষাগুলি যথেষ্ট উন্নত নয়। হিন্দীও কেউ চায় না। এই একটি ক্ষেত্রে ইংরেজী মাধ্যম বিশ্ববিদ্যালয় অপরিহার্য, সুতরাং চিরস্থায়ী।

বিশ্ববিদ্যালয়ের সৃষ্টি হয়েছে বিশ্বজ্ঞান বিতরণের তথা অর্জনের জন্যে। সকলের জন্যেই বিশ্বজ্ঞান, কিন্তু কার্যত সমাজের অতি অল্পসংখ্যক তরুণ-তরুণীরই তাতে আন্তরিক আগ্রহ। অধিকাংশের দৃষ্টি জীবিকার উপরে অথবা ডিগ্রীর থেকে যে মর্যাদা আসে সেই মর্যাদার উপরে। জীবিকার অন্য কোনো ব্যবস্থা হলে অনেকেই বিশ্ববিদ্যালয়ের চৌকাঠ মাড়াবে না। কিন্তু মর্যাদার অন্য কোনো বিকল্প নেই। মর্যাদার জন্যে বিস্তর ছাত্র ছাত্রী জীবিকার অপর কোনো ব্যবস্থায় আকৃষ্ট না হয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে এসে ভিড় করবে ও বিশ্ববিদ্যালয়ের হাত থেকে মর্যাদার রাজটীকা নিয়ে জীবিকার সন্ধানে বেরোবে। এটাই এখনকার আন্তর্জাতিক রীতি। রাশিয়া ও চীনও এই সমস্যার থেকে মুক্ত নয়।

ডিগ্রী এখন সব দেশেই স্টেটাস সিম্বল। আফ্রিকাই হোক আর এশিয়াই হোক প্রধানমন্ত্রী বা রাষ্ট্রপতিদের নামের আগে দেখি "ডক্টর"। যাঁরা রীতি-মতো পড়াশুনা করে ওই ডিগ্রী পাননি তাঁরা পেয়েছেন সম্মানস্বরূপ। এর থেকে বোঝা যায় পৃথিবীর সর্বত্র বিদ্বান বা ময়ূরপুচ্ছধারী বিদ্বানদের কত সম্মান। ছেলেমেয়েরা যদি একধার থেকে ডক্টর হতে চায় তা হলে আশ্চর্য হবার কি আছে! দিল্লীর হায়ার সেকেন্ডারি পরীক্ষায় যে ছেলেটি প্রথম হয়েছে সে বলেছে তার লক্ষ্য বাইশ বছর বয়সে ডক্টর হয়ে তারপরে আই এ এস পরীক্ষায় বসা। অর্থাৎ সে চীনদেশের মান্দারিনদের ঐতিহ্য অনুসরণ করবে।

ওদিকে গণচীন পণ করেছে মান্দারিন কাউকে হতে দেবে না। বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ পাবার আগে প্রত্যেককে প্রমাণ করতে হবে যে সে তিন বছর না চার বছর ক্ষেতেখামারে বা কারখানায় হাতেকলমে কাজ শিখেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রীর মোহ অধিকাংশেরই মিটে যাবে, যাদের থাকবে তারাও আবার সেই

ক্ষেতখামার বা কারখানায় ফিরে গিয়ে জীবিকা অর্জন করবে। এটাও একপ্রকার পরিবার পরিকল্পনা। বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ বাড়তির দিকে যাবে না। বাছা বাছা ছাত্রছাত্রীরাই প্রবেশ পাবে।

আমরা যাকে পরীক্ষা বলি সেও তো একপ্রকার বাছাই। যতগুলো আসন খালি ততগুলি প্রার্থী থাকলে পরীক্ষার দরকার হতো না। সবাইকে ভর্তি করে নেওয়া যেত। কিন্তু প্রার্থীর সংখ্যা তার বহুগুণ। সেইজন্যেই পরীক্ষা অর্থাৎ বাছাই। পরীক্ষায় সবাইকে পাশ করিয়ে দিলে যে বিশ্ববিদ্যালয় অঙ্গন প্লাবিত হবে। অথচ ফেল করিয়ে দেওয়াও নিষ্ঠুরতা। জীবিকার অপর কোনো ব্যবস্থা করতেই হবে। তার জন্যে চাই কায়িক পরিশ্রমে রুচি। এমন কোন সমাজ নেই যে সমাজ লক্ষ লক্ষ মান্দারিনকে উৎপাদকমূলক কর্মে নিযুক্ত করতে পারে।

তা বলে কাউকেই মান্দারিন হতে দেওয়া হবে না এ নীতিও ঠিক নয়। বাছা বাছা ছাত্রছাত্রীদের মান্দারিন হতে না দিলে জ্ঞানের তপস্যা করবে কারা?

পরীক্ষা প্রসঙ্গে

যতগুলি ছাত্র ইস্কুলে পড়ে ততগুলি ছাত্র কলেজে পড়তে চাইলে কলেজের সংখ্যা বহুগুণ হওয়া চাই। সেটা সম্ভব নয় বলে সবাইকে কলেজে পড়তে দেওয়া হয় না। কেবলমাত্র তাদেরি পড়তে দেওয়া হয় যারা ইস্কুলের পরীক্ষায় পাশ করেছে। আবার অগ্রাধিকার দেওয়া হয় তাদেরি যারা প্রথম বা দ্বিতীয় বিভাগে পাশ করেছে।

তেমনি যতগুলি ছাত্র কলেজে পড়ে ততগুলি ছাত্র বিশ্ববিদ্যালয়ে এম-এ, এস-এর্সাস পড়তে চাইলে বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা বহুগুণ হওয়া চাই। সেটা সম্ভব নয় বলেই সবাইকে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে দেওয়া হয় না। কেবলমাত্র তাদেরি পড়তে দেওয়া হয় যারা কলেজের পরীক্ষায় পাশ করেছে। আবার অগ্রাধিকার দেওয়া হয় তাদেরি যারা প্রথম বা দ্বিতীয় শ্রেণীর অনার্স পেয়েছে।

যাঁরা পরীক্ষা জিনিসটা বেবাক উঠিয়ে দিতে চান তাঁরা কি কলেজের সংখ্যা ও বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা বহুগুণ করতে চান? এমনিতেই ইস্কুলের ছাত্রদের সংখ্যা দিন দিন বেড়ে চলেছে। ভবিষ্যতে প্রত্যেকটি শিশুকে প্রাথমিক শিক্ষার সুযোগ দেওয়া হবে। তখন প্রাথমিক ছাত্রদের সংখ্যা এখনকার চার পাঁচগুণ হবে। মাধ্যমিক শিক্ষার ব্যবস্থাও অন্যান্য দেশে প্রাথমিকের মতোই সার্বজনীন। এদেশেও তার দরকার হবে। তখন মাধ্যমিক ছাত্রদের সংখ্যা এখনকার আট দশগুণ হবে।

বিনা পরীক্ষায় মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শেষ ধাপটি পর্যন্ত পৌঁছে দেওয়া যায়। কিন্তু কলেজে ওঠার সময় পরীক্ষা অনিবার্য। নইলে কলেজের সংখ্যা

এখনকার বিশ পঁচিশগুণ হবে। প্রত্যেকটি প্রাথমিক ছাত্র যদি দাবী করে যে তাকে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার সুযোগ দিতে হবে তা হলে বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা এখনকার শতগুণ হবে।

দেশের ধনসম্পদ কত বেশী হলে এটা সম্ভব হবে ভেবে দেখেছেন কি? যদি ভেবে দেখেন তবে কোনো এক জায়গায় লাইন টানতেই হবে। বিনা পরীক্ষার প্রাথমিক শিক্ষা চলতে পারে। মাধ্যমিক শিক্ষাও চালাতে চেষ্টা করা যাবে। কিন্তু বিনা পরীক্ষায় কলেজের শিক্ষা কোনো দেশেই চলতি হয়নি, হয়ে থাকলে আমার জানা নেই। সংখ্যা যদি নির্দিষ্ট হয় তবে পরীক্ষা ছাড়া উপায় নেই। সেকেণ্ডারি বোর্ড যদি পরীক্ষা না করে প্রত্যেকটি কলেজ নিজের মতো করে পরীক্ষা করে নেবে। সে পরীক্ষায় সবাই পাশ করবে না, কলেজে যতগুলি সীট ততগুলি পাশ করবে। তেমনি প্রত্যেকটি বিশ্ববিদ্যালয় নিজের মতো করলে সে পরীক্ষাতেও সবাই পাশ করবে না। নয়তো চাকরিক্ষেত্রে আবার পরীক্ষা দিতে হবে।

কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা বাড়তে দেওয়া মানেই বেকার সংখ্যা বাড়তে দেওয়া। সমাজ যেদিন সবাইকে চাকরি বা স্বাধীন জীবিকা জোগাতে পারবে সেদিন কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা আপনা থেকেই বাড়বে। আপাতত অবস্থা অনুসারে ব্যবস্থা। পরীক্ষা নামক প্রথাটি একেবারে তুলে দেওয়া যুক্তিসঙ্গত নয়। তবে সেটিকে যথাসম্ভব সদয় ও সৎ করতে হবে। ছাত্রদের একথাও বোঝাতে হবে যে পরীক্ষা জিনিসটা তাদের স্বার্থেই অনুষ্ঠিত হয়। নয়তো তাদের অনেক রকম ঝামেলা পোহাতে হবে। কলেজ কর্তৃপক্ষ কখনো সবাইকে জায়গা দেবেন না। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষও না। চাকরি-দাতারাও না। যোগ্যতার বিচার করে তারপর জায়গা দেবেন।

পরীক্ষার ফলে কতক ছাত্রকে গোড়া থেকেই ছাঁটাই করতে হবে, এটা একটা অপ্রিয় কর্তব্য। তাদের জন্যে কারিগরি শিক্ষা, কৃষিশিক্ষা, সামরিক শিক্ষা প্রভৃতির ব্যাপক আয়োজন চাই। তা হলে ফেল করা ছাত্ররাও জীবনে সফল হতে পারবে। জীবনের সাফল্যটাই তো আসল। পরীক্ষায় সাফল্যটা জীবনের সাফল্যের পথ প্রশস্ত করে বলেই মূল্যবান। কিন্তু সব সময় করে কি? করলে এত পাশ করা ছেলে বেকার হতো কেন?

শিক্ষা, শিক্ষার্থী ও শিক্ষক

শিক্ষা, শিক্ষার্থী ও শিক্ষক এই নিয়ে ত্রয়ী। আমরা সাধারণত একদেশদর্শী। হয় শিক্ষার্থীদের বাদ দিয়ে বা তুচ্ছ করে ভাবি। নয় শিক্ষকদের সংখ্যানুপাত ও প্রয়োজনীয় অর্থসংস্থান উপেক্ষা করে ভাবি। শিক্ষার্থীদের উপর পাঠ্য-পুস্তকের যে বোঝাটি চাপানো হয় সেটি তারা পশু হয়ে থাকলে পশুক্লেশ-

নিবারণী আইনের আমলে আসত। ছাত্রক্লেশনিবারণী আইন না থাকায় কর্তৃপক্ষ যা খুশি করে যাচ্ছেন। ছাত্ররাও এতদিনে বিদ্রোহ করতে শিখেছে। তাদের বিদ্রোহ এখন ধ্বংসের পথ ধরেছে।

শিক্ষকরাও যে প্রকারান্তরে বিদ্রোহী নন তা নয়। আমাদের রাজস্বের সিংহের ভাগ চলে যায় সৈন্য ও পুলিশ বিভাগে। সে খরচ না কমালে শিক্ষার জন্যে খরচ বাড়ানো শক্ত। লোকে শিক্ষার জন্যে নতুন একটা কর দিতে উৎসাহী নয়। তবে ওদের যদি ব্যাপকভাবে মদ, গাঁজা, আফিং চরস ধরানো যায় তা হলে অবশ্য প্রচুর টাকা শিক্ষার খাতে খরচ করা চলে। ইতিমধ্যে সেই উপায়েই শিক্ষাবিস্তার হয়েছে। কিন্তু শিক্ষাবিস্তার যেমন হয়েছে অপরাধবিস্তারও তেমনি হয়েছে। তার ফলে পুলিশ বিস্তার, আদালত বিস্তার, জেল বিস্তার।

শিক্ষকদের জানা উচিত যে শিক্ষার সঙ্গে আরো দশটা প্রশ্নও গভীরভাবে জড়িত। যে দেশের লোক শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষার অহিংস উপায় জানে সে দেশের পুলিশ ও সৈন্য ব্যবস্থা এত বেশী ব্যয়সাপেক্ষ হয় না। কাজেই শিক্ষার খাতে যথেষ্ট টাকা খরচ করতে পারা যায়। তার জন্যে যত্র তত্র মদের দোকান খুলতে হয় না। নাবালকদেরও মদ খেতে প্রশ্রয় দেওয়া হয় না। অহিংসা একটা পুঁথিগত তত্ত্ব নয়। ব্যবহারিক জগতে এর আবশ্যকতা আছে বলেই আমি অহিংসায় বিশ্বাসী। দেশের লোক যতই এর থেকে সরে যাচ্ছে ততই আমাদের সমস্যাগুলো জটিল থেকে জটিলতর হচ্ছে। এর পরে হয়তো দেখা যাবে যে ছাত্ররাই শিক্ষকদের শিক্ষক হয় বসেছে ও বেতনদানের বদলে বেত্রদান করছে। তখন প্রত্যেকটি বিদ্যালয়ে থানা বসাতে হবে।

যে ত্রয়ীর উল্লেখ করেছি তার সুষ্ঠু সমন্বয় চাই। শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও শিক্ষা কর্তৃপক্ষ একসঙ্গে মিলিত হয়ে আলাপ আলোচনা করুন। প্রত্যেকে প্রত্যেকের মত শুনুন। পারস্পরিক বিচার বিশ্লেষণের ফলেই একটি উন্নততর ব্যবস্থার বিবর্তন হবে।

লোকশিক্ষা

যে দেশ সুদীর্ঘকাল পরাধীন থেকে অবশেষে একদিন মুক্তি পেয়েছে তার প্রধান চিন্তা হওয়া উচিত আর যাতে পরাধীন হতে না হয় তার জন্যে আটঘাট বাঁধা। স্বাধীনতার প্রাক্‌কাল হতেই এ চিন্তা আমাকে পেয়ে বসেছিল। আমি ভাবতুম স্বাধীন হয়ে আমাদের প্রথম কাজ হবে শিক্ষার উপর সবচেয়ে বেশী জোর দেওয়া। বিশেষ করে লোকশিক্ষার উপরে। যে দেশের জনগণ শিক্ষার আলো পেয়েছে সে দেশ সহজে পরাধীনতা স্বীকার করবে না। তার থেকে পরিত্রাণের উপায় খুঁজে বার করবে। সে উপায় সশস্ত্র না হয়ে নিরস্ত্র হতেও পারে। কিন্তু যে দেশের জনগণ অজ্ঞ তারা একেবারেই নিরুপায়।

আকবর, শিবাজী, রণজিৎ সিংহ নিরক্ষর ছিলেন। এর থেকে ধারণা জন্মাতে পারে যে রাম শ্যাম যদু মধুও নিরক্ষর থাকলে ক্ষতি নেই, তারাও

তেমনি যোদ্ধা হবে। বণিকদের মধ্যেও নিরক্ষরতা লক্ষ্য করা যায়। তা সত্ত্বেও লক্ষপতি কোটিপতি হতে তাঁদের বাধেনি। বাধবে কি কেবল রাম শ্যাম যদু মধুর বেলা? খবর নিলে জানা যাবে যে মন্দিরনির্মাতা প্রাসাদনির্মাতারাও নিরক্ষর ছিলেন। কারিগর শ্রেণীর লোক নিরক্ষর হয়েও সৌন্দর্যসৃষ্টি করেছে। কৃষক শ্রেণীর লোক নিরক্ষর হয়েও সোনা ফলিয়েছে।

এসব ক্ষেত্রে ধরে নেওয়া হচ্ছে যে শিক্ষা মানেই অক্ষরপরিচয়, অক্ষরপরিচয় মানেই শিক্ষা। আসলে তা নয়। শুনেছি অষ্টাদশ শতাব্দীর পূর্বে বেদ কখনো লিপিবদ্ধ হয়নি। স্যার উইলিয়াম জোন্স উদ্যোগী না হলে লিপিবদ্ধ হতো না। চিরকাল মুখে মুখেই সংরক্ষিত হয়ে এসেছিল, মুখে মুখেই সংরক্ষিত হতো। তবে কি বলতে হবে যে বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণরা ছিলেন অশিক্ষিত? একজন মানুষ চক্ষুর মাধ্যমে শেখে, একজন শেখে কর্ণের মাধ্যমে। দুটোই শিক্ষা। ছাপাখানা যখন ছিল না, খুব কম লোকই বই পড়ে শিখত, বেশীর ভাগই শিখত যাত্রা দেখে, কথকতা শুনে। আকবর, শিবাজী, রণজিৎ সিংহেরও অস্ত্রশিক্ষা হয়েছিল। শাস্ত্রশিক্ষার মতো অস্ত্রশিক্ষাও একপ্রকার শিক্ষা। কৃষক শ্রমিক কারিগর যে যার বৃত্তি শিখত গুরুজনের কাছে, গুরুর কাছে। ব্যবসায়ীরা দোকানে বসে হাতে কলমে শিখত। শিক্ষানবীশীও শিক্ষা।

একালে আমরা ধরে নিয়েছি যে স্কুল কলেজে না গেলে শিক্ষা হয় না। সেইজন্যে স্কুল কলেজ স্থাপন করতে লেগে গেছি। দেশের পঞ্চান্ন কোটিকে স্কুল কলেজে পড়ানো কি কোনো কালে সম্ভব? স্বাধীনতা যদি স্কুল কলেজের উপর নির্ভর করে তবে কি তা আমাদের কপালে বেশী দিন টিকবে?

স্কুল কলেজ থাকবেই, তাদের সংখ্যাও থাকবে। কিন্তু কোনোদিনই এমন অবস্থা হবে না যেদিন দেশের প্রত্যেকটি ছেলেমেয়ে হাই স্কুলে পড়ছে, কলেজে পড়ছে, পাশ করে বেরিয়ে এসে চাকরি পেয়ে যাচ্ছে। অধিকাংশকেই লাঙল ধরতে না হোক ট্রাক্টর চালাতে হবে। তাঁত বুনতে না হোক কাপড়ের কলে কাজ করতে হবে। খনিতে নেমে লোহা তুলে আনতে হবে, নল বসিয়ে খনিজ তৈল তুলতে হবে। যেখানে শতকরা নব্বই জন কায়িক শ্রমসাধ্য নিত্যকর্মে ব্যাপৃত সেখানে বাকী দশজন মানসিক শ্রমসাধ্য কর্মে নিযুক্ত হতে পারে। তাদের বেশীর ভাগই করণিক বা দোকানের কর্মচারী। অল্প কয়েকজন জজ, ম্যাজিস্ট্রেট, ডাক্তার, মাস্টার, উকিল, এঞ্জিনীয়ার, সিভিল অফিসার, মিলিটারি অফিসার, সওদাগরী অফিসার, কারখানার মালিক, কোম্পানীর ডাইরেকটার, দোকানদার বা ঠিকাদার।

সমাজের এই গড়ন সমাজতন্ত্রও রাতারাতি উল্টিয়ে দিতে পারবে না। সমাজতন্ত্রী দেশগুলিতে এখনো সেটা সম্ভব হয়নি। এখনো তারা ওলটপালটের সমস্যায় জর্জর। চেকোস্লাভাকিয়ার নয়া এঞ্জিনীয়ার শ্রেণী বলে, "আমরা এত লেখাপড়া শিখে এত মাথা খাটিয়ে পাই মাসে বাইশ শো মুদ্রা আর ওরা সামান্য পড়াশুনা করে নিছক গতর খাটিয়ে পাবে মাসে আঠারো শো মুদ্রা! মাথা খাটানো আর গতর খাটানোর মাঝখানে এত স্বল্প ব্যবধান! এই কি আমাদের

সামাজিক ন্যায় !" চেকোস্লাভাকিয়ার এই বিতর্ক বাইরের কমিউনিস্ট শক্তিরা সৈন্য পাঠিয়ে দেশ দখল করে থামিয়ে রেখেছে। সৈন্য একদিন ফিরে যাবে। তখন আবার বিতণ্ডা। চীনারাও এই নিয়ে নাজেহাল হচ্ছে। বিপ্লব একবার হয়েই চুকে যায় না। বার বার হয়। যতদিন না সম্পূর্ণ সাম্য আসছে ততদিন বিপ্লবের বিরাম নেই। সম্পূর্ণ সাম্য কি কোনোদিন আসবে ? মাথার কাজ আর গতরের কাজ কি একদর হবে ? মুড়ি মিছরির এক দর কি সম্ভব ? সাম্য প্রতিষ্ঠা করতে হলে ত্যাগের দ্বারা করতে হবে।

এসব কথা মনে রেখে লোকশিক্ষার আয়োজন করতে হবে। একই প্রকার শিক্ষা সকলের জন্যে নয়। তবে কতকগুলো বিষয়ে কতকদূর জ্ঞান সকলের জন্যেই। অজ্ঞানের অন্ধকারে কোনো মানুষকেই রাখা চলবে না। যাত্রা কথকতা রেডিও সিনেমার সাহায্যে সবাইকে মোটামুটি শিক্ষিত করে তুলতে হবে। যদিও সবাই ইনটেলেকচুয়াল বলে বিদিত হবে না। মোটা ভাত মোটা কাপড়ের মতো মোটা শিক্ষা সকলের ভাগেই জুটবে। প্রাথমিক বিদ্যালয় ব্যতীত আর কোনো স্কুলে না গিয়েও যাতে এটা সম্ভব হয় তার জন্যে বিশ্বভারতীর লোকশিক্ষা সংসদের মতো প্রতিষ্ঠান সর্বত্র গড়ে তোলা দরকার।

বাংলা প্রবর্তন

সরকারী বেসরকারী আপিস আদালত কোম্পানী কর্পোরেশন প্রভৃতিতে ইংরেজীর পরিবর্তে বাংলা প্রবর্তন করতে হবে এ দাবী আজকের নয়। স্বাধীনতার সময় থেকেই শোনা যাচ্ছে। কিন্তু কাজ বেশীদূর এগোয়নি। কেন, তা ভেবে দেখা দরকার।

বাংলা প্রবর্তনের প্রস্তাব উঠলেই আমরা সর্বপ্রথমে তৈরি করতে বসে যাই পারিভাষিক শব্দ। তার জন্যে গ্রামে যাইনে, গ্রামের লোকের সঙ্গে কথা বলিনে, বাংলার বহমান ধারায় ডুব দিইনে। বাংলাভাষার পুঁথিপত্রও ঘাঁটিনে। মোল্লার দৌড় যেমন মসজিদ অবধি আমাদের দৌড় তেমনি ইঙ্গসংস্কৃত অভিধান অবধি। আপ্‌টে প্রমুখ মারাঠী পণ্ডিত ইংরেজীর প্রতিশব্দ যেমনটি লিখেছেন আমরাও তারই অনুরূপ রচনা করি। আর তারই নাম দিই বাংলা পারিভাষিক শব্দ।

ইতিমধ্যে ইংরেজী শব্দের সঙ্গে আমাদের দেশবাসীর পরিচয় দেড়শো কি দুশো বছর ধরে হয়েছে। বহু ইংরেজী শব্দ লোকমুখে তৎসম বা তদ্ভব হয়ে গেছে। তাদের বদলে সংস্কৃত পারিভাষিক শব্দ সৃষ্টির সত্যিকার প্রয়োজনই নেই। আমাদের উদ্দেশ্য যদি হয় ইংরেজীর বদলে বাংলা তা হলে সংস্কৃতর কাছেই বা আমরা যাব কেন ? তা হলে কি আমাদের লক্ষ্য বাংলা প্রবর্তন নয়, সংস্কৃত পুনঃপ্রবর্তন ? সে চেষ্টা জনাকতক পণ্ডিতের প্রীতিবর্ধন করতে পারে, কিন্তু আজকের দুনিয়ায় সাধারণ মানুষের কাজে লাগবে না। সাধারণ লোক কংগ্রেসকে বা যুক্তফ্রন্টকে ভোট দেয়, সি. পি. আই বা সি. পি. আই. এম-এর

সভায় যায়। করুন দেখি এগুলির সংস্কৃত ভাষান্তর। কেউ গ্রহণ করবে না। তেমনি ওরা ট্রামে বাসে চড়বে, রেলের স্টেশনে গিয়ে টিকিট কাটবে, তারপর প্ল্যাট-ফর্মে গিয়ে ট্রেন ধরবে, ব্যাঙ্কে গিয়ে চেক ভাঙাবে, দোকানে গিয়ে নোট ভাঙাবে, ব্যালান্স মিলিয়ে নেবে। শেখান দেখি ওদের সংস্কৃত পারিভাষিক শব্দ।

অসংখ্য ইংরেজী শব্দ বাঙালীর মুখে থাকতে এসেছে। সুতরাং লেখনীর মুখেও থাকবে। তার পরিবর্তে সংস্কৃত কেউ মেনে নেবে না। অভিধানের শব্দ অভিধানেই থেকে যাবে। জীবনে প্রচলিত হবে না। সরকারের কাজকর্ম কি প্রচলিতকে নিয়ে, না অচলিতকে নিয়ে? সরকারী বাংলা কি কাজ চালানোর জন্যে, না শোভাবর্ধনের জন্যে? যদি কাজ চালানোকেই অগ্রাধিকার দিতে হয় তবে কথায় কথায় সংস্কৃত অচলিত শব্দের আশ্রয় না নিয়ে ইংরেজী চলিত শব্দের আশ্রয় নিতে হয়।

পারিভাষিক শব্দ তৈরি করার ভার বাইশ বছর আগে যাঁদের উপর পড়েছিল তাঁরা কেবল ইংরেজীর নয়, আরবী ফারসীরও পারিভাষিক শব্দ বানাতে আরম্ভ করেন। মুনসেফ কথাটি ইংরেজীও নয়, ইংরেজদের সৃষ্টিও নয়। অথচ তারও একটি সংস্কৃত পারিভাষিক শব্দ চাই। এর মানে কী? মুসলমানী আমলটাকেই প্রক্ষিপ্ত বলে অস্বীকার করা? তা হলে তো দেওয়ানী ফৌজদারি আইনকানুনের ভাষা বেবাক বদলাতে হয়। উকিল মোক্তার সেরেস্তাদার নাজির পেশকার পেয়াদা চৌকিদার খাজাঞ্চি পোদ্দার প্রভৃতি ইংরেজ আমলের দেড়শো দু'শো বছরেও বিলুপ্ত হয়নি। এবার তা হলে তারা পণ্ডিতদের কোপানলে ভস্ম হবে।

লোকের মনে যে পরিমাণ ইংরেজবিদ্বেষ ছিল সে পরিমাণ ইংরেজীবিদ্বেষ ছিল না। তেমনি যে পরিমাণ মুসলমানবিদ্বেষ ছিল সে পরিমাণ আরবীফারসী বিদ্বেষ ছিল না। সুতরাং লোকে তাদের পরিচিত ভাষাকে রাজভাষা বলে রাজার সঙ্গে সঙ্গে বিদায় দেয়নি। নিজেদের প্রয়োজনেই ভাণ্ডারে মজুত করে রেখেছে। এটাই সব দেশের রীতি। ইংলণ্ডের ইতিহাসেও এর নজীর আছে। রোমানদের বিদায়ের পরেও রোমান আইন ও লাটিন ভাষা থেকে যায়। নর্মান বিজয়ের পর ফরাসী ভাষা ও ফরাসী আচার এল। এখনো কি তার জের মিটেছে? লাট-সাহেবের সঙ্গে আহারের নিমন্ত্রণ যতবারই পেয়েছি ততবারই দেখেছি মেনু ছাপা হয়েছে ফরাসী ভাষায়।

সব কিছু বিশুদ্ধ সংস্কত করতে গেলে তাই হবে যা হয়েছে হিন্দীর বেলা। ইংরেজীকে তাড়াবার নাম করে সে আরবী ফারসীকে তাড়াচ্ছে। উর্দুর সঙ্গে তার এখন শত্রু সম্পর্ক। এর ফলে হিন্দীর বিবর্তন হাজার বছর পিছিয়েই যাচ্ছে। কী করে সে অগ্রসর চিন্তাকে ধারণ করবে? যার চোখ সামনের দিকে আর পা পেছনের দিকে তার প্রগতিকে ব্যাহত করে তার পশ্চাদ্‌গতি। বাংলা যে হিন্দীর পথ এখনো ধরেনি তার কারণ বাংলার ঐতিহ্য যাবনীমিশাল। ভারতচন্দ্রই পথ নির্দেশ করে দিয়ে যান। কিন্তু পারিভাষিক শব্দ তৈরি করার ভার যাঁদের উপর পড়বে তাঁদের যদি যাবনীমিশালে আপত্তি থাকে তা হলে বাংলার পথও হবে হিন্দীর মতো বিশুদ্ধ সংস্কৃত। সেটা আপাতত ইংরেজীর

পরিবর্তে হলেও অতঃপর আরবী ফারসীর পরিবর্তেও হবে। বিংশ শতাব্দীতে বাস করেও আমরা দ্বাদশ শতাব্দীর স্বাদ পাব। অমন করে ইতিহাসকে উজান-মুখী করার চেষ্টায় সময় নষ্ট করার চেয়ে ইংরেজীকে চালু রাখাও ভালো।

পারিভাষিক শব্দের জন্য মাথা না ঘামিয়ে হাতের কাছে যে শব্দ পাওয়া যায় সেই শব্দ দিয়ে কাজ চালানো গোছের বাংলায় সরকারী বেসরকারী চিঠিপত্র ও রিপোর্ট লেখা যদি সকলের সম্মতি পায় তবে কাল সকালেই বাংলা প্রবর্তন করতে পারা যায়। তার জন্যে অনির্দিষ্টকাল পদচারণ করতে হয় না। সে বাংলায় সংস্কৃত যেমন থাকবে তেমনি থাকবে আরবী ফারসী ও ইংরেজী। যেখানে যেটা মানায়।

তবে এটাও মনে রাখতে হবে যে বাংলা ভাষায় কেন্দ্রের সঙ্গে পত্রব্যবহার চলবে না। তার জন্যে চাই ইংরেজী বা হিন্দী। তেমনি বাংলা ভাষায় বিহার সরকার বা আসাম সরকারের সঙ্গে পত্রব্যবহার চলবে না। তার জন্যেও চাই ইংরেজী বা হিন্দী। তেমনি বাংলা ভাষায় আন্তর্জাতিক বা আন্তঃপ্রাদেশিক সওদাগরী সংস্থা বা শিল্পসংস্থার সঙ্গে পত্রব্যবহার চলবে না। সে ক্ষেত্রেও ইংরেজী বা হিন্দী। এমনি কয়েকটি ক্ষেত্র বাদে আর সব জায়গায় বাংলায় পত্র-ব্যবহার চলতে পারে। কলকাতার সঙ্গে মুর্শিদাবাদের পত্রব্যবহার কেন যে ইংরেজীতে হবে তার কোনো কারণ নেই। কলকাতার মহাকরণের সঙ্গে বিভিন্ন ডাইরেক্টরেটের পত্রব্যবহার বাংলাতে না হয়ে ইংরেজীতে হতে বাধ্য নয়। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সঙ্গে কলকাতা কর্পোরেশনের পত্রব্যবহারও বাংলাতেই হতে পারে।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের এক বিভাগের সঙ্গে অপর বিভাগের পত্রব্যবহার বাংলাতেই হওয়া বাঞ্ছনীয়। কিন্তু যেখানে আইন কানুনের সুক্ষ্ম ব্যাখ্যার প্রয়োজন সেখানে অর্থাৎ হাইকোর্টে ও জেলাকোর্টে ইংরেজীর স্থান সামনের পঞ্চাশ বছরেও যাবার নয়। সেখানে যেটা সম্ভব সেটা একপ্রকার দ্বৈভাষিকতা। ইংরাজীতে ও বাংলাতে কাজকর্ম ভাগ বাঁটোয়ারা করে নিতে হবে। ইংরেজ রাজত্বেও বাংলা ছিল আদালতের ভাষা। জজকেও বাংলায় জুরিদের চার্জ বুঝিয়ে দিতে হতো। আসামীকে তার বিরুদ্ধে অভিযোগ বুঝিয়ে দিতে হতো। যেখানে জজ বাংলায় বোঝাতে পারতেন না সেখানে বাংলায় বোঝাতেন তাঁর পেশকার। আমি তো উকিল মহাশয়দের বাংলাতেই সওয়াল করতে সুযোগ দিয়েছি, কিন্তু তাঁরা সে সুযোগ নেননি। তার কারণ তাঁদের মক্কেলরা ঠাওরাবে যে উকিল মহাশয়রা ইংরেজিতে কাঁচা। তাই এক অদ্ভুত দৃশ্য দেখতে হতো। জজ বাঙালী, উকিল বাঙালী, সাক্ষী বাঙালী, আসামী বাঙালী, অথচ সওয়াল চলছে ইংরেজীতে। এর জন্যে ইংরেজরা দায়ী নয়। বাংলাই ছিল আদালতের ভাষা। ইংরেজদেরও বাংলা শিখতে বাধ্য করা হতো। পরীক্ষা দিতে হতো। বাংলা আদালতের ভাষা তখনো ছিল, এখনো আছে।

আমি যতদূর দেখতে পাচ্ছি আইন আদালতের ক্ষেত্রে ইংরেজীও থাকবে, বাংলাও থাকবে, প্রত্যেকটি বিচারককে ভালো করে ইংরেজী শিখতেই হবে।

প্রত্যেকটি উকিলকেও। কিন্তু কথায় কথায় ইংরেজী ব্যবহার করার সত্যি কোনো দরকার নেই। বরঞ্চ যত বেশী বাংলা ব্যবহার করা হয় তত ভালো। বিচারটা কী ভাবে হচ্ছে সাধারণ লোকের সেটা জানা উচিত। সুবিচার হলো, অথচ লোকে বুঝতে পারল না, এটা ন্যায়ক্ষেত্রের নীতি নয়। সুবিচারও হবে, লোকেও জানবে যে সুবিচার হলো, দুই একসঙ্গে চলবে। তার জন্যে বাংলাই প্রশস্ত। যেখানে সকলেই বাঙালী সেখানে বাংলাকে তার অগ্রাধিকার দিতে হবে। কিন্তু ইংরেজীকেও বজায় রাখতে হবে এই জন্যে যে আমাদের অসংখ্য আইন রাতারাতি বাংলায় তর্জমা করা যাবে না, তর্জমা করলেও তার সূক্ষ্ম অর্থ প্রকাশ করা যাবে না। তাছাড়া অসংখ্য নজির, অসংখ্য রুলিং রয়েছে ইংরেজীতে। বাংলায় সেসব তর্জমা করতে যাওয়া পণ্ডশ্রম। কারণ বাংলা বই ক'জন কিনবে ? তর্জমার মজুরি পোষাবে না। এক একজন উকিলের চেম্বারে কী পরিমাণ আইনের কেতাব থাকে তা সকলেই লক্ষ্য করেছেন। বাংলায় তর্জমা করার কথা ভাবা যায় না।

তারপর সব কিছু তর্জমার আইডিয়াটাই ভ্রান্ত। বাংলায় তর্জমা হলে যাঁরা ওসব কিনবেন তাঁরা ইংরেজীও ভালো জানেন। ইংরেজী মূল গ্রন্থটাই তাঁদের কাছে প্রামাণিক। সেটাই তাঁরা কম দামে কিনবেন। মনে করুন, সারা ভারতের জন্যে ক্রিমিনাল প্রোসিডিওর কোড এক। বাজারে তার যে সংস্করণ পাওয়া যায় তাতে বিভিন্ন হাইকোর্টের রুলিং দেওয়া থাকে। প্রতি বছরই সংস্করণ বদলে যায়। তার ইংরেজী সংস্করণ সারা ভারত জুড়ে বিক্রী। কিন্তু বাংলা তর্জমা ক'খানাই বা বিকোবে ? কেন তা হলে কেউ বছর বছর সংস্করণ বার করবেন ? করলে তার দাম হবে ডবল।

আইন আদালতের উপর ইংরেজীর প্রভাব এখনো দু'তিন পুরুষ ধরে চলবে। তার কোনো সংক্ষিপ্ত রাস্তা নেই। তবে হাঁ, বিপ্লব যদি হয় তাহলে সব একদিনে পুড়ে ছাই হয়ে যাবে। গোটা সীস্টেমটাই বদলাবে। কিন্তু তা যদি হয় আমাদের সংবিধানটাও কি থাকবে ?

শুনতে পাই টাইপরাইটারের অভাবে বাংলা প্রবর্তন এগোতে পারছে না। সেটা অবশ্য একটা যুক্তিসঙ্গত কারণ। কিন্তু কথায় কথায় টাইপরাইটার ব্যবহার না করে আগেকার মতো নকলনবীশ নিয়োগ করা যেতে পারে।

সংস্কৃতি ও শিক্ষা

অষ্টাদশ শতাব্দীর ইউরোপে 'সিভিলাইজেশন' ও 'কালচার' বলে দুটো নতুন শব্দ বানানো হয়। তার মানে এ নয় যে ওই দুই বস্তু তার আগে কোনোদিন কোনোখানে ছিল না। ছিল নিশ্চয়ই, কিন্তু বস্তুর উপযোগী নামে অভিহিত ছিল না। গত দুই শতাব্দী ধরে শব্দদুটি মন্ত্রের মতো কাজ করে এসেছে।

এমনও দেখা গেছে যে নামই আছে, বস্তুর অস্তিত্ব নেই! মহাযুদ্ধের সময় অনেকেই সন্দেহ করেছেন যে সভ্য মানুষ আসলে বর্বর আর সংস্কৃতি তো কোল ভীল মুণ্ডাদেরও থাকতে পারে।

এখানে বলে রাখি যে 'সভ্যতা' শব্দটা 'সিভিলাইজেশনে'র ভাষান্তর। পারিভাষিক শব্দ হিসাবে সেটার প্রচলন ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলা প্রভৃতি ভাষায়। আর 'কালচারে'র পারিভাষিক শব্দ কী হবে সেটা আমাদের জীবদ্দশাতেই স্থির হয়, প্রথমে 'কৃষ্টি' ও পরে 'সংস্কৃতি'। কালচারের সঙ্গে কালটিভেশনের মিল আছে। মনের জমিন আবাদ করাকেই বলে কালচার। 'কৃষ্টি'ই কৃষির সঙ্গে মেলে। কিন্তু কথাটা কানে বাজে। রবীন্দ্রনাথ তো তা নিয়ে মশকরা করেন তাঁর 'তাসের দেশ' নৃত্যনাট্যে। তার চেয়ে শ্রুতিমধুর 'সংস্কৃতি'। কিন্তু তার মধ্যে কর্ষণের ভাব কোথায়? প্রাকৃতকে সংস্কার করলে সেটা হয় সংস্কৃত। প্রকৃতিকে সংস্কার করলে সেটা হয় সংস্কৃতি। এটা কিন্তু বিদেশী 'কালচার' কথাটির বক্তব্য নয়।

যাই হোক, চালিয়ে যখন দেওয়া হয়েছে 'কালচার' অর্থে 'সংস্কৃতি' তখন সেই অর্থেই শব্দটি ব্যবহার করতে হবে। কেউ কেউ এখনো কৃষ্টি নিয়ে পড়ে আছেন। কিন্তু ভাষার ক্ষেত্রে যেটা সবাই মেনে নেয় সেটাই চলিত হয়। কৃষ্টি একদিন অচলিত হয়ে যাবে। আক্ষরিক অর্থে কৃষ্টিই সত্যিকার পারিভাষিক শব্দ। সংস্কৃতি তা নয়। তা সত্ত্বেও সংস্কৃতি এখন দখলদার। স্বত্ববানের চেয়ে দখলদারেরই জোর বেশী।

অষ্টাদশ শতাব্দীর ইউরোপে কেবল শব্দদুটির উদ্ভাবন হয় না, তাদের সংজ্ঞা ও তাৎপর্য নিয়ে বিদ্বানরা মোটামুটি একমত হন। আমরাও পরবর্তীকালে তাঁদের মতের সঙ্গে মত মিলিয়েছি। এখন ওইসব মত আন্তর্জাতিক বিদ্বৎ সমাজের সাধারণ মতে পরিণত হয়েছে। আর বিদ্বৎ সমাজও তো সেই সমাজ যে সমাজ আধুনিক ধরনের স্কুল কলেজ ও ইউনিভার্সিটি নির্ভর। এসব প্রতিষ্ঠান তুলে দাও, তারপর দেখবে কারো সঙ্গে কারো মত মিলছে না। 'কালচার' ও 'সিভিলাইজেশন' শব্দ দুটোরও নানা মুনি নানা অর্থ করবেন।

'স্কুল', 'কলেজ', 'ইউনিভার্সিটি' এই তিনটি শব্দও বহিরাগত। এদের আমরা ভাষান্তরিত করে 'বিদ্যালয়', 'মহাবিদ্যালয়' ও 'বিশ্ববিদ্যালয়' নামকরণ করেছি। তার ফলে আমাদের মনে ধারণা জন্মেছে যে এসব তো আমাদের দেশে চিরকাল ছিল। না, ছিল না। যা ছিল তার নাম পাঠশালা, টোল বা চতুষ্পাঠী। আরো আগে গুরুগৃহ বা গুরুকুল বা বৌদ্ধ বিহার। মুসলমানদের মধ্যে মক্তব, মাদ্রাসা, ইমামবাড়া। দেশে শিক্ষিত জনের অভাব ছিল না, উচ্চশিক্ষিত জনেরও অস্তিত্ব ছিল। কিন্তু স্কুল, কলেজ ও ইউনিভার্সিটিকে নিয়ে এই যে সীস্টেম এটা বহুদিন ধরে ইউরোপে বিবর্তিত হবার পর ভারতে প্রবর্তিত হয়েছে। আরো পরে চীনে জাপানে। ইউরোপের মধ্যেও পশ্চিম ইউরোপ অগ্রণী, রাশিয়া অনুসরণকারী। বিপ্লবের পরে সোভিয়েট কর্তৃপক্ষ কী কী পরিবর্তন করেছেন ঠিক বলতে পারব না, তবে তাঁরাও সীস্টেমটার

মূলোচ্ছেদ করেননি। সেই কাজটি করতে চাইছেন চীনদেশের মহানায়ক মাও ৎসে-তুং। কতদূর সফল হয়েছেন ঠিক বলতে পারব না। কিন্তু আমার বিশ্বাস হয় না যে ষোল আনা সফল হওয়া সম্ভবপর। কারণ আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় চীনকেও অগ্রগামী হতে হবে। অগ্রগামী হতে হলে একই রাস্তায় এগোতে হবে। ভিন্ন পথে চললে তার নাম অগ্রগামিতা হবে না, হবে ভিন্নগামিতা। সে রকম অভিপ্রায় থাকলে কি চীন হাইড্রোজেন বোমা বানাত? হাইড্রোজেন বোমার পেছনে যে ফলিত বিজ্ঞান সে বিজ্ঞান যাঁহা মার্কিনে তাঁহা চীনে। বিজ্ঞানীদের সবাইকেই স্কুল, কলেজ ও ইউনিভার্সিটির জাঁতাকলের ভিতর দিয়ে যেতে হবে। যাঁরা ভিন্ন পথে চলবেন তাঁরা হাইড্রোজেন বোমা বানাতে পারবেন না, বানাবেন তীর ধনুক বা গাদা বন্দুক।

জাঁতাকল জিনিসটা আমার দু'চক্ষের বিষ। তাই আমি স্কুল জীবনে ছিলাম স্বভাব পলাতক। স্কুল থেকে বেরিয়ে পণ করি যে আর নয়। এখন থেকে আমি জীবনের কাছেই শিখব। জীবন আমাকে যা শেখাবে তাই শিখব। কলেজে ভর্তি হব না। বই মুখস্থ করব না। পরীক্ষার দুঃস্বপ্ন দেখব না। ডিগ্রীর জন্যে রক্ত জল করব না। কিন্তু সাংবাদিক হতে গিয়ে যা দেখলুম তাতে আমার উৎসাহ একেবারে জল। কলেজে গিয়ে পেছনের সারিতে বসি। বন্ধুদের নিয়ে একটু আধটু সাহিত্য করি। অবাক হয়ে যাই একটার পর একটা পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করে। এর জন্যে আমাকে বড়ো কঠোর মাশুল দিতে হয়। মাশুলটা ইনটেলেকটের অতিকর্ষণ। এতে হৃদয়বৃত্তি, কল্পনাশক্তি, ইনটুইশন ও ঈশ্বরবিশ্বাস অবহেলিত বা উপেক্ষিত হয়। দেহচর্চারও সময় মেলে না। এক ভদ্রমহিলা আমাকে একটা অতি নিষ্ঠুর কথা শুনিয়ে দেন। "ইউ আর এ ব্যাগ অফ বোন্স।" আমি নাকি একটা হাড়ের বস্তা। তার চেয়েও নির্মম বাক্য এক বন্ধুর মুখে শুনি। "আপনার বিয়ে করা উচিত নয়। ছেলেমেয়ে জন্মালে তারা হবে প্যাকাটির মতো।"

এদিকে আমি কিন্তু মনঃস্থির করে বসে আছি যে, কেউ আমাকে ভালোবেসে বিয়ে করতে না চাইলে আমি বিয়েই করব না। আমার চাকরিকে ভালোবাসা তো আমাকে ভালোবাসা নয়। আর চাকরিও কি আমি করতে চাই নাকি! করলেও সে আর কদ্দিন! জোর পাঁচ বছর। তা ছাড়া আমার আরো একটা পণ ছিল। সেটাই অধিকতর প্রাসঙ্গিক। আমি যেদিন স্কুল থেকে বেরই সেইদিনই ঠিক করি যে আমার যদি ছেলেমেয়ে হয় তাদের আমি স্কুলে পড়তে পাঠাব না। কোনো স্কুলেই না। স্কুলমাত্রেই আমার চক্ষুঃশূল। রবীন্দ্রনাথের 'অচলায়তন'। ছেলেমেয়েরা বাড়ীতেই পড়বে। কিন্তু মনের আড়ালে একটা মোহ ছিল। রবীন্দ্রনাথের প্রতিষ্ঠিত ব্রহ্মচর্য বিদ্যালয় তো তেমন নয়। আহা! কী প্রাকৃতিক পরিবেশ!

বিয়েও হলো, ছেলেও হলো। তার চেহারা দেখে এক ভদ্রমহিলা আদর করে বললেন "গুণ্ডা"। এখন সেই বলিষ্ঠ বালককে আমরা স্কুলে পাঠালুম না। বাড়ীতেই পড়ালুম, কিন্তু ইংরেজীতে নয়। মাধ্যমহিসাবে তো নয়ই, ভাষা-

হিসাবেও ইংরেজী শিক্ষা নিষেধ। ওর মা ইংরেজীভাষিণী। তাঁকেই কিনা বাংলা শিখে নিতে হলো ছেলের সঙ্গে কথা বলার জন্যে। আমি যে আমার ছেলের সর্বনাশ করছি এ বিষয়ে ইংরেজ বাঙালী একমত। কিন্তু বাংলাভাষার ওর বয়সের ছেলেদের জন্যে যতরকম বই ছিল সবই ওকে পড়তে দেওয়া হয়েছিল। আর মুখে মুখে বাংলায় তর্জমা করে ইংরেজীতে যতরকম বই ছিল সে সবও বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছিল। ইংরেজী ভিন্ন আর সব বিষয়েই ও পাকা। এই ভাবে চলল ওর জীবনের প্রথম আটটি বছর। আমার তো ইচ্ছা ছিল আরো চার বছর চালাবার। বারো বছরের আগে ওকে আমি ইংরেজী শিখতে দিতুম না। আমার থিওরি ছিল মানুষ কেবল একটা ভাষাতেই চিন্তা করতে পারে, একাধিক ভাষায় নয়। গোড়া থেকেই একাধিক ভাষায় চিন্তা করলে চিন্তার শক্তি ক্ষয় হয়। আগে বাংলাভাষায় চিন্তা করতে করতে চিন্তাশক্তিতে শক্তিমান হোক। তার পরে ইংরেজী শিখবে ও দ্রুত দক্ষ হবে।

ইতিমধ্যে আমার আরো দুটি সন্তান হয়েছে ও তাদের উপর দিয়েও একই এক্সপেরিমেন্ট চলেছে। বন্ধুরা একবাক্যে না-মনজুর করেছেন এই শিক্ষপদ্ধতি। আমার তো খেয়াল ছিল ওদের যদি কোথাও পাঠাতেই হয় তা হলে পাঠাতুম শ্রমিকদের বিদ্যালয়ে। মধ্যবিত্তদের বিদ্যালয়ে নয়। আমার এক পরম শ্রদ্ধেয় সহযোগী আমাকে বলেন, "অমন কাজটি করবেন না। ওখানে গেলে ওরা নোংরা কথা শিখবে।" শ্রেণীশূন্য সমাজের জন্যে আমার যে কল্পনা ছিল সেটা তাঁর অগ্রাহ্য।

পুণ্যর যখন আট বছর বয়স তখন সে তার ছোটভাইকে হারায়। শোকে দুঃখে আমি চাকরি ছেড়ে দেবার কথা ভাবি। ছুটি নিয়ে চলে যাই শান্তি-নিকেতনে। সেখানে বসে বই লিখব। তাই দিয়ে যেমন করে হোক সংসার চালাব। সেই সময়ই স্থির করি যে পুণ্যকে রবীন্দ্রনাথের পাঠভবনে ভর্তি করে দেব। নইলে ওই দামাল ছেলেকে বাড়ীতে সামলানো যাবে না। গুরুদেব তো খুব খুশি, কিন্তু আমাদের রেখে তিনি চলে যান কালিমপং। আর আমরা শুনি পুণ্যকে তার সমবয়সীদের ক্লাসে ভর্তি করতে পারা যাবে না। কারণ সে আর সব বিষয়ে পাকা হলেও ইংরেজী বিলকুল জানে না। ইংরেজীর ক্লাসে হাঁ করে বসে থাকবে। ওর জন্যে বিশেষ ব্যবস্থা কিছু করা যায় না? পাঠভবনের গুরু যাঁরা তাঁরা বলেন, "না। তা কী করে হয়! নিয়ম নেই যে!" পুণ্যকে সব চেয়ে নিচের ক্লাসেই ভর্তি হতে হবে। হোক না কেন দু'বছর নষ্ট। কৃষ্ণ কৃপালানী তখন পাঠভবনের অধ্যক্ষ। একদিন তিনি স্বয়ং এসে আমাকে বলেন, "আমি ওঁদের কাছে হার মানতে বাধ্য হয়েছি। আমি ওঁদের বোঝাতে চেষ্টা করি যে, এই ছেলেটিকে নিয়ে আপনারা একটা এক্সপেরিমেন্ট করে দেখুন ফল কী হয়, ইংরেজী কি কম সময়ের মধ্যে শিখে নেওয়া যায় না? ওঁরা কিছুতেই রাজী হন না। ওঁদের ওই এক কথা। নিয়ম!"

অর্থাৎ 'তাসের দেশ' আর কী! ওখানে প্রত্যেকটি ছেলেকে সব চেয়ে নিচের ক্লাস থেকেই ইংরেজী শেখানো হতো। গুরুদেবের থিওরি যাই হোক।

থিওরিতে ও প্র্যাকটিসে গরমিল শান্তিনিকেতনেও দেখব প্রত্যাশা করিনি। আমার মোহভঙ্গ হয়। ওদিকে পুণ্যও আমাকে গুরুদেবের ফিরে আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে সময় দেয় না। ফল পাড়বার জন্যে গাছে ঢিল ছোঁড়ে আর সেই ঢিল পড়ে ওর নিজেরই মাথায়। কলকাতা নিয়ে গিয়ে অপারেশন করাতে হয়। তারপরে ওকে শান্তিনিকেতন থেকে সরিয়ে নিয়ে যাই কর্মস্থলে। চাকরিটা রাখি। বাড়ীতে ইংরেজী শেখাই।

বার্টরান্ড রাসেল স্কুলের পড়া বাড়ীতে বসেই শেষ করেন, তারপর সরাসরি কলেজে যান। কী এমন ক্ষতি হয়েছিল তাঁর? আমরাও সেই মহাজন পন্থায় আস্থাবান ছিলুম। কিন্তু তিনিই তো আবার তাঁর সন্তানদের জন্যে স্কুল স্থাপন করলেন। তা হলে কি আমরাও নতুন একটা স্কুল প্রতিষ্ঠা করব? সে বাসনা আমাদের ছিল না। পুণ্যের সমবয়সীরা সবাই যাচ্ছে স্কুলে, সবাই ফুটবল ক্রিকেট খেলছে, ডিবেট করছে, অভিনয় করছে, আর সে বেচারা একেবারে কুণো। মেলামেশার সাথী নেই। ভবিষ্যতে যারা দেশের বিভিন্ন বিভাগের ভার পাবে তাদের কারো সঙ্গে তার চেনাশোনা হচ্ছে না। স্কুল কি কেবল বিদ্যাস্থান? ইটনের মাঠ তো ওয়াটারলুর যুদ্ধক্ষেত্র। আজকের দিনের জীবনসংগ্রামে স্কুলই হচ্ছে উদ্যোগপর্ব। স্কুলে না পড়ে বাড়ীতে পড়েও মানুষ হওয়া যায়, কিন্তু পড়াশুনা ছাড়া আরো দশটা দিক আছে যার সঙ্গে পরিচয়ের জন্যে স্কুলজীবনই প্রশস্ত। ধীরে ধীরে আমার মত বদলায়।

আদর্শ স্কুল যখন হাতের কাছে পাচ্ছিনে তখন যেটা পাচ্ছি সেটাই শ্রেয়। আমার নিজের শিক্ষাও তো আদর্শ বিদ্যালয়ে হয়নি। এগারো বছর বয়সে পুণ্যকে ভর্তি করে নেন এক ইংরেজ মিশনারী তাঁর স্কুলে। আমিও বদলী হতে হতে চলি। সেও ট্র্যান্সফার হতে হতে চলে। শেষের দিকে ক্লাসে ফার্স্ট হয়। ইংরাজীতেও বোধ হয় তাই। কলেজেও ভালো করে। স্টেট স্কলারশিপ পেয়ে বিদেশে যায়। কাজেই আমাদের ঘরোয়া এক্সপেরিমেন্টটা ব্যর্থ হয়নি। আমরা ওকে বাঙালী করতে চেয়েছিলুম, ও বাঙালীই হয়েছে। সাহেব হয়নি। কিন্তু জার্মানভাষায় লিখেছে থীসিস ও ইংরেজীতে লিখেছে গ্রন্থ।

স্বাধীনতার পরে দেশে উলটো দিক থেকে হাওয়া বইতে থাকে। তার ফলে ওর ছেলেটি হয়েছে ইংরেজীতে পয়লা নম্বর আর হিন্দীতে দোসরা। কিন্তু বাংলায় একেবারে কাঁচা। যদিও বাংলাই হচ্ছে ওর মাতৃভাষা। একই ব্যাপার দেখা যাচ্ছে আমার অন্যান্য পুত্রকন্যার সন্তানদের বেলাও। ওরা নিজেরা যে সুযোগ আমার দোষে পায়নি সে সুযোগ দিচ্ছে ওদের ছেলেমেয়েদের। আমার এক্সপেরিমেন্ট কি কোথাও কেউ অনুসরণ করল? মুখে যিনি যাই বলুন কার্যকালে সেই ইংরেজী। আর তার উপর হিন্দী। এ দুটো ভাষা ভালো করে না শিখলে চাকরির পরিধি সংকীর্ণ।

এখন সংস্কৃতির কথায় আসি। কেবলমাত্র সংস্কৃতির কথা ভেবে কেউ স্কুলে কলেজে ইউনিভার্সিটিতে জীবনের ষোল সতেরোটা বছর কাটাতে যায় না। এত খরচও করে না। মানবজমিন আবাদ করলে সোনা ফলবে, এই বিশ্বাস

থেকেই ষোল সতেরো বছর ধরে চাষ আবাদ। কালটিভেশন। কালচার। সোনা হয়তো সকলের বেলা ফলে না, তবু সংস্কৃতির সোহাগা তো উপজায়। সমাজকে সংস্কৃতিসম্পন্ন করার ওর চেয়ে উত্তম উপায় এখন পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয়নি।

প্রশ্ন উঠবে, কোন্ সমাজকে? উচ্চবিত্ত বা মধ্যবিত্ত সমাজই কি সমগ্র সমাজ? কৃষক শ্রমিক কারিগরদের ঘরের ক'জনকে তোমরা ষোল সতেরো বছর ধরে স্কুল কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষায় শিক্ষিত করতে পারো? ওভাবে শতকরা ক'জনের মানবজমিন আবাদ হতে পারে? তাতে সোনা ফলতে পারে? সোনা যদি-বা না ফলে সোহাগা উপজাতে পারে? একশো বছর সময় পেলেও কি তোমরা দেশের সাধারণ মানুষকে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়িয়ে সংস্কৃতিমন্ত করতে পারবে? শ্রীমন্ত করা তো দূরের কথা। সাধারণ মানুষের সংস্কৃতিকে যদি বিশ্ববিদ্যালয়নির্ভর করো তবে সে আশা দুরাশা। যদি বিশ্ববিদ্যালয়-নিরপেক্ষ করো তা হলে আশা আছে। তা বলে শিক্ষানিরপেক্ষ করলে চলবে না। শিক্ষাই হচ্ছে মনের চাষ আবাদ। কালটিভেশন। কালচার।

বিশ্ববিদ্যালয় এদেশের মাটিতে রোপণ করার সময় ওদেশের মতো এদেশেরও সুধীজনের ধারণা ছিল যে, উচ্চতর পদের জন্যে চাই উচ্চতর শিক্ষা। উচ্চতর শিক্ষা যারা পাবে তাদের জন্যেই উচ্চতর পদ। ইউরোপের বিশ্ববিদ্যালয়গুলির ইতিহাস এই কথাই বলে যে, চার্চের তথা রাষ্ট্রের উচ্চতর পদগুলির জন্যে যোগ্যতা যাচাই করার নিরপেক্ষ উপায় হচ্ছে পরীক্ষা ও ডিগ্রী। পরীক্ষা ও ডিগ্রীর সরষের ভিতর ভূত থাকলে তো নিরপেক্ষতা থাকে না। সরষের থেকে ভূতকে দূরে রাখার খ্যাতি যেসব বিশ্ববিদ্যালয়ের ছিল সেসব বিশ্ববিদ্যালয়ই দেশবিদেশে সমাদর পেতো। বহুদূরে থেকে বহু বিদ্যার্থী আসত তাদের আকর্ষণে। ফিরে গিয়ে সেসব বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রীর জোরে চাকরিও পেতো স্বদেশে। এদেশে যখন বিশ্ববিদ্যালয় প্রবর্তিত হয় তখন পরীক্ষা ও ডিগ্রীর সরষের ভিতর ভূত থাকে না। তাই ডিগ্রীর জোরে এক প্রদেশের গ্রাজুয়েট অপর প্রদেশে চাকরি পায়। সম্মান পায়। তখনকার দিনের সেই ঐতিহ্য কি আর আছে? রাখতে কি আর পেরেছি আমরা? তাই উচ্চতর পদের জন্যে উচ্চতর শিক্ষার প্রয়োজনই অনেকে উড়িয়ে দিতে চান। তার জন্যে ডিগ্রী না হলেও নাকি চলে। উচ্চতর শিক্ষা যারা পাবে তারাই কেবল উচ্চতর পদের জন্যে যোগ্য বিবেচিত হবে, এ ধারণাও ক্রমে লোপ পেতে চলেছে। উচ্চতর পদ সকলের অনায়াসলভ্য হলে শিক্ষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে তার পরিণাম হবে ভয়াবহ। শাসনের পক্ষেও মারাত্মক।

ইউরোপের মাটিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্ভব হলো কী করে আর কেন? রোমান সাম্রাজ্যের পতনের পর অধ্যয়ন অধ্যাপনার দায়-দায়িত্ব রোমান ক্যাথলিক চার্চের উপরে অর্সায়। চার্চের কাছে তার নিজস্ব বিদ্যার বাইরে আর যা-কিছু সবই পেগান। রোমান আইন বা চিকিৎসাবিজ্ঞান শেখাতে হলে পেগানদের ডাকতে হয়। সবাইকে খ্রীস্টান করাই যাঁদের উপরে মহামান্য পোপের নির্দেশ তাঁরা পেগানদের সহ্য করতে পারেন না। নিজেরাও পেগান

বিদ্য শিখতে বা শেখাতে পারেন না। অথচ তার চাহিদা ছিল। যেমন লাটিন-সাহিত্যের ক্লাসিকসের। গ্রীকসাহিত্যের ক্লাসিকসের। সংস্কৃতিকে কেবলমাত্র ধর্মতত্ত্বে বা স্মৃতিশাস্ত্রে সীমাবদ্ধ রাখলে সাংস্কৃতিক বিকাশের ধারায় ছেদ পড়ে যায়। সংস্কৃতির নায়ক শাস্ত্রী মহাশয়রা হতে পারেন না। তার জন্যে চাই কবি, নাট্যকার, গায়ক, বাদক, অভিনেতা, চিত্রকর। তার জন্যে চাই দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক, জ্যোতির্বিদ, স্থপতি, আইনজ্ঞ, চিকিৎসক। চার্চের কর্তারা না পারেন এঁদের স্থান পূরণ করতে, না পারেন এসব বিদ্যাকে নির্বাসিত করতে।

বেশ কয়েক শতাব্দীর অব্যবস্থার পর দেখা গেল গ্রীকভাষায় রচিত চিকিৎসা-গ্রন্থ চেয়ে পাঠিয়েছেন বাগদাদের খলিফা। তাঁর আনুকূল্যে সেগুলিকে আরবী-ভাষায় তর্জমা করেন স্থানীয় সীরিয়ান খ্রীস্টান পণ্ডিতরা। আরবরা সেসব তর্জমা করা বই নিয়ে যায় ইউরোপে। সেখানে আরো এক দফা তর্জমা হয়—লাটিন ভাষায়। পড়ানোর জন্যে ডাক পড়ে ইহুদীদের। এমনি করে পত্তন হয় সালের্নোতে এক চিকিৎসা বিদ্যাপীঠ। পরে আইনের বিদ্যাপীঠ পত্তন হয় বোলোন্যায় ও প্যারিসে। পরে তার সঙ্গে যুক্ত হয় লাটিন ভাষার ক্লাসিকস। বিদ্যাপীঠের সংখ্যা ও প্রতিপত্তি ক্রমেই বাড়তে থাকে। পড়ানো হয় অলঙ্কার-শাস্ত্র, ব্যাকরণ, লজিক ইত্যাদি বিষয়। আরো পরে থিওলজির থেকে স্বতন্ত্র করে ফিলসফি। বলা বাহুল্য থিওলজি শিক্ষার ব্যবস্থা বরাবরই ছিল। চার্চের অধীনে চাকরি পেতে হলে থিওলজি তো পড়তে হতোই, তার সঙ্গে খ্রীস্টীয় বিধিবিধান। বিজ্ঞান আসে আরো পরে। আর তাই নিয়ে কত লোকের প্রাণ-দণ্ড বা কারাদণ্ড হয়। তেমনি করে উচ্চশিক্ষিতদের মানসে সংঘটিত হয় এক অদৃশ্য ঘটনা। মধ্যযুগ থেকে আধুনিক যুগে উত্তরণ। মানবিকবাদে দীক্ষা। রেনেসাঁস।

বিদ্যাপীঠগুলিকে গোড়ার দিকে ইউনিভার্সিটি বলা হতো না। কথাটা আসে লাটিন ভাষার 'universitat' থেকে। তার মানে কর্পোরেশন বা কমিউনিটি। আমাদের যেমন কাশী মিথিলা নবদ্বীপে নানা প্রদেশ থেকে বিদ্যার্থীর সমাবেশ হতো। তেমনি ওদের হতো বোলোন্যায়, পাদুয়ায়, প্যারিসে। স্বদেশী বিদ্যার্থীদের চেয়ে বিদেশী বিদ্যার্থীদের সংখ্যা বহুগুণ। স্থানাভাব হতো, বাড়ীওয়ালারা চড়া হারে ভাড়া দাবী করত, এমন কোনো প্রথা ছিল না যে গুরুই শিষ্যকে আশ্রয় দেবেন। তাই ওরা দায়ে ঠেকে সংগঠন করে। সংগঠনের নাম উনিভারসিটাট। অর্থাৎ ছাত্রপরিষদ্। বিদেশ থেকে অধ্যাপকরাও আসতেন। তাঁরাও তেমনি সংগঠিত হতেন। বহু স্থলে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের একই সংগঠন। আবার এমনও দেখা যেত যে একই বিদ্যাপীঠে তিন চারটি উনি-ভারসিটাট। একটা হয়তো ফরাসীদের, আর একটা হয়তো জার্মানদের, আরও একটা হয়তো ইংরেজদের, আরও একটা হয়তো প্রোভাঁস অঞ্চল বাসীদের। প্রোভাঁস তখন ফ্রান্সের অঙ্গ নয়। যতগুলো 'নেশন' ততগুলো উনিভারসিটাট। পরে ওই একই শব্দের অর্থান্তর ঘটে। গোটা বিদ্যাপীঠটাকেই বলা হয় ইউনি-ভার্সিটি।

ওদিকে দেশী বিদেশী শিক্ষক মহাশয়রা একজোট হয়ে পত্তন করেন 'Collegia' নামক সংস্থা। উদ্দেশ্য ডিগ্রী দান। তথা আশ্রয় দান। দরিদ্র ছাত্ররা থাকবে সেখানে। সেখানে থেকে পড়াশুনা করবে। তাদের ব্যয়বহনের জন্যে এনডাউমেণ্ট সংগ্রহ করা হয়। তার থেকে এলো কলেজ। কলেজমাত্রেই আদিতে ছিল আবাসিক। অক্সফোর্ড ও কেমব্রিজে এখনো তাই। আবাসিকরা এখন প্রচুর দক্ষিণা দেয়। সাধারণত বড়লোকের ছেলে। ইদানীং সরকারী ছাত্রবৃত্তি নিয়ে গরিবের ছেলেরাও আবাসিক হচ্ছে। অনাবাসিক কলেজের সূত্রপাত ইংরেজদের দেশে হয় ঊনবিংশ শতাব্দীর লণ্ডনে। তারই অনুকরণে ঊনবিংশ শতাব্দীর ভারতবর্ষে। সঙ্গে সঙ্গে সূত্রপাত হয় ডিগ্রীদানের। ডিগ্রী দান যখন ইউরোপের বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে প্রবর্তিত হয় তখন তার হেতু ছিল এই যে শিক্ষা সমাপ্ত করে যারা কাজকর্মের সন্ধানে বেরবে তখন তাদের আর নতুন করে পরীক্ষা দিতে হবে না। ডিগ্রী দেখালেই চার্চ বা রাষ্ট্র বা অন্য কোনো প্রতিষ্ঠান বিশ্বাস করবে যে প্রার্থীরা যথারীতি পরীক্ষা দিয়েছে ও পাশ করেছে। ডিগ্রীর গুরুত্ব যখন এত বেশী তখন ডিগ্রীদানের অধিকার প্রত্যেকটি বিদ্যাপীঠ দাবী করতে পারত না। সেইসব বিদ্যাপীঠকেই পোপ কিংবা সম্রাট কিংবা রাজা সেই অধিকার দিতেন যেসব বিদ্যাপীঠ তাঁদের বিচারে উৎকৃষ্ট। তবে অক্সফোর্ডের মতো অতি প্রসিদ্ধ কয়েকটি বিদ্যাপীঠকে যাজকীয় বা রাজকীয় আদেশপত্র নিতে হয়নি।

এককথায় বলা যেতে পারে যে সেইসব বিদ্যাপীঠই ইউনিভার্সিটি পদবাচ্য যাদেব ডিগ্রী দেখাতে পারলে আর নতুন করে পরীক্ষা দিতে হয় না। সেই ডিগ্রীর জোরেই কর্মপ্রাপ্তি সুগম হয়। যদি কর্ম আদৌ খালি থাকে। সেকালেও কর্মের অভাব ছিল যথেষ্ট। চার্চের বা রাষ্ট্রের ঘরে কর্মাভাব, তাই বড়লোকদের ঘরে প্রাইভেট টিউটর হতেন অনেকে। কেউ কেউ হতেন প্রাইভেট সেক্রেটারি। বাণিজ্য আর সাম্রাজ্য মিলে ইউরোপকে চার শতাব্দী পূর্বে অপ্রত্যাশিত একটা স্টার্ট দেয়। দেখতে দেখতে বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা বেড়ে যায়, অধ্যাপনার বিষয়ও যায় বেড়ে। কাজকর্মও জুটে যায় ডিগ্রীধারী বহুসংখ্যক বিদ্যার্থীর। দেশে না হোক বিদেশে। ডিভিনিটির ডিগ্রী নিয়ে বা না নিয়ে খ্রীষ্টীয় প্রচারকরাও আসেন। সরকারের অনুমতি নিয়ে বা না নিয়ে স্কুল কলেজ স্থাপন করেন প্রধানত তাঁরাই। তবে ইউনিভার্সিটি প্রতিষ্ঠার বেলা সরকারই হন অগ্রণী। অতঃপর ইউনিভার্সিটি গড়ে তোলার কাজে হাত দেন বেনারসে মদন-মোহন মালবীয়, আলীগড়ে স্যর সৈয়দ আহমদ খানের অনুসারকগণ, শান্তি-নিকেতনে রবীন্দ্রনাথ, পুনায় ধোন্দো কেশব কার্বে। বেনারস ও আলীগড় ডিগ্রী দেয় সরকারের আইনের বলে। বিশ্বভারতী তা রবীন্দ্রনাথের জীবৎকালে পারে না, পরে ভারত সরকারের আইনের জোরে পারে। কার্বের প্রতিষ্ঠিত মহিলা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রী সরকারের দ্বারা স্বীকৃত কিনা আমার অজ্ঞাত। মোটের উপর ভারতের সব ক'টা বিশ্ববিদ্যালয়ই সরকারের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত বা নিয়ন্ত্রিত ও তাদের দেওয়া ডিগ্রী সরকারের দ্বারা স্বীকৃত। যতদূর জানি

শ্রীরামপুরের খ্রীস্টীয় কলেজ ডেনমার্কের রাজার আদেশপত্রের জের টেনে এখনো দিয়ে আসছে তার থিওলজির ছাত্রদের ডিভিনিটির ডিগ্রী। ওরা সরকারী চাকরি চায় না, ওদের কাজকর্ম জোগায় বিভিন্ন মিশনারী প্রতিষ্ঠান।

টোল চতুষ্পাঠী মক্তব মাদ্রাসার ঐতিহ্য ইউরোপীয় ঐতিহ্য নয়। ইউরোপীয় ঐতিহ্য যারাই মেনে নিয়েছে তারাই ইউনিভার্সিটির কাছে প্রত্যাশা করে ডিগ্রী আর তাদেরও কাছে ইউনিভার্সিটি প্রত্যাশা করে পরীক্ষা। ওটা যেন অলিখিত একটা চুক্তি। শিক্ষার্থীরা দেবে পরীক্ষা, শিক্ষাগুরুরা দেবেন ডিগ্রী। পরীক্ষা যদি ফাঁকি হয় ডিগ্রীও হবে ফাঁপা। অমন ডিগ্রী দেখে কেউ চাকরি দেবে না। বলবে, আবার পরীক্ষা দাও। অথচ ডিগ্রীর সৃষ্টিই হয়েছিল দ্বিতীয়বার পরীক্ষা এড়াতে। পরীক্ষাই যদি আবার দিতে হলো তবে ডিগ্রীর কী প্রয়োজন? প্রতি-যোগিতামূলক পরীক্ষার কথা আলাদা, সেক্ষেত্রে পদের সংখ্যা পরিমিত, প্রার্থীর সংখ্যা অপরিমিত।

ফাঁকি দিয়ে পরীক্ষা পাশ করা ও ডিগ্রী পাওয়া আজকাল হামেশা ঘটছে। কিন্তু তার বিপরীতটাও সত্য। একজন অতি মেধাবী ছাত্র অতিরিক্ত পরিশ্রমের ফলে বা অন্য কোনো কারণে পরীক্ষায় ফেল করে বা খারাপ করে। বেচারার কেরিয়ারটাই নষ্ট। তা বলে তো সে বিদ্যার দিক থেকে কাঁচা নয়। সংস্কৃতির দিক থেকেও খাটো নয়। মনের জমিনের যে চাষ আবাদটা সে করেছে সেটার ফসল থেকে কি কেউ তাকে বঞ্চিত করতে পারে? কালচার হচ্ছে নিজেই নিজের পুরস্কার। এই কথাটিই সারকথা যে, অধ্যয়নটাই আসল, ডিগ্রীটা তার সুদ। আসলটা হারায় না, সুদটা হয়তো হারায়।

কতকটা রাষ্ট্রের প্রয়োজনে, কতকটা রাজনীতির প্রয়োজনে উচ্চপদের সংখ্যা এখন ইংরেজ আমলের চাইতে অনেক বেশী। তার সঙ্গে তাল রেখে উচ্চশিক্ষার প্রয়োজনও সমান বেশী। বিশ্ববিদ্যালয় এখন আমাদের সমাজজীবনের অপরি-হার্য অঙ্গ। বিশ্ববিদ্যালয় ইংরেজের সঙ্গে সঙ্গে বিদায় নেবে একথা আর ভাবাই যায় না। কেউ কেউ হয়তো ভাবছেন যে সমাজবিপ্লবের পরে উচ্চবিত্ত ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সঙ্গে সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ও বিলুপ্ত হবে। তেমন দিন যদি কখনো আসে তখনো দেখা যাবে যে বিশ্ববিদ্যালয়ও আবার ঘুরে ফিরে আসবে। কারণ উচ্চপদও আবার নতুন করে সৃষ্টি হবে। কতকটা রাষ্ট্রের প্রয়োজনে কতকটা রাজনীতির প্রয়োজনে। এই নিয়েই তো চীনদেশে এমন তীব্র মতভেদ। এর নাম রেখেছে ওরা সাংস্কৃতিক বিপ্লব। সত্যি কি তাই?

ক্যাপিটালিস্ট শ্রেণীটাকে উৎসন্ন করতে পারো, জমিদার শ্রেণীটাকে উচ্ছেদ করতে পারো, কিন্তু তোমাদের কলকারখানা ব্যাঙ্ক ট্রেজারি চাষের জমি বাসের জমি ও জাতীয় সম্পত্তি ম্যানেজ করবে কারা? তার জন্যে যে চাই একটি ম্যানেজার শ্রেণী। সেইজন্যে রুশবিপ্লবকে বলা হয়ে থাকে ম্যানেজারিয়াল রেভোলিউশন। এই যে নতুন ম্যানেজার শ্রেণী এর খাঁই বড়ো কম নয়। যাতে এরা লোভে পড়ে অসৎ না হয় তার জন্যে এদের মজুরি সাধারণ মজুরের তুলনায় বহুগুণ। তা ছাড়া এদের কর্মদক্ষতারও মূল্য আছে। একজন জেট

বিমান চালক তো একজন বাসচালকের চেয়ে বেশী ঝুঁকি দেয়, বেশী সাহস দেখায়, বেশী কৌশলী হয়। মুড়ি মিছরির একদর হলে জেট বিমান চালাতে কেই বা রাজী হবে? গায়ের জোরে রাজী করানো কি সর্বক্ষেত্রে সম্ভব? এমনি করে উৎপত্তি হয় নতুন একটা উচ্চতর শ্রেণীর। তখন তার বিরুদ্ধে বিপ্লব ঘোষণা আবশ্যক হয়। তার উত্তরে যদি প্রতিবিপ্লব ঘটে, তখন? সমাজতন্ত্রের দুর্ভাগ্য হচ্ছে ব্যুরোক্রাসীর সর্বব্যাপী প্রসার। কিন্তু ব্যুরোক্রাটদের মধ্যেও গুণকর্ম বিভাগ অনুসারে বিপ্লববৈষম্য আছে। বিশ্ববিদ্যালয় ধ্বংস করাই কি এর সমাধান?

উচ্চতর শিক্ষা, উচ্চতর সংস্কৃতি, উচ্চতর পদ, উচ্চতর বিত্ত, উচ্চতর সামাজিক মর্যাদা, উচ্চতর আর্থিক ক্ষমতা, উচ্চতর রাজনৈতিক প্রভাব ও উচ্চতর জীবনদর্শন আদিকাল থেকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে পরস্পরনির্ভর। যখনি এদের একটিকে ছিন্ন করা হয় তখনি আর একটির অঙ্গে লাগে। সুতরাং উচ্চতর শিক্ষার উপর হস্তক্ষেপ সম্বন্ধে নির্বিকার থাকা যায় না। সেটা যেদিক থেকেই আসুক না কেন ফলভোগ করতে হবে সাহিত্যকেও। যা নিয়ে আমি আছি। শিক্ষা নিয়ে আমার কথা বলার অধিকার এই সূত্রে। নতুবা আমি শিক্ষকও নই, শিক্ষার্থীও নই, শিক্ষা অধিকর্তাও নই, বিশ্ববিদ্যালয় সংসদ বা পরিষদের সদস্যও নই। মাঝে মাঝে আমার ডাক পড়ে, তাই দু'এক কথা বলতে হয়।

সমাজের ন্যায়সম্মত পুনর্বিন্যাস নিয়ে যাঁরা চিন্তাকুল আমিও তাদের একজন। যারা নিচে পড়ে আছে তাদের উপরে তুলতেই হবে। যারা পেছনে পড়ে আছে তাদের সামনে টেনে আনতেই হবে। যারা ক্রীতদাস না হলেও মজুরি দাস তাদের মুক্তি দিতেই হবে। স্লেভারি রহিত হয়েছে, ওয়েজ স্লেভারি আরো বেড়ে গেছে। একালের মানুষ একহিসাবে সেকালের মানুষের চাইতেও অধম, কেননা এরা যুদ্ধকালে কনস্ক্রিপ্ট হয়। শান্তিকালেও রেহাই পায় না। এটা ক্যাপিটালিস্ট তথা কমিউনিস্ট উভয় সমাজেই সমান সত্য। এ প্রথা রহিত না হলে লিবার্টির অভিমান বৃথা। আর ইকোয়ালিটি বলতে যারা অজ্ঞান তাদের সমাজে পার্টি মেম্বর ও পার্টি মেম্বর নয় এই দুই ভাগে বিভক্ত নাগরিক কি সমদৃষ্টির অধিকারী; ক্লার্জি এখন পার্টি সেজে ফিরে এসেছে।

শিক্ষাঘটিত ব্যাপারে আমার বিচার জাতীয়তাবাদীর মতো নয়। দেশ নয়, যুগই আমার বিবেচনায় মুখ্য। এ যুগের মুখ্য স্রোতটা পশ্চিমে প্রবাহিত হচ্ছে। সেই জন্যে আমার তরুণ বয়সের ধ্যান ছিল যেমন করে হোক একবার পশ্চিমের মুখ্য স্রোতে অবগাহন করে আসতে হবে। একই ধ্যান আজকের দিনের তরুণবয়সীদেরও। প্রথম সুযোগেই তারা পশ্চিমযাত্রা করে। তাদের আটক করার জন্যে কি কম চেষ্টা হয়? সমুদ্রযাত্রা সেকালে সোজাসুজি নিষিদ্ধ ছিল। একালে প্রকারান্তরে নিষিদ্ধ। এসব না করে আমাদের নেতারা মুখ্য স্রোতটাকে আবার প্রাচ্যদেশে ফিরিয়ে আনার জন্যে উদ্যোগী হন। যেমনটি ছিল মৌর্য ও গুপ্ত যুগে। রিভাইভাল আর সম্ভব নয়, কিন্তু রেনেসাঁস সম্ভব। এর খানিকটে হয়ে রয়েছে বহিরাগত শিক্ষাব্যবস্থার কল্যাণে। কিন্তু এমন ঘুণ ধরেছে এতে

যে এর মূলোচ্ছেদ না করে আমূল সংস্কার প্রয়োজন। রিয়ালিটির সঙ্গে নতুন করে মন মিলিয়ে নিতে হবে। আর চোখ কান ইত্যাদি ইন্দ্রিয়।

কেবলি স্বপন করেছি বপন

এবার বাংলাদেশ থেকে ফিরে এসে স্থির করি যে অন্যান্যদের দিয়ে লেখাব, নিজে কিছু লিখব না। লিখলে আমার যা স্বভাব সাহিত্যের ধান ভানতে রাজনীতির শিবের গীত গাইব। তাতে ভুল বোঝাবুঝি কমবে না বাড়বে কে বলতে পারে! আমি আর যাই করি ভুল বোঝাবুঝি বাড়তে দেব না। তার চেয়ে নীরব থাকাই শ্রেয়।

কিন্তু যে আনন্দ এবার আমি পেয়েছি তা কি তা বলে অব্যক্ত থেকে যাবে? না, আমাকে বলতেই হবে। ঈশ্বরের কাছে আমি দীর্ঘজীবন চাইনি। এটা তাঁর অযাচিত দান। কে জানে কী তাঁর উদ্দেশ্য ছিল! হতেও পারে তিনি আমাকে শেখাতে চেয়েছিলেন যে মানুষের সব চেষ্টা বৃথা যায় না, আজ যেটা ব্যর্থ সেটা আপাতত ব্যর্থ, পরে সেটা সফল হবে, যদি সত্য হয়ে থাকে। আমি কেবলি স্বপন করেছি বপন বাতাসে, তা বলে হাহুতাশ করে আকাশকুসুম চয়ন করব কেন? বীজ থেকে গাছ জন্মাবে, গাছে ফুল ফুটবে, ফল ধরবে। আমাকে দিয়ে নয়। তাতে কী আসে যায়! আমি নিমিত্তমাত্র।

টলস্টয়ের প্রভাবে পড়ে আমার আদর্শ ছিল আত্মসম্মানসম্পন্ন শিক্ষিত কৃষক। যাকে কেউ শোষণ করতে সাহস পাবে না। শাসক যাঁরা তাঁরাও সমীহ করবেন। তাই আমার হাতে যখন পরিচালনা এল তখন আমি রাজশাহী জেলার নওগাঁ মহকুমার গাঁজামহালের হাইস্কুলকে করতে গেলুম সাধারণ হাই-স্কুলের থেকে ভিন্ন প্রকার। জুড়ে দিলুম তার উপরের দিকে চাষের ক্লাস। ছাত্ররা পড়াশুনাও করবে, চাষবাসও করবে। চাষবাসের শিক্ষা দেবেন কৃষিবিদ্যায় শিক্ষিত একজন ডেমনস্ট্রেটর। স্কুলের অবস্থান শহর থেকে দূরে। চারদিকে গ্রাম। ছাত্ররা কৃষকের ছেলে। সকলেরই ক্ষেতখামার আছে। আধুনিক পদ্ধতিতে আবাদ করলে অনায়াসেই ভালো ফসল পাবে। চাকরি করতে যাবে কেন? চাকরির উপর থেকে চাপ কমবে। শহরের উপর চাপ পড়বে কম।

কালচার অ্যান্ড অ্যাগ্রিকালচার। এই ছিল আমার মটো। আমি নিজেও একদিন চাকরি ছেড়ে দিয়ে তাই নিয়ে থাকব। টলস্টয়ের অনুসরণে। কী দরকার কারো দাসত্ব করার! আমি যত বড়োই হই না কেন চাকুরে বলেই গণ্য হব। সার্ভিস মেণ্টালিটি স্লেভ মেণ্টালিটিরই ভদ্র নাম। স্বরাজ মানে কি আরো বেশী চাকরি? আরো বড়ো বড়ো চাকরি? না, স্বরাজ মানে আত্মসম্মান-সম্পন্ন কৃষক ও শিল্পী।

কিন্তু দেখা গেল যাদের জন্যে স্কুল তারা অর্থাৎ গাঁজামহালের চাষী মুসল-

মানরা তাদের ছেলেদের চাষী করবে না, চাকুরে করবে। স্কুলের কৃষি ক্লাসে একটির বেশী ছাত্র নেই। সেটিও বামুনের ছেলে। পাশ করে চাষ করবে না, পড়াশুনায় কাঁচা বলে তার অভিবাবক তাকে কৃষিবিদ্যা শিখতে পাঠিয়েছেন। সে পাশ করে বেরোলে ডেমনস্ট্রেটর হবে। এই একটি ছাত্রের জন্যে এত বড়ো আয়োজন! আমি দমে যাই। ওদিকে একদল লোক উঠে পড়ে লেগেছিলেন স্কুলটাকে উঠিয়ে দিতে। আমার বদলীর পর সেটা বোধহয় দু'বছর বাদে উঠে যায়। আমার উৎসাহ চলে যায়।

ঢাকায় অধ্যাপক শহীদুল্লাহ্ ছিলেন আমার প্যারিসের আলাপী। আবার নতুন করে আলাপ জমে ওঠে। আমার দুঃখের কাহিনী শুনে তিনি যা বলেন তার মর্ম চাষীর ছেলেরা তো বাপের সঙ্গে মাঠে গিয়েই চাষ শেখে। স্কুলে গিয়ে আর নতুন কী শিখবে! জমির উপরে চাপ খুব বেশী। চাষীর সব ক'টি ছেলের জন্যে এত জমিই বা কোথায়! সেইজন্যে চাষী তার ছেলেদের অন্তত একজনকে পাঠায় স্কুলে পড়াশুনা করতে। পাশ করে চাকরি নিয়ে শহরে যেতে।

তার মানে গ্রামের উপর চাপ কমবে। শহরে ভিড় বাড়বে। সম্পূর্ণ বিপরীতমুখী চিন্তা। বোঝা গেল কেউ চাষ করবে না। না হিন্দুর ছেলে, না মুসলমানের ছেলে। সবাই করবে চাকরি। তাই নিয়ে কাড়াকাড়ি। মারা-মারি। ভাগাভাগি। তখনো মালুম হয়নি যে ভাগাভাগি করতে করতে ঘটবে দেশভাগ ও প্রদেশভাগ।

এই ভেবে আমার দুঃখ হয় যে চাষীরা শিক্ষিত হলে চাষ করবে না, চাকরি করবে। আর অশিক্ষিত থাকলে শোষকদের হাত থেকে রক্ষা পাবে না, বাবুদের কাছে সম্মান পাবে না। পশ্চাদপৎ থেকে যাবে। আমি ও প্রসঙ্গ ভুলে যাই। অন্য কাজে মন দিই।

বদলী হতে হতে একদিন যাই নদীয়া জেলায়। ভ্রমণসঙ্গী হই স্যর নাজিম-উদ্দীনের। তিনি তখন স্যর জন অ্যাণ্ডারসনের এক্‌জিকিউটিভ কাউনসিলার। ডিনার টেবিলে বসে আমাকে চমকে দিয়ে বলেন, "আপনি শুনে সুখী হবেন যে গভর্ণমেণ্ট এতকাল পরে আপনার পরিকল্পনাই গ্রহণ করেছেন। সেই যে গাঁজামহালের স্কুল।" ততদিনে আমার মন ভেঙে গেছে। গাঁজামহল কোথায় আর আমি কোথায়! পরে আবার রাজশাহী জেলায় বদলী হই। কিন্তু আর বেলতলায় যাইনে।

দেশ প্রস্তুত ছিল না। কাল উপযোগী ছিল না। পাত্র বলতে যদি আমাকেই বোঝায় তো আমি সাতঘাটে বদলী হতে হতে বদলে যাই। অসময়ে চাকরিও ছেড়ে দিই।

নওগাঁর পর কতকাল কেটে গেছে। এক প্রদেশ দুই প্রদেশ হয়েছে। এক দেশ দুই দেশ হয়েছে। পরে আবার তিন দেশ। যোগাযোগ ছিন্নবিচ্ছিন্ন। সাহিত্যের খোঁজখবর কতকটা রাখি। শিক্ষার খোঁজখবর রাখিনে। তবে মুক্তি-যুদ্ধের পর বার বার তিনবার বাংলাদেশে নিমন্ত্রিত হয়ে শিক্ষার সমাচারও একটু আধটু পাই। সুযোগ পেলে মুখ ফুটেও দুটি একটি কথা বলি। গত-

বার জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের জায়গা জমি তেপান্তরের মাঠের মতো ধ্ধ্ করছে দেখে বলি, এখানে চাষ করা উচিত। ছেলেরাই করবে চাষ। কে কার কথা শোনে! সবাই চায় শহুরে শিক্ষা।

এবার সাভারের শহীদ মিনার দর্শন করে ওই পথ দিয়েই ফিরছি। সহযাত্রী এক ভদ্রলোক বলেন বাংলাদেশে এখন অগণিত কলেজ, কোনটারই আর্থিক অবস্থা সচ্ছল নয়, সরকার থেকে যা পাওয়া যায় তা মুষ্টিভিক্ষা। তাই কলেজের সংখ্যা কমিয়ে দেবার প্রস্তাব উঠেছে। সেইসব কলেজই সাহায্য পাবে যাদের নিজেদের আয় আশাপ্রদ। তিনি যে কলেজের সঙ্গে সংযুক্ত তার কর্মকর্তারা আশেপাশের সব জমি কিনে নিয়েছেন। সেখানে চাষ হবে। লাভের টাকা হবে কলেজের প্রধান আয়। সরকারী সাহায্য না মিললেও কলেজ দাঁড়িয়ে থাকবে নিজের পায়ে।

দিন দুই বাদে শিক্ষাসচিব আমাদের ডিনার দেন। কথাপ্রসঙ্গে বলেন, সরকার স্থির করেছেন এখন থেকে বাংলাদেশের প্রত্যেকটি হাইস্কুলেই কৃষি হবে একটি অবশ্য শিক্ষণীয় বিষয়।

আমি চমৎকৃত হই। বলি, "আচ্ছা, আপনি কি জানেন এর প্রবর্তক কে?"

তাঁর জানার কথা নয়, কারণ আমি যখন নওগাঁয় তখন তিনি নবজাতক।

তিনি আমাকে সেদিন যে আনন্দ দেন তার তুলনা নেই। বলেন, "আপনিই। আপনার স্কীমের কাগজপত্র আমি দেখেছি।" ডিনারের পর ভাষণ দিতে গিয়ে আমি প্রাণভরে ধন্যবাদ জানাই তাঁকে, তাঁর সরকারের শিক্ষাবিভাগকে। কালচার আর অ্যাগ্রিকালচার ছিল আমার লক্ষ্য। এখন তাঁদেরও। আমার হাতে ক্ষমতা নেই, তাঁদের হাতে আছে। আমি বিশ্বাস করি তাঁরা সফল হবেন। যদি নিষ্ঠার সঙ্গে লেগে থাকেন। দেশকালপাত্র ভুলে গিয়ে আবেগের সঙ্গে বলি, "আমি কৃতার্থ। আমার জীবন ধন্য।"

বাংলা সাহিত্য একাডেমী প্রসঙ্গে

প্রায় বিশ বছর আগে যখন দিল্লীতে সাহিত্য আকাদেমী, ললিতকলা আকাদেমী ও সঙ্গীত নাটক আকাদেমি প্রতিষ্ঠিত হয় তখন প্রশ্ন উঠেছিল, 'আকাদেমি' ছাড়া আর কোনো শব্দ কি খুঁজে পাওয়া গেল না? ওটা তো একটা গ্রীক শব্দ। ইতিমধ্যে ইউরোপের বিভিন্ন ভাষায় গৃহীত হয়েছে। সুতরাং ইউরোপীয় শব্দও বলা যেতে পারে। মৌলানা আজাদ এর উত্তরে কী বলেছিলেন ঠিক মনে পড়ছে না, যতদূর মনে আছে আকাদেমি শব্দটা আরবদেশের সুধীসমাজও আপনার করে নিয়েছেন। এদেশেও মুসলিম বিদ্বানদের শিবলী আকাদেমির নাম শোনা যায়।

তা ছাড়া গ্রীক শব্দ কি সংস্কৃত ভাষায় কম আছে নাকি? 'কেন্দ্র' কথাটাও

তো গোড়ায় গ্রীক। 'কেন্দ্রীয় সরকার' যদি 'বেতার কেন্দ্র' পরিচালনা করতে পারেন তবে 'সাহিত্য আকাদেমি' এমন কী অপরাধ করল! ওর ইংরেজী নাম হচ্ছে ন্যাশনাল অ্যাকডেমি অফ লেটার্স। ওর প্রতিষ্ঠাতারা কী জানি কেন আমাকেও তাঁদের একজন করেছিলেন। চোদ্দজনের কর্মসমিতিতে আমারও আসন ছিল জবাহরলাল নেহরু, সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন, আবুল কালাম আজাদ, কে. এম. পানিক্কর প্রভৃতির সঙ্গে। প্লেটো কি কোনোদিন ভাবতে পেরেছিলেন যে এমন এক আজব একাডেমী হবে যার ভাষার সংখ্যাই সদস্যদের সমান? এক একজন এক এক ভাষায় কথা বলবেন? কেউ কারো ভাষা বুঝতে পারবেন না? মৌলানা আজাদ তো ইংরেজীতে বার্তাচিৎ করবেন না। সবাই যদি তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করতেন তা হলে ওটি হতো আর একটি 'টাওয়ার অফ্ বেবল'। যদিও ইংরেজী তার অন্যতম স্বীকৃত ভাষা ছিল না। তবু ভারতীয় সাহিত্য আকাদেমির সাধারণ ভাষা হয় ইংরেজী।

বছর কয়েক বাদে বুঝতে পারা গেল ওটা ফরাসী আকাদেমির মতো আকাদেমি নয়। কোনোদিন হবেও না। হতে পারত, যদি ওর ভাষা হতো যে-কোনো একটি ভারতীয় ভাষা। কিন্তু একসূত্রে একরাশ ভাষাকে গাঁথতে গিয়ে কোনোটির উপরেই মনোনিবেশ করতে পারা সম্ভব হলো না। ইতিমধ্যে আকাদেমির স্বীকৃত ভাষার সংখ্যাও বেড়েছে। "যত মত তত পথ" এই যদি হয় নীতি তবে যতগুলি ভাষা ততগুলি আকাদেমি ছাড়া আর কোনো গতি নেই। তিন মাসে একবার একঘণ্টার জন্যে মীটিং করে বিশেষ বিশেষ প্রয়োজনের দিকে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করা যায় না। বিভিন্ন ভাষার উৎপত্তি বিভিন্ন, বিকাশ বিভিন্ন, আদর্শ বিভিন্ন, মান বিভিন্ন। কয়েকটি ভাষার সাহিত্য এখনো ঊনবিংশ শতাব্দীতেই পা দেয়নি, কয়েকটি ভাষার সাহিত্য এখনো সেই শতাব্দীর থেকে পা সরিয়ে নেয়নি। সংস্কৃত সাহিত্য যে কোন্ যুগে আছে তা পণ্ডিতরাই জানেন। একই তৎসম শব্দের এক এক অঞ্চলে এক এক অর্থ। একদিন জবাহরলালজী 'কল্যাণ' শব্দটির উদাহরণ দেন।

একটু একটু করে আমার উপলব্ধি হয় যে গোটা কয়েক সাধারণ কর্তব্য ছাড়া আর কিছুই একসঙ্গে বসে করতে পারেন না তামিল, তেলুগু, মালায়লাম, কন্নড, গুজরাটী, মরাঠী, হিন্দী, উর্দু, পাঞ্জাবী, কাশ্মীরী, অসমীয়া, বাংলা, ওড়িয়া, সংস্কৃত ভাষার প্রতিনিধিগণ। এখন তো তাঁদের সঙ্গে যোগ দিয়েছেন মৈথিলী, সিন্ধি, ডোগরী ও ইংরেজী ভাষার প্রতিনিধিরা। মণিপুরী ও রাজস্থানীও স্বীকৃতি পেয়েছে। ভোজপুরী, কোঙ্কনী ও নেপালীও চাইছে। ইতিমধ্যে পেয়েছে।

তখন থেকেই আমি বলতে আরম্ভ করি যে বিভিন্ন ভাষার জন্যে বিভিন্ন শাখা আকাদেমি চাই। ভারতীয় সাহিত্য আকাদেমির শাখা। কথাটা কর্তাদের মনঃপূত হয় না। তাঁদের আশঙ্কা অমন করলে ভারত ভেঙে যাবে। ভারতীয় সাহিত্য আকাডেমি থেকে আমার বিদায়ের পর বিভিন্ন রাজ্যে সাহিত্য আকাডেমির উদ্ভব হয়েছে। কিন্তু ভারতীয় সাহিত্য আকাদেমির শাখা রূপে নয়।

স্বতন্ত্রভাবে। এসব রাজ্য আকাদেমি রাজ্য সরকারের কর্তৃত্বাধীন। পশ্চিমবঙ্গে সেরকম কোনো প্রতিষ্ঠান নেই। থাকলে ভাল হোত ভেবে কথাটা আমি একটি সভায় মুখ্যমন্ত্রী শ্রীযুক্ত অজয়কুমার মুখোপাধ্যায়ের কর্ণগোচর করেছিলুম। পরে খবরের কাগজে সেই প্রস্তাবের সমালোচনা দেখি। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্ থাকতে আবার এক বাংলা সাহিত্য আকাদেমি কেন?

বছর পাঁচেক পরে আবার বাংলা সাহিত্য আকাদেমির কথা উঠেছে। এবার যাঁরা উদ্যোগী হয়েছেন তাঁদের সামনে রয়েছে ঢাকার বাংলা একাডেমীর উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। মাত্র কয়েক বছরের কর্মিষ্ঠতায় ঢাকার বাংলা একাডেমী অসামান্য প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছে। তাই সকলে ভাবছেন তেমনি একটি প্রতিষ্ঠান এপারে থাকলে কত বেশী কাজ হোতো। আমাকেও সভায় আমন্ত্রণ করা হয়। ঘরে ঢুকছি এমন সময় এক বন্ধুর সঙ্গে মুখোমুখি। তিনি বললেন, "বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্‌কে বাঁচান।" মিনতিভরা সেই আবেদন আমাকে অভিভূত করে। বাংলা সাহিত্য একাডেমী হলে যদি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্ উঠে যায় তবে সেটা হবে পরম দুর্ভাগ্যের বিষয়। অপর পক্ষে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্ যদি ঢাকার বাংলা একাডেমীর মতো সক্রিয় না হয়, যদি তার সঙ্গে হাত মিলিয়ে কাজ করতে না পারে, যদি ভারতীয় সাহিত্য আকাদেমির সঙ্গে সম্পর্কশূন্য হয়, যদি প্রতিবেশী রাজ্যের সাহিত্য একাডেমীর সঙ্গে সংস্রব না রাখে তবে তার একাব বেঁচে থাকা হবে আর-একটি অত্যাবশ্যক প্রতিষ্ঠানকে বাঁচবাব সুযোগ না দেওয়া।

বাংলা সাহিত্য আকাদেমি একদিন না একদিন ভূমিষ্ঠ হবেই। কারণ যে ঐতিহাসিক অনিবার্যতা ঢাকার বাংলা একাডেমীর প্রতিষ্ঠা ঘটিয়েছে সেই ঐতিহাসিক অনিবার্যতাই কলকাতার বাংলা সাহিত্য একাডেমীর প্রতিষ্ঠা ঘটাবে। ওপারে যাঁরা আঞ্চলিক ভাষার অভিধান সংকলন করছেন তাঁদের কাজ অপরিপূর্ণ থেকে যাচ্ছে। তার পরিপূরক কাজ করতে হবে এপারেও। কিন্তু করবে কে? বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্? ছড়া ছড়িয়ে রয়েছে মেদিনীপুব থেকে চট্টগ্রাম পর্যন্ত বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডে। কিন্তু একই ছড়ার জেলা অনুসারে এক এক পাঠান্তর। তুলনামূলক আলোচনা কেমন কবে সম্ভব যদি ওপারের সংগ্রাহকরা যে আনুকূল্য ওপারে পাচ্ছেন এপারের সংগ্রাহকরা সেইরূপ আনুকূল্য এপারে না পান? একই বাউলগীতি আমরা দু' পাবের বিভিন্ন জেলায় শুনেছি, কিন্তু মিল যত অমিলও তত লক্ষ্য করেছি। তুলনামূলক আলোচনার জন্যে ক্ষেত্র প্রস্তুত হবে যখন দুই পারেই সংগ্রহের কাজ এগিয়ে যাবে। তার জন্যে চাই উপযুক্ত প্রতিষ্ঠান ও কর্মপ্রচেষ্টা।

ঢাকার বাংলা একাডেমী এক পায়ে এগিয়ে যাচ্ছে, আর একটা পা অচল। সে যদি স্বেচ্ছায় সচল হতো তা হলে বাংলা সাহিত্য আকাদেমি নামক নতুন একটা প্রতিষ্ঠানের আবশ্যক হতো না। আমরা বহুদিন থেকে অনুভব করছি যে এটার জন্যে কাজ পড়ে রয়েছে, কাজ আটকে রয়েছে। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্ যদি নিজের অস্তিত্ব বজায় রাখতে চায় তো পুরাতত্ত্ব নিয়েই থাকুক। পুরাতত্ত্ব নিয়ে বাংলা সাহিত্য একাডেমী তার সঙ্গে প্রতিযোগিতায় নামবে না। একা-

ডেমীর কাজ বর্তমানকে নিয়ে। আঞ্চলিক শব্দ, ছড়া, প্রবাদ, লোকগীতি যদি এখনি সংগৃহীত না হয় তবে অচলিত হয়ে যাবে, বিকৃত হয়ে যাবে। পূর্ববঙ্গের একজন লেখক আক্ষেপ করেছেন যে গ্রামের চেহারাই বদলে যাচ্ছে, গ্রাম হয়ে উঠছে শহর, লোকে ভুলে যাচ্ছে এতদিন যা লোকের মুখে মুখে ছিল। যে প্রতিষ্ঠান কর্মতৎপর হবে তাকেই তো পথ ছেড়ে দিতে হবে। বাংলাদেশ এবিষয়ে অগ্রণী হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ পশ্চাৎপদ। বাংলা একাডেমী যদি ঢাকায় প্রয়োজন হয়ে থাকে তবে তার পরিপূরক একাডেমী কলকাতায়ও প্রয়োজন। তা বলে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্ নিষ্প্রয়োজনীয় নয়। সেও থাকুবে।

বাংলা সাহিত্য একাডেমীর প্রধান কাজ হবে ওপারের বাংলা একাডেমীর সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের মান ও আদর্শ নির্ধারণ করা। এর জন্যে মাঝে মাঝে সেমিনার ডাকতে হবে, বৈঠকও বসাতে হবে। ভাষা ও সাহিত্যের প্রত্যেকটি বিভাগ যাতে বিকশিত হয় তার জন্যে উদ্যোগী হতে হবে। কেবলমাত্র কথাসাহিত্য দিয়েই সাহিত্যের পরিমাপ হয় না। আমাদের দর্শন বিজ্ঞান কখনো অপরিপুষ্ট। কেবল কতকগুলি পারিভাষিক শব্দ তৈরী করে দিলেই দর্শন বিজ্ঞানের গ্রন্থ আপনি লেখা হয়ে যাবে না। লেখকও তৈরি করতে হবে। পাঠকও তৈরি করতে হবে।

বিশ্ববিদ্যালয় ও সরকার থেকে ইতিমধ্যেই কতকগুলি কাজ আরম্ভ করে দেওয়া হয়েছে। বাংলা সাহিত্য একাডেমী তাদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় নামবে না। তাদের সঙ্গে সহযোগিতা করবে। কিন্তু এমন একদিন আসবে যেদিন বাংলা সাহিত্য একাডেমীর অথরিটিই লোকচক্ষে চূড়ান্ত হবে। ভাষাঘটিত বা সাহিত্যঘটিত বিতর্কের সময় একাডেমীর বক্তব্যই সর্বজনমান্য হবে। বলা বাহুল্য, সে অবস্থা প্রস্তাব পাশ করলেই আসবে না। দল থাকলেই আসবে না। অর্থবান হলেই আসবে না। অথরিটি ধীরে ধীরে গড়ে তুলতে হয়। পঞ্চাশ বছরও তার পক্ষে যথেষ্ট নয়। ধৈর্য ধরতে হবে। একনিষ্ঠভাবে কাজ করে যেতে হবে। অন্ততঃ পাঁচজন সাহিত্যিককে একত্র করা চাই যাঁদের কথার দাম আছে। ফরাসী একাডেমীর সদস্যসংখ্যা মাত্র চল্লিশজন। সেই চল্লিশজনকে বলা হয় 'অমরবৃন্দ'। সদস্যপদ লাভের জন্যে বড়ো বড়ো রাজনীতিক ও সেনানায়করাও উদ্‌গ্রীব, যদি সাহিত্যে কিছু কাজ থাকে। একদিন হয়তো বাংলা সাহিত্য একাডেমীরও তেমনি সুযশ হবে।

(১৯৫৩)

গ্রন্থাগার প্রসঙ্গে

গ্রন্থকার আর গ্রন্থাগার যেন একই মুদ্রার এপিঠ ওপিঠ। গ্রন্থকার না থাকলে গ্রন্থাগার থাকে না। আর গ্রন্থাগার না থাকলে গ্রন্থাকারের সৃষ্টি ধারণ করে রাখবে কে? বলা বাহুল্য ঘরোয়া গ্রন্থাগারও গ্রন্থাগার। আবার শিক্ষালয়ের

গ্রন্থাগারেও গ্রন্থাগার।

তবে আমরা সাধারণত পাবলিক লাইব্রেরী অর্থেই গ্রন্থাগার শব্দটি ব্যবহার করি। পাবলিক লাইব্রেরী এদেশের মাটিতে নতুন। সবচেয়ে পুরাতন পাবলিক লাইব্রেরীর বয়সও দেড় শতাব্দীর বেশী নয়। এসব লাইব্রেরীর দ্বারা পাঠক-সাধারণের অশেষ উপকার হয়েছে। কিন্তু তাদের সংখ্যা অপেক্ষাকৃত মুষ্টিমেয়। এখনো এদেশের বৃহত্তর জনসাধারণ পাবলিক লাইব্রেরীর সেবা থেকে বঞ্চিত।

গ্রামে গ্রামে পাড়ায় পাড়ায় পাবলিক লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠা করতে হবে। একাজ বেশীদিন ফেলে রাখা যাবে না। কেবলমাত্র পাঠশালা বিদ্যালয় বা কলেজ থেকেই সকলে শিক্ষালাভ করতে পারে না। করলেও তা বিশ বাইশ বছরে ফুরিয়ে যাবে। কলেজ থেকে শিক্ষা লাভ করে তারা শিক্ষিত বলে গণ্য হবে তা ঠিক। কিন্তু চর্চা না করলে প্রত্যেক বিদ্যাই বাসি হয়ে যায়। বিশেষ করে আজকের দিনে জ্ঞানবিজ্ঞান যেমন দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলেছে, তার সঙ্গে পাল্লা দিতে না পারলে শিক্ষিত ব্যক্তিও সেকেলে হয়ে যান। সুতরাং তরুণ সম্প্রদায়ের শ্রদ্ধা হারান।

কলেজের পড়াই যথেষ্ট নয়। তার পরেও আরো পড়াশুনা করতে হবে। আজীবন অধ্যয়ন করা চাই। রবীন্দ্রনাথকে তা করতে দেখেছি। মৃত্যুর একবছর আগেও তিনি আমার স্ত্রীর কাছ থেকে 'ম্যাথেমেটিক্স ফর দ্য মিলিয়ন' নিয়ে পড়েছিলেন। আর একজন জ্ঞানতপস্বীর নিকট সংস্পর্শে এসেছি। তিনি বিশ্ববিখ্যাত বৈজ্ঞানিক আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসু। কখনো সংস্কৃত, কখনো প্রাকৃত, কখনো ফরাসী, কখনো জার্মান ভাষার বই হাতে নিয়ে বসেছেন বা শুয়েছেন। তাঁর তৃষ্ণার জল।

সাধারণ মানুষকে সারাজীবন এই তৃষ্ণার জল জোগাবে কে? পাবলিক লাইব্রেরী। দেশে অসংখ্য পাবলিক লাইব্রেরী স্থাপন করতে হবে আর তাতে অসংখ্য উৎকৃষ্ট গ্রন্থ রাখতে হবে। দ্বিতীয় প্রস্তাবটি প্রথম প্রস্তাবের চেয়ে কঠিন। সাহিত্যের রুচি এত নিচে নেমে গেছে যে তাকে প্রশ্রয় দিতে গেলে লাইব্রেরীর উদ্দেশ্য পণ্ড। না দিলেও বিপদ। কেউ বই নেবে না, চাঁদা দেবে না। তখন লাইব্রেরীটাই সেকেলে হয়ে যাবে।

অনুবাদ প্রসঙ্গে

আজ থেকে চল্লিশ বছর আগে কাশী থেকে হিন্দী ভাষায় একটি মাসিকপত্র প্রকাশিত হয়, তার নাম 'হংস'। সম্পাদক দুই সাহিত্যের দুই দিকপাল। হিন্দীর প্রেমচন্দ্। গুজরাটীর কন্হাইয়ালাল মুন্শী। হাঁস যেমন নীর থেকে ক্ষীর সংগ্রহ করে তেমনি 'হংস' করত বিভিন্ন ভারতীয় ভাষায় প্রকাশিত গল্প, প্রবন্ধ, কবিতা প্রভৃতির থেকে অনুবাদযোগ্য রচনা সংগ্রহ। সেসব রচনা হিন্দীতে অনুবাদ করে ভারতের সর্বত্র পরিবেশন। পাঠকরা পেতেন ভারতীয় সাহিত্যের স্বাদ। আমিও ছিলুম একজন আগ্রহী পাঠক। বিভিন্ন ভাষার সঙ্গে

সেইভাবে ঘটে আমার পরোক্ষ পরিচয়।

অনুবাদ ভিন্ন স্বদেশের বিচিত্র সাহিত্যের সঙ্গে পরিচয়ের অন্য কোনো উপায় নেই। এ কাজ ইংরেজীতে 'মডার্ন রিভিউ' প্রভৃতি পত্রিকা করত। কিন্তু এটিকে নিজের একমাত্র কাজ করল 'হংস'। কিন্তু দুঃখের বিষয় প্রেমচন্দের তিরোধানের সঙ্গে সঙ্গে তারও তিরোধান ঘটে। মুন্‌শী বোধহয় একাই কিছুদিন চালিয়েছিলেন। কিন্তু তিনিও বম্বের কংগ্রেস মন্ত্রী হয়ে সাহিত্য থেকে সরে যান। তখন থেকে তারই মতো একটি অনুবাদপত্রের অভাব আমি অনুভব করেছি। অনুবাদের কাজ অবশ্য বন্ধ থাকেনি। কিন্তু একসঙ্গে অনুবাদ করারও একটি মহিমা আছে। পাশাপাশি পৃষ্ঠায় পনেরো ষোলটি ভাষার রচনাকে সারিবন্ধ করা যেন লেখকদেরও একসারিতে বসিয়ে আরতি করা, এতে ভারত-ভারতীরও আরতি।

আমাদের 'অনুবাদ পত্রিকা' যদি এই কাজটির ভার নেয় তা হলে সেটা কেবল সাহিত্যের কাজ নয়, দেশের কাজও হবে। মাধ্যমটা হিন্দী নয়, বাংলা। এতে কিছু এসে যাবে না। বরঞ্চ বাংলার যোগ্যতা প্রমাণিত হবে। অনেকে হয়তো এইজন্যে বাংলা শিখবেন। আমরা বাঙালীরাও হাতের কাছে অন্যান্য সাহিত্যের সম্ভার পাব। তবে অনুবাদ যেন সরাসরি মূল থেকে করা হয়। ইংরেজী বা হিন্দীর মধ্যস্থতায় নয়। একদল অনুবাদকর্মী চাই যাঁরা যত্ন করে বিভিন্ন ভাষায় বিশেষজ্ঞ হবেন। প্রায় প্রত্যেক রাজ্যেই আজকাল বাঙালী লেখকলেখিকা আছেন, তাঁরা সেখানকার সাহিত্যে ওয়াকিবহাল। কেউ কেউ অনুবাদ করে অন্যত্র প্রকাশ করেছেন দেখা যায়। এঁরা যদি সহায় হন তবে আমাদের এই 'অনুবাদ পত্রিকা' নিশ্চয়ই নীর থেকে ক্ষীর সংগ্রহ করে 'হংস' পত্রিকার অভাব পূরণ করবে। সম্পাদনার জন্যে অবশ্য উপযুক্ত ব্যক্তিত্বের প্রয়োজন।

১৮

যুক্তাক্ষর বর্জন করার একটা ঝোঁক সর্বত্র দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। খবরের কাগজে তো প্রতিদিনই, সাময়িক পত্র যদি লাইনোটাইপে ছাপা হয় সাময়িক পত্রেও। সরকার থেকে মাঝে মাঝে বাংলায় টাইপ করা চিঠিপত্র পাই। তাতেও সেই ঝোঁক। টাইপিস্ট মশায় জানেন না কেমন করে যুক্তাক্ষর ভেঙে লিখতে হয়। তাই প্রেমেন্দ্র মিত্রকে লেখেন প্রেমেন্‌দ্র মিত্র। লেখা উচিত মিত্‌র। কিন্তু তা হলে আবার দ্র না লিখে দ্‌র লিখতে হয়। কঠিন সমস্যা। কিন্তু তাই বলে মিত্রকে মিত্র লেখা কি উচিত?

এখন আমার আপত্তি অন্নদাকে অন্‌নদা করা নিয়ে নয়, শঙ্করকে শংকর বানান করা নিয়ে। আমরা জানি যে ম্‌ স্থলে ং লেখা ব্যাকরণসম্মত। যেমন,

সম্বাদ না লিখে সংবাদ, সম্বরণ না লিখে সংররণ। কিন্তু সম্ একটি উপসর্গ। শম্ তা নয়। শঙ্কর যদি শংকর হয় তবে শঙ্কা হবে শংকা, অঙ্ক হবে অংক, বিহঙ্গ হবে বিহংগ, বঙ্গ হবে বংগ।

সংস্কৃতভাষায় কেবল যে ম্ স্থলে ঙ চলে তাই নয়। ঙ স্থলে, ঞ স্থলে, ণ্ স্থলে, ন্ স্থলে ং চালানো যায়। যে কোন দেবনাগরীতে ছাপা সংস্কৃত গ্রন্থ খুলে দেখবেন। বিশেষত বোম্বাইতে মুদ্রিত। আপ্টে মহাশয়ের অভিধান খুলে দেখছি গ্রন্থ হয়েছে গ্রংথ। শঙ্কর তো শংকর হয়েছেই। কিন্তু অন্ন হয়নি অংন। যদিও অন্ধ হয়েছে অংধ। অন্তর হয়েছে অংতর। তার চেয়ে ভয়ংকর কথা চন্দ্র হয়েছে চংদ্র। ইন্দ্র হয়েছে ইংদ্র।

হিন্দী ও মারাঠী লেখা হয় দেবনাগরী লিপিতে। তার অনুকরণে আজকাল গুজরাটী, ওড়িয়া প্রভৃতি লিপিতেও অনুস্বরের ব্যবহার দিন দিন বেড়ে চলেছে। মহাত্মা লিখতেন গাংধী। উৎকলমণি লিখতেন গোপবংধু। তাঁর সহকর্মী লিখতেন নীলকংঠ। তবে নামের আগে যখন পণ্ডিত বসিয়ে দিতেন তখন কিন্তু পংডিত লিখতে দেখিনি। ইদানীং ওড়িয়া ভাষার যেসব বইপত্র হাতে আসছে তাতে অনুস্বরের ছড়াছড়ি। দিগংত, অনংত, সামংত, মহাংতি এমনি কতরকম বানান। ওদিকে হিন্দী যদিও হিংদী হয়নি তবু দেখতে পাচ্ছি প্রধানমন্ত্রী হয়েছে প্রধানমংত্রী আর মন্ত্রালয় হয়েছে মংত্রালয়। সম্বন্ধ হয়েছে সংবংধ। দণ্ডবিধি হয়েছে দংডবিধি। আচ্ছা, আপনারা কি কেউ কাংস্টীট্যুশনল হিস্ট্রী অফ ইংডিয়া পড়েছেন? যদি না পড়ে থাকেন তবে পার্লিয়ামেংট্রী প্রেক্টিস বইখানা অবশ্যই পড়ে থাকবেন।

আমি সেই দিনটির প্রতীক্ষায় আছি যেদিন ঈশ্বরচন্দ্র হবে ঈশ্বরচংদ্র, বঙ্কিমচন্দ্র হবেন বংকিমচংদ্র, হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় হবেন হেমচংদ্র বংদ্যোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথ হবেন রবীংদ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ হবেন সত্যেংদ্রনাথ। আমরা বংদে মাতরম্ গান করার পর গান ধরব পংজাব সিংধু গুজরাট মারাঠা দ্রাবিড় উৎকল বংগ। তারপর গাইব আমি চংচল হে আমি সুদূরের পিয়াসী। সুংদর হৃদিরংজন তুমি নংদন ফুলহার। নতুন করে গীতাংজলি আর চতুরংগ পড়ব। অচিংত্যকে চিনব, প্রেমেংদ্রকে ভালোবাসব, জীবনানংদকে বুঝব।

উপরে লিখেছি 'হিন্দী যদিও হিংদী হয়নি'। না, সেটা ঠিক নয়। একই রিপোর্টের পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেখছি হিন্দী হয়েছে হিংদী। তবে কেন্দ্রীয় হয়নি কেংদ্রীয়। হয়ে থাকতে পারে অন্য কোনো পৃষ্ঠায়। এখনও টাইপরাইটারে যুক্তাক্ষর লিখতে পারা যায়। পরে যখন সেটা সম্ভব হবে না তখন শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীও হবেন ইংদিরা গাংধী। তাঁর পদাংক অনুসরণ করে একে একে সকলেই সেই ধারা ধরবেন। আনংদবাজার পত্রিকার সঙ্গে পাল্লা দেবে যুগাংতর। অশোককুমার সরকার ওটা এড়াতে পারলেও তুষারকাংতি ঘোষ বা সুকমলকাংতি ঘোষ কি পারবেন? সংতোষকুমার ঘোষ ও নীরেংদ্রনাথ চক্রবর্তী যদি না পারেন তবে দক্ষিণারংজন বসু ও নংদগোপাল সেনগুপ্ত কেমন করে পারবেন? মুখ্যমংত্রী সিদ্ধার্থশংকরের সঙ্গে তরুণকাংতি, শংকর ঘোষ, অজিত পাংজা, মৃত্যুংজয়

বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতিরও রূপাংতর ঘটবে। আমলাতংত্রেও এর ঢেউ গিয়ে পৌঁছবে। সমাজতংত্রী নেতারাও কি বাদ যাবেন? "সব লাল হো জায়গা" যখন হবে তখন হবে। তার আগে সব অনুস্বর বন্ জায়েগা।

কিন্তু আমি এক্ষেত্রে রক্ষণশীল। আমার দৌড় ওই বাংলাদেশ ও বাংলা ভাষা অবধি। গানের ও কবিতার ছন্দ ঠিক রাখতে হলে ও ছাড়া উপায় নেই। উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গতি রাখার জন্যে রবীন্দ্রনাথ ও অতুলপ্রসাদও কাজ করেছেন। এখন তো বাংলাদেশ বলে একটা স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রের অভ্যুদয় হয়েছে। উচ্চারণ ও ছন্দের দিক থেকে শঙ্কর কিসে ভুল, শংকর কিসে ঠিক? দেবনাগরীর বা হিংদীর পথ আমার পথ নয়। আর টাইপরাইটার বা লাইনোর জন্যে আমি, না আমার জন্যে টাইপরাইটার ও লাইনো? এতে জনগণেরই বা এমন কী লাভ হবে? কাগজ বাঁচবে? ছাপা খরচ কমবে? যুক্তাক্ষর কি পুরোপুরি বর্জন করতে পারা যাবে?

সংস্কৃত ভাষায় অনুস্বরের উচ্চারণ ক বর্গের বেলা ঙ্, চ বর্গের বেলা ঞ্, ট বর্গের বেলা ণ্, ত বর্গের বেলা ন্। অন্যান্য ক্ষেত্রে ম্। বাংলা ভাষায় এ নিয়ম খাটে না। সুতরাং এটা একটা অংধ অনুকরণ। এটা বংধ হলেই ভালো হয়।

সংহতির সঙ্কট

ভূমিকা

ছেলেবেলায় শুনতুম রাশিয়া বাদে সমগ্র ইউরোপ যত বৃহৎ একা ভারতবর্ষ তত বৃহৎ। ক্ষুদ্র ইংলণ্ড, সাত সমুদ্র পারে তার অবস্থান, সে কী করে এত বড়ো একটা মহাদেশতুল্য দেশের একচ্ছত্র মালিক হয়? জার্মানদের সঙ্গে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে সে যদি আপনা হতে সরে যায় বা আমাদের কেউ যদি তাকে জোর করে সরিয়ে দেয় তা হলে তো আমরা নিজের ঘরে নিজে মালিক হই। নরমপন্থীদের আমরা কৃপার চক্ষে দেখি। ওঁদের ধারণা ইংরেজরা আছে বলেই ভারতবর্ষ অখণ্ড আছে, ওরা না থাকলে চৌচির হবে। ইউরোপেরই মতো। কিংবা মোগল সাম্রাজ্যের পতনের পর এই ভারতবর্ষেরই মতো। ব্রিটিশ সম্রাটই একমাত্র যোগসূত্র। তাঁর কাছে স্বাধিকার চাইতে পারো, স্বরাজ চাইতে পারো, কিন্তু দেশরক্ষার দায়িত্ব তাঁর উপরেই থাকবে, সুতরাং পররাষ্ট্রনীতি নির্ধারণের ভারও।

কিন্তু এমন এক সময় এল যখন পূর্ণ স্বাধীনতাই হলো কংগ্রেসের লক্ষ্য। এতে বহু বিজ্ঞজনের সায় ছিল না। রবীন্দ্রনাথেরও না। তিনি বলতেন, আগে তো ঐক্য গড়ে তোল। তার পরে ইংরেজদের বিদায় দেবার কথা তুলবে। আমরা ততদিনে যুবক হয়েছি। বৃদ্ধের বচন আমরা গ্রাহ্য করিনে। মুসলিম লীগ যখন পাকিস্তানের দাবী শোনায় তখন সেটাকেও আমরা অগ্রাহ্য করি। একবার ইংরেজকে হটাতে পারলে মুসলিম লীগকে হটাতে কতক্ষণ? কিন্তু কার্যকালে দেখা গেল ইংরেজ আপনা থেকে হটে যাচ্ছে, সঙ্গে সঙ্গে ভারতবর্ষও দু'ভাগ হয়ে যাচ্ছে। কংগ্রেস যদি তাতে রাজী না হতো বহুভাগ হয়ে যেত। মাউণ্টব্যাটেন হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন তিনি আপসের চেষ্টায় বিফল হলে প্রদেশওয়ারি ভাবে ক্ষমতা হস্তান্তর করে বিদায় নেবেন। তা হলে কংগ্রেস অবশ্য আটটি প্রদেশকে নিয়ে ফেডারেশন গড়তে পারত, কিন্তু বাকী তিনটি প্রদেশ অন্যান্যদের কবলে পড়ত। বাংলাদেশের সবটা ছেড়ে না দিয়ে আধখানা হাতে রাখাই পণ্ডিতের কাজ। তেমনি পাঞ্জাবের আধখানাও। পূর্ণ স্বাধীনতার নবীন প্রস্তাবকারীদের একজন নিখোঁজ, আরেকজন ততদিনে প্রবীণ। অখণ্ড ভারতের জন্যে লড়বার ধৈর্য সে বয়সে নেই। পূর্ণ স্বাধীনতাই তিনি আদায় করলেন, কিন্তু বাংলার অখণ্ডতা, পাঞ্জাবের অখণ্ডতা, আসামের অখণ্ডতা ও ভারতের অখণ্ডতা রক্ষা করতে পারলেন না। কী করবেন, দেশের জনসংখ্যার একভাগ তাঁর বৈরী। তারা চায় দেশভিত্তিক রাষ্ট্র নয়, ধর্মভিত্তিক রাষ্ট্র। না পেলে তারা ধর্মযুদ্ধ বাধিয়ে দেবে। সে ঝুঁকি অহিংসাবাদী যাঁরা তাঁরা নিতে পারেন না। এক নোয়াখালী নিয়েই তাঁরা নাজেহাল। সারা দেশ জুড়ে শত শত নোয়াখালী হবে। তার উত্তর শত শত বিহার নয়। মহাত্মার একটাই তো শরীর। ক'টা জায়গায় তিনি যাবেন? একটাই তো জীবন। ক'বার তিনি অনশন করবেন? কংগ্রেস নেতাদের সঙ্গে একমত না হলেও তিনি তাঁদের সিদ্ধান্তের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করবেন না। খর্বাকারে হলেও পাকিস্তানের পত্তন হলো। বাকী অংশটাকেই ভারত বলে অতীতের সঙ্গে অন্বয় রক্ষা করা গেল। অখণ্ডতা

রক্ষা নয়, অন্বয় রক্ষা সেটাও কম কথা নয়। সেই বুনিয়াদের উপর দাঁড়িয়ে আছে ভারতীয় জাতীয়তাবাদ ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র ও গণতন্ত্র।

ওদিকে পাকিস্তান তাসের কেল্লার মতো ধ্বসে পড়ছে। কারণ সে অতীতের সঙ্গে অন্বয় ছেদ করেছে। তার যেটা শিকড় সেটা থেকে গেছে ভারতের মাটিতে। সুলতানদের দিল্লী, বাদশাহদের দিল্লী, বড়লাটদের দিল্লী ভারতেই। ভারতের মুসলমানদের পবিত্রতম তীর্থ আজমীর শরিফ, বাদশাহী আমলের শ্রেষ্ঠ কীর্তি তাজমহল ও লাল কেল্লা, একালের শিক্ষা ও সংস্কৃতির পীঠ আলীগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয় আর হিন্দুস্থানী ভাষা ও সঙ্গীতের কেন্দ্র, লখনউ ভারতের ভিতরেই। পাকিস্তানীরা ধর্মের জন্যে আরবদের দিকে তাকাতে পারে, কিন্তু গৌরবময় অতীতের জন্যে ভারতের দিকেই। অথবা মোহেন্‌জো-দরো ও হরপ্পার দিকে। সেসব ইসলামের ইতিহাসের সামিল নয়, ভারতের ইতিহাসের সামিল।

যে ভারতের সঙ্গে আজকের মানুষ পরিচিত সে ভারত বিভাগোত্তর স্বাধীন ভারত। তার বয়স হলো ছত্রিশ। তার গণতন্ত্রের বয়স হলো তেত্রিশ। তার জাতীয়তাবাদ বিগত শতাব্দীর। তার ধর্মনিরপেক্ষতা কিন্তু বহু বিতর্কিত বিষয়। আমাদের রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাতা পিতারা বলেছেন এটা সেকুলার স্টেট। ইংরেজীতে সেকুলার কথাটির দুটো অর্থ। একটা অর্থ যে মানুষ বা প্রতিষ্ঠান আদৌ কোনো ধর্ম মানে না। আর একটা অর্থ, যে মানুষ বা প্রতিষ্ঠান কোনো একটি ধর্মকে অগ্রাধিকার বা বিশেষ অধিকার বা অসমান অধিকার দেয় না। সে ধর্ম অধিকাংশের ধর্ম হলেও না। সংখ্যা এক্ষেত্রে গণনীয় নয়। হিন্দুরা সংখ্যা-গরিষ্ঠতার জোরে সংখ্যালঘিষ্ঠদের উপর নিজেদের ইচ্ছা চাপিয়ে দিতে পারে না। আইন সভায় তাদের দুই-তৃতীয়াংশ গরিষ্ঠতা থাকলেও না। সৈন্যদলে তাদের আরো বেশী গরিষ্ঠতা থাকলেও না। ভোটের জোরেই হোক আর অস্ত্রের জোরেই হোক কেউ কখনো এই রাষ্ট্রকে হিন্দু রাষ্ট্রে পরিণত করতে পারবে না। তেমন কাজ করতে গেলেই ভারতীয় জাতীয়তাবাদের মূলে কুঠারাঘাত করা হবে। আমরা আর ধর্মনিরপেক্ষ থাকব না। আমাদের জাতীয়তাবাদ ধর্ম-নিরপেক্ষতার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। কিন্তু ওই দ্বিতীয় অর্থে। এ দেশ বা রাষ্ট্র ধর্মবর্জিত নয়। তবে যারা ধর্ম মানে না তারাও নাগরিক হতে পারে ও নাগরিকের যাবতীয় অধিকার ভোগ করতে পারে। লোকে যদি তাদের গুণ দেখে তাদের ভোট দেয় ও গদীতে বসায় তবে মহাভারত অশুদ্ধ হবে না। আমাদের রাষ্ট্রই সর্বপ্রথম রাষ্ট্র যে রাষ্ট্র কমিউনিস্ট না হয়েও কমিউনিস্টদের ভোট দিয়ে গদীতে বসিয়েছে। অন্যান্য দেশে এর জন্যে কত রক্তপাত ঘটে গেছে। এদেশে তা ঘটেনি। তারাও লোকের ধর্মে আঘাত করেনি।

এটাই আমাদের সেকুলার স্টেটের বিশেষত্ব। কিন্তু ইদানীং অকালী শিখরা এটা ভুলে যাচ্ছে। তাদের মনোগত অভিপ্রায় শিখ রাষ্ট্র বা শিখ রাজ্য প্রতিষ্ঠা। যেখানে শিখদেরই অগ্রাধিকার বা বিশেষ অধিকার বা অসমান অধিকার। তাদের সব ক'টা দাবী যে অন্যায্য তা নয়, কিন্তু মূল দাবীটা অন্যায্য। বিরোধ মেটাতে গিয়ে যদি সংবিধান সংশোধন করি তো সেই নজীর পরে হিন্দু রাষ্ট্র-

বাদী দলবিশেষের ভোটবল জোগাবে। সৈন্যদলে যদি তাদের লোক থাকে তবে তাদের অস্ত্রবলেও বলীয়ান করবে। কাশ্মীরের মুসলমান ও বৌদ্ধ, সিকিমের বৌদ্ধ, অরুণাচলের অ্যানিমিস্ট ও বৌদ্ধ, নাগাল্যান্ড, মেঘালয় ও মিজোরামের খ্রীস্টান, কেরলের মুসলমান ও খ্রীস্টান, পশ্চিমবঙ্গের ও ত্রিপুরার কমিউনিস্ট সকলেই বিদ্রোহের ধ্বজা তুলবে। এ বড়ো সাংঘাতিক নজীর। হিন্দু রাষ্ট্রবাদীরা ওৎ পেতে বসে আছে।

বিপদ কেবল পাঞ্জাবের শিখদের দিক থেকে নয়। উত্তর-পূর্ব অঞ্চলের অসমীয়া, নাগা, মণিপুরী ও মিজোদের দিক থেকেও। সবাই যে বিচ্ছিন্ন হতে চায় তা নয়, সবাই তো উগ্রপন্থী নয়। কিন্তু সকলের মনে ভয় যে তারা নিজ বাসভূমে পরবাসী হতে পারে। 'ভারতীয়রা' তাদের ভূমিতে গিয়ে উপনিবেশ স্থাপন করবে। ক্রমে ক্রমে তাদের সংখ্যালঘুতে পরিণত করবে। তাদের যার যার আইডেনটিটি থাকবে না। এই যে ভয় এটা পার্টিশনের পূর্বেও ছিল, কিন্তু পরে দিন দিন বেড়েছে। কারণ পূর্ববঙ্গে টিকতে না পেরে হিন্দুরা ঢুকছে শরণার্থী হয়ে, সঙ্গে করে জমি নিয়ে আসছে না, অসমীয়া প্রভৃতির জমিতে ভাগ বসাচ্ছে। চাকরি-বাকরিতেও। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পরেও এর বিরাম নেই। যারা সরাসরি ঢুকছে না তারা পশ্চিমবঙ্গ ঘুরে ঢুকছে। খুব কম ক্ষেত্রেই তারা মূলধন নিয়ে আসছে ও সেই মূলধন খাটিয়ে নতুন বাসভূমির ধন বৃদ্ধি করছে। ওদিকে পাকিস্তানী বা বাংলাদেশী মুসলমান চাষীরাও আসছে নতুন জমিতে চাষ ও বাস করতে। একদা এরা স্বাগত ছিল। জলা জমি চর জমি পতিত জমি আবাদ করে মালিকের উপকার করত। কিন্তু ইদানীং এরাও মালিক হয়ে বসছে, এদের হাতে চলে যাচ্ছে হাসিল হওয়া জমি। কাজেই এরা আর স্বাগত নয়। আগে এদের রাজনৈতিক উচ্চাভিলাষ ছিল না। এখন এরাও ক্ষমতার রাজনীতিকে জড়িয়ে পড়েছে। তেমনি হিন্দু শরণার্থীরাও। সুতরাং এই দুই প্রকার বিদেশী আগন্তুকদের বহিষ্কার না করলে অসমীয়া প্রভৃতির রাতে ঘুম নেই। তার যদি দেরি থাকে তবে আপাতত ভোট দেবার অধিকার কেড়ে নিতে হবে, তা হলে অর্ধেকটা ঘুম হবে।

এর সমাধানের বহু চেষ্টা হয়েছে, কিন্তু একটা প্রবল অন্তরায় বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমানের সঙ্গে ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর চুক্তি। সেই চুক্তি অনুসারে ১৯৭১ সালের আগে যারা প্রবেশ করেছে তাদের বহিষ্কার করা চলবে না, তাদের ভোটদানের অধিকারও হরণ করা চলবে না। তারা ভারতের নাগরিক বলেই গণ্য হবে। বড়ো জোর এই পর্যন্ত হতে পারে যে তাদের আসাম প্রভৃতি রাজ্য থেকে সরিয়ে পশ্চিমবঙ্গ প্রভৃতি রাজ্যে পুনর্বাসন করা হবে যদি রাজ্য সরকারগণ সম্মত হন। তাঁরা অসম্মত হলে ভারত সরকারের প্রত্যক্ষ শাসনাধীন দিল্লী, গোয়া, আন্দামান প্রভৃতি টেরিটরিতে চালান দিতে হবে। বলা বাহুল্য যাদের সরানো হবে তারা গোরু ছাগল ভেড়া নয়, তাদের দিকেও আইন আছে, তারা লড়তেও জানে। আসাম আন্দোলনের নেতারা কিন্তু জেদ ধরে বসে আছেন যে ১৯৬১ সালই ভিত্তি

বর্ষ, ১৯৭১ সাল নয়। তাঁদের দিকেও যুক্তি আছে, দলিল আছে। তাঁরা আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছেন ও অবিরাম চালিয়ে যাবেনই। ইতিমধ্যে বহু লোকের প্রাণ গেছে, নারী ও শিশুরাও রেহাই পায়নি। বহু লোক নতুন করে শরণার্থী। রাজনৈতিক ক্ষমতা যাঁদের হাতে এসেছে আন্দোলকারীরা তাঁদের নির্বাচনকে স্বীকারই করতে চান না। অথচ তাঁদের সরকারকে স্বীকার না করলে ভারত সরকারও আর আলাপ আলোচনা করবেন না। মোট কথা অসমীয়াদের গ্যারাণ্টি দিতে হবে যে কখনো তারা মাইনরিটিতে পরিণত হবে না।

আমার এই প্রবন্ধসংগ্রহে ভারতের বাইরের কয়েকটি দেশের প্রসঙ্গও আছে। আর আছে আরো কয়েকটি বিষয়েও লেখা। কোন্‌টি কোন্‌ সালে রচিত তা আমি টুকে রাখিনি, স্মৃতির আশ্রয় নিয়ে অন্যত্র উল্লেখ করছি। কিছু ভুলচুক থাকতে পারে। রচনাগুলির পৌর্বাপর্য'ও থাকেনি। স্থলে স্থলে পুনরাবৃত্তি ঘটেছে বলে আমি ক্ষমাপ্রার্থী। বাদ সাদ দিলে প্রবন্ধগুলির ধারাভঙ্গ হতো।

অন্নদাশঙ্কর রায়

স্বাধীনতা দিবসের প্রশ্ন

আর কয়েকদিন পরে আমাদের দেশের স্বাধীনতার পঁয়ত্রিশ বছর পূর্ণ হবে। দেশ বলতে আমি ভারত, বাংলাদেশ ও পাকিস্তান এই তিন দেশকেই বুঝি। যদিও জানি যে বাংলাদেশের স্বাধীনতা পাকিস্তানের ভিতর দিয়ে এসেছে।

আপাতত আমার ভাবনা চিন্তা ভারতকেই নিয়ে। ভারত যদি তার স্বাধীনতা হারায় বাংলাদেশ ও পাকিস্তান তাদের স্বাধীনতা রক্ষা করতে পারবে না, তারাও পরাধীন হবে। ভারত যদি তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে বাংলাদেশ ও পাকিস্তানও জড়িয়ে পড়বে। ভারত থেকে যদি গণতন্ত্র বিদায় নেয় তবে বাংলাদেশ ও পাকিস্তানও গণতন্ত্র ফিরে পাবে না। সুতরাং ভারত যদিও একান্নবর্তী পরিবারের কর্তা নয় তবু যে দু' ভাই পৃথক হয়ে গেছে তারাও ভারতের অনুবর্তী। আজ না হোক কাল।

এখন এই পঁয়ত্রিশ বছরের অভিজ্ঞতার ফলে আমার মনে নানা প্রশ্ন জেগেছে। প্রথম প্রশ্ন, ভারত কি চিরদিন তার স্বাধীনতা রক্ষা করতে পারবে? আনুষ্ঠানিকভাবে স্বাধীন, কিন্তু পরোক্ষভাবে পরাধীন তেমন দেশ কি অন্যত্র দেখা যায় না। সামরিক তথা অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে স্বয়ংভর না হলে রাজনৈতিক স্বাধীনতাও বিড়ম্বনা হতে পারে।

দ্বিতীয় প্রশ্ন, বিভিন্ন রাজ্যে যদি বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তি প্রবল হয় তবে কেবলমাত্র সামরিক শক্তি দিয়ে জাতীয় ঐক্য বজায় রাখতে পারা যাবে কি? আসাম, মণিপুর ও মিজোরাম দিল্লী থেকে অনেক দূরে। যাতায়াতের পথ অতি সংকীর্ণ। ট্রাইবালদের সঙ্গে না রক্তগত মিল, না ধর্মগত মিল, না ভাষাগত মিল, না ঐতিহ্যগত মিল। ব্রিটিশ শাসনে কিছুকাল একসঙ্গে থাকার স্মৃতি তো দিন দিন মিলিয়ে যাচ্ছে। অরুণাচলের বেলা সে কথাও খাটে না। ইংরেজরা সে প্রদেশ শাসন করেনি। সেটা একটা প্রদেশই ছিল না। মানচিত্রে দেখানো হতো তিব্বতের অঙ্গরূপে। স্বাধীনতার বছর বারো আগে মানচিত্রে দেখানো শুরু হয়। সেটা কিন্তু চীন ও তিব্বতের দ্বারা অস্বীকৃত। এখনো বিতর্কিত ও আলোচনার বিষয়।

তৃতীয় প্রশ্ন, পার্লামেনটারি গণতন্ত্র কি চিরস্থায়ী হবে? না তার জায়গা নেবে আমেরিকার মতো বা ফ্রান্সের মতো প্রেসিডেনশিয়াল গণতন্ত্র? সেটাও যদি ধাতে না সয় তবে একপ্রকার ডিকটেটরশিপ? সামরিক বা সমাজতান্ত্রিক বা ফাসিস্ট। না বিকেন্দ্রীকরণের পন্থা অবলম্বন করতে হবে। যার নাম পঞ্চায়তী গণতন্ত্র। যার প্রবক্তা মহাত্মা গান্ধী। পার্লামেনটারি গণতন্ত্রে একটা বিরোধী পক্ষ থাকে, পরে সেই বিরোধী পক্ষই হয় সরকার পক্ষ। আমেরিকার প্রেসিডেনশিয়াল গণতন্ত্রেও তাই। এদেশে তেমন একটা বিরোধীপক্ষ কোথায় যে পরে সরকার চালাতে পারে? জনতা পার্টির মতো চৌচির হওয়া বিচিত্র নয়।

চতুর্থ প্রশ্ন, গণতন্ত্র কোনো মতে বজায় থাকলেও আইনের শাসন কি থাকবে? আমরা যারা ব্রিটিশ আমলে আইনের শাসন দেখেছি ও তাতে অংশ নিয়েছি তারা

মুখ বুজে আছি। যদি বলি, এটা আইনের শাসন থেকে বহুদূর সরে এসেছে তাহলে শুনতে হবে আপনারা দেশদ্রোহী বুর্জোয়া শ্রেণীর মানুষ। কিন্তু আইনের শাসন যদি দুর্বল হয় তবে এ রাষ্ট্র সমাজতন্ত্রের দায়িত্বও পালন করতে পারবে না। গণতন্ত্রও হবে ফাঁপা বেলুন। যে-কোনোদিন ফেটে চুপসে যাবে।

পঞ্চম প্রশ্ন, অসভ্যতা ও অপসংস্কৃতি যদি দিন দিন প্রবল হয়, সভ্যতা ও সংস্কৃতি যদি দিন দিন দুর্বল হয়, তবে আমরা কী নিয়ে জগৎ সভায় দাঁড়াব? কিসের গর্ব করব? স্বাধীনতাই কি একমাত্র পুরুষার্থ? বিদেশের লোক কি আমাদের অস্ত্রসম্ভার ও যন্ত্রকৌশল দেখে শ্রদ্ধা করবে? ভারতের আধ্যাত্মিকতা, ভারতের নৈতিকতা, ভারতের শ্রেয়োবোধ, ভারতের রুচিবোধ এসব কি অতীতের ব্যাপার হবে? দালান তো উঠছে বিস্তর। সৌন্দর্যবোধ কোথায়? এই নয়া ধনিক শ্রেণীর ঐশ্বর্য এখন আকাশছোঁয়া। কিন্তু কোথাও শোনা যায় না যে রকেফেলার ফাউণ্ডেশন বা ফোর্ড ফাউণ্ডেশনের মতো জনহিতকর কোনো প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়েছে। একটি কি দুটি বাদে সব ক'টি বিশ্ববিদ্যালয়ই সরকার মুখাপেক্ষী। আমেরিকায় ঠিক বিপরীত। ললিতকলা ও জ্ঞানবিজ্ঞানের জন্যে সে দেশের ধনিকরা মুক্ত হস্তে অর্থব্যয় করেন। যতদিন দেশীয় রাজারা ছিলেন তাঁরাও এদেশে তাই করতেন। এখন দেশীয় রাজারা নেই, পৃষ্ঠপোষকতার অভাবে নৃত্যগীতবিশারদরা সস্তার পথ ধরেছেন। রাষ্ট্রের পৃষ্ঠপোষকতার উপর নির্ভর করা মানে রাষ্ট্রের রুচি মেনে নেওয়া। অর্থাৎ রাজনীতিকদের ও আমলাদের।

ষষ্ঠ প্রশ্ন, দেশের লোক কি স্থির করে ফেলেছে যে তারা গ্রাম ছেড়ে শহরে এসে ভিড় করবে? তা যদি না পারে তবে গ্রামকেই শহর বানাবে? নগরগুলোও তো আজকাল বিদেশী ছাঁচের। এক্ষেত্রে ধনতন্ত্রে সমাজতন্ত্রে ভেদ নেই। ভারত যদি সমাজতন্ত্রী হয় তা হলেও নগরপ্রধান হবে। নগরপ্রভাবিত হবে। আর বিদেশী ছাঁচে ঢালাই হবে। এখনই এই জলতরঙ্গ রোধ না করলে পরে আর পারা যাবে না। দিন দিন দেরি হয়ে যাচ্ছে। মনঃস্থির যদি করতে হয় তো আজ এখনি।

সপ্তম প্রশ্ন, দেশের লোক কি স্থির করে ফেলেছে যে মাটি খুঁড়ে যেখানে যা খনিজ আছে সব উদ্ধার করতে হবে, যেখানে যত গাছপালা আছে সব কেটে নিঃশেষ করতে হবে, যেখানে যত নদী আছে তাদের উপর পুল তৈরি করতে হবে, বাঁধ দিতে হবে? প্রকৃতির সঙ্গে শত্রুতা করলে প্রকৃতিও প্রতিশোধ নেবে। অনাবৃষ্টি ও অতিবৃষ্টি আগেকার দিনেও ছিল। রাজশাহী জেলায় যখন রাজকার্যে নিযুক্ত ছিলুম তখন বিরাট বিরাট দীঘি আমি দেখেছি। সেসব দীঘির এক পাড় থেকে আরেক পাড় দেখা যায় না। সেসব দীঘি ব্রিটিশ আমলের নয়, মোগল আমলের নয়, সুলতানী আমলের নয়, পাল সেন আমলের। সেকালের রাজারা অতিবৃষ্টির দিনে সেই সব দীঘিতে জল জমিয়ে রাখতেন। অনাবৃষ্টির দিনে সেখান থেকে জল সরবরাহ করতেন। সংরক্ষণের অভাবে সেসব দীঘি ক্রমশ অব্যবহার্য হয়ে গেছে। সেখানে এখন চাষ আবাদ হয়। সেগুলির সংস্কার করলে অতিবৃষ্টি

ও অনাবৃষ্টি এই দুই সমস্যার সহজ সমাধান হতো। সেরকম দীঘি আরো খুঁড়তে পারা যেত। এ বিষয়েও মনঃস্থির করা জরুরি। পরে আর দীঘি খোঁড়ার জন্যে জমি পাওয়া যাবে না। যদি পাওয়া যায় তার দাম হবে আগুন। খননকারদের মজুরিও হবে দ্বিগুণ, তিন গুণ। যেখানে লবণ হ্রদ ছিল সেখানে এখন কলকাতার শহরতলি। পাল সেন যুগের দীঘিগুলোও এক এক করে উপনগর হতে পারে। মনে হবে দারুণ প্রগতি। কিন্তু অনাবৃষ্টিতে ও অতিবৃষ্টিতে মিলে যা ঘটাবে তা দারুণ দুর্গতি। স্বাধীনতার পর থেকে যেসব চটকদার পলিসি আমাদের নেতারা অনুসরণ করে এসেছেন তার স্বল্পমেয়াদী ফল আপাতমধুর। কিন্তু দীর্ঘমেয়াদী ফল বিষম তিক্ত। ফলভোগ যারা করবে সে বেচারিরা এখনো ভূমিষ্ঠ হয়নি। তাদের হয়ে অগ্রিম চিন্তা করছে কে? যদি-বা কেউ করছে তার কথা শুনছে কে?

স্বাধীনতা দিবসের স্মৃতি

রাত বারোটায় তন্দ্রা ছুটে যায়। খেয়াল ছিল না যে সেটা স্বাধীনতার লগ্ন। কানে আসে মুহুর্মুহু চিৎকার। ধরে নিই যে অন্যান্য রাত্রের মতো সেটাও হিন্দু মুসলমান দাঙ্গাবাজদের উপর গুলী চালনার সময় আর্তনাদ। এবার কিন্তু গুলির আওয়াজ ছিল না। ওটা আর্তনাদও নয়, জয়ধ্বনি। তখন হুঁশ হয় যে আমার দেশবাসী এখন স্বাধীন। আমিও এখন স্বাধীন। এই দিনটি যে এ জীবনে দেখতে পাব তা সত্যি সত্যি বিশ্বাস হয়নি। তৃতীয়পক্ষ চলে যেতে চাইলেও হিন্দু মুসলমান কি তাদের চলে যেতে দেবে? এরা যদি প্রকৃতিস্থ হতো ওরা কবে চলে যেত।

তাহলে দুই শতাব্দীর রাজত্ব সত্যি সত্যি ছায়ার মতো সরে গেছে। আমার জীবন ধন্য যে আমি আজ বেঁচে আছি। কবি ওয়ার্ডসওয়ার্থের ভাষায়—

> "Bliss it was in that dawn to be alive
> And to be young was very Heaven."

ভোর হতে না হতে হাওড়া থেকে একদল মান্যগণ্য ভদ্রলোক এসে আমাকে ধরে নিয়ে যান হাওড়া ময়দানে। সেখানে স্বাধীন ভারতের ত্রিবর্ণ পতাকা উত্তোলন করি। তারপর হাওড়া জজকোর্টের আমলারা আমাকে টেনে নিয়ে যান তাঁদের আদালতভবনে। যদিও অবিভক্ত বঙ্গের সঙ্গে সঙ্গে আমার হাওড়ার জজগিরি ফুরিয়ে গেছে। তখন আমি পশ্চিমবঙ্গের শ্রমিক ক্ষতিপূরণের কমিশনার। কলকাতায় নিযুক্ত। চার্জ নিইনি।

এসব অনুষ্ঠানের পর কলকাতা যাই নতুন বাসা দেখে আসতে। পথে যেতে যেতে লক্ষ করি লাটভবনের শীর্ষে উড়ছে নতুন গভর্নর রাজাজীর নিজস্ব পতাকা। চমক লাগে। তাহলে কি সত্যি সত্যি ইউনিয়ন জ্যাক নামিয়ে দিয়ে গেছে ইংরেজ? প্রাণ ধরে পারল ও কাজ করতে? ইংরেজ ছাড়া আর কোন্

জাতি পেরেছে ? ওদের বিদায় কেমন গ্রেসফুল ! মনে মনে ওদের ধন্যবাদ দিই। দেখি ময়দানে ইংরেজ মহিলা নির্ভয়ে গল্‌ফ খেলছেন। তাঁর মতো নির্ভয় আমরা কেউ নই। কারণ কাল পর্যন্ত দাঙ্গার ভয় ছিল। আজকের দিন হিন্দুরা মুসলমানদের উপর চূড়ান্ত প্রতিশোধ নেবে এ রকম একটা গুজব আমি সাত আটদিন আগে হাওড়ায় পৌঁছবার সময় থেকেই শুনে আসছিলুম। গান্ধীজী সেটার বিরুদ্ধে প্রাণপণ প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিলেন। আজ তাঁর অনশন। হিন্দু মুসলমান শান্ত না হলে তিনি প্রাণত্যাগ করবেন।

ময়মনসিংহ থেকে প্রস্থান করার পূর্বেও আমি শুনে এসেছিলুম যে স্বাধীনতা দিবসে কলকাতায় যদি নতুন করে দাঙ্গা বাধে তবে পূর্ববঙ্গের সর্বত্র তার প্রতিশোধ নেওয়া হবে। তখন সেটা নোয়াখালীতে সীমাবদ্ধ থাকবে না। সুতরাং কলকাতায় দাঙ্গা বাধতে না দেওয়াই ছিল বিজ্ঞতা। তার জন্যে গান্ধীজী সুহরাবর্দী সাহেবের তথা ভাবী প্রধানমন্ত্রী ডক্‌টর প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষের সাহায্য নিয়েছিলেন। তখনকার দিনে মুখ্যমন্ত্রী কথাটি চালু হয়নি। হয় পরবর্তীকালে। স্বাধীনতা দিবস যে শান্তিতে কাটবে দিনের শেষ না দেখে বলবার জো ছিল না। দিনটি সম্প্রীতিপূর্ণ। সন্ধ্যাবেলা আমাকে ডেকে নিয়ে যাওয়া হলো হরিতকী ব্যগানে শ্রীঅতুল্য ঘোষের আস্তানায়। সেখানে জমায়েৎ ছিলেন বহু কংগ্রেস কর্মী ও সমর্থক। উচ্চাসন থেকে ভাষণ দিতে হলো আমাকে। উঠোনে বসলেন আর সবাই। তাঁদের মধ্যে পাঁচজন মন্ত্রীও। ত্যাগী সংগ্রামী। তাঁদের তুলনায় আমি কে ? দেশের জন্যে কীই বা করেছি। সত্যাগ্রহীদের জেলেও পুরেছি। আবার তাঁদের সঙ্গে মেলামেশাও করেছি। গান্ধীজীর সঙ্গে ডক্‌টর ঘোষের গ্রামে গিয়ে সাক্ষাৎও করেছি।

মহাত্মাজী অনশন করেছেন। এটা তাঁর কাছে আনন্দের দিন নয়। আমার কাছেই বা হবে কী করে ? আমি অখণ্ড ভারতের অফিসার থেকে নেমে এসেছি খণ্ডিত ভারতের অফিসার পর্যায়ে। অবিভক্ত বাংলার অফিসার থেকে পশ্চিম বাংলার অফিসার পর্যায়ে। এটা কি অবনমন নয় ? এর গ্লানি কি আমি অন্তরে অন্তরে অনুভব করিনে ? বাংলা ভাষার সাহিত্যিক আমি, আমার পাঠকমণ্ডলী কি কেবল পশ্চিমবঙ্গের হিন্দু ? এটাও কি অবনমন নয় ? মহাত্মার বেদনা তিনি আর সসাগরা ভারতের অধিনায়ক বা প্রতিভূ নন। তাঁরও অবনমন ঘটেছে। উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ এখন তাঁর কাছে বিদেশ। এই সেদিন যেখানে ছিল তাঁর শিষ্যদের মন্ত্রিত্ব। পূর্ববঙ্গ এখন তাঁর নাগালের বাইরে। নোয়াখালীতে তিনি তাঁর কাজ বাকী রেখে এসেছেন। তিনি রাষ্ট্রপতি বা প্রধানমন্ত্রী হতে চাননি। চেয়েছিলেন প্রধান সেবক হতে। আজ গোটা পাকিস্তান তাঁর কাছে পরদেশ। তাঁর গতিবিধি নিয়ন্ত্রিত। এবার ইংরেজ রাজের দ্বারা নয়। লীগ রাজের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ করা চলে না। অহিংস সংগ্রাম বাইরে বসে চালানো যায় না। একটিমাত্র পন্থা তাঁর কাছে উন্মুক্ত। তিনি খণ্ডিত ভারতের সংখ্যালঘু মুসলমানদের অভয় দিয়ে এপারে সসম্মানে রাখবেন। তার সুফল ফলবে ওপারে। ওরাও সংখ্যালঘু হিন্দুদের অভয় দিয়ে সসম্মানে রক্ষা করবে। বা

যদি ওরা না করে তবু তিনি প্রতিশোধের কথা ভাববেন না। প্রতিশোধ যারা নিতে চাইবে তাদের অনশন দিয়ে নিবৃত্ত করবেন। চাই কি প্রাণ বিসর্জন দেবেন। তাঁর নিজের প্রাণের মূল্য কী যেখানে লক্ষ লক্ষ মানুষের প্রাণ বিপন্ন!

সমুদ্রমন্থনের দিন অমৃতের সঙ্গে সঙ্গে গরলও উঠেছিল। তাকে কণ্ঠে ধারণ করে শিব হন নীলকণ্ঠ। এবার গান্ধীজীর কাজ সেই গরলকে কণ্ঠে ধারণ করে নীলকণ্ঠ হওয়া। সেইভাবে তিনি তাঁর দেশবাসীকে মহতী বিনষ্টি থেকে উদ্ধার করবেন। তাঁর এই কর্তব্য তাঁর একার নয়। তাঁর অনুগামীদের প্রত্যেকের কর্তব্য। আমি যদি অনুগামী হয়ে থাকি তবে আমারও। কেবলমাত্র চাকরি বজায় রাখা আমার পক্ষে গ্লানিকর। আমি চাকরি ছেড়ে দেবার জন্যে অনেকদিন থেকে তৈরী হচ্ছি। যে-কোনো দিন ছেড়ে দিতে পারি। গান্ধীজীও সেটা জানতেন। দেশের স্বাধীনতা সম্পন্ন হয়েছে। আমার স্বাধীনতা বাকী।

ইংরেজ অফিসারদের দশ বছর ধরে আটকে রাখা হয়েছিল, তিনবছর অন্তর ছুটি দেওয়া হয়নি। তাঁরা সবাই মিলে গণছুটি নিলে ব্রিটিশ রাজত্ব সামলাবে কারা? তারপর ব্যাপক দাঙ্গাহাঙ্গামার সময় তারা কাকে ছেড়ে কার উপর গুলী চালাবে? হিন্দুকে মারলে আবার সন্ত্রাসবাদীদের হাতে মরতে হবে। মুসলমানকে মারলে বাবুর্চি খানসামা চাপরাসী আর্দালি সবাই বয়কট করবে। সাহেবরা হাতে মরবে না, ভাতে মরবে। এরকম উভয় সংকট তো মিউটিনির পর হয়নি। এর উপর যদি মিউটিনি ফের বাধে তবেই হয়েছে। "হিন্দু মুসলমান যদি লড়তে চায়, লড়ুক। আমরা কেন রিং ধরে থাকব?" বলেন বাংলার লাট বারোজ ১৯৪৭ সালের জানুয়ারি মাসে ময়মনসিংহের সারকিট হাউসের ডিনার পার্টিতে জজকে আর তাঁর গৃহিণীকে। "আমরা যাচ্ছি" বলে তিনি আমাদের নোটিশ দেন। এর পর ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী অ্যাটলীর নোটিশ। মহাপ্রস্থান পর্ব জুন ১৯৪৮ বা আরো আগে। আমরা তো আনন্দে অধীর। সিন্ধুবাদ নাবিকের ঘাড় থেকে নামবে দু'শো বছর বয়সের বুড়ো। সেদিন আমরা ঘুঘু দেখিছি, ফাঁদ দেখিনি। সেই ফাঁদটা হচ্ছে পার্টিশন। আট মাস যেতে না যেতে কাঁদবার পালা। সে পালা এখনো শেষ হয়নি। যদিও কেটে গেছে চৌত্রিশ বছর। পাকিস্তানের পরমাণু বোমার পদধ্বনি শোনা যাচ্ছে। তার উত্তরও নাকি পরমাণু বোমা। সেটা ভারতের বা তার কশ্চিৎ বান্ধবের। গান্ধীজীর অপ্রতিশোধ নীতি এখন অগাধ সলিলে।

এখন তো আমি আর সরকারী চাকুরে নই। লেখা নিয়ে থাকি। লোকে বলে বুদ্ধিজীবী। জবাবদিহি চায়, আপনারা বুদ্ধিজীবীরা কী করেছেন? দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছেন? অতি প্রাচীনকালে জনক রাজাকেও প্রশ্ন করা হয়েছিল, "মিথিলার রাজধানী জ্বলছে। আপনি করছেন কী?" রাজর্ষি জনক একটি চমৎকার উক্তি করেছিলেন। সেটির উদ্ধৃতি দিয়েছিলেন মহাত্মা গান্ধী। নোয়াখালী প্রসঙ্গে। উক্তিটি আমি বেবাক ভুলে গেছি। যদি কারো মনে থাকে আমাকে স্মরণ করিয়ে দিলে কৃতজ্ঞ হব। মর্মটা এই যে, নিবারণের জন্যে তো আমি যথাসাধ্য করেছি.। নির্বাপণের জন্যেও যথাসাধ্য করছি। আজকের দিনের

বুদ্ধিজীবীরা এ ছাড়া আর কী বলতে পারেন ?

কলকাতায় মহাত্মার সঙ্গে সাক্ষাৎ করার কথা ছিল। সেটা সম্ভব হয়নি। তার আগে শান্তিনিকেতনে শেষ সাক্ষাৎ। সেদিন আমি তাঁর প্রার্থনা সভার ভাষণ শুনি। শ্রোতাদের তিনি উপদেশ দেন অস্পৃশ্যতা দূর করতে। জীবনের শেষদিনটির আগের দিনটি পর্যন্ত তিনি এই উপদেশ দিয়ে গেছেন। বেঁচে থাকলে শেষদিনটিতেও দিতেন। তার অনেক আগে তাঁর এক শিষ্যের মুখে শুনেছিলুম, তিনি বলেছিলেন, "দেশের লোকের কাছে আমার তিনটিমাত্র বক্তব্য আছে। খাদি, হিন্দু মুসলিম ঐক্য, হিন্দুসমাজ থেকে অস্পৃশ্যতা লোপ। অস্পৃশ্যতা দূর না হলে পঁচিশ বছরের মধ্যেই হিন্দুসমাজ টুকরো টুকরো হয়ে যাবে।" কী সাংঘাতিক ভবিষ্যদ্বাণী ! এতদিন পরে ফলতে শুরু করেছে। প্রথমে গান্ধীজীর নিজের গুজরাটেই। তার পরে রাজাজীর নিজের তামিলনাড়ুতেও। দেশভাগ, প্রদেশভাগের পর বাকী ছিল সমাজভাগ। সেবার তৃতীয়পক্ষের হাত ছিল। এবারেও তৃতীয়পক্ষের হাত আছে বলে আত্মসন্তোষ লাভ করা হচ্ছে। যেন বর্ণহিন্দুরা সবাই ধৌত তুলসীপত্র। এসব উটপাখীদের সঙ্গে তর্ক করা বুদ্ধিজীবীদের কর্ম নয়। গান্ধীবাদীদেরই এগিয়ে আসতে হবে, ব্রত নিতে হবে, 'করেঙ্গে ইয়া মরেঙ্গে'।

স্বাধীনতার সংগ্রাম কোনোদিনই সমাপ্ত হয় না। কোনো দেশেই হয় না। তাই সৈন্যসামন্ত পোষণ করতে হয়, তাদের প্রতিদিন কুচকাওয়াজ করাতে হয়, অস্ত্রশিক্ষা দিতে হয়। কিন্তু এমনও তো হতে পারে যে দেশের আশাভরসার স্থল সৈন্যদল যুদ্ধে হেরে গেল। তা হলে কি দেশের লোক একপাল মেষের মতো আত্মসমর্পণ করবে ? এর উত্তরে গান্ধীবাদীরা বলবেন, না। আরো একপ্রকার সংগ্রামপদ্ধতি আছে। তারও একটা দৈনন্দিন প্রস্তুতি আছে। অহিংস অস্ত্রশিক্ষা আছে। সৈন্যদল হেরে গেলেও জনগণ হার মানবে না। তারা সত্যাগ্রহ চালিয়ে যাবে। মরবে, তবু আত্মসমর্পণ করবে না। কখনো গণ সত্যাগ্রহ, কখনো ব্যক্তি সত্যাগ্রহ, কখনো শুধুমাত্র অসহযোগ, কিন্তু সব সময় একপ্রকার গঠনকর্ম। সেই গঠনকর্মই প্রাত্যহিক কুচকাওয়াজ বা প্রস্তুতি। গান্ধীজী তাঁর জীবনের শেষদিনটিতেও প্রতিদিনের মতো চরকা কেটেছেন। বেঁচে থাকলে নোয়াখালী ফিরে যেতেন, তার জন্যে জীবনের শেষদিনটিতেও বাংলা লিখতে শিখেছেন। দৈনন্দিন নিষ্কাম কর্মই কর্মযোগ। সেটা একপ্রকার ত্যাগস্বীকারও বটে। ভারতের সত্যাগ্রহীরাই তার সেকেন্ড লাইন অভ ডিফেন্স। দ্বিতীয় দেশরক্ষাবাহিনী। এঁরা যদি আপৎকালে ছত্রভঙ্গ বা অদৃশ্য হন তবে জনগণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে যা পারে তা করবে, কিংবা ভুল নেতৃত্বের দ্বারা পরিচালিত হয়ে অন্ধের দ্বারা নীয়মান অন্ধ হবে। প্রথম স্বাধীনতা দিবসে গান্ধীজী ছিলেন, আজকের স্বাধীনতা দিবসে মহাসত্যাগ্রহীর অভাব।

স্বাধীনতা দিবসের ভাবনা

এবারকার স্বাধীনতা দিবসে আমাদের মনে স্বতঃস্ফূর্ত আনন্দ নেই। আনন্দ করতে হয়, তাই করব। সেটা একটা প্রথায় দাঁড়িয়ে গেছে।

কিন্তু কেন এমন হলো? অনেকেই আমাকে প্রশ্ন করেন। কতটুকুই বা আমি জানি? তবু উত্তর দিতে চেষ্টা করি। পূর্ণ নয়, আংশিক উত্তর।

দুশো বছরের দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত একটা সাম্রাজ্যকে উচ্ছেদ করার ক্ষমতা কোনো একটি সম্প্রদায়ের ছিল না। না হিন্দুর, না মুসলমানের, না শিখের। তেমনি কোনো একটি প্রদেশের ছিল না। না বাংলার, না পাঞ্জাবের, না আসামের। তেমনি কোনো একটি পার্টির ছিল না। না কংগ্রেসের, না মুসলিম লীগের, না কমিউনিস্ট পার্টির। প্রত্যেকেরই কিছু না কিছু কৃতিত্ব ছিল। কারো বেশী, কারো কম। ইংরেজদের নিজেদের কৃতিত্বও কিছু কম নয়। তারাও বুঝতে পেরেছিল যে যুদ্ধোত্তর জগতের ক্রমবর্ধমান সমস্যাগুলোর সঙ্গে মোকাবিলা করা বড়লাট ও তার মনোনীত পারিষদের কর্ম নয়। চাই নির্বাচিত মন্ত্রীদের প্রশস্তভিত্তিক সরকার, যে সরকার সাম্রাজ্যের আইনসম্মত উত্তরাধিকারী হয়ে ব্রিটেনের সঙ্গে যোগসূত্র রক্ষা করবে। আইনসম্মত বলতে বোঝায় ব্রিটিশ পার্লামেন্টের আইনসম্মত। সে পার্লামেন্ট আইন করে ভারতবর্ষের শাসনভার ভারতীয়দের হাতে হস্তান্তর করবে। তারা নিজেদের সংবিধান রচনা করে স্বয়ং-শাসিত হবে। রেপাবলিকও স্থাপন করতে পারে। কিন্তু ব্রিটেনের সঙ্গে যোগসূত্র রক্ষা করা বাঞ্ছনীয়। এটা হলো আইনের বাইরে ভদ্রলোকের চুক্তি।

এ রকম চুক্তি কংগ্রেস ও লীগ উভয় দলের নেতাদের সঙ্গে হয়েছিল। তাঁদের সঙ্গে ছিলেন শিখ নেতাও। ব্রিটেনের সঙ্গে সম্পর্ক নিয়ে সকলেই একমত ছিলেন। কিন্তু পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্ক নিয়ে দ্বিমত। কংগ্রেস চায় অখণ্ড ভারত। লীগ চায় দ্বিখণ্ড ভারত। শিখ নেতা না চাইলেও চরমপন্থী শিখরা চায় ত্রিখণ্ড ভারত। মুসলমানদের পাকিস্তান দিলে শিখদেরও খালিস্থান দিতে হবে। খালিস্থান কথাটি স্বাধীনতার পূর্বেই শোনা গেছে। অন্য নাম শিখিস্থান। শেষ পর্যন্ত সবাই মিলে স্থির করেন ভারত দ্বিখণ্ডই হবে, কিন্তু মুসলমানরা গোটা বাংলা ও গোটা পাঞ্জাব পাবে না। পশ্চিমবঙ্গ দিতে হবে হিন্দুদের আর পূর্ব পাঞ্জাব হিন্দু ও শিখদের একসঙ্গে। দুই উত্তরাধিকারী সরকার রেখে ইংরেজ সরকার বিদায় হয়। দুই ডোমিনিয়ম পরে দুই রেপাবলিক হয়। ভারতীয় ইউনিয়ন এখনও ব্রিটেনের সঙ্গে যোগসূত্র রক্ষা করে চলেছে। পাকিস্তান সেটা ছিন্ন করেছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও বিলেতে গেলে পাকিস্তানী নাগরিকরা ভারতীয় নাগরিকদের সঙ্গে একই শ্রেণীভুক্ত হয়। কিন্তু তাঁদের কর্তাব্যক্তিরা কমনওয়েলথ কনফারেন্সে আসন পান না বলে আবার যোগসূত্র ফিরিয়ে আনতে চান।

এতদিন পরে শিখদের চেতনা হয়েছে যে তাদেরও একটি স্বাধীন রাষ্ট্র পাওয়া উচিত ছিল। ওরা ভুলে গেছে যে তৎকালীন পাঞ্জাবে এমন একটিও জেলা ছিল না যেখানে তারা সংখ্যাগুরু। তাই খালিস্থান হয়নি। প্রদেশভাগের

পরে শিখরা প্রায় সবাই পূর্ব পাঞ্জাবে তথা ভারতের অন্যত্র চলে আসায় কয়েকটি জেলায় তারা সংখ্যাগরিষ্ঠ হয়েছে। সুতরাং এখন আবার খালিস্থানের স্বপ্ন দেখছে। সংখ্যাধিক্যের জোরে ওরা পাঞ্জাবী সুবা দাবী করে ও পায়। এখন সুবার থেকে আরেক ধাপ উপরে উঠে শিখ রাষ্ট্র চায়। এবার পাঞ্জাবী ভাষার ভিত্তিতে নয়, শিখ ধর্মের ভিত্তিতে। মুসলিম লীগের মুসলিম নেশনের মতো অকালী শিখদের শিখ নেশন। স্বতন্ত্র তথা সার্বভৌম। হিন্দুস্থান, পাকিস্তান ও খালিস্তান তিনটিই হবে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের উত্তরাধিকারী। হিন্দুস্থান যে ইণ্ডিয়ান ইউনিয়ন হয়েছে ও হিন্দু, মুসলমান, শিখ, খ্রীস্টান ইত্যাদির দেশভিত্তিক রাষ্ট হয়েছে, ধর্মভিত্তিক রাষ্ট্র নয়, এটা তারা স্বীকারই করে না। পরিস্থিতিটা যেন ১৯৪৭ সালের মতোই আছে। মাঝখানের ছত্রিশ বছরে যেন কোনো পরিবর্তনই হয়নি।

কিন্তু পরিবর্তন হয়েছে বইকি। ব্রিটিশ সবকারের মসনদে বসেছে ভারত সরকার, পাকিস্তান সরকার ও বাংলাদেশ সরকার। তিনটের মধ্যে একটা দেশভিত্তিক, একটা ধর্মভিত্তিক ও একটা ভাষাভিত্তিক। এরা হিন্দু, মুসলিম, শিখ নয়, ভারতীয়, পাকিস্তানী, বাঙালী। আজকের দিনে পৃথক একটি শিখ ধর্মভিত্তিক রাষ্ট্র পেতে হলে ব্রিটেনের কাছে দরবার করা চলে না, ব্রিটেনের হাতে ক্ষমতা নেই। তাই ভারতের কাছেই চাওয়া হচ্ছে, যেন ভারতই একমাত্র উত্তরাধিকারী। যেন পাকিস্তানও শিখদের হোমল্যাণ্ড নয়। যেন মহারাজা রণজিৎ সিংহের রাজধানী লাহোরে ছিল না। যেন অমৃতসরই ছিল শিখ রাজ্যের কেন্দ্রবিন্দু। যেন সন্তরাই ছিলেন শিখ সমাজের কুলপতি। যেন অকালীরাই সমুদায় শিখ সম্প্রদায়।

এই ছত্রিশ বছরে সব চেয়ে ভাগ্যবান যদি কেউ হয়ে থাকে সে শিখ সম্প্রদায়। তবু তাদের মনে দুঃখ হিন্দুদের আছে হিন্দুস্থান, মুসলমানদের আছে পাকিস্তান, শিখদের নেই শিখিস্থান বা খালিস্থান। রক্ত গরম হয়ে ওঠে যখন হিন্দুরা বলে, "শিখরাও হিন্দু"। এই ধারণাটা সম্পূর্ণ ভুল। শিখধর্মের প্রতিষ্ঠাতারা হিন্দু দেবদেবীদের, তাঁদের অবতারদের, তাঁদের মূর্তিগুলিকে, তাঁদের সম্পর্কিত শাস্ত্রগুলিকে বর্জন করে একটি আলাদা ধর্ম প্রচার করেছিলেন। সেটি হিন্দুও নয়, মুসলিমও নয়, উভয়ের সারাৎসার নিয়ে সৃষ্ঠ। শিখদের হিন্দু বললে মুসলিমও বলতে হয়। মুসলমানদের সঙ্গে তাদের মিলও কম নয়। কোরানের স্থান নিয়েছে গ্রন্থসাহেব, মসজিদের স্থান গুরুদ্বার। তাদের উপাসনা পদ্ধতি নিরাকারবাদীদের মতো, সাকারবাদীদের মতো নয়। তাদের বিবাহপদ্ধতিও হিন্দুদের মতো নয়। তবে হিন্দুদের সঙ্গে অজস্র মিল আছে। হিন্দু সমাজের সঙ্গে নাড়ীর বন্ধন ছিন্ন হয়নি। কিন্তু ওদের ক্ষ্যাপালে ওরা তাই করবে। পাঞ্জাবের হিন্দু ও আর্যসমাজীরা যদি বলত, "হিন্দু শিখ ভাই ভাই" তাহলে ওরা ক্ষেপত না। তা হলে স্বতন্ত্র সত্তা মেনে নেওয়া হতো। তার বদলে যা বলছে তাতে স্বাতন্ত্র্য থাকে না। শিখরাও পরিণত হয়ে যায় শৈব, শাক্ত ও বৈষ্ণবদের মতো হিন্দুদের একটি শাখায়। শিখদের মতে তা সত্য নয়। ইসলামের

মতো, খ্রীস্টধর্মের মতো শিখধর্মও আলাদা একটি ধর্ম। ওরা মুসলমানকেও শিখ করে ও মুসলিম মেয়েকে শিখ করার পর বিয়ে করে। এই করতে গিয়েই গোঁড়া মুসলিমদের সঙ্গে ঝগড়া ও ঝগড়া থেকে মারামারি হানাহানি, দীর্ঘস্থায়ী শত্রুতা। মুসলমানরা যদি ওটা মেনে নিত তা হলে হতো গলাগলি, কোলাকুলি, চিরস্থায়ী বন্ধুতা। কেউ কারো গোঁ ছাড়বে না। সুতরাং পাকিস্তানে বাস করা চলবে না। ভারতেই বাস করতে হবে ও সম্ভব হলে ভারতের কাছ থেকেই স্বতন্ত্র বাসভূমি আদায় করে নিতে হবে। চরমপন্থীদের মনের কথা, লড়কে লেঙ্গে খালিস্থান।

হিন্দু রাষ্ট্রবাদীদের সংখ্যা ও প্রভাব যতই বেড়ে যাচ্ছে দেশ ততই ভাঙনের অভিমুখে যাচ্ছে। পাঞ্জাবের শিখরা তো হিন্দু রাষ্ট্র থেকে বেরিয়ে যাবেই, নাগাল্যান্ড, মিজোরাম ও মেঘালয়ের খ্রীস্টানরাও যাবে, অরুণাচলের ও সিকিমের বৌদ্ধরাও যাবে, কাশ্মীরে মুসলমানরাও যাবে। এসব ঘটনা ঘটবে কোনো এক দুর্বল মুহূর্তে। তৃতীয় মহাযুদ্ধের ধাক্কায় বা বিপ্লবের ঘাত প্রতিঘাতে। হিন্দু রাষ্ট্রবাদীদের দাপটই আর সবাইকে তাড়াবে, যদি ইতিমধ্যে তাদের মতবাদকে দেশের লোক পরিহার না করে। ধর্মের স্থান মন্দিরে, মসজিদে, গির্জায়। আফিসে, আদালতে, বিশ্ববিদ্যালয়ে, থানায়, ব্যারাকে নয়। সৈন্যদলের মধ্যে এ মতবাদ প্রবেশ করলে সর্বনাশ। আমাদের সৈন্যদল ধর্মনিরপেক্ষ। পাকিস্তানের মতো ধর্মাত্মক নয়। যুদ্ধকালে যারা অসমসাহসিক কাজ করে রাষ্ট্রীয় সম্মান পেয়েছে তাদের মধ্যে প্রথম স্থান কখনো মুসলমানের, কখনো অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ানের, কখনো শিখের, কখনো পার্শীর। এরা ভারতসন্তান হিসাবে ভারতরাষ্ট্রের জন্যে লড়েছে, হিন্দুরাষ্ট্রের জন্যে নয়। এদের মনে বিভেদ ঢুকিয়ে দেওয়া দেশাত্মবোধের পরিচয় দেয় না, ধর্মাত্মবোধের পরিচয় দেয়। যদিও দেশাত্মবোধের ছদ্মবেশ ধারণ করে বালকদের ভোলায়। দেশের যুবশক্তি যেন এর দ্বারা বিভ্রান্ত না হয়। ধর্মনিরপেক্ষ দেশ ধর্মবর্জিত নয়। আমেরিকায় যুক্তরাষ্ট্র, সোভিয়েট ইউনিয়ন, গণ চীন, ফ্রান্স, পশ্চিম জার্মানী, পূর্ব জার্মানী এরা কেউ দুর্বল নয়। ব্রিটেনও কার্যত ধর্মনিরপেক্ষ।

ওদিকে অসমীয়ারাও বলতে আরম্ভ করেছে যে ওরাও একটি নেশন। তাই যদি হয় তবে ভারতীয় নেশনের সঙ্গে বেখাপ। এর লজিকসম্মত পরিণাম অবশিষ্ট ভারতের সঙ্গে বিচ্ছেদ ও বিচ্ছিন্ন একটি রাষ্ট্র। বাংলাদেশ যেমন অবশিষ্ট পাকিস্তানের থেকে ভাষার ইস্যুতে বিচ্ছিন্ন হয়েছে, আসামও তেমনি ভাষার ইস্যুতে ভারতের থেকে বিচ্ছিন্ন হবে। বাংলাদেশই তার নজীর। বাংলাদেশ আজ যা ভাবে অবশিষ্ট ভারত কাল তা ভাবে। এটা তো আধুনিক ঋষিবাক্য। এ কি মিথ্যা হতে পারে? ভাষার ইস্যুতে কেবল আসাম কেন, মহারাষ্ট্র, কর্ণাটক, তামিলনাড়ু, অন্ধ্রপ্রদেশও বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতে পারে। আন্ধ্ররা আজকাল আর প্রদেশ নিয়ে সন্তুষ্ট নয়। তাদের কাম্য তেলুগু দেশ। এক এক করে সবাই যদি বলে, "আমরা একটি নেশন, আমাদের চাই একটি হোমল্যান্ড", তা হলে ভারতীয় বলে যে নেশনটি আছে সেটি আর থাকবে না, ইণ্ডিয়ান

ইউনিয়ন বলে যে রাষ্ট্রটি আছে সেটিও বিশ পঁচিশ ভাগ হয়ে যাবে। মোগল সাম্রাজ্যেরও সেই দশা হয়েছিল। ইংরেজরা এসে ভাঙা টুকরোগুলিকে জুড়ে জুড়ে আবার এক সাম্রাজ্য গড়ে তোলে। নইলে তার চেহারা হতো আফ্রিকার মতো। বিভিন্ন রাষ্ট্রে বিভক্ত। প্রত্যেকটি বিদেশী শাসিত বা প্রভাবিত।

আবার কি সেইরকম ভবিষ্যৎ আমাদের জন্যে অপেক্ষা করছে? বলা যায় না। দক্ষিণের রাজ্যগুলি জোট বাঁধছে। আপাতত তাদের লক্ষ্য কেন্দ্রের ক্ষমতা খর্ব করে রাজ্যের ক্ষমতাবৃদ্ধি। সেটা এমন কিছু অন্যায় দাবী নয়। সংবিধানে কেন্দ্রকে যে পরিমাণ ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে কেন্দ্র তাব চেয়ে বেশী ভোগ করছে। সর্বত্র কংগ্রেস মন্ত্রীমণ্ডলী গঠিত হওয়ায় ও সকলে কেন্দ্রের বশংবদ হওয়ায় এইভাবে ভারসাম্য নষ্ট হয়েছে। এখন নানা রাজ্যে অ-কংগ্রেসী দল নির্বাচনে জিতে মন্ত্রীমণ্ডলী গঠন করায় কয়েকটি রাজ্য ক্ষমতার পুনর্বণ্টন চায়। তা হলে ব্যালান্স পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হবে। তবে অকালী দল খালিস্থানের পরিবর্তে যে পরিমাণ ক্ষমতা দাবী করছে সে পরিমাণ ক্ষমতা বর্তমান সংবিধান অনুসারে কোনো রাজ্যের প্রাপ্য নয়। তাতে ভারসাম্য নষ্ট হবে।

একটা গোঁজামিল বহুদিন থেকেই চলে আসছে। আমাদের ভারতরাষ্ট্র কি একটা ফেডারেশন না ফেডারেশন নয়? কখনো শুনি ফেডারেশন। কখনো শুনি তা নয়। কংগ্রেস যতদিন সর্বত্র মন্ত্রীমণ্ডলী গঠন করতে পারছিল তত-দিন এর একটা হেস্তনেস্তব দরকার ছিল না। এখন দেখা যাচ্ছে একটি বাদে দক্ষিণের সব ক'টি রাজ্য কংগ্রেসের হাতছাড়া। কেরলও যে-কোনোদিন তাদের সঙ্গে জুটতে পারে। এদিকে পশ্চিমবঙ্গ ও ত্রিপুরাও বার বার হস্তচ্যুত। গান্ধীজীর উপদেশ অনুসরণ করে বামপন্থীরা গ্রামে গ্রামে শক্ত ঘাঁটি নির্মাণ করেছে বা করছে। গ্রামের লোক যদি নিত্য ব্যবহার্য জিনিসগুলির জন্যে শহরের মুখাপেক্ষী না হয়, যদি তাদের তৈরি জিনিসগুলির জন্যে ন্যায্য দর পায়, যদি রাতারাতি ভূমিসংস্কার করতে গিয়ে শ্রেণীসংগ্রাম বাধিয়ে দেওয়া না হয় তবে পরবর্তী নির্বাচনে কী হবে তা আন্দাজ করা কঠিন নয়। বামপন্থীরা সংবিধানের বাইরে যাবার কথা বলছেন না। সংবিধান সংশোধন না করেও তাঁদের দাবী মেটানো যায়। কিন্তু তাব আগে খুলে বলতে হবে এটা কি ফেডারেশন না ফেডারেশন নয়।

স্বাধীনতার পূর্বে সকলেই ধরে নিয়েছিলেন যে স্বরাজের সঙ্গে সঙ্গে ফেডারেশন আসবে। কিন্তু রাজন্যদের পিছু হটার ফলে মুসলিম লীগও পিছু হটে। কংগ্রেসেরও পলিসি বদলায়। ফেডারেশন হয় না, হয় দুই শক্তিশালী কেন্দ্র। তবু তার বেসিক স্ট্রাকচার বা মূল কাঠামোটা থাকে। কারো সাধ্য নেই যে সংবিধান সংশোধন করে সব ক'টি রাজ্যের স্বায়ত্তশাসনের অধিকার কেড়ে নিয়ে কেন্দ্রের হাতে ন্যস্ত করে। মাঝে মাঝে এখানে ওখানে রাষ্ট্রপতির শাসন নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্যে চলতে পারে। সেটা ব্যতিক্রম। সেটাই নিয়ম নয়। কিন্তু গান্ধীজী যেটা চেয়েছিলেন সেটা না হয়ে কংগ্রেস হাইকমাণ্ড যেটা চেয়ে-ছিলেন সেটাই হয়েছে। ক্ষমতা নিচের দিক থেকে উপরের দিকে ওঠেনি। উপরের

দিক থেকেই নিচের দিকে নেমেছে। তাও কংগ্রেস হাইকমান্ডের মনোনীত মন্ত্রীদের হাতে। কে কে মুখ্যমন্ত্রী হবেন, কে কে সাধারণ মন্ত্রী হবেন এসব তাঁরাই স্থির করে দেবেন। কে কে নির্বাচনের টিকিট পাবেন, কাকে কাকে লোকে ভোট দেবে, সেটাও তাঁদের নির্বন্ধ। জনগণ যেন নাবালক। ছত্রিশ বছর পরে তারা সাবালক হয়েছে। সংবিধান সংশোধন না করেও তাদের সঙ্গে সাবালকের মতো ব্যবহার করা যায়। কেন্দ্রকে দুর্বল না করেও রাজ্যকে সবল করা যায়। কেন্দ্রকে সর্বশক্তিমান না করেও শক্তিশালী করা সম্ভব।

ছত্রিশ বছর খুব একটা বেশী সময় নয়। এই ছত্রিশ বছর আমরা মোটের উপর সুস্থিত অবস্থায় রয়েছি। গণতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা, জোটনিরপেক্ষতা এই তিনটি মূলনীতি সুদৃঢ় হয়েছে। যেটা নড়বড় করছে সেটা সমাজতন্ত্র। কী করে এটা মজবুত হবে সেটা ভাবনার বিষয়। আমাদের এই আপেল ফলের ঠেলাগাড়ীকে উলটে দিয়ে বিপ্লববাদীরা বিশেষ সুবিধা করতে পারবেন না। দেশটা সঙ্গে সঙ্গে চৌচির হয়ে যাবে। কংগ্রেস ভেঙে গেলেই যে বিরোধীপক্ষ তার শূন্যতা পূরণ করতে পারবে তাও নয়। বিরোধীপক্ষ বহুধা বিভক্ত। এমন দলও আছে যে ধর্মনিরপেক্ষ নয়। এমন দলও আছে যে জোটনিরপেক্ষ নয়। সত্যিকার একটা বিকল্প গড়ে তোলা দরকার। গড়ার কাজ না করে ভাঙার কাজ করলে ফেডারেশন তো হবেই না, ভগ্নপ্রায় দেশের সংহতি রক্ষার জন্যে কোনো এক মিলিটারি ডিকটেটরের আবির্ভাব হবে।

শিল্পবিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে ধনবণ্টন না হলে কতক লোক লক্ষপতি কোটিপতি হয়, অধিকাংশ লোক দীনদরিদ্র থেকে যায়। অপরপক্ষে ধনবণ্টন যদি উৎপাদনশীল না হয় তবে কিছুদিন পরে বণ্টন করবার মতো ধন থাকে না। বণ্টনের সঙ্গে সঙ্গে উৎপাদনের উপর জোর দেওয়া চাই। গ্রামে গ্রামে যদি ক্ষুদ্র শিল্প প্রতিষ্ঠিত হয় তবে সেভাবেও শিল্পবিস্তার হতে পারে। যেমন করেই হোক দেশের সব ক'টি সমর্থ ব্যক্তিকে উৎপাদনের কাজে নিযুক্ত রাখা দরকার। এটা শুধু আর্থিক কারণেই নয়, নৈতিক কারণেও বটে। বেকার বসে থেকে পরের অর্জিত অন্ন ধ্বংস করা ব্যক্তি বা সমাজ কারো পক্ষে হিতকর নয়। কেউ বেকার বসে আছে দেখলে তাকে কাজে লাগিয়ে দেওয়া উচিত। কিন্তু ইংলণ্ড, আমেরিকার মতো শিল্পসমৃদ্ধ দেশেও সেটা সম্ভব হচ্ছে না। হঠাৎ একটা বিপ্লব ঘটলেও যে সেটা সম্ভব হবে তা নয়। মূল কারণটা নিহিত রয়েছে মানুষকে দিয়ে কাজ না করিয়ে যন্ত্রকে দিয়ে কাজ করানোয়। আমার ছেলের এক বন্ধু বিলেতে সরকারী চাকরি করে। মাঝে মাঝে দেশে এসে বাপমায়ের সঙ্গে দেখা করে যায়। তার কাছে শুনি বিলেতে এখন কম্পিউটারের সাহায্যে কাজ করানোর ধুম পড়েছে। ফলে প্রত্যেক বছর কিছু না কিছু লোক ছাঁটাই হচ্ছে। সরকারী চাকরি থেকেও। তারা বেকার হবে, বেকার ভাতা পাবে। তাতে তাদের কুলিয়েও যাবে। কিন্তু বসে বসে রাষ্ট্রের অন্ন ধ্বংস করার গ্লানি যাবে কোথায়? জীবনের সার্থকতা কি যুবক বয়সেই নিষ্কর্মা হয়ে অনর্জিত অন্ন ভোগ করা! জাতির পতন তো অমনি করেই হয়।

প্রাণী জগতে কেউ অলস নয়। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত প্রত্যেকটি পশু-পাখী কর্মব্যস্ত থাকে। কোনো কোনো প্রাণী নিশাচর। তারাও রাতে কাজ করে। সমাজকেও প্রকৃতির সঙ্গে পা মিলিয়ে নিতে হবে। যে সমাজ সবাইকে কাজ দেয় সেই সমাজই প্রগতিশীল সমাজ। সমাজের মান উন্নত না হলেও সে উন্নতিশীল। চার দিকে দারিদ্র্য দেখে আমি ততটা বিচলিত নই, যতটা কর্মহীনতা ও কর্মবিমুখতা দেখে। দীর্ঘকাল ধরে ধর্মঘট যারা করে তারা কি বুঝতে পারে না যে তারা কাজের শক্তি হারিয়ে ফেলছে? যেটা হারিয়ে গেল সেটা আরো মূল্যবান। একজন সেতারবাদক যদি প্রতিদিন রেওয়াজ না করেন তাঁর বাজাবার হাত চলে যায়। এর কি কোনো ক্ষতিপূরণ আছে।

যে কারণেই হোক স্বাধীন ভারত সবাইকে সুখী করতে পারেনি, সন্তুষ্ট করতে পারেনি। নেতাদের দোষ আছে, ধনিকদেরও দোষ আছে। কিন্তু দোষের তালিকা করতে বসলে কাকেই বা বাদ দেওরা যায়? আজকের দিনে আমি গুণগুলোই ধরব, দোষগুলো নয়। সদ্য স্বাধীন হয়ে আর ক'টা দেশই বা ভারতের মতো অসংখ্য সমস্যার মোকাবিলা করেছে? তাও গণতান্ত্রিক উপায়ে। ভারতের ইতিহাসে আর কখনো পাঞ্জাবী, গুজরাটী, মরাঠা, দ্রাবিড়, উৎকলীয়, বাঙালী, পশ্চিমা একসঙ্গে গভর্নমেণ্ট চালাননি, তাও একজন মহিলার নেতৃত্বে। সিভিল সার্ভিস গুলোতেও মহিলারা স্থান পেয়েছেন। সৈন্যদলে অসামরিক জাতির পুরুষরাও প্রবেশ পেয়েছেন। ভারতীয় বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিবিদ্‌রা কারো চেয়ে খাটো নন। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ভারতের সম্মানিত আসন। আমরা যেন আমাদের ঘরোয়া সমস্যাগুলোকে বাড়িয়ে না দেখি। সব চেয়ে বড়ো কথা আমরা সামরিক জোটবন্দী হইনি, তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধে নিরপেক্ষ থাকব।

স্বাধীনতার মূল্য চিরজাগর

সর্বজনের অনুমোদিত একটি মূলতত্ত্ব হলো যে কোনো রাষ্ট্রের শাসন ব্যবস্থায় শাসনকার্য হবে তিনটি ভাগে বিভক্ত: এক, কার্যনির্বাহক বিভাগ, দুই, ন্যায়-বিচারক বিভাগ, তিন, বিধানপ্রণয়নকারী বিভাগ। ভারতে যুগ যুগ ধরে প্রথমটি আছে। দ্বিতীয়টিও যে ছিল না তা নয়, কিন্তু এখনকার মতো জেলা আদালত, তার উপরে হাইকোর্ট, তার উপরে সুপ্রীম কোর্ট ছিল না। এটা এদেশে বিবর্তন-সূত্রে আসেনি, এসেছে প্রবর্তনসূত্রে। ব্রিটিশ আমলেই এসব প্রবর্তিত হয়। তফাৎ শুধু এইটুকু যে ফেডারল কোর্ট পরিণত হয় সুপ্রীম কোর্টে। স্বাধীনতার পরে যেটা কোনো কালেই ছিল না সেটা হচ্ছে বিধান প্রণয়নকারী বিভাগ। ব্রিটিশ আমলেই এর গোড়াপত্তন হয়। জনসাধারণ ভোট দিয়ে তাদের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের প্রাদেশিক তথা কেন্দ্রীয় আইনসভায় পাঠায়। তাঁরাই সেখানে গিয়ে আইন পাশ করার অধিকারী হন। স্বাধীনতার পরে তাঁরাই ভারতের সংবিধান করেন ও তাঁদের রচিত সংবিধান অনুসারে তিনটি বিভাগই

নিয়ন্ত্রিত হয়। অনেক ভেবেচিন্তে তাঁরা যে ব্যবস্থা গ্রহণ করেন তার নাম পার্লামেনটারি গণতন্ত্র। অর্থাৎ পার্লামেন্টের কাছেই কার্যনির্বাহক বিভাগের জবাবদিহির দায়। কিন্তু ন্যায়বিচার বিভাগের জবাবদিহির দায় কার্য্যনির্বাহক বিভাগের বা বিধানপ্রণয়নকারী বিভাগের কাছে নয়। সে দায় ঈশ্বর মানলে ঈশ্বরের কাছে, বিবেক মানলে বিবেকের কাছে। জনমতের কাছে। ভাবীকালের কাছে। বিশ্ববাসীর কাছে। আমাদের সংবিধানে এমন কোনো কথা নেই যে পদাধিকারীদের সবাইকে ঈশ্বর মানতে হবে। এটা ধর্মনিরপেক্ষ সংবিধান। বিবেকের সঙ্গে বোঝাপড়ারও কোনো অনুশাসন নেই। তবে সর্বসাধারণ প্রত্যাশা করে যে ন্যায়বিচারের ভার যাঁর উপরে ন্যস্ত হয়েছে তিনি বিবেকের সঙ্গে বোঝা-পড়া করেই তাঁর কাজ করবেন।

ভারতের সুদীর্ঘ ইতিহাসে একচ্ছত্র রাজচক্রবর্তীরা ছিলেন ব্যতিক্রম। তাঁরা ভারতকে বেশীদিন ঐক্যবদ্ধ রাখতে পারেন নি। ভারত বরাবরই বহু রাজ্যে বিভক্ত। স্বাধীন হয়ে এবার আমরা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ যে রাজ্যের সংখ্যা যত বেশী হোক না কেন তাদের উপরে একটি ছত্র থাকবে, সেটি হবে কেন্দ্রীয় শাসন। প্রত্যেকটি রাজ্যের মতো তারও থাকবে তিনটি শাখা। সকলের মাথার উপরে থাকবেন একজন নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট বা রাষ্ট্রপতি। তিনি সম্রাট না হলেও সম্রাটস্থানীয়। ব্রিটেনের ব্যবস্থা অপেক্ষাকৃত সরল। সেখানে মাত্র একটি গভর্ন-মেন্ট, একটি জুডিসিয়ারি, একটি পার্লামেন্ট। আমাদের এদেশে উপরের দিকে একপ্রস্থ, নিচের দিকে এক এক রাজ্যে এক এক প্রস্থ। এদের মধ্যে সামঞ্জস্য আনা স্বৈরতান্ত্রিক আমলে সহজ, গণতান্ত্রিক আমলে কঠিন। সেইজন্যে সংবিধানে ক্ষমতা ভাগ করে দেওয়া হয়েছে। কেন্দ্রের ক্ষমতা সুদূরপ্রসারী হলেও রাজ্যের ক্ষমতাও বড়ো কম নয়। আরো বেশী ক্ষমতার কথা গান্ধীজী বলেছিলেন, কিন্তু কংগ্রেস নেতারা তাতে রাজী হননি। তাঁদের আশঙ্ক ছিল যে আরো বেশী ক্ষমতা পেলে রাজ্যগুলি এক এক করে বেরিয়ে যাবে, কেন্দ্র তখন কানা হয়ে যাবে। সে আশঙ্কা অমূলক নয়। ভাষাভিত্তিক রাজ্য গঠনের দাবী উত্তাল হয়ে তৎকালীন মাদ্রাজ বোম্বাই প্রভৃতি প্রদেশ তথা রাজ্যকে ভেঙে তিন চার টুকরো করে। পরে অবশ্য পুনর্বিন্যাস হয়। আরো পরে ভাষাভিত্তিক রাষ্ট্রগঠনও সম্ভবপর।

কেন্দ্র বনাম রাজ্য এই বিতর্ক এতদিন জোরালো হয়নি তার কারণ একটি-মাত্র পার্টিই সর্বত্র সংখ্যাগরিষ্ঠ হয়ে শাসনকার্য নির্বাহ করছিল, আইন প্রণয়ন করছিল, বিচারপতি নিয়োগ করছিল। ইতিমধ্যে খাস কেন্দ্রেই কংগ্রেসকে হটিয়ে জনতা পার্টি তার জায়গায় বসেছে। আর রাজ্যগুলিতেও কংগ্রেসের একাধিপত্য দূর করেছে কোথাও বামপন্থী জোট, কোথাও দক্ষিণপন্থী জোট, কোথাও হযবরল। কেউ জোর করে বলতে পারে না কেন্দ্রের সঙ্গে রাজ্যের সম্পর্ক কতদিন সুমধুর থাকবে। কেন্দ্রের সঙ্গে রাজ্যের ঝগড়া মেটাবার জন্যে কোনো মধ্যস্থ আমাদের সংবিধানে নেই। কেন্দ্র ইচ্ছা করলে বিদ্রোহী রাজ্যের উপর রাষ্ট্রপতির শাসন চাপিয়ে দিতে পারে, কিন্তু সেটা নির্দিষ্ট কালের জন্যে। তার পরে কী

উপায় ? অর্ধেক রাজ্য একজোট হয়ে আরো বেশী ক্ষমতা দাবী করলে সবাইকে তো আর দমন করা যাবে না। সংবিধান সংশোধন করতে হবে। আর নয়তো আমাদের প্রতিবেশী পাকিস্তানের অনুসরণ করতে হবে। সেখানে গণতন্ত্রই নেই, তাই ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণও নেই। গান্ধীজীর কাছে বিকেন্দ্রীকরণই ছিল আদর্শ। গান্ধীপন্থীরা সেই ভাষাতেই কথা বলেন। কিন্তু ছত্রভঙ্গের শঙ্কায় আমি তটস্থ। ভয়কে জয় করার গণতান্ত্রিক মন্ত্র আমার অজানা। আসামের দিকে চেয়ে দেখুন, তারপরে বিকেন্দ্রীকরণের নাম জপ করুন। তা বলে আমি অতিকেন্দ্রীকরণের দিকেও ঝুঁকব না। ক্ষুরধার পন্থা। একটু এদিক ওদিক হলে সর্বনাশ। গণতন্ত্রী হলেও ভারত আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র নয়। সেখানেও একবার চারবছর ধরে গৃহযুদ্ধ ঘটেছিল।

আমেরিকার অনুকরণে একদল প্রেসিডেনশিয়াল ডেমোক্রাসীর ফরমাস দিচ্ছেন। সেটা পার্লামেণ্টারি ডেমোক্রাসীর চেয়ে ঢের বেশী জটিল। সেদেশে দুটি পার্টিই পালা করে শাসন করে। এখানে দুটি পার্টির বদলে দশটি পার্টি প্রত্যেকটি নির্বাচন কেন্দ্রে প্রার্থী দেয়, তাদের মধ্যে একটিই জেতে, সেটি সাধারণত কংগ্রেস। জনমত যেদিন দুটি পার্টিকে রেখে আর সব ক'টিকে খারিজ করবে সেদিন দেখবেন সেই দুটি পার্টি পালা করে ভোটে জিতবে ও পার্লামেণ্টারি ডেমোক্রাসীকেই জিতিয়ে দেবে। আমাদের স্বভাবটাই হলো বাবো রাজপুত তেরো হাঁড়ির। এর সংশোধন না হলে প্রেসিডেনশিয়াল ডেমোক্রাসীও কি ধোপে টিকবে ?

কেন্দ্র বনাম রাজ্য, পার্লামেণ্টারি বনাম প্রেসিডেনশিয়াল, এ দুটো বিতর্কের পর আরও একটা বিতর্ক বেশ জবর। সেটা এক্‌জিকিউটিভ বনাম জুডিসিয়াল। বিচারপতিরা গায়ে পড়ে পার্লামেন্টের গায়ে হাত দেন না। লোকে তাঁদের দ্বারস্থ হলে তাঁরা সংবিধানের ধারাগুলি পরীক্ষা করে যে রায় দেন তা হয়তো পার্লা-মেণ্টের বিপক্ষে যায়। সে রায় কি সংবিধানবিরুদ্ধ ? তাই যদি হতো তবে রাতারাতি সংবিধান সংশোধন করার প্রয়োজন থাকত না। আমেরিকায় ওঁরা কথায় কথায় সংবিধান সংশোধন করেন না। এক বিচারপতি অবসর নিলে তাঁর শূন্য স্থানে নিজের পছন্দসই বিচারপতি নিয়োগ করেন। আমাদের মহামান্য মন্ত্রীরা বিচারপতির সংখ্যা বাড়িয়ে দিয়ে পছন্দসই বিচারপতি নিয়োগ করলে কেউ বলবে না যে কাজটা বেআইনী। বিচারপতির সংখ্যা বাড়ানোর পক্ষে জোরালো যুক্তি আছে। আদালতগুলোতে মামলা জমতে জমতে আয়ত্তের বাইরে চলে গেছে। তবে সংখ্যা বাড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে বেতনও বাড়াতে হবে। নয়তো যোগ্যতমের সম্মতি মিলবে না।

সবচেয়ে ধারালো বিতর্ক ব্যক্তিস্বাধীনতা নিয়ে। এটা যদি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র হয়ে থাকে তবে এর কাঠামোটা অটুট রেখেই সমাজতন্ত্রের প্রাণসঞ্চার করতে হবে। গণতন্ত্রকে মেরে সমাজতন্ত্রকে বাঁচানো কি শুধুমাত্র সংবিধান সংশোধন দিয়ে সম্ভব ? তার জন্যে নির্জলা ডিকটেটরশিপ ও তার আনুষঙ্গিক রক্তপাত আবশ্যক হবে। তার মানে কেবল বিরোধী পার্টিগুলোকেই উৎখাত করা নয়, বিরোধী

শ্রেণীগুলোকেও উচ্ছেদ করা। এটা হলো বিপ্লবের পন্থা। বিবর্তনের পন্থা নয়। এ পন্থা যাঁরা বরণ করবেন তাঁদের জন্যে পার্লামেণ্টারি বা প্রেসিডেনশিয়াল কোনো প্রকার গণতন্ত্রই নয়। তাঁরা কেন তবে নির্বাচন লড়বেন, আইনসভা জুড়বেন, মন্ত্রী পরিষদ্ গড়বেন? এর যদি সত্যি কোনো দাম থাকে তবে ব্যক্তিস্বাধীনতারও দাম আছে। ব্যক্তি যদি স্বাধীনভাবে ভোট না দিতে পারে তো ভোটাধিকারই বা কেন এত দামী হবে। আর ভোটাধিকার যদি দামী হয়ে থাকে তবে ভোটারের ব্যক্তিস্বাধীনতাও সেই অনুপাতে দামী। ভোটার স্বাধীনভাবে চিন্তা করবে, বিবেচনা করবে, ওজন করবে, তারপরে যাকে তার পছন্দ তাকে ভোট দেবে।

ভোটাররা যাতে চোখ কান খোলা রেখে প্রতিনিধি নির্বাচন করতে পারে তার জন্যে যাঁরা জনমত গঠন করতে সাহায্য করেন তাঁদেরও ব্যক্তিস্বাধীনতা থাকা চাই। তাঁদেরও চাই চিন্তার স্বাধীনতা, বাক্যের স্বাধীনতা, সভাসমিতিতে মত প্রকাশ করবার স্বাধীনতা, সংবাদপত্রে তথ্য প্রকাশের স্বাধীনতা, শাসকদের সমালোচনার স্বাধীনতা, আইনসঙ্গত অপোজিশনের স্বাধীনতা। এসব স্বাধীনতা খর্ব করলে বা হরণ করলে গণতন্ত্রকেও খর্ব করা বা হরণ করা হয়। গণতন্ত্রে বিশ্বাস থাকলে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতেই প্রতিপক্ষের যুক্তি খণ্ডন করা যায়, তথ্য অপ্রমাণ করা যায়। তার জন্যে নিরস্ত্র লেখককে জেলে পুরতে হয় না। তাও বিনা বিচারে। হতেও পারে যে তাঁর লেখনীটাই একটা ধারালো অস্ত্র। একবার আমাকেও বলা হয়েছিল যে আমার লেখা যদি প্রকাশ করতে দেওয়া হয় তার ফলাফল সুদূরপ্রসারী হবে। বাংলাদেশ থেকে এককোটি হিন্দু চলে আসবে। আমাদের কর্তারা মরে যাবেন। অতএব আগে থেকেই সেনসরশিপ শ্রেয়। একেই বলে লেখনী হচ্ছে তরবারির চেয়ে শক্তিমান। তবে এটা ব্যাজ-ভক্তিও হতে পারে। কোনো সংবাদপত্রে বা সাহিত্যপত্রে আমার সে লেখা প্রকাশিত হতে পারে না। পরে আমি সেটা বই করে বার করে দিই। সেটা ইতিহাসের আদালতে নথিভুক্ত হয়ে রইল।

আমরা যারা নির্দলীয় বুদ্ধিজীবী তারা নাগরিক হিসাবে ট্যাক্স দিই। নির্বাচনকালে ভোট দিই। আমাদের মতামত ব্যক্ত করা অপরের পক্ষে বিপজ্জনক হতে পারে এটা যদি কেউ আমাদের বুঝিয়ে দেয় তা হলে আমরা নিজেরাই নীরব থাকব। কিন্তু সাধারণত যা দেখি তা হচ্ছে যিনি যখন কর্তা তখন তাঁর মন জুগিয়ে লেখা বা কথা বলা এটা যাঁদের স্বভাব নয় তাঁরা নীরব থেকে গা বাঁচান। একভাবে না হোক আরেকভাবে গা বাঁচানোই যদি এত বড়ো একটা দেশের লক্ষ লক্ষ শিক্ষিত মনের স্বভাব হয় তবে তো এদেশ কোনোদিনই জগতের শ্রদ্ধা পাবে না। গণতন্ত্র থাকলেও যদি চিন্তা ও বাক্যের স্বাধীনতা না থাকে তবে একরাশ জোহুকুমই হবে সে দেশের প্রতিনিধি। বাইরের লোক যদি তাদের দেখেই ভারতের বিচার করে তবে ভারতের মুখ আলো হবে না, আঁধার হবে।

সিভিল লিবার্টির ইস্যুতে গান্ধীজী ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহ আন্দোলন করে-

ছিলেন, স্বরাজের ইস্যুতে নয়। সেটা ছিল স্বরাজের মতো দরকারী, স্বরাজের জন্যেই দরকারী। স্বরাজ তো অর্জন করাই যথেষ্ট নয়। তাকে সুরক্ষিত করাও দরকার। তার জন্যেও চাই সিভিল লিবার্টি। নাগরিকরা সকলেই এর ধারক ও বাহক। তাঁরা যদি সংগঠিত হন তবেই তাঁরা আত্মরক্ষা করতে পারবেন।

কেন্দ্র রাজ্য সম্পর্ক

ভারতের চেয়েও বিরাট দেশ চীন। সেদেশে কিন্তু একটির বেশী সরকার নেই। সেটি তার কেন্দ্রীয় সরকার। কেন্দ্রীয় কথাটি সেক্ষেত্রে বাহুল্য। কিন্তু ভারতের বেলা তা নয়। এদেশে আরো একপ্রস্থ সরকার আছেন। তাঁদের বলা হয় রাজ্য সরকার। চূড়ান্ত ক্ষমতা যদিও কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে তবু রাজ্য সরকার-গুলিও একেবারে ক্ষমতাহীন নন। তাঁরাও সংবিধান অনুসারে কেন্দ্রের সঙ্গে ক্ষমতার শরিক। সংবিধানে কতকগুলি ক্ষমতা কেন্দ্রের জন্যে সংরক্ষিত, কতক-গুলি রাজ্যসকলের জন্যে, কতকগুলি কনকারেণ্ট অর্থাৎ দুই পক্ষের এক্তারে। সংঘর্ষ যদি কখনো বাধে তো এই কনকারেণ্ট বিষয়গুলি নিয়ে বাধতে পারে। তা নইলে রাজ্য সরকার কখনো সৈন্যদল গঠনের অধিকার দাবী করেন না, ডাকঘর বসাতেও চান না, নোট ছাপানোর দাবীও তাঁদের মুখে শোনা যায় না, আয়করের অংশ চাইলেও আলাদা করে আয়কর ধার্য করতে যান না। অপর পক্ষে কেন্দ্রীয় সরকারও কখনো জেলার প্রশাসন হাতে নেন না, পুলিশের কাজে হস্তক্ষেপ করেন না, ভূমিরাজস্ব আত্মসাৎ করেন না বা রদ করেন না, মদের দোকান খোলেন না বা বন্ধ করেন না। আমাদের প্রধানমন্ত্রী যদি ভারতের সর্বত্র সুরাপান নিষিদ্ধ করতে চান তো তাঁকে মুখ্যমন্ত্রীদের সবাইকে রাজী করাতে হবে। নয়তো এক রাজ্যে কারণবারির অনাবৃষ্টি, অপর রাজ্যে অতিবৃষ্টি। যেসব রাজ্যে গোহত্যা নিষিদ্ধ হয়েছে সেসব রাজ্যের গোরু নাকি পশ্চিমবঙ্গে চালান হয়ে আসে ও এ রাজ্যের কসাইখানায় জবাই হয়। সম্প্রতি এই নিয়ে আন্দোলন চলেছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকার যদি কেন্দ্রের সঙ্গে একমত না হন তবে কেন্দ্রকেই পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে একমত হতে হবে। এমনি একরাশ উদাহরণ দিয়ে বোঝাতে পারি যে কেন্দ্র সর্বশক্তিমান নন, রাজ্য সর্বশক্তিহীন নন। সংবিধান উভয়ের প্রতি ন্যায়বিচার করতে চেয়েছিল, অবিচার যদি কেউ করে থাকেন তো তিনি আমাদের ভূতপূর্ব প্রধানমন্ত্রী, যিনি তাঁর দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে এমারজেন্সীর সুযোগ নিয়ে সংবিধানকে ইচ্ছামতো সংশোধন করেছেন। রাজ্য সরকারের অনিচ্ছাসত্ত্বে কেন্দ্র যখন খুশি পুলিশ পাঠাতে পারেন, তাঁদের পুলিশ তাঁদের কাছেই দায়ী থাকবে, রাজ্য সরকার সাক্ষীগোপাল। হাই-কোর্টকেও তাঁরা বহু পরিমাণে ঠুঁটো জগন্নাথে পরিণত করেছেন। শিক্ষাকেও তাঁরা কনকারেণ্ট বিষয় করেছেন। সংশোধিত সংবিধানকে আবার সংশোধন করতে হবে। নয়তো রাজ্যের দিক থেকে ক্ষোভের হেতু থাকবে।

চীনদেশে একটিমাত্র দল ক্ষমতাসীন। এদেশের সংবিধানে তেমন কোনো কথা নেই। এদেশে একাধিক দলের হাতে একাধিক রাজ্যের শাসনক্ষমতা থাকতে পারে। এখনি তো আমরা দেখতে পাচ্ছি কেন্দ্রে জনতা সরকার, পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্ট সরকার। আমাদের প্রত্যেকের দুটি করে ভোট। একটি ভোট কেন্দ্রের লোকসভার জন্যে, অপরটি রাজ্যের বিধানসভার জন্যে। আমরা যদি মনে করি যে কেন্দ্রের হাতে আরো বেশী ক্ষমতা থাকা উচিত তাহলে আমরা সেই দলটিকেই ভোট দিয়ে জিতিয়ে দিতে চাইব যে দল আরো বেশী ক্ষমতা হাতে পেলে আমাদের আরো বেশী উপকার করবে। আর আমরা যদি মনে করি যে রাজ্যের হাতেই আরো বেশী ক্ষমতা থাকলে আরো ভালো হয় তবে আমরা সে দলটিকে ভোট না দিয়ে অন্য একটি দলকে ভোট দিতে চাইব। এ দল চেষ্টা করবে রাজ্যকে আরো ক্ষমতাসম্পন্ন করতে। আমাদেরকেই ভেবে স্থির করতে হবে কোন্ অবস্থায় কোন্টা শ্রেয়। অতিকেন্দ্রীয়করণ না বিকেন্দ্রীকরণ। দুই দিকেই জোরালো যুক্তি আছে। জবরদস্ত কেন্দ্র না হলে ভারত আবার ভেঙে যেতে পারে। আবার পরাধীন হতে পারে। অতীতে এরকম বার বার হয়েছে। সেটা কি কাম্য? কখনোই নয়। অপর পক্ষে রাজ্যগুলি যদি শক্তসমর্থ, আত্মনির্ভর ও উদ্যোগবান না হয় তবে এই বিরাট দেশের বুনিয়াদ চিরকাল কাঁচা থেকেই যাবে। চূড়া যতই উচ্চ হোক না কেন তাকে ধারণ করে থাকে সুগভীর ভিত্তি। সুদৃঢ় ভিত্তি।

ক্ষমতার বণ্টন এমনভাবে করতে হবে যাতে কেন্দ্রও প্রয়োজনের সময় যথেষ্ট ক্ষমতা হাতে পায়, রাজ্যও ক্ষমতার অভাবে হাত গুটিয়ে বসে না থাকে। কোনো পক্ষ যেন অপরপক্ষের উপর দোষারোপ না করে। যতদিন একই দল এখানেও ছিল ওখানেও ছিল ততদিন দোষারোপের অবকাশ ছিল না। কিন্তু ইতিমধ্যে অবস্থার পরিবর্তন হয়েছে। যতদূর দৃষ্টি যায় প্রতিবার না হলেও বার বার এরকম হবে। লোকে মুখ বদলাতে চাইবে। এতে একটা প্রতিযোগিতার ভাবও আসবে। একই দল বরাবর জয়ী হলে অহঙ্কারে আত্মহারা হয়। ভুলে যায় যে মালিক সে নয়, মালিক হচ্ছে সাধারণ নাগরিক, যার হাতে ভোট। ভোটাররা এতদিনে সেয়ানা হয়ে গেছে। তাদের মাথায় কাঁঠাল ভাঙা আর সহজ নয়। তা হলেও নিশ্চিন্ত হওয়া যায় না। জার্মানরা কি কম সেয়ানা ছিল? তা হলে হিটলারকে সর্বেসর্বা হতে দিল কী করে? কাউকেই খুব বেশী বাড়তে দিতে নেই। ঝড়ে পড়ে যাবে। ঝড়টা গৃহযুদ্ধও হতে পারে, আন্তর্জাতিক যুদ্ধও হতে পারে। অথচ কাউকে দুর্বল বা অসহায় হতে দেওয়াও সমীচীন নয়। সরকার মানেই বলিষ্ঠ সরকার। যে সরকার ভয়ে জড়সড় সে সরকারকে আমি সরকারই বলিনে। রাজ্য সরকারদের যথেষ্ট ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। সে ক্ষমতা ব্যবহার করা না করা তাঁদের ইচ্ছাধীন। হয়তো তাঁদের কারো কারো ইচ্ছাই নেই। নিজের অনিচ্ছাকে তাঁরা পরের উপর আরোপ করে পাশ কাটাতে চান। এতে তাঁদের গদী বাঁচতে পারে, কিন্তু কাজ এগোয় না। কখনো বা কেন্দ্রীয় সরকারও নিজের অনিচ্ছাকে ঢাকতে পারেন রাজ্য সরকারের উপর দোষারোপ

করে। মাঝখান থেকে গণতন্ত্রের বদনাম হয়। লোকে গণতন্ত্রের বদলে একনায়কত্বের গুণগান করে। অমনি করে হিটলারের জন্যে পথ পরিষ্কার হয়।

যারা গণতন্ত্র রাখতেই চায় তারাও বলে প্রেসিডেনশিয়াল ডেমোক্রাসী পার্লামেণ্টারি ডেমোক্রাসীর চেয়ে ভালো। সাধারণ লোকের মুখে একথা হয়তো মানায়, কিন্তু যাঁরা তুলনা করে দেখেছেন ও দেশের মাটির সঙ্গে যোগ রেখেছেন তাঁদের জানা উচিত যে শাসনবিভাগ, বিচারবিভাগ ও বিধায়কবিভাগের মধ্যে সমভাবে ক্ষমতা ভাগ করে না দিলে রাষ্ট্রপতিই হবেন সর্বেসর্বা। যেমন হয়েছেন আমাদের দুই প্রতিবেশী রাষ্ট্রে। এই বিরাট দেশে যদি সেরকম অতিকেন্দ্রীকরণ ঘটে তবে আমেরিকার মতো চেক ও ব্যালান্স থাকবে না। তার সুযোগ নেবে দেশের মিলিটারি। যেমন নিয়েছে বাংলাদেশে ও পাকিস্তানে। পার্লামেণ্টারি ডেমোক্রাসীর ছিদ্র অনেক। সেইসব ছিদ্র দিয়ে দুর্নীতি প্রবেশ করলে সেই বেনোজল দেশকে ভাসিয়ে নিয়ে যেতে পারে। কিন্তু বেনোজল কি প্রেসিডেনশিয়াল ডেমোক্রাসীতে প্রবেশের ছিদ্র পায় না? গত শতাব্দীর শেষভাগে আমেরিকার অবস্থা কি আজকের ভারতের চেয়ে কম দুর্নীতিপূর্ণ ছিল? এক এক করে প্রত্যেকটি ছিদ্র বন্ধ করতে হয়েছে ও হচ্ছে ও হবে। এর কোনো শর্টকাট নেই। কোনোপ্রকার গণতন্ত্রেই না। ডিকটেটরশাসিত দেশে হয়তো দুর্নীতি নেই। কিন্তু ওটাই কি জীবনের একমাত্র বা সর্বপ্রধান অভিশাপ? যারা স্বাধীনভাবে ভোট দিতে পারে না, সিদ্ধান্ত নিতে পারে না, কথা বলতে পারে না, কাজ করতে পারে না, গুপ্ত পুলিশের ভয়ে তটস্থ হয়ে থাকে, বিনা বিচারে আটকে থাকে বা বেগার খাটে, সুস্থ হয়েও মানসিক রোগের জন্যে নজরবন্দী হয়, এক জেলা থেকে আরেক জেলায় যেতে হলে পাশপোর্ট বা পারমিট নিয়ে যায়, সবসময় আইডেনটিটি কার্ড নিয়ে ঘোরে, পালাতে গেলে গুলী খেয়ে মরে, তাদের জীবন দুর্নীতিমুক্ত হতে পারে, সন্ত্রাসমুক্ত নয়। জীবনকে সর্বেতোভাবে মুক্ত করতে হবে। তবেই না আমরা মানুষ।

আমাদের যেটা আছে সেটাই মোটের উপর ভালো। সেটাকেই আরো ভালো করতে হবে। কোনো রাষ্ট্রেরই সংবিধান সর্বাঙ্গসম্পূর্ণ নয়। কিছু না কিছু অসম্পূর্ণতা থেকে যায়ই। সেইজন্যে বার বার সংশোধনের প্রয়োজন হয়। তবে প্রত্যেকটি সংবিধানের একটা মূল কাঠামো বা বেসিক স্ট্রাকচার থাকে। আমাদের সংবিধানেরও আছে। এটা যাঁরা অস্বীকার করেছেন তাঁরা নির্বাচনে হেরে গেছেন। কিন্তু সেই পরাজয় থেকে তাঁরা যে কিছু শিখেছেন তা বলা শক্ত। আমাদের এ রাষ্ট্রের গঠন দোতলা বাড়ীর। এর নিচের তলায় অনেকগুলি ঘর। সেগুলির নাম রাজ্য। উপরতলায় একখানি মাত্র ঘর। সেটিকে বলা হয় কেন্দ্র। নিচের ঘর সংখ্যা পরে বাড়তে পারে, কিন্তু উপরে ওই একখানা ঘরই থাকবে। কিন্তু ঘরের সংখ্যা উপরতলায় একখানা হলেও সেইঘরের আসবাবসংখ্যা বাড়তেও পারে, কমতেও পারে। আমরা ইচ্ছা করলে কেন্দ্রকে আরো বেশী শক্তিশালী করতে পারি, সেটা রাজ্যগুলোর খরচে। অথবা আমরা কেন্দ্রের বিষয়সংখ্যা কমিয়ে দিয়ে রাজ্যগুলির বিষয়সংখ্যা বাড়িয়ে দিতে পারি। কিন্তু

যেটাই করি না কেন সকলের মত নিতে হবে। লোকসভার দুই-তৃতীয়াংশ ভোট, তার উপরে রাজ্যসভার দুই-তৃতীয়াংশ ভোট, তার উপরে অর্ধেকসংখ্যক রাজ্যের সমর্থনও মূল কাঠামোর এত বড়ো ওলটপালটের পক্ষে যথেষ্ট নয়। পার্লামেন্টের সোভরেনটি আমাদের সংবিধানে স্বীকৃত হয়নি। সোভরেনটি ভারতের জনগণেরই। এত বড়ো একটা মৌল পরিবর্তনের জন্যে রেফারেন্ডাম বা গণভোট অত্যাবশ্যক। সেটা যদি অবাস্তব মনে হয় তো আবার সংবিধান সভা ডাকা যেতে পারে। কেন ডাকা হচ্ছে সেকথা ভোটদাতাদের বুঝিয়ে দিতে হবে। তাঁরা তাঁদের প্রতিনিধিদের সেই অনুসারে ম্যান্ডেট দেবেন। বিবেচনার জন্যে বছরখানেক সময় দিতে হবে। গতবারের সংবিধান সংশোধনের মতো এমারজেন্সী ঘোষণা করে রাতারাতি কেল্লা ফতে করলে চলবে না।

রাজনৈতিক সংবিধানকে অর্থনৈতিক সংবিধানে পরিণত করাও একপ্রকার মৌল পরিবর্তন। এ রাষ্ট্র যদি সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র হয় তবে রাষ্ট্রই হবে যাবতীয় জায়গাজমি কলকারখানা দোকানবাজার ধনসম্পত্তির মালিক। প্রাইভেট বলে যদি কিছু থাকে তবে সেটা রাষ্ট্রের অনুগ্রহে, রাষ্ট্র তার সীমানির্দেশ করবে। এখন পর্যন্ত কোথাও এত বড়ো একটা ওলটপালট পার্লামেন্টের ভোটে বা সংবিধান সভার ভোটে বা রেফারেন্ডামের ভোটে সাধিত হয়নি। এদেশে যদি হয় তো সেটা হবে পৃথিবীর অষ্টম আশ্চর্য। হবে না যে, তাই বা কেমন করে বলি ? হবে যে, তাই বা কেন নয় ? সব কিছু নির্ভর করছে জনগণের উপরে। তাদের মতৈক্যের উপরে।

সেকাল আর একাল

সেকালের রীতি ছিল এই। সেক্রেটারি অভ স্টেট ফর ইন্ডিয়া ছিলেন সবার উপরে। তিনি যে আদেশ দিতেন ভারতের বড়লাট তা মান্য করতেন। বড়লাট যে আদেশ দিতেন প্রাদেশিক লাট তা মান্য করতেন। প্রাদেশিক লাট যে আদেশ দিতেন জেলা ম্যাজিস্ট্রেট তা মান্য করতেন। জেলা ম্যাজিস্ট্রেট যে আদেশ দিতেন অধীনস্থ কর্মচারীরা তা মান্য করতেন। সেক্রেটারি অভ স্টেট থেকে গ্রাম্য চৌকিদার পর্যন্ত প্রসারিত ছিল একটি লোহার শিকল। প্রশাসনকে সে শিকল মজবুতভাবে বেঁধেছিল। শিকলটা ছিল আইনেরও শিকল। আদেশ যাঁরা দিতেন তাঁরা আইনের মর্যাদা রক্ষা করতেন। নয়তো ব্রিটিশ পার্লামেন্টের কাছে ছিল তাঁদের জবাবদিহির দায়। ওয়ারেন হেস্টিংসকে একদা ইমপীচ করা হয়েছিল। মাঝে মাঝে দেখা যেত বড়লাট অসময়ে ইস্তফা দিয়ে বিদায় নিয়েছেন। লাটসাহেবরা যে অকালে ইস্তফা দিতেন তারও দৃষ্টান্ত আছে।

একালে আমরা ব্রিটিশ পার্লামেন্টের নিয়ন্ত্রণাধীন নয়। আমরা আত্মনিয়ন্ত্রণ লাভ করেছি। আমাদের তৈরি সংবিধানই আমাদের নিয়ন্ত্রণ করে। আমাদের সংবিধান অনুসারে কেন্দ্রে গঠিত হয়েছে লোকসভা ও রাজ্যসভা, রাজ্যে রাজ্যে বিধানসভা। কোনো কোনো রাজ্যে বিধান পরিষদও আছে। লোকসভা ও

বিধানসভা প্রত্যক্ষভাবে নির্বাচিত। রাজ্যসভা ও বিধান পরিষদ্ পরোক্ষভাবে নির্বাচিত। সেক্রেটারি অভ স্টেট তথা বড়লাটের ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে ভারতের প্রধানমন্ত্রীকে। রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শেই চলেন। ক্ষেত্রবিশেষে তিনি স্বয়ংচালিত। কিন্তু সেরূপ পরিস্থিতি কদাচিৎ দেখা দেয়। তেমনি, রাজ্যপাল মুখ্যমন্ত্রীর পরামর্শেই চলেন। কিন্তু সেরূপ পরিস্থিতি ততদিন দেখা দেয়নি যতদিন প্রত্যেকটি রাজ্য তথা কেন্দ্র ছিল কংগ্রেসের শাসনাধীন। প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রীর মতভেদ ঘটলে প্রধানমন্ত্রী মুখ্যমন্ত্রীকে সরাসরি আদেশ দিতে পারতেন না, দিলে সেটা হতো সংবিধানবিরুদ্ধ। কিন্তু কংগ্রেস হাই কমান্ড তো উভয়েরই পেছনে। হাই কমান্ডের হাতেই নির্বাচনকালে টিকিট বিতরণের ও প্রচারকার্যের ভার। বৈতরণী পারাপারের কান্ডারী যাঁরা তাঁদের শরণ নিয়ে কখনো প্রধানমন্ত্রী জয়ী হতেন মুখ্যমন্ত্রীর উপর, কখনো মুখ্যমন্ত্রী অপরাজিত থাকতেন। একটা দৃষ্টান্ত আমার মনে আছে। পশ্চিমবঙ্গের অশান্ত অবস্থায় বিচলিত হয়ে নেহরু বলেন এখনি সাধারণ নির্বাচন চাই। বিধানচন্দ্র বলেন, চাইনে। কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি বিধানচন্দ্রের পক্ষ নেন।

কিন্তু এমনও তো হতে পারে যে কেন্দ্র যে-দলের দ্বারা শাসিত রাজ্যবিশেষ সেই দলের দ্বারা শাসিত নয়। কংগ্রেসী প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশ কমিউনিস্ট মুখ্যমন্ত্রী অমান্য করলে সংবিধানে শাস্তির বিধান নেই। কংগ্রেস হাই কমান্ডও নিরুপায়। এরূপ স্থলে যেটা অগতির গতি সেটা হচ্ছে রাজ্যপালকে দিয়ে রিপোর্ট লিখিয়ে নেওয়া যে, রাজ্য রসাতলে যাচ্ছে, কেন্দ্রের হস্তক্ষেপ অপরিহার্য, রাজ্য সরকারকে বরখাস্ত করে রাষ্ট্রপতিকেই নিতে হবে শাসনের ভার। বলা বাহুল্য রাষ্ট্রপতি এক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকারের পরামর্শে চালিত। কেন্দ্রীয় সরকার পার্লামেন্টের কাছে দায়ী। রাজ্যের বিধানসভা বাতিল কিংবা শিকেয় তোলা।

কিন্তু এমনও তো হতে পারে যে রাজ্যের জনমত রাষ্ট্রপতির হস্তক্ষেপের বিরোধী। তা হলে জনমতের চাপে অবিলম্বে সাধারণ নির্বাচন ঘটাতে হবে। সাধারণ নির্বাচনে যদি কেন্দ্রীয় শাসকদলের হার হয় ও রাজ্যের শাসকদলের জিৎ হয় তবে প্রধানমন্ত্রীকেই নাকাল হতে হবে। প্রধানমন্ত্রী বনাম মুখ্যমন্ত্রী এই দ্বন্দ্বে আখেরে কে যে জয়ী হবেন তা নির্বাচকরাই জানেন। নির্বাচকদের মনে কী আছে তা জানাবার জন্যে বিদেশে গ্যালপ পোল অনুষ্ঠিত হয়। এদেশে তেমন কিছু হয় না। গ্যালপ পোলের রেওয়াজ থাকলে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী সময়ে সতর্ক হতেন। গতবারের সাধারণ নির্বাচনে সদলবলে পরাজিত হতেন না। কিংবা পরাজিত হলেও অমন পাইকারিভাবে নয়।

কংগ্রেসের একাধিপত্যের যুগ আর নেই। কংগ্রেস নিজেই এখন বহুধা বিভক্ত। কেন্দ্রে তার স্থান নিয়েছিল জনতা দল। কিন্তু সম্প্রতি জনতা দলেও ভাঙন ধরেছে। রাজনীতিতে শেষ কথা বলে কিছু নেই। অসম্ভবও সম্ভব হয়। তবু দেখে শুনে মনে হয় ইংলন্ডের মতো দুই প্রধান দল পর্যায়ক্রমে দেশ শাসন করবে এটা অবাস্তব ধারণা। একই কথা খাটে রাজ্যের বেলাও। যতদূর দৃষ্টি যায় কোয়ালিশনই হচ্ছে কেন্দ্রের তথা রাজ্যের ভবিতব্য। কোয়ালিশন

যে সব সময় মন্দ তা নয়। কোয়ালিশন যে সংবিধানবিরোধী তাও নয়। পশ্চিম জার্মানী বহুকাল ধরে কোয়ালিশনের দ্বারা শাসিত। তা সত্ত্বেও সমৃদ্ধ ও সুশৃঙ্খল। কোয়ালিশন যদি ভারতের তথা বিভিন্ন রাজ্যের ললাটলিখন হয়ে থাকে তবে 'হায় হায়' করা অকারণ।

কিন্তু ইতিমধ্যেই অনেকে ভাবতে আরম্ভ করেছেন যে ওটা পার্লামেন্টারি ডেমোক্রাসী নয়। ওর চেয়ে ভালো প্রেসিডেনশিয়াল ডেমোক্রাসী। কেউ কেউ তো ডেমোক্রাসী জিনিসটার উপরেই হতাশ হয়ে ডিকটেটরশিপের ফরমাস দিচ্ছেন। বিশেষ করে মিলিটারি ডিকটেটরশিপের। অপরাধ হয়তো দু'তিনশো জন রাজনীতিক করেছেন। তাঁদের অপরাধে সাজা পাবে কিনা কোটি কোটি নাগরিক বা নির্বাচক। কেন, তারা কি তাদের ভোটের অপব্যবহার করেছে? তারা কি উপযুক্ত পাত্রকে ভোট দেয়নি? পাত্ররা যদি দল বদল করেন তবে পাত্ররাই তার জন্যে দায়ী। তাদেরকেই বলা হোক জনসভায় দাঁড়িয়ে জনসাধারণের সামনে জবাবদিহি করতে। দল বদলের বিরুদ্ধে আইন পাশ হয়নি। কাজটা বেআইনী না হলেও বেইমানী। বেইমানীর বিরুদ্ধে জনমত তৈরি করা উচিত। পাত্রদের পরের বার ভোট দেওয়া না দেওয়া নির্ভর করবে জবাবদিহির বিশ্বাসযোগ্যতার উপরে। ওটা কি দল বদল না দল বিভাজন?

সেকালে বৌমাস্টারের দল বলে একটি যাত্রার দল ছিল। সেটি ভেঙে গিয়ে দুটি দল হয়। তখন একটির নাম হয় বৌমাস্টারের দল। অপরটির নাম বৌমাস্টারের ভাঙা দল। একালেও সেই রকম দেখছি জনতা ও জনতা (এস)। তার আগে কংগ্রেস ও কংগ্রেস (আই)। তারও আগে সি পি আই ও সি পি আই (এম)। আধুনিকতম বৌমাস্টারের ভাঙা দলের বক্তব্য ওরাই জনতা দলের সেকুলার অংশ। বাকীটা ধর্মাশ্রিত বা সাম্প্রদায়িক। এ বক্তব্য কতদূর সঙ্গত তা বিচারসাপেক্ষ। কার্যকলাপ দেখেই লোকে এর বিচার করবে। কার্যকলাপের উপর দৃষ্টি রাখতে হবে। ফাঁকা আওয়াজ হয়ে থাকে তা ধরা পড়ে যাবে।

শ্রীচরণ সিং-এর কোয়ালিশন সরকার যদি স্থায়ী না হয় এর পরে আসবে শ্রীজগজীবন রামের কোয়ালিশন সরকার। তাঁর সে সরকার যদি স্থায়ী না হয় তবে অকালবোধন করতে হবে। অর্থাৎ অসময়ে সাধারণ নির্বাচন। তাতে এমন কী লাভ হবে? কোয়ালিশন ভিন্ন আর কোন সরকার কি সামনের কয়েক বছরের মধ্যে সম্ভবপর? আমার বড়ো আশা ছিল ইংলণ্ডের মতো ভারতেরও দুই পার্টি পালা করে সরকার চালাবে। তা তো হবার নয়। আমাদের জাতীয় ঐতিহ্যই বারো রাজপুত তেরো হাঁড়ি। এইজন্যেই মোগল এসেছিল, এইজন্যেই ইংরেজ। এর পরে কে আসছে কে জানে! তবে এখন থেকেই সতর্কতামূলক ব্যবস্থা করতে হবে। ফরাসীরাও আশি বছর ধরে কোয়ালিশন সরকারের পর কোয়ালিশন সরকার দেখতে অভ্যস্ত ছিল। প্রায় বছরই সরকার বদলাত। কখনো কখনো বছরে তিনচার বার। তা বলে দেশ অশাসিত ছিল না। ওদের সিভিল সার্ভিস অতি মজবুৎ। যাকে বলে ইস্পাতের কাঠামো। আমাদেরও তেমনি একটি ইস্পাতের কাঠামো ছিল ইংরেজ আমলে। এখনকার কাঠামো ইস্পাতের নয়।

একে দুর্বল করা হয়েছে নেহেরু শাসনকাল থেকেই। এখন এই দুর্বল কাঠামোর উপর কোয়ালিশন চাপলে প্রশাসন ভেঙে পড়তে পারে। পনেরোটা ভাষায় পঁচিশটা কেন্দ্রে নিখিল ভারতীয় প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করতে গেলে যা হবে তা একপ্রকার জুয়াখেলা। কাঠামোটা হবে কার্ডবোর্ডের। তার উপর যাঁরা চাপবেন তাঁরা যদি হন খড়ের মানুষ তা হলে কী হবে সেটা আমি পাঠকদের কল্পনার উপর ছেড়ে দিচ্ছি। কথায় কথায় আর্মিকে ডাকলে অবশেষে আর্মিই সওয়ার হবে।

ধাঁধার জবাব

সম্পাদক মহাশয় আমার কাছে একটি ধাঁধার জবাব চেয়ে পাঠিয়েছেন। ধাঁধাটি হলো এই। কেন্দ্রে ইন্দিরার সরকার আর রাজ্যগুলিতে বিভিন্ন দলের সরকার ভারতে এই ধরনের রাজনৈতিক রূপরেখা দাঁড়ালে তাতে কি অগ্রগতি বা উন্নয়ন ব্যাহত হবার আশঙ্কা আছে ?

দাঁড়াবে কী ? দাঁড়িয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের নির্বাচকগণ ইন্দিরাজীর দলকে দিয়েছে ৪৯টি আসন আর তাঁর বিরোধী বামফ্রণ্টকে ২৩৮টি আসন। এটা যে কেবল রাজ্য কংগ্রেস (ই)র প্রতি অনাস্থাসূচক তাই নয়, নিখিল ভারত কংগ্রেস (ই)র প্রতিও অনাস্থাসূচক। এর ফলে ইন্দিরা সরকার পদত্যাগ করবেন না। লোকসভায় তাঁদের দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রন্ট সরকার যদি কেন্দ্রের ইন্দিরা সরকারের সঙ্গে অসহযোগ করে বা ইন্দিরা সরকারই যদি বামফ্রণ্ট সরকারের সঙ্গে অসহযোগ করে তবে এমন কোনো তৃতীয় পক্ষ নেই যে মধ্যস্থতা করবে। পশ্চিমবঙ্গ হয়তো একদিন কেন্দ্রের বিরুদ্ধে আইন অমান্য শুরু করে দেবে। আর কেন্দ্র তার উত্তরে রাষ্ট্রপতির শাসন চাপিয়ে দেবে।

এ ধরনের পরিস্থিতি ব্রিটিশ আমলেও দেখা দিয়েছিল। কেন্দ্র ব্রিটিশ সবকারের নিরঙ্কুশ শাসনাধীন। আটটি প্রদেশ কংগ্রেস সরকারের সীমাবদ্ধ শাসনাধীন। মহাযুদ্ধে যোগদানের প্রশ্নে দুই পক্ষ দ্বিমত। কেন্দ্রীয় সরকারের অদলবদলে বড়লাট নারাজ। প্রাদেশিক সরকারের উপর যুদ্ধকালীন নিয়ন্ত্রণ চাপিয়ে দেওয়ায় কংগ্রেস মন্ত্রীরা ক্ষুব্ধ। মধ্যস্থতা করার মতো কেউ ছিলেন না। কেন্দ্রকে অমান্য করলে কেন্দ্র প্রাদেশিক মন্ত্রীদের বরখাস্ত করে লাটসাহেবদের দিয়ে শাসনকার্য চালাত। বরখাস্তের জন্যে অপেক্ষা না করে মন্ত্রীরা স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করেন। লাটসাহেবরা প্রশাসনের ভার নেন। মহাযুদ্ধের পরে আবার যখন সাধারণ নির্বাচন হয় তখন সেই আটটি প্রদেশে আবার কংগ্রেস সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়। এছাড়া পাঞ্জাবেও আংশিক কংগ্রেস সরকার। এতগুলো প্রদেশ যদি কেন্দ্রের বিরোধিতা করে তা হলে কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষে সুষ্ঠুভাবে শাসনকার্য পরিচালনা অসম্ভব। মন্ত্রীদের পাইকারী ভাবে বরখাস্ত করা যদিও আইন অনুসারে কেন্দ্রীয় সরকারের ইচ্ছাধীন তবু অসমীচীন। ততদিনে বুঝতে

বাকী নেই যে জনসাধারণের অধিকাংশের আস্থা কংগ্রেসের উপরে, অনাস্থা ইংরেজের উপরে। কোনো সরকারই এতখানি অনাস্থার পর নিছক আইনের জোরে টিকতে পারে না। বাধ্য হয়ে আইন বদলাতে হয়। আর নয়তো গায়ের জোর ফলাতে হয়।

ব্রিটিশ সরকার সেই সন্ধিক্ষণে অপসরণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। কেন্দ্রীয় সরকার দুই ভাগে বিভক্ত হয়। বৃহত্তর অংশটি পড়ে কংগ্রেসের ভাগে। কংগ্রেস সেই অংশটির নাম রাখে ইণ্ডিয়ান ইউনিয়ন বা সংক্ষেপে ইণ্ডিয়া। ইউনিয়ন বলতে বোঝায় অনেকগুলি ইউনিটের ইউনিয়ন। এক একটি ইউনিট যেন এক একটি স্তম্ভ। স্তম্ভ নড়ে গেলে ছাদ ভেঙে পড়ে। প্রদেশ বা রাজ্যই হচ্ছে 'বেসিক' বা মৌল বস্তু। ইউনাইটেড স্টেটসও একটি ইউনিয়ন। ইউনাইটেড কিংডমও একটি ইউনিয়ন। কিন্তু ক্যালিফর্নিয়ার বা টেকসাসের যেমন নিজস্ব আইনসভা ও সরকার আছে স্কটল্যাণ্ড বা ওয়েলসের তেমন নেই। ইংল্যাণ্ডের সঙ্গে তাদের আইনসভা ও সরকার একাকার হয়েছে।

স্বাধীনতার পরে যখন ভারতীয় ইউনিয়নের জন্যে সংবিধান রচনা করা হয় তখন প্রদেশগুলিকে স্টেট বা রাজ্য আখ্যা দিয়ে দেশীয় রাজ্যগুলির সঙ্গে একত্র করে টেকসাস বা ক্যালিফর্নিয়ার মতো নিজস্ব আইনসভা ও সরকার গঠন করতে দেওয়া হয়। সেদিক থেকে আমাদের এটা ফেডারল ইউনিয়ন। যেমন আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের। অথচ আমাদের প্রেসিডেণ্টকে করা হয় ব্রিটিশ রাজার মতো ক্ষমতা-শূন্য শিরোভূষণ। ক্ষমতার মালিক তিনি নন, তাঁর প্রধানমন্ত্রী। কেন্দ্রীয় আইনসভা বা পার্লামেণ্ট থেকে একজনকে প্রধানমন্ত্রী করা হয়। যতদিন তাঁর পেছনে অধিকাংশ সদস্য ততদিন তাঁর প্রাধান্য। প্রেসিডেণ্ট কিন্তু পার্লামেণ্টের সংখ্যা-গরিষ্ঠদের আস্থানির্ভর নন। যতদিন না তাঁর মেয়াদ পূর্ণ হচ্ছে ততদিন তাঁর স্থায়িত্ব। তিনি স্বতন্ত্রভাবে নির্বাচিত প্রেসিডেণ্ট।

আমেরিকার মতো ভারতের এক একটি রাজ্যে এক একজন গভর্নর। কিন্তু এঁরা কেউ সেখানকার মতো নির্বাচিত গভর্নর নন। এঁরা প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শে প্রেসিডেণ্ট কর্তৃক নিযুক্ত। এঁরা প্রধানমন্ত্রীর আস্থা হারালে যে-কোনোদিন বিতাড়িত হতে পারেন। অথচ এঁরাই রাষ্ট্রপতি শাসন প্রবর্তিত হলে রাজ্য মন্ত্রীমণ্ডলীকে বিতাড়িত করে রাজ্য সরকারের সর্বময় পরিচালক হতে পারেন। আমেরিকায় এটা অভাবনীয়। আর রাষ্ট্রপতির শাসন মানে তো তাঁর বকলমে প্রধানমন্ত্রীর শাসন। এই পরিমাণ ক্ষমতা আমেরিকাব প্রেসিডেণ্ট অথবা ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীরও নেই। সংবিধান এত অধিক ক্ষমতা দেওয়া সত্ত্বেও ভারতের প্রধানমন্ত্রী তাঁর পার্টির সদস্যদের ভোটে সংবিধান সংশোধন করিয়ে নিতেও সক্ষম। তাঁর ধারণা 'পার্লামেণ্ট' বলে নামকরণের এমন মহিমা যে আসলে যেটা সীমাবদ্ধ ক্ষমতাসম্পন্ন কেন্দ্রীয় আইনসভা সেটা নাকি ব্রিটিশ পার্লামেণ্টের মতো 'সোভরেন' ক্ষমতাসম্পন্ন। তাই যদি হয়ে থাকে তো সংবিধান সংশোধনের জন্যে অর্ধেকসংখ্যক রাজ্য আইনসভার অনুমোদন আবশ্যক কেন ?

সংবিধানে যে সসীম ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে তাকে অসীম করার আরেকটি

উপায় কংগ্রেস পার্টির প্রেসিডেণ্ট পদে নিজের লোককে বসানো কিংবা নিজেই বসা। তা হলে যে-ক্ষমতা প্রধানমন্ত্রী হিসাবে প্রয়োগ করা চলে না সে ক্ষমতা খিড়কি দরজা দিয়ে কংগ্রেস হাই কমাণ্ডের সেনাপতি হিসাবে বিভিন্ন রাজ্যের কংগ্রেস মন্ত্রী ও আইনসভা সদস্যদের উপরে প্রয়োগ করা চলে। এর নাম এক্‌স্ট্রাকনস্টিটিউশনাল পাওয়ার। এর উদ্‌ভাবক ইন্দিরা গান্ধী নন, মহাত্মা গান্ধী। কংগ্রেস হাই কমাণ্ড তাঁরই মানস পুত্র। বিদেশী শাসকদের সঙ্গে পাঞ্জা কষার জন্যে এ ব্যবস্থার প্রয়োজন হয়েছিল। এখন বিদেশী শাসক নেই, এখন এটাকে ব্যবহার করা হচ্ছে স্বদেশী রাজ্য সরকারদের উপর সংবিধান-বহির্ভূত ক্ষমতা জারির জন্যে। যদি সেসব সরকার কংগ্রেস দলের দলীয় সরকার হয়ে থাকে।

কিন্তু তাদের কোনোটা যদি অন্য কোনো দলের দলীয় সরকার হয়—যেমন পশ্চিমবঙ্গে, ত্রিপুরায়, তামিলনাড়ুতে—তা হলে কী হবে? তাকে তাড়িয়ে দিতে পারা যাবে কি? এই প্রশ্নের উত্তর মেলে সংবিধান রচনার দশ বছরের মধ্যে কেরল রাজ্যে। সেখানে সংবিধানসম্মত উপায়ে কমিউনিস্টরা আইন সভায় নির্বাচিত হয়ে সরকার গঠন করেন। সেটাই বোধ হয় পৃথিবীর সর্বপ্রথম গণতান্ত্রিক উপায়ে গঠিত কমিউনিস্ট সরকার। ভারতেই এটা সম্ভব হয়েছিল। সুতরাং আমাদের গর্ব করবার যথেষ্ট কারণ ছিল যে ইউরোপ আমেরিকার চেয়েও আমরা গণতান্ত্রিক উপায়ে বিশ্বাসী। কিন্তু সে সরকারকে তার বিরোধীপক্ষ বেশীদিন টিকতে দেয় না, এমন এক অশান্ত পরিস্থিতি সৃষ্টি করে যে কেন্দ্রীয় সরকার গভর্নরকে দিয়ে রিপোর্ট লিখিয়ে নিয়ে রাষ্ট্রপতিকে দিয়ে মন্ত্রীদের বরখাস্ত করান। আমি এর প্রতিবাদে একটি প্রবন্ধ লিখি। আমি কমিউনিস্ট বলে নয়, আমি সংবিধানের অপপ্রয়োগে মর্মাহত বলে। গণতন্ত্র বিরোধীপক্ষকে যে সুযোগ দেয় আর কোনো শাসনব্যবস্থা সে সুযোগ দেয় না। তাই গণতন্ত্রের দেশে বিপ্লব হয় না। শান্তিপূর্ণভাবে ক্ষমতার হস্তান্তর হয়। কেরলের কমিউনিস্টদের বিপ্লবের পথে ঠেলে দেওয়া হয়। ওদের অবশ্য বিপ্লব ঘটাবার মতো গায়ের জোর ছিল না। ওরাও জাতপাত মানে। জ্যোতিষী গণনায় বিশ্বাস করে। কেরলের একটি ছাত্রী আমাকে বলেছিল, "দেখবেন এ সরকার ছ' মাসের বেশী থাকবে না।" কারণ কী? "কারণ জাতিভেদ প্রথা।" আমি তো হাঁ। মার্কস শুনলে কাঁদতেন।

মানুষের স্বভাবই এই যে তাকে যদি বৈধ উপায়ে ক্ষমতা দখল করতে না দেওয়া হয় সে অবৈধ উপায় অবলম্বন করবেই। একদা ন্যাশনালিস্টরাও সন্ত্রাসবাদী উপায় অবলম্বন করেছিলেন। অস্ত্রসংগ্রহের জন্যে জার্মানীতে গেছলেন। জাপান-অধিকৃত দেশে গিয়ে আজাদ হিন্দ ফৌজ গঠন করে সশস্ত্র সংগ্রাম করেছিলেন। কিন্তু পরে দেখা গেল ক্ষমতা হস্তান্তরের একটা বৈধ উপায়ও আছে, সেই উপায়ে ব্রিটিশ সরকার ক্ষমতা হস্তান্তর করেন ও কংগ্রেস নেতারা ক্ষমতার আসনে বসেন। কিন্তু তাদেরও একটা বিরোধীপক্ষ গড়ে ওঠে। সে পক্ষের সবাই যে কমিউনিস্ট তা নয়, কেউ বা সোশিয়ালিস্ট, কেউ বা দক্ষিণপন্থী, কেউ

বা "হিন্দ্ হিন্দ্ হিন্দী" মতবাদে বিশ্বাসী। ক্রমেই কংগ্রেসের পুণ্যবল ক্ষীণ হতে থাকে। ত্যাগশক্তি স্মৃতির অতলে তলিয়ে যায়। 'কংগ্রেস' এই লেবেলটাকে ভাঙিয়ে রাজনীতির বেসাতি চলে। কাজেই বিভিন্ন মার্গের বিরোধীপক্ষ দিকে দিকে মাথা তোলে। এমারজেন্সী ঘোষণা করে দাবিয়ে রাখা দুষ্কর হয়। অবশেষে ১৯৭৭ সালের সাধারণ নির্বাচনে কংগ্রেস নেতারা কেন্দ্রে গদীচ্যুত হন। মসনদে আরোহণ করে জনতা পার্টি। সংবিধানসম্মত ক্ষমতার হস্তান্তর। এতকাল রাজত্ব করার পর কংগ্রেস হয় বিরোধীপক্ষ।

কিন্তু জনতা পার্টির কেন্দ্রীয় সরকার কংগ্রেস পার্টির রাজ্য সরকারগুলিকে কিছুতেই তাদের আইন নির্দিষ্ট কার্যকাল সম্পূর্ণ করতে দেবে না। রাষ্ট্রপতিকে পরামর্শ দিয়ে সংবিধানের অপব্যাখ্যা করে গোটা আষ্টেক রাজ্য সরকারকে বরখাস্ত করাবে। আমি তো হতভম্ব। এই অদূরদর্শী সরকারের পরিণাম হয় অকালে বিদায়। পরবর্তী নির্বাচনে ইন্দিরা গান্ধী তাঁর অনুগত কংগ্রেসীদের নিয়ে কেন্দ্রে ফিরে আসেন। সঙ্গে সঙ্গে সেইসব রাজ্যের জনতা সরকারগুলিকেও সেই একই উপায়ে বরখাস্ত করান। সংবিধানে এমন কোনো কথা নেই যে কেন্দ্রীয় সরকারে রদবদল হলে তৎক্ষণাৎ রাজ্য সরকারেও রদবদল হবে। কিন্তু কংগ্রেসকে তাড়িয়ে জনতা পার্টি ও জনতা পার্টিকে তাড়িয়ে কংগ্রেস (ই) এইরকম একটা কনভেনশন চালু করেছে। ফলে পশ্চিমবঙ্গের বামপন্থী সরকার হয়েছে নার্ভাস। গত জুন মাস থেকেই এঁরা বলে আসছেন যে এঁরা বরখাস্ত হতে চলেছেন। বরখাস্ত হবার কীই বা কারণ থাকতে পারে। আইনসভায় এঁরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ। এঁদের বরখাস্ত করলে বিকল্প সরকার গঠন করতে পারা যাবে না। সাধারণ নির্বাচন যতদিন না হয় ততদিন রাষ্ট্রপতির নামে গভর্নর শাসন করবেন। অবাক হয়ে দেখি বিনা দোষে ত্রিভুবন নারায়ণ সিংকে পদত্যাগ করতে বাধ্য করা হয়েছে। তবে কি নতুন গভর্নর এসেছেন মন্ত্রীদের কোনো একটা ছুতোয় ববখাস্ত করতে?

সেরকম কিছু ঘটেনি বটে, কিন্তু ঘটতে পারত। ভারতে একটা অশুভ সূচনা দেখা যাচ্ছে। রাজ্যে যারা সংখ্যালঘু তারা কেন্দ্রের সাহায্যে সংখ্যাগুরু দলকে হটাতে চায়, কিন্তু নিজেরা বিকল্প সরকার গড়তে পারে না, কেন্দ্রীয় সরকারের আজ্ঞাবহ গভর্নরকে শাসনভার দিতে চায়। এর মানে কেন্দ্রে মেজরিটি রুল, রাজ্যে মাইনরিটি রুল। ধৈর্য ধরলে, সেবা করলে, লোকের আস্থা পেলে মাইনরিটিও পরে মেজরিটি হতে পারত। কিন্তু তার মতিগতি অন্যরূপ। যেহেতু কংগ্রেস কেন্দ্রের কর্ণধার সেহেতু কংগ্রেস প্রত্যেকটি রাজ্যে গভর্নর নিয়োগ করবে ও তাঁর মারফৎ রাজ্যশাসন করবে। এটা উন্নয়ন বা অগ্রগতির পন্থা নয়। চাই সহ-অবস্থান, পারস্পরিক সহযোগিতা, সংবিধানকে এক পার্টির সংবিধানে পরিণত না করা।

যেমন লক্ষণ দেখা যাচ্ছে ইন্দিরা কংগ্রেস সব ক'টি রাজ্যে সংখ্যাগরিষ্ঠতা রক্ষা করতে পারবে না। কোথাও বামপন্থী, কোথাও দক্ষিণপন্থী, কোথাও ভিন্নপন্থী রাজ্য সরকার গঠিত হবেই। আর তারা সেইখানেই থামবে না।

কেন্দ্রের কাছ থেকে আরো ক্ষমতা চাইবেই। তার জন্যে আন্দোলন বৈধতার সীমা ছাড়িয়ে যেতেও পারে। কেন্দ্রকে দুর্বল করা আমাদের কাম্য নয়। কেন্দ্র দুর্বল হলে দেশ খণ্ড খণ্ড হয়ে যেতে পারে। অতীতে হয়েছেও। অপর পক্ষে কেন্দ্রকে অত্যধিক প্রবল করলে রাজ্য সরকারগুলি পুত্তলিকা সরকার হয়ে দাঁড়ায়। সেটাও কি বাঞ্ছনীয়? যে দেশে বিভিন্ন মতবাদ কাজ করছে সে দেশে কোনো একটা মতবাদই সর্বেসর্বা হবে, আর সব মতবাদ কোণঠাসা হবে, এর অবশ্যম্ভাবী পরিণাম গৃহযুদ্ধ। এটা এড়ানোর জন্যেই পার্টিশন। পরে আবার পার্টিশন প্রয়োজন হতে পারে।

এইসব কথা ভেবে আমি পার্লামেণ্টারি ডেমোক্রাসীর পরিবর্তে প্রেসিডেনশিয়াল ডেমোক্রাসীর পক্ষপাতী নই। বৈধ অবৈধ যে কোনো উপায়ে একজন হিটলার কি স্টালিন প্রেসিডেণ্টের সিংহাসনে আরোহণ করলে তাঁর গভর্নরদের মারফৎ তিনি প্রত্যেকটি রাজ্য শাসন করবেন। বিরোধীরা আন্দোলন করলে তিনি তাঁদের নির্মূল করবেন। সিংহাসন থেকে অবরোহণের পথ খোলা না থাকলে আমরণ তিনি স্বস্থানে বহাল থাকবেন। পাঁচবছর অন্তর সাধারণ নির্বাচন হবে না, হলে তাঁর দলটিই একমাত্র নির্বাচনপ্রার্থী হবে। প্রেসিডেনশিয়াল ডেমোক্রাসী যদি আমেরিকার মতো হয় তা হলে কেন্দ্রের সঙ্গে রাজ্যের সম্পর্ক এখনকার মতোই থাকবে। দিল্লীতে এক দলের সরকার, কলকাতায় আরেক দলের সরকার। সহ-অবস্থানের নীতি গৃহীত না হলে পরস্পরের বিরোধিতায় উভয় সরকারই নাজেহাল হবে। অতিকেন্দ্রীকরণ এর প্রতিকার নয়। আবার অতিবিকেন্দ্রীকরণও বাঞ্ছনীয় নয়। সংবিধানে যাকে যে ক্ষমতা দিয়েছে তারই সদ্ব্যবহার শ্রেয়। সংবিধান বহির্ভূত ক্ষমতা বর্জনীয়।

ভারতের যিনি রাষ্ট্রপতি সেনাবাহিনীরও তিনি সংবিধানসম্মত মহাসেনাপতি। এর উপরেও যদি তিনি কংগ্রেস (ই) হাই কমাণ্ডেরও অধিনায়ক হন তবে ইণ্ডিয়ান ইউনিয়ন হয়ে দাঁড়াবে আর একটি ইউনিয়নের দোসর। তার নাম সোভিয়েট ইউনিয়ন। সেখানকার পার্টিপ্রধানই হচ্ছেন রাষ্ট্রপ্রধান বা রাষ্ট্রপ্রধানই হচ্ছেন পার্টিপ্রধান। ও পথে সমাজতন্ত্র সম্ভব হতে পারে, গণতন্ত্র অসম্ভব।

আপেল বনাম আপেল শকট

ছেলেবেলায় পড়েছি সেকালে এক জ্যোতির্বিদ অন্ধকার রাত্রে আকাশের দিকে তাকিয়ে তারা গুনতে গুনতে মাঠের মাঝখানে খুঁড়ে রাখা এক পাতকুয়ায় পড়ে গিয়ে প্রাণ হারান। সেটা ইতিহাস না কিংবদন্তী অত কথা আমার স্মরণ নেই।

তার সঙ্গে তুলনা করতে পারি একালের একটি চমকপ্রদ ঘটনার। আমরা যখন আকাশের দিকে হাঁ করে তাকিয়ে আমাদেরি তৈরি উপগ্রহ 'আপেল' সম্বন্ধে খোঁজখবর নিচ্ছি তখন আমাদের কানে খবর আসে তামিলনাড়ুর মীনাক্ষীপুরম্ গ্রামের হরিজনরা সদলবলে হিন্দুসমাজ থেকে মহানিষ্ক্রমণ করেছে। তারা

খ্রীস্টানও হয়নি, বৌদ্ধও হয়নি, মার্কসবাদী নাস্তিকও হয়নি, হয়েছে আরবী নাম গ্রহণ করে মুসলমান। দেখা হলে বলছে, "সালাম আলায়কুম"। ছেলেরা কোর্তা পায়জামা পরছে, মেয়েরা পর্দার আড়ালে থাকছে। সবাই পাঁচ ওক্ত নামাজ পড়ছে। গ্রামের মাঝখানে মসজিদ উঠছে। দাড়ি গোঁফ গজিয়ে ওরা এখন অন্য এক 'রেস'। এর পরে শোনা যাবে অন্য এক 'নেশন'। সংখ্যা আপাতত সাতশো আটশো, কিন্তু অন্যান্য গ্রামের হরিজনরাও যদি ওদেরই পথ ধরে তবে দশ বিশ বছর পরে রব উঠবে, চাই আর একটি হোমল্যাণ্ড। দক্ষিণ পাকিস্তান। তার মানে আরো একবার দেশভঙ্গ। বহু লোক কোতল। বহুতর শরণার্থী। ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি।

আমাদের দেশটা কি তা হলে একটা আপেলবোঝাই ঠেলাগাড়ী, যা একটু চাপ বাড়লে বা কমলে উলটিয়ে যায়? ইংরেজীতে যাকে বলে অ্যাপল কার্ট। এই যে আমরা ষাট থেকে সত্তর কোটি মানুষ চেপে বসেছি, কিসের ভরসায় গড় গড় করে এগিয়ে যাচ্ছি, যদি পথের মাঝখানে গাড়ী যায় উলটিয়ে, ছিটকে পড়ে কয়েক কোটি মানুষ, তাদের কয়েক লক্ষ গড়াগড়ি যায়? এটা শুধু হিন্দুসমাজের ঘরোয়া ব্যাপার নয়, ভারতীয় নেশনেরও ঘরোয়া ব্যাপার। শুধু হিন্দুসমাজ নয়, ভারতীয় নেশনও লণ্ডভণ্ড হতে পারে। যেমন আমেরিকার নিগ্রোরা পাইকারিহারে মুসলমান হয়ে গেলে আমেরিকান নেশন। আমেরিকার শ্বেতাঙ্গ খ্রীস্টানদের টনক নড়েছে। নিগ্রোদের এখন আর তেমন হেলাফেলা করা হয় না। এক এক করে তাদের অভিযোগ দূর করা হচ্ছে। যথেষ্ট সম্মানও দেখানো হচ্ছে তাদের। এই তো সেদিন আমেরিকার প্রেসিডেণ্ট রেগন আর্লিংটন সামরিক গোরস্থানে শ্বেতাঙ্গ সেনাপতিদের কবরের পাশে একজন কৃষ্ণাঙ্গ সেনাপতিরও মৃতদেহ সমাহিত করার আদেশ দিলেন। এ সম্মান এই প্রথম।

কলেজে আমার ছাত্রজীবনে একজন আমেরিকান অধ্যাপকের লেখা একখানি বই আমার হাতে পড়েছিল। নিগ্রো সমস্যার একমাত্র সমাধান তাঁর মতে নিউ গিনি বা তেমনি কোনো এক দ্বীপে নিগ্রোদের জন্যে একটি উপনিবেশ স্থাপন ও সেখানে আমেরিকার নিগ্রোদের সকলের পুনর্বাসন। যেন নিগ্রোদের ইচ্ছা অনিচ্ছা সম্মতি অসম্মতি বলে কিছু নেই। তারা ক্রীতদাস বা চ্যাটেল। অথচ অধ্যাপক মহাশয় বিংশ শতাব্দীরই মানুষ, গণতন্ত্রে ও ব্যক্তি স্বাধীনতায় বিশ্বাসী। তখনো ফাসিস্ট বা নাৎসীদের বর্ণান্ধতা দেখা দেয়নি। আমি তো রীতিমতো শক পাই। আমেরিকার নিগ্রোরা সেদেশে শ্রমিকের অভাব পূরণের জন্যেই চালান হয়েছিল। শ্রমিকের অভাব কি মিটেছে? যেসব নিকৃষ্ট কাজ আর কেউ অত কম মজুরিতে করে না ও করবে না সেইসব কাজ অধ্যাপক মশায় কাকে দিয়ে করাবেন? সেই বা রাজী হবে কেন? আমেরিকার অর্থনৈতিক ব্যবস্থাও জখম হবে যদি নিগ্রোদের অন্যত্র পাঠনো হয়। শুধু অর্থনৈতিক নয়, রণনৈতিক ব্যবস্থাও। তাই নিগ্রোরা সেদেশে শিকড় গেড়ে বসেছে, পণ্ডিতদের বিপরীত মন্ত্রণাসত্ত্বেও।

আমেরিকার আদিবাসী তথাকথিত রেড ইণ্ডিয়ানদের মতো ভারতবর্ষেও

অতি প্রাচীন কাল থেকে তফশীলভুক্ত উপজাতি বলে চিহ্নিত বহুধাবিভক্ত আদিবাসী বাস করছে। এদের কতক খ্রীস্টান হয়েছে, কতক হয়েছে বৈষ্ণব, কতক বৌদ্ধ, কিন্তু অধিকাংশই ইংরেজীতে যাকে বলে অ্যানিমিস্ট। যারা হিন্দু বলে পরিচয় দিচ্ছে তারা ট্রাইব বলে গণ্য, কাস্ট বলে নয়। তবে তফশীলভুক্ত কাস্ট বলে যাদের পরিচিতি তাদের কতক হয়তো আগে ছিল ট্রাইব, পরে হয়েছে কাস্ট। রোম যেমন একদিনে গঠিত হয়নি হিন্দুসমাজও তেমনি এক-আধ হাজার বছরে গঠিত হয়নি। আর্যভাষীরাও একদা ট্রাইব বলে বিদিত ছিল। আর্যভাষীদের সমাজও ছিল আদিতে ট্রাইবাল সমাজ। বিংশ শতাব্দীতে আর্যভাষীদের আর্যজাতি অভিহিত করা হয়। পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতদের এই ভ্রান্তি থেকে নাৎসীদের আর্যরক্তের বিশুদ্ধিতার দম্ভ। আর আমাদের পণ্ডিতদের আর্যত্বের অভিমান। তাঁরা ধরে নেন যে 'আর্যাবর্ত' ছিল আর্য নামক একটি 'রেস' কর্তৃক অধ্যুষিত একটি দেশ। কিন্তু তার সীমানা তো তিন দিকে সাগর ও চতুর্থ দিকে পর্বতবেষ্টিত ছিল না। তার বাইরে যারা ছিল তাদের তো অন্য দেশ। এতে আমাদের একদেশতত্ত্ব জোরদার হয় না। একজাতিতত্ত্বও না। অথচ সবাই জানে যে আর্যভাষাগুলির পরিধি আরো ব্যাপক। আফগানিস্থানে, ইরানে, জর্জিয়ায়, মূল রাশিয়ায়, ইউরোপের অধিকাংশ দেশে আর্যভাষাগুলির অবস্থান। তাও অন্তত তিন হাজার বছর ধরে। ইদানীং ইউরোপীয় পণ্ডিতরা 'আর্যজাতির' অস্তিত্ব অস্বীকার করছেন। ভাষা আর রক্ত এক জিনিস নয়। ভাষা থেকে জাতি বিচার করা যায় না। এটা তো জাজ্বল্যমান সত্য যে বাংলাভাষা বাঙালী মুসলমানদেরও মাতৃভাষা। ভাষার নিরিখে তারাও আর্য, কিন্তু রক্তের নিরিখে তারা আরব, ইথিওপীয়, ইরানী, তুরানী, মুঘল অর্থাৎ মঙ্গোলদের সঙ্গে মিশ্রিত। বাঙালী হিন্দুরা যে নৈকষ্য আর্য নয় তাও আজকাল সকলেই মানেন। জাতিহিসাবে তারাও মিশ্র। আর্যের চেয়ে দ্রাবিড়ের ভাগই বেশী। অস্ট্রিক ভাগটাও কম নয়।

হিন্দুদের সমাজগঠন কোনো একটা ফরমুলা ধরে হয়নি। ধর্মবিশ্বাস অনুসারে তো নয়ই। আসামের অহোমরা, ত্রিপুরার টিপারিরা বিগত সাত শতকের মধ্যেই হিন্দুসমাজভুক্ত হয়েছে। মণিপুরীদের বেলাও সেকথা খাটে। রাজারা বৈষ্ণব বা শাক্ত দীক্ষা নেবার পর ক্ষত্রিয় বলে গণ্য হন। অন্যান্যদের জন্যে এক একটি জাত অর্থাৎ কাস্ট নির্দিষ্ট হয়ে যায়। সাধারণত বৃত্তি অনুসারেই জাত বা কাস্ট। কখনো কারো মাথায় আসেনি যে কতকগুলি জাতকে পরে একসময় তফশীলভুক্ত করা হবে। কোচ ট্রাইবের থেকে সম্ভূত রাজবংশীরাও হবে তফশীলভুক্ত। মহাত্মা গান্ধীর ভাষায় 'হরিজন'। নামে কী আসে যায়? নামকরণের সময় যে যেখানে ছিল সে সেইখানেই রয়েছে। যেমন রাষ্ট্রের চোখে তেমনি সমাজের চোখে। সমাজ কাউকে প্রমোশন দিয়ে বর্ণহিন্দু করেনি, যদিও রাষ্ট্র প্রমোশন দিয়ে পিয়নকে কেরানী ও কেরানীকে অফিসার করেছে। আসলে এটা হিন্দুসমাজেরই মাথাব্যথা, ভারতরাষ্ট্রের নয়, কারণ ভারত রাষ্ট্র হচ্ছে ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র। একটা নির্দিষ্ট সময়ের জন্যে তফশীলভুক্ত কাস্ট

ও ট্রাইবদের জন্যে আইনসভায় আসন সংরক্ষণের ও সরকারী চাকরিতে পদ সংরক্ষণের ব্যবস্থা আছে। সময়সীমা বার বার বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে, কিন্তু বরাবর বাড়িয়ে দেওয়া যাবে না। সেটা একটা চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত নয়। অথচ হিন্দুসমাজের বর্ণাবর্ণ ব্যবস্থা হচ্ছে স্বয়ং ব্রহ্মার সৃষ্টি। কার সাধ্য তার পরিবর্তন করে! একজন 'হরিজন' যদি বর্ণহিন্দু হতে চায় তবে তাকে প্রথমত পুনর্জন্মে বিশ্বাস করতে হবে, তার পর পুনর্জন্মের জন্যে পুণ্যসঞ্চয় করতে হবে, তার পর মরতে হবে, তার পর আবার জন্মাতে হবে। তাও একবার নয়, বহুবার।

হিন্দুধর্ম হাজার উদার হলেও নিম্নতম জাতের মানুষকে ইহজন্মে উন্নততর মর্যাদার আশাভরসা দেয় না। উল্টে উচ্চতম জাতের মানুষকে ভয় দেখায় তাকে এইজন্মেই পতিত করা হবে, তার পুত্রপৌত্রদেরও। স্বর্গীয় প্রফুল্লকুমার সরকার আমাকে বলেছিলেন, "জানো তো, বাঘে ছুঁলে আঠারো ঘা। পিরালী বামুনের মেয়েকে যে বিয়ে করবে সেও পিরালী হবে, তাদের বংশের প্রত্যেককে পিরালী করা হবে, তাদের যারা বিয়ে করবে তারাও পিবালী হবে, তাদের বংশের প্রত্যেকেই হবে পিরালী।" জগৎ কবিসভায় মর্যাদার আসন পেলেও স্বদেশের ব্রাহ্মণসমাজে বিশ্বকবির মর্যাদা একতিলও বৃদ্ধি হয়নি। এ বেদনা তিনি আজীবন বহন করে গেছেন। অন্যে পরে কা কথা! তবে এই শতাব্দীতে একটা সহজ উপায় আবিষ্কৃত হয়েছে। উপবীত ধারণ করে বৈদ্যরা বলছেন ওঁরা ব্রাহ্মণ, কায়স্থরা বলছেন ওঁরা ক্ষত্রিয়, সাহারা বলছেন ওঁরা বৈশ্য, ওঁদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে গয়লারা হয়েছেন যদুবংশীয় ক্ষত্রিয় অর্থাৎ যাদব, নাপিতরা নৈব্রাহ্মণ, ছুতোররা বিশ্বকর্মা ব্রাহ্মণ, আগুরিরা উগ্রক্ষত্রিয়, বাগদীরা ব্যগ্রক্ষত্রিয়, পোদরা পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়। নমঃশূদ্রদের পুরোহিতরা বাঁড়ুয্যে চাটুয্যে লাহিড়ী বাগচী পদবী ধারণ করছেন। তাঁরাও ব্রাহ্মণ। অথচ তফশীলভুক্ত।

তাই বাংলাদেশে মুসলমান হওয়ার হিড়িক থেমে গেছে। আমাদের ছেলেবেলায় কিন্তু প্রায়ই কাগজে বেরোত অমুক গ্রামের নমঃশূদ্ররা জাতকে জাত ইসলাম গ্রহণ করেছে। কারণ হিন্দু থাকলে ধোপা তাদের কাপড় কাচবে না, নাপিত তাদের ক্ষৌরি করবে না। মুসলমান হলে সেই ধোপাই আর সেই নাপিতই তাদের প্রয়োজন মেটাবে। তাতে কোনো ধোপার জাত যাবে না, কোনো নাপিত সমাজচ্যুত হবে না। হিন্দুসমাজ যেন প্রকারান্তরে বলছে তথাকথিত ছোট জাতের লোককে মুসলমান খ্রীস্টান হয়ে ধোপা নাপিতের সাহায্য পেতে। এমনি করে কত লোক যে স্বেচ্ছায় ধর্ম বদল করেছে তার লেখাজোখা নেই। পৈতে নেওয়া চালু হওয়ার পর এটা বন্ধ হয়েছে। এতে পুনর্জন্মের ফল ইহজন্মেই পাওয়া যাচ্ছে। মহাত্মা যাই বলুন লোকে হরিজনকে তেমন শ্রদ্ধা করে না উপবীতধারীকে যেমন করে। তারা তফশীলভুক্ত কি না খোঁজ করে না। পদবীগুলোও তারা পাল্টে দিয়েছে। মুখ দেখেও চেনা যায় না কে কী। লক্ষ লক্ষ লোক কায়স্থ বলে সেনসাস রিপোর্টে সুমারি হয়েছে। অনেকেই দাস থেকে দে, দে থেকে চৌধুরী। বহু লোক হয়েছে রায়। সাহাকে আমি রায় হতে

দেখেছি। একটা অ্যাফিডেফিটই যথেষ্ট। জন্মান্তরের কী দরকার?

মীনাক্ষীপুরমের অস্পৃশ্যদের স্পৃশ্য করতে পারলে তারা হয়তো ইসলাম কবুল করত না। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে স্পৃশ্যের অধিকারও দিতে হতো। তারা সমকক্ষের মতো মাথা উঁচু করে রাজপথ দিয়ে হাঁটত, কাউকে হেঁট হয়ে প্রণাম করতে হতো না, কারো পায়ের ধুলো নিতে হতো না। ঘোড়ায় চড়তে পারত, সাইকেলে চড়তে পারত, সাধারণ কুয়ো থেকে জল তুলতে পারত, পুষ্করিণীতে স্নান করতে পারত, সাধারণ স্কুলে একই বেঞ্চে বসতে পারত। হাসপাতালে পাশাপাশি বেডে শুতে পারত, মন্দিরে অবাধ প্রবেশ পেতো, ভোজনাগারে সমান আসন পেতো। কিন্তু নিম্নতম বৃত্তির জন্যে সমাজের কতক লোককে যদি চিরকাল নির্দিষ্ট করা হয় আর তাদের পারিশ্রমিকও চিরকাল স্বল্পতম হয় তবে তাদের মানমর্যাদাও হবে চিরকাল সবার নীচে ও সবার পিছে। উপবীত ধারণেও এর প্রতিকার হবে না। হতে পারে ইসলাম বরণে। খ্রীস্টানরাও উচ্চনীচ ভেদ মানে। মানে না মুসলমানরা। তবে বিয়ে সাদীর বেলা মুসলমানরাও বাছবিচার করে। মীনাক্ষীপুরমের নয়া মুসলমানদের নসীবে এ শিক্ষা বাকী আছে। বাধ্য হয়ে নিকটসম্পর্কীয় ভাইবোনের সঙ্গে বিয়ে দিতে হবে।

ভারতবর্ষের একটা বৈশিষ্ট্যই হলো এই যে, এদেশে হিন্দুই হোক আর মুসলমানই হোক আর খ্রীস্টানই হোক আর শিখই হোক, বৌদ্ধই হোক আর জৈনই হোক বিয়ে সাদীর বেলা যে যার জাত মেনে চলে। অর্থাৎ রাজপুত মুসলমান জাট মুসলমানকে বিয়ে করবে না, চাষী মুসলমান তাঁতী মুসলমানকে বিয়ে করবে না, যদিও তার নতুন নাম মোমিন। মারা যাবার আগে বাপ তার ছেলেকে ডেকে তার কানে কানে বলে, "মনে রাখিস আমাদের অমুক গোত্র।" একই ব্যাপার ভারতীয় খ্রীস্টান সমাজেও। শিখ সমাজেও। বৌদ্ধ সমাজেও। জৈন সমাজেও। এক বাঙালী লেখিকার উপন্যাসে পড়েছি নবদীক্ষিত খ্রীস্টানরা বলছে, "আমরা ধর্ম দিয়েছি, কিন্তু জাত দিইনি।" জাত বা কাস্ট এদেশে ধর্মের চেয়েও প্রবলতর শক্তি। এ সত্য যারা জানে না তারা এদেশের সম্বন্ধে কিছুই জানে না। আমাদের এক বাঙালী বন্ধুর জার্মান পত্নীর মুখে শুনেছি তাঁর বাবা ছিলেন মালাবারের এক জার্মান প্রটেস্টাণ্ট মিশনারী। স্পৃশ্য খ্রীস্টান আর অস্পৃশ্য খ্রীস্টানের মধ্যে পার্থক্য করতেন না বলে স্পৃশ্য খ্রীস্টান মহলে তিনি অপ্রিয় হন। মিশন থেকে তাঁর উপর চাপ আসে, যস্মিন্ দেশে যদাচারঃ। পার্থক্য তাঁকে মানতেই হবে, নইলে খ্রীস্টধর্মের প্রচার ব্যাহত হবে। তিনি বলেন এটা তাঁর বিবেকবিরুদ্ধ, তাই কর্মে ইস্তফা দেন। এক কপর্দকও ঘরে ছিল না, দেশে ফিরে যাবার পাথেয়ও না। তবু তিনি অটল। কাল তিনি কী খাবেন ও পরিবারকে খাওয়াবেন তা তিনি জানতেন না। কিন্তু প্রতিদিন ভোরে উঠে দেখতেন কে বা কারা তাঁর দোরগোড়ায় রেখে গেছে একঝুড়ি ফলমূল রুটি পনীর। দক্ষিণ ভারতে আজ পর্যন্ত এ সমস্যার সমধান হয়নি, তাই যারা হিন্দু-সমাজ ত্যাগ করতে চায় তারা খ্রীস্টান না হয়ে মুসলমান হয়। মীনাক্ষীপুরমেরই কয়েকটি খ্রীস্টান পরিবার নাকি মুসলমান হয়ে গেছে। কিন্তু ধর্ম পরিবর্তন

করলে কী হবে, যে যার জাত আঁকড়ে ধরে থাকবে, বিয়েসাদীর বেলা মনে রাখবে।

বছর ষাটেক আগে হিন্দুসমাজের টনক নড়ে। আর্যসমাজীরা মালকানা রাজপুতদের ইসলামের কোল থেকে ফিরিয়ে আনে। সেসময় যে অনুষ্ঠান হয় তাকে বলা হয় শুদ্ধি অনুষ্ঠান। তার মানে ওরা এতদিন অশুদ্ধ বা অপবিত্র ছিল, এখন আবার শুদ্ধ হলো, পবিত্র হলো। এতে মুসলমানদের আঁতে ঘা লাগে। তাঁরা অপমান বোধ করেন। তাঁদের ধারণা ছিল তাঁরাই পাক অর্থাৎ পবিত্র, অন্যেরা না-পাক, অপবিত্র। শেষপর্যন্ত এর জের গড়ায় পাকদের জন্যে পাকিস্তান হাসিলে। শুদ্ধি আন্দোলন বাধা পায় কতকটা স্বামী শ্রদ্ধানন্দের নিধনের জন্যে, কতকটা তার চেয়ে গভীরতর কারণে। ধর্মান্তরিত রাজপুতেরা না হয় রাজপুত জাতে ফিরে আসতে পারল, কিন্তু ধর্মান্তরিত জেলে, ধোপা, বাগদী, বাউরি, ভুঁইমালী, কাপালীরা শুদ্ধ হয়ে ফিরে আসবে কোন জাতে? হিন্দুজাত বলে তো কোনো জাত নেই। হিন্দুসমাজ বলে যা আছে তা দু'তিন হাজার জাতের একটা শিথিল ফেডারেশন। শুদ্ধির পরে যদি চামার আবার চামার হয়, হাড়ি আবার হাড়ি হয়, ডোম আবার ডোম হয় আর তাদের বৃত্তিও হয় আগেব মতো নীচ আব উপার্জনও তেমনি সামান্য তবে তাদের হীনতা গেল কোথায়, দীনতা গেল কোথায়? ব্রাহ্মণও স্বধর্মে ফিরে এসে মেয়ের জন্যে পাত্র পায় না, কায়স্থও তাই। মুসলমান থাকলেই বরং মেয়ের বরও জুটত, ছেলের চাকরিও জুটত।

আবার শুদ্ধির ঢেউ উঠেছে। নয়া মুসলমানদের ফিরিয়ে আনা হচ্ছে। কিন্তু ফিরে এসে তারা যদি তেমনি হীন ও তেমনি দীন থেকে যায় তবে এ ঢেউটাও মিলিয়ে যাবে। একমাত্র প্রতিকার একপ্রকার না একপ্রকার সমাজ-বিপ্লব, তা সে মার্কসের প্রেরণাতেই হোক আর গান্ধীর প্রেরণাতেই হোক। জন্মান্তরবাদেরও নতুন ব্যাখ্যা চাই। কর্মবাদেরও। যাতে সামাজিক অন্যায় সমর্থন না পায়। যা এতদিন পেয়ে এসেছে।

'শুদ্ধি' কথাটা আমার মতে অমর্যাদাকর। যাকে তুমি শুদ্ধ করতে চাও সে কি তোমাদের চেয়ে কম শুদ্ধ? তেমনি 'পাক' কথাটাও অমর্যাদাকর। যাকে তুমি 'পাক' করতে চাও সেও কি তোমার চেয়ে কম 'পাক'? সোজাসুজি স্বীকার করতে হবে যে মানুষমাত্রেই শুচি। জন্মের দরুন বা বৃত্তির দরুন কেউ অশুচি নয়। সমাজে যদি মেথর বলে একটা বৃত্তি থাকে তবে কতক লোককে মেথর হতে হবেই। নইলে সমাজ অচল হবে। সেকালে তাদের বাধ্য করা হতো। একালে বাধ্য করা যাবে না। অর্থনীতিক পেষণ না থাকলে মানুষ আপনি সে বৃত্তি ছেড়ে দেবে। বহুক্ষেত্রে ছেড়ে দিচ্ছেও। অন্য বৃত্তি গ্রহণ করার স্বাধীনতা আগেকার দিনে ছিল না। এখনকার দিনে যার যাতে লাভ সে তেমন বৃত্তি অবলম্বন করছে। ব্রাহ্মণের সন্তানও জুতোর দোকানে খরিদ্দারের পায়ে জুতো পরিয়ে দিচ্ছে। আর মুচির সন্তানও নির্বাচনে জিতে মন্ত্রী হচ্ছে ও ব্রাহ্মণ-সন্তানকে দাঁড় করিয়ে রাখছে। কিন্তু এসব পরিবর্তন হিন্দুসমাজের কাঠামো

বদলে দিচ্ছে না। তার ওলটপালট ঘটাচ্ছে না। বিপ্লব মানে আর কিছু নয়, ওলটপালট। প্রধানমন্ত্রী হলেও বাবু জগজীবন রাম তাঁর স্বগ্রামে গিয়ে ব্রাহ্মণ বা ক্ষত্রিয়ের মর্যাদা পাবেন না, দারোগারা তাঁকে সেলাম ঠুকবে, কিন্তু ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়রা তাঁকে প্রণাম করবেন না, তাঁর সঙ্গে ও তাঁর স্বজাতির সঙ্গে সামাজিক অনুষ্ঠানে পঙ্‌ক্তি ভোজনে বসবেন না। অন্তর্বিবাহ তো দূরের কথা। শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী কাশ্মীরী ব্রাহ্মণকন্যা। কিন্তু পারসীকে বিবাহ করার ফলে তাঁর স্বজাতির সামাজিক অনুষ্ঠানে তাঁকে শুনেছি ঘরের বাইরে আসন দেওয়া হতো। আজকাল কী হয় জানিনে। তবে হিন্দুসমাজকে ধন্যবাদ দিতে হবে, তাঁর পুত্রদ্বয়কে হিন্দু বলেই স্বীকার করা হয়। সেটা বোধহয় তাঁদের রাজনৈতিক প্রভাবের দরুন। নয়তো ওঁরা ম্লেচ্ছ বা যবন বংশধর।

বিপ্লব না হোক, বিবর্তন তো হচ্ছে। চার বর্ণের স্থান নিচ্ছে চার শ্রেণী। বৃত্তি অনুসারে নয়, বিত্ত অনুসারে। উচ্চবিত্ত, মধ্যবিত্ত, নিম্নবিত্ত, বিত্তহীন। এই শ্রেণীভিত্তিক সমাজেও তথাকথিত হরিজনরা সাধারণত সবার নীচে ও সবার পিছে। এই দীনতা কি ধর্মান্তর গ্রহণ করলেই দূর হতে পারে? মুসলমানদের মধ্যেও কি বিত্তহীন বলে একটি শ্রেণী নেই? মুসলিমপ্রধান দেশগুলিতেও একইরকম বিত্তহীনতা। তেরোশ' বছর পরেও সেসব দেশের অধিকাংশ মানুষ নিম্নবিত্ত ও বিত্তহীন। হঠাৎ এদের কয়েকটি দেশের মাটিতে পেট্রোলিয়ম আবিষ্কৃত হয়েছে বলে বিদেশ থেকে সমৃদ্ধির জোয়ার এসেছে, কিন্তু বিশ ত্রিশ বছরের মধ্যে পেট্রোলিয়ম নিঃশেষ হলে সমৃদ্ধিতে ভাঁটা পড়বে। জোয়ার বা ভাঁটা কোনোটাই ধর্মের উপর নির্ভর করে না। ধর্মকে এর মধ্যে টেনে আনার কী সার্থকতা? তবু বহুলোকের ধারণা মুসলমান বলেই আরবরা ধনী, অতএব মুসলমান হলেই হরিজনরাও ধনী হবে। এ ধারণা যদি তাদের মনে জন্মিয়ে থাকে তবে তাদের নসীবে আছে মোহভঙ্গ। ইরানের তথাকথিত ইসলামী বিপ্লবও ভারতের মুসলমানদের মনে আরো এক ধারণার জন্ম দিয়েছে। যারা ভারতরাষ্ট্রের সংখ্যালঘু হয়ে সুখ সমৃদ্ধির স্বাদ পাচ্ছে না তারা ভাবছে ভারতেও সেই ধরনের একটা ইসলামী বিপ্লব ঘটলে তাদেরও বরাত ফিরে যাবে। এদেরও একদিন মোহভঙ্গ হবে। বিপ্লব যদি কখনো ভারতের মাটিতে ঘটে তবে তা ধর্মের নামে ঘটবে না, ঘটলে বহুধা বিভক্ত হয়ে ব্যর্থ হবে। সার্থক বিপ্লবের অবশ্য প্রয়োজনীয় শর্ত ধর্মনিরপেক্ষ সমদর্শিতা। সেটা ইরানে অবহেলিত। রাজতন্ত্রের উচ্ছেদ সাধন করতে ইসলামের কাছ থেকে নৈতিক বল সংগ্রহ করার প্রয়োজন ছিল, সেদিক থেকে সে বিপ্লব সার্থক। ইসলামের ভূমিকা ওই পর্যন্তই। বাকীটা পেট্রোলের মহিমা। তাতেও একদিন টান পড়বে। তখন রাজতন্ত্রের যে গতি মোল্লাতন্ত্রেরও সেই গতি।

সংহতির সংকট

ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি সব সময় হয় না। কখনো কখনো হয়। প্রথম মহাযুদ্ধের পর ব্রিটিশ সরকার আইরিশ নেতাদের স্বায়ত্তশাসন দিতে স্বীকৃত হন। সারা আয়ারল্যাণ্ডকে শাসন করবে ডাবলিনে অবস্থিত একচ্ছত্র সরকার। এমন সময় উত্তর আয়ারল্যাণ্ডের প্রটেস্টাণ্ট সম্প্রদায়ের নেতারা বিদ্রোহের হুমকি দেন। কিছুতেই তাঁরা ক্যাথলিক মেজরিটির শাসন মেনে নেবেন না। তাঁদের প্রস্তাব আয়ারল্যাণ্ডকে দু'ভাগ করা হোক। একভাগ পাবে উত্তর আয়ারল্যাণ্ডের প্রটেস্টাণ্ট মেজরিটি। আরেক ভাগ অবশিষ্ট আয়ারল্যাণ্ডের ক্যাথলিক মেজরিটি। উত্তর আয়ারল্যাণ্ড ব্রিটিশ সরকারের ছত্রাধীনে আলাদা একটি সরকার গঠন করবে। বেলফাস্ট তাদের রাজধানী। তাদের প্রতিনিধিরা ব্রিটিশ পার্লামেণ্টে বসতে পারবেন। নিজেদের বিধানসভাতেও।

বিদ্রোহ এড়াবার জন্যে ব্রিটিশ কর্তারা আইরিশ জাতীয়তাবাদী নেতাদের সঙ্গে আবার কথাবার্তা চালান। নেতাদের বলা হয় যে তাঁরা যদি উত্তর আয়ারল্যান্ডের উপরে দাবি ছেড়ে দেন তবে তাঁরা স্বায়ত্তশাসনের চেয়ে আরো বেশী পাবেন। সর্বময় ক্ষমতা তাঁদের হবে। ব্রিটেন হস্তক্ষেপ করবে না। এলাকার দিক থেকে কম পড়বে, ক্ষমতার দিক থেকে বাড়বে। আইরিশ ফ্রী স্টেট যে-কোনো স্বাধীন রাষ্ট্রের তুল্য হবে। গৃহযুদ্ধের মুখোমুখি হয়ে আইরিশ জাতীয়তাবাদী নেতারা সেই প্রস্তাবে সম্মতি দেন। আয়ারল্যাণ্ড স্বাধীনও হয়, বিভক্তও হয়। ডি ভালেরা প্রমুখ চরমপন্থী এর বিরোধিতা করলেও জনমত এই মর্মে মিটমাট সমর্থন করে। গৃহযুদ্ধের জন্যে জনসাধারণ প্রস্তুত ছিল না। গৃহযুদ্ধ বাধলে ব্রিটেন নিশ্চয়ই উত্তর আয়ারল্যাণ্ডের প্রটেস্টাণ্টদের মদত দিত। জাতীয়তাবাদীদের দুই শত্রুর সঙ্গে লড়তে হতো। পরাজয় ধ্রুব। আইরিশ স্বাধীনতা সংগ্রামের জের কতকাল চলত কে জানে! অধিকাংশ নাগরিক ক্লান্ত। অধিকাংশ নেতা ক্লান্ত ঘোড়ার সওয়ার হয়ে কতদূর যেতেন? অক্লান্ত যারা তারা আজকেও অক্লান্ত। যদিও কেটে গেছে ষাট বছর। এখনো সফল হননি। অস্ত্র আছে, পেছনে জনবল নেই। সন্ত্রাসবাদী আক্রমণের দ্বারা উত্তর আয়ারল্যাণ্ড দখল করা যাবে না। শুধু মানুষ মরবে।

এরই পুনরাবৃত্তি ঘটে ভারতবর্ষে। নেতারা ক্যাবিনেট মিশন স্কীম গ্রহণ করলে দেশ ও প্রদেশ অবিভক্ত থাকত। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে থাকত কেবল প্রতিরক্ষা, পররাষ্ট্রনীতি, যোগাযোগ ব্যবস্থা। স্বরাষ্ট্র থাকত না, অর্থ দফতর থাকত না, বাণিজ্য থাকত না, আইন থাকত না। নিচের তলায় প্রদেশগুলি তিনটি সারিতে বিন্যস্ত হতো। গ্রুপগুলি অর্ধস্বাধীন। যে যার নিজস্ব মুদ্রা চালাত, আমদানী রফতানির শুল্ক আদায় করত, আভ্যন্তরীণ ছাড়পত্র দিয়ে গমনাগমন নিয়ন্ত্রণ করত। যে যার সংবিধান রচনা করে প্রদেশের ক্ষমতা খর্ব করতে পারত। সেই ভয়টা ছিল আসামের লোকের। তিনটের মধ্যে দুটো গ্রুপ হতো মুসলিম লীগের ঘাঁটি। একটা কংগ্রেসের। উপরতলার কেন্দ্রীয় সরকার আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করতে পারত না। আর করবেই বা কী

করে ? সেটা তো কংগ্রেস সরকার নয়, কংগ্রেস-লীগ সরকার। সম্ভবত তৃতীয় আসনটি একজন শিখের। সে রকম সরকার একমত হয়ে সিদ্ধান্ত নিতে পারত না।

মুসলিম লীগ নেতারা সংবিধান সভায় যোগ দিলে হয়তো কংগ্রেস নেতাদের তাঁদের একটা ঘরোয়া আদানপ্রদান হয়ে যেত। তাঁরা কিছু ছাড়তেন, কিছু পেতেন। কংগ্রেস নেতারাও কিছু ছাড়তেন, কিছু পেতেন। দেশ তথা প্রদেশ অবিভক্তই থাকত। ভাগাভাগিটা হতো শাসনক্ষমতার ও চাকরিবাকরির। লীগ নেতারা অনুপস্থিত থাকলে কংগ্রেস একাই একটা সংবিধান রচনা করতে পারত, কিন্তু ব্রিটিশ সরকার মুসলিম লীগ নেতাদের সেটা গ্রহণ করতে বাধ্য করতেন না। কারো সঙ্গে কোনো সেটলমেন্ট না করেই ভারত থেকে বিদায় নিতেন। তখন বেধে যেত গৃহযুদ্ধ। কংগ্রেসের লক্ষ্য শান্তিপূর্ণভাবে ক্ষমতার হস্তান্তর। গৃহযুদ্ধ পরিহার করার জন্যে কংগ্রেস মাউন্টব্যাটেনের প্ল্যান গ্রহণ করে। দেশ ও প্রদেশ ভাগ হয়ে যায়। কংগ্রেস তার অংশে নিরঙ্কুশ স্বাধীনতা পায়, লীগও তার অংশে। এর পরে স্বাধীনভাবে সংবিধান রচনা করা হয়। ভারত রাষ্ট্রের সংবিধানে গ্রুপ গঠন করার প্রয়োজন ছিল না। যেসব ক্ষমতা গ্রুপগুলিতে ছেড়ে দেবার কথা সেগুলি কেন্দ্রই হাতে রাখে। প্রদেশগুলির ক্ষমতা যথাপূর্ব। দেশীয় রাজ্যগুলির অধিকাংশই ভারতীয় ইউনিয়নভুক্ত হয়। তাদের ক্ষমতাও প্রদেশের অনুরূপ হয়। প্রদেশগুলিকেও দেওয়া হয় স্টেটের মর্যাদা। এ ছাড়া থাকে কতকগুলি ইউনিয়ন টেরিটরি। তারা কেন্দ্রের দ্বারা শাসিত। রাষ্ট্রের মূলনীতি হয় ধর্মনিরপেক্ষতা। সুতরাং একই রাষ্ট্রে মুসলিমপ্রধান, খ্রীস্টান-প্রধান ও বৌদ্ধপ্রধান রাজ্যও থাকতে পারে। সে সময় শিখপ্রধান রাষ্ট্র ছিল না। পরে পূর্ব পাঞ্জাবকে কেটে কুটে শিখপ্রধান করা হয়।

দেশভাগ তথা প্রদেশভাগ কি কোনো মতেই নিবারণ করা যেত না ? যেত বইকি, কোনো পক্ষই সেটা চায়নি। না কংগ্রেস, না ইংরেজ, না মুসলিম লীগ। কিন্তু তার জন্যে দরকার ছিল ১৯১৬ সালের মতো আর-একটা কংগ্রেস লীগ চুক্তি। সেটা না হলে ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে চুক্তি হতো না। চুক্তি না হলে ইংরেজরা ভারত ছেড়ে চলে যেত ঠিকই, কিন্তু গৃহযুদ্ধ বেধে গেলে তারা বাইরে থেকে মুসলিম লীগকে মদত দিত। সমুদ্রপথেই তারা এসেছিল, সমুদ্রপথেই আবার আসত। কারো সঙ্গে কোনো রকম চুক্তি না করেই স্বাধীনতা পাব এটা ছিল একটা স্বপ্ন। স্বপ্নে আর বাস্তবে অনেক তফাৎ। মুসলিম সম্প্রদায়কে একটা ভাগ দিতে হতোই, সেটা যেভাবেই হোক। জিন্না সাহেব পাকিস্তান চাইতেন না, যদি মুসলিম লীগকে অন্যভাবে একটা ভাগ দেওয়া হতো। কংগ্রেস নেতারা অন্যভাবে দিতে রাজীও হয়েছিলেন, কিন্তু তিন-চতুর্থাংশের সঙ্গে এক-তৃতীয়াংশের নিক্তির ওজনে সমতা ইতিহাসে কেউ কোথাও দেখেনি। সেটাও একটা অবাস্তব সমাধান। স্বাধীনতার জন্যে অত বড়ো দাম দিতে হিন্দু সম্প্রদায় রাজী হতো না। তার চেয়ে দেশভাগ শ্রেয়, যদি সঙ্গে সঙ্গে প্রদেশভাগও হয়ে যায়। জিন্না সাহেবের প্রদেশভাগে আপত্তি ছিল, কিন্তু মাউন্টব্যাটেন সে আপত্তি খারিজ করেন।

মাউণ্টব্যাটেন ভিন্ন আর কোনো বড়লাটের সে ক্ষমতা ছিল না। অন্যান্য বড়লাটরা দীর্ঘকাল ভারতে থেকে দেশের লোকের মতিগতির সঙ্গে পরিচিত ছিলেন। মাউণ্টব্যাটেন নবাগত। তিনি ভাবতেই পারেননি যে পাঞ্জাবে আগুন জ্বলবে। জ্বালাবে শিখরাই আগে। লাহোর হারিয়ে তারা তেমনি উন্মাদ হয়, যেমন হতো কলকাতা হারিয়ে বাঙালী হিন্দু। পদ্মাপারে ওরাও তার বদলা নিত।

শিখদের একাংশের দাবী ছিল খালিস্থান। পাকিস্তান যদি সম্ভব হয় খালিস্থান সম্ভব হবে না কেন? মাউণ্টব্যাটেন পারলে খালিস্থানও দিতেন। কিন্তু এমন একটি জেলাও ছিল না যেখানে শিখরা সংখ্যাগরিষ্ঠ। সর্বত্র তারা সংখ্যালঘু। তাদের খালিস্থান দিলে একে তো হিন্দু বা মুসলমানকে বা উভয়কে জোর করে সরাতে হতো, তা ছাড়া পার্টিশনের মূলসূত্রটাই লংঘন করা হতো। মূলসূত্রটা ছিল যার যেখানে মেজরিটি তাকে সেই জেলা বা অঞ্চল বা প্রদেশ দেওয়া। ব্যতিক্রম কেবল মুর্শিদাবাদ খুলনা ও পার্বত্য চট্টগ্রাম। এসব জায়গায় ভূগোলের দাবী মানতে হয়।

পশ্চিম পাঞ্জাব হারিয়ে শিখরা চলে আসে পূর্ব পাঞ্জাব ও দিল্লীতে। তার ফলে কয়েকটি জেলায় তারাই হয় সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়। তখন তারা পাঞ্জাবী ভাষাকে ভিত্তি করে আলাদা একটা রাজ্য পায়। সেখানে তারা সংখ্যায় শতকরা বাহান্ন। রাজধানী হিসাবে তারা আশা করেছিল গোটা চণ্ডিগড় পাবে। কিন্তু হরিয়ানা রাজ্যের তাতে আপত্তি থাকায় চণ্ডিগড় হয় ইউনিয়ন টেরিটরি। সেখানে দুই রাজধানী পাঞ্জাবের ও হরিয়ানার। ইতিমধ্যে 'পূর্ব' কাটা গেছে। শিখদের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয় যে তারা গোটা চণ্ডিগড়ই পাবে, যদি ফাজিলকা হরিয়ানাকে দেয়। সেটা নিঃশর্ত প্রতিশ্রুতি নয়। কিন্তু অকালী শিখ নেতারা ফাজিলকা হাতছাড়া না করেই হরিয়ানাকে চণ্ডিগড় থেকে বঞ্চিত করতে চান।

আরো কয়েকটা বিতর্কিত বিষয় আছে। যেমন নদীর জলবণ্টন। কিন্তু তলে তলে কাজ করছে খালিস্থানের অচরিতার্থ বাসনা। মুসলমানরা যদি পাকিস্তান পায় শিখরা কেন খালিস্থান পাবে না? এখন তো তারা একটি রাজ্যে সংখ্যাগুরু। মুসলমানদের মতো তারাও তো একটি স্বতন্ত্র সম্প্রদায়। হিন্দুদের সঙ্গে তাদের মিল যেমন আছে অমিলও তেমনি। তারা দেবদেবী মানে না, মূর্তিপূজা করে না, তাদের শাস্ত্র হিন্দুদের শাস্ত্র নয়, হিন্দুদের শাস্ত্র তাদের শাস্ত্র নয়। ইংরেজরা তাদের স্বতন্ত্র নির্বাচনপদ্ধতি দিয়েছিল, অতিরিক্ত ওয়েটেজ দিয়েছিল। চাকরিবাকরিতেও তারা ওয়েটেজ ভোগ করেছে। সৈন্যদলের তো কথাই নেই। মিলিটারি বাজেটের একটা মোটা অংশই তাদের ভাগে পড়ত। নতুন সংবিধান স্বতন্ত্র নির্বাচনপদ্ধতি আর ওয়েটেজ তুলে দিয়েছে। সৈন্যদলেও ধর্ম দেখে নিয়োগ করা হয় না, গুণ দেখে হয়। সব রাজ্যের ও সব সম্প্রদায়ের যুবকেরা সুযোগ পায়। প্রতিযোগিতায় শিখরা কখনো জেতে, কখনো হারে। অসামরিক সার্ভিসগুলিতেও তাই। ফলে শিখদের মধ্যে অসন্তোষ। অপরপক্ষে ব্যবসাক্ষেত্রে শিখরা অপূর্ব সাফল্য লাভ করেছে। হোটেল ব্যবসায় টাটার উপর টেক্কা দিচ্ছেন ওবেরায়। দেশে বিদেশে তাঁর হোটেলগুলি ছড়ানো। যেন একটা

হোটেল সাম্রাজ্য। বেশীর ভাগ শিখই খালিস্থানের বিপক্ষে। কিন্তু হলে হবে কী, ধর্মান্ধ শিখও আছে। তারা মরতেও জানে, মারতেও জানে। পুলিশ যদি তাদের আয়ত্তে রাখতে না পারে, সৈনা পাঠাতে হবে। সৈন্যরাও যদি না পারে তবে বাধ্য হয়ে নতিস্বীকার করতে হবে। সময় থাকতে একটা রাজনৈতিক সমাধান খুঁজে বার করতে হবে। সন্ত লঙ্গোওয়াল তেমন একটা সমাধানের ইঙ্গিত দিয়েছেন। কেন্দ্রের হাতে থাকবে কেবল প্রতিরক্ষা, পররাষ্ট্রনীতি, যোগাযোগ ও অর্থদফতর। বাদবাকী দিতে হবে রাজ্য সরকারকে। সংবিধান সংশোধন না করে এটা হতে পারে না। এই মর্মে সংশোধন করলে প্রত্যেকটি রাজ্য তার সুযোগ নেবে। কেন্দ্রীয় সরকার দুর্বল হবেই।

আলীবর্দী খান্ নবাব হবার পর বাদশাহকে প্রচুর নজর পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু সেই একবারই। তার পরে ষোল বছর তিনি আর রাজস্ব পাঠাননি। তিনি সোভরেনের মতো ব্যবহার করেন। তাঁর উত্তরাধিকারী সিরাজউদ্দৌলা তাঁরই পদাঙ্ক অনুসরণ করেন। বাদশাহ যদি রাজস্ব না পান সৈন্যদের বেতন দেবেন কী করে? গুলীগোলা কিনবেন কী দিয়ে? বাংলা, বিহার, ওড়িশা রক্ষার জন্যে সৈন্য পাঠাবেন কী রসদ কিনে? সময়মতো সৈন্য পাঠালে বাদশাহী ফৌজ এসে ইংরেজ ফৌজের সঙ্গে পলাশীতে লড়তে পারত। ক্লাইভ হেরে যেতে পারতেন। সোভরেন যিনি হবেন তাঁর যদি দেশরক্ষার মুরোদ না থাকে তিনি তো যুদ্ধে হারবেনই। "মজালি কনক লঙ্কা মজিলি আপনি" সিরাজের বেলাও সত্য। ভারতরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় সরকারকে দুর্বল করলে একই পরিণাম হবে। এক এক করে প্রত্যেকটি রাজ্য নিজে মজবে ও সারা ভারতকে মজাবে।

শিখরা নাকি একাই একটা 'নেশন'। আর যেহেতু তার 'নেশন' সেহেতু তারা 'সোভরেন'। শুনে অবাক হতে হয়। কিন্তু ওরা যা বলছে অসমীয়ারাও তাই বলছে। অসমীয়ারাও নাকি একটা 'নেশন'। তারাও নাকি 'সোভরেন'। শুনে তো আমি হতভম্ব। এর পরে আসছে তেলুগুদের পালা। ওরা ভোট দিয়ে জিতিয়ে দিয়েছে 'তেলুগু দেশম্' নামক পার্টিকে। আগে ওরা আদায় করেছিল 'অন্ধ্রপ্রদেশ'। এবার দেখা যাচ্ছে 'প্রদেশ' পেয়ে তাদের মন ভরেনি। এবার চায় 'দেশ'। এর পরে চাইবে 'সোভরেন নেশন'। বাদশাহী আমলে হায়দরাবাদের নিজামও 'সোভরেন' হতে চেয়েছিলেন, তাঁর সামরিক শক্তিও ছিল। সেকালে 'নেশন' কথাটার চল ছিল না। নিজামের প্রজাদের কতক ছিল তেলুগুভাষী, কতক মরাঠীভাষী, কতক কন্নড়ভাষী। ওরাও একমত হয়ে 'নেশন' বলে দাবী করত না।

আমার ব্যক্তিগত জ্ঞান থেকে বলতে পারি জবাহরলাল ও রাধাকৃষ্ণন্ ভাষা-ভিত্তিক রাজ্যের বিপক্ষে ছিলেন। তাঁরা ছিলেন আমাদের পি. ই. এন সংস্থার সভাপতি ও উপসভাপতি। আমি যখন প্রস্তাব করি যে বিভিন্ন রাজ্যে আমাদের সংস্থার বিভিন্ন শাখা হোক ও সেসব হোক ভাষাভিত্তিক, তাঁরা ভয় করেন যে তাতে ভাষাভিত্তিক রাজ্যের দাবী জোর পাবে। আমার প্রস্তাব বানচাল হয়ে যায়। দিল্লীর সাহিত্য আকাদমিরও তাঁরাই ছিলেন সভাপতি ও উপসভাপতি।

আমি ছিলুম পরিষদ্ ও সংসদের সভ্য। যখন বলি বিভিন্ন ভাষার জন্যে আকাদমির বিভিন্ন শাখা হোক তাঁরা সে প্রস্তাবও বাতিল করেন। কারণটা একই। ভারত খণ্ড খণ্ড হয়ে যাবে। শ্রীরামুলুর অনশনে দেহত্যাগের পর জবাহরলালকে নতিস্বীকার করতে হয়। অন্য উপায় না দেখে তাঁকে মাদ্রাজ রাজ্য ভেঙে 'অন্ধ্র' গঠন করতে হয়। পরে হায়দরাবাদ রাজ্য ভেঙে তার সঙ্গে তেলুগুভাষী অঞ্চল জুড়ে দেওয়া হয়। তখন তার নাম রাখা হয় 'অন্ধ্রপ্রদেশ'। নির্বাচনে জিতে 'তেলুগু দেশম্' দলের কর্তারা এখন রাজ্য সরকারের হাতে আরো ক্ষমতা চাইছেন। তামিলনাড়ু ও কর্নাটকের শাসকদলের দলপতিরা তাঁদের সঙ্গে জোটবন্দী হচ্ছেন। উদ্দেশ্য আরো কিছু ক্ষমতা আদায়। এদিকে আমাদের পশ্চিমবঙ্গের শাসক দলও পেছিয়ে নেই। তবে এখন পর্যন্ত 'নেশন' ও 'সোভরেন' শব্দ দুটি শোনা যায়নি।

এক একটি দেশে এক একটি নেশনই থাকে, একাধিক নেশন থাকে না। স্বাধীন ভারত যদি একটি দেশ হয়ে থাকে তবে এতে একটিমাত্র নেশন আছে, তার নাম ভারতীয় নেশন। তাই যদি হয় তবে শিখরাও আলাদা একটি নেশন নয়, অসমীয়ারাও নয়, তেলুগুরাও নয়। তাদের বাসভূমি 'রাজ্য' হতে পারে, 'রাষ্ট্র' হতে পারে না। যদি হয় তবে ভারতরাষ্ট্রে ভাঙন ধরবে। ভারত হবে ইউরোপের মতো বহু রাষ্ট্রে বিভক্ত। কোনোটি ধর্মভিত্তিক, কোনোটি ভাষাভিত্তিক, কোনোটি মতবাদভিত্তিক। ইউরোপে যেটা নেই ভারতে সেটা আছে, একটা কেন্দ্রীয় সরকার। এটা যদি ভেঙে যায় তো ভারতও বিভক্ত হবে বহুসংখ্যক রাষ্ট্রে। কোনোটা ধর্মভিত্তিক, যেমন পাঞ্জাব। কোনোটা ভাষাভিত্তিক, যেমন তেলুগুদেশ। কোনোটা মতবাদভিত্তিক, যেমন পশ্চিবঙ্গ। অনেকে হয়তো বলবেন, এটাই তো স্বাভাবিক। ভারতের ইতিহাসে কেন্দ্রীয় শাসন বেশীদিন টিকতে পারেনি। না মৌর্য শাসন, না গুপ্ত শাসন, না মোগল শাসন, না ব্রিটিশ শাসন। কংগ্রেস শাসনও একই পথে যাবে। বিরোধীপক্ষের শাসনও। বলকানীকরণের সম্ভাবনা অমূলক নয়। এসব তারই পূর্বাভাস। ভাষাভিত্তিক রাজ্য গঠন করার সময় ভাবা উচিত ছিল যে রাজ্য একদিন রাষ্ট্র হতে চাইতে পারে, ভাষাভিত্তিক জাতি একদিন নেশন বলে পরিচয় দিতে পারে। এখন তো দেখা যাচ্ছে ভাষাগোষ্ঠীর নাম করে যে রাজ্য গঠন করা হলো সেখানে একটি ধর্মরাষ্ট্র স্থাপন করার উদ্যোগ চলেছে। দাঙ্গাহাঙ্গামা করে পাকিস্তান অর্জন, অনশনে প্রাণ দিয়ে অন্ধ্রপ্রদেশ অর্জন, এর পরে কি সিপাহীবিদ্রোহ বাধিয়ে খালিস্থান অর্জন?

মানতেই হবে যে পাঞ্জাব, রাজস্থান, গুজরাট, মহারাষ্ট্র, মালব, অন্ধ্র, কর্নাটক, তামিলনাড়ু, কেরল, উৎকল, বঙ্গ, আসামের ইতিহাস বরাবরই স্বতন্ত্র। অতীতের সঙ্গে এরা মনে মনে অন্বয় রক্ষা করে এসেছে। এরা যত না ভারতীয় তার চেয়ে বেশী বাঙালী বা অসমীয়া বা ওড়িয়া বা তেলুগু বা তামিল বা মরাঠা বা গুজরাটী। ব্রিটিশ আমলের আগে এটাই ছিল স্বাদেশিকতা, পরে হয় প্রাদেশিকতা। এখন এর নাম কী? আঞ্চলিকতা? নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্ত

বাংলা সাহিত্যকে আঞ্চলিক সাহিত্য বললে খাটো করা হয়। পদ্মার ওপারে এই বাংলা সাহিত্যই জাতীয় সাহিত্য। এ ভাষায় ইউনাইটেড নেশনসে বক্তৃতা দিয়েছিলেন স্বাধীন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমান। সব দেশের বাংলাদেশ দূতাবাসে এই ভাষাই ব্যবহৃত হয়। ইউরোপের উপর দিয়ে যাতা-যাতের সময় বিমানের ভিতরে ও বাইরে বিভিন্ন অবতোরণস্থলে বা আরোহণস্থলে বিমানযাত্রীদের এই ভাষাতেই বার্তা শোনানো হয়।

এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে স্টেটাসের প্রশ্ন তথা আইডেনটিটির প্রশ্ন। ভারতের বাঙালীরা আর পাঞ্জাবীভাষী শিখরা এটা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করে। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় একবার আমাকে বলেছিলেন, "জানেন, ভারতীয় দূতাবাসে হিন্দী ছাড়া আর কোনো ভারতীয় ভাষার পত্রিকা রাখে না? বিদেশীরা আর কোনো ভাষার কথা জানতে পায় না?" হিন্দীকে অত বেশী প্রাধান্য দিলে তার প্রতিক্রিয়া সংহতি বিপন্ন করবে, তার লক্ষণ স্পষ্ট। রাজনৈতিক সমাধানের কথা চিন্তা করতে হবে।

গান্ধী জীবিত থাকলে বোধ হয় সন্ত লঙ্গোয়ালকে সমর্থন করতেন। তিনিও কেন্দ্রকে এত বেশী ক্ষমতা দেবার পক্ষপাতী ছিলেন না। বিকেন্দ্রীকরণই ছিল তাঁর আদর্শ। কংগ্রেস নেতারা কিন্তু তাঁর সঙ্গে একমত ছিলেন না। আমেরিকার প্রতিষ্ঠাতা পিতাদেরও আদর্শ ছিল বিকেন্দ্রীকরণ। কিন্তু ক্রমে ক্রমে প্রেসিডেণ্টের ক্ষমতা বেড়েছে। তবে তিনি যতই শক্তিশালী হোন না কেন, ক্ষুদ্রতম অঙ্গরাজ্যের উপর রাষ্ট্রপতি শাসন চাপিয়ে দিতে পারবেন না। যেটা এদেশে বার বার হয়েছে ও প্রত্যেকটি রাজ্যের উপর খাঁড়ার মতো ঝুলছে। সব জেনেশুনেও অনেকে এদেশে প্রেসিডেনশিয়াল সীস্টেম প্রবর্তন করতে চান। যেহেতু রাষ্ট্রপতি দ্য গল সেটা ফ্রান্সে প্রবর্তন করে গেছেন। খেয়াল রাখেননি যে একদিন তার সুযোগ নেবেন বিপরীত মতবাদী মিতেরঁ। প্রধানমন্ত্রীকে অনাস্থা প্রস্তাব পাশ করিয়ে সরানো যায়, কিন্তু রাষ্ট্রপতিকে সরানো ঢের বেশী কঠিন। ফ্রান্সে ভারতের মতো অঙ্গরাজ্য নেই। থাকলে দ্য গলের পক্ষে প্রেসিডেনশিয়াল সীস্টেম প্রবর্তন করা অত সহজ হতো না। হিটলার সেটা করেছিলেন গায়ের জোরে। আইনের জোরে নয়। ভোটের জোরে নয়। ওটাকে একটা সীস্টেম বলা চলে না। হিটলারও গেছেন, পশ্চিম জার্মানীতে কেন্দ্রী-করণও গেছে।

প্রয়োজন হলে ক্ষমতার পুনর্বণ্টন করতে হবে। যথাসম্ভব বিকেন্দ্রীকরণ করতে হবে। তা বলে আলীবর্দি খানের মতো নবাবের সুবিধার জন্যে নয়। আলীবর্দি কি জানতেন যে তাঁর উত্তরাধিকারী সঙ্কটকালে বাদশাহের সাহায্য না পেয়ে যুদ্ধে হারবেন? ভারতের রাষ্ট্রপতির বা প্রধানমন্ত্রীর সাহায্য না পেলে পশ্চিমবঙ্গে আবার সে রকম ব্যাপার ঘটতে পারে। অতিমাত্রায় কেন্দ্রী-করণ যেমন ভয়াবহ অতিমাত্রায় বিকেন্দ্রীকরণও তেমনি। পরিমিত ক্ষমতার উপর আরো কিছু ক্ষমতা বাড়িয়ে নিতে পারো, কিন্তু বাদশাহী আমলের পুনরাবৃত্তি করে নয়। সম্প্রতি আমার হাতে পড়েছে সমসাময়িক ঐতিহাসিক

য়ুসুফ আলী খানের ফার্সী কেতাব 'তারিখ-ই বাঙ্গালা-ই মহাবতজঙ্গী' গ্রন্থের ইংরেজী অনুবাদ। অনুবাদক মৌলানা আজাদ কলেজের অধ্যাপক ডক্টর আবদুস সুভান। কলকাতা জয় করে সিরাজউদ্দৌলা একটি ক্ষুদ্র কক্ষে শত-খানেক ফিরিঙ্গীকে অবরুদ্ধ করেন। প্রায় সব ক'জনই দম বন্ধ হয়ে মারা যায়। এটা সিরাজের ইচ্ছাকৃত নয়। অধীনস্থ কর্মচারীর অজ্ঞতার ফল। একবছরের মধ্যেই ইংরেজরা পলাশীতে প্রতিফল দেয়। অন্ধকূপ হত্যা না ঘটলে পলাশীও ঘটত না। কলকাতা বিজয়ই নবাবের কাল হলো। অন্ধকূপ হত্যাকে মিথ্যা বলে উড়িয়ে দিয়ে লাভ নেই। এ গ্রন্থের বাংলা তর্জমা হওয়া উচিত।

মাথার উপর কেন্দ্রীয় সরকার না থাকলে কী হয় তা তো আমরা পাকিস্তানে ও বাংলাদেশে দেখছি। গায়ের জোরে ক্ষমতা দখল করেছেন দু'দিকে দু'জন সেনাপতি। গণতন্ত্র ফিরিয়ে দেবার লেশমাত্র ইচ্ছা নেই। গণতন্ত্রের জন্যে সংগ্রামে বহু লোককে প্রাণ বিসর্জন করতে হবে। এর কোনো দরকারই হতো না যদি ওরা একই ফেডারল গভর্নমেন্টের সামিল হয়ে থাকত। সে গভর্নমেন্টে তাদেরও প্রতিনিধি থাকতেন। ভারতীয় ইউনিয়নকেও দ্ব্যর্থহীন ভাবে ফেডারশনে রূপান্তরিত করতে হবে। সেটা এই ছত্রিশ বছরেও সম্ভব হয়নি। আমরা আশা করব যে অবিলম্বে সম্ভব হবে।

বিচ্ছিন্ন হবার দাবী

'বিচ্ছিন্নতা' কথাটি ইতিপূর্বে 'এলিয়েনেশন' প্রসঙ্গে ব্যবহৃত হয়েছে। ঐ একই শব্দ এখন 'সিসেসন' প্রসঙ্গে ব্যবহার করা কি সঙ্গত? তাই আমি একটু ঘুরিয়ে ফিরিয়ে লিখছি 'বিচ্ছিন্ন হবার দাবী'?

ছেলেবেলায় আমরা পড়েছি ইংলণ্ড, স্কটল্যাণ্ড, ওয়েলস ও আয়ারল্যাণ্ড মিলে একটাই রাজ্য। তার রাজা পঞ্চম জর্জ। বড়ো হয়ে দেখলুম আয়ার-ল্যাণ্ডের তিনভাগের উপর আলাদা হয়ে গেছে। রাজার উপাধি কিং অব গ্রেট ব্রিটেন অ্যাণ্ড নর্দার্ন আয়ারল্যাণ্ড। সম্প্রতি স্কটল্যাণ্ড থেকে আলাদা হয়ে যাবার দাবী উঠেছে, কিন্তু স্কটদের মধ্যেই দুই মত। একমত হলে ওরাও আলাদা হয়ে যেতে পারে। ওয়েলসেও অনুরূপ আন্দোলন চলেছে। কিন্তু ওইটুকু দেশ আলাদা হয়ে গেলে মুশকিলে পড়বে। নর্দার্ন আয়ারল্যাণ্ডে গোল-মাল চলছে। ক্যাথলিক মাইনরিটি চায় অখণ্ড আয়ারল্যাণ্ড। প্রটেস্টাণ্ট মেজরিটি নারাজ। অখণ্ড আয়ারল্যাণ্ডে তারা মাইনরিটি। দু'পক্ষের ঝগড়া কিছুতেই মিটছে না। পাহারা দিচ্ছে ব্রিটিশ আর্মি। কতদিন দেবে কে জানে! আধুনিক পাশ্চাত্ত্য দেশেও ধর্ম অনুসারে রাজ্য ভাগ হয়।

বেলজিয়ামের সৃষ্টি হয়েছিল নেদারল্যাণ্ডস যখন ধর্ম অনুসারে ভাগ হয়ে যায়। প্রটেস্টাণ্টদের দেশ হয় হল্যাণ্ড আর ক্যাথলিকদের দেশ বেলজিয়াম। এখন বেলজিয়ামের ক্যাথলিকদের মধ্যেই ভাষা অনুসারে ভাগের দাবী উঠেছে। ফ্লেমিশ যাদের মাতৃভাষা আর ফ্রেঞ্চ যাদের মাতৃভাষা তারা বাস করে স্বতন্ত্র

অঞ্চলে। যে যার অঞ্চলকে স্বাধীন রাষ্ট্রে পরিণত করতে চাইছে। পারছে না এইজন্যে যে রাজধানী ব্রাসেলস নিয়ে মীমাংসা হচ্ছে না। দু'পক্ষই ওটা দাবী করছে। শহরটাকে দু'ভাগ করাও সম্ভব নয়।

কানাডার ফরাসীভাষী প্রদেশ কুইবেক অন্যান্য প্রদেশের থেকে পৃথক হয়ে স্বাধীন রাষ্ট্র হবে, এটা যাদের দাবী তারা স্বভাষীদের কাছেই ভোটে হেরে গেছে। স্বভাষীরা সবাই যদি একমত হতো তা হলে কুইবেকও একটি স্বাধীন রাষ্ট্র হতে পারত। কানাডা বলতে তখন বোঝাত কুইবেকহীন কানাডা। এখন যেমন ভারত বলতে বোঝায় পাকিস্তানবিহীন ও বাংলাদেশবিহীন ভারত। ফরাসীভাষী কুইবেককে সন্তুষ্ট করার জন্যে কেন্দ্রীয় সরকার সর্বদা তৎপর। কিন্তু মাইনরিটি কি কখনো মেজরিটির সঙ্গে পাল্লা দিতে পারে? কানাডার এক ফরাসীভাষী উচ্চপদস্থ কর্মচারীর সঙ্গে আমার আলাপ হয়েছিল। ইংরেজী-প্রাধান্য তিনি মন থেকে মেনে নিতে পারছিলেন না। অথচ কুইবেক স্বাধীন হোক এটাতেও তাঁর সায় ছিল না। ওইটুকু প্রদেশ বিচ্ছিন্ন হয়ে সমৃদ্ধিশালী হবে কী করে? সামরিক শক্তিই বা পাবে কোথায়?

গত শতাব্দীতে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র দাস ব্যবসায়ের প্রশ্নে দু' ভাগ হয়ে গৃহযুদ্ধে জর্জর হয়। উত্তরের বাহুবল দক্ষিণের বাহুবলকে পরাস্ত করে। সমাধান যেটা হয় সেটা সামরিক সমাধান। দক্ষিণের লোক এখনো সেটা ভুলে যায়নি। পরাজয় কেউ কখনো ভোলে না। তবে সবাই এখন স্বীকার করেছে যে একসঙ্গে থাকার ফলে সকলের সমৃদ্ধি বেড়েছে, শক্তি বেড়েছে। তা না হলে দুই পক্ষেরই অবস্থা খারাপ হতো।

এটা কে না বোঝে যে ভারত অখণ্ড থাকলে হিন্দুমুসলমান সকলেরই সমৃদ্ধি বাড়ত, শক্তি বাড়ত? কিন্তু বুঝলে কী হবে, ধর্ম অনুসারে রাষ্ট্রগঠনের মূলে ছিল মেজরিটির সঙ্গে পাল্লা দিতে না পারার সামর্থ্য। মুসলমানরা প্রতিযোগিতায় সফল হতে পারছিল না। সর্বক্ষেত্রেই তাদের স্থান ছিল নিচের দিকে। এক সৈন্যদল বাদে। গৃহযুদ্ধ বাধলে তাদের হারিয়ে দেওয়া শুধুমাত্র সংখ্যার জোরে সম্ভব হতো না। তাই নেতারা অত সহজে দেশভাগে রাজী হয়ে যান।

ধর্মের ভিত্তিতে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানে বেধে যায় ভাষা নিয়ে দ্বন্দ্ব। কেন্দ্রের সরকারী ভাষা হবে উর্দু ও একমাত্র উর্দু এটা যাদের ফতোয়া তারা সংখ্যাগুরু বাংলাভাষীদের প্রাণে আঘাত দেয়। পরে দুই ভাষার মাধ্য সমতা স্বীকৃত হলেও কার্যত বাংলাভাষীদের স্বার্থহানি হয়। তারা ছয় দফা দাবী তোলে। সেসব দাবী মেনে নিলে কেন্দ্র দুর্বল হয়। অথচ তার বদলে কেন্দ্রীয় শাসনে বাংলাভাষীদের সংখ্যাগুরু হতে দেওয়া হয় না। সামরিক শাসন প্রকারান্তরে সংখ্যালঘুর শাসন। এই জট খোলার আর কোনো উপায় নেই দেখে পূর্ব পাকিস্তান জট কেটে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। তার নতুন নাম হয় বাংলাদেশ। তার ভিত্তি হয় ভাষা। ধর্ম নয়। ধর্মের প্রশ্নে যারা এক হয়েছিল ভাষার প্রশ্নে তারা দুই হয়ে যায়।

এদিকেও হিন্দুর সংখ্যাগুরুত্বকে আচ্ছন্ন করছে হিন্দীর তথাকথিত সংখ্যাগুরুত্ব। কিন্তু ভাষার প্রশ্নে ভারত যে ভেঙে যায়নি তার কারণ হিন্দীর প্রতিদ্বন্দ্বী এদেশে বাংলা প্রভৃতি নয়, একমাত্র ইংরেজীই তার দোসর ও কেন্দ্রীয় সরকারের চাকরিবাকরিতে ইংরেজীর কদর এখনো অব্যাহত। ইংরেজীর সাহায্যে আমরা ভাষাভিত্তিক বিচ্ছিন্নতা ঠেকিয়ে রেখেছি।

ধর্ম অনুসারে দেশ ভাগ দ্বিতীয়বার হবে না। সংখ্যালঘু হলেও শিখরা তা চায় না। খ্রীস্টানরা তা চায় না। মুসলমানরাও সবাই যে চেয়েছিল তা নয়। সবাই যদি চাইত তবে কাশ্মীরও আলাদা হয়ে যেত। আপাতত আমাদের সমস্যা ধর্ম নিয়ে নয়, ভাষা নিয়ে। হিন্দীর দাপটে তামিল একদিন বিদ্রোহী হতে পারে। সেটা দেশদ্রোহ নয়, হিন্দীভাষীদের প্রাধান্যের বিরোধিতা। কিন্তু এই মুহূর্তে যেটা প্রত্যক্ষ সেটা ভারতের উত্তর পূর্ব প্রান্তে অসমীয়াভাষীদের বিদ্রোহ। এটাও দেশদ্রোহ নয়। ওদের দাবী বিদেশী নাগরিকদের বহিষ্কার। অন্তত ভোটার তালিকা থেকে তাদের বর্জন। কিন্তু দাবী আদায় করার জন্যে যে পদ্ধতি তারা অবলম্বন করেছে সেটা ভারত সরকারের বিরুদ্ধেই সংগ্রাম। সরকার যদি আসাম থেকে তেল উদ্ধার করতে না পারে, সে কাজে নিযুক্ত কর্মীদের নিয়ন্ত্রণ করতে না পারে, তাদের একজনকে ঢিল মেরে খুন করা হলেও কাউকে সাজা দিতে না পারে তবে সরকারের সমস্ত প্রেস্টিজ ও সমস্ত অথরিটি ধূলিসাৎ হয়। এ সরকার ব্যর্থ হলে আর কোনো সরকার সফল হবে না। তখন আসাম ইচ্ছা করলে বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতে পারবে। তবে তেমন ইচ্ছা অসমীয়াদের অধিকাংশের আছে কি না সন্দেহ। কুইবেকের মতো রেফারেন্ডাম হলে হয়তো তারা বিচ্ছিন্নতার বিপক্ষেই ভোট দেবে। কিন্তু যদি স্বপক্ষে দেয় ?

অসমীয়াদের মনের ভিতরে যে ভাবাবেগ ঘনীভূত হচ্ছে সেটা ভারতবিরোধী নয়, সেটা ভিন্নভাষাবিরোধী। ওরা শুধু যে বিদেশী বলে বাংলাদেশের শরণার্থী হিন্দু তথা চাষী মুসলমানদের অবাধ অনুপ্রবেশের বিরোধী তা নয়, বহিরাগত বলে ভারতের অন্যান্য রাজ্যের থেকে আগত সরকারী কর্মচারী, পাবলিক সেকটরের কর্মী, ব্যবসাদার, চা বাগানের শ্রমিক প্রভৃতির অবাধ প্রবেশেরও বিরোধী। এর পেছনে আছে নিজেদের সংখ্যাধিক্য হারাবার ভীতি। এদের প্রবেশ নিরোধ করতে হলে এমন সব আইন পাশ করিয়ে নিতে হয় যা রাজ্য বিধানসভার ক্ষমতার বাইরে। তা হলে লোকসভাকে বলতে হয় সংবিধান সংশোধন করতে। লোকসভা যদি সেটা করে তো অন্যান্য রাজ্য থেকেও ভিন্নভাষীদের বিরুদ্ধে আইন পাশ করার ধুম পড়ে যাবে। ভারত খণ্ড খণ্ড হতে কতক্ষণ ? কোনো কেন্দ্রীয় সরকার কি পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করতে পারে ?

নাগাল্যাণ্ড, মিজোরাম, মণিপুর, ত্রিপুরা প্রভৃতির বিচ্ছিন্নতার দাবীও ক্রমে ক্রমে উঠছে। সেটা কিন্তু ভাষাঘটিত নয়। 'রেস' অর্থে জাতিঘটিত। দুই পক্ষই যেখানে হিন্দু সেখানেও তথাকথিত আর্য-অনার্যের ভেদ আছে। যেমন ত্রিপুরায়, মণিপুরে। ধর্ম একে ধামাচাপা দিয়েছে, যেমন খ্রীস্টান ধর্ম দক্ষিণ আফ্রিকায়। কিন্তু আজকের দিনে যে যার অধিকার সচেতন হয়েছে। কৃষ্ণাঙ্গরা

দাবী করছে শ্বেতাঙ্গদের সমান অধিকার। তোমার যদি একটি ভোট থাকে তো আমারও একটি ভোট থাকবে। ভোটের জোরে তুমি যদি সরকার গঠন করতে পারো তো আমিও পারব সরকার গঠন করতে। তুমি যদি আইন পাশ করতে পারো তো আমিও পারব আইন পাশ করতে। এখানে শ্বেতাঙ্গদের ঘোর আপত্তি। তারা নিজেরা গণতন্ত্রী হয়েও অপরকে গণতান্ত্রিক অধিকার দেবে না। বিরোধ অনিবার্য। দীর্ঘ সংগ্রামের দ্বারা রোডেশিয়ার কৃষ্ণাঙ্গরা তাদের অধিকার আদায় করে নিয়েছে। আরো দীর্ঘ সংগ্রামের পর দক্ষিণ আফ্রিকার কৃষ্ণাঙ্গরাও তাদের অধিকার আদায় করে নেবে। মনে রাখতে হবে যে তারা ইতিমধ্যেই খ্রীস্টধর্ম ও ইউরোপীয় সভ্যতা গ্রহণ করে শ্বেতাঙ্গদের কাছাকাছি এসেছে। এর জন্যে যা ত্যাগ করতে হয়েছে তার বেশী ত্যাগ করা সম্ভব নয়।

এদেশের তথাকথিত অনার্যরাও হিন্দু ধর্ম ও ভারতীয় সভ্যতা গ্রহণ করেছে। তার জন্যে এত বেশী ত্যাগ স্বীকার করেছে যে তার বেশী আশা করা অন্যায়। তাদের যদি সঙ্গে রাখতে হয় তো তাদের মৌলিক অধিকারগুলো মেনে নিতে হবে। তাদের সংখ্যাগত গুরুত্ব কেউ কেড়ে নিতে পারবে না। তাদের জায়গা জমি তাদেরই থাকবে। তাদের বনজঙ্গল উজাড় করা চলবে না। তারা যেখানে সংখ্যাধিক সেখানে তারাই সরকার গঠন করবে। বাইরে থেকে শরণার্থীরা উড়ে এসে জুড়ে বসবে না। সংখ্যাগুরুকে সংখ্যালঘুতে পরিণত করবে না। তা যদি হয় তো তারা কোনোকালেই মাথা তুলতে পারবে না। তাদের বিদ্রোহ স্বাভাবিক। তারা যদি বিচ্ছিন্নতার দাবী তোলে সেটাও অস্বাভাবিক নয়।

ত্রিপুরার সমস্যাটা জাতি বা 'রেস' ঘটিত। সুতরাং আরো পুরাতন ও আরো গভীর। একই সমস্যা ধোঁয়াচ্ছে মেঘালয়ে, মণিপুরে, মিজোরামে, নাগাল্যাণ্ডে, অরুণাচলে। ভাষার জন্যে ততটা নয় যতটা জাতি বা 'রেসে'র জন্যে। কোথাও খ্রীস্টধর্ম, কোথাও বা বৌদ্ধধর্ম কাজ করছে। যেসব সমস্যা সনাতন তাদের জন্যে চীন, মার্কিন প্রভৃতি বিদেশী শক্তিকে দোষ দেওয়া বৃথা। আমাদের কর্মফল আমাদেরই ভোগ করতে হবে। এর কোনো সামরিক সমাধান নেই। রাজনৈতিক সমাধান খুঁজে বার করতে হবে। নয়তো বিচ্ছেদের জন্যে প্রস্তুত হতে হবে। ইউনিয়ন মানে জোড়াতালি নয়। জাতীয় ঐক্যের জন্যে অশেষ ত্যাগস্বীকার। যারা হিন্দু নয়, যারা আর্য নয়, যারা আর্যপূর্ব তারাও ভারতীয়। তাদের অগ্রাধিকার মেনে নিতে হবে।

বাতাস যার বীজ ঝড় তার ফসল

রবীন্দ্রনাথের একটি গান আছে—"আমি কেবলি স্বপন করেছি বপন বাতাসে, তাই আকাশকুসুম করিনু চয়ন হতাশে।" ইংরেজীতে অনুরূপ একটি প্রবচন আছে। এটি বাইবেল থেকে নেওয়া। "যারা বাতাসের বীজ বোনে তারা ঝড়ের ফসল কাটে।" আমাকে একান্ত বেদনার সঙ্গে বলতে হচ্ছে এটাই হচ্ছে এক

কথায় আসামের পরিস্থিতি বা পরিণতি। এ ছাড়া আর কিছু হতে পারত না। তবে সময়ে নিবারণ করতে পারা যেত। এখন আর নিবারণ করা যায় না। কিন্তু এইখানেই থামিয়ে দিতে পারা যায়। সেটা পশ্চিমবঙ্গের বুদ্ধিজীবীদের সাধ্য নয়।

তবে কি ভারতরাষ্ট্রের প্রধানমন্ত্রীর সাধ্য ? না, তাঁরও সাধ্য নয়। তিনি নবপ্রতিষ্ঠিত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমানের সঙ্গে চুক্তিবন্ধ। মুজিব না থাকলেও চুক্তি আছে। সে চুক্তি এখনো বলবৎ। উভয় রাষ্ট্র সম্মত না হলে তার রদবদল অসম্ভব। ইন্দিরাজী না থাকলেও সেটা থাকবে। কংগ্রেস না থাকলেও সেটা থাকবে। তবে, হ্যাঁ, আসাম যদি ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় সেটা হয়তো থাকবে না। তখন বাংলাদেশের সামরিক শাসকরা যদি আসাম আক্রমণ করেন ভারত তাকে রক্ষা করতেও পারে, না করতেও পারে। চীন ছুটে আসতে পারে বাংলাদেশকে মদত দিতে। তিন যুধ্যমান রাষ্ট্রের পাল্লায় পড়ে আসামের অস্তিত্বই থাকবে না। সেকালের পোলাণ্ডের মতো ত্রিভঙ্গও হয়ে যেতে পারে।

এটা কবিকল্পনা নয়। ইতিহাসের শিক্ষা। বলা বাহুল্য ভারতেরই ক্ষতি হবে সব চেয়ে বেশী। ভারতই অরুণাচলে, নাগাল্যাণ্ডে, মণিপুরে, মিজোরামে তথা মেঘালয়ে যাবার পথ পাবে না। তারাও ভারতে আসার পথ না পেয়ে বাংলাদেশের বা চীনের আশ্রিত রাজ্য হবে। দুর্বলের স্বাধীনতা অর্থহীন। সেটা নামেই স্বাধীনতা।

তেমন দুর্ভাগ্য এড়ানোর জন্যে ভারতরাষ্ট্র যদি আগে থেকেই আসামকে তিনভাগে বিভক্ত করে তিনটি স্বতন্ত্র রাজ্যে পরিণত করে তা হলে আর কিছু না হোক অরুণাচলে ও মেঘালয়ে যাবার পথ খোলা পাবে। সেই পথে নাগাল্যাণ্ডে, মণিপুরে, মেঘালয়ে ও মিজোরামে যাবে। ভারতের স্বাধীনতার দিক থেকে এটাই অবশ্যকরণীয় ন্যূনতম ব্যবস্থা। পরিস্থিতি আয়ত্তের বাইরে চলে যাবার আগে এটুকু ব্যবস্থা অত্যাবশ্যক।

দাঙ্গাহাঙ্গামা আসামে আগেও হয়েছে, কিন্তু সেসব দাঙ্গাহাঙ্গামা অসমীয়াতে বাঙালীতে। বলা যেতে পারে দ্বিপাক্ষিক সংগ্রাম। আসাম রাজ্যের নির্বাচিত সরকারই ভারত সরকারের মুখাপেক্ষী না হয়ে সেসব দাঙ্গাহাঙ্গামা থামিয়ে দিয়েছেন। এবার কিন্তু সংগ্রামটা কেবলমাত্র অসমীয়াতে বাঙালীতে নয়, এবার এই সংগ্রামে মুসলমান নেমেছে, খ্রীস্টান নেমেছে। এটা সাম্প্রদায়িক মোড় নিয়েছে। সেটা আসামের ইতিহাসে অভূতপূর্ব হলেও ভারতের ইতিহাসে নয়। হিন্দু মুসলমান তো যত্র তত্র লড়ছে। হিন্দু খ্রীস্টানও লড়ছে কুমারিকা অন্তরীপের আশেপাশে। ওদিকে অকালী শিখরাও ধর্মযুদ্ধ ঘোষণা করে বসেছে। ওটা হিন্দু শিখের সংগ্রামে পর্যবসিত হতে পারে। আসামের বর্তমান সংগ্রাম তা হলে ত্রিপাক্ষিক। না, তার চেয়েও বেশী। 'বড়ো' বলে একটি উপজাতি আছে, তাদের কতক খ্রীস্টান হয়েছে। যারা ধর্মান্তর গ্রহণ করেনি তাদের কতক লিপ্যন্তর গ্রহণ করেছে। তারা রোমান লিপিতে লেখে। সে রকম বই

আমি উপহার পেয়েছি। তাদের ভাষা স্বতন্ত্র। বোধ হয় তিব্বত-বর্মী ভাষাগোষ্ঠীর অন্যতম। তারাই আজকাল স্বতন্ত্র রাজ্য উদয়াচল দাবী করছে। সম্প্রতি তারা অসমীয়া হিন্দু নিপাত করে। আর লালুংরা বাঙালী মুসলিম নিপাত।

উপজাতীয়রা যোগ দেওয়ায় সংগ্রামটা হয়ে দাঁড়ায় চতুষ্পাক্ষিক। চার পক্ষের নাম অসমীয়া, বাঙালী, মুসলমান, উপজাতি। আসাম পুলিশ অসহযোগী হওয়ায় সেণ্ট্রাল রিজার্ভ পুলিশকে ডাকতে হয়। তারাও হালে পানী পায় না বলে ভারতের সৈনিকদের ডাক দেওয়া হয়। ভারত সরকারও পক্ষভুক্ত হন। তখন সংগ্রামটার রূপ হয় পঞ্চপাক্ষিক। কিন্তু এমন জটিল সমস্যার কোনো সামরিক সমাধান নেই। রাজনৈতিক সমাধানই শ্রেয়। সেটা সম্ভব হচ্ছে কী করে যদি ছাত্র সঙ্ঘ ও গণসংগ্রাম পরিষদ জেদ ধরে বসে থাকে যে শেখ মুজিবের সঙ্গে চুক্তির খেলাপ করে ১৯৬১ সালের পরে যারা এসেছে তাদেরকেও বিদেশী নাগরিক বলে বাংলাদেশে ফেরৎ দিতে হবে, নয়তো ভারতের অন্যান্য রাজ্যে চালান করে অন্যত্র পুনর্বাসিত করতে হবে? আপাতত ভোটার তালিকা থেকে তাদের নাম কেটে দিয়ে তাদের ভোটদানের অধিকার কেড়ে নিতে হবে। এসব দাবী যেন পরাজিত রাষ্ট্রের কাছে বিজয়ী রাষ্ট্রের দাবী। অসমীয়া আন্দোলনকারীরা যেন যুদ্ধে জিতেছে। ভারত সরকার যেন হেরে গেছেন। ভারতের প্রধানমন্ত্রীর ধৈর্যের সীমা নেই। আন্দোলনকারীদের উপেক্ষা করলে রাজনৈতিক সমাধান হয় না। তাদের কাছে নতিস্বীকার করলে অন্তত দশলক্ষ নরনারী ও শিশুকে বাস্তুচ্যুত ও সম্পত্তিচ্যুত করা হয়। বাংলাদেশ তাদের ফেরৎ নেবে না, নিলে হাজার কয়েককে নেবে। অন্যান্য রাজ্য তাদের আশ্রয় জোগাতে পারবে না, আশ্রয় দিলেও জমি জোগাতে পারবে না, জীবিকা জোগাতে পারবে না, সম্পত্তির পরিবর্তে সম্পত্তি জোগাতে পারবে না। কিসের ভরসায় তারা অন্যান্য রাজ্যে যাবে? সেখানেও তো দু'দিন পরে রব উঠবে, বিদেশী নাগরিকদের দায়িত্ব আমরাই বা বহন করব কদ্দিন? এদের বিদায় করা হোক। বিদেশী নাগরিক সর্বত্রই বিদেশী নাগরিক। তাদের নাগরিক করে নিলে তারা সেই অধিকারে আবার আসামে ঢুকবে। এবার কেউ আইন অনুসারে আটকাতে পারবে না। তখন কি আভ্যন্তরীণ পাশপোর্ট প্রথা প্রবর্তন করতে হবে?

তারপর ভোটার তালিকা থেকে নাম কাটাও কি আদালতের বিচারে ধোপে টিকবে? যারা কয়েকবার ভোট দিয়ে এসেছে তাদের ভোটচ্যুত করলে পূর্ববর্তী নির্বাচনগুলো অসিদ্ধ হয়ে যায়। পূর্ববর্তী বিধানসভাগুলো অবৈধ হয়ে যায়। তাদের পাশ করা আইনগুলো কেঁচে যায়। বাজেটগুলো ও সেই অনুসারে খরচগুলো নিয়ে গণ্ডগোল বাধে। এখনকার এই আপত্তিটা বিশবছর আগে তোলা উচিত ছিল। এটা যেন ছেলেপুলে হবার পর বিবাহ অস্বীকার করা। এমন আপত্তির কথা কেউ কখনো শোনেনি। আসাম কি সৃষ্টিছাড়া দেশ?

আগে ভোটার তালিকা থেকে বিদেশী নাগরিকদের নাম খারিজ করো, তারপরে নির্বাচন হবে, এটাও কি যুক্তিসঙ্গত দাবী? এমন করলে পাঁচবছরেও

নির্বাচন হবে না, মাঝখানে নিম্ন আদালত, উচ্চ আদালত, সুপ্রীম কোর্ট। সরকার কি আদালতের ধার ধারবেন না? একদিকে সাধারণ নির্বাচনের দিন ঘনিয়ে এসেছে, আরেকদিকে রাষ্ট্রপতির শাসনের মেয়াদ ফুরিয়ে এসেছে। আন্দোলনকারীদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা তিনবছর ধরে চলে আসছে, সেটা আপাতত স্থগিত রেখে নির্বাচন অনুষ্ঠান করলে ক্ষতি কী? তারপরে মন্ত্রী-মণ্ডলী গঠন করলে কার কী ক্ষতি? রাজনৈতিক সমাধানে মন্ত্রীদেরও তো হাত থাকতে পারে। তাঁরা যে ইন্দিরা কংগ্রেসের লোক হবেনই তা আগে থেকে ভবিষ্যদ্বাণী করা যায় না। অপর পক্ষে, রাষ্ট্রপতির শাসন মানে তো ইন্দিরা গান্ধীর মনোনীত রাজ্যপাল ও তাঁর পরামর্শদাতাদের শাসন।

যে রাজ্যের মোট জনসংখ্যা দেড় কোটি সে রাজ্যে দশ লক্ষ বিদেশী নাগরিক থাকলে তারা মোট জনসংখ্যার শতকরা সাতজন। সেই সাতজন ভোট দিতে পারে বলে কি বাকী তিরানব্বই জনকে ভোটদানের সুযোগ থেকে বঞ্চিত করা যায়? তারা ভোট দিলে ফলাফলের এমন কী তারতম্য হবে? না দিলেই বা কার কতটুকু লাভ হবে? যেখানে দুই প্রতিদ্বন্দ্বী দল আসরে নেমেছে ও উভয়েই সমান বলবান সেখানে একটা ভোটের এদিক ওদিকও নির্বাচনের ফলাফল প্রভাবিত করতে পারে। এটা সম্ভব, তবে সাধারণত খুব কম জায়গাতেই এমন হয়। তার জন্যে গোটাকয়েক জায়গায় নির্বাচন বাতিল করে আবার নির্বাচনের ব্যবস্থা করা যেত। কিন্তু বিধানসভার মোট একশো ছাব্বিশটি আসনের প্রত্যেকটির নির্বাচন বন্ধ করতে হবে এ দাবীর পেছনে আছে যুক্তি নয়, জেদ। জেদ থেকে দুনিয়ায় অনেক যুদ্ধবিগ্রহ ঘটে গেছে। এটাও একপ্রকার কুরুক্ষেত্র বা লঙ্কাকাণ্ড। বিনাযুদ্ধে নাহি দিব সূচ্যগ্র মেদিনী। বিনা যুদ্ধে নাহি দিব রামের ঘরণী। বিনা যুদ্ধে নাহি দিব ভোট অধিকার। জ্বালাও গ্রাম, পোড়াও বাড়ী, তাড়াও মানুষ, পৃথিবী থেকেই বিলুপ্ত করো। পরলোকে গিয়ে বসতি করুক। এই যে জেদ এর কাছে নতিস্বীকার করা যায় না। শুধুমাত্র ভোট দিতে গেছে বা যাচ্ছে বা যাবে এই অপরাধে বহু লোককে প্রাণদণ্ড দেওয়া হয়েছে, দিয়েছে অসমীয়া জনতা। বদলা নিয়েছে যেখানে যার মেজরিটি। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ভোটের বদলে পদভোট। পদভোটদাতারা সপরিবারে পশ্চিমবঙ্গের ত্রাণশিবিরে ভিড় করেছে। তা সত্ত্বেও হস্তভোট দিতে পেরেছে কোথাও শতকরা দশজন, কোথাও বিশজন, কোথাও ত্রিশ-চল্লিশজন, কোথাও ষাট-সত্তরজন। কোথাও আরো বেশী। একটাও ভোট পড়েনি এমন কেন্দ্রও আছে। সমস্তটা নির্ভর করেছে ভয় বা সাহসের উপরে। আসামের নির্বাচনে ভোটদানের পক্ষে ও বিপক্ষে জনমত স্পষ্টত দু'ভাগ হয়ে গেছে। পক্ষে যারা তাদের একাংশ নিশ্চয়ই অসমীয়া হিন্দু, মুসলমান ও উপজাতি শ্রেণীভুক্ত। এঁদের ভোটদানের অধিকার এঁরা প্রয়োগ করেছেন। এঁরা প্রধানত ইন্দিরা কংগ্রেসের দলভুক্ত। তা বলে রাজ্যদ্রোহী বা সংবিধানদ্রোহী নন।

"আমরা ভোট দেব না, অতএব তোমাদেরও ভোট দিতে দেব না" এটা ন্যায় নয়, ধর্ম নয়, আইন নয়, সভ্যসমাজের রীতি নয়। মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে

কংগ্রেস যখন অসহযোগ নীতি গ্রহণ করে তখন নির্বাচন বয়কটও ছিল তার প্রোগ্রামের একটি ধারা। কংগ্রেস থেকে সবাইকে অনুরোধ করা হয় ভোটদান থেকে বিরত থাকতে। কিন্তু কারো উপর বলপ্রয়োগ করা হয়নি, প্রাণহানির বা গৃহহানির ভয় দেখানো হয়নি। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতির নিন্দাবাদ করা হয়েছে। ভোট কেন্দ্রে বেশী লোক যান নি বলে ভোটদান বাতিল হয়ে যায়নি। কম লোকের ভোটে আইন সভা গঠিত হয়েছে বলে সেটা ভেঙে দেওয়া হয়নি। সুরেন্দ্রনাথ মন্ত্রী হয়ে তিনবছর কাজ চালান ও কলকাতা করপোরেশন আইন পাশ করে চিত্তরঞ্জনকে মেয়র হতে ও সুভাষচন্দ্রকে চীফ এক্‌জিকিউটিভ অফিসার হতে পরোক্ষে সাহায্য করেন। নবগঠিত হিতেশ্বর শইকিয়া মন্ত্রী-মণ্ডলী ইন্দিরা কংগ্রেস দলভুক্ত বলে স্বজাতিদ্রোহী নন। সে অপবাদ সুরেন্দ্র-নাথকেও দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু সে অপবাদ মিথ্যা অপবাদ। বছরে চৌষট্টি হাজার টাকা বেতন পান বলে ব্যঙ্গচিত্র আঁকা হয়েছিল। যেন তিনি অর্থলোভে আত্মবিক্রয় করেছেন। কংগ্রেসীরাও পরে স্বরাজী সেজে নির্বাচনে নামেন ও আইনসভায় প্রবেশ করেন। মন্ত্রী হন না এই যা তফাৎ। এ পলিসি একদিন আসামের আন্দোলনকারীরাও অবলম্বন করতে পারেন।

আগে ভোটের তালিকা সংশোধন করতে হবে, তার পরে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে, এই জেদ বজায় থাকতে আবার নির্বাচন মানে তো আবার কুরুক্ষেত্র, আবার লঙ্কাকাণ্ড। সে ঝুঁকি নেবে কে? জেদের সঙ্গে রয়েছে গায়ের জোর। গায়ের জোরে নির্বাচন বানচাল করব, গায়ের জোরে আবার নির্বাচন ঘটাব। ভোটার তালিকা সংশোধনও কি গায়ের জোরে হবে? আমরা যাদের নাম কাটতে বলব তাদের নাম কাটতেই হবে, না কাটলে মুণ্ডু কাটব, খেদিয়ে দেব। ভিটে-মাটি থেকে উচ্ছেদ করব। ঘরবাড়ী জমি দোকান বাজেয়াপ্ত করব। এই যাদের চিন্তাধারা তারা গণতন্ত্র মানে না, ধর্মনিরপেক্ষতা মানে না, জাতীয়তাবাদ যদি বা মানে সেটা ভারতীয় জাতীয়তাবাদ নয়, অসমীয়া জাতীয়তাবাদ। তার থেকে উপজাতীয়রা বাদ। আমি এর একটিমাত্র প্রতিকার জানি। আসাম থেকে তথাকথিত বিদেশী নাগরিকদের না সরিয়ে আসামকে আবার বিভক্ত করা ও যেসব জেলায় অসমীয়া প্রাধান্য সেসব জেলা আসামে রেখে আর সব জেলা আসাম থেকে কেটে নেওয়া। মুণ্ডু কাটার চেয়ে ল্যাজ কাটাই মন্দের ভালো। ল্যাজ দিয়ে আরেকটা রাজ্য হয়, আরেকটা ইউনিয়ন টেরিটরি হয়। তথাকথিত বিদেশী নাগরিকরা সেসব জায়গায় নিরাপদে বাস করবে। এমনিতেই অনেকে গোয়ালপাড়ায় ও কাছাড়ে অবস্থান করছে। উপজাতীয়দেরও আত্মরক্ষার জন্যে কয়েকটা এলাকা ছেড়ে দেওয়া উচিত।

এই পরিস্থিতি প্রধানমন্ত্রীর সৃষ্টি নয়। এর বীজ বোনা হয়েছে ব্রিটিশ আমলেই। চারা গজিয়েছে পার্টিশনের পরে। বাড়তে বাড়তে চারাগাছ হয়েছে বড়ো গাছ। এখন সেটা বনস্পতি। অসমীয়াদের নিষ্কণ্টক না করলে তারা সন্তুষ্ট হবে না। একভাষী রাজ্য তাদের চাইই চাই। আর সব রাজ্য একভাষী হয়েছে, আসামই বা হবে না কেন? রাজ্য পুনর্গঠন কমিটি ফতোয়া দিয়েছেন

যে শতকরা সত্তরজন অধিবাসী অসমীয়া না হলে আসাম একভাষী হবে না। অসমীয়াদের সংখ্যা আপাতত শতকরা বাষট্টি। তারা আরো আটজনকে অসমীয়া বানাতে পারলেই একভাষী রাজ্য পাবে। কিন্তু ইতিমধ্যে একটা বিপর্যয় ঘটে গেছে। যেসব বাঙালী মুসলমানকে তারা স্বাগত জানিয়েছিল তারা বেশ কিছুকাল নিজেদের ন'অসমীয়া বা নয়া অসমীয়া বলে পরিচয় দিয়ে অসমীয়াভাষীদের দল ভারী করেছিল। হঠাৎ একটা অঘটন ঘটে। পূর্ব পাকিস্তান লড়াই করে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ রূপে আত্মপ্রকাশ করে। ন'-অসমীয়ারাও মাতৃভাষা সচেতন হয়ে ওঠে। ফলে অসমীয়াভাষীদের সংখ্যানুপাত শতকরা বাষট্টি থেকে নেমে যায়। আসামের মাটিতে কখনোই যেটা ছিল না সেটাও ভূঁই ফুঁড়ে ওঠে। হিন্দু মুসলমানে ধর্মগত বিরোধ। আসামে ধর্ম নিয়ে দাঙ্গাহাঙ্গামা একবার ঘটেছিল ব্রিটিশ আমলের পূর্বে। সে বিরোধ হিন্দু মুসলমানের নয়, শাক্ত বৈষ্ণবের। বৈষ্ণব গিয়ে বার্মা থেকে বৌদ্ধকে ডেকে নিয়ে আসে। আসাম পরাধীন হয়। মগদের অত্যাচার দিন দিন বাড়ে। লোকে ত্রাহি ত্রাহি করে। তখন আসামের বন্ধু সেজে ইংরেজের আগমন। এক পরাধীনতার বদলে আরেক পরাধীনতা। তখন থেকে তারা ভাষা সম্বন্ধে স্পর্শকাতর। ধর্ম সম্বন্ধে নয়। শঙ্করদেবের বৈষ্ণবধর্মও একান্ত উদার। শৈবরাও কম উদার নন। শিবমন্দিরে নহবৎ বাজায় মুসলিম বাদ্যকর। নইলে শিবের ঘুম ভাঙবে না। আসামের ঐতিহ্য এই প্রথমবার কলঙ্কিত হলো।

এমন যে হতে পারে এটা কিন্তু আমার মনে দশবছর আগে উদয় হয়েছিল। যেদিন কানে আসে একটি জঙ্গী হিন্দু সাম্প্রদায়িক সংগঠন আসামে গিয়ে ডেরা বেঁধেছে সেইদিনই অনুভব করি যে হিন্দু মুসলমানের সম্পর্কে চিড় ধরবেই। এর পরে শুনি একটি জঙ্গী মুসলমান সাম্প্রদায়িক সংগঠনও আসামে গিয়ে বিপরীত দিক থেকে একই কাজ করছে। দুই বিষবৃক্ষের ফল একদিন ফলতই। এই উপলক্ষে না হোক অন্য কোনো উপলক্ষে হিন্দু মুসলমানে দাঙ্গাহাঙ্গামা বাধতই।

কিন্তু এটাও গৌণ। মুখ্য যেটা সেটা হচ্ছে একভাষী রাজ্য প্রতিষ্ঠার ইস্যুতে অসমীয়াদের সঙ্গে বাঙালীদের মন কষাকষি ও তার থেকে বল কষাকষি। দশ বছর আগে আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে আসেন এক অসমীয়া হিন্দু অধ্যাপক। চমৎকার বাংলা বলেন। বলেন, "আপনারা পশ্চিমবঙ্গ ও ত্রিপুরা পেয়েছেন। এখন বাংলাদেশও পেলেন। তা হলে কেন আপনারা আসামকেও পেতে চান ? ত্রিপুরায় গিয়ে আপনারা ত্রিপুরীদের তাদের নিজ বাসভূমে সংখ্যা-লঘুতে পরিণত করেছেন। আসামে গিয়ে অসমীয়াদের কি সংখ্যালঘুতে পরিণত করবেন ? ভারত ও বাংলাদেশ মিলিয়ে বাঙালীদের সংখ্যা বারো কোটি। অপর পক্ষে, অসমীয়াদের সংখ্যা এক কোটিও নয়। হিন্দু শরণার্থী হিসাবেই হোক আর মুসলমান চাষী মজুর হিসাবেই হোক বাঙালীদের প্রবেশ যদি অব্যাহত থাকে তা হলে তো ওরাই একদিন হবে সংখ্যাগরিষ্ঠ। ওরাই রাজত্ব করবে, যেমন ত্রিপুরায়। হিন্দু শরণার্থীরা যেখানে খুশি যাক, কিন্তু আসামে আর নয়।"

অসমীয়ারা দ্বিভাষী রাজ্য চায় না, দ্বিভাষী স্কুল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় চায় না, এমন কী ইংরাজীতেও তাদের আপত্তি আছে, পাছে প্রতিযোগিতায় হেরে যায়। বছর পনেরো আগে একজন মিজো ভদ্রলোক আমাকে বলেছিলেন, "আমরা অসমীয়াদের ভালোবাসি। তাদের সঙ্গে একই রাজ্যে বাস করতে চাই। কিন্তু অসমীয়া হবে একমাত্র সরকারী ভাষা এতে আমাদের আপত্তি আছে। ইংরেজীর সাহায্যে আমরা সরকারী চাকরিবাকরির প্রতিযোগিতায় সফল হয়ে থাকি। ইংরেজী ছাড়তে আমরা নারাজ। কেরলের লোকের পর মিজোরাই সারা ভারতে সবচেয়ে বেশী লেখাপড়া জানে। আমাদের মেয়েরাও শিক্ষিত। আমরা কেন অসমীয়াদের কাছে ছোট হব ?"

একই কথা বলেন শিলং-এর এক খাসী ভদ্রলোক। "আমরা অসমীয়াদের ভালোবাসি। একসঙ্গেই বাস করতে চাই। রাজ্যটা বড়ো হলে মনটাও বড়ো হয়। রাজ্যটা ছোট হলে মনটাও হয় ছোট। ছোট একটা রাজ্য নিয়ে আমরা বড়ো হব কী করে ? কিন্তু ইংরেজী আমরা ছাড়ব না। হয় হবে রাজ্যভাগ।"

ওঁরা দু'জনেই খ্রীস্টান। দু'জনেই উচ্চশিক্ষিত। একটি খাসী ছাত্র ইংরজীতে এমন চমৎকার ভাষণ দেয় যে আমি ভাবি এরা কিসে বাঙালীদের চেয়ে কম ? সুযোগ পেলে এরাও তো ঘানা নাইজেরিয়া তানজানিয়া চালাতে পারে। এরা যদি অসমীয়া হিন্দু আধিপত্য পছন্দ না করে তো কেন অসমীয়া হবে একমাত্র সরকারী ভাষা ? বিমলাপ্রসাদ চলিহা ছিলেন তখন আসামের মুখ্যমন্ত্রী। তিনি যেমন উদার তেমনি বিজ্ঞ। তাঁর মতে আসাম হচ্ছে দুই উপত্যকা আর এক গিরিমালার রাজ্য। অসমীয়া, বাঙালী, পাহাড়ী সবাই মিলে মিশে বাস করবে। সকলের জন্যেই আসাম। কেবল অসমীয়াদের জন্যেই নয়। তিনি রাজ্য ভাগা-ভাগির বিপক্ষে কিন্তু ঘটনার স্রোত তাঁর আয়ত্তের বাইরে চলে যায়। তিনি ব্যর্থ হন। কিছুদিন পরে পরলোকে যান। মেঘালয় হয় পৃথক রাজ্য। মিজোরাম হয় ইউনিয়ন টেরিটরি। অবশিষ্ট আসামের সরকারী ভাষা হয় রাজ্যস্তরে অসমীয়া, জেলাস্তরে বাংলা ইত্যাদি। এতে কোনো পক্ষই সন্তুষ্ট নয়। বাঙালীরা চায় রাজ্যস্তরে উঠতে। অসমীয়ারা চায় নিম্নস্তরেও নামতে।

দশ বছর আগে বঙ্গাতঙ্কই ছিল একমাত্র আতঙ্ক। ইতিমধ্যে আরেকটি আতঙ্ক তার সঙ্গে যোগ দিয়েছে। সেটি ইসলামাতঙ্ক। কে জানে বাংলাদেশের মনে কী আছে ? সে কি আসামকে গ্রাস করবে ? বিহারী মুসলমানরাও নাকি বাংলাদেশ থেকে তাড়া খেয়ে আসামে অনুপ্রবেশ করছে। সব দরজা জানালা বন্ধ করা চাই। নইলে আসামের কপালে লেখা আছে মুসলিম রাজ। সব রকম মুসলমানই একজোট হবে, কী বাঙালী, কী অসমীয়া, কী বিহারী। অসমীয়া হিন্দুরা এখন এককাট্টা। আন্দোলনকারীদের নির্দেশ মান্য করছেন সরকারী বেসরকারী কর্মচারীরাও, মায় পুলিশ। কতকটা ভয় থেকে, কতকটা সহানুভূতি থেকে। মহিলারাও আন্দোলনকারীদের পক্ষে।

আমরা যারা অসমীয়াদের ভালোবাসি তারা কি তাদের সঙ্গে বিচ্ছেদ কামনা করতে পারি ? আমার তো ইচ্ছে করে ছুটে গিয়ে শান্তি ফিরিয়ে আনতে। কিন্তু

আমি নিজের সীমাবদ্ধতা সম্বন্ধে সচেতন। আমি মানুষকে ভালোবাসি, পাপকে ভালোবাসিনে। যেসব কাণ্ডকারখানা ঘটছে সেসব কোনো মতেই সমর্থন করা যায় না। যদি কেউ সমর্থন করেন তো বুঝতে হবে তিনি পাপ-পুণ্যের প্রভেদ ভুলে গেছেন। অহিংসার সঙ্গে হিংসা মিশিয়ে দিলে সেটা আর অহিংসা থাকে না। অহিংসার তেমন কোনো ব্যাখ্যা যদি কেউ করেন তবে তিনি গান্ধীজীর কাছ থেকে অনেক দূর সরে এসেছেন। সব কিছুতেই তিনি ইন্দিরা গান্ধীর কারসাজি দেখছেন। ইন্দিরা গান্ধী না থাকলেও একই ব্যাপার ঘটত। সাধারণ নির্বাচন চিরকাল ঠেকিয়ে রাখতে পারা যেত না। রাষ্ট্রপতি শাসন চিরকাল প্রলম্বিত করা যেত না। সংবিধান সংশোধন এক তরফা হতো না। ভোটার তালিকা সংশোধন নির্বিবাদে হতো না। বিবাদ গড়াত সুপ্রীম কোর্ট অবধি। একবার তাঁরা ভারতরাষ্ট্রের দায়িত্ব নিয়ে দেখুন না, কেমন করে দশলক্ষ নরনারী ও শিশুকে নিগ্রো ক্রীতদাসের মতো রেল ওয়াগনে ভর্তি করে রাজ্যে রাজ্যে চালান দেওয়া যায় ও যন্ত্র তন্ত্র কয়লার মতো উজাড় করে দেওয়া যায়। ইন্দিরাজী ১৯৭১ সালের থেকে অপসারণের দায় মাথায় নিচ্ছেন। এই নিয়ে বাংলাদেশের সঙ্গে ঠোকাঠুকি বেধে না যায়। বাংলাদেশ বিমুখ হলে বিতাড়িত মুসলমানদেব আসামের বাইরে আর কোন্ রাজ্য ঠাঁই দেবে? বিতাড়িত হিন্দুদেরও কি বিহারী বা ওড়িয়ারা ঘরে ঢুকতে দেবে? কোথাও ধর্মভেদের জন্যে মুসলমানরা অবাঞ্ছিত। কোথাও ভাষাভেদেদের জন্যে হিন্দুরা অবাঞ্ছিত। এই বেচারিদের ভিয়েটনামের বা কাম্পুচিয়ার বোট পীপলের মতো জলে ভাসিয়ে দেওয়া হবে কি? অনেকেই ডুবেছে। যারা ডাঙায় উঠতে পেরেছে তাদের আবার ভাসিয়ে দেওয়া হয়েছে।

আসামের এই ট্র্যাজেডি আমাকে অভিভূত করেছে। কিন্তু আমি জানি যে বাইবেল যা বলেছে সেটাই সত্য। বীজ বুনলে গাছ গজায়। বাতাস বুনলে ঝড় গর্জায়। মন্ত্রীদের হটাও, আবার নির্বাচন করো, বিরোধী পক্ষকে জিতিয়ে দিয়ে গদিতে বসাও, কিন্তু হিন্দু শরণার্থী আর মুসলিম উপনিবিষ্টদের শিকড়সুদ্ধ উপড়ে নিয়ে আর কোথাও রুইতে যেয়ো না। ওদের সম্পত্তিতে হাত দিয়ো না। ওরাও মরণকামড় দিতে জানে। পরিস্থিতি যত খারাপ তার চেয়েও খারাপ হতে পারে। ইন্দিরা গান্ধী ব্যতীত আর কে সামাল দিতে পারবেন? আগে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে আসুক। তার পরে আসাম সম্বন্ধে একটা সর্বসম্মত সমাধান খুঁজে বার করতে হবে।

এ সমস্যা পৃথিবীর ইতিহাসে নতুন নয়। দক্ষিণ আফ্রিকায় অনাবাদী জমি আবাদ করে চিনি উৎপাদন করার জন্যে ব্রিটিশ শাসিত ভারত থেকে মজুর আমদানী করতে হয়েছিল। কাজের সময় কাজী, কাজ ফুরোলে পাজী। তাদের বলা হলো, দেশে ফিরে যাও। তারা ফিরে এলে থাকবে কোথায়, খাবে কী? দেশে যা কিছু ছিল সব বেদখল হয়ে গেছে। কালাপানী পার হওয়ায় জাতও গেছে। তারা কোনো রকমে দিন গুজরান করে দক্ষিণ আফ্রিকায় থেকে গেল। তখন একটা মোক্ষম চাল চালা হলো। যাদের নাম উঠেছিল ভোটার তালিকায়

তাদের নাম কেটে দেওয়া হলো। যাদের নাম ওঠেনি তাদের নাম উঠলই না। বড়ো বড়ো শহর থেকে তাদের সরিয়ে নিয়ে বিশ ত্রিশ মাইল দূরে থাকবার ব্যবস্থা করে দেওয়া হয়েছে। পাশ না নিয়ে তারা শহরে ঢুকতে পারে না। শহরের সম্পত্তি নামমাত্র দামে কিনে নেওয়া হয়েছে। আইন অনুসারে তারা সাউথ আফ্রিকান ন্যাশনাল। কিন্তু তাদের গায়ের রং শাদা নয়। তাদের 'রেস' আলাদা। খ্রীস্ট ধর্মে দীক্ষা নিয়েও নিস্তার নেই। আসাম কি সেই পথে চলতে চায়? তা যদি হয় তবে সর্বসম্মত সমাধান হবার নয়, হবেও না। সেই গানের কথা একটু বদলে দিয়ে আমরা গাইব, "কেবলি স্বপন করেছি বপন বাতাসে, তাই ঝড়ের কুসুম করিনু চয়ন হতাশে।"

বর্ণবিদ্বেষ

আশ্চর্যের কথা, বর্ণবিদ্বেষ আমেরিকায় কমছে, ব্রিটেনে বাড়ছে। এই সম্প্রতি ব্রিটেনে যা ঘটে গেল তা কারো পক্ষে গৌরবের বিষয় নয়। দুই পক্ষই মারমুখী হয়ে দুই পক্ষের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে। ঘরবাড়ীতে আগুন ধরিয়েছে। লুটপাট করেছে। কিন্তু শুক্লপক্ষের সবাই ইংরেজ বা স্কটস (স্কচ কথাটা ওঁরা পছন্দ করেন না) হলেও কৃষ্ণপক্ষের সবাই ভারতীয় বা পাকিস্তানী বা বাংলাদেশী নয়, বেশির ভাগই জ্যামেকা প্রভৃতি দ্বীপের লোক, যাদের দেশের নাম এককথায় ওয়েস্ট ইন্ডিজ। এসব দ্বীপের অবস্থান ভারতের বিপরীত দিকে, এসব দ্বীপের আদি বাসিন্দারা কোনো অর্থেই ভারতীয় বা ইন্ডিয়ান নয়, অথচ কলম্বসের ভুলের খেসারৎ দিতে হচ্ছে আসল ইন্ডিয়ানদেরও। ওরাও ইন্ডিয়ান আমরাও ইন্ডিয়ান, অতএব উদোর পিন্ডি বুধোর ঘাড়ে। ওদের বেয়াদবির জন্যে আমরাও অপ্রিয়। আর আমাদের অপ্রিয়তার জন্যে ওরাও।

তা ছাড়া পাকিস্তানীকেও অনেক সময় ভারতীয় বলে ভুল করা হয়। তেমনি ভারতীয়কেও পাকিস্তানী বলে। চব্বিশ বছর ধরে বাংলাদেশের লোকও ভারতীয় বলে পরিচিত হয়েছিল, তার জের এখনো মেটেনি। যে মারটা পাকিস্তানীদের পাওনা সেটা বাংলাদেশের লোকের পিঠেও পড়ে। একই রকম দেখতে বলে ভারতীয়দের পিঠেও। একে বলা হয় "পাকি ব্যাশিং"। পাকি ঠ্যাঙানো। আমার পুত্রের বন্ধু ও আমার পুত্রপ্রতিম নিমাই চট্টোপাধ্যায় বিনা অপরাধে তিন তিনবার এর ভুক্তভোগী। নিমাই আমাদের চোখে বেশ ফরসা, কিন্তু ওদের চোখে বেশ কালো। ওরা বর্ণান্ধ। বলা বাহুল্য সবাই নয়। তাই যদি হতো তবে নিমাই ওদেশে চাকরি পেতো কী করে? এক শতাব্দীর এক চতুর্থ ভাগ ওদেশে বাস করতো কী করে? সুধী মহলে ও জনপ্রিয়। তাঁদের সঙ্গে সমানে মেলামেশা।

বাহান্ন তিপ্পান্ন বছর আগে বিলেতে যখন ছিলুম তখন সেখানে ইহুদীদের সংখ্যা ছিল লাখ দেড়েক। ইংরেজরা বলত সেই যথেষ্ট। তার বেশী ওরা অ্যাসিমিলেট করতে অপারগ। ইহুদীরাও গজগজ করত। কেন ওদের আরো বেশী

সংখ্যায় আসতে দেওয়া হচ্ছে না ? কেন ওদের সঙ্গে অমন ব্যবহার করা হচ্ছে ? তখনো হিটলারের অভ্যুদয় হয়নি। তখনি ইহুদিদের নিয়ে এই সমস্যা। পরে এটা আরো উৎকট হয়। এখন তো ইহুদীবিদ্বেষ নতুন করে মাথাচাড়া দিচ্ছে। সেটা বর্ণবিদ্বেষ নয়, জাতিবিদ্বেষ। ইহুদীরা হাজার চেষ্টা করলেও ইংরেজদের সঙ্গে মিশে যেতে পারে না, তাদের ইহুদীত্ব বজায় রাখতে চায়। কেউ কেউ সেটা চোখে আঙুল দিয়ে দেখায়, সদর্পে জাহির করে। ওদের মধ্যে যারা বড়লোক তারা খুবই বড়লোক। এতে সাধারণ ইংরেজের চোখ টাটায়। হিটলারী অত্যাচারের ফলে ইহুদীর সংখ্যা অনেক বেড়ে গেছে। সেটাও একটা কারণ। একদিন যারা দেড় লক্ষ ইহুদীকে অ্যাসিমিলেট করতে রাজী ছিল, তার বেশী নয়, তারা এখন ভিতরে ভিতরে নারাজ। কিন্তু ধনী মানী গুণী জ্ঞানী ইহুদীদের এত বেশী প্রভাব যে তাদের মেরে তাড়িয়ে দেবার কথা চিন্তা করা যায় না, তবু কয়েক হাজার যুবক নয়া নাৎসী হয়েছে। জনমত তাদের বিরোধী।

ভারতীয়দের সংখ্যা আমার অবস্থানকালে বোধহয় এক লাখেরও কম ছিল। এখন দশ লাখেরও বেশী। পাকিস্তানী ও বাংলাদেশী সমেত। আর ওয়েস্ট ইণ্ডিয়ানের সংখ্যা বোধহয় আরো কয়েক লাখ বেশী। কালো ও বাদামী রঙের মানুষ মিলে মোট সংখ্যা শুনেছি পঁচিশ লাখের মতো। এদের অ্যাসিমিলেট করতে ইংরেজরা অক্ষম। তাদের ঐতিহ্য হলো দেশ ছেড়ে বিদেশে গিয়ে উপনিবেশ স্থাপন করা। বিদেশ থেকে অন্যেরা এসে ওদের দেশেই উপনিবেশ স্থাপন করবে এটা তার সম্পূর্ণ বিপরীত। ওরা সাময়িকভাবে এক আধ লক্ষকে আশ্রয় দিতে পারে, কিন্তু স্থায়ীভাবে পঁচিশ লক্ষকে স্থান দিতে অনিচ্ছুক। ওদের বক্তব্য হলো, আমাদের দ্বীপটি ছোট, নিজেদেরই জনসংখ্যা অত্যধিক, আমরা তেমন সম্পদশালীও নই, নিজেদেরই কত অভাব। ঠাঁই নাই ঠাঁই নাই ছোট এ তরী, ভরাডুবি হবে যদি বোঝাই করি। তোমাদেরও দরকার ছিল, আমাদেরও দরকার ছিল, তা বলে চিরকাল তোমরা এদেশে থাকবে, এত বেশী সংখ্যায় থাকবে, এটার জন্যে আমরা প্রস্তুত নই।

ন্যাশনালিটি আইন রক্ষণশীলদের আমলে আরো কড়া হয়েছে। ব্রিটিশ প্রজা হলেও ব্রিটিশ ন্যাশনালিটি এখন আর সহজলভ্য নয়। প্রতিবাদ আমাদের মুখে সাজে না, কারণ ইণ্ডিয়ান ন্যাশনালিটিও সহজলভ্য নয়। আমাদের তুলনায় ইংরেজরা আরো উদার। ইংরেজ পুরুষ যদি ভারতীয় নারীকে বিবাহ করে স্ত্রী সঙ্গে সঙ্গে স্বামীর ন্যাশনালিটি পায়। কিন্তু ভারতীয় পুরুষ যদি ইংরেজ নারীকে বিবাহ করে স্ত্রীকে বহুকাল অপেক্ষা করতে হয়। আমি যতদূর জানি পাঁচবছর। দশ লক্ষ ইংরেজ এদেশে কোনদিন ছিল না, সওয়া লক্ষের মতো ছিল, বেশীর ভাগই সৈনিক। স্থায়ীভাবে বসবাস কেউ করত না, ভারতীয় ন্যাশনালিটি বলে স্বাধীনতার আগে কিছু ছিলও না। পরে জনাকয়েক ইংরেজ স্বেচ্ছায় ভারতীয় ন্যাশনালিটি চান ও পান। যেমন হলডেন, যেমন এলউইন। সে সকল প্রার্থীর সংখ্যা লক্ষ লক্ষ হলে আমরা ভারতের দরজা বন্ধ করে দেব।

যদিও ইংলন্ডের তুলনায় বড়ো এ তরী।

ইংরেজদের একটা প্রবাদ, রোমে গেলে রোমানদের মত আচরণ করতে হয়। কিন্তু ভারতীয়রা যখন ইংলন্ডে যায় তখন ইংরেজদের মতো আচরণ করে না। ঢেঁকী স্বর্গে গিয়েও ধান ভানে। দীর্ঘকাল বাস করেও ইংরেজী বলতে পারে না, গণ্ডীর বাইরে যায় না, 'পাবে' গিয়ে বীয়ার খায় না ও খাওয়ায় না, হিন্দুরা বীফ খায় না, মুসলমানরা বেকন খায় না। মেলামেশা কেবলমাত্র আপিসে বা কারখানায় বা দোকানে। নাচতে গেলে মেয়েদের নিয়ে যাবে না, অথচ নাচের শখটি আছে। সাঁতার কাটতে গেলে মেয়েদের নিয়ে যাবে না, যদিও মিশ্র সন্তরণেরও সাধ। হিন্দু মুসলমান শিখ কেউ গীর্জায় যেতে চায় না। শিখেরা তাদের পাগড়ি কিছুতেই খুলবে না, যেখানে মাথা খোলা রাখাই নিয়ম সেখানেও না, যেখানে মাথায় হেলমেট পরাই নিয়ম সেখানেও না। গুজরাটী দোকানদাররা ইংরেজ খদ্দেরদের যত সস্তায় যত রকম মাল জোগায় আসল ইংরেজরা তত সস্তায় তত রকম নয়। তাদের সংখ্যাও অনেক বেড়ে গেছে আফ্রিকা থেকে তাড়া খেয়ে। প্রতিযোগিতায় ইংলন্ডের নেটিভরা হেরে যাচ্ছে। এটাও একটা কণ্টক। তাই নিষ্কণ্টক হতে চায়। পাকিস্তানীদের ব্যবহার অত ভদ্র নয়। তাই তাদের উপর বিরাগ আরো বেশী। আর বাংলাদেশীরা এক একটা বাসায় এত বেশী সংখ্যায় থাকে যে তাদের জীবনযাত্রা পাড়ার ইংরেজদের চোখে অশ্রদ্ধেয়। অথচ ওদের দর্জিরা যত সস্তায় সুট বানাতে পারে আর কেউ তত সস্তায় নয়। আর ওদের রেস্টোরাণ্টগুলো যত সস্তায় খাওয়াতে পারে আর কেউ তত সস্তায় নয়। সেই রেস্টোরাণ্টের সংখ্যাও শত শত। চীনাদের পরেই বাঙালীরা। খাবারটা কিন্তু বাঙালীর খাবার নয়। লস্কর হিসাবেও বাংলাদেশীরা অত্যাবশ্যক।

এবারকার সংঘর্ষের প্রথম ধাক্কায় অনেকেই চেয়েছিল দেশে ফিরে আসতে। পরে আবার তারাই বলতে আরম্ভ করেছে, "আমরাও দেখে নেব ওরা কী করতে পারে। আমাদেরও গায়ে জোর আছে।" সম্পত্তির মায়া কাটিয়ে ওঠাও শক্ত। খেলাটা জমবে ভালো।

ইংরেজরা সাম্রাজ্য ছেড়ে দিয়েছে, কিন্তু বাণিজ্য ছেড়ে দেয়নি। ভারতের সঙ্গে বাণিজ্যে তাদের প্রয়োজন ও লাভ। আবার যদি যুদ্ধ বাধে ভারতীয় সৈন্যও তাদের আবশ্যক। ব্রিটেনে বসবাসকারী শিখরাই তাদের ভরসা। তারাও রাজভক্ত। ইংরেজী বইয়ের চাহিদা স্বাধীন ভারতে কমেনি বরং বেড়েছে। ইংরেজী বইয়ের এত বড়ো একটা বিদেশী বাজার আর কোন্‌খানে? সব দিক বিবেচনা করলে ভারতের সঙ্গে বন্ধুতাই ইংলন্ডের কাম্য। একই কমনওয়েলথে উভয়ের অধিষ্ঠান। ইংলন্ডের রানীই কমনওয়েলথের শিরোমণি। ইংরেজরা তাদের উগ্রপন্থীদের সংযত রাখবে বলেই মনে হয়। তারাও বেকার বলেই অতটা উগ্র। হাতে কাজকর্ম থাকলে ওরা এর জন্যে সময় পেতো না বোধহয়।

এই পর্যন্ত লিখে কাল শুতে যাই। আজ সকালে উঠে দিল্লী থেকে প্রকাশিত "হিন্দুস্থান টাইমস" পড়ছি আর লক্ষ করছি একটি পনেরো বছর বয়সের মেয়ের লেখা চিঠি। মেয়েটি বাপ-মার মনে কষ্ট হবে বলে নাম ছাপতে দেয়নি। তার

বেদনা দেশের কালো মেয়েদের সকলের বেদনা। চিঠির কতক অংশ উদ্ধৃত হলো—

"Though there is no discrimination of colour in the eyes of law (information collected from my civics book) I do feel that there is dtscrimination of colour in our society. Haven't you heard people saying, "She is sooo···fair !" If she is fair, it is taken for granted that she is beautiful. This is not so of a dark girl with sharp elegant features. The people say, 'She is dark'. Ugh ! 'Dark' word is something which always makes a person sound unattractive. Why has society developed such a feeling that only the fair are beautiful and not the dark ?"

তারপর লিখেছে ওর নিজের রং কালো, ওর বাপের রং কালো, ওর মায়ের রং ফরসা, ওর কাজিনদের রং ফরসা। এ নিয়ে পরিবারের ভিতরেই বর্ণবৈষম্য। গায়ের রং নিয়ে বাছবিচার। ওর কাজিনরা ওর সঙ্গে এমন ব্যবহার করে যেন ও একটি 'কালো ভেড়া'। ওর মা ওর জন্যে মনে মনে লজ্জিত। অর্থাৎ ওর গায়ের রং-এর জন্যে। লোকে যখন ওর মায়ের সঙ্গে ওর গায়ের রং-এর তুলনা করে তখন ও প্রায়ই চোখের জল ফেলে। ওর ধারণা ওর রং যদি কালো না হতো ওকে সবাই সুন্দর বলত। কালো পোশাক পরলে নাকি ওকে ফরসা দেখায়, কিন্তু ওর মা ওকে কালো পোশাক পরতে দেবেন না।

আমার ধারণা ছিল এটা শুধু বাঙালী সমাজের দুর্বলতা। তা নয়। চিঠি থেকে মনে হচ্ছে এ মেয়েটি দক্ষিণী। এটা আমাদের গোটা ভারতীয় সমাজেরই দুর্বলতা। এই দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে ইংরেজরা এদেশে দেবতার সম্মান পেয়ে রাজত্ব করে গেছে। ওরা যদি গোরা না হয়ে কালা হতো ওদের রাজত্ব অতদিন টিকত না। বর্ণবিদ্বেষ আমাদের সমাজে বোধহয় সেই আর্য অনার্য বর্ণবৈষম্যের যুগ থেকেই গভীরভাবে নিহিত। বর্ণাশ্রমের মধ্যেও সেই বর্ণবৈষম্য প্রকারান্তরে স্বীকৃত। ব্রাহ্মণরা গৌরবর্ণ, ক্ষত্রিয়রা পীতবর্ণ, বৈশ্যরা রক্তবর্ণ, শূদ্ররা কৃষ্ণবর্ণ। এর তাৎপর্য কি আর্য, মঙ্গোলীয়, দ্রাবিড়, অস্ট্রিক? নৃতত্ত্ববিদ্‌রা এ ব্যাখ্যা দিতে পারেন। আমার যতদূর মনে হয় আমরা আমাদের পূর্বপুরুষদের কাছ থেকেই এই বর্ণঘটিত সংস্কার উত্তরাধিকারসূত্রে পেয়েছি। তাই ইংরেজদের দোষ দেবার আগে আত্মসমালোচনা করা উচিত। কালো মেয়ের দুঃখ দূর হলে কালা আদমীরও দুঃখ দূর হবে। সে জাতিহিসাবে শ্রদ্ধা ও সম্মান পাবে।

উচ্চবর্ণের বর্ণান্ধতা আমরা কে না লক্ষ করেছি? আমার বন্ধুর মাকে যখন পা ছুঁয়ে প্রণাম করি তিনি আমাকে আশীর্বাদ না করে তিরস্কার করেন। "ছি ছি! আমি এইমাত্র স্নান করে উঠেছি। শূদ্দুরটা আমাকে ছুঁয়ে দিল।" আমার নিজের মাও ছিলেন তেমনি শুচিবাতিকগ্রস্ত। বলেছিলেন, "বদ্দির মেয়েকে আমি আমার হেঁসেলে ঢুকতে দেব না।" তাঁর বোধহয় ধারণা কায়স্থরা বৈদ্যদের চেয়ে উঁচু জাত। কিন্তু বৈদ্যরা সেটা মানবেন কেন? চট্টগ্রামে আমার সাহিত্যিক

বন্ধু ছিলেন আশুতোষ চৌধুরী। তিনি কায়স্থ, তাঁর স্ত্রী বৈদ্য। চট্টগ্রামে এটা নতুন কিছু নয়, পুরাতন প্রথা। আশুবাবু একদিন আক্ষেপ করে বলেন, "শ্বশুরবাড়ী গেলে আজকাল আমাকে আলাদা খেতে দেয়। আমার শ্যালকরা আমার সঙ্গে খাবে না। কারণ আমরা কায়স্থ, ওরা বৈদ্য। কিন্তু শাশুড়ী আমাকে আগের মতো যত্ন করে খাওয়ান।" এটা হলো দেশভাগের প্রায় দশবছর আগের ঘটনা। আর আমার মায়ের ব্যবহারটা তার প্রায় ত্রিশ বছর পূর্বের। আর আমার বন্ধুর মায়ের ব্যবহার স্বাধীনতার পাঁচবছর পরের। বলতে ভুলে গেছি যে আমার বন্ধু ব্রাহ্মণ। নিজে একান্ত উদার।

বিলেতে থাকতে রবীন্দ্রনাথের একটি ভাষণের রিপোর্ট লণ্ডনের 'টাইমস' বা ম্যাঞ্চেস্টারের 'গার্ডিয়ান' পত্রিকায় পড়েছিলুম। কবি দুঃখ প্রকাশ করেছেন যে হিন্দুসমাজের এক জাতের লোক আরেক জাতের লোকের প্রতি কায়িকভাবে জুগুপ্সা বোধ করে। যতদূর মনে পড়ে, শব্দটা ছিল রিভালসন। কবি আর যা বলেছিলেন তা আমার মনে নেই। দেশ তখন মিস্ মেয়োর 'মাদার ইণ্ডিয়া' পড়ে ক্ষিপ্ত। কবির উক্তি নজরে পড়লে তাঁর উপরেও খাপ্পা হতো। আমাদের স্বাধীনতার দাবীটা দুর্বল হবে বলে আমরা আমাদের সমাজের সনাতন ব্যাধিগুলো গোপন করে ধর্মের ভেকটাকেই জগতের সামনে তুলে ধরতুম। স্বাধীনতা পেয়েছি, কিন্তু ব্যাধিমুক্তি এখনো বহুদূর। হরিজনদের উপর বিভিন্ন প্রান্তে যে অত্যাচারটা চলেছে সেটা আর্য আধিপত্যের যুগ থেকেই অব্যাহত। শম্বুকের মুণ্ডছেদ, একলব্যের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ ছেদ রামায়ণ মহাভারতে কীর্তিত হয়েছে। সেকালেও এদেশে দক্ষিণ আফ্রিকার মতো একপ্রকার আপার্টহাইড ছিল। শহরের বা গ্রামের এক এক এলাকায় এক এক জাতের বাসস্থান। যে যত নিচে সে তত দূরে। অস্পৃশ্যরা তো একদম বাইরে। এ ব্যবস্থা কি এখনো সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয়েছে?

স্বাধীনতার কিছুদিন আগে একবার এক ক্লাবে উচ্চপদস্থ বাঙালী অফিসাররা ইংরেজ রাজত্বের নিন্দাবাদ করছিলেন। চুপ করে শুনছিলেন বাঙালী সাবজজ মশায়। ব্রাহ্মণ কালেকটর সাহেব তাঁর দিকে চেয়ে জিজ্ঞাসা করেন, "কী মশায়, আপনি চুপ করে আছেন যে!" সাবজজ মুখ তুলে বলেন, "আমি জাতে রজক। আমলটা ইংরেজ আমল বলেই আমি সাবজজ হতে পেরেছি, আপনাদের সামনে চেয়ার পেতে বসতে পারছি। আপনাদের আমলে কি এটা সম্ভব ছিল? কেন তবে ইংরেজ রাজত্বের নিন্দাবাদ করব?" এ বিষয়ে সন্দেহ নেই যে ইংরেজরা এসে কতকগুলি জাতকে হিন্দুশাসনের অত্যাচার থেকে মুক্তি দিয়ে গেছে। তার জন্যে তাদের ধর্মান্তরিত করেনি। পরাধীনতাও কারো কারো পক্ষে উন্নতির সোপান হতে পারে। যেমন আদিবসী ও হরিজনদের পক্ষে। ব্রাহ্মণ কালেকটর রজক সাবজজের কথা শুনে নিজেই চুপ করে থাকেন। রামায়ণের যুগ হলে তাঁর মুণ্ডু কাটতেন, মহাভারতের যুগ হলে বুড়ো আঙুল কাটতেন।

এই দেশটিও একদা এক দক্ষিণ আফ্রিকা ছিল। দক্ষিণ ভারত এখনো সেই ঐতিহ্যের জের টেনে চলেছে। স্বাধীনতা অব্রাহ্মণদের পক্ষে আশীর্বাদস্বরূপ

হয়েছে, কিন্তু অব্রাহ্মণদের মধ্যে যারা অস্পৃশ্য তাদের শাপমোচন এখনো ঘটেনি। তাই তারা এবার বুদ্ধের শরণ নয়, মহম্মদের শরণ নিচ্ছে।

ধর্ম ও রাজনীতি

বছর কয়েক আগে আন্তর্জাতিক পি. ই. এন কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশন হয় সুইডেনের রাজধানী স্টকহোল্‌ম নগরে। সেই সূত্রে আমার কাছে একখানি চিঠি আসে। তার সঙ্গে একটি প্রস্তাবের খসড়া। খসড়াটি সেই অধিবেশনে উত্থাপন করতে চান আমেরিকার নিউইয়র্ক পি. ই. এন কেন্দ্রের একজন সদস্য। জানতে চান ভারতীয় পি. ই. এন কেন্দ্রের সমর্থন আছে কি না। প্রস্তাবের মর্ম ইরান সরকার যেসব বুদ্ধিজীবীকে দীর্ঘকাল বিনা বিচারে বন্দী করে রেখেছেন তাঁদের মুক্তি দিতে এই লেখক সম্মেলন অনুরোধ জানাচ্ছে। বন্দীদের একটা তালিকাও ছিল খসড়ার সঙ্গে জোড়া। সেটাতে চোখ বুলিয়ে দেখি পঁচিশ ত্রিশ-জনের নাম। কিন্তু এ কী! সাত আটজনের নাম কেন আয়াতোল্লা? ওটা কি নাম না পদবী না উপাধি? মানে কী ওর? আমার কেমন যেন সন্দেহ হয় যে এঁরা বোধহয় ধর্মগুরু। আমাদের মতে বুদ্ধিজীবী নন। এঁদের জন্যে দরবার করা পি. ই. এন সম্মেলনের সাজে না। তা হলে বেছে বেছে সুপারিশ করতে হয়। বাছাই করা আমার সাধ্য নয়। আমি উত্তর দিই যে ভালো করে খোঁজ-খবর না নিয়ে ঢালা সুপারিশ করা যায় না। আর খোঁজখবর নেওয়া আমাদের পক্ষে সহজসাধ্য নয়। তখন মনে হয়নি, পরে মনে হয়েছে যে মুক্তির আবেদন না করে বিচারের আবেদন করাই ছিল সঙ্গত। স্টকহোল্‌মে কী হলো তার বিবরণ প্রকাশিত হতে দেখিনি।

এর কিছুকাল পরে ইরানের শাহ্ আন্দোলনের চাপে দেশত্যাগ করেন ও সে আন্দোলন পর্যবসিত হয় ইসলামী বিপ্লবে। তার পুরোধা আয়াতোল্লা খোমেইনী। তখনি বোঝা গেল আয়াতোল্লা একটা নামও নয়, পদবীও নয়, উপাধিও নয়, শিয়া সম্প্রদায়ের জনা ত্রিশেক ধর্মগুরুর পদ। এঁদের মধ্যে প্রবীণতম যিনি তাঁর নাম রুহোল্লা ও পদবী খোমেইনী। ইনি বছর পনেরো আগে দেশত্যাগ করে প্রথমে ইরাকে ও পরে ফ্রান্সে আশ্রয় নেন। বিদেশ থেকেই আন্দোলনের নেতৃত্ব করেন। সুতরাং উপরোক্ত তালিকায় এঁর নাম থাকার কথা নয়। অন্তত আমার তো স্মরণ নেই। তবে আর যেসব আয়াতোল্লার নাম বিপ্লবের সঙ্গে জড়িত ও বিশ্বময় প্রচারিত তাঁদের অনেকের নাম বোধ হয় পি. ই. এন সম্মেলনে উঠেছিল। অন্তত বিবেচনাধীন ছিল। আহা, তখন যদি জানতুম যে এঁরাই হবেন একদিন ইরানের হর্তা কর্তা বিধাতা তা হলে এঁদের মুক্তির জন্যে আবেদন করে আমিও একজন ইসলামভক্ত ও বিপ্লবদরদী বলে আত্মপ্রসাদ অনুভব করতুম। কিন্তু বিপ্লবী জমানায় যেসব বুদ্ধিজীবীকে বিনা বিচারে বন্দী করা হয়েছে বা নামমাত্র বিচারে বধ করা হয়েছে বা দেশ থেকে পালিয়ে বাঁচতে হয়েছে তাদের কথা চিন্তা করলে আত্মপ্রসাদ অনুভব করা মনুষ্যত্ব নয়।

আর বাহাই সম্প্রদায়ের উপরে শুধুমাত্র বাহাই হওয়ার অপরাধে যে উৎপীড়ন চলেছে সে অন্যায়ের দায় আমার উপরেও অর্শাত।

বাহাইরা নানাদেশে বাস করেন, কোথাও রাজনীতিতে অংশ নেন না। কিন্তু বাহাই ধর্মের প্রবর্তক আবদুল বাহা স্বদেশ থেকে স্বেচ্ছা নির্বাসিত হয়ে প্যালেস্টাইনে শেষ জীবন যাপন করেন। সেখানেই স্থাপন করেন বাহাই ধর্মের আন্তর্জাতিক সদর। তখনো ইসরায়েলের উদ্ভব হয়নি। প্যালেস্টাইন ছিল তুরস্কের অধিকারে। অবস্থান পরিবর্তিত না হওয়ায় সদর এখন ইসরায়েলের অধিকারে। ইসরায়েল যেহেতু আরবদের শত্রু আর আরবদের বেশীর ভাগ ইসলামের অনুগামী সেহেতু ইরানেরও শত্রু। সুতরাং বাহাইরাও শত্রু। বিশেষ করে ইসলামী বিপ্লবের পর। সে বিপ্লব রাজনীতিকে ধর্মের সঙ্গে আর ধর্মকে রাজনীতির সঙ্গে একাকার করে আদি ইসলামী আদর্শ অনুসরণ করতে চায়। সে আদর্শ থেকে রাজা-রাজরারা দূরে সবে এসেছিলেন। মোল্লারাও রাজা-রাজরাদের উপর হুকুম জারি করেননি। তবে এটাও সত্য যে ইরানের বিংশ শতকের প্রথম গণতান্ত্রিক সংবিধানে মজলিস কর্তৃক আইন প্রণয়নের পরে মোল্লাদের অনুমোদনের প্রয়োজন ছিল, শুধু রাজার সম্মতিই যথেষ্ট নয়। সেই বাধ্যবাধকতা ক্রমে তামাদি হয়ে যায়। পবে তো গণতন্ত্রও তামাদি হয়। সেটা রাজাদের মর্জিতে। বিপ্লবের হেতু ছিল বইকি। তা বলে ইসলামী বিপ্লবের ? হ্যাঁ, এরও হেতু ছিল। যেখানে কমিউনিস্টরা সক্রিয় সেখানে রাজার পতন হলে তারাই হতো রাষ্ট্রের সর্বেসর্বা। তখন তাদের বিপক্ষে দাঁড়ায় কার সাধ্য! সেইজন্যে আগে থাকতে ক্ষমতা দখলের দরকার ছিল আর সেটা শস্ত্রের জোবে নয়, শাস্ত্রের জোরে। আয়াতোল্লারা হলেন শাস্ত্রবিশারদ। আয়াতোল্লা খোমেইনীর পরিচালনায় ধর্মোন্মাদ জনতা সশস্ত্র সৈনিকদের সম্মুখীন হয়। ওরাও স্বধর্মীদের ঘাতক হতে ভয় পেয়ে ভঙ্গ দেয়। ইরানের বিপ্লব বিপ্লবের ইতিহাসে অভূতপূর্ব।

পরবর্তী ঘটনাগুলো কিন্তু নজীরবিহীন নয়। শাহী জমানার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট আবালবৃদ্ধবনিতাকে একধার থেকে কোতল। হাতে পেলে সপরিবারে রাজারও শিরচ্ছেদ হতো। তাঁকে চিকিৎসার জন্যে হাসপাতালে ভর্তি হতে দেওয়ার প্রতি-শোধে আমেরিকান সরকারের দূতদের বিনা বিচারে বন্দী করা হয়। এক বছরের উপর তারা বন্দী থাকে। এটা রাজনীতিসম্মত হতে পারে, ধর্মসম্মত নিশ্চয়ই নয়। ইরানের নিষ্ঠুরতায় হতভম্ব হয়ে আমার এক উচ্চাপদারূঢ় মুসলিম বন্ধু বলেন, "এতে ইসলামেরই বদনাম হচ্ছে। লোকে মুসলমান বলে পরিচয় দিতে লজ্জা করবে।" কিন্তু ইসরায়েলবিদ্বেষ মুসলিম সাধারণের বিবেককে ঘুম পাড়ায়। মার্কিনরা যে ইসরায়েলের মিতা। শাহ্ও ছিলেন মিতার মিতা। মরুন না চিকিৎসার অভাবে। একমাত্র মিশরই তাঁকে আশ্রয় দেয়। তার জন্যে প্রেসিডেন্ট সাদাতেরও তো প্রাণ গেল। শাহ্ বা সাদাত কারো জন্যে শোকের লহর বয়ে গেল না ইসলামী দুনিয়ায়।

যীশুখ্রীস্ট বলেছিলেন, "সীজারকে দাও যা সীজারের, ঈশ্বরকে দাও যা

ঈশ্বরের।” তার মর্ম রাজনীতি ও ধর্ম অভিন্ন নয়, ভিন্ন। এই ভিন্নতাবোধ কিন্তু পরবর্তীকালের খ্রীস্টীয় সাধুরা পরিত্যাগ করেন। তাঁরা সঙ্ঘবন্ধ হয়ে এমন প্রভাব অর্জন করেন যে সঙ্ঘই রাষ্ট্রের উপর ক্ষমতা বিস্তার করে। সঙ্ঘের সর্বাধিনায়ক সম্রাটের উপর কর্তৃত্ব করেন। প্রয়োজনও ছিল স্বৈরাচারীর উপর নিয়ন্ত্রণের। নিরঙ্কুশের উপর অঙ্কুশের। চার্চের সঙ্গে পরে একদিন স্টেটের সংঘর্ষ বাধে। সংঘর্ষ থেকে ঘটে বিচ্ছেদ। অবশেষে এক অনুগত পাদ্রীই পোপের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। তাঁর পৃষ্ঠপোষক হন সম্রাটের অনুগত রাজন্যদের অনেকে। চার্চ দু'ভাগ হয়ে যায়। একভাগ থেকে যায় পোপের শাসনাধীন ক্যাথলিক। অপরভাগ প্রটেস্টাণ্ট, কিন্তু পোপের মতো কোনো এক-জনের শাসনাধীন নয়। বিভিন্ন রাজ্যের প্রটেস্টাণ্ট চার্চ বিভিন্ন রাষ্ট্রের উপর নির্ভর হয়। ইংলণ্ডের চার্চ চলে যায় রাজার রক্ষণাধীনে। তিনি হন ডিফেণ্ডার অভ্ দ্য ফেথ। কিন্তু তিনি যদি নিরঙ্কুশ হন তবে তাঁর উপর অঙ্কুশ প্রয়োগ করবে কে? ইংলণ্ড এর উত্তর দেয়, কেন? পার্লামেণ্ট? অর্থাৎ প্রজাদের প্রতি-নিধিসভা। চার্চ আর স্টেট দুটোর উপরেই আধিপত্য করে পার্লামেণ্ট। পার্লা-মেণ্টের একভাগের নাম হাউস অভ্ লর্ডস্। সেখানে অভিজাতশ্রেণীর ভূস্বামী-দের সঙ্গে আসন গ্রহণ করেন খ্রীস্টীয় সঙ্ঘের গোস্বামীরা। লর্ডস টেম্পোরাল তথা লর্ডস স্পিরিচুয়াল। আরেকভাগের নাম হাউস অভ্ কমনস। সেখানে বসেন জনসাধারণের নির্বাচিত প্রতিনিধিরা। প্রধানত ব্যবসাদার শ্রেণীর লোক। যাদের পরে বলা হয় বুর্জোয়া। অর্থাৎ নাগরিক। ইতিমধ্যে শ্রমিকরাও সেখানে প্রবেশ পেয়েছেন আর দলে ভারী হয়েছেন। ইতিহাস ক্রমেই বামদিকে যাচ্ছে। অঙ্কস্য বামা গতিঃ। ইংলণ্ডে সেটা বিপ্লবের রূপ না নিয়ে বিবর্তনের রূপ নিয়েছে। তবে বিপ্লবের রূপ যে একেবারেই নেয়নি তা নয়। রাজার উপরে পার্লামেণ্টের জয় নির্বিবাদে ঘটেনি। সশস্ত্র সংগ্রামের ভিতর দিয়ে যেতে হয়েছে কিন্তু এখন পর্যন্ত পার্লামেণ্টের উপর ট্রেড ইউনিয়নের জয় হয়নি। চরমপন্থীরাও চান পার্লামেণ্টকে সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী করতে। শুধু রাজনৈতিক ক্ষমতার নয় অর্থনৈতিক ক্ষমতার। কিন্তু তার দেরি আছে।

ইরান এখনো ধর্মীয় সংগঠনের উপর রাষ্ট্রকে জিতিয়ে দিতে পারেনি। ইসলামে চার্চ নেই, কিন্তু মোল্লাতন্ত্র বা উলেমাতন্ত্র রয়েছে। আয়াতোল্লাদের হাতে প্রায় দু'লক্ষ সর্বসময়ের কর্মী। তাঁদের তহবিলে অর্থ যোগায় দেশের বণিকশ্রেণী। বিশেষ করে তেহরানের ‘বাজার’। দেশের অসংখ্য মসজিদে তাঁদের ঘাঁটি। রাজার সাধ্য ছিল না তাঁদের সেসব ঘাঁটি থেকে তাঁদের হটিয়ে দেওয়ার। কিংবা তাঁদের জন্যে বণিকদের বরাদ্দ টাকায় হাত দেওয়ার। তবে তিনি চাষীদের স্বার্থে ভূমিসংস্কার করতে গিয়ে মালিকদের স্বার্থে ঘা দিয়েছিলেন। তাদের স্বত্ব খর্ব করেছিলেন। তার ফলে মোল্লাদের ক্ষমতাও খর্ব হয়। তাঁরা বিদ্রোহী হন। অথচ ভূমিসংস্কারের ইস্যুতে নয়। সেটাকে ধামাচাপা দিয়ে শাসন-সংস্কারের ইস্যুতে। এমনি করে জনসাধারণের সমর্থন পান। দেশে গণতন্ত্র থাকলে তাঁরা জনসাধারণের ভোটেই তাঁদের দলটাকে জিতিয়ে দিতেন।

গণতন্ত্রে রাজার অনীহা ছিল। অভিজাতদেরও অনিচ্ছা ছিল। ফরাসী বিপ্লবের সঙ্গে ইরানী বিপ্লবের সাদৃশ্য লক্ষণীয়। বৈসাদৃশ্য এইখানে যে ক্যাথলিক পাদ্রীরা পোপের প্রতি আনুগত্য ত্যাগ করেন না, তাই পোপের অনুগত রাজার আনুগত্যও ত্যাগ করেন না। শাসনসংস্কার তাঁদেরও কাম্য ছিল, কিন্তু রাজার বা রাজতন্ত্রের বিনাশ নয়। দেখা গেল বিপ্লবীরা চার্চের বিরুদ্ধেও জনতাকে ক্ষেপিয়েছে। চার্চের জমি কেড়ে নিয়েছে।

সেই অধ্যায়টা ইরানে শুরু হওয়ার সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু আয়াতোল্লারাই অগ্রণী হয়ে তার পথ রোধ করলেন। এতে তাঁদের প্রভাব প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পেয়েছে। তাঁরাই দল গঠন করে মজলিসে সংখ্যাগরিষ্ঠ হয়েছেন। নতুন সংবিধান প্রণয়ন করে দেশের লোকেরই হাতে ভোটাধিকার দিয়েছেন। ভোট পড়েছে তাঁদের দলেরই দিকে বেশী। কিন্তু তাঁদের নতুন সংবিধানও পুরাতন সংবিধানের মতো পার্লামেণ্টের উপর একজন ইমামকে স্থান দিয়েছে। তিনি অনুমোদন না করলে আইনও পাশ হবে না, প্রগতিও হবে না। প্রেসিডেণ্টও তাঁরই মনোনীত ব্যক্তি। প্রধানমন্ত্রীও তাঁরই আস্থাভাজন। প্রেসিডেণ্টের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রীর মতভেদ হলে যাকে তিনি রাখবেন তিনিই থাকবেন। অপরজনকে বিদায় নিতে হবে। এযাত্রা গেলেন প্রেসিডেণ্ট বানী সদর। পরের বার হয়তো যাবেন প্রধানমন্ত্রী। এটাও রাজার খামখেয়ালীর সঙ্গে তুলনীয়। রাজার মর্জির জায়গায় এসেছে ইসলামের মর্জি। রাজনীতির উপর সওয়ার হয়েছে ধর্মনীতি। কত লোকের প্রাণদণ্ড হয়ে গেল রাষ্ট্রদ্রোহের অপরাধে নয়, ধর্মদ্রোহের অপরাধে। অর্থাৎ ইমাম বা আয়াতোল্লাদের অমান্য করার অপরাধে। পান থেকে চুন খসলেও ধর্মদ্রোহ। ধর্মের এলাকায় পড়ে যাবতীয় সামাজিক আইন। একে আর ফরাসী বিপ্লবের সঙ্গে তুলনা করা যায় না। কোনো বিপ্লবের সঙ্গেই না। এ এক আজব চিড়িয়া।

স্পৃশ্যাস্পৃশ্য বিনিশ্চয়

সালটা বোধহয় ১৯২৮। স্থানটা ইংলণ্ড। একদিন 'টাইমস' বা 'ম্যানচেস্টার গার্ডিয়ান' খুলে দেখি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একটি বক্তৃতার সংক্ষিপ্ত রিপোর্ট ছাপা হয়েছে। সেটি ভারতেই প্রদত্ত। যতদূর মনে পড়ে পাঞ্জাবে। এতকাল পরে তার সমস্তটা মনে নেই। যেটুকু মনে দেগে গেছে সেটুকু এই যে মানুষের প্রতি মানুষের ফিজিকাল রিভালসন বা কায়িক ঘৃণা ভারতের লোকদের মজ্জাগত।

অর্থাৎ মানুষ মানুষকে ভিন্ন জাতের বা ছোট জাতের মানুষ বলে ঘেন্না করে। আশ্চর্যের ব্যাপার সে নিজেও তথাকথিত উচ্চতর জাতের দ্বারা ঘৃণিত। এমন কী একশ্রেণীর ব্রাহ্মণও অপর শ্রেণীর ব্রাহ্মণকে ঘৃণা করে। অন্তত কিছু-দিন আগেও করত।

কিন্তু যে কথাটা রবীন্দ্রনাথ বলেননি সে কথাটাও সমান সত্য। ঘৃণা জিনিসটা দিনের বেলা সকলের সামনে। রাতের বেলা নারীর সঙ্গে অন্ধকার

কক্ষে নয়। সে নারী দাসীও হতে পারে, বেশ্যাও হতে পারে, জন্মসূত্রে হাড়িও হতে পারে, ডোমও হতে পারে, চণ্ডালও হতে পারে, ম্লেচ্ছও হতে পারে, যবনও হতে পারে। উচ্চবর্ণীয় পুরুষ তাকে উচ্চবর্ণীয়া নারীর মতোই সাদরে গ্রহণ করে। মানুষটা তো ঘৃণ্য নয়ই, কাজটাও ঘৃণ্য নয়। পুরাণে ইতিহাসে এর ভুরি ভুরি দৃষ্টান্ত আছে। দৈনন্দিন জীবনেও এর যথেষ্ট উদাহরণ মেলে।

বিবাহ যেখানে সম্ভব নয় মিলন সেখানে সম্ভব। মিলনের ফলে যেসব সন্তান জন্মায় তারা সাধারণত সমাজেই স্থান পায, নয়তো তাদের নিয়ে আলাদা একটা জাত সৃষ্টি হয়। সেই জাতের জন্যে একটা পেশাও নির্দিষ্ট হয়। এমনি করে চার বর্ণের থেকে চার হাজার জাতের উৎপত্তি হয়েছে। কে কার চেয়ে বড়ো, কে কার চেয়ে ছোট এ নিয়ে তর্কবিতর্ক চার হাজার বছর ধরে চলে এসেছে। যে বড়ো সে ছোটকে ছোঁবে না, তার হাতে খাবে না, তার সঙ্গে সামাজিক সম্পর্ক পাতাবে না। তবে ডুবে ডুবে জল খেতে অরুচি নেই। উক্ত ক্রিয়া আদিকাল থেকে আজ পর্যন্ত অব্যাহত রয়েছে। হিন্দ সমাজ এটা স্বীকারও করে নিয়েছে। হিন্দু আইনে অবৈধ সন্তানকেও সম্পত্তি দানের ব্যবস্থা আছে। অবৈধ সন্তানেরও সম্পত্তি থাকলে বৈধ বিবাহ হয়। কাঞ্চন থাকলে কৌলীন্য পেতে সাধারণত দু' পুরুষেব বেশী সময় লাগে না। পিতার পদবীর পরিবর্তে আর একটা গালভরা পদবী জুটে যায়। কিছু টাকা খরচ করলে জাল কুলজীও তৈরি হয়।

আমার ছেলেবেলায় আমার বাবা আমাকে বলেছিলেন, "ভারতে এতগুলো জাত আছে। ইংরেজরা যদি এদেশে থেকে যেত তা হলে আরো একটা জাত বাড়ত। তাতে আমাদের কী ক্ষতি হতো ?" অর্থাৎ ভারতীয় সমাজে ইংরেজরাও হতো আরো একটা কাস্ট। কেবল হিন্দু মানস হয়, হিন্দু মুসলমান শিখ খ্রীস্টান নির্বিশেষে ভারতীয় মানস মানুষকে কাস্ট অনুসারে ভাগ করতে অভ্যস্ত। সেদিন উত্তরপ্রদেশে ব্যাকওয়ার্ড কাস্টের একটা তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে। তাতে দেখা গেল বেশ কয়েকটি কাস্ট ধর্মে মুসলমান। মুসলমানরাও যে কাস্ট মানে এটা আমার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা। চাষী মুসলমান ও তাঁতী মুসলমান ও জেলে মুসলমান এদের কারো সঙ্গে কারো জ্ঞাতা নেই। অর্থাৎ কেউ কারো জ্ঞাতি নয়। একই গ্রামে পাশাপাশি দুই মসজিদ। একটি 'গেরস্তদের', তার মানে চাষীদের। অপরটি 'মোমিনদের', তার মানে জোলাদের। ধীবর বা 'ধাওয়াদের' মর্যাদা আরো নিচে। অবস্থাও আরো খারাপ।

এটা লক্ষণীয় যে ছোট ও বড়ো বিচার করার সাধারণ মাপকাঠি হচ্ছে সম্পত্তি ও পেশা। কতকগুলি পেশা খুবই নোংরা বা নিন্দনীয়। তেমন অর্থকরীও নয়। যেমন মুচি, মেথর ও মুদ্দফরাসের কাজ। চামার শুনলেই হিন্দুর মনে ঘৃণা জাগে। ওরা মরা গোরু তুলে নিয়ে যায়, চামড়া ছাড়ায়, কেউ কেউ সন্দেহ করে যে মাংসটাও কাজে লাগায়। চণ্ডাল বললে শ্মশানের অনুষঙ্গ মনে আসে। সেকালে ওরাই অপরাধীকে শূলে চড়াত বা তার মাথা কাটত। নিন্দনীয় পেশার মধ্যে একটিই ছিল অর্থকরী। সেটি শৌণ্ডিকের। সমাজে প্রতিষ্ঠা পেতে হলে

তাকে জমিদারি কিনতে হতো, প্রাসাদ বানাতে হতো, দান খয়রাত করতে হতো। কসাই বৃত্তিও তেমনি হীন বৃত্তি। আমার আদালতে শহরের বেশ্যারা সাক্ষী দিতে এলে তাদের পেশার ঘরে লেখা হতো 'বেশ্যা' নয়, 'পেশাকার'। লিখতে গিয়ে আমার পেশকারের মুখখানা গম্ভীর হয়ে যেত। জিজ্ঞাসা করতুম, "তোমার নাম কী?" উত্তর পেতুম, "পারুলবালা পেশাকার।" ওটিও একটি নিন্দিত পেশা, মর্যাদায় খাটো, কিন্তু কারো কারো জীবনে সে পেশা অর্থকরী। প্রাচীন সাহিত্যে গণিকাদের মর্যাদা প্রায় শ্রেষ্ঠীদের অনুরূপ। এটা কেবল প্রাচীন ভারতে নয়, প্রাচীন গ্রীস রোমেও। প্রাচীন তথা আধুনিক জাপানেও। কিন্তু গেইশাদের অধিকাংশই গরীব দুঃখী।

মোটের উপর বলা যেতে পারে, যে যত নিচে সে তত শোষিত, যে যত শোষিত সে তত নিচে। কিন্তু এমনও দেখা গেছে যে পুরোহিত পেশার লোকেরা খেতে পরতে পায় না, কুঁড়েঘরে থাকে, অথচ তাদের হাতেই শাস্ত্র, তাদের সঙ্গেই ঠাকুরদেবতাদের নিবিড় সম্পর্ক, অন্নপ্রাশন থেকে অন্ত্যেষ্টি পর্যন্ত দশ-কর্ম তাদের দ্বারাই নিষ্পন্ন হয়, তাদের অভিশাপ সর্বনাশা, তাই তাদের ভয় করে রাজাপ্রজা ধনিকশ্রমিক নির্বিশেষে প্রত্যেকটি হিন্দু। ইউরোপেও ভয় করত রোমান ক্যাথলিক পুরোহিতকুলকে। তাঁরা ছিলেন দারিদ্র্য ও ব্রহ্মচর্যব্রতধারী। তাঁদের ধর্মগুরু পোপ ইচ্ছা করলে রাজাকে সমাজচ্যুত করতে পারতেন, তখন তাঁর সিংহাসন টলমল করত। তিনি মারা গেলে তাঁর শেষকৃত্য দুষ্কর হতো। বিয়ে করতে চাইলে বিয়ের মন্ত্রই বা পড়াবে কে? ব্যাপটিজম না হলে কেউ খ্রীস্টান বলেই গণ্য নয়। সুতরাং একঘরে। গত কয়েক শতাব্দীতে বার্থ রেজিস্ট্রেশন, সিভিল ম্যারেজ, বৈদ্যুতিক চুল্লীতে ক্রিমেশন প্রভৃতি প্রবর্তিত হয়েছে। পুরোহিতকুলের সে একচেটে পসার আর নেই। কিন্তু তাদের প্রভাব প্রতিপত্তি ও মর্যাদা এখনো প্রভূত। কারণ ক্যাথলিক হয়ে থাকলে তাঁরা কামিনী-কাঞ্চনত্যাগী। প্রটেস্টান্ট হয়ে থাকলে কাঞ্চনত্যাগী। শোষক শ্রেণী বনাম শোষিত শ্রেণীর ছকের মধ্যে তাঁদের ফেলা যায় না।

মানুষের ইতিহাসে বিভিন্ন দেশে লক্ষিত হয় শাস্ত্র, শস্ত্র ও ধনসম্পদ এই তিনটি যাদের অধিকারে তারাই সমাজের তথা রাষ্ট্রের উপরতলার অধিবাসী। আর সকলে নিচের তলার। তারা শ্রমজীবী! তারা কৃষিজীবী। তারা সাধারণ পদাতিক সৈনিক। নিচের তলার নিচেও একটা বেসমেন্ট থাকে। সেখানে বাস করে দিনমজুর, ভিক্ষুক, পতিতা, জাতিচ্যুত, মেথর, মুদ্দফরাস, চামার, হিজড়ে প্রভৃতি মানুষ। অবাক কাণ্ড। জাপানেও অস্পৃশ্য জাত আছে। 'সদ্গতি' নামক কাহিনীতে প্রেমচন্দ্ একটি চামারের জীবনের ট্রাজেডী এঁকেছেন। তাকে টেলিভিসনে রূপায়িত করেছেন সত্যজিৎ রায়। ওই লোকটি চামার না হয়ে কামার হলে ওর দুর্গতি হতো না। চামার বললেই তার সঙ্গে আসে হিন্দুদের উপাস্য দেবতা গোমাতার সঙ্গে তার ম্লেচ্ছসুলভ সম্পর্ক। আর ম্লেচ্ছের প্রতি হিন্দুসমাজ হৃদয়হীন। শুধু ওই ব্রাহ্মণটিকে দোষ দিলে কী হবে? যাদের উত্তরপ্রদেশে 'ঠাকুর' বলা হয় সেই রাজপুতরাই বা কম কী? খুন জখম পুড়িয়ে মারার

মামলাগুলোতে ব্রাহ্মণ রাজপুত যাদব কেউ কারো চেয়ে কম যায় না। দক্ষিণ ভারতে ব্রাহ্মণদের চেয়ে অব্রাহ্মণদেরই ক্ষমতা বেড়ে গেছে, তাই অত্যাচারও বেড়ে গেছে। সূর্যের চেয়ে বালির তেজ বেশী। স্বাধীনতার পরে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের প্রতাপ কমে গেছে, বৈশ্য ও সৎশূদ্রের প্রতাপ তুঙ্গে উঠেছে। সৎশূদ্ররা আজকাল উপবীত নিয়ে ক্ষত্রিয় বলে পরিচয় দেয়। গোকুলের গোপ-গোপীরা নাকি যদু-বংশের যাদব-যাদবী। জোত যার জোর তার। জমিদার গেছে। জোতদার এখন গ্রামের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা। দিনমজুর শ্রেণীর হরিজনদের মাথা তুলতে দেখলে তারা মাথা গুঁড়িয়ে দেবে। এর অবশ্যম্ভাবী পরিমাণ গ্রাম থেকে শহরে পলায়ন। শহরে এসে ওরা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে। ফুটপাথে পড়ে থাকে। সেইখানে আহার নিদ্রা মৈথুন। নতুন এক সমস্যা সন্দেহ নেই, কিন্তু আমরা কি তেমনি নেশন যে স্বেচ্ছায় উপবীত ত্যাগ করব, উপনয়ন ত্যাগ করব, দেব আর দাস বলে সমাজকে দুই ভাগে বিভক্ত করব না? এদেশে দেবদেবীদের এত বেশী প্রভাব যে ছোট বড়ো সবাই চায় দেবদেবী বলে পরিচয় দিতে। মানবমানবী বলে নয়। তেত্রিশ কোটি দেবদেবীর উপর আরো তিপ্পান্ন কোটি দেবদেবী।

আরো গভীরে যেতে হবে। ভারতে যুগে যুগে ভিন্ন ভিন্ন জাতির লোক এসেছে। জাতি অর্থে 'রেস'। 'কাস্ট' নয়। ভারত বরাবরই চেষ্টা করেছে 'রেস'কে 'কাস্ট'-এ পরিণত করতে। কারণ সেইটেই ভারতের কাঠামো। গ্রীক আর পারসিক, শক আর কুশান, হূন আর আহোম, প্রত্যেকেই এক বা একাধিক 'কাস্টে' সামিল হয়ে গেছে। হয়নি কেবল তুর্ক আর মোগল আর পর্তুগীজ আর ইংরেজ। কারণ এরা ধর্মে মুসলমান বা খ্রীস্টান। আমি পার্শী আর ইহুদীদের উল্লেখ করলুম না। তারা মুষ্টিমেয়। তবে হিন্দু সমাজে 'কাস্ট' হিসাবে গণ্য না হলেও তারাও প্রকারান্তরে এক একটি 'কাস্ট'। যদিও তাদের বেলা 'রেস' হিসাবে আইডেনটিটিই শেষ কথা। সেই অভিমান ইংরেজদের বেলাও সত্য, তাই ওরা এদেশে বসবাসই করল না। আমার বাবার থিওরি কাজে লাগল না। তুর্ক, মোগল ও পর্তুগীজ বংশীয়রা এদেশে বসবাস করতে করতে ভারতীয় বনে গেছে, কিন্তু হিন্দু বনেনি। ফলে হিন্দুদের কাস্ট সিস্টেমের সঙ্গে খাপ খায়নি। এই অসামঞ্জস্যের পরিণাম হয়েছে দেশভাগ। তা সত্ত্বেও অসামঞ্জস্য দূর হয়নি। আমাদের অনেকের মতে এর একমাত্র সমাধান কাস্ট সীস্টেম লোপ করা। ডক্টর আম্বেদকার গান্ধীজীকে এই মন্ত্রণা দিয়েছিলেন। তখন অগ্রাহ্য করলেও গান্ধীজীও পরে একই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন। তিনিও চেয়েছিলেন 'কাস্টলেস সোসাইটি'। তাঁর শেষ সিদ্ধান্ত ছিল, "Caste is a form of graded untouchability.'

তার মানে প্রেমচন্দের ওই চামারটিও আরো নিচু জাতের বেলা অস্পৃশ্যতা মানে। বিয়ে সাদীর বেলা সেটা প্রকট হয়। জ্ঞাতি ভোজনের বেলাতেও। চামার যদি শহরে গিয়ে কলমজুর হয় কেউ তাকে চামার বলে চিনতে পারবে না, সে অনায়াসে জলচল হবে, কিন্তু গ্রামের গোরু মারা গেলে সৎকার করবে কে? চামড়া ছাড়াবে কে? চামড়ার ব্যবসা মার খাবে না? একই কথা খাটে মেথর

মুদ্দফরাস প্রভৃতির বেলা। হিন্দুসমাজের চিরাচরিত শ্রমবিভাগ বিপর্যস্ত হবে। গ্রামীণ অর্থনীতি ক্ষতিগ্রস্ত হবে। হরিজন সমস্যার মোক্ষম সমাধান হচ্ছে ভারতের শিল্পায়ন। ভারতকে আর একটা রাশিয়ায় বা আমেরিকায় বা জাপানে পরিণত করা। কিন্তু পরে হয়তো মালুম হবে যে রোগটার চেয়ে দাওয়াটাই আরো খারাপ। হরিজন হবে প্রোলিটারিয়ান, কিন্তু ক'জন প্রোলিটারিয়ান নিম্নতম স্তর থেকে উচতম স্তরে ওঠবার সুযোগ পাবে ? তখন ওরা সবাই মিলে একটা সাংস্কৃতিক বিপ্লব ঘটাবে। চীনদেশে তেমন বিপ্লব সফল হয়নি। ভারতে কি হবে ?

'সদ্‌গতি'র মতো ঘটনা বাংলাদেশে ঘটতে পারত না। বাংলাদেশ বলতে আমি অবিভক্ত বাংলার কথাই বলছি। এখানে প্রত্যেকটি জাতের নিজস্ব 'ব্রাহ্মণ' আছে। নমঃশূদ্রদের 'ব্রাহ্মণ'রাও অন্তত পঞ্চাশ বছর আগে থেকে মুখোপাধ্যায়, বন্দ্যোপাধ্যায়, লাহিড়ী, ভাদুড়ী ইত্যাদি পদবী ধারণ করেছেন। এঁরাও উপবীতধারী। উপবীত আজকাল কে না নিচ্ছে ? বাংলাদেশে কেবল ব্রাহ্মণদেরই উপবীত ছিল, আর কোনো জাতের ছিল না। গত শতাব্দীতে বৈদ্যরাও উপবীত ধারণ করেন, এ শতাব্দীতে কায়স্থরাও, এঁদের দেখাদেখি অন্যান্য জাত। একদিন এক স্কুল পরিদর্শন করতে গিয়ে শুনি মাস্টার মশায়েব পদবী নৈ শর্মা। সেন শর্মা, দাশ শর্মা এঁদের সঙ্গে পরিচিত হয়েছি, কিন্তু নৈ শর্মা ? আজকাল কাউকে তার জাত নিয়ে প্রশ্ন করা অভদ্রতা। তখনকার দিনে অভদ্রতা ছিল না। মাস্টার মশায়কে জিজ্ঞাসা করিনি। কিন্তু সেক্রেটারি মশায়কে করেছি। উত্তর পেয়েছি, নাপিত। নাপিতরা আর নাপিত নয়, ওরা নৈ। নবশাখ নয়, ব্রাহ্মণ। অতএব শর্মা। ঘটনাটা ১৯৩৫ বা '৬ সালের। তারপর গঙ্গা দিয়ে অনেক জল গড়িয়ে গেছে। ব্রাহ্মণের ছেলে ছুতোরমিস্ত্রির কাজ করছে দেখলে আজকাল কেউ আশ্চর্য হয় না, কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার ছুতোরমিস্ত্রিকে তাঁর নাম জিজ্ঞাসা করলে পাওয়া যাবে শ্রীঅমুকচন্দ্র শর্মা। তাঁরও উপবীত আছে। শর্মার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বর্মার সংখ্যাও অগণ্য। সঙ্গে সঙ্গে আর্থিক উন্নতির নানান দরজা খুলে গেছে। জাত ব্যবসা ছাড়াও অন্য ব্যবসা করা চলে। ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থ সবাই তাই করছেন। অতএব কামার, কুমোর, ছুতোর কেন করবে না ? মহাত্মা গান্ধী যাঁদের হরিজন বলে চিহ্নিত করেছিলেন ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট তাঁদের তফশীলভুক্ত করে বিশেষ সুযোগ সুবিধা দিয়ে যান। স্বাধীনতার পরেও তাঁরা তেমনি তফশীলভুক্ত কিন্তু 'হরিজন' শব্দটা তাঁদের পক্ষে অসম্মানকর। তাঁরা এখন যে যার জাত রক্ষা করে পৈতে নিয়ে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য বর্ণভুক্ত হতে তৎপর। অর্থাৎ তাঁরাও দ্বিজ। পঞ্চাশ বছর বাদে শূদ্র বলে কেউ থাকবে না। চারটি বর্ণের একটি অচলিত হবে।

তার মানে কি কাস্ট অদৃশ্য হবে ? কাস্ট অদৃশ্য হওয়া দূরে থাক, কাস্ট ওয়ার নানা স্থানে দেখা যাচ্ছে। যে যার কাস্ট রক্ষা করতে বদ্ধপরিকর। সেটাই তার আইডেন্টিটি। হিন্দুর যখন জাত যায় বৈষ্ণব হয়। কালক্রমে বোষ্টমও একটা কাস্ট। জৈনদের মধ্যে, বৌদ্ধদের মধ্যে, শিখদের মধ্যেও কাস্ট আছে।

খ্রীস্টান, মুসলমানদের মধ্যেও। আমার এক সহকর্মী বলেন, "আমরা রাজপুত মুসলমান।" ওঁরা আর কোনো মুসলমানদের সঙ্গে বিয়ে সাদী করেন না। কিন্তু অবাক কাণ্ড তাঁদেরি হিন্দু রাজপুত জ্ঞাতিদের সঙ্গে করেন। দ্বিজাতিতত্ত্বের জ্বলন্ত প্রতিবাদ। এক মুসলমান সহযাত্রী আমার জামাতাকে বলেছিলেন, "আমরাও গোত্র মানি। বাপ যখন মারা যান তখন ছেলেকে বলে যান গোত্রের নাম।" সমাজে ওটা গোপন রাখা হয়।

আমার নিজের ধারণা ট্রাইব ছিল সকলের আগে, তার পরে এল কাস্ট, তার পরে এল বর্ণ। এল শ্বেতকায় আর্যভাষী বিদেশীদের সঙ্গে। সাম্প্রতিক গবেষণার ফলে জানা গেছে যে 'আর্য' বলে কোনো একটা 'রেস' ছিল না। কিন্তু 'আর্য' বলে একটি ভাষাগোষ্ঠী ছিল। আমরা এতদিন একটা ভ্রান্তি পোষণ করে এসেছি। 'আর্য' আর 'অনার্য' বলে দুটো ভাষাগোষ্ঠী ছিল। দুটো 'রেস' ছিল না। সব দেশে যেমন দেখা যায় এদেশেও তেমনি। বিদেশীরা বিজেতা হয়ে শাসনযন্ত্র দখল করে বসে। ওদের সঙ্গে আসে একদল বণিক। তারা ব্যবসা বাণিজ্য করে। আসে একদল ধর্মপ্রচারক। তারা নেটিভদের ধর্মান্তরিত করে। ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও ব্রাহ্মণ এই তিনটি শাখা কেবল ভারতে নয়, ভারতের বাইরেও দেখা গেছে। দেশভেদে নাম ভিন্ন। এই তিনটি শাখাই এদেশে তিনটি বর্ণ বলে অভিহিত হয়। এই তিন বর্ণেরই উপবীত ধারণে অধিকার। এরাই দ্বিজ। আগে থেকে যারা ছিল সেই নেটিভরা হলো শূদ্র। অর্থাৎ ক্ষুদ্র। অর্থাৎ ছোটলোক বা ছোট জাত।

কিন্তু 'নেটিভরাও' তো সবাই সমান ছিল না। তাদের মধ্যে ছিল আরো পুরাতন স্তরভেদ। একেবারে নিচের স্তরে যারা ছিল তারাই আদিম, আদিম বলেই অন্ত্যজ। দক্ষিণ ভারতে এমন কয়েকটি জাত আছে যারা শুধু অস্পৃশ্য নয়, অদৃশ্য। তাদের মুখ দেখতে নেই। তারা যদি মুখ দেখাতে যায় তবে কঠোর সাজা পায়। ভারতে আর্যভাষীদের আগমনের পূর্বেই এদেশের সমাজ-ব্যবস্থায় ট্রাইব ছিল, কাস্ট ছিল, অস্পৃশ্যতা ছিল, অদৃশ্যতা ছিল। সে সমাজের নাম কী ছিল কেউ জানে কেউ জানে না। তাকে হিন্দু সমাজ বলা শুরু হয় ইসলামধর্মী আরব ও তুর্কদের সমাজের থেকে পৃথক করতে। এরাও তিন শাখায় বিভক্ত। একদল রাজত্ব করে, একদল বাণিজ্য করে, একদল ধর্মপ্রচার করে। এরাও একপ্রকার দ্বিজ। এদের বলা হয় আশরাফ। ধর্মান্তরিত 'নেটিভ' মুসলমানরা আতরাপ। প্রকারান্তরে শূদ্র বা ছোটলোক। এর পরে আসে ইংরেজ ফরাসী পর্তুগীজরা। এরাও তিন শাখায় বিভক্ত। শাসক, বণিক, ধর্ম-প্রচারক। এরাও একপ্রকার দ্বিজ। ধর্মান্তরিত 'নেটিভ' খ্রীস্টানরা প্রকারান্তরে শূদ্র বা ছোটলোক। শ্বেতাঙ্গরা গেছে, আশরাফরা আছে, দ্বিজরা আছে।

আগন্তুকরা সঙ্গে করে যথেষ্টসংখ্যক নারী নিয়ে আসত না। সেকালে পথঘাট ছিল বিপৎসঙ্কুল। নারী হরণের আশঙ্কা ছিল। এদেশে এসে আর্য-ভাষীরা নারীর অভাব অনুভব করেন। কখনো বৈধভাবে, কখনো অবৈধভাবে দেশীয় নারীর সঙ্গে মিলিত হন। আরব, তুর্ক ও মোগলদের বেলাও তাই।

ইংরেজ, ফরাসী, পর্তুগীজদের বেলাও তাই। এটা একটা 'লৌহ নিয়ম' (Iron Law), এ নিয়ম সর্বত্র সক্রিয়। একে অতিক্রম করার জন্যে দক্ষিণ আফ্রিকার শ্বেতাঙ্গরা আপার্টহাইড (apartheid) প্রবর্তন করেছে। কিন্তু তার তিন শতাব্দী পূর্বেই রক্তের মিশ্রণ শুরু হয়ে গেছে। আমাদের পূর্বপুরুষরাও রক্তের মিশ্রণ রোধ করার জন্যে একপ্রকার আপার্টহাইড প্রবর্তন করেছিলেন। কারা থাকবে গ্রামের বা শহরের ভিতরে, কারা বাইরে। কারা থাকবে কোন্ পাড়ায়, কোন্ মহল্লায়। এসব আমি দেশীয় রাজ্যে ছেলেবেলায় চাক্ষুষ করেছি। ব্রাহ্মণদের বসতির নাম 'ব্রাহ্মণ শাসন'। সেখানে ঢুকতে ভয় করত। আমার এক প্রাইভেট টিউটরের আমন্ত্রণে তাঁর অতিথি হয়েছি। কটকের কাছে একটি 'ব্রাহ্মণ শাসন' আছে, সেখানে এখনো অব্রাহ্মণদের প্রবেশ নিষেধ। একমাত্র ব্যতিক্রম হচ্ছে রজক। সে কাপড় কাচতে নিয়ে যায়, কেচে দিয়ে যায়।

পৃথিবীতে সব চেয়ে দীর্ঘস্থায়ী হচ্ছে ভারতের হিন্দুদের আপার্টহাইড। এর জন্যে দায়ী শুধু ব্রাহ্মণরা নয়, দায়ী ক্ষত্রিয় বৈশ্যরাও, দায়ী উচ্চশ্রেণীর শূদ্ররাও। উদারতা যেটুকু দেখা যাচ্ছে সেটুকু ঊনবিংশ শতাব্দীর রেনেসাঁস ও রেফরমেশনের কল্যাণে। সেইসঙ্গে শিল্পায়ন তথা নগরায়নের প্রভাবে। নারী-জাগরণ ও শূদ্রজাগরণ যদি অব্যাহত থাকে আমূল পরিবর্তন আশা করতে পারি। স্ত্রীশূদ্রকে অবদমিত রাখাই ছিল শাস্ত্রকার ও শস্ত্রধারীদের চিরাচরিত নীতি ও রীতি। এতে স্ত্রীশূদ্রও সহযোগিতা করেছিল। বিদ্রোহের বা বিপ্লবের কথা পুরাণে ইতিহাসে লেখে না। প্রতিরোধ না করলে সব অন্যায়ই চিরস্থায়ী হয়। তখন তাকে বলা হয় ধর্মের অঙ্গ।

উদ্‌ভট

আমার যৌবনকাল কেটেছে ইউরোপীয় লিবারলদের আকাঙ্ক্ষিত প্রগতিশীল বিশ্বের ধ্যানধারণায়। তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে টলস্টয়, রাস্‌কিন, থোরো, গান্ধীর ইউটোপীয় আদর্শবাদ ও তার রূপায়ণের পরিকল্পনা। কিন্তু অস্তাচলের প্রান্ত থেকে উদয়াচলে তাকিয়ে অবাক হয়ে দেখছি একটার পর একটা উদ্‌ভট এসে ইতিহাসের মঞ্চে অবতীর্ণ হয়েছে। যার কোনো বাস্তব ভিত্তি ছিল না তাই হয়েছে বাস্তব।

আমার মুসলমান বন্ধুরা কি কোনোদিন ভাবতে পেরেছিলেন যে ইংরেজ চলে গেলে তাঁদের দিয়ে যাবে পাকিস্তান বলে স্বতন্ত্র একটি রাষ্ট্র? যখন ভাবতে আরম্ভ করেন তখনো তাঁদের কাম্য ছিল হিন্দু মুসলমানের সমঝোতা ও সহ-অবস্থান। ভারতীয় মুসলমানরা একাই একটা নেশন হবে ও পাকিস্তান হবে সেই নেশনেরই একার বাসভূমি। এতদূর যেতে আমার পরিচিত কেউ রাজী ছিলেন না। কারণ সেক্ষেত্রে তাঁদের সবাইকেই 'হিন্দুস্থান' থেকে বিদায় নিয়ে যেতে হতো 'পাকিস্তানে'। এমন নির্বোধ কেউ ছিলেন না যে সত্যি সত্যি লোকবিনিময় ঘটিয়ে কলকাতাকে হিন্দুশূন্য আর দিল্লীকে মুসলিমশূন্য করতেন।

অথচ ঠিক এই জিনিসটিই হতে যাচ্ছিল দেশভাগের সঙ্গে সঙ্গে, যদি না কলকাতা পড়ে যেত 'হিন্দুস্থানে' ও যদি না গান্ধীজী প্রথমে কলকাতায় ও পরে দিল্লীতে লোকবিনিময়ের বিরুদ্ধে সমগ্র শক্তি নিয়োগ করতেন ও আক্ষরিকভাবে প্রাণপাত করতেন। পাকিস্তান এমনিতেই একটা উদ্ভট তত্ত্ব। লোকবিনিময় তার চেয়েও উদ্ভট। কিন্তু সর্বাপেক্ষা উদ্ভট হচ্ছে ইসলামী রাষ্ট্র। যার নজীর ভারতের ইতিহাসে নেই। ভারতের লোক মুসলিম রাজত্বে দীর্ঘকাল বাস করেছে, কিন্তু ইসলামী রাষ্ট্রে কোনোদিন বাস করেনি। মাঝে মাঝে জিজিয়া কর ধার্য করা হয়েছে, কিন্তু হিন্দুরা প্রতিবাদ করলে সুলতান ও বাদশারা সেটা রহিত করেছেন। সৈন্যদলে হিন্দুদেরও নেওয়া হয়েছে। সেনাপতির পদও দেওয়া হয়েছে। অথচ কাউকে ইসলামের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করতে বলা হয়নি। আনুগত্য বরাবরই রাজার কাছে। তা তিনি হিন্দুই হোন আর মুসলমানই হোন। রাজাও প্রজার কাছে অপর কোনো আনুগত্য দাবী করেননি। কাউকে বলেননি যে রাজার উপরেও রাজধর্মের প্রতি অনুগত হতে হবে। সেটা ছিল রাজার ব্যক্তিগত আনুগত্য। ইসলাম এদেশের রাজধর্ম হলেও 'স্টেট রিলিজন' হয়নি। হলো পাকিস্তানী আমলেই।

আমরা এই উদ্ভটের পালটা উদ্ভটকে মঞ্চে নামাইনি। হিন্দুপ্রধান ভারত-রাষ্ট্রকে 'হিন্দু নেশনে'র একার রাষ্ট্র বানাইনি, ভারতকে করিনি হিন্দুদের একার বাসভূমি। 'হিন্দু নেশন' নামক তত্ত্বটাকেই অস্বীকার করেছি। তবে এটাও সত্য যে পালটা উদ্ভট এই ভূখণ্ডেও সক্রিয়। হিন্দী ও মরাঠী ভাষায় ইংরেজী 'নেশন' শব্দটির পারিভাষিক শব্দ জাতি নয়, 'রাষ্ট্র'। 'হিন্দু রাষ্ট্র' বলতে বোঝায় 'হিন্দু নেশন'। 'রাষ্ট্রভাষা' বলতে বোঝায় 'ন্যাশনাল ল্যাঙ্গুয়েজ'। নেশন আর স্টেট সমার্থক হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই বিভ্রান্তির পরিণাম অশুভ। 'হিন্দ্, হিন্দু, হিন্দী, এই তিন মূর্তি' ইতিমধ্যেই প্রভূত ক্ষতি করেছে। আরো করবে, যদি না হিন্দুরাষ্ট্রবাদীরা নিরস্ত ও নিরস্ত্র হয়।

কিন্তু হবার সম্ভাবনা কতটুকু, যদি না পাকিস্তান সেকুলার হয়? পাকিস্তান সেকুলার হওয়া দূরে থাক দিন দিন উৎকটভাবে ইসলামী হচ্ছে। তার প্রেরণা আসছে ইসলামী দুনিয়া থেকে। চারদিকে ইসলামের পুনর্জাগরণের লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। পাকিস্তান তার ব্যতিক্রম নয়। এটাও উদ্ভট। এই ইসলামী পুনর্জাগরণ। ইসলামিক রিভাইভাল। এটা ইউরোপীয় অর্থে রেনেসাঁস তো নয়ই, রেফরমেশনও নয়। মানুষ ফিরে যেতে চাইছে তেরো শ' বছর আগে। হজরত মহম্মদের যুগে। চার খলিফার যুগে। যেন ইচ্ছা করলেই বৃদ্ধবয়সে যৌবনে ফিরে যাওয়া যায়। যৌবনের তেজ বীর্য সর্বাঙ্গে অনুভব করা যায়। একদিন মোহভঙ্গ অবশ্যম্ভাবী। পেট্রলের অর্থে এরা হঠাৎ বড়লোক হয়েছে, কিন্তু যুদ্ধে জড়িয়ে পড়লেই টের পাবে যে সেকালের সেই দিগ্বিজয়ের পরিবর্তে ঘটবে পরাজয়। ইতিমধ্যে ক্ষুদ্রকায় ইসরায়েলের সঙ্গে যতবার যুদ্ধে নেমেছে ততবার হেরেছে। কারণ ইসরায়েল আধুনিক জ্ঞানবিজ্ঞানে তথা অর্থনীতিতে বহুদূর অগ্রসর, কেবল অস্ত্রশস্ত্রেই নয়। ইসরায়েল আধুনিক ইউরোপের অঙ্গ।

ইউরোপীয় রেনেসাঁসের উত্তরাধিকারী। তবে রেফরমেশন থেকে বঞ্চিত। সেই-দিক থেকে ইসরায়েলও উদ্‌ভট।

পৃথিবীতে ইহুদীদের মতো প্রগতিশীল কে? কিন্তু তাদের মধ্যেও একটা পিছুটান ছিল। দু' হাজার বছর ধরে তারা প্রতিদিন প্রার্থনা করে এসেছিল যে তাদের নিজেদের দেশে তারা আবার ফিরে যাবে ও নিজেদের রাষ্ট্র আবার ফিরে পাবে। তাদের প্রার্থনা সত্যি সত্যি সফল হলো বিংশ শতাব্দীতে এসে। দুই মহাযুদ্ধেই তারা ছিল মিত্রশক্তির সহায়ক। তাই মিত্রশক্তির জয়ের শরিক। মিত্রশক্তির প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সমর্থনে তারা ইসরায়েল রাষ্ট্র পুনঃপ্রতিষ্ঠা করে। ইতিহাসে এমনতরো উদ্‌ভট কেউ কখনো দেখেনি। দু'হাজার বছর পরে পলাতকরা ফিরে এসে আবার রাজা হয়েছে।

ইহুদীদের 'হোমল্যাণ্ডে'র অনুকরণে এসেছে লীগপন্থী মুসলিমদের 'হোমল্যাণ্ড'। ইহুদীদের নিজস্ব রাষ্ট্র ইসরায়েলের অনুকরণে এসেছে লীগপন্থী মুসলিমদের 'নিজস্ব' রাষ্ট্র পাকিস্তান। এক উদ্‌ভটের থেকে আরেক উদ্‌ভট। ইতিহাসের এই উদ্‌ভট পরম্পরার নবতম আবির্ভাব ইরানের ইসলামী বিপ্লব। রেনেসাঁস নয়, রেফরমেশন নয়, রেভোলিউশন। ইতিহাসের বহুদেশেই বিপ্লব ঘটেছে। তার সাধারণ লক্ষণ রাজবংশের বিতাড়ন বা রাজতন্ত্রের বিলোপ। প্রজাতন্ত্রের প্রবর্তন। কিংবা তার বিশেষ লক্ষণ রাজতন্ত্রের সঙ্গে সঙ্গে ধর্মসংঘেরও পতন। ফরাসী বিপ্লব চার্চকেও ক্ষমতাচ্যুত ও সম্পত্তিচ্যুত করে। ঈশ্বরের জায়গায় বসায় যুক্তির দেবীকে। অন্ধবিশ্বাস নয়, বিজ্ঞানসিদ্ধ যুক্তিই হয় জীবনের নিয়ামক। আইনকানুন সব উল্টে যায়। শিক্ষায় নবযুগ আসে। ফরাসী বিপ্লব দেশে ও বিদেশে যুগান্তর ঘটায়। সে বিপ্লব ব্যর্থ হলেও তার উত্তরাধিকারী হয় রুশ বিপ্লব। রাজতন্ত্রের সঙ্গে সঙ্গে চার্চেরও অন্তর্ধান ঘটে। তার সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত হয়। ঈশ্বরের জায়গায় কিন্তু যুক্তির দেবীকে বসানো হয় না। রুশ বিপ্লবীরা আরেকপ্রকার অন্ধবিশ্বাসী। তাঁদের 'শাস্ত্র' মার্কস লিখিত সুসমাচার। সেই তাঁদের জীবনের নিয়ামক।

বিপ্লবের যে নজীর ফ্রান্সে ও রাশিয়ায় স্থাপন করা হয়েছে তার সঙ্গে ইরানের ইসলামী বিপ্লবের মিল এইটুকুই যে রাজবংশকে তথা রাজতন্ত্রকে উৎখাত করা হয়েছে। কিন্তু চার্চের অনুরূপ যে মোল্লাতন্ত্র তার গায়ে বা তার সম্পত্তির গায়ে হাত দেওয়া হয়নি। উল্টে মোল্লাতন্ত্রই সর্বশক্তিমান হয়েছে। সবার উপরে ইমাম সত্য তাঁহার উপরে নাই। আয়াতোল্লা খোমেইনী যা বলবেন তাই কোরানবাক্য। আর যা কোরানবাক্য তাই ধ্রুবসত্য। কেবল ধর্মীয় ব্যাপারে নয়, যাবতীয় মানবিক ব্যাপারে। ইরান জোর কদমে এগিয়ে চলেছে তেরোশ' বছর পেছনে। তার অগ্রগতি মানেই পশ্চাদ্‌গতি। এমনতরো বিপ্লব কি কেউ কোনোদিন দেখেছে? ইরানের ইসলামী বিপ্লবের বিশেষণ পদটি যদি বিশেষ্য-পদটির চেয়ে প্রবলতর হয় তবে বিপ্লব ধীরে ধীরে নিষ্প্রভ হবে। পেট্রল যেই নিঃশেষিত হবে ইরানের নবকলেবরের দম ফুরিয়ে যাবে। ভাগ করবার মতো ধন থাকবে না। শ্রমিক কৃষকের ভাগে যথেষ্ট পড়বে না। আর যদি বিশেষ্য

পদটিই প্রবলতর হয় তবে বিশেষণ পদটির মহিমা থাকবে না। মোল্লার দৌড় মসজিদ পর্যন্তই হবে, পার্লামেণ্ট ও গভর্নমেণ্ট চলে যাবে তাদের নাগালের বাইরে। আদালতও তাদের অচলমুক্ত হবে। ব্যাঙ্ক ইত্যাদির উপর তাদের খবরদারী খাটবে না। ট্রেড ইউনিয়নের উপরেও না।

জনতার সাহায্য না পেলে সম্রাটকে সরানো যেত না। ইসলামের সাহায্য না নিলে জনতাকে জাগানো যেত না। এইদিক থেকে বিচার করলে ইরানের বিপ্লবের একটা অর্থ পাওয়া যায়। কিন্তু সেটা অর্থহীন হয়ে যায় যখনি শুনি বিশ্ববিদ্যালয়গুলির দরজা বন্ধ। যেহেতু সেখানে আধুনিক জ্ঞানবিজ্ঞানের চর্চা হয়। তার চর্চা যদি হয় তবে মানুষের অন্ধবিশ্বাসে আঘাত লাগে। কোন্‌দিন কে বলে বসবে পৃথিবীটা গোল আর সেটা নাকি সূর্যের চারদিকে ঘুরছে? কী সর্বনেশে কথা! কোরানের সৃষ্টিতত্ত্ব আর বিজ্ঞানের সৃষ্টিতত্ত্ব পরস্পরবিরোধী। কোন্‌টা শেখানো হবে? এর উপর নির্ভর করছে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার ভবিষ্যৎ। আয়াতোল্লা নাকি বলেছেন যে অমন শিক্ষার কোনো দরকার নেই যা ধর্মের সঙ্গে বেখাপ। এ সেই মনোভাব যা হাজার বছর আগে আরবদের জ্ঞানের বর্তিকা ফুঁ দিয়ে নিবিয়ে দেয়। মাদ্রাসার যুগ যদি ফিরে আসে তবে বিশ্ববিদ্যালয়ের যুগ অতীত হবে। ইরানের সেই আগামী অন্ধকার যুগকে বিপ্লবের যুগ বলতে আমার বাধবে। বস্তুত এটা রেভোলিউশনই নয়, এটা রিভাইভাল। এই গেল তিন রকম উদ্‌ভট। এর কোনোটির জন্যে আমি প্রস্তুত ছিলুম না। অথচ তিনটিই কেমন করে সম্ভব হলো। বিশ্লেষণ করলে উদ্‌ভটকেও অহেতুক বলা চলে না। যে তিনটির উল্লেখ করেছি সে তিনটির পেছনে ছিল বহুবিধ কারণ। তথা বহুজনের সমর্থন। তা ছাড়া বহু শক্তির সম্মিলন বা ঘাতপ্রতিঘাত। ইসরায়েল বা পাকিস্তান বা ইরানের ইসলামী বিপ্লব কোনোটিই অহেতুক বা জনসমর্থনহীন বা চতুর্দিক থেকে বিচ্ছিন্ন নয়। ভারত স্বাধীন না হলে পাকিস্তান কখনো সম্ভব হতো না। ভারতের স্বাধীনতা অবশ্যম্ভাবী ছিল বলেই পাকিস্তানও সম্ভব হলো। প্রথম মহাযুদ্ধে তুর্করা জড়িয়ে না পড়লে ও হেরে না গেলে ইংরেজরা প্যালেস্টাইন অধিকার করত না। বাইরে থেকে ইহুদীরা গিয়ে জড়ো হতো না। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে জয়ী হলেও ইংরেজরা তাদের সাম্রাজ্যের বিভিন্ন স্থান থেকে সৈন্য অপসারণের সিদ্ধান্ত নেয়। জার্মানীর আধখানা সোভিয়েট সৈন্য দখল করে থাকায় বাকী আধখানার সৈন্য মোতায়েনের দায় বর্তায় ইংরেজ, ফরাসী ও আমেরিকানদের উপর। ফলে প্যালেস্টাইনে যে পাওয়ার ভ্যাকুয়াম সৃষ্টি হয় তার সুযোগ নেয় ইহুদীরা। নইলে ইসরায়েল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা সম্ভব হতো না।

ইরানের শাহ্ দেশকে রাতারাতি আধুনিক ও শিল্পায়িত করতে গিয়ে ধনীদের আরো ধনী ও দরিদ্রদের আরো দরিদ্র করেছিলেন। মধ্যবিত্তরাও বেকার। বিদ্রোহের জলতরঙ্গ রোধ করার সাধ্য তাঁর সৈন্যদলের ছিল না। বিদ্রোহকে নেতৃত্ব দেন ধর্মগুরু খোমেইনী। তিনি নিঃস্বার্থ। তিনি সর্বজনশ্রদ্ধেয়। তিনি অসমসাহসী। তাঁর আজ্ঞায় প্রাণ দিতে ছুটে যায় লক্ষ লক্ষ জনের জনতা। তা দেখে সৈন্যদের মন যায় না গুলী চালাতে। তারা অস্ত্রত্যাগ করে। হ্যাঁ, এটাই

বিপ্লবের অজ্ঞাতপূর্ব মুহূর্ত। এই মুহূর্তটিই স্থির করে দিল যে সম্রাটের ইচ্ছা নয়, ধর্মগুরুর ইচ্ছাই চূড়ান্ত। আর সে ইচ্ছা জনগণেরও ইচ্ছা।

খোমেইনী অহিংসাবাদী নন। তাঁর পরিচালনাধীন জনতাও অহিংস নয়। একথা মানতে হবে যে সম্রাটের শক্তিশালী সৈন্যদলের সম্মুখীন হওয়ার মতো সামরিক শক্তি তাঁর ছিল না। তাঁর যে শক্তি তা নৈতিক শক্তি। তাঁর জয় নৈতিক জয়। কিন্তু তাঁর জয়লাভের পর যেসব ব্যাপার ঘটেছে সেসব প্রচণ্ডভাবে সহিংস। এর একমাত্র সাফাই বিপ্লবের সময় অমন রক্তপাত তো যে কোনো দেশেই ঘটে থাকে। ফ্রান্সে ঘটেনি? রাশিয়ায় ঘটেনি? চীনে ঘটেনি?

কিন্তু তা সত্ত্বেও প্রশ্ন থেকে যায় এ কী ধরনের বিপ্লব যার নীট ফল রাজতন্ত্রের শূন্যতাপূরণের জন্যে মোল্লাতন্ত্র? ইতিহাস কি মোল্লাতন্ত্রকে চিরদিন সহ্য করবে? আবার কি শূন্যতা সৃষ্টি করবে না? তখন সে শূন্যতা পূরণ করবে কোন্ তন্ত্র? গণতন্ত্র? সমাজতন্ত্র? আপাতত ইরানই একমাত্র মোল্লাতন্ত্রী দেশ। অন্যান্য মুসলিম রাষ্ট্রগুলি হয় রাজন্যশাসিত, নয় সেনানীশাসিত, নয় রাজনীতিকশাসিত। মনে হয় না যে রাজন্যরা বেশীদিন থাকবেন। তাঁরা চলে গেলে কোথাও কর্তৃত্ব করবেন সেনাপতিরা, কোথাও দলপতিবা। মোল্লাদের জন্যে শূন্যতা সৃষ্টি হবে আর কোন্ দেশে? ইরানই বোধ হয় একমাত্র দৃষ্টান্ত।

সব চেয়ে উদ্ভট হচ্ছে ইরানী ছাত্রদের দ্বারা মার্কিন দূতাবাস অবরো ধও দূতদের বন্দিত্ব। তারা অন্য কারো আদেশ চায়নি বা পায়নি। যা করেছে নিজেদের উদ্যোগে করেছে। সমর্থন করেছে দেশের লোক, অনুমোদন করেছেন ধর্মগুরু, স্বীকার করে নিয়েছেন সরকার। আন্তর্জাতিক আইন যদি কেউ না মানে তবে শাস্তিদানের ক্ষমতাই নেই আন্তর্জাতিক কোনো সংস্থার। তবে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বন্ধ করে দেওয়া যায়। কূটনৈতিক সম্পর্কও ছিন্ন করে দেওয়া যায়। সর্বপ্রকার শান্তিপূর্ণ প্রয়াস ব্যর্থ হলে যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী। আমেরিকা যুদ্ধে নামলে রাশিয়াও নামবে। ওরা হয়তো নিজেদের মধ্যে আপস করে ইরানকে দু'ভাবে দখল করবে। যেমন করেছিল দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়। ইরানীদের শুভবুদ্ধি তাদের রক্ষা করুক।

শিখ প্রসঙ্গ

আমার ছেলেবেলায় আমাদের দেশীয় রাজ্যে নানা ধর্মের ও নানা প্রদেশের মানুষ দেখেছি। আমার নিচের ক্লাসে পড়ত বলদেও সিং। পাঞ্জাবী শিখ। তার বাবা ফরেস্ট অফিসার পৃথ্বী চাঁদ কিন্তু শিখ নন, হিন্দু। তার মা হিন্দু নন, শিখ। ধর্মমত এক নয়, কিন্তু মতবিরোধও নেই।

'শিখ' কথাটি সংস্কৃত শিষ্য শব্দের স্থানীয় উচ্চারণ। হিন্দীতেও মূর্ধণ্য ষ লোকমুখে হয়ে যায় খ। পণ্ডিতদের মুখেও তাই। পাটনা কলেজের সংস্কৃত অধ্যাপক রামাবতার শর্মা 'ষষ্ঠ' বলতে গিয়ে বলতেন 'খষ্ঠ'। বাংলা পদাবলীতে 'বৃষভানু নন্দিনী' থেকে 'বৃখভানু নন্দিনী'। য ফলাতেও হসন্ত দিলে 'শিষ্য'

হয়ে যায় 'শিখ'। কার শিষ্য ? গুরুজীর শিষ্য। তাঁরা গুরুবাদী। তাঁদের উপাসনার স্থান 'গুরুদ্বার'। তাঁরা বেদকে তাঁদের আদিগ্রন্থ বলে মানেন না। তাঁদের আদিগ্রন্থ হচ্ছে 'গ্রন্থসাহেব'। তাতে বিভিন্ন ধর্ম থেকে সদুক্তি সঙ্কলিত হয়েছে। তাঁদের আর কোনো ধর্মপুস্তক নেই। গীতা, উপনিষদ্ প্রভৃতি অসংখ্য হিন্দু শাস্ত্র তাঁদের কাছে অভ্রান্ত নয়। আছেন একমাত্র অলক্ষ্য বা অলখ নিরঞ্জন। তার কোনো আকার নেই। তিনি কালাতীত বা অকাল। তাঁর ভক্ত 'অকালী'। তেত্রিশ কোটি দেবদেবীর অস্তিত্ব নেই। সৎ শ্রী অকাল। 'সৎ' অর্থ যিনি আছেন। দেবদেবী যখন নেই তখন তাঁদের অবতার থাকবেন কী করে ? শিখরা বর্ণাশ্রম ধর্ম মানেন না। ব্রাহ্মণ প্রাধান্য মানেন না, উপবীত ধারণ করেন না। দশম গুরু গোবিন্দের অনুশাসনে পুরুষেরা প্রত্যেকেই ধারণ করে সিংহ পদবী আর কেশ, কঙ্গী, কড়া, কাচ্ছা অর্থাৎ কৌপীন আর কৃপাণ। কঙ্গী মানে চিরুনি, কড়া মানে বালা। যার থেকে এসেছে হাতকড়া।

শিখরা দীক্ষা দিয়ে মুসলমানকেও শিখ করে নেন। তার সঙ্গে বিয়ে সাদী করেন। মুসলমান তাঁদের কাছে ম্লেচ্ছ বা যবন নয়। অথচ মুসলমানদের সঙ্গেই তাঁদের সব চেয়ে বেশী ঝগড়া। মূল কারণ শিখরা মুসলমানদের শিখ ধর্মে দীক্ষা দিয়ে দল ভারী করলে মুসলমানদের অস্তিত্ব বিপন্ন। সন্ত ফতে সিং ছিলেন জন্মত মুসলমান। শিখ ধর্মে দীক্ষা নিয়ে পরে একজন সন্ত বলে মান্য হন। মাস্টার তারা সিং ছিলেন জন্মত ব্রাহ্মণ। তিনি কিন্তু সন্ত বলে গণ্য নন। এই প্রসঙ্গে বলে রাখি একজন শিখ অফিসারের স্ত্রী ছিলেন জন্মত মুসলমান। পরে শিখ ধর্মে দীক্ষা নেন। তাঁদের কন্যাকে বিবাহ করেন এক বাঙালী ব্রাহ্মণ অফিসার। আর যায় কোথা ! তাঁর মা বাবা তাঁকে ত্যাজ্যপুত্র করেন। ছোট ছেলেকে দেখিয়ে বলেন, এটিই আমাদের একমাত্র ছেলে। মুখে হাসি নেই, মনে শান্তি নেই, প্রভূত ঐশ্বর্য সত্ত্বেও অসুখী। বাঙালী ব্রাহ্মণ অফিসার শিখ হননি। শিখরা কী মনে করে, জানিনে। তবে এ বিষয়ে শিখ সমাজ চিরদিন উদার। বাজপেয়ীজীর বাড়ীতে তাঁর শিখ সম্বন্ধীদের অগাধ গতিবিধি। স্বামীকে শিখ ধর্মে দীক্ষা দিতেই হবে এমন কোনো বাধ্যবাধকতা নেই। পৃথ্বী চাঁদের বেলাও ছিল না। মোনা শিখরা তো কেশও বাড়তে দেন না, দাড়ি গোঁফ কামান, বালা পরেন না, কৃপাণ ধরেন না। কাচ্ছা সম্বন্ধে আমি খোঁজ রাখিনে। তবে ইদানীং গোঁড়ামি বেড়ে যাচ্ছে। ইউরোপে আমেরিকায় বসবাস করেও শিখরা সব ক'টি বিধিনিষেধ মানে ও তাই নিয়ে ঝগড়া করে।

গুরু নানকের বংশধর বাবা পুরুষোত্তমলাল বেদীর সঙ্গে আমরা এক বাড়ীতে অতিথি হয়েছি। তাঁর পত্নী ক্রীডা ইংরেজকন্যা। পরে বৌদ্ধ ভিক্ষুণী হন। পুত্র কবীর এখন নামকরা ফিল্মস্টার। বেদী দাঁড়ি গোঁফ কেশ পাগড়ীর ধার ধারতেন না। অথচ সাচ্চা শিখ। এই উদারতা আজকাল কমে আসছে। অকালীরা কট্টর শিখ। তাঁদের বক্তব্য হলো হিন্দু সাকারবাদ ও অবতারবাদের বিরুদ্ধে প্রোটেস্ট করার জন্যেই তাঁদের ধর্মের উদ্ভব। ইউরোপে যেমন প্রোটে-স্টান্ট ধর্মের। তাঁরাও যদি সনাতনী হয়ে যান তো তাঁদের পার্থক্য রইল

কোথায় ? আজকের ভারতে মুসলমানরা তাঁদের দাবিয়ে রাখছে না। রাখছেন সনাতনী হিন্দুরা। রাজত্বটাকে ধর্মনিরপেক্ষ বলে চালালে কী হবে ? এটা হিন্দু রাজত্ব। হিন্দুর ভোটের উপর নির্ভর না করে বিধানসভায় বা লোকসভায় নির্বাচিত হওয়া অসম্ভব। মন্ত্রিত্ব পাওয়া অসম্ভব। বড়ো বড়ো পদও হিন্দুদের দয়া না হলে পাবার উপায় নেই। এর জন্যে হিন্দুরা কি মাশুল আদায় না করে ছাড়বে ? মাশুল জোগাতে গেলে শিখদের আইডেনটিটি থাকবে না।

হিন্দুদের চেয়ে আর্যসমাজীদের সঙ্গেই শিখদের মিল বেশী, অমিল কম। অথচ আর্যসমাজীদের সঙ্গেও ঝগড়া। ওঁরাও নিরাকারবাদী, দেবদেবী পুজো করেন না, অবতার মানেন না, ব্রাহ্মণপ্রাধান্য স্বীকার করেন না। কিন্তু ওঁরা শিখদের মতো গুরুবাদী নন। ওঁদের কাছে বেদই প্রথম কথা ও শেষ কথা। গ্রন্থসাহেব সমান মর্যাদা পান না। তারা চায় সংস্কৃত, হিন্দী ও দেবনাগরী। শিখরা চায় পাঞ্জাবী ও গুরুমুখী। সংস্কৃত নয়। ভাষা ও লিপির প্রশ্নে অকালীরা সমান কট্টর। ধর্মে পরমত সহিষ্ণুতা সম্ভবপর, ভাষায় বা লিপিতে নয়। দ্বিভাষী ভারতীয় পাঞ্জাবকে দ্বিখণ্ড করে তারা একভাষী করেছে। সরকারী ভাষা এখন হিন্দী ও পাঞ্জাবী নয়, একমাত্র পাঞ্জাবী। দুই লিপির বদলে এখন একমাত্র গুরুমুখী লিপিই সরকারী লিপি। এখন তাঁদের পথের কাঁটা হয়েছে চণ্ডীগড়। সেটা পাঞ্জাব ও হরিয়ানার যুক্ত রাজধানী। সেখান থেকে হরিয়ানার হিন্দীওয়ালাদের সরাতে হলে তার বদলে ফাজিলকা তালুক ছাড়তে হয়। সেটা হিন্দীভাষী এলাকা। কিন্তু সেখানে তুলার চাষ হয়। তাই সমৃদ্ধ এলাকা। সেটা হাতছাড়া করলে সমৃদ্ধিতে টান পড়ে। শিখরা তার বেলা নাছোড়বান্দা।

এমনি আরো কয়েকটা প্রশ্নে সনাতনীদের তথা আর্যসমাজীদের সঙ্গে ঝগড়া করতে করতে অকালীদের মধ্যে যারা চরমপন্থী তারা ভারত থেকেই বিচ্ছিন্ন হয়ে মাস্টার তারা সিংয়ের মতো খালিস্তান বলে একটি স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র চায়। তার জন্যে খালিস্তানবিরোধীদের রক্তপাত করতেও বিমুখ নয়। নরমপন্থীরা ততদূর যেতে ইচ্ছুক নয়। তারা কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে কয়েকটা বিষয় রাখতে দিয়ে আর সব বিষয় রাজ্য সরকারের আয়ত্তে আনতে পেলেই সন্তুষ্ট হয়। ঝগড়াটা এখন কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে। কারণ কেন্দ্রীয় সরকারও নাছোড়বান্দা।

এর পেছনে আরো একটি রহস্য আছে। সেটা আছে বলেই শিখরা পাকিস্তানের সহানুভূতি ও প্রশ্রয় পাচ্ছে। শিখ হাইজ্যাকারদের প্রাণদণ্ড বা কারাদণ্ড এখনো হয়নি। হবেও না। হলে নামমাত্র দণ্ডের পর খালাস দেওয়া হবে। তবে সেটা নির্ভর করছে অকালীদের বন্ধুভাবের উপরে। পাকিস্তানের প্রতি বন্ধুভাব, ভারতের মুসলিমদের প্রতি বন্ধুভাব।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ বাধবার পর ১৯৪০ সালে পাঞ্জাবীদের সকলের মনে এই ধারণা জন্মায় যে ব্রিটিশ রাজত্বের অবসানের আর দেরি নেই। "এই বেলা নে ঘর ছেয়ে।" শিখরা আবার রণজিৎ সিংয়ের শিখ রাজত্ব ফিরে পাবে। মুসলমানরা আবার ফিরে পাবে মোগল রাজত্ব। আর হিন্দুরা ফিরে পাবে আবার তার

আগের হিন্দু রাজত্ব। কিন্তু বিনা অস্ত্রে এসব হাসিল হবে কী করে? ইউনিয়নিস্ট মন্ত্রীদের লোকজন ব্রিটিশ সরকারের পক্ষে রিক্রুট সংগ্রহের সময় দেখতে পান কেউ ঘর ছেড়ে বাইরে যেতে চায় না। তাদের লড়াইটা তো বিদেশে জার্মানদের সঙ্গে নয়। নিজের প্রদেশে পরস্পরের সঙ্গে। তখন একটা ফন্দী আঁটা হয়। শিখদের সামনে গাজর ঝুলিয়ে মন্ত্রণা দেওয়া হয়, "শুনছি মুসলমানরা যুদ্ধে নাম লেখাচ্ছে, অস্ত্র পাবে, ফিরে এসে সেই অস্ত্র দিয়ে মসনদ দখল করবে।' মুসলমানদের সামনে গাজর ঝুলিয়ে মন্ত্রণা দেওয়া হয়, 'দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছ কী? শিখরা যে যুদ্ধে যোগ দিতে চলল। সশস্ত্র হয়ে ফিরে আসবে। তখন মসনদ দখল করবে।" হিন্দুদের সামনে গাজর ঝুলিয়ে মন্ত্রণা দেওয়া হয়, 'শিখ আর মুসলমান রণসাজে সাজছে, রণশেষে ফিরে এসে সিংহাসন অধিকার করবে। তোমরা হবে আবার পরাধীন।"

গাজরের কী মহিমা! তিন পক্ষই অস্ত্র হাতে ইংরেজদের নেতৃত্বে লড়তে বেরোয়। শিখ হাঁকে, "সৎ শ্রীঅকাল।" মুসলমান হুঙ্কার ছাড়ে, "আল্লা হো আকবর।" আর হিন্দু চিৎকার করে, "দুর্গামাঈ কী জয়।" গাজর আপাতত শিকেয় তোলা থাকে। যুদ্ধে জিতে ফিরে আসে তিন পক্ষই। কিন্তু ইংরেজের সঙ্গে একা একা লড়তে সাহস হয় না কারো। আর ইংরেজও যে বিনা যুদ্ধে সূচ্যগ্র মেদিনী দেবে তাও সম্ভবপর নয়। ইংরেজ থাকতে পরস্পরের সঙ্গে লড়াই করা যায় না। শেষে দেখা গেল ইংরেজরা সত্যি সত্যি তল্পিতল্পা গোটাতে যাচ্ছে। ক্যাবিনেট মিশন স্কীম মেনে নিলে অখণ্ড ভারত। নয়তো পাকিস্তান ও হিন্দুস্থান। তা দেখে তারা সিংয়ের অনুগামী শিখদের তরফ থেকে রব ওঠে, "শিখদের জন্যে চাই খালিস্থান।" মাউণ্টব্যাটেন বলেন, "অতি ন্যায্য দাবী। শিখদের জন্যেও আমার কিছু করা উচিত। কিন্তু পাঞ্জাবে তো এমন একটিও জেলা নেই যেখানে শিখরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ। কোথাও মুসলমানরা সংখ্যাগরিষ্ঠ, কোথাও হিন্দুরা। ওরা কেন ওদের বখরা থেকে শিখদের এক ভাগ ছেড়ে দেবে?" হিন্দু বা মুসলমান কেউ বিনা যুদ্ধে সূচ্যগ্র পরিমাণ মেদিনী দেবে না। মাউণ্টব্যাটেন নাচার। তখন শিখদের সামনে দুটিমাত্র বিকল্প। বেছে নিতে হবে দুটির একটি। পাকিস্তান বা হিন্দুস্থান। ওরা সেই সন্ধিক্ষণে বেছে নেয় হিন্দুস্থান। যার নাম পরে হয় ইণ্ডিয়ান ইউনিয়ন বা ইণ্ডিয়া। শিখদের বড়ো আশা ছিল লাহোর ও নানকানা সাহেব পড়বে পূর্ব পাঞ্জাবের ভাগে। কিন্তু র‍্যাডক্লিফ রোয়েদাদে সে দুটি পড়ে পশ্চিম পাঞ্জাবের ভাগে। তার আগে থেকে শুরু হয়ে আছে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাহাঙ্গামা ও সদলবলে মহাপ্রস্থান। সেটা চরমে ওঠে যখন রোয়েদাদ প্রকাশ করা হয়। মহাপ্রস্থানপর্ব পরিণত হয় মুষলপর্বে। পাঁচ লাখ মানুষ পাঁচ ছয় সপ্তাহের মধ্যে কচুকাটা হয়। নব্বই লাখ করে এপার ওপার। ইতিহাসে তার নজীর নেই। না ভারতের ইতিহাসে, না জগতের ইতিহাসে। একদা যারা অস্ত্রের আশায় যুদ্ধযাত্রা করেছিল তারাও জীবিত ফিরে এসে পদযাত্রা করে কিংবা পরলোক যাত্রা। মহাযুদ্ধেও ভারতে এত লোক মরেনি।

শিখরা সবাই মিলে পূর্ব পাঞ্জাবে চলে আসার ফলে ও মুসলমানরা সবাই

মিলে পশ্চিম পাঞ্জাবে চলে যাওয়ার ফলে পূর্ব পাঞ্জাবের কয়েকটি জেলায় শিখরাই হয় সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়। এই যে পরিবর্তনটা চোখের সামনে ঘটে যায় এটার মর্ম উপলব্ধি করতে বেশ কিছুকাল কেটে যায়। হিন্দুদের সঙ্গে মোটামুটি সমতা থাকায় হিন্দী ও পাঞ্জাবী উভয় ভাষাই হয় সরকারী ভাষা। তাতে দু'-পক্ষই সন্তুষ্ট। কিন্তু পুনর্বিন্যাসের ফলে ভারতের আসাম ভিন্ন আর সব রাজ্য একভাষী হয়। তখন আসাম থেকে দাবী ওঠে, একভাষী রাজ্য চাই। অসমীয়া হবে একমাত্র সরকারী ভাষা। তার জন্যে আসামেরও চাই পুনর্বিন্যাস। তেমনি পাঞ্জাবেও আওয়াজ ওঠে, একভাষী রাজ্য চাই। পাঞ্জাবী হবে একমাত্র সরকারী ভাষা। তার জন্যে পাঞ্জাবেরও চাই পুনর্বিন্যাস। মারদাঙ্গা না বাঁধলে এদেশে কিছু হবার জো নেই। আসামের পুনর্বিন্যাস হয়। পাঞ্জাবেরও।

তখন মুশকিল বাধে রাজধানী নিয়ে। ন্যায়বিচারে সেটা হরিয়ানারই প্রাপ্য। কিন্তু শিখরাও নাছোড়বান্দা। লাহোরের পরিবর্তে চণ্ডীগড় পেয়ে সেখানে তারা জাঁকিয়ে বসেছে। অন্য উপায় না দেখে ভারতের প্রধান মন্ত্রী চণ্ডীগড়কে করেন ইউনিয়ন টেরিটরি। সেখানে দুই সরকারের দুই গভর্নর বাস করেন। হাইকোর্ট কিন্তু একটাই। চণ্ডীগড় হিন্দী ও পাঞ্জাবী উভয় ভাষাই রাখে। প্রধানমন্ত্রী একথাও বলেন যে পাঞ্জাবীভাষী রাজ্য যদি স্বতন্ত্রভাবে চণ্ডীগড় চায় তবে তাকে হরিয়ানাকে ক্ষতিপূরণ হিসাবে ফাজিলকা তালুক দিতে হবে। যেহেতু সেখানে হিন্দীভাষীদের সংখ্যাধিক্য। তখন থেকে চণ্ডীগড় ও ফাজিলকা নিয়ে ঠাণ্ডা লড়াই চলছে। প্রধানমন্ত্রী হস্তক্ষেপ করতে চান না। তাই রাগটা পড়ছে কেন্দ্রীয় সরকারের উপর। বিনা শর্তে চণ্ডীগড় পাঞ্জাবীভাষী রাজ্যকে দিতে হবে।

এই রাজ্য যখন সৃষ্টি করা হয়েছিল তখন ভাষার ভিত্তিতেই হয়েছিল, ধর্মের ভিত্তিতে হয়নি। এখন রাজ্য হাতে পাবার পর দাবীর ভিত্তি বদলে গেছে। এটা হবে ধর্মভিত্তিক শিখ রাজ্য। যেহেতু মুসলমানদের দেওয়া হয়েছিল পাকিস্তান ও হিন্দুদের হিন্দুস্থান সেহেতু আজ এতকাল পরে শিখদের দিতে হবে খালিস্থান। তা যদি সম্ভব না হয় তো শিখ ধর্মভিত্তিক পাঞ্জাব। তাকে দিতে হবে একটা স্পেশাল স্টেটাস। সে রাজ্যের সরকারের হাতে তুলে দিতে হবে তিন চারটি বিষয় ছাড়া আর সব কেন্দ্রীয় বিষয়। ভারত সরকার যদি এতে রাজী হন তবে সংবিধান বদলাতে হবে ও তার সুযোগ নেবে অন্যান্য রাজ্য। ফলে কেন্দ্রীয় সরকার হবে ঠুঁটো জগন্নাথ। পার্লামেণ্ট কখনো সংবিধান সংশোধন করে নিজেকেও ঠুঁটো বলরাম বানাতে রাজী হবে না। প্রধানমন্ত্রীও ঠুঁটো সুভদ্রা হতে নারাজ হবেন।

অকালীরা এখন ধর্মের নামে 'ধর্মযুদ্ধ' শুরু করে দিয়েছে। আট হাজার প্রাক্তন সৈনিক তাদের দাবী সমর্থন করেছে। তাদের হাতে বন্দুক রয়েছে। যে দাবীটা মাউণ্টব্যাটেন না-মঞ্জুর করতে বাধ্য হলেন ১৯৪৭ সালে সেটা পাকে প্রকারে আদায় হবে স্বাধীন ভারতের কাছ থেকে, তাকে আরো খণ্ডিত হবার পথ খোলা রেখে। চরমপন্থীরা খালিস্তান না নিয়ে ছাড়বে না, নরমপন্থীরা

আপাতত তার চেয়ে কম নিয়ে আরো বেশীর জন্যে ক্ষেত্র প্রস্তুত করছে। পাকিস্তানের অঙ্গহানি ঘটবে না, ঘটবে ভারতেরই, যদিও এটা হিন্দু রাষ্ট্র নয়, ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র। এর সর্ব স্তরে শিখদের অনুপাতের অধিক উপস্থিতি। তবে এটাও ঠিক যে ব্রিটিশ আমলে মার্শাল রেস হিসাবে তারা যে মাত্রাতিরিক্ত সুযোগ সুবিধা পেয়েছিল সেটা অন্যান্যদের দাবীর চাপে ক্রমে খর্ব হয়েছে। এটা শিখদের অসহ্য। সৈনিকবৃত্তি থেকে তাদের একটা বাঁধা আয় ছিল। মিলিটারি খরচার এক বিপুল অংশ তাদের গ্রামে ব্যয়িত হতো। তবে আজকাল চাষ থেকে যে সমৃদ্ধি এসেছে সেটার বিপুল অংশ তো তারা ঘরে বসেই পাচ্ছে। চাষের কাজ আরো লাভজনক হওয়ায় অনেকে সৈন্যদলে ভর্তি হতে অনিচ্ছুক। নানা রাজ্যে ছড়িয়ে পড়ে ওরা গাড়ী চালিয়ে প্রচুর অর্থ পায়। হোটেল চালিয়ে ওরা ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে ও ভারতের বাইরে বিভিন্ন দেশে যা পায় তার পরিমাণও প্রভূত। আমাদের এ পাড়াতেও এক পাঞ্জাবী হোটেল আছে।

বছর কয়েক আগে একজন পাঞ্জাবী অফিসার আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে আসেন। তিনি বিভিন্ন ভাষার কবিতা কবিদের নিজেদের হাতে লিখিয়ে নিচ্ছেন। আমাকেও বলেন স্বহস্তে লিখে দিতে। আমি দুটি পুরোনো কবিতা নিজের হাতে নকল করে দিই। একটি বাংলা, অন্যটি ওড়িয়া। তিনি খুশি হয়ে উঠতে যাচ্ছিলেন, আমি তাঁকে বসতে বলি। একটু সুখদুঃখের গল্প হোক। পার্টিশনে শিখদের মতো ক্ষতি আর কারো হয়নি। তাঁরা হারিয়েছেন তাঁদের ভূতপূর্ব রাজধানী লাহোর, যা আমাদের কলকাতা হারানোর সমতুল্য। তাঁরা হারিয়েছেন তাঁদের পুণ্যতীর্থ নানকানা সাহেব, যা আমাদের পুণ্যতীর্থ নবদ্বীপের সমমূল্য। সেগুলি হয়েছে পাকিস্তানের সামিল। ভারতে যোগ দিয়েও তাঁরা হারিয়েছেন পাতিয়ালা প্রমুখ দেশীয় রাজ্য। আর তাঁদের জন্যে নির্দিষ্ট সেপারেট ইলেকটোরেট, ওয়েটেজ, চাকরিতে সেপারেট কোটা, ওয়েটেজ। তাঁর নিজের জন্মস্থান পশ্চিম পাঞ্জাবে। তাঁর কি সেখানে ফিরে যেতে ইচ্ছে করে না, সে স্থান ফিরে পেতে ইচ্ছে করে না?

তিনি আনন্দের সঙ্গে উত্তর দেন, "পরিবর্তে আমরা যা পেয়েছি তাতে আমাদের সব ক্ষতি পুষিয়ে গেছে। জীবনের প্রত্যেকটি বিভাগে আমাদের বাড়বাড়ন্ত। এতদিনে আমরা একটি রাজ্যে মেজরিটি হয়েছি। মাইনরিটি হওয়া বড়ো দুঃখের। কোন্ দুঃখে আমরা পেছন ফিরে তাকাব? ওসব চুকেবুকে গেছে ১৯৪৭ সালে। যা ঘটেছে তা বরাবরের মতো একবারেই ঘটেছে। আর আমরা লড়তে চাইনে। তবে আমাদের উপর লড়াই চাপিয়ে দিলে আবার লড়ব।"

আমি তাঁর মুখ দেখে অনুমান করি তিনি অন্তরে অসুখী। একটু অন্তরঙ্গভাবে বলি, "তবু আপনাদের মনের বাসনাটা কী? নানকানা সাহেবের মায়া কাটাতে পারবেন?"

তাঁর চোখ ছলছল করে। করুণ স্বরে বলেন, "শিখদের নিত্য প্রার্থনার সঙ্গে আমরা একটা বাক্য জুড়ে দিই। আবার যেন নানকানা সাহেবে ফিরে যেতে পারি।"

শিখদের নিত্য প্রার্থনার মতো ইহুদীদেরও একটা নিত্য প্রার্থনা আছে। তার সঙ্গে তাঁরাও জুড়ে দিতেন, "আবার যেন জেরুজালেমে ফিরে যেতে পারি।"

আমি বলি, "দু'হাজার বছর পরে ইহুদীরা জেরুজালেম আবার ফিরে পেয়েছে। তেমনি একদিন আপনারাও নানকানা সাহেব ফিরে পেতে পারেন।" তিনি হেসে ওঠেন। তারপর বিদায় নেন।

প্রার্থনার শেষ বাক্য পূরণের জন্যে অকালী শিখরা ততকাল সবুর করবে না। ইহুদীদের মতো ওরাও একটা নেশন। আমার মনে হচ্ছে চরমপন্থীরা পাকিস্তানের সঙ্গে একটা স্বতন্ত্র সন্ধি চায়। তার জন্যে দরকার খালিস্থান বলে একটি স্বতন্ত্র রাষ্ট্র। তার জন্যে চাই অধিকতর ক্ষমতাসম্পন্ন বৃহত্তর পাঞ্জাব রাজ্য। তার জন্যে চাই বিনা শর্তে চণ্ডীগড়।

তবে স্বতন্ত্র সন্ধির প্রয়োজন হবে না, যদি পাকিস্তানের সঙ্গে ভারতের মিটমাট হয়ে যায়। কাশ্মীর নিয়ে একটা ফয়সালা হলে পাকিস্তানও তাতে রাজী। সেটা কবে হবে, কোন্ কোন্ শর্তে হবে তা কে বলতে পারে? তবে মিটমাটের দিকে দুই পক্ষই এক পা এক পা করে এগোচ্ছে। চলি চলি পা পা। সেটা যদি সময় থাকতে ঘটে তবে শিখদের সঙ্গে হিন্দুদের সংঘর্ষ এড়ানো সম্ভবপর। হ্যাঁ, সংঘর্ষটা আসলে হিন্দুদের সঙ্গেই। অকালীদের অভিযোগ এই যে হিন্দুরা পাঞ্জাবীভাষী হয়েও মাতৃভাষা ছেড়ে হিন্দী বরণ করছে ও সেই সূত্রে হরিয়ানা কেড়ে নিয়েছে। সিমলা কেড়ে নিয়েছে। ফাজিলকা কেড়ে নিতে চায়। সেপারেট ইলেকটোরেট উঠে যাবার পর থেকে শিখরা নির্বাচনের দ্বন্দ্বে হিন্দু ভোট নির্ভর। হিন্দুরা শিখ ভোট নির্ভর নয়। হিন্দু ভোটে নির্বাচিত কংগ্রেস সরকার রাজ্যেই হোক আর কেন্দ্রেই হোক শিখদের সঙ্গে বিমাতৃসুলভ ব্যবহার করছে। শিখরা তাদের ন্যায্য ভাগ পাচ্ছে না।

পাঞ্জাবীরা এক আশ্চর্য জনগোষ্ঠী। একই গ্রামের শিখরাও জাঠ, মুসলমানরাও জাঠ, হিন্দুরাও জাঠ। অথচ এরা যদি পড়ে হিন্দী, ওরা পড়ে উর্দু, আর তারা পড়ে পাঞ্জাবী। এরা যদি লেখে দেবনাগরী লিপিতে ওরা লেখে ফারসী লিপিতে, আর তারা লেখে গুরুমুখী লিপিতে। বাংলাদেশের সমস্যা অপেক্ষাকৃত সরল। এখানে ধর্মভেদ আছে, ভাষাভেদ নেই, লিপিভেদ নেই। ভাষা বা লিপি নিয়ে কোনো পক্ষই উত্তেজিত নয়। ধর্মভেদ না থাকলে সব বাঙালী এক হতে পারত, কিন্তু সব পাঞ্জাবী এক হবে না। বিভিন্ন ভাষায় পড়াশুনা করে ও বিভিন্ন ভাষার বইপত্র লিখে বিভিন্ন মানসিকতার অধিকারী হবে। ষাট বছর আগে এমনটি ছিল না। লালা লাজপৎ রায়ের সম্পাদিত 'বন্দে মাতরম্' আনিয়ে দেখি সে পত্রিকার ভাষা উর্দু, লিপি ফারসী। অথচ লালাজী ছিলেন ধর্মে আর্যসমাজী। আর্যসমাজীরা দলকে দল হিন্দীনবীশ হয়ে মুসলমানদের কাছ থেকে সরে গেছে। উর্দুভাষী হিন্দুদের কাছ থেকেও। হ্যাঁ, হিন্দুদেরও বহুসংখ্যক পরিবার এখনো উর্দু পত্রিকা পড়ে, উর্দুতে লিখে ছাপায়। উর্দু সাহিত্যের জন্যে পুরস্কার এবার একজন হিন্দুকে দেওয়া হয়েছে। ফিরাক গোরখপুরী তো জ্ঞানপীঠ পুরস্কারও পান। তাঁর আসল নাম রঘুপতি সহায়। গোরখপুরে বাড়ী। সেই থেকে গোরখপুরী। আর ফিরাক তাঁর ছদ্মনাম।

উর্দু সাহিত্যের ইতিহাস লিখেছেন রামবাবু সক্‌সেনা। তাঁর সঙ্গে আমার আলাপ ছিল। উর্দুভাষী হিন্দু। উত্তরপ্রদেশের কায়স্থদের প্রথা তাঁদের ছেলেদের নাম রাখা হতো ফারসীতে। তারা লেখাপড়া করত উর্দুতে। ইকবাল বখ্‌ত হিন্দু। তাঁর পিতার নাম খুশবখ্‌ত রায়। রায় না লিখলে কার সাধ্য চেনে হিন্দু কি মুসলমান?

ধর্মের মতো ভাষাও মানুষকে বিভক্ত করে। নইলে অসমীয়া হিন্দুর সঙ্গে বাঙালী হিন্দুর এমন কী তফাৎ! আসাম আন্দোলন আসলে বাঙালীবিরোধী আন্দোলন। ধর্মও মানুষকে এক করতে পারছে না। এসব দেখে শুনেও যারা হিন্দু রাষ্ট্র গঠনের স্বপ্ন দেখছেন তাঁরা কি শিখদেরও শিখরাষ্ট্র গঠন করতে প্ররোচনা দিচ্ছেন না? হিন্দীভাষীরা মুখে বলছেন বটে, শিখরাও হিন্দু। কিন্তু তাই যদি হয় তবে হিন্দুরাই বা হরিয়ানার জন্যে ফাজিলকা চায় কেন? বিনা শর্তে চণ্ডীগড় ছেড়ে দেয় না কেন? শিখরাই বা ধর্মযুদ্ধে নামতে যায় কেন? এ যুদ্ধ তো বিপথগামী হয়ে হিন্দু শিখের রক্তপাতে পর্যবসিত হবে। তখন মিটমাট আরো দুরূহ হবে।

এতদিন আমরা জানতুম যে ইণ্ডিয়ানরা একটি নেশন। এখন শুনছি শিখরাও একটি নেশন। শিখরা একটি নেশন হলে মুসলমানরাই বা নয় কেন? খ্রীস্টানরা কী অপরাধ করল? আর হিন্দুরাই বা পেছিয়ে থাকবে কেন? দেশটা কি তা হলে চার পাঁচ ভাগ হয়ে যাবে? প্রত্যেকটি ভাগেই প্রত্যেকটি তথাকথিত নেশন থাকবে ও পরস্পরকে ফরেনার বলে ভাগিয়ে দিতে চাইবে? আসাম মার্কা আন্দোলন ভারতব্যাপী হবে? দেশরক্ষা করবে কে? দেশ কি আরো একবার পরাধীন হবে? তা হলে এত দীর্ঘকাল ধরে সারা দেশব্যাপী স্বাধীনতা সংগ্রাম চালানো হলো কেন? শিখদের দানও তো কম নয়।

ন্যাশনালিজম একটি ঈর্ষাপরায়ণা দেবী। ইনি চান অসপত্ন হতে। ইণ্ডিয়ান ন্যাশনালিজম ইণ্ডিয়ার পূজাবেদীতে অন্য কোনো দেবীর সপত্নী হতে রাজী হবেন না। দুই নেশনের অস্তিত্ব নিয়ে মিটনাট করা অসম্ভব। শিখদের প্রথম আনুগত্য ভারতের প্রতি। নয়তো ভারত ছাড়তে হবে। খানিকটে জায়গা কেটে নিয়ে খালিস্তান প্রতিষ্ঠা যদি করতেই হয় তো তার জন্যে তরবারি ধারণ করতে হবে। যুদ্ধে জিততে হবে। নির্বাচনে তার মীমাংসা হবে না। যারা ভারতের প্রতি অনুগত নয় তাদের নির্বাচনেই যোগ দেওয়া উচিত নয়। আগে নাগরিকের দায়িত্ব পালন করতে হবে, তার পরে নাগরিকের অধিকার দাবী করতে হবে।

"রাজ করেগা খালসা" দেড় শতাব্দী পরে আবার এই ধ্বনি উঠেছে। এবার মোগলকে বা ইংরেজকে বা পাকিস্তানকে হটিয়ে নয়, হিন্দুকে হটিয়ে। পাঞ্জাবে এখন হিন্দুদের সংখ্যানুপাত শতকরা আটচল্লিশ। অকালীদের দাবী অনুসারে হরিয়ানা, হিমাচল প্রদেশ ও রাজস্থানের কতক অংশ পাঞ্জাবের সঙ্গে জুড়লে ও চণ্ডীগড় তাকে ছেড়ে দিলে হিন্দুর সংখ্যানুপাত শতকরা পঞ্চাশ তো ছাড়িয়ে যাবেই, বাহান্নও ছাড়িয়ে যেতে পারে। তা হলে নির্বাচনে কারা জিতবে? শিখরা না হিন্দুরা? এটা আঁচ করতে পেরে কেউ কেউ বলতে শুরু করেছেন যে

অ-পাঞ্জাবী হিন্দু কর্মী ও শ্রমিকদের ভোট দিতে দেওয়া হবে না। কেন, ওরা কি ভারতীয় নাগরিক নয়? সরকারকে কর জোগায় না? গণতন্ত্র তা হলে কোথায় রইল? ন্যাশনালিজমও যাবে, ডেমোক্রাসীও যাবে। বাকী থাকবে কী?

দেশরক্ষায় শিখদের একটা মস্ত বড়ো ভূমিকা আছে। সবাই সেটা স্বীকার করে ও তার জন্যে তাদের শ্রদ্ধা করে। কিন্তু পাঞ্জাবী হিন্দুদেরও কি ভূমিকা নেই? ইণ্ডিয়ান আর্মির উপরে এর বিষম প্রতিক্রিয়া হবে। গণতান্ত্রিক উপায়ে ক্ষমতা দখল করার পথ খোলা রয়েছে। অকালীরা যে ক্ষমতার ভাগ পায়নি তা নয়। কিন্তু বহু শিখ কংগ্রেসেরও সভ্য। অনেকে কমিউনিস্ট পার্টিরও সভ্য। তারাও ক্ষমতার মুখ দেখেছে বা দেখতে চায়। কিন্তু পার্টির সভ্য হিসাবে। সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি হিসাবে নয়। রাজনীতিক্ষেত্রে ধর্মকে নিয়ে এলে আরো একটা মূলনীতিতে বাধে। সেটার নাম ধর্মনিরপেক্ষতা। যে রাষ্ট্র ধর্মনিরপেক্ষ সে রাষ্ট্রে সম্প্রদায় অনুসারে ভোট দেওয়া নেওয়া হয় না। হিন্দুও মুসলমানকে ভোট দিতে পারে, মুসলমানও হিন্দুকে, উভয়েই শিখকে, শিখও উভয়কে। নয়তো ন্যাশানালিজমও যাবে, ডেমোক্রাসীও যাবে, সেকুলারিজমও যাবে। তা হলে তো আমাদের সংবিধানটাই হয় ব্যর্থ। কে এতে রাজী হবে? অকালীদের মধ্যে যাঁরা দূরদর্শী তাঁরা হয়তো সব দিক বিবেচনা করে 'ধর্মযুদ্ধ' থেকে নিবৃত্ত হবেন।

আফগান প্রসঙ্গ

এখন যার নাম আফগানিস্থান একদা সে দেশ ছিল ভারতবর্ষেরই অঙ্গ। যেমন পাকিস্তান। স্বতন্ত্র একটি দেশ হলেও সে ভারতের সঙ্গে নিবিড়ভাবে যুক্ত। দেশ-ভাগের পর পাকিস্তানের সঙ্গে। তার আমদানী রফতানীর বন্দর করাচী। তার সামুদ্রিক বাণিজ্যের অপর কোনো রাস্তা নেই। সেদিক থেকে সে ব্রিটিশ আমল থেকেই ভারতনির্ভর ও পরে পাকিস্তাননির্ভর। এ রাস্তা যদি বন্ধ হয়ে যায় তবে তাকে বাধ্য হয়ে মধ্য এশিয়ার ভিতর দিয়ে রাশিয়ার সঙ্গে আমদানী রফতানীর ব্যবস্থা করতে হয়। কিংবা ইরানের ভিতর দিয়ে অন্যান্য রাষ্ট্রের সঙ্গে।

আফগানিস্থানের অবস্থান সুইটজারল্যাণ্ডের মতো। চারদিকেই অন্যান্য দেশ। কোনোদিকেই সমুদ্রপথ নেই। এর দরুন সুইটজারল্যাণ্ড কি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে? না, সে তার অবস্থানকে মেনে নিয়ে সমৃদ্ধ হয়েছে। সকলের সঙ্গেই তার সদ্‌ভাব। সকলের সঙ্গেই তার শান্তির সম্পর্ক। তার মূলনীতি রাজনৈতিক নিরপেক্ষতা। সে কোনো শিবিরেই কখনো যোগ দেয় না। তবে আত্মরক্ষার জন্যে সব সময় প্রস্তুত থাকে। কেউ যদি সুইটজারল্যাণ্ড আক্রমণ করে তবে প্রবল বাধা পাবে। জনসংখ্যার অধিকাংশই জার্মানভাষী। অথচ ভাষার নাম করে বা জাতির নাম করে হিটলার তাদের জার্মান শিবিরে টানতে পারেননি। তাই জার্মানরা হেরে গেলেও জার্মানভাষী সুইসরা হেরে যায়নি। তারা অপরাজিত ও যতদিন নিরপেক্ষ থাকবে ততদিন অপরাজেয়।

এতদিন আমরা জানতুম যে আফগানিস্থানই এশিয়ার সুইটজারল্যান্ড। সেইরকম নিরপেক্ষ ও সেইরকম শান্তিপূর্ণ। কেউ তাদের ঘাঁটাবে না। তারাও কাউকে ঘাঁটাবে না। ভারতের ইংরেজ শাসকরা তাদের বার বার ঘাঁটিয়ে শেষ-পর্যন্ত এই শিক্ষা লাভ করেছিলেন যে তাদের গায়ে হাত না দিলেই তারা ইংরেজের বন্ধু থাকবে, রুশের দিকে ঝুঁকবে না। তবে বরাবরই আশঙ্কা ছিল যে আফগানরা রাশিয়ার দিকে না ঝুঁকলেও রাশিয়া আফগানদের দিকে ঝুঁকতে পারে। মধ্য এশিয়ার আর পাঁচটা মুসলিম রাজ্য যেমন করে গ্রাস করেছে আফগানিস্থানকেও তেমনি করে মুখে পুরতে পারে। সেইজন্য উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে ও ব্রিটিশ বেলুচিস্থানে ব্রিটিশ আর্মি সদা সতর্ক ছিল। ইংরেজরা জানত যে আসল শত্রু আফগান রাষ্ট্র নয়, রুশ সাম্রাজ্য। পরে সোভিয়েট ইউনিয়ন। নানা আন্তর্জাতিক কারণে রাশিয়ার সঙ্গে ব্রিটেনের বিরোধ বেধে যেতে পারে। তখন সোভিয়েট সৈন্য আফগানিস্থানে প্রবেশ করতে উদ্যত হলে ব্রিটিশ ভারতীয় সৈন্য তার আগেই কোয়েটা থেকে কান্দাহারে হাজির হবে, কান্দাহার থেকে কাবুলে। যে আগে দখল করবে তারই তো জয়ের সম্ভাবনা বেশী।

আজ যদি ইংরেজ এদেশে থাকত তা হলে রুশ সৈন্য আফগানিস্থানে প্রবেশ করতে সাহস পেত না। আফগান বিপ্লবীরা একাই প্রতিবিপ্লবীদের সঙ্গে মোকাবিলা করত। রুশ সাহায্য চাইত না, চাইলে পেতোও না, পেলে যা হতো তার নাম আন্তর্জাতিক যুদ্ধ। আর পাঁচটা দেশও তাতে জড়িয়ে পড়ত। ইংরেজরা নেই। তাদের ক্ষমতা ও দায়িত্ব যাদের হাতে অর্পণ করে গেছে তারা সারা ভারতবর্ষের হিন্দু মুসলমান নয়, তারা পাকিস্তানী মুসলিম। হিন্দুকে তারা ভাগিয়ে দিয়েছে। তাদের সৈন্যদলে একটিও হিন্দু আছে কি না সন্দেহ। নইলে হিন্দু মুসলমান শিখ মিলে ছুটে যেত রুশ সৈন্যদের পথ রোধ করতে। যাতে আফগানিস্থান তার নিরপেক্ষতা না হারায়। যাতে রাশিয়া সেখানে ঘাঁটি গাড়তে না পারে। এখন ভারতের হিন্দু শিখের মাথাব্যথা নেই। যত মাথাব্যথা পাকিস্তানের মুসলমান কর্তৃপক্ষের। তাদের এখন দোস্ত যদি থাকে তো তারা আরব, ইরানী, তুর্ক, ইংরেজ, মার্কিন, চীন। ভারতরাষ্ট্র তাদের দোস্ত নয়, তাদের চোখে দুশমন। হিন্দু শিখ সৈন্য যদি পাকিস্তানের ভিতর দিয়ে আফগানিস্থানে যায় তবে স্বাগত হবে না। বাধা পাবে।

ব্যাপার দেখে মনে হয় পাকিস্তান নিজেও রাশিয়ার সম্মুখীন হবে না, ভারতকেও হতে দেবে না। তা হলে ভারতেরই বা এমন কী গরজ? কেনই বা সে রাশিয়াকে তার শত্রু করতে যাবে? কবে একদিন রাশিয়া পাকিস্তানে প্রবেশ করে ভারতের দিকেও পা বাড়াবে এই আতঙ্কে কি ভারত এখন থেকেই দিশাহারা হয়ে আগেভাগে পা বাড়াবে? বাড়াতে চাইলে কোন্ পথ দিয়ে বাড়াবে? পাকিস্তানের ভিতর দিয়ে তো নয়। পাকিস্তান সরকারের ইচ্ছার বিরুদ্ধে পাকিস্তান রক্ষার জন্যে ভারতীয় সৈন্য পাঠানো যায় না। তেমনি, আফগান সরকারের ইচ্ছার বিরুদ্ধে আফগানিস্থান রক্ষার জন্যেও সৈন্য পাঠানো যায় না। ভারতের বর্তমান সরকার প্রাক্তন ব্রিটিশ সরকারের মতো রাশিয়ার অগ্রগতি রোধ করার

জন্যে নিজে অগ্রগামী হতে পারে। অন্ধভাবে ব্রিটিশ পলিসি অনুসরণ করতে গেলে এমন বিপাকে পড়বে যে অগত্যা ইংলণ্ড আমেরিকার কাছে সাহায্য চেয়ে দেশের স্বাধীনতা বিকিয়ে দিতে হবে।

মনে রাখতে হবে যে আফগানিস্থানের নিকটতম প্রাচ্য প্রতিবেশী এখন ব্রিটিশ ভারত নয়, এখন পাকিস্তান। সে ইচ্ছা করলে করাচী বন্দর দিয়ে আমদানী রফতানী বন্ধ করে দিতে পারে। সেইভাবে বিপ্লবী আফগান সরকারের উপর চাপ দিতে পারে। পরোক্ষে রুশ আগন্তুকদের উপরেও। সে তা করেছে কি না জানিনে। যদি করে না থাকে তবে সে-স্বাধীনতা তার আছে। যদি করে থাকে তবে সেও জড়িয়ে পড়েছে। তাছাড়া এটাও তো শোনা যায় যে পাকিস্তানের সীমানা থেকে আফগান বিদ্রোহীরা আফগানিস্থানে হানা দিচ্ছে। এটাও এক-প্রকার জড়িয়ে পড়া। পাকিস্তানের কি এত সামর্থ্য আছে যে সে মিত্রহীন ভাবে একাই জড়িয়ে পড়তে পারে? পেছনে মিত্র আছে নিশ্চয়। আজকাল ধর্মের জিগীর তুললে মিত্র পাওয়া কঠিন নয়। গোটা মধ্য প্রাচ্য জুড়ে ইসলামের পুনরুজ্জীবন চলেছে। এটা যদি মধ্য এশিয়ায় চারিয়ে যায় তবে সোভিয়েট ইউনিয়ন তার সংহতি রক্ষা করতে পারবে না। সোভিয়েট ইউনিয়ন ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রসমবায়। সে ধর্মের নামে জেহাদ বরদাস্ত করবে না। আফগানিস্থানের সমস্যা তার কাছে এক জীবনমরণ সমস্যা। সেখানে কমিউনিজম যদি হেরে যায় তবে মধ্য এশিয়াতেও হেরে যাবে। অথচ সেখানে কমিউনিজমকে জিতিয়ে দেওয়া একমাত্র বৈদেশিক সাহায্যের দ্বারা হতে পাবে না। বিপ্লবী সরকারকে বহাল রাখাও চাই।

ধর্মনিরপেক্ষতা ভারতেরও জাতীয় নীতি। এটা ইসলামী রাষ্ট্র নয়। ইস-লামের পুনর্জাগরণে এর কোনো ভূমিকা নেই। ভারতীয় মুসলমানদের কারো যদি জেহাদে মতি হয় তিনি পাকিস্তানে বা ইরানে গিয়ে পাশপোর্ট বদল করে আফগান বিদ্রোহীদের দলে যোগ দিতে পারেন। কিন্তু ভারতকে এর মধ্যে জড়াতে চাইবেন না। মুসলিম্ দেশের সংখ্যা এখন চল্লিশের উপর। তাদের ধন-বল এখন ভারতের চেয়েও বেশী। একজোট হলে সৈন্যবলও কম নয়। তবে ভারতকে এর মধ্যে টানা কেন? সোভিয়েট ইউনিয়ন আমাদের বন্ধু। বন্ধুকে বড়ো জোর পরামর্শ দিতে পারি যে, আফগানিস্থান থেকে সরে যাও। কিন্তু জেহাদ ঘোষণা করলে বন্ধুতা বিসর্জন দিতে হয়। এ খেলা বিশ্ব ইসলামীরাও খেলতে পারে কি না সন্দেহ। রাশিয়া একটি সুপারপাওয়ার। তার সঙ্গে লড়তে গেলে আরেকটি সুপারপাওয়ারকে সঙ্গে জড়াতে হয়। তার মানে আমেরিকাকে যুদ্ধে নামাতে হয়। সে যদি লড়তে রাজী হয় তো তার আগে ঘাঁটি দাবী করবে ও উড়ে এসে জুড়ে বসবে। বিশ্ব ইসলামীদের স্বাধীনতা কোথায় থাকবে? তাঁরাও সেটা বোঝেন। তাই আগুয়ান হচ্ছেন না।

একথা কি কেউ বলছেন যে আফগানিস্থানের বিপ্লবটা আফগানদের নিজেদের উদ্যোগে ঘটেনি, ঘটেছে সোভিয়েটের উদ্যোগে? যতদূর বুঝতে পারা যাচ্ছে উদ্যোগটা স্বদেশের বিপ্লবীদেরই। বিপ্লব ঘটলে প্রতিবিপ্লবও ঘটে। দেশের

প্রতিবিপ্লবীরা বিদেশের সাহায্যও পায়। সুযোগ পেলে বিদেশীরা সৈন্যও যে না পাঠায় তা নয়। কিন্তু ইরান তথা পাকিস্তান ঘর সামলাতেই ব্যস্ত। আর কেউ যখন সৈন্য পাঠাচ্ছে না তখন সোভিয়েটই বা সৈন্য পাঠাতে যায় কেন? কৈফিয়ৎটা এই যে আফগানিস্থানের বিপ্লবীরা সৈন্য পাঠাতে অনুরোধ করেছিল। যেখানে প্রতিবিপ্লবীরা সৈন্য আমদানী করেনি সেখানে বিপ্লবীরা সৈন্য আমদানী করেছে, এর তাৎপর্য কী? বিপ্লবীরা প্রতিবিপ্লবীদের সঙ্গে এঁটে উঠতে পারেনি। বাইরে থেকে সৈন্য আমদানী না করলে ক্ষমতার আসনে টিকতে পারত না। আমানুল্লার মতো বাচ্চা-ই সাকোর দ্বারা বিতাড়িত হতো।

আফগানিস্থানের দুর্ভাগ্য এই যে সেদেশে আমানুল্লাদের চেয়ে বাচ্চা-ই সাকোদের জোর বেশী। সেটা শস্ত্রের জোর নয়, শাস্ত্রের জোর। লড়াইটা যেন কোরানের সঙ্গে 'ডাস কাপিটল'-এর। জনগণ যদি কোরানের প্রতি অন্ধ বিশ্বাসের বশীভূত হয় তবে মোল্লারাই গণসমর্থন পাবে। যে পক্ষে গণসমর্থন সে পক্ষেই সাফল্য। তা হলে কি বিপ্লব ব্যর্থ হবে? বোধহয় না। আফগানিস্থান যদি ইথিয়োপীয়ার পথ নেয় তা হলে বিপ্লব সফল হতেও পারে। সেদেশের জনগণ বাইবেলের প্রতি অন্ধবিশ্বাসী। কিন্তু সেদেশের সম্রাট বিরাট এক সৈন্য-দল গঠন করেছিলেন, যাতে চাষীর ছেলেদেরই প্রাধান্য। চাষীর ছেলেরা প্রমোশন পেতে পেতে যখন কর্নেল পর্যন্ত ওঠে তখন তাদের পদোন্নতির সীমায় এসে পৌঁছে যায়, কারণ উপরের দিকের জেনারলরা অভিজাতবংশীয়। তখনি তারা ক্ষমতা দখল করে। আফগানিস্থানেও উপরের দিকে যাঁরা আছেন তাঁরা অভিজাত বা বুর্জোয়া বংশধর। নিচের দিকে যারা আছে তারা চাষীর ছেলে। বিপ্লবী সরকার চাষীর ছেলেদের ধরে নিয়ে এসে সৈন্যদলে ভর্তি করেছেন ও তাদের সামনে তুলে ধরেছেন পদোন্নতির অভূতপূর্ব সুযোগ। এটা রাশিয়ান ফৌজের শিক্ষায়। রাশিয়ান ফৌজ সরে যাবার আগে চাষীর ছেলেদের তালিম দিয়ে তাদেরই হাতে বিপ্লব রক্ষার ভার সঁপে দিয়ে যাবে। 'ডাস কাপিটাল' ততদিনে তাদের মুখস্থ হয়ে থাকবে। নতুন শাস্ত্রই পুরাতন শাস্ত্রকে প্রতিহত করবে।

এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে ইণ্ডোনেশিয়ার কথা। চীনের পরে এশিয়ার বৃহত্তম কমিউনিস্ট পার্টি ছিল ইণ্ডোনেশিয়ায়। এক রাত বা দু'রাতের মধ্যেই সেই পার্টির পাঁচলক্ষ সদস্য ও সমর্থক ঘরে ঘরে কোতল হয়। যাদের হাতে কোতল হয় তারা ধর্মান্ধ ইসলামী বিপ্লববিরোধী দল। বিপ্লব ঘটাবার আগেই বিপ্লবীদের জান খতম। এখন আর ইণ্ডোনেশিয়ায় বিপ্লবের নামগন্ধ নেই। অথচ জন-গণের দুর্গতিরও অবধি নেই। ইন্ডোনেশিয়ার অবস্থান এমন যে সেখানে রাশিয়া বা চীন সৈন্য পাঠাতে পারে না। নয়তো তারাও ইণ্ডোনেশিয়ায় ঢুকে প্রতি-বিপ্লবীদের উপর শোধ তুলত। আফগানিস্থানের তিন দিকে ইসলামী রাষ্ট্র, সেসব রাষ্ট্র প্রতিবিপ্লবীদের মদত দিতে রাজী, যদি তাদেরও মদত দেবার জন্যে ইসলামী বা সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্ররা রাজী থাকে। কেবল একটি দিক খোলা। সেদিকেও ইসলাম, কিন্তু সে ইসলাম সোভিয়েট ইউনিয়নভুক্ত ইসলাম। বলা

যায় না তার সহানুভূতি কোন্ পক্ষে। বিপ্লবী পক্ষে না প্রতিবিপ্লবী পক্ষে। যদি বিপ্লবী পক্ষে হয়ে থাকে তবে আখেরে আফগান বিপ্লবীরাই জিতবে বা পালিয়ে গিয়ে প্রাণে বাঁচবে। নয়তো সোভিয়েট সৈন্যকেই দশ বিশ বছর আফগানিস্থানে মোতায়েন থাকতে হবে, যেমন মোতায়েন রয়েছে চেকোস্লোভাকিয়ায়। যদি অসময়ে ঘরে ফিরে যায় তবে আফগান বিপ্লবীদের নেকড়ে বাঘের মুখে ফেলে রেখে যাবে। তখন ইন্ডোনেশিয়ার পুনরাবৃত্তি হবে। কয়েকদিনের মধ্যেই কয়েক লক্ষ কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য বা সমর্থক খতম কিংবা উধাও। রুশ অভিমুখে।

যোধপুর পার্কের একটা বাড়ীতে কাবুলীরা ভাড়াটে ছিল। তেরো বছর আগে যখন এ পাড়ায় আসি তখন দেখি ওরা কাবুলী পোশাক পরে লাঠি হাতে ঘুরে বেড়ায়। কিন্তু পরে ওদের পোশাক বদলে যায়। ওরা ইউরোপীয় পোশাক পরে, পাগড়ী ছাড়ে, বাবরী ছাঁটে, লাঠি রাখে না। তখন কেউ চিনতে পারে না ওরা কাবুলী না পাঞ্জাবী। হিন্দু না মুসলমান। ওদের একজনের সঙ্গে আমার ভাব ছিল। দাউদ খান্ যখন ক্ষমতা অধিকার করেন কাবুলীটি অসুখী হয়। বলে, "দেখুন দেখি কী অন্যায়! ভগ্নীপতির এই কাজ!" যে মানুষ দাউদের সমর্থন করেনি সেই মানুষ যে কমিউনিস্টদের সমর্থন করবে তা মনে হয় না। কিন্তু আজকাল আর ওদের দেখতে পাইনে। মহাজনী ব্যবসা চলছে কি না সন্দেহ। নয়তো আফগানিস্থান সম্বন্ধে আরো ওয়াকিবহাল হওয়া যেত। সেখানকার বিপ্লবের সফলতা-বিফলতার উপরে ইরান, পাকিস্তান তথা ভারতের ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে।

আধুনিক লঙ্কাকাণ্ড

অবিশ্বাস্য ব্যাপার! সিংহলীদের যারা দেখেছে তারা জানে ওদের মতো নিরীহ গোবেচারি জাতি ভারতের বা তার আশেপাশে নেই। সেই তারাই রাস্তায় ঘাটে তামিল দেখলেই তাকে নির্বিচারে হত্যা করেছে, কোনো কোনো ক্ষেত্রে তার গায়ে পেট্রল ঢেলে আগুন ধরিয়ে দিয়ে পুড়িয়ে মেরেছে। তা ছাড়া তাদের দোকান জ্বালিয়েছে, কারখানা জ্বালিয়েছে, বসতবাড়ী বা ফ্ল্যাট জ্বালিয়েছে। উপরন্তু তাদের সম্পত্তি লুটপাট করছে। পুলিশ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখেছে, আর্মি প্রশ্রয় দিয়েছে, কোনো কোনো ক্ষেত্রে প্ররোচনা দিয়েছে। আর তামিল বলতে কেবল জাফনার তামিল নয়, চা-বাগানের বা রাবার বাগানের শ্রমিক তামিল, ভারতের নাগরিক তামিলও বোঝায়। যারা তামিল নয়, অথচ ভারতীয়, তাদের উপরেও হামলা করে। সরকার কারফিউ জারি করলেও কারফিউ মানে না। জানে যে সরকার তাদেরি ভোটনির্ভর।

রাষ্ট্রপতি জয়বর্ধন এক একদিন একরকম ব্যাখ্যা দিচ্ছেন। প্রথমে গোটা তিনেক বামপন্থী পার্টিকে দোষ দিয়ে তাদের নেতাদের ধরপাকড় করেন। দলগুলোও নিষিদ্ধ হয়। তাদের পেছনে নাকি রাশিয়ার ও পূর্ব জার্মানীর হাত

আছে। তার পরে সন্দেহ করেন যে কোনো এক দেশ সৈন্য পাঠিয়ে হস্তক্ষেপ করবে। সেরূপ অবস্থায় ইংরেজ, মার্কিন, পাকিস্তানী ও বাংলাদেশী সাহায্য পাওয়া যাবে কি না অনুসন্ধান করেন বলে শোনা যায়। তার পর তাঁর রোখ পড়ে জাফনা তামিলদের নেতাদের উপরে। দেশের সংবিধান এমনভাবে করা হয়েছে যে এর পরে তাঁরা আর পার্লামেণ্টে আসতে পারবেন না, এলে বিচ্ছিন্নতাবাদ ত্যাগ করে আসতে হবে। শেষে স্বীকার করেছেন যে সিংহলী সৈনিকরাই জাফনার তামিলদের উপরে নির্বিচারে গুলী চালিয়েছে, এ খবরটা তিনি আগে শোনেননি। এর প্রতিক্রিয়ায় তামিল সন্ত্রাসবাদীরা বোমা ফেলে তেরোজন সিংহলী সৈন্যকে কোতল করেছে। তার প্রতিক্রিয়ায় দক্ষিণের সিংহলীরা তিনশো জনের উপর স্থায়ী তামিল, নয়া তামিল ও ভারতীয় নাগরিক তামিল ও অ-তামিল খুন করেছে। আশি হাজারকে বাস্তুহারা করেছে। এটা হল সরকারী হিসাবে। বেসরকারী হিসাবে আরো অধিকসংখ্যক।

জয়বর্ধন আর্মির মধ্যে শৃঙ্খলার অভাব তো দেখছেনই, কতক অংশের মধ্যে বিদ্রোহের বা বিপ্লবের গন্ধও পাচ্ছেন। ওরা নাকি কমিউনিস্টদের উস্‌কানিতে ক্ষমতা দখল করতে চেয়েছিল। ওদিকে তামিল সন্ত্রাসবাদী 'টাইগার' দলটিও নাকি কমিউনিস্টদের দ্বারা প্ররোচিত। চক্রান্ত! চক্রান্ত ছাড়া এমন কাণ্ড সম্ভব নয়! অথচ কলম্বোর খবরের কাগজে ভারতকেই গালাগাল দেওয়া হচ্ছে। দক্ষিণ ভারতের লোক নাকি শ্রীলঙ্কার তামিল সন্ত্রাসবাদীদের প্রেরণা দিচ্ছে ও আশ্রয় দিচ্ছে। পরোক্ষে ভারতের সরকারও নাকি দায়ী। ভারত সরকার বাংলাদেশের মতো সৈন্য পাঠিয়ে হস্তক্ষেপ করবে এ রকম একটা ধারণা উভয় পক্ষের মনে ছিল। শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী তা করেননি। বিপন্নদের জন্যে তিনি খাদ্য, বস্ত্র, ঔষধ ইত্যাদি পাঠিয়েছেন। রাষ্ট্রপতি জয়বর্ধনের সঙ্গে তিনি সদ্‌ভাব রক্ষা করেই চলেছেন। সন্ত্রাসবাদী তামিলদের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক নেই। বিচ্ছিন্নতাবাদ তিনি সমর্থন করেন না।

এখানে বিশেষ উল্লেখযোগ্য যে বহু সিংহলী যেমন আত্মহারা হয়ে তামিলদের হত্যা করেছে তেমনি বহু সিংহলী প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে তামিলদের রক্ষা করেছেন। অপর পক্ষে তামিলরা সবাই কিছু বিচ্ছিন্নতাবাদী বা সন্ত্রাসবাদী নয়। অধিকাংশ মানুষ চাষী মজুর ও গরিব দুঃখী। ভাষা বা ধর্ম বা জাতি নির্বিশেষে। কিন্তু এটাও সমান সত্য যে মানুষ আজকাল ভাষাচেতন, ধর্মসচেতন, জাতিসচেতন সব দেশেই বা সব রাজ্যেই। যেমন আসামে, তেমনি পাঞ্জাবে, তেমনি অন্ধ্রপ্রদেশে, তেমনি শ্রীলঙ্কায়। ধর্মের ইস্যুতে তো ভারত ভাগ হয়েই গেল। তথা বাংলাদেশ ও পাঞ্জাব। পরে ভাষার ইস্যুতে তো পাকিস্তানও ভাগ হয়ে গেল। পূর্ব পাকিস্তান হলো গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ।

শ্রীলঙ্কায় শুধু যে বৌদ্ধ আর হিন্দু এই দুই ধর্ম আছে তা নয়, সিংহলী আর তামিল এই দুই ভাষাও আছে। তার উপর আছে সত্যিকারের দুই জাতি বা রেস। তামিলরা দ্রাবিড়বংশীয় আর সিংহলীরা বলে তারা বঙ্গদেশের রাজকুমার বিজয়সিংহের বংশধর, সুতরাং আর্য। আর্য অনার্যের বৈদিক যুগের

সেই বিরোধ আধুনিক যুগেও বিলুপ্ত হয়নি। সমুদ্রের দ্বারা বিচ্ছিন্ন একটি দ্বীপে এখনো বিদ্যমান। সিংহলীরা ঠিক আর্য কি না সন্দেহ। বিজয়সিংহও ঐতিহাসিক পুরুষ নন। বৌদ্ধ পুরাণেই তাঁর অস্তিত্ব। তিনি আর্য হলেও তাঁর বিয়ে হয়েছিল যাঁর সঙ্গে সেই রাজকন্যা কুবেনী তো আর্য ছিলেন না। তবে ওরা তামিলদের জাতভাই নয়, ওদের ভাষাও তামিলের সগোত্র নয়। ওদের বিশ্বাস ওরা সিংহ জাতি। যেহেতু ওদের পূর্বপুরুষ বিজয়সিংহের পিতা সিংহবাহু নাকি সিংহের ঔরসজাত। বাংলাদেশে সিংহ ছিল বলে কোথাও লেখে না। লোকের স্মৃতিতেও নেই। সিংহ ছিল গুজরাটে। এখনো আছে গির অরণ্যে। এই কারণে ও অন্যান্য কারণে কোনো কোনো পণ্ডিত অভিমত প্রকাশ করেন যে বিজয়সিংহ ছিলেন গুজরাটের রাজকুমার।

চেহারার দিক থেকে সিংহলীরা অনেকটা বাঙালীদেরই মতো। আর ওরা নিজেরাই তো আমার বন্ধু করুণাদাস গুহকে যে মানপত্র দিয়েছিল তাতে ছিল ওদের পূর্বপুরুষের আদিভূমি বঙ্গদেশের উল্লেখ। গত শতাব্দীতে যখন বৌদ্ধ-ধর্মের পুনরুত্থান হয় তখন সিংহলের বৌদ্ধ প্রচারক অনাগারিক ধর্মপাল কলকাতাকেই বৌদ্ধধর্মের প্রচারকেন্দ্র মনোনয়ন করেন। সেখানেই প্রতিষ্ঠিত হয় মহাবোধি সোসাইটি। যেমন মাদ্রাজে প্রতিষ্ঠিত হয় থিয়সফিকাল সোসাইটি। তামিলদের সঙ্গে সাযুজ্য থাকলে মাদ্রাজই হতে পারত মহাবোধি সোসাইটির কর্মস্থল। দক্ষিণ ভারতও এককালে বৌদ্ধ প্রভাবাধীন ছিল। তার দৃষ্টান্ত অজন্তা, অমরাবতী, নাগার্জুনকোণ্ডা। অজন্তার প্রভাব আমি লক্ষ করেছিলুম সিংহলের সিগিরিয়ার গুহাচিত্রে। কলকাতা কেন, মাদ্রাজ কেন নয়, তার উত্তর বোধহয় বুদ্ধগয়া আর সারনাথ মাদ্রাজ থেকে সুদূর। কলকাতা থেকে অদূর। আরো গভীর কারণ সিংহলের ইতিহাসে তামিলদের ভূমিকা সিংহলীদের পক্ষে মর্যাদাপূর্ণ নয়। কখনো তারা এসেছে রাজ্য জয় করতে, কখনো উপনিবেশ স্থাপন করতে, কখনো বাগানের শ্রমিকরূপে, কিন্তু বৌদ্ধ হতে নয়, সিংহলী হতে নয়। দেশের উত্তরাংশ এখনো তাদের অধিকারে রয়েছে। সেখানে সিংহলীদের সংখ্যা এক শতাংশ।

তামিলরা দাবী করে যে তারাই আগে এসে বসতি করেছে। সিংহলীরা পরে। দক্ষিণ ভারত তো লঙ্কাদ্বীপের নাকের ডগায়। বঙ্গদেশ বা গুজরাট বহুদূরে। কোন্‌টা বেশী স্বাভাবিক? তেমনি শৈব ধর্মই আগে, বৌদ্ধধর্ম পরে। তামিল ভাষা আগে, সিংহলী ভাষা পরে। তামিলরা সংখ্যায় পাঁচভাগের একভাগ। তা বলে তাদের দাবী খাটো নয়। ব্রিটিশ আমলে শিক্ষাদীক্ষায় ও চাকরিবাকরিতে সিংহের ভাগ ছিল সিংহলীদের নয়, তামিলদের। স্বাধীনতার বছর পনেরো আগে সর্বসাধারণের ভোট অধিকার প্রবর্তিত হয়। তখন আইন সভায় সিংহলীদের আধিক্য হয়। স্বাধীনতার পর সরকার তাদেরই হাতে আসে। সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয়ে যায় স্কুল কলেজ আফিস আদালতে সিংহলীদের জন্যে সিংহের ভাগ। তাও সহ্য হতো, কিন্তু মেজরিটির চাপে সিংহলীদের ভাষাকেই করা হয় একমাত্র সরকারী ভাষা আর বৌদ্ধধর্মকে দেশের প্রধান ধর্ম।

তার মানে দাঁড়ায় সিংহলীরাই প্রথমশ্রেণীর নাগরিক, তামিলরা দ্বিতীয় শ্রেণীর। এতে তাদের আত্মমর্যাদায় বাধে। তারাই বা কম কিসে? তারা ব্যাঘ্র জাতি। এই মনোভাব থেকে জন্মায় 'তামিল টাইগারস' নামক সন্ত্রাসবাদী গোষ্ঠী। তারা চায় স্বতন্ত্র তামিল 'ইলম'। তামিলস্থান। সিংহ বনাম ব্যাঘ্র।

বিশ্ববিদ্যালয়ে, মেডিকেল কলেজে, ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজে তামিল ছাত্রদের অনুপাত অন্যায়ভাবে কমানো হয়। যাতে তারা পরে চাকরি না পায়। যেখানে ইংরেজী চালু রাখলেই শান্তি থাকত সেখানে সিংহলী চালাতে গিয়ে অশান্তি। ইংরেজীর উত্তরাধিকারী একমাত্র সিংহলী হবে কেন? তামিলও কেন হবে না? সে তো কম সমৃদ্ধ ভাষা নয়। অসামান্য তার সাহিত্য। প্রকারান্তরে বলা হলো ইংরেজের একমাত্র উত্তরাধিকারী সিংহলীভাষীরাই। তামিলরাও যেন উত্তরাধিকারী নয়। স্বাধীনতা লাভের সময় কিন্তু এমন কোনো বাছবিচার ছিল না। প্রধানমন্ত্রী ডন স্টীফেন সেনানায়ক তাঁর মন্ত্রীমণ্ডলীতে তামিলদেরও উচ্চস্থান দিয়েছিলেন। জুনিয়াস রিচার্ড জয়বর্ধনও ছিলেন তাঁরই দলে। প্রথম আট বছর কোনো গোলমাল ছিল না। সেটা শুধু হয় ১৯৫৬ সালে সলোমন ভাণ্ডারনায়কের আমল থেকে। ইউনাইটেড ন্যাশানাল পার্টিকে ভোটে হারিয়ে দিয়ে শ্রীলঙ্কা ফ্রীডম পার্টি ক্ষমতাসীন হয়। অনেক সৎকাজ করে, কিন্তু ভাষার ক্ষেত্রে সিংহলীকে ও ধর্মের ক্ষেত্রে বৌদ্ধধর্মকে নিষ্কণ্টক করতে গিয়ে তামিল হিন্দুদের আস্থা হারায়। অদৃষ্টের পরিহাস সলোমন ভাণ্ডারনায়ক নিহত হন এক বৌদ্ধ ভিক্ষুর হাতে। অহিংসক বলে যারা প্রসিদ্ধ তাদেরই একজন এই মহামন্ত্রীনিপাত করে। হিংসার এই যে নজীর এটা এখন ব্যাপক হয়েছে। বৌদ্ধ জনতার মধ্যে হিংসার ছোঁয়াচ ছড়িয়ে গেছে। দাঙ্গাহাঙ্গামা এর আগেও বারকয়েক হয়ে গেছে, কিন্তু এবারকার মতো ভয়াবহ নয়। দাঙ্গাবাজরা যেন গভর্নমেণ্টের তোয়াক্কাই রাখে না। রাষ্ট্রপতি যেন সাক্ষীগোপাল।

ইতিমধ্যে দেশের নাম হয়েছে শ্রীলঙ্কা। প্রধানমন্ত্রীর চেয়ে ক্ষমতা বেশী হয়েছে রাষ্ট্রপতির। এখন তিনি গভর্নর জেনারল নন, প্রেসিডেণ্ট। এসব হলো সলোমন ভাণ্ডারনায়কের বিধবা পত্নী সিরিমাভোর কীর্তি। স্বামী-স্ত্রী দু'জনেই ভারতের পররাষ্ট্রনীতি অনুসরণ করেন, সমাজতন্ত্রের দিকে মোড় নেন। ভারতের সঙ্গে সম্পর্ক নিকটতর হয়। সিরিমাভোর আমলেই ভারতীয় তামিল চা-বাগান ও রাবার বাগান শ্রমিকদের কতককে শ্রীলঙ্কার নাগরিক অধিকার দেওয়া হয়। তাদের বঞ্চিত করেছিলেন ডন স্টীফেন। এখানে ব্যাখ্যা করা দরকার যে এই শ্রমিকরা ইংরেজদের বাগানের স্বার্থে আমদানী। এরা দক্ষিণ আফ্রিকার ভারতীয় শ্রমিকদের মতো কর্মস্থানেই থেকে যায়। দক্ষিণ আফ্রিকার মতো নাগরিক অধিকার চায়, পায় ও হারায়। স্বাধীন হয়েই সিংহল সরকার এদের ভোটার তালিকা থেকে উচ্ছেদ করে। দেশ থেকেই উচ্ছেদ করত, যদি না বাগানের নয়া মালিকরা নিজেদের স্বার্থে এদের রাখতে চাইতেন। এরা যেমন কষ্টসহিষ্ণু সিংহলী শ্রমিকরা তেমন নয়। এরা চলে গেলে বাগান থেকে লাভ হবে না। চা আর রাবার রফতানী করেই তো সিংহলীরা বড়লোক। অথচ

এ বেচারাদের ভোটের অধিকার দিতে কুণ্ঠিত।

এই তামিল শ্রমিকরা নয়া তামিল। বনেদী তামিল নয়। এদের কোনো রাজনৈতিক উচ্চাভিলাষ নেই, এদের ছেলেরা উচ্চশিক্ষা বা উচ্চপদ অভিলাষী নয়। এরা স্বতন্ত্র বাসভূমির স্বপ্নও দেখে না। সন্ত্রাসবাদে এদের মতি নেই। এদের কেউ তামিল টাইগার নয়। যেহেতু এরা আইন অনুসারে শ্রীলঙ্কার অধিবাসী নয় সেহেতু ভারত সরকারকেই এদের হয়ে শ্রীলংকা সরকারের সঙ্গে আলাপ আলোচনা চালাতে হয়। এদের জন্যে নৈতিক দায়িত্ব এখনো ভারতের। অপরপক্ষে বনেদী তামিলরা দু'হাজার কি আড়াই হাজার বছর আগে থেকে ভারত ছেড়ে লঙ্কায় বা সিংহলে বাস করে আসছে। তাদের প্রতি সহানুভূতি থাকা স্বাভাবিক, কিন্তু তাদের জন্যে নৈতিক দায়িত্ব বা রাজনৈতিক দায়িত্ব ভারতের নেই। তারা বিদেশী। ভারতও তাদের কাছে বিদেশ। অধিকাংশ ভারতীয় এই তফাৎটা বুঝলেও তামিলনাড়ুর সাধারণ মানুষ বোঝে না। ইতিমধ্যেই তারা একটা বিশ্ব তামিল কংগ্রেস অনুষ্ঠিত করেছে। সেখানে মিলিত হয়েছে ভারতের, শ্রীলংকার, বর্মার, মালয়েশিয়ার, সিঙ্গাপুরের ও অন্যান্য স্থানের তামিলরা। সিঙ্গাপুরের চারটি সরকারী ভাষার একটি হচ্ছে তামিল। আর তিনটি ইংরেজী, মালয়ী, চীনা। মালয়েশিয়ার তামিলদের এত প্রভাব যে একজন তামিল হিন্দুকে দেওয়া হয় পররাষ্ট্র মন্ত্রীর পদ আর তিনি হন রাষ্ট্রসঙ্ঘের নিরাপত্তা পরিষদের সভ্য। ভারদীয়দের কেউ যা কখনো হননি।

লঙ্কাদ্বীপে সংখ্যালঘু হলেও তামিলদের গর্বের যথেষ্ট কারণ আছে। অমন একটি গর্বিত জাতি সিংহলীদের করুণার উপর নির্ভর করে থাকতে পারে না। যেমন চায়নি অবিভক্ত ভারতের গর্বিত মুসলমান 'জাতি' হিন্দুদের করুণানির্ভর হতে। তা হলে কি এ সমস্যার স্থায়ী সমাধান তামিলদের জন্যে স্বতন্ত্র বাস-ভূমি? তামিল 'ইলম'? তামিলস্থান? এ রকম একটা সিদ্ধান্ত নেবার আগে দশবার ভাবতে হবে। শ্রীলঙ্কা ক্ষুদ্র দ্বীপ। তামিলভাষী অঞ্চলটি ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র। তামিলরা তার বাইরেও ছড়িয়ে আছে ও ব্যবসাবাণিজ্যে টেক্কা দিচ্ছে। তাদের সবাই কিছু চাকরিজীবী নয়। তামিলভাষী রাষ্ট্রে তাদের ভবিষ্যৎ নেই। দেশ ভাগ হয়ে গেলে তারা সিংহলীভাষী রাষ্ট্রে বিদেশী বলে গণ্য হবে। বিতাড়িত হবে। তামিলভাষী রাষ্ট্র স্বয়ংসম্পূর্ণ হবে কী করে? ট্যাক্স দেবে কে? রফতানীযোগ্য পণ্য কোথায়?

অপরপক্ষে শ্রীলংকা সরকারকেও মনে রাখতে হবে যে তামিল এলাকায় সিংহলীদের জায়গা জমি দিয়ে উপনিবেশ পত্তন করাও কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে। এই কর্মটি করা হচ্ছে সেচ প্রকল্পের নাম করে। তামিলদের বিক্ষোভের এটাও একটা কারণ। ইতিমধ্যেই তামিল এলাকায় নানা উপলক্ষে বিস্তর সিংহলী উপস্থাপিত হয়েছে। এতে তামিলদের গাত্রদাহ ও স্বার্থহানি। সমগ্র দ্বীপে তামিলরা সংখ্যালঘু হলেও কয়েকটি জেলায় তারা সংখ্যাগুরু। সেই কয়েকটি জেলায় তাদের সংখ্যালঘুতে পরিণত করতে গেলে তারা প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ করবেই। যদিও সরকারের অভিপ্রায় হয়তো তাদের সংখ্যালঘুতে পরিণত না

করা। কিংবা তাদের বসবাসের জায়গা সংকীর্ণ না করা।

জয়বর্ধন রেফারেন্ডাম করে পার্লামেন্টের কার্যকাল আরো ছ'বছর বাড়িয়ে নিয়েছেন। সেইসঙ্গে আপনার স্থিতিকাল। কিন্তু তামিলরা যদি পার্লামেন্ট বয়কট করে তবে তাদের অনুপস্থিতিতে আইনকানুন, বাজেট ইত্যাদি পাস করা যেন খালি মাঠে গোল দেওয়া। দুনিয়ার লোক হাসবে। আর যাই করুন তামিল সন্ত্রাসবাদীদের 'লিকুইডেট' করতে সিংহলী সৈন্য পাঠাবেন না, পাঠালে ওরাও মরবে, এরাও মরবে। কেউ বেশী কেউ কম। জনতাও উত্তেজিত হয়ে প্রতিশোধ নেবে। কোনো সভ্যদেশ জনতার হাতে নিপরাধের প্রাণদণ্ড সমর্থন করে না। জেলখানায় আটক বন্দীদের খুন করে জেল কয়েদীরা, এমন কথা কেউ কোথাও শোনেনি। তাও একজন দু'জন নয়, বাহান্ন জন। তাদের মধ্যে জনা তিনকে বাদে আর সকলেই বিচারাধীন বা বিচারবিহীন। একজন কি দু'জন গান্ধী-বাদী। জয়বর্ধনের দ্বিতীয় ছ'বছর কি এমনিভাবেই কাটবে?

বলতে পারা যায়, তামিলরা সন্ত্রাসবাদীদের প্রশ্রয় দেয় কেন? হয়তো এইজন্যে যে ওরা তামিলদের স্বাধিকারের জন্যে জান কবুল করে লড়ছে। আর কারো অত সাহস বা ত্যাগশক্তি নেই। কিন্তু সরকার যদি কেবলমাত্র সিংহলীদের সরকার হয়ে থকে, আর্মি যদি কেবলমাত্র সিংহলীদের আর্মি হয়ে থাকে, পুলিশ যদি শতকরা পঁচানব্বই ভাগ সিংহলীদের হয়ে থাকে তবে তামিলদের প্রতিরোধ একভাবে না একভাবে আত্মপ্রকাশ করবেই। গান্ধীবাদী ধারাও ধরতে পারে। মার্কসবাদী ধারাও ত্যাজ্য নয়। সারা দেশে না হোক কতক অঞ্চলে প্রশাসন অচল হয়ে যেতে পারে। একমুঠো সন্ত্রাসবাদী তখন এক হাজার কি দু'হাজার গেরিলায় পরিণত হবে।

যেদেশে সংখ্যাগুরু আর সংখ্যালঘুর জাতি আলাদা, ধর্ম আলাদা, ভাষা আলাদা সেদেশের ঐক্যের একমাত্র শর্ত পার্টি এক ও সরকার এক। সেনানায়ক সেটা বুঝতেন, জয়বর্ধন সেটা বোঝেন না। তাঁর প্রথম কাজ হবে তামিলদের আস্থা অর্জন করা। তারা যেন বিশ্বাস করে যে তাঁর সরকার তাদেরও সরকার। দ্বিতীয় কাজ হবে কানাডা বা বেলজিয়ামের মতো শ্রীলঙ্কাকে একটি দ্বিভাষী রাষ্ট্র করা। একভাষী রাষ্ট্র করতে গেলে দেশকে দু'ভাগ করতে হবে। সিঙ্গাপুরে যদি চারটে ভাষা সরকারী ভাষা হয় শ্রীলঙ্কার কেন তিনটে ভাষা সরকারী ভাষা হবে না? সিংহলী, তামিল ও ইংরেজী? শ্রীলঙ্কায় বৌদ্ধধর্ম ছাড়া আরো তিনটি ধর্ম আছে। হিন্দু, মুসলিম ও খ্রীস্টান। রাষ্ট্র যদি ধর্মনিরপেক্ষ হয় তা হলে বৌদ্ধদের এমন কিছু ক্ষতি হবে না অথচ অন্যান্যদের আস্থা বাড়বে। সরকার চলে আস্থার জোরে, তলোয়ারের জোরে নয়, কারাগারের জোরে নয়। যেদেশে গণতন্ত্র আছে সেদেশে মেজরিটির শাসন হচ্ছে রাজনৈতিক মেজরিটির শাসন, সাম্প্রদায়িক মেজরিটির নয়, ভাষাভিত্তিক মেজরিটির নয়, জাতিভিত্তিক মেজরিটির নয়।

বার্মায় এই ভুলটি করেছিলেন উ নু। তার ফলে তাঁর বিরুদ্ধে সামরিক অভ্যুত্থান হয়। ক্ষমতা দখল করেন সেনাপতি নে উইন। বার্মা আবার ধর্ম-

নিরপেক্ষ রাষ্ট্র হয়। জাতিনিরপেক্ষ দেশ হয়। কারেন, শান প্রভৃতি জাতি শান্ত হয়। কারেনরা খ্রীস্টান। শেষপর্যন্ত শ্রীলঙ্কাতেও একটা সামরিক অভ্যুত্থান ঘটতে পারে। জয়বর্ধন বলছেন যে চক্রান্তকারীদের উদ্দেশ্যই ছিল তাই। তেমন কিছু যদি হয় তিনি বিদেশ থেকে সামরিক সাহায্য প্রার্থনা করতে পারেন, কিন্তু কেউ তাঁর ডাকে সাড়া দেবে না। কারণ বিশ্বের জনমত এখন তাঁর দিকে নয়। অত্যাচারিত সংখ্যালঘুদের দিকে। তিনি যদি তাঁর ব্রুট মেজরিটি দিয়ে মাইনরিটিকে সায়েস্তা করতে চান তবে বুঝতে হবে তাঁর নৈতিক অধিকার এখন শূন্যের কোঠায়। তাঁর উচিত অবিলম্বে তামিল প্রতিনিধিদের সঙ্গে গোল টেবিল বৈঠকে বসা ও সবাই মিলে একটা রাজনৈতিক সমাধান খুঁজে বার করা। ইচ্ছা থাকলে উপায় থাকে। অখণ্ড শ্রীলঙ্কা যদি কাম্য হয়ে থাকে তার জন্যে সিংহলীদের কিছু ত্যাগ স্বীকার করতে হবে। ভাষা আর ধর্ম আর জাতি এই তিনটি বিতর্কিত বিষয়ে গোঁড়ামি ছাড়তে হবে। পক্ষান্তরে তামিলদেরও ভারতের মুখাপেক্ষী হওয়া চলবে না। ভারত তাদের রক্ষক নয়। ভারত রামচন্দ্রের মতো লঙ্কায় গিয়ে তাদের সীতার মতো উদ্ধার করতে পারবে না। তাদের উদ্ধার করে রাখবেই বা কোন অযোধ্যায় ?

সিংহলীদের আর কোনো হোমল্যাণ্ড নেই, তারা দেয়ালে পিঠ রেখে লড়বে। ভারত যদি যুদ্ধে নামে বিশ্বের জনমত সিংহলীদের দিকেই যাবে। তামিলরা যদি ভারতের দিকে তাকায় তা হলে বুঝতে হবে তাদের অন্য একটা হোমল্যাণ্ড আছে। তারা নিজেরা সিংহলীদের মতো মরীয়া হয়ে লড়বে না। প্রত্যাশা করবে ভারতীয়রাই তাদের হয়ে লড়বে। দক্ষিণ ভারতের কতক তামিল নেতা স্বাভাবিক কারণেই উত্তেজিত। কিন্তু ভারত দেশটা কেবল তামিলদের নয়, ভারত সরকার কেবলমাত্র তামিল সেণ্টিমেণ্টের দ্বারা চালিত হতে পারেন না। সব দিক বিবেচনা করে কাজ করতে হবে। তা না হলে সিংহলীরা ভারতের চিরশত্রু হবে। শ্রীলঙ্কা আকারে ক্ষুদ্র হলেও তার অবস্থানিক গুরুত্ব অত্যধিক। ইউরোপ থেকে চীন, জাপান, ইণ্ডোনেশিয়া ও অস্ট্রেলিয়াগামী জাহাজ কলম্বো হয়ে যায়। কলম্বো হয়ে ফেরে। নৌঘাঁটি হিসাবে ত্রিঙ্কোমালির গুরুত্ব সমধিক। সে ঘাঁটি যদি বিদেশীদের কবলে পড়ে তা হলে ভারতের নিরাপত্তা বিঘ্নিত। ভারত মহাসাগরে শ্রীলঙ্কা হচ্ছে ভারতের পাহারাদার। কিন্তু ভারত যদি তাকে ঘাঁটায় সে বিদেশীদের ঘাঁটি দেবে।

পরিশেষে একটি কথা বলি। সিংহলই হচ্ছে ভারতীয় বৌদ্ধদের শেষ আশ্রয়। বৌদ্ধধর্ম ভারত থেকে নির্বাসিত হয়ে সেইখানেই আশ্রয় নিয়েছে ও এতকাল বেঁচে আছে। বৌদ্ধধর্মের যেটি আদিরূপ সেই থেরবাদ বা হীনযান শ্রীলঙ্কাতেই বিদ্যমান। অনুরাধপুরের বোধিবৃক্ষ দু'হাজার বছরের পুরনো। অনুরাধা নয়, অনুরাধ। আর কাণ্ডিতে তো বুদ্ধের দন্ত সংরক্ষিত হয়েছে। বুদ্ধ, বুদ্ধদেব নয়। বুদ্ধ সব দেবতার ঊর্ধ্বে। অথচ মানব। সেইখানেই বৌদ্ধধর্মের মহত্ত্ব। আর একটি কথা। সিংহলের বৌদ্ধদের প্রায় সকলেরই একটি বা দুটি করে খ্রীস্টান নাম আছে। কারো কারো পদবীও। ডন স্টীফেন

সেনানায়ক, ডাডলী সেনানায়ক, সার জন কোটেলাওয়ালা, সলোমন ভাণ্ডারনায়ক, জুনিয়াস রিচার্ড জয়বর্ধন এঁরা সবাই বৌদ্ধ। জয়বর্ধন সিংহলীদের মতো লুঙ্গি পরেন। এককালে দারুণ সাহেব ছিলেন। আর ভাণ্ডারনায়ক ছিলেন আগে খ্রীস্টান, পরে বৌদ্ধ হন।

আদিবাসীদের কথা

আদিবাসীরাই এদেশের আদিম অধিবাসী। যখন আর্যভাষীরা এদেশে ছিল না তখন সাঁওতাল, মুণ্ডা, ওরাওঁ প্রভৃতি ট্রাইবগুলি ছিল। এরা যে এতদিন টিকে আছে তার কারণ এরা বাঘ ভালুকের মতো জঙ্গলে বাস করত। বনে বসত করলেও সেখানে ঝুম পদ্ধতিতে চাষ করত। ত্রিপুরার এক টিপুরী কলকাতায় এসেছিলেন শ্রীপান্নালাল দাশগুপ্তের সম্মেলনে। আমাকে বলেন, "আমরা বাঁচব কী করে? ঝুম চাষ বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। জঙ্গল সাফ করে গাছগুলো নদীর জলে ভাসিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। দেশ স্বাধীন হয়ে আমাদের কী লাভ হয়েছে?" একই নালিশ সকলের মুখে। দেশকে শিল্পায়িত করতে গিয়ে বনজঙ্গল ধ্বংস করা হচ্ছে। সেইসঙ্গে আদিবাসীদেরও হাজার হাজার বছরের নিরাপদ আশ্রয়। জলের মাছ ডাঙায় বাঁচে না। তেমনি আদিবাসীরাও চারদিকে গজিয়ে ওঠা শহরে বা শহরতলীতে বাঁচবে না। প্রাণধারণের জন্যে ওদের যা যা দরকার তার ঘাটতি হলে পূরণ করবে কে? কী কী দিয়ে?

আমার তরুণ সাহিত্যিক বন্ধুরা আদিবাসী এলাকায় ঘুরে ঘুরে যা দেখেছেন তা আমাকে শুনিয়েছেন। তাঁদের বিবরণ কোনো বনেদী পত্রিকায় ছাপা হয় না। ছোট ছোট পত্রিকায় মাঝে মাঝে বেরোয়। আমাকে সেরকম কিছু লেখা পড়তে দেওয়া হয়। আদিবাসী হলে আমি নিশ্চয়ই প্রতিবাদ করতুম। আমার লেখনীর মুখে সেটা শোভন হবে না। আমি তো সরেজমিনেও যাইনি। সভ্যতাগর্বিত সরকারী কর্মচারীদের কাছে তারা যে ব্যবহার পায় তা প্রায় হিন্দুসমাজের অন্ত্যজদের মতো। যদিও তারা হিন্দুসমাজভুক্ত নয়। তাদের আলাদা এক ধর্ম আছে। ইংরেজীতে যাকে বলে অ্যানিমিজম। হিন্দু ডাক্তার বা সেবিকা তাদের স্পর্শ করবেন না। তারা এতই অশুচি! শিক্ষকশিক্ষকাদেরও একই মনোভাব। খ্রীস্টান মিশনারীদের সঙ্গে এঁদের কত না তফাৎ!

বনে বাস করলে কেউ বনমানুষ হয় না। তাদের বুনো বলা বা মনে করা অন্যায়। মুনি ঋষিরাও বনে বাস করতেন। কেনই বা আমরা আশা করব যে সকলেই বাঙালী হিন্দু ভদ্রলোক হবে? আর সেটাই কি আদর্শ? কাউকে সভ্য করার মহান ব্রত কেউ আমাদের উপর অর্পণ করেননি। সেবা করতে বা শিক্ষা বিতরণ করতে যাঁদের নিযুক্ত করা হয় তাঁরা প্রত্যেকের সঙ্গে সমান ব্যবহার করবেন। মহাপুরুষেরা একবাক্যে বলে গেছেন, অপরের কাছে যেরূপ ব্যবহার প্রত্যাশা কর অপরের সঙ্গেও সেইরূপ ব্যবহার করবে। এখন এমন হয়েছে যে আদিবাসী ছেলেমেয়েরা তাদের জন্যে প্রতিষ্ঠিত স্কুলে আসতেই চায় না।

হাসপাতালে যারা আসে তারাও অপমান বোধ করে। এখানে শ্রেণীগত শোষণের প্রশ্ন ওঠে না। প্রশ্নটা জাতিগত বা বর্ণগত উচ্চনীচ বৈষম্যের। ওরা যেন আফ্রিকার নেটিভ আর এঁরা যেন আফ্রিকার শ্বেতাঙ্গ।

এর ফলে যদি ঝাড়খণ্ড আন্দোলন দানা বাঁধে তবে সেটা কি বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন? অমন অবস্থায় পড়লে কে না স্বতন্ত্র রাজ্য বা রাষ্ট্র চায়? আদিবাসীদের এলাকায় কাজ করতে যাঁদের পাঠানো হবে তাঁদের কিছুদিন খ্রীস্টীয় মিশনারীদের কাছে শিক্ষানবীশ করে তালিম দিতে হবে। মিশনারীদের বিচ্ছিন্নতাবাদী বলে বিতাড়ন করা অন্যায়। তাঁদের অর্থবল সরকারের চেয়ে বেশী নয়, কিন্তু তাঁদের মমতাবোধ আমাদের শহুরে ভদ্রলোকদের চেয়ে বেশী। ধর্মান্তরিত হবার সঙ্গে সঙ্গেই আদিবাসীদের মর্যাদা বৃদ্ধি হয়।

ঝাড়খণ্ড যারা চায় তারা ভারতীয় ইউনিয়নের অঙ্গরাজ্য হিসাবেই চায়। সুতরাং তাদের বিচ্ছিন্নতাবাদী বলতে পারা যায় না। স্বাধীনতার পরে বিভিন্ন প্রদেশ থেকে তেলুগুভাষী অঞ্চলগুলি নিয়ে অন্ধ্রপ্রদেশ গঠিত হয়েছে। মারাঠী-ভাষী অঞ্চলগুলি নিয়ে মহারাষ্ট্র গঠিত হয়েছে। কন্নড়ভাষী অঞ্চলগুলি নিয়ে কর্ণাটক গঠিত হয়েছে। তখন তো বিচ্ছিন্নতাবাদের অভিযোগ ওঠেনি। সাঁওতাল ও মুণ্ডাভাষী অঞ্চলগুলি নিয়ে ঝাড়খণ্ড গঠন করলে মহাভারত অশুদ্ধ হবে না। এই ধরনের দাবীর পেছনে রয়েছে আইডেনটিটির প্রশ্ন। প্রত্যেকেই চায় নিজস্ব আইডেনটিটি। বাঙালীও কি তা চায় না? নেপালীও কি তা চায় না? তা ছাড়া আছে মাইনরিটির প্রশ্ন। "আমরা সর্বত্র মাইনরিটি হব কেন? কোনো একটি রাজ্যে মেজরিটি হব না কেন?" গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় মাইনরিটি হয়ে গৌরব নেই। সে যেখানে পারে সেখানে মেজরিটি হতে চায়। ঝাড়খণ্ড হলে আদিবাসীরাই হবে সেখানকার মেজরিটি। তাদের কণ্ঠস্বর জোরালো হবে। আর তাদের আইডেনটিটি সুরক্ষিত হবে। তারা বাংলা বা হিন্দী বা ওড়িয়া মেজরিটির চাপে পড়ে বাঙালী বা হিন্দীওয়ালা বা ওড়িয়া বনে যাবে না।

তার পর এটাও অনেকের জানা নেই যে লর্ড কার্জনের বড়লাট হয়ে আসার আগে থেকেই বঙ্গভঙ্গের জন্যে ক্ষেত্র প্রস্তুত করে রাখা হয়েছিল। প্রথম পরিকল্পনা ছিল তখনকার বঙ্গপ্রদেশকে এমনভাবে ভাগ করতে হবে যে একটি ভাগে পড়বে বাংলা ও বিহার, আরেকটি ভাগে পড়বে ওড়িশা ও ছোটনাগপুর। তথা মধ্যপ্রদেশের কতক অংশ। যত দূর জানি নামকরণ হবে ঝাড়খণ্ড। এটি একটি পুরাতন নাম। মোগল আমলের চেয়েও পুরাতন। তাঁর ধ্বংসাবশেষ হচ্ছে ঝাড়গ্রাম। ব্রিটিশ আমলের গোড়ায় সিংহভূম, মানভূম, মল্লভূম, বীরভূম প্রভৃতি নিয়ে জঙ্গলমহল বলে একটি অঞ্চল ছিল। জেলা ভাগ হয় তার অনেক পরে। জেলা জিনিসটাই ইংরেজদের সৃষ্টি। ভাঙতে ভাঙতে গড়তে গড়তে জেলাগুলির চেহারা এখনকার মতো হয়েছে। উদ্দেশ্য প্রশাসনিক সুবিধা।

প্রশাসনিক সুবিধার জন্যেই কার্জনের আগে বঙ্গভঙ্গের পরিকল্পনা তৈরি হয়ে রয়েছিল। কার্জন তার উপর খোদকারি করেন এই বলে যে প্রস্তাবিত প্রদেশ দুটির মাঝখানকার নৈসর্গিক সীমারেখা হবে পদ্মানদী। পদ্মানদীই তো

তৎকালীন বঙ্গপ্রদেশের বুক চিরে তাকে দ্বিখণ্ডিত করেছে। আসামকে জুড়ে দিলেই তো কাজ চুকে যায়। তাঁর যুক্তিটাকে জোরালো করার জন্যে তিনি হিন্দু মুসলমানের ধর্মভেদে মেজরিটি মাইনরিটির দোহাই দেন। মুসলমানরা প্রায় সব ক'টা প্রদেশেই মাইনরিটি হবে কেন? কয়েকটা প্রদেশে তাদের মেজরিটি বানিয়ে দেওয়া হোক। এই কার্জনই উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশকে পাঞ্জাবের থেকে আলাদা করার অজুহাতে পাঞ্জাব ভঙ্গ করেন। তাঁর হাতে মুসলিমপ্রধান প্রদেশের সংখ্যা দাঁড়ায় তিন। পাঞ্জাব. উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, পূর্ববঙ্গ ও আসাম। হিন্দুপ্রধান প্রদেশের সংখ্যা পাঁচ। বেঙ্গল, বম্বে, মাদ্রাজ, যুক্তপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ। পরবর্তীকালে বঙ্গভঙ্গ এক অর্থে রদ করা হয়, আরেক অর্থে বহাল করা হয়। পূর্ববঙ্গ পশ্চিমবঙ্গ মিলে যায়, কিন্তু বিহার ওড়িশা বেরিয়ে যায়। আসাম আবার পৃথক হয়। কিন্তু সুরমা উপত্যকা তার সামিল হয়। বঙ্গপ্রদেশ হয় মুসলিমপ্রধান। ভারতের রাজধানী সরে যায় দিল্লীতে।

এইসব রদবদলের ফলে ঝাড়খণ্ডের নাম চাপা পড়ে যায়। নইলে ঝাড়খণ্ড প্রদেশ কার্জনী আমলেই ভূমিষ্ঠ হতো। ভূমিপুত্রদের স্বার্থে নয়। প্রশাসনিক স্বার্থে। একজন ছোটলাটের পক্ষে সেকালের বিহার, ওড়িশা সমেত বঙ্গপ্রদেশের মতো বৃহদায়তন ভূখণ্ড শাসন করা অতি দুরূহ ছিল। আবার সেই প্রশ্ন ঘুরে ফিরে এসেছে।

মাউন্টব্যাটেন

আমার নিয়তি আমাকে নিয়ে যায় অতিথিরূপে তেরো বছর আগে সিমলার সামার হিলে অবস্থিত সেই ঐতিহাসিক প্রাসাদটিতে যার নাম ছিল ভাইসরিগাল লজ, পরে হয়েছে রাষ্ট্রপতিনিবাস। সেখানে স্থাপন করা হয়েছে ইণ্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অভ্ অ্যাডভান্সড স্টাডিজ। দেশের জ্ঞানবিজ্ঞানের সাধকদের মহাতীর্থ।

এই অপ্রত্যাশিত সুযোগ আমাকে দেখতে দেয় সেই ঐতিহাসিক মহল যেখানে ১৯৪৭ সালের ১১ই মে তারিখে মাউন্টব্যাটেন, নেহরু ও ভি. পি. মেনন মিলে ক্ষমতার হস্তান্তরঘটিত পরিকল্পনাকে চূড়ান্ত রূপ দেন। বাকী থাকে প্রধান মন্ত্রী অ্যাটলীর অনুমোদন। তাব জন্যে ছুটে যেতে হয় মাউন্টব্যাটেনকে লণ্ডনে আকাশপথে। তার আগেই অ্যাটলী অন্য একখানি খসড়া মন্জুর করে রেখেছিলেন। তাই নতুন খসড়া দেখে চমকে ওঠেন। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে নতুনটিকেই গ্রহণ করেন।

কাজেই সিমলার ভাইসরিগাল লজে ১১ই মে তারিখে যে দৃশ্য অভিনীত হয় সেই দৃশ্যই ভারতের ভাগ্য নির্ধারণ করে। মাউন্টব্যাটেনকে তাঁর সহকর্মীরা পরামর্শ দিয়েছিলেন আগের খসড়াটি কাউকে না দেখাতে। তিনি তাঁদের পরামর্শ লঙ্ঘন করে নেহরুকে দেখান। দেখাতেই জবাহরলাল বলেন, "এ ভাবে ক্ষমতার হস্তান্তর চলবে না। এর ফলে ভারত হয়ে উঠবে বলকান।"

এটা কারো মাথায় আসেনি যে বাংলাদেশের হিন্দু মুসলমান নেতারা যদি একমত হয়ে বাংলাদেশকে অবিভক্ত রাখতে চান ও অবিভক্ত বাংলাদেশ যদি ভারত তথা পাকিস্তানের থেকে বিচ্ছিন্ন একটি স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র হতে চায় তা হলে তার দেখাদেখি অন্যান্য প্রদেশও তেমনি স্বাধীন ও সার্বভৌম হতে চাইবে আর হায়দরাবাদ প্রমুখ দেশীয় রাজ্যগুলিও তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করবে। গান্ধী, শরৎচন্দ্র বসু ও সুহরাবর্দী যা চেয়েছিলেন তা অবিভক্ত ও স্বতন্ত্র বাংলাদেশ। বাংলার লাটেরও সেই সুপারিশ। মাউণ্টব্যাটেনের ইউরোপীয় সহকর্মীরা সেই মর্মে খসড়া তৈরি করেছিলেন। মাউণ্টব্যাটেন তাতে রাজী হয়েছিলেন। সেইভাবে মূল মাউণ্টব্যাটেন পরিকল্পনা সংশোধিত হয়েছিল। কিন্তু কংগ্রেস বা লীগ নেতাদের না জানিয়ে ও তাঁদের সম্মতি না নিয়ে। মাউণ্টব্যাটেন যদি নেহরুকে সিমলায় আমন্ত্রণ না করতেন ও অ্যাটলীর কাছে পেশ করা খসড়াটি না দেখাতেন তা হলে পরে হৈ চৈ বেধে যেত। নেতারা বেঁকে বসতেন এই বলে যে ভারতের বলকানীকরণ তাঁরা মেনে নেবেন না।

হিন্দু মুসলমান একমত হলে বাংলাদেশ অবিভক্ত থাকত ও সেই অবস্থায় স্বাধীন হতো, এ রকম একটা বিকল্প যোগ করা নিশ্চয়ই অন্যায় নয়। দু'পক্ষেই সেদিন যেমন জঙ্গী মনোভাব, তাঁরা যে একমত হতেন এটা অবাস্তব আশাবাদ। তবু কে জানে! লীগের মতিগতি বদলে যেতেও পারত। বাংলাদেশ অবিভক্ত থাকলে আসাম কোণঠাসা হতো। সে ভারতীয় ইউনিয়নে যোগ দিতে চাইলেও চলাচলের পথ পেত না। আকাশপথে বহিঃশত্রুর হাত থেকে আসাম রক্ষা করতে পারা যেত না। বাংলাদেশের মতো আসামও কংগ্রেসের হাতছাড়া হতো। লীগের কবলে পড়ত। লীগ তাতে খুশি হতে পারে, কংগ্রেস খুশি হতো না। তবে বাস্তববাদীরা এটাও জানতেন যে সুহরাবর্দীর হাতে ক্ষমতা আসা মানে তাঁদের হাতে ক্ষমতা আসা নয়। সুহরাবর্দীকে তাঁরা লীগ দখল করতে দিতেন না। তাই কংগ্রেসের মতো মুসলিম লীগও অবিভক্ত স্বাধীন বাংলাদেশের সম্ভাবনা অঙ্কুরেই বিনাশ করে।

এত কথা বলার কারণ এই যে ভারত ভাগের জন্যে মাউণ্টব্যাটেন দায়ী হলেও বাংলা ভাগের জন্যে তাঁকে দায়ী করা উচিত নয়। গান্ধীজীকেও না। হিন্দু মুসলমান একমত হলে বাংলাদেশ অবিভক্ত থাকতে পারত। তা দেখে পাঞ্জাবও অবিভক্ত থাকতে পারত। তা দেখে ভারতও অবিভক্ত থাকতে পারত। অপর পক্ষে বাংলাদেশ স্বাধীন রাষ্ট্র হলে তার অনুসরণে হায়দরাবাদ, কাশ্মীর প্রভৃতি বহু স্বাধীন রাষ্ট্রের আবির্ভাব ঘটত। তার ফলে ভারতের চেহারাটা হতো বলকান দেশগুলির মতো। কেন্দ্রীয় সরকার বলতে যেটা অবশিষ্ট থাকত সেটাকে তো ইংরেজরা প্যারামাউণ্ট পাওয়ার বলে স্বীকৃতি দিত না। প্যারামাউণ্ট পাওয়ার হওয়া নিয়ে লড়াই বেধে যেত।

যতরকম অশুভ সম্ভাবনা ছিল সব ক'টার হিসাব নিলে আমরা মাউণ্টব্যাটেনকে দোষ দিতে পারিনে। ভারত ভাগও তাঁর আইডিয়া নয়। ওটা জিন্নার আইডিয়া। পরে জবাহরলাল ও বল্লভভাইয়েরও আইডিয়া। তাঁরা চেয়েছিলেন

কংগ্রেস শাসিত ভারত। যেসব অঞ্চল কংগ্রেস শাসন মেনে নিত না, বিদ্রোহ করত, সেসব অঞ্চলকে তাঁরা বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতে দিতেন। বিচ্ছিন্ন হয়ে ওরা লীগ শাসনাধীন ও পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হতো। পশ্চিমবঙ্গ ও পূর্ব পাঞ্জাব ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন হতে রাজী হতো না। তাদের পার্টিশন ছিল একান্ত আবশ্যক। সেটার জন্যে মাউণ্টব্যাটেনের মধ্যস্থতার প্রয়োজন ছিল। লীগকে তিনি রাজী করান উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ তথা সীলেট দিয়ে। এর জন্যে রেফারেণ্ডাম অনুষ্ঠিত হয়। কংগ্রেস রাজী। মাউণ্টব্যাটেনে তাঁর মধ্যস্থতার মাশুল হিসাবে আদায় করে নিয়েছিলেন ডোমিনিয়ন স্ট্যাটাসে রাজীনামা। লীগ গোড়া থেকেই রাজী ছিল। কিন্তু কংগ্রেসের বামপন্থীরা ছিল নারাজ। সিমলাতেই মাউণ্ট-ব্যাটেন নেহরুর কাছ থেকে আশ্বাস পান যে কংগ্রেস ডোমিনিয়ন স্ট্যাটাসে রাজী হবে। এই আশ্বাসটা বল্লভভাইয়ের কাছে পেয়েছিলেন ভি. পি. মেনন। কিন্তু আরেক মেনন ছিলেন এর বিপক্ষে। তিনি কৃষ্ণ মেনন। তিনিও তখন সিমলায়। নেহরু রাজী দেখে তিনিও রাজী। এদের লাভ হলো অবিলম্বে ক্ষমতার হস্তান্তর। মাউণ্টব্যাটেন যেন ঘোড়ায় চড়ে এসেছিলেন। তিনি তাড়াতাড়ি ক্ষমতা হস্তান্তর করে সৈন্যসামন্ত নিয়ে ভারত থেকে অপসরণ করতে সকলের চেয়ে অধীর। ওদিকে নেহরুও কম অধীর নন। বল্লভভাইও চান ত্বরান্বিত হস্তান্তর। শাসনকার্য দিনকের দিন দুরূহ হয়ে উঠেছিল। বেশী দেরি করলে পরিস্থিতি আয়ত্তের বাইরে চলে যেত। ইংরেজ রাজকর্মচারীদেরও সেই মত।

ক্ষমতা হস্তান্তরের পর মাউণ্টব্যাটেন ব্রিটিশ নেভীতে ফিরে যেতে চান। কিন্তু কংগ্রেস নেতারা তাঁকে যেতে দেন না। তাঁর বিশ্বাস ছিল লীগ নেতারাও তাঁকে পাকিস্তানের গভর্নর জেনারল করবেন। কিন্তু বাদ সাধলেন জিন্না। দুই ডোমিনিয়নের একই গভর্নর জেনারল হলে দাঙ্গাহাঙ্গামা একেবারে বন্ধ না হলেও আয়ত্তাধীন হতো। তা না হয়ে যা হলো তার দরুন মাউণ্টব্যাটেনের নাম খারাপ হয়ে গেল তাঁর নিজের দিশে। আর কাশ্মীরের মহারাজাকে তিনি কিছুতেই বোঝাতে পারলেন না যে কাশ্মীরকে একটা না একটা ডোমিনিয়নে যোগ দিতে হবে। তৃতীয় এক ডোমিনিয়ন সম্ভব নয়। তেমনি অবুঝ হায়দরাবাদের নিজামও। অন্যান্য রাজা মহারাজারা তাঁর কথা শোনেন। তাই দেশীয় রাজ্য-গুলি সহজেই ভারতভুক্ত বা পাকিস্তানভুক্ত হয়। মাউণ্টব্যাটেন ভারতকে কাশ্মীরে সৈন্য পাঠাতে দেন, কিন্তু জিন্না যখন সেখানে সৈন্য পাঠাতে উদ্যত হন তখন অকিনলেক বাধা দেন। ফলে পাকিস্তান বিষম অসন্তুষ্ট হয়। এই সংকটজনক পরিস্থিতিতে বিবাদটা ইউনাইটেড নেশনসে না পাঠালে আন্তর্জাতিক যুদ্ধ বেধে যেত। তেমন পরামর্শ দিয়ে মাউণ্টব্যাটেন ভুল করেননি। সে পরামর্শ গ্রহণ করে ভারত সরকারও ভুল করেননি। কাশ্মীর সমস্যার একতরফা সমাধান সামরিক উপায়ে সম্ভব ছিল না। কংগ্রেস নেতারা সেটা বুঝতেন। তাই গোটা কাশ্মীর জয় করতে চাননি। ক্ষমতা হস্তান্তরের পর গভর্নর জেনারলের শাসন-ক্ষমতা ছিল না। মাউণ্টব্যাটেন সিদ্ধান্ত নেবার মালিক ছিলেন না। যার ক্ষমতা

নেই তার দায়িত্বও নেই। তাঁকে দায়ী করা অনুচিত। অথচ কাশ্মীরের জন্যে তাঁকে দায়ী করা হয়। সেটা ঠিক নয়।

হায়দরাবাদের পুলিশ অ্যাকশনের পূর্বেই তিনি পদত্যাগ করে দেশে ফিরে যান। আমার মনে হয় না যে তিনি সেটা সমর্থন করতেন। তিনি আপ্রাণ চেষ্টা করেছিলেন নিজামের সঙ্গে একটা সম্মানজনক মিটমাট করতে, কিন্তু যাতে নিজামের সম্মান তাতে ভারত সরকারের অসম্মান ও যাতে ভারত সরকারের সম্মান তাতে নিজামের অসম্মান। নিজামের বিশ্বাস তিনি সাধারণ রাজা মহারাজা নন, তিনি স্বাধীন নৃপতি, যেমনটি ছিলেন অষ্টাদশ শতাব্দীতে।

পার্টিশনের জন্যে মাউণ্টব্যাটেনকে দোষ দেওয়া অন্যায়। মুসলিম সেপারেটিজম তাঁর সৃষ্টি নয়। সেটা মুসলিম লীগের সৃষ্টি। মুসলিম লীগের পূর্বেও তার সৃষ্টিলক্ষণ দেখা যাচ্ছিল সার সৈয়দ আহমদ খানের কংগ্রেস-বিরোধী কার্যকলাপে। ব্রিটিশ রাজের উত্তরাধিকারী হবে কংগ্রেস রাজ, তার মানে হিন্দু রাজ, এই সম্ভাবনা তাঁকে সনাতন ব্রিটিশ রাজত্বের পক্ষপাতী করেছিল। কিন্তু ব্রিটিশ রাজত্ব যদি সনাতন না হয় তা হলে হিন্দু রাজত্বকে ঠেকানো যাবে কী দিয়ে? এর উত্তর, মুসলিম রাজত্ব দিয়ে। সেকথা বললে আবার সিপাহী বিদ্রোহের পুনরাবৃত্তির মতো শোনাবে। দিল্লীর সিংহাসন ছাড়া মুসলিম রাজত্ব কল্পনা করা যেত না। পাকিস্তানের আইডিয়াটা কারো মাথায় আসেনি। না মুসলমান, না ইংরেজ। এর জনক চৌধুরী রহমৎ আলী নামে এক ছাত্র। কবিবর ইকবাল এটা তাঁর কাছে পান। পরে জিন্না সাহেব এটাকে আপনার করে নেন। কিন্তু ১৯৪৬ সালেও তাঁর বিশ্বাস ছিল যে কংগ্রেসের সঙ্গে অখণ্ড ভারতের ভিত্তিতে একটা মিটমাট সম্ভবপর। কংগ্রেস কিছুতেই মওলানা আবুল কালাম আজাদ, খান্ আবদুল গফ্ফার খান প্রভৃতি জাতীয়তাবাদী মুসলমানদের ত্যাগ করে মুসলিম লীগের সঙ্গে মিটমাট করবে না, এটা হৃদয়ঙ্গম করে তিনি যৌথ রাজত্বের তথা দিল্লীর সিংহাসনের মায়া কাটান।

মাউণ্টব্যাটেনকে আমরা মনে রাখব পার্টিশনের বিধাতা রূপে নয়, কংগ্রেস-ব্রিটিশ মিটমাটের তথা লীগ-ব্রিটিশ মিটমাটের মধ্যমণি রূপে। যেটা তাঁর সাধ্যের বাইরে ছিল সেটা কংগ্রেস-লীগ মিটমাট। সেক্ষেত্রে ওয়েভেলও ব্যর্থ, মাউণ্টব্যাটেনও ব্যর্থ। এঁরা যে চেষ্টা করেননি তা নয়। সে চেষ্টা আন্তরিক ছিল।

মাউণ্টব্যাটেনের মহাপ্রয়াণ মহাত্মা গান্ধীর মহাপ্রয়াণের সঙ্গেই তুলনীয়। আততায়ীর অস্ত্রেই তাঁদের উভয়ের নিধন। এ দুটি যেন নিয়তির নির্দিষ্ট প্রতীকী ঘটনা। একজন ভারতের ও অপরজন ব্রিটেনের শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি। আমি শোকাকুল।

প্রবাসে বিপ্লবী জীবন

(চিন্মোহন সেহানবীশকে)

যেদিন আপনি আপনার লেখা "রুশ বিপ্লব ও প্রবাসী ভারতীর বিপ্লবী" আমার হাতে দেন সেইদিনই বাড়ী ফিরে আমি তার বেশ খানিকটে পড়ে ফেলি রাত জেগে। কোথায় লাগে তার কাছে উপন্যাস! আফসোস এই যে আমি নিজে এ বিষয়ে উপন্যাস রচনার যোগ্য পাত্র নই। অন্য কেউ যে লিখবেন তার সম্ভাবনা দেখছিনে। আপনার বইখানি উপন্যাসের সাধ মেটাবে। তার মানে এ নয় যে আপনি যা লিখেছেন তা ফ্যাকট নয়, ফিকশন। আমার বক্তব্য এই যে আপনার গ্রন্থ অবলম্বন করে একখানি বৃহৎ উপন্যাস রচনা করা যায়। উপন্যাসের ঘটনাস্থল ইংলণ্ড, ফ্রান্স, জার্মানী, সুইডেন, রাশিয়া, আমেরিকা, জাপান, ইণ্ডোনেশিয়া।

বিষয়টিকে দুই ভাগে বিভক্ত করা যায়। প্রথম ভাগ, রুশ বিপ্লবের পূর্বে। দ্বিতীয় ভাগ, রুশবিপ্লবের পরে। বিভাজন রেখা ১৯১৭ সাল। বিপ্লবপূর্বের বিপ্লবী যাঁরা তাঁরা জাতীয়তাবাদী রাষ্ট্রবিপ্লবী। দেশের স্বাধীনতাই তাঁদের অভিষ্ট। সেখানেই তাঁরা থামতেন। স্বাধীন দেশ কমিউনিস্ট হবে না সোশিয়ালিস্ট হবে না বুর্জোয়া ফিউডাল ক্যাপিটালিস্ট হবে সেটা পরবর্তী যুগের ভাবনা। আগে থেকে ভাবতে গেলে নিজেদের মধ্যে ঝগড়া বেধে যায়। কাজ এগোয় না। রুশ বিপ্লবোত্তর বিপ্লবী যাঁরা তাঁরা শুধুমাত্র রাষ্ট্রবিপ্লবেই ক্ষান্ত হবেন না, তাঁরা ঘটাবেন সমাজবিপ্লব। তাঁদের অভিষ্ট স্বদেশী বিদেশী সর্বপ্রকার শোষণহীন সমাজ। নতুন সোশিয়াল অর্ডার। মার্কস যার তত্ত্ব নির্ণয় করে গেছেন। লেনিন যাকে রূপায়িত করছেন।

জাতীয়তাবাদী বিপ্লবীদের অনেকেই রুশবিপ্লবের পরে সমাজবিপ্লবী হন। রাশিয়ায় যান। কেউ কেউ সেদেশে থেকে যান। পরে স্টালিনের সন্দেহের শিকার হন। সন্দেহের মূল কারণ তাঁরা কাইজারশাসিত জার্মানীর সঙ্গে ভারতের স্বাধীনতার জন্যে হাত মিলিয়েছিলেন। সেই যে 'অরিজিনাল সিন' সে কি কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দিলেই ধুয়ে মুছে যায়? ভারতের স্বাধীনতার জন্যে হিটলারশাসিত জার্মানীর সঙ্গে হাত মেলানো কি একেবারেই অসম্ভব? না, তাঁদের বিশ্বাস করা যায় না। অতএব কোতল। বুদ্ধিমান মানবেন্দ্রনাথ অনাগতবিধাতার মতো আগেই স্টালিনের জাল থেকে বেরিয়ে এসেছিলেন। দেশে ফিরে জেলে যেতে হলো। কিন্তু প্রাণে বাঁচলেন ও রায়পন্থী মতবাদের প্রবক্তা হলেন।

তবে রুশবিপ্লবকে মনেপ্রাণে গ্রহণ করতে পারেননি এমন বিপ্লবীও ছিলেন। তাঁরা রাশিয়ায় গেলেন না। ভারতেও ফিরলেন না। প্রবাসেই জীবনপাত করলেন। যেমন শ্যামজী কৃষ্ণবর্মা ও লালা হরদয়াল। শ্যামাজী নয়, শ্যামজী। রামকৃষ্ণকে কি কেউ রামাকৃষ্ণ বলে? মাদাম কামা দেশে ফিরলেন বটে, কিন্তু হাসপাতালে রোগে ভুগে প্রাণ দিতে। হরদয়ালের নাম এনসাইক্লোপীডিয়া

ব্রিটানিকায় উঠেছে। জার্মানীতে বাস করে তাঁর মোহভঙ্গ হয়েছিল, তুলনায় ইংরেজরা বহুগুণে শ্রেয়, এই সিদ্ধান্তের পর লণ্ডনে গিয়ে তিনি গবেষণায় নিযুক্ত হন। বক্তৃতা দিতে গিয়ে আমেরিকায় মারা যান। তারকনাথ দাস তো কালক্রমে মার্কিনভক্ত বনে গেলেন। স্বাধীনতার পরে তিনি ভারত ভ্রমণে আসেন। শান্তিনিকেতনে রথীবাবু একটি ডিনার দেন। আমাকে ও আমার স্ত্রীকেও ডাকেন। তাঁর সঙ্গে তর্ক বেধে যায় আমার স্ত্রীর। ভারতের রুশঘেঁষা নীতি তিনি সহ্য করতে পারেন না। ভারতও না শেষে লাল হয়ে যায়!

আপনার বইখানি আমার হাতে আসার পরে একদিন নজরে পড়ে 'অমৃত-বাজার পত্রিকা'র শতবর্ষপূর্বের পৃষ্ঠায় ১৮৭৯ সালের ২৯শে মে তারিখে অক্সফোর্ড থেকে লেখা লন্ডনের 'অ্যাথিনীয়াম' পত্রিকায় প্রকাশিত ডক্টর মনিয়ার উইলিয়ামসের পত্র।

"It may interest the readers of the Athenaeum to learn that a young Indian Pundit, named Syamaji Krishnavarma, who, considering his age (scarcely twenty-three) is remarkably well-versed in grammatical and Vedic literature, has recently arrived in this country, and has just been admitted a member of this University. He is the first real Indian Pundit who has ever visited England. We have had others here who have borne the name, but no real Sanskrit scholar has ever before had the courage to break the rules of caste, give offence to his own family, incur the odium and contempt of the whole fraternity of his brother Pundits and expose himself to the certainty of excommunication on his return to India."

এর পরে এক অচেনা ভদ্রলোক একদিন আমার সঙ্গে আলাপ করতে করতে পুরাতন প্রসঙ্গ তোলেন ও আমার আগ্রহ দেখে আমাকে খানতিনেক বই পড়তে দিয়ে যান। তার একখানা হলো জেমস ক্যাম্পবেল কার প্রণীত "পলিটিকাল ট্রাবল ইন ইণ্ডিয়া ১৯০৭—১৯১৭।" এতে অন্যান্য বিপ্লবীদের সঙ্গে শ্যামজী কৃষ্ণবর্মার কথাও আছে। তার থেকে কয়েকটি অজানা তথ্য তুলে দিচ্ছি।

"He graduated from Balliol College in 1882 and was called to the Bar in 1884. Returning to India he held high posts in one or two Native States, but was dismissed from Junagadh in September, 1895, and after this failed in his intrigues to obtain re-employment in Udaipur, where he had been a member of the State Council from 1893 to January, 1895. Colonel Curzon-Wyllie was appointed Resident of Udaipur in March, 1884, and was instrumental in turning Krishnavarma out of the State at the beginning of 1895, and successfully opposed his return to State

service in September of the same year. Krishnavarma, however, obtained employment in the private service of the Maharana, and when Lord Elgin visited Udaipur in November, 1896, Colonel Curzon-Wyllie refused to allow him to be presented at the Viceregal Durbar. Next year Krishnavarma left India and returned to London. (*Political Trouble in India* : *1907-1917*) by James Campbell Ker, page 155. Published by EDITIONS INDIAN, CALCUTTA, 1973).''

উপরের উদ্ধৃতি থেকে অনুমান করা শক্ত নয় যে কার্জন-উইলিই কৃষ্ণবর্মাকে দেশছাড়া করেন। বিলেতে বোধ হয় তিনি ন্যায়বিচার আশা করেছিলেন। পাননি। আইনসম্মত ভাবে ইণ্ডিয়ান হোমরুল সোসাইটি স্থাপন করেন। বিপ্লবী তিনি একদিনে হননি, ক্রমে ক্রমে হন। কার্জন-উইলির হত্যার বছর দুই পূর্বেই তিনি লণ্ডন ত্যাগ করে প্যারিসকেই করেছিলেন তাঁর কর্মক্ষেত্র। উক্ত ঘটনার সঙ্গে তাঁর সংস্রব ছিল না। তবু তিনি 'টাইমস' পত্রিকায় চিঠি লিখে জানান,

"I frankly admit I approve of the deed and regard its author as a martyr in the cause of Indian independence."

তখনকার দিনে অর্থাৎ ১৯০৯ সালে 'ইণ্ডিয়ান ইণ্ডিপেণ্ডেন্স" কথাটা উচ্চারণ করার সাহস আর কারো ছিল কি? তাও খাস লণ্ডনের 'টাইমস' পত্রিকায়? তবু এর থেকে প্রমাণিত হয় না যে তিনি ছিলেন ওই হত্যাকাণ্ডের পেছনে। ক্যাম্পবেল কার লিখেছেন,

"Though it was never proved in court, the whole circumstances leave little doubt that the murder of an Euglishman was planned by Savarkar in revenge for the sentence passed on his brother, and that the particular vtctim was chosen to satisfy the private grudge of Krishnavarma."(*Ibid* page 165)

সম্ভবত এই কারণে কৃষ্ণবর্মাকে ব্রিটিশ সরকার আর ভারতে ফিরতে দেননি, যদিও তিনি জীবিত ছিলেন ১৯৩০ সাল অবধি রাজনীতি থেকে অনেক দূরে জেনেভায়। অনুমতি পেলে তিনি স্বদেশে ফিরে আসতেন ও স্বদেশের মাটিতেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করতেন। তবে তিনি অনুমতি চেয়েছিলেন কি না বলা যায় না। বোধহয় চাননি। গর্কি তাঁকে ১৯১২ সালে যে চিঠি লেখেন তাতে তাঁকে বলা হয়েছে ভারতের মাৎসিনি। মাৎসিনির মতো তিনিও ছিলেন জাতীয়তাবাদী বিপ্লবী।

জাতীয়তাবাদী বিপ্লবী ভারতীয়দের মক্ষিরাণী ছিলেন মাদাম কামা। প্যারিসে অবস্থানকালেই তিনি ফরাসী সোশিয়ালিস্ট পার্টিতে যোগ দেন। তাঁর মতবাদ দাঁড়ায় অন্যান্য সদস্যদের মতো সোশিয়ালিস্ট। রুশ বিপ্লবের পরে ঐ পার্টির অধিকাংশ সদস্য কমিউনিস্ট হয়ে যান। সংখ্যালঘু অংশ বেরিয়ে গিয়ে সোশিয়ালিস্ট পার্টি গড়েন! প্রশ্ন হলো, মাদাম কামা কি অধিকাংশের মতো

কমিউনিস্ট হলেন না সংখ্যালঘুদের মতো সোশিয়ালিস্ট রয়ে গেলেন? এ প্রশ্নের উত্তর আপনি দিতে পারেননি। আপনিও জিজ্ঞাসু। তবে আপনার অনুমান তিনি কমিউনিস্ট হয়েছিলেন। রুশবিপ্লবের প্রতি সহানুভূতি থাকা এক জিনিস, কিন্তু তেমনি একটি বিপ্লবের জন্যে কাজ করা আরেক জিনিস। যুদ্ধকালে তাঁকে ও রানাকে দক্ষিণ প্রান্তে অন্তরীণ করা হয়েছিল, এর থেকে প্রমাণিত হয় না যে সেটা রুশবিপ্লবের পূর্বে কমিউনিস্ট অর্থে বৈপ্লবিক কার্য-কলাপের জন্যে। সেটা ন্যাশনালিস্ট অর্থে বৈপ্লবিক কর্মকাণ্ডের জন্যেই হওয়া সম্ভবপর। অন্তরীণ তো অ্যানি বেসাণ্টকেও করা হয়েছিল। যুদ্ধকালে হোম-রুল চেয়েছিলেন এই তাঁর অপরাধ। যুদ্ধের পরে মাদাম কামার জীবন রহস্যাবৃত। যেটুকু জানা যায় তার থেকে এই সিদ্ধান্তেই আসা যায় যে তিনি রুশ-বিপ্লবের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন হলেও তাঁর স্বদেশের বা বিদেশের কমিউনিস্টদের সঙ্গে সক্রিয়ভাবে জড়িয়ে পড়েননি। একান্ত নির্জনেই বাস করতেন। স্বাস্থ্যও ভেঙে পড়েছিল। ভারতের স্বাধীনতাই ছিল তাঁর স্বপ্ন। তার অতিরিক্ত একটা স্বপ্ন একই জীবনে থাকলেও থাকতে পারে, কিন্তু দল নেই, বল নেই, ঢাল নেই, তলোয়ার নেই, একটা পত্রিকা পর্যন্ত নেই, এমন অবস্থায় মার্কসবাদী বিপ্লবী হওয়া বিশ্বাসযোগ্য কি? মাদাম কামা সম্বন্ধে আরো গবেষণা চাই। তিনিই ভারতের বাইরে একমাত্র ভারতীয় বিপ্লবী নায়িকা। কমিউনিস্ট হওয়া না হওয়া অবান্তর।

প্যারিস থেকে কৃষ্ণবর্মা চলে যান জেনেভায়, বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বার্লিনে। প্যারিসের গুরুত্ব থাকে না। আরো আগে লণ্ডনেরও গুরুত্ব হ্রাস পেয়েছিল। জেনেভা নয়, বার্লিনই হয়ে ওঠে বিপ্লবীদের কেন্দ্র। ব্রিটেনের প্রধান শত্রু জার্মানী। অতএব ভারতীয় বিপ্লবীদের প্রধান সহায় কিনা জার্মানীর যুদ্ধবাজ সাম্রাজ্যবাদী শাসকশ্রেণী। থীসিসটাই ভুল। যুদ্ধে যদি জার্মানরা জয়ী হতো ভারতের স্বাধীনতা এক কদমও এগোত না। সেই চোরা-গলি থেকে বেরোবার একমাত্র পথ ছিল বার্লিন থেকে মস্কোর দিকে। তাও যুদ্ধবাজ সাম্রাজ্যবাদী জার থাকতে নয়। তাঁর পতনের পর যে পটপরিবর্তন ঘটে সেটাই ছিল ভারতীয় বিপ্লবীদের শেষ আশাভরসা। কিন্তু জাতীয়তাবাদী বিপ্লবীদের মধ্যে ক'জনই বা রাতারাতি রং পরিবর্তন করে লাল হয়েছিলেন? যাঁরা হয়েছিলেন ও যাঁরা হননি তাঁরা কে কোন্ উদ্দেশ্যে সোভিয়েট অস্ত্রশস্ত্র চান? ভারতীয় জাতীয়তাবাদীরা তো নিজেরাই বুর্জোয়া, ব্রিটিশ রাজত্বের পরে তাঁদের রাজত্ব কি প্রোলিটারিয়ান ডিকটেটরশিপ হতো? যাঁরা কমিউনিস্ট মতবাদে রাতারাতি দীক্ষিত তাঁদের পক্ষেও সোভিয়েট সহায়তায় শ্রমিক কৃষকরাজ প্রতিষ্ঠা করা সম্ভবপর নয়। ট্রটস্কির মতো যাঁরা বিশ্বব্যাপী বিপ্লবে বিশ্বাস করতেন তারা হয়তো এঁদের আমল দিতেন। কিন্তু স্টালিনের মতো যাঁরা রুশ-দেশের বিপ্লবী শক্তিকে সর্বাগ্রে নিজের ঘরে সংহত ও অপরাজেয় করতে চান তাঁরা তাকে অসময়ে বাইরে ছড়িয়ে দেবার বিরোধী। স্টালিন যখন একনায়ক হয়ে বসেন, ভারতীয় জাতীয়তাবাদী বিপ্লবীদের তো কথাই নেই, কমিউনিস্ট

বিপ্লবীদেরও অস্ত্রশস্ত্র লাভের শেষ আশাভরসা শিকেয় তোলা থাকে। যদি কোনো দিন পাশ্চাত্ত্য ক্যাপিটালিস্টদের সঙ্গে রুশ-কমিউনিস্টদের যুদ্ধ বাধে তবে সেই-দিন রুশ অস্ত্রশস্ত্র ভারতের কমিউনিস্ট বিপ্লবীদের ভাগ্যে শিকে থেকে নামবে।

যুদ্ধ একদিন বাধল ঠিকই। কিন্তু সে যুদ্ধে সোভিয়েট ইউনিয়নের মিত্র ধনতন্ত্রী ব্রিটেন, ফ্রান্স, আমেরিকা। দুনিয়ার সব কমিউনিস্ট তখন সর্বাগ্রে চায় ফাসিস্টদের পতন। ভারতের স্বাধীনতা তখন বহু দূরের প্রশ্ন। সমাজ-বিপ্লব তো ভাবনাচিন্তার বাইরে। মস্কো তখন আর ভারতীয় বিপ্লবীদের ব্রিটেনের বিরুদ্ধে বিপ্লবের তোড়জোড় করার কেন্দ্র নয়। তেমন কিছু করতে গেলে ব্রিটিশ ইনটেলিজেন্সই তাঁদের সোভিয়েট ইনটেলিজেন্সের হাতে ধরিয়ে দেবে। তখন এ জীবনে আর তাঁদের দেখা পাওয়া যাবে না। হয় তাঁদের হাত পা বাঁধা। নয় তাঁদের জান খতম।

না জাতীয়তাবাদী বিপ্লবী, না সমাজতন্ত্রবাদী বিপ্লবী কেউ অস্ত্রশস্ত্র আহরণ করে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের সম্মুখ সমরে বা গেরিলা যুদ্ধে পরাস্ত করতে পারেননি। এর জন্যে তাঁদের খাটো করা যায় না। লেনিন প্রভৃতির সুবিধা ছিল এই যে রাশিয়া থেকে সুইটজারল্যাণ্ড বা ফ্রান্স তেমন কিছু দূরে নয়, ভারত থেকে যেমন। তাই রাশিয়ার জনগণের নাড়ীর সঙ্গে তাঁদের যোগ ছিল। সর্বদাই রাশিয়া থেকে লোকজন গিয়ে তাঁদের সঙ্গে শলা পরামর্শ করতেন। ভারত থেকে প্যারিস, বার্লিন, মস্কোর দূরত্ব বহুগুণ বেশী। প্রবাসী বিপ্লবীরা দেশের জনগণের থেকে বিচ্ছিন্ন। জনগণও তাঁদের থেকে।

আপনার এই গ্রন্থ একটি অপূর্ব চিত্রশালা। বিপ্লবীদের প্রতিকৃতি যেমন মূল্যবান তেমনি তাঁদের চরিত্রচিত্রণ। এইসব মানুষ ভুলই করুন আর ঠিকই করুন এঁরা ঘর ছেড়ে, দেশ ছেড়ে, মা বাপ ছেড়ে, স্ত্রী পুত্র ছেড়ে আত্মীয়স্বজন ছেড়ে সাগর পাড়ি দিয়েছেন, গিরিসঙ্কট পার হয়েছেন, শীতে কেঁপেছেন, ক্ষুধায় ভুগেছেন। নিশ্চিত আয় কারো ছিল না। নিরাপদ জীবিকাও না। নারীর প্রেম কারো কারো ভাগ্যে জুটেছিল, নইলে বিদেশপ্রবাস দুঃসহ হতো। যাঁরা ফিরে আসতে পারলেন না তাঁদের হোমসিক হয়েই বাকী জীবনটা কাটাতে হলো। বিদেশের মাটিতেই দেহরক্ষা করতে হলো। যখনি এসব কথা ভাবি তখনি মাথা আপনি নুয়ে আসে। বলে উঠি, "বন্দে!" হাত জোড় করে নমস্কার করি।

বধূদাহ

দেশ স্বাধীন হওয়ার পূর্বে আমাদের অনেকের মনে এই আশঙ্কা ছিল যে স্বাধীন ভারত হিন্দু পুনরুজ্জীবনবাদের প্রভাবে পড়ে সতীদাহ ফিরিয়ে আনবে। এতদিন সেই পবিত্র কর্তব্য সম্পন্ন হয়নি দেখে নিশ্চিন্ত ছিলুম। কিন্তু এখন দেখছি সেই সনাতন প্রথাই অন্য ভাবে ও অন্য নামে প্রত্যাগত হয়েছে। এবার তার নাম বধূদাহ। কেবল স্বামী মহাপ্রভু নন, পরিবারের সবাই এই যজ্ঞে অংশগ্রহণ করেন। মহিলারাও। খেয়াল নেই যে তাঁদের কুমারী

কন্যারাও একদিন বধূ হবেন, তখন তাঁদের বেলাও অনুষ্ঠিত হবে বধূমেধ যজ্ঞ। ইতিমধ্যে এই প্রথা দিল্লীতেই সব চেয়ে ব্যাপক হয়েছে। যেখানে স্বয়ং প্রধান মন্ত্রীর অধিষ্ঠান। বলা বাহুল্য তিনিও একজন মহিলা।

সতীদাহের অন্তরালেও পতির সম্পত্তিঘটিত ব্যাপার ছিল। সেটা চাপা দেওয়া হতো শাস্ত্রের দ্বারা। ইউরোপেও চার্চের আদেশে মানুষকে পুড়িয়ে মারা হতো। তা ছাড়া নারীকে পুড়িয়ে মারা হতো ডাইনী সন্দেহে। এটা চার্চের আদেশে নয়, জনতার আক্রোশে। অষ্টাদশ শতাব্দীর 'এনলাইটেনমেণ্ট' নামক আন্দোলনের কল্যাণে শিক্ষিত জনমানসে যে জাগরণ আসে তার ফলে এসব অন্যায় ক্রমে ক্রমে রহিত হয়। সেই আন্দোলনেরই সংস্পর্শে এসে রামমোহন সতীদাহের বিরুদ্ধে সংগ্রামে নামেন। গভর্নর জেনারেল লর্ড উইলিয়াম বেণ্টিঙ্ক ইউরোপীয় এনলাইটেনমেণ্টের সন্তান। সতীদাহের মতো সনাতন প্রথার বিপক্ষে যেতে তাঁর সাহস হতো না, যদি না দেখতেন যে হিন্দু সমাজের ভিতর থেকেই সতীদাহ বন্ধ করার দাবী উঠছে। অবশ্য পাল্টা দাবীও ছিল। সে দাবী আরো জোরালো। বেণ্টিঙ্ক তাতে দমে যাননি।

সতীদাহ আসলে সতীত্বের অগ্নিপরীক্ষা। সতীকে একবার সে পরীক্ষা দিতে হয়েছিল। কিন্তু অযোধ্যার লোকের মনোরঞ্জন করতে গিয়ে রামচন্দ্র যখন তাঁকে বিনা দোষে বনবাসে পাঠান তখন তাঁর মধ্যে বিদ্রোহের ভাব জাগে। প্রজার মনোরঞ্জনের জন্যে আবার যখন অগ্নিপরীক্ষার কথা ওঠে তখন তিনি দেহত্যাগ করাই শ্রেয় বিবেচনা করেন। পাতালপ্রবেশ বলতে স্বেচ্ছা দেহত্যাগই বোঝায়। তার মানে আত্মহত্যা। সেটাও একপ্রকার বধূদাহ। দ্বিতীয় বার অগ্নিপরীক্ষায় রাজী হলে তিনি হয়তো পুড়েই মরতেন। আমাদের সেই ঐতিহ্য এখনো মন থেকে যায়নি। স্বামীর চিতায় ঝাঁপ দিয়ে পড়লে এখনো আমরা ভক্তিতে আপ্লুত হই। আহা, কত বড়ো সতী! যেন আর কেউ সতী নয়। এতে মৃতার গৌরব বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে জীবিতা বিধবাদের অগৌরবও বাড়ে। আর মৃতাই বা কেমন করে জানলেন যে তাঁর স্বামীর স্বর্গলাভ হবে, সুতরাং তাঁরও? স্বামী যদি মহাপাপী হয়ে থাকেন ও নরকে যান তবে সতীও কি নরকে যাবেন? বোধ হয়, তা না হলে তিনি সতী কিসের?

সতীদাহের বদ্ধমূল সংস্কার গণমানস থেকে উৎপাটিত হয়নি। ভারতের এনলাইটেনমেণ্ট গভীর স্তরে প্রবেশ করেনি। বধূদাহ তারই প্রকারভেদ। বধূকে পীড়াপীড়ি করা হয় আত্মহত্যা করতে। সে তাতে নারাজ হলে বধূহত্যা। কিন্তু এর মূলে কি থাকে পণযৌতুকের অপ্রাপ্তি বা অর্ধপ্রাপ্তি? সব সময় তা নয়। বধূর মস্ত অপরাধ সে বন্ধ্যা কেন? অথবা পুত্রসন্তানের জননী হচ্ছে না কেন? বংশরক্ষার কী উপায়? পিতৃতান্ত্রিক সমাজে পুত্রের নামেই তো বংশের নাম। শাস্ত্রে লিখেছে পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্যা। পুত্রঃ পিণ্ড প্রয়োজনাৎ। পিণ্ড না পেলে পিতা, পিতামহ প্রভৃতি পরলোকে ক্ষুধার্ত হয়ে থাকবেন। সুতরাং সতী নারীকেও পুত্রজননী না হওয়ার অপরাধে সপত্নীজ্বালা পোহাতে হয়। স্বামী কর্তব্যের দায়ে আর একটি বিয়ে করেন। স্বেচ্ছায় নয়, পিতামাতার

আদেশে। ইদানীং বহুবিবাহ প্রথা আইন করে বন্ধ করা হয়েছে। আইন অনুসারে প্রথম স্ত্রী থাকতে দ্বিতীয় স্ত্রী গ্রহণ করার উপায় নেই। তবে উপযুক্ত কারণ থাকলে প্রথম স্ত্রীকে তালাক দেওয়ার দুয়ার এখন খোলা। সেরা উপায় হচ্ছে স্ত্রীর উপর এমন অত্যাচার করা যাতে সে নিজেই তালাক চাইতে আদালতের দ্বারস্থ হয়। তালাকের মামলা এত বেশী বেড়ে গেছে যে বিচারকরা হিমশিম খাচ্ছেন। গোপনীয় কারণটা পুত্রসন্তানের জন্ম না দেওয়া। এমনও হয় যে ছেলে হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ছেলের মায়ের প্রয়োজন ফুরিয়ে যায়। অপরাধ শ্বশুর শাশুড়ীর সেবা না করা বা অবাধ্য হওয়া।

আদালত যদি তালাক দিতে বাধা দেন তা হলে বৌকে পরলোকে পাঠানো ছাড়া আর কী উপায় আছে? তার বাপের বাড়ী পাঠালে তো আর একটি বিয়ে করতে পারা যাবে না। বহুবিবাহ রদ করার সময় আমরা কেউ এটা ভেবে দেখিনি। আমাদের পূর্বপুরুষরা বহুদর্শী ছিলেন। অম্লানবদনে আর-একটি কেন আরো দশটি বিবাহ করতেন। সেসব দিন আর নেই। তাঁদের বংশধররা আজকাল একটিও বিয়ে করতে চান না। বিবাহমাত্রকেই তাঁরা ভয় করেন। বহুবিবাহ দূরের কথা। কন্যার পিতা হতে তাঁদের সাহস হয় না। কত খরচ!

কন্যারাও আজকাল স্বতন্ত্র জীবিকা তথা স্বতন্ত্র উপার্জনের খাতিরে বিবাহবিমুখ। এটা যুগধর্ম। সব দেশেই এক প্রবণতা। শূদ্র জাগরণের মতো নারী জাগরণও এই প্রবণতার মূলে। নারীর হাতে এখন এক মোক্ষম অস্ত্র এসে গেছে। জন্মনিয়ন্ত্রণের কলাকৌশল। মা হতে সে যদি আদৌ রাজী হয় তবে ওই একটি দুটির বেশী নয়। সেটা ভারত সরকারেরও পলিসি। চীন সরকার আরো এক কাঠি সরেশ। একবারের বেশী মা হতে দেবেন না। জনসংখ্যা বিস্ফোরণের ভয়ে জাপান সরকার গর্ভপাতেরও ঢালা ব্যবস্থা করেছেন। জনসংখ্যা আয়ত্তের বাইরে চলে গেলে আইনের জোরে স্টেরিলাইজ করাও অসম্ভব নয়। পৃথিবীর খাদ্যসঙ্কট ইতিমধ্যেই দুর্বিষহ। হস্তক্ষেপ না করলে তুঙ্গে উঠতে পারে। পরমাণু বোমা দিয়ে অর্ধেক সংখ্যা না কমালে নয়। নারী কেন এই আসুরিক সমাধানের নিমিত্ত হবে? পাশ্চাত্ত্য দেশে এখন শান্তি আন্দোলনের স্তম্ভ অগ্রণী হয়ে সত্যাগ্রহ করছে।

ভারতের মতো একটি প্রাচীন সভ্য দেশ বধূদাহ সহ্য করছে কোন মুখে? পণযৌতুকের বিরুদ্ধে আইন পাশ করাই যথেষ্ট নয়। আইনকে ফাঁকি দেওয়া এতই সহজ যে তলে তলে লেনদেন চলবেই। স্বামীর চেয়ে শাশুড়ী শ্বশুরই বেশী অর্থপিশাচ। তাঁদের দিক্ থেকেও বলবার আছে। ছেলের বিয়েতে মোটা টাকা না নিলে মেয়ের বিয়ে দেবেন কী করে? মেয়ের দায়িত্ব কি সরকার নিচ্ছেন? গোটা সমাজটাই যদি অর্থপাগল হয় তবে কে কাকে শিক্ষা দেবে? যুবকদের মধ্যে কি খুব একটা পৌরুষ দেখতে পাওয়া যাচ্ছে? যুবতীদের মধ্যে খুব একটা তেজ? সবাই রাজনীতি নিয়ে ব্যস্ত। সমাজসংস্কারের জন্যে সময় দিচ্ছে কে? সেটা আরো ত্যাগসাপেক্ষ। অবলাদেরই প্রবলা হতে হবে। সঙ্ঘবদ্ধ হতে হবে। আত্মসংশোধন করতে হবে। বধূবধের অর্ধেক দোষ তো তাদেরই।

বাংলার রেনেসাঁস

ভূমিকা

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আমন্ত্রণে ১৯৬৭ সালের লীলা বক্তৃতাবলী আমি ১৯৭১ সালে প্রস্তুত করি। বিষয়টা আমিই নির্বাচন করেছিলুম। বাংলার রেনেসাঁস। এ বিষয়ে আমি তিনটি বক্তৃতা দিই। পরে সেগুলিকে প্রবন্ধের আকার দিতে পারো সময় নিই। এখন পুস্তকাকারে প্রকাশ করছি। পরিশিষ্ট-হিসাবে জুড়ে দিচ্ছি অপর একজনের বইয়ের জন্য লেখা ভূমিকা। আমার বক্তব্য যাতে আরো পরিষ্কার হয়।

বহু চিন্তাশীল ব্যক্তির ধারণা গত শতাব্দীতে আমাদের দেশে প্রথমে দেখা দেয় রেনেসাঁস, তারপরে রিভাইভাল। অনেকের মতে রিভাইভালও রেনেসাঁসের অন্য নাম। আমাদের রেনেসাঁস যদি ইটালীর সঙ্গে আদৌ তুলনীয় না হতো তা হলে কেউ একে রেনেসাঁস নাম দিয়ে শব্দটির অপব্যবহার করতেন না। অপর-পক্ষে রেনেসাঁস বলে অভিহিত হলে ইটালীর সঙ্গে হুবহু মিলে যাবে এতটা প্রত্যাশা করলে একদেশের সঙ্গে আরেক দেশের ষোল আনা মিল কল্পনা করতে হয়। ইতিহাসে কোনো দুটো রেভোলিউশনই একই রকম নয়। তা হলে কোনো দুটো রেনেসাঁসই বা কেন একই রকম হবে? মাটি আলাদা, মন আলাদা, ইতিহাস আলাদা, ঐতিহ্য আলাদা। বাংলার রেনেসাঁস তাই ইটালীর অনুরূপ হয়নি। তা সত্ত্বেও রেনেসাঁস বলে তাকে চেনা যায়। বিভ্রান্তি ঘটে রিভাইভাল যখন রেনেসাঁসের নাম অধিকার করতে চায়।

আমার নিজের ধারণা পঞ্চাশ বছর আগে যেমনটি ছিল এখন তেমনটি নয়। ধীরে ধীরে তার বিবর্তন হয়েছে। এখন আমার স্থির সিদ্ধান্ত এই যে আমাদের রেনেসাঁস এসেছিল সাত সমুদ্র পার হয়ে পশ্চিম ইউরোপ থেকে। কালপারাবার পার হয়ে প্রাচীন ভারত থেকে নয়। প্রাচীন ভারত থেকে যেটা আসে সেটার নাম রিভাইভাল। দুটো স্রোতই প্রায় সমসাময়িক, কিন্তু সমান প্রবল নয়। প্রথম দিকে রেনেসাঁস ছিল প্রবলতর। পরবর্তীকালে রিভাইভালই প্রবলতর হয়। আরো পরে রেনেসাঁসের উপর থেকে দেশের লোকের মন উঠে যায়। ওটা যেন স্বাদেশিকতা ও স্বাধীনতাকামনার বিপরীত মেরু। আরো পরে বুদ্ধিমানেরা আবিষ্কার করেন যে ওটা বিদেশী ধনতন্ত্র আর স্বদেশী বুর্জোয়াচক্রের ভাব-বিলাসিতা। সত্যিকার রেনেসাঁস নয়। মিথ্যে ফাঁকি।

এতকাল আমরা যেটাকে বাংলার রেনেসাঁস বলে ঠিক করেছি বা ভুল করেছি সেটা ছিল অবিভক্ত বাংলার ব্যাপার। পার্টিশনের পর পূর্ব বাংলা—এখন তো বাংলাদেশ—নতুন করে জেগে ওঠে। সেখানে দেখা দেয় দ্বিতীয় এক রেনেসাঁস। প্রথম রেনেসাঁসে নায়কদের মধ্যে ইউরোপীয় ছিলেন, খ্রীস্টান ছিলেন, কিন্তু মুসলমান ছিলেন না। দ্বিতীয় রেনেসাঁসের নায়করা প্রায় সকলেই মুসলমান। এবার তাঁরা পা মিলিয়ে নিচ্ছেন। প্রথম রেনেসাঁস ছিল কলকাতাকেন্দ্রিক। দ্বিতীয় রেনেসাঁস হচ্ছে ঢাকাকেন্দ্রিক। এর পূর্বাভাস পার্টিশনের পূর্বেই সূচিত হয়েছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার অনতিকাল পরে। মুসলিম বুদ্ধিজীবী মহলে যখন জগৎ সম্বন্ধে, জীবন সম্বন্ধে, মানুষ সম্বন্ধে, ধর্ম সম্বন্ধে নতুন

করে অনুসন্ধিৎসা জাগে। তখন একে বলা হতো 'বুদ্ধির মুক্তি' আন্দোলন। এর নায়কদের মধ্যে অগ্রগণ্য ছিলেন আবুল হোসেন ও কাজী আবদুল ওদুদ। গত শতাব্দীর ডিরোজিও ও তাঁর 'ইয়ং বেঙ্গল' গোষ্ঠীর সঙ্গেই এঁদের তুলনা। এঁরাও গোঁড়াদের বিষ নজরে পড়েন। এক্ষেত্রেও প্রবাহিত হচ্ছিল রিভাইভালের স্রোত। মুসলিম রিভাইভালের। রিভাইভালই প্রবলতর। রিভাইভালের স্রোতের তোড়ে দেশ ভেঙে যায়। তারপরে যখন ভাষার প্রশ্নে একুশে ফেব্রুয়ারির শহীদের রক্তে ঢাকার মাটি রঞ্জিত হয় তখন সে মাটিতে জন্ম নেয় দ্বিতীয় রেনেসাঁস। মুক্তিযুদ্ধের শহীদদের রক্ত তাকে আরো শক্তি যোগায়। 'বাংলার রেনেসাঁস' না বলে এর নাম রাখা যাক 'বাংলাদেশের রেনেসাঁস'।

প্রথম রেনেসাঁস এখনো অসমাপ্ত। রবীন্দ্রনাথের অন্তর্ধানে সে নিঃশেষিত হয়নি। আমাদের মনে জগৎ সম্বন্ধে, জীবন সম্বন্ধে, মানুষ সম্বন্ধে, সমাজ সম্বন্ধে অফুরন্ত জিজ্ঞাসা। তাই আমাদের রেনেসাঁস চলছে, চলবে।

অন্নদাশঙ্কর রায়

পুনশ্চ,

দ্বিতীয় সংস্করণে সংযোজিত বাংলা 'রেনেসাঁসের নবপর্যায়' ও 'বাংলার রেনেসাঁস : পুনর্ভাবনা'।

অন্নদাশঙ্কর রায়

এক

ছেলেবেলা থেকেই শুনে এসেছিলুম যে, ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাংলাদেশে তথা ভারতে একটা নবজন্ম ঘটে গেছে, ফরাসীতে যাকে বলে রেনেসাঁস। কী জানি কেন ওই ফরাসী প্রতিশব্দটাই লোকে পছন্দ করে। যাঁদের বিদেশীতে আপত্তি তাঁরা বলেন নবজাগরণ। কিন্তু তাঁরাও স্বীকার করেন যে, গত শতাব্দীতে একটা নবজাগরণ ঘটে গেছে।

সম্প্রতি এক সেমিনারে গিয়ে শুনলুম রেনেসাঁস বা নবজন্ম বা নবজাগরণ বলে যাকে চিহ্নিত করা যায় তেমন কিছুই ঘটেনি। কারণ, দেশটা ছিল পরাধীন ও জনগণ ছিল শোষিত ও নিরক্ষর। সামন্তবাদ, সাম্রাজ্যবাদ ও ধনতন্ত্রের আওতায় মুষ্টিমেয় অভিজাত বা ভদ্রলোক শ্রেণীর সাহিত্যিক বা শিল্পী বা মনীষী কি রেনেসাঁসের মতো অত বড়ো একটা ব্যাপার ঘটাতে পারতেন? পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দীর ফ্রান্স বা ইংলণ্ডের সঙ্গে তার কি কোনো সাদৃশ্য ছিল? যেটা রেনেসাঁস নয় সেটাকে রেনেসাঁস বলে ভ্রম করা হয়েছে।

আবার এমন কথাও শোনা গেল যে বাংলার রেনেসাঁস তো চৈতন্যদেবের সময়েই ঘটেছিল। বৈষ্ণব পদাবলী যার সাক্ষী। অমন অপূর্ব জাগরণ যে দেশে ঘটেছিল, সে-দেশে ঊনবিংশ শতাব্দীতে এমন কী ঘটল যে তাকেই বলতে হবে রেনেসাঁস? যেটা রেনেসাঁস নয় সেটাকে রেনেসাঁস বলে ভ্রম করা হচ্ছে।

বুঝতে পারা যাচ্ছে দেশে দুই দল ভাবুক আছেন যাঁরা দেশাভিমানী, তাঁরা বলবেন দেশের রেনেসাঁস দেশের অতীত থেকে বা দেশের মাটি থেকেই জন্মায়। ইউরোপে যেমন জন্মেছিল। রেনেসাঁসের বীজ বাইরে থেকে উড়ে আসে না সমসাময়িক কালের হাওয়ায়। আর যাঁরা সমাজবাদী, তাঁরা বলেন সত্যিকার রেনেসাঁস কখনো উপরের স্তর থেকে হতে পারে না, হতে পারে নিচের স্তর থেকে। সামন্তবাদ, সাম্রাজ্যবাদ ও দেশী বিদেশী ধনতন্ত্র মিলে রেনেসাঁস ঘটাতে পারে না। পারে জাগ্রত জনগণ।

এই নেতিবাদী মনোভাব আমার ছেলেবেলায় ছিল না। স্বদেশী যুগের নেতারাও স্বীকার করতেন যে বিদেশী শাসন যতই মন্দ হোক না কেন, সেই অন্ধকারের ভিতরেও আলোর দেয়ালী জ্বলেছিল। জ্ঞানের আলো এসে অজ্ঞানের আঁধার দূর করে ঊনবিংশ শতাব্দীতে।

তবে ইউরোপেও আজকাল রেনেসাঁসের সংজ্ঞা ও সময় নিয়ে নানা মত। কারো কারো মতে রেনেসাঁস শুরু হয় পঞ্চদশ শতাব্দীতে তুর্কদের কনস্টান্টিনোপল অধিকার ও গ্রীক পণ্ডিতদের ইটালীতে আশ্রয়লাভের সময় থেকে নয়। আরো আগে থেকে। যখন আরবরা স্পেন অধিকার করে ও তাদের সঙ্গে গ্রীক গ্রন্থের আরবী তর্জমা ইউরোপের নজরে পড়ে। কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয় তো তখন থেকেই প্রতিষ্ঠিত। এঁদের মত মেনে নিলে মহাকবি দান্তেও রেনেসাঁসের সন্তান। এটা কিন্তু অধিকাংশের মত নয়। অথচ এটার পক্ষে প্রবল যুক্তি হলো দান্তের যুগে লাটিন থেকে ইটালিয়ন ভাষায় উত্তরণ, অবজ্ঞাত লোকভাষায়

নিখুঁত ছন্দ নিখুঁত মিল বিদগ্ধ চিন্তা গভীর অনুভূতি।

সংস্কৃত থেকে বাংলাভাষার উত্তরণ, হিন্দীভাষার উত্তরণ, অন্যান্য লোক-ভাষার উত্তরণও কি অনুরূপ ঘটনা নয়? সেটা যদি রেনেসাঁসের লক্ষণ না হয়, তবে কিসের লক্ষণ? সেইজন্যে রেনেসাঁসের সংজ্ঞা সম্বন্ধে একমত হওয়া শক্ত। অধিকাংশের মতে রেনেসাঁসের প্রধান লক্ষণ হলো দিব্য চেতনার পরিবর্তে মানবিক চেতনা, ব্রহ্মজ্ঞানের পরিবর্তে বস্তুজ্ঞান, পারলৌকিক বা অলৌকিক কার্যকারণ পরম্পরার পরিবর্তে ঐহিক বা প্রাকৃতিক কার্যকারণ পরম্পরা, ভক্তির পরিবর্তে যুক্তি, আপ্তবাক্যের পরিবর্তে প্রমাণসিদ্ধ বাক্য, অথরিটির পরিবর্তে লিবার্টি। প্রাচীন গ্রীসে এসব ছিল। খ্রীস্টধর্ম প্রবর্তনের ফলে এসব রহিত হয়। সবকিছুর জন্যে বাইবেলে যেতে হয়। বাইবেলই ইতিহাস, বিজ্ঞান, দর্শন। তাহলে মানবমনের বিকাশ হবে কী করে? মানুষের কি কেবল আত্মা আছে, মন নেই? দেহ নেই? দেহ থাকলে শরীরতত্ত্বও জানতে হয়। শরীরতত্ত্ব জেনে মানুষের ছবি আঁকতে হয়, মূর্তি গড়তে হয়। শরীরতত্ত্ব জানতে হলে শবব্যবচ্ছেদ করতে হয়। এসব যে নিষিদ্ধ।

প্রাচীন গ্রীসের সঙ্গে একটা ছেদ বা ডিসকন্টিনিউইটি ঘটেছিল। তার ফলে এনেছিল একপ্রকার অন্ধকার। সেটা মনের রাজ্যে। তেমনি একপ্রকার অবদমন। সেটা দেহের রাজ্যে। মানবমনকে, বিশ্বপ্রকৃতিকে শৃঙ্খলিত করে যে শৃঙ্খলা তার থেকে মুক্তির জন্যেও আকুলতা জেগেছিল। আবশ্যক হয়েছিল আরো একটা ছেদ, আরো একটা ডিস্কন্টিনিউইটি। এবার প্রাচীন গ্রীসের সঙ্গে নয়, মধ্য-যুগের শাস্ত্রনিবদ্ধ চার্চশাসিত বিদ্যার সঙ্গে। তাই পুরাতন বিদ্যার জায়গায় এল নতুন বিদ্যা, ওল্ড লার্নিং-এর জায়গায় নিউ লার্নিং। এটা একটা নতুন ধর্ম নয়, একটা নতুন মনোভাব। এটা ধর্মের সঙ্গে মেলে না বলে এর নাম দেওয়া হয় মানবিকবাদ বা হিউমানিজম। মানুষই সবকিছুর মাপকাঠি। পৃথিবী স্থির না অস্থির এই নিয়ে যে বাদ-বিসম্বাদ ঘটে, সেটা আসলে খ্রীস্টীয় বা ধর্মীয় বিশ্ব-বীক্ষার পক্ষে জীবন-মরণের প্রশ্ন। পৃথিবী অস্থির হলে তো সব কিছুই অস্থির।

ইউরোপীয় রেনেসাঁসের আরো একটা দিক ছিল। শিল্পের দিক। ধর্মের আঁচল ধরা জ্ঞানের মতো ধর্মের আঁচল ধরা সৌন্দর্য কয়েকটি ধর্মীয় বিষয়ে নিবদ্ধ ছিল। তার বাইরে গেলেই আধ্যাত্মিক বা নৈতিক অর্থে পতন। রেনেসাঁস দিল শিল্পীকে মুক্তি। গ্রীক রোমক দেবদেবীর অস্তিত্বে বিন্দুমাত্র বিশ্বাস না থাকলেও তাদের পৌরাণিক কাহিনীকে চিত্রভাস্কর্যে রূপায়িত করা হলো। আঁকা হলো, গড়া হলো নগ্নকায় ভীনাস। এক এক করে নিষেধের গণ্ডী লঙ্ঘন করা হলো। যে গণ্ডী প্রাচীন ঐতিহ্যের নয়, মধ্যযুগীয় ঐতিহ্যের। এক্ষেত্রে প্রাচীন আধুনিক পরস্পরের বন্ধু। আধুনিকদের প্রেরণার উৎস প্রাচীন ক্লাসিকাল সাহিত্য ও শিল্প। এক-একটি প্রাচীন কীর্তি আবিষ্কৃত হয় আর সাহিত্যিক বা শিল্পীরা নতুন প্রেরণা পেয়ে সৃষ্টিতৎপর হন। তাতে হয়তো খ্রীষ্টীয় ঐতিহ্যের সঙ্গে অসঙ্গতি বা বিচ্ছেদ হলো, কিন্তু তার জন্যে কেউ দ্বিধান্বিত নন।

অতীতের পুনরাবিষ্কারের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চলতে থাকে বহির্বিশ্ব আবিষ্কার। আকাশের গ্রহনক্ষত্রের মতো পৃথিবীর সাগর-মহাসাগর দেশ-মহাদেশ। আগেকার দিনে লোকের ধারণা ছিল স্বর্গ, মর্ত্য ও পাতাল পরস্পর-সংলগ্ন। তার চিত্র আঁকা হতো। কোথাও তার কোনো সমর্থন পাওয়া গেল না। ভূগর্ভে আব যাই থাক পাতাল নেই। আকাশে আর যাই থাক স্বর্গ নেই। বাইবেলের জগৎ বিজ্ঞানের জগতের সঙ্গে মেলে না। মানুষ কোন্‌টা বিশ্বাস করবে? ধীরে ধীরে বিজ্ঞানের জগৎকেই স্বীকার করে নিল। বাইবেলের জগৎ যে সহজে পথ ছেড়ে দিল তা নয়। রেনেসাঁসের পর এল কাউণ্টার রেনেসাঁস। সাহিত্যের উপরে, বিজ্ঞানের উপরে এমন উপদ্রব শুরু হলো যে, ইটালীর রেনেসাঁস এক শতাব্দীর মধ্যেই স্তব্ধ। তারপরের শতাব্দীটা তার তুলনায় বন্ধ্যা। অন্যান্য দেশেও এর অনুরূপ দেখা যায়। তবে যেসব দেশে খ্রীস্টধর্মের রেফরমেশন ঘটে সেই প্রোটেস্টাণ্ট দেশগুলিতে কাউণ্টার-রেনেসাঁস তেমন অত্যাচার করতে পারে না। আর ফ্রান্স যদিও ক্যাথলিক দেশ তবু সেইখানেই দেখা দেয় অষ্টাদশ শতাব্দীর এনলাইটেনমেণ্ট। যার মানসসন্তান ফরাসী বিপ্লব। এই চারটি যুগান্তকারী পর্যায় এক শতাব্দীকালের মধ্যে উপস্থিত হয়নি। মোটামুটি চার শতাব্দী সময় নিয়েছে। এই চার শতাব্দীর ঐতিহাসিক বিবর্তন একসঙ্গে এসে সমাগত হয় আটলাণ্টিক ও ভারত মহাসাগর পার হয়ে বাংলাদেশের উপকূলে। তথা ভারতবর্ষের উপকূলে। তাদের স্বাগত জানান সর্বপ্রথম রামমোহন রায়। তিনি যেন তাদেরি অপেক্ষায় অন্ধকার রাত্রে জাগ্রত ছিলেন। বিদেশী বিধর্মী ও বিজেতার সঙ্গে তিনি তাদের ঘুলিয়ে ফেলেন না। পৃথিবীর একপ্রান্তের ঐতিহাসিক পরিবর্তন অপর প্রান্তের ঐতিহাসিক পরিবর্তন উদ্বোধন করতে পারে। রামমোহন বিশ্বাস করতেন যে, বাংলাদেশে তথা ভারতে অনুরূপ পরিবর্তন অত্যাবশ্যক। সূচনা যাঁরা করেন, তাঁরা সব দেশেই মুষ্টিমেয় শিক্ষিত ব্যক্তি। কেউ বা অভিজাত কেউ বা মধ্যবিত্ত। জনগণ হঠাৎ একদিন জেগে উঠে রেনেসাঁসও করেনি, রেফরমেশনও না, এনলাইটেনমেণ্ট তো নয়ই। এক ফরাসী বিপ্লবেই জনগণকে রঙ্গমঞ্চে দেখা গেল। উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে ফরাসী বিপ্লবের পুনরাবৃত্তির লেশমাত্র সম্ভাবনা ছিল না এদেশের মাটিতে। প্রথম তিনটিব অনুবৃত্তির সম্ভাবনা যে ছিল এটা রামমোহনেরই চোখে পড়ে।

আমাদের রেনেসাঁস ভারতবর্ষের ইতিহাসে ঘটেছে, কিন্তু ভারতবর্ষের ইতিহাস থেকে ধারাবাহিকতার সূত্রে আসেনি। ইউরোপের ইতিহাস থেকে আবির্ভূত হয়েছে। কিছুকালের জন্য ভারতের ইতিহাস ইউরোপের ইতিহাসের সামিল। গোড়ায় অর্থনৈতিক অর্থে, পরে রাজনৈতিক অর্থে, শেষে সাংস্কৃতিক অর্থে। ইচ্ছা করলে তৃতীয়টাকে প্রতিরোধ করতে পারা যেত। বলতে পারা যেত, চাইনে রেনেসাঁস, চাইনে রেফরমেশন, চাইনে এনলাইটেনমেণ্ট। পরবর্তীকালে বলাও হলো। কিন্তু রামমোহন ও তাঁর সহযোগীরা বহিরাগত ভাবধারাকে সাদরে আবাহন করেন। দেশজ না হলেও কালোপযোগী বলে। সে

না এলে আধুনিক যুগটাই আসত না। নতুন ভোরের আলোর রেখাও আসত না।

আমাদের রেনেসাঁস ইউরোপীয় রেনেসাঁসেরই মতো মধ্যযুগের অন্ধকার থেকে আধুনিক যুগের আলোকে উত্তরণ। আমাদের রেফরমেশন অর্থাৎ ধর্ম-সংস্কার তথা সমাজসংস্কার আমাদের রেনেসাঁসের সমকালীন, যদিও স্বতন্ত্র। আমাদের এনলাইটেনমেণ্ট স্বতন্ত্র নয়, যদিও সমকালীন। রামমোহনের মধ্যে তিনটেই একসূত্রে গ্রথিত। ফরাসী বিপ্লবের সঞ্চালিকা ভাবধারাও তাঁর মধ্যে কাজ করছিল, তিনিও ভালোবাসতেন সাম্য মৈত্রী স্বাধীনতা। তবে বিপ্লবটার অনুরূপ তাঁর স্বকালে ও তাঁর নেতৃত্বে সংঘটিত হয়নি। আপাতত রেনেসাঁস নিয়েই আমাদের আলোচনা। রেফরমেশন আমাদের আলোচ্য নয়। এনলাইটেন-মেণ্ট অর্থাৎ রুশো ভলতেয়ার দিদেরো প্রভৃতিকে রেনেসাঁসের কোটায় ফেলা যায় না। অথচ আমাদের ইয়ং বেঙ্গল গোষ্ঠী এঁদের দ্বারা এমনভাবে প্রভাবিত যে, এনলাইটেনমেণ্টকে বাদ দিলে ইয়ং বেঙ্গলকেও বাদ দিতে হয়। আর ইয়ং বেঙ্গলকে বাদ দিলে আমাদের রেনেসাঁস অঙ্গহীন হয়। আসলে আমাদের রেনেসাঁস ইউরোপের চার শতাব্দীর বিবর্তনের সংক্ষিপ্ত ও বিমিশ্র অনুবর্তন। অথচ অনুকরণ নয়। আমরা কতক নিয়েছি কতক বাদ দিয়েছি। আমাদের প্রেরণার উৎস খ্রীস্টপূর্ব গ্রীস নয়। ইসলামপূর্ব ভারত নয়। প্রতীচ্যের নতুন বিদ্যা, নতুন জ্ঞানবিজ্ঞান।

খ্রীস্টীয় ঐতিহ্য তার পূর্ববর্তী গ্রীক ঐতিহ্যকে অন্ধকারের সঙ্গে তুলনা করত। আর আপনাকে করত আলোকের সঙ্গে। রেনেসাঁসের পর হিউমানিস্টদের একভাগ খ্রীস্টীয় ঐতিহ্যকেই অন্ধকারের সঙ্গে তুলনা করেন, আর পুনরুদিত গ্রীক ঐতিহ্যকে আলোকের সঙ্গে। মধ্যযুগের অন্য নামই হলো অন্ধকার যুগ। অথচ সেই যুগটাই ছিল খ্রীস্টীয় ঐতিহ্যের একচ্ছত্র আধিপত্যের যুগ। আমাদের এদেশে যাঁরা রেনেসাঁসের দীক্ষা নিলেন তাঁদের মধ্যে একভাগ বলতে আরম্ভ করলেন যে আমাদের মধ্যযুগটাও ছিল অন্ধকার যুগ। কিন্তু সেকথা বললে কেবল যে ইসলাম প্রভাবিত আরব্য ও পারসিক ঐতিহ্যকে খর্ব করা হয় তাই নয়, নানক কবীর চৈতন্য প্রবাহকেও উপেক্ষা করা হয়। মধ্যযুগ নিয়ে এই যেমন সমস্যা তার পূর্ববর্তী যুগ নিয়েও তেমনি আরেক। ইসলামী ধর্ম-প্রচারকরা হয়তো তাকে অন্ধকার যুগ বলে শ্রদ্ধা করে থাকবেন, কিন্তু প্রাচীন আরবরা প্রাচীন ভারতের সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। প্রাচীন পারসিকরাও। ইসলাম এতে দেশশুদ্ধ মানুষকে মুসলমানও করেনি, খ্রীস্টধর্ম যেমন করেছিল ইউরোপের মানুষকে। তেমন কোনো ছেদ বা ডিস্কণ্টিনিউইটি ইউরোপের মতো ভারতের পূর্বতন ঐতিহ্যের সঙ্গে ঘটেনি। সেটা ঘটে থাকলে পরে আবার পূর্বতন ঐতিহ্যকে পুনরাবিষ্কার করে মধ্যযুগের অন্ধতার সঙ্গে ছেদ বা ডিস্কণ্টিনিউইটির প্রশ্ন উঠত।

এদেশে প্রাচীন ভারতীয় বা হিন্দু সংস্কৃতি প্রাচীন গ্রীক সংস্কৃতির মতো আচ্ছন্ন বা বিলুপ্ত হয়নি। মধ্যযুগের ইসলামী বা আরব্য পারসিক সংস্কৃতি

তাকে আচ্ছন্ন বা বিলুপ্ত করতে চায়নি বা পারে নি। যে কোনো দেশে যে কোনো যুগে নবজাগরণ ঘটতে পারে, কিন্তু যে কোনো নবজাগরণই রেনেসাঁস নামের যোগ্য নয়। যেখানে ছেদ নেই, ডিস্কন্টিনিউইটি নেই, সেখানে অন্ধকার থেকে আলোকে উত্তরণের প্রশ্ন ওঠে না। তা সে খ্রীস্টীয় আলোকই হোক আর গ্রীক আলোকই হোক। অবিকল ইউরোপীয় অর্থে রেনেসাঁস এদেশে ঘটবার কথা নয়। কিন্তু একথা তো অস্বীকার করা যায় না যে বস্তুজগৎ সম্বন্ধে অষ্টাদশ শতাব্দীর ভারতীয়দের যে জ্ঞান ছিল সে জ্ঞান অজ্ঞান। অজ্ঞানের পরিণাম জ্ঞানের হাতে পরাজয়। অন্ধকারের পরিণাম আলোকের কাছে পরাভব। আরো আগে ইসলামধর্মী আরব, তুর্ক ও মোগলদেরও বস্তুজগৎ সম্বন্ধে জ্ঞান খুব বেশী না হলেও তুলনায় বেশী ছিল। দেশ-বিদেশ ঘুরে ভূগোলটা তারা আরো ভালো জানত। আর সমুদ্রযাত্রা তথা স্থলপথে বিদেশযাত্রা নিষিদ্ধ করে ভারতের মধ্যযুগের হিন্দুরা স্বেচ্ছায় কূপমণ্ডূক হয়েছিল। একই কালে তাদেরি মতো কূপমণ্ডূক হয়েছিল চীনারা, জাপানীরাও।

কোনো এক অজ্ঞাত কারণে কেবল ভারত নয়, চীন জাপান তিব্বতও তাদের ঘরের দরজা জানলা বন্ধ করে পর্দানশীন বনে। পৃথিবীর অপর প্রান্ত থেকে ইউরোপের অভিযাত্রীরা এসে তাদের ঘোমটা খুলে দেয়। এই শতাব্দীর গোড়ার দিকে ঘটে লাসার অবগুণ্ঠন উন্মোচন। যাঁর দ্বারা তাঁর নামটিও তেমনি। ইয়ংহাজব্যান্ড। জাপানীরা রাতারাতি ইউরোপীয় জ্ঞানবিজ্ঞানকে সাদরে বরণ করে নেয়। চীনারা তাদের অহঙ্কার ছাড়ে না। দীর্ঘসূত্রিতা করে। তবু তারাও ওর মূল্য বোঝে। অবুঝ কেবল তিব্বতীরা। চীন কমিউনিস্ট হবার পর তিব্বত থেকে যাঁরা পালিয়ে আসেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন একজন পণ্ডিত। একখানি পুঁথি দেখিয়ে আমাকে বলেন, "আমার হাতে প্রমাণ আছে। আমি প্রমাণ করে দিতে পারি যে পৃথিবীটা গোল নয়।"

আমাদের এদেশেই অনবগুণ্ঠন সকলের আগে ঘটে। এদেশে রেনেসাঁস হয়নি বলা যেমন কঠিন, হয়েছে বলাও তেমনি। কারণ বিস্তর পণ্ডিত আছেন যাঁদের হাতে প্রমাণ রয়েছে যে রবি সোম মঙ্গল বুধ বৃহস্পতি শুক্র শনি পৃথিবীর চারদিকে ঘুরছে। তা ছাড়া রেনেসাঁস তো একটা সাধারণ শব্দ নয়, একটা বিশেষ শব্দ। যেটা ইটালীর বেলা প্রয়োগ করা হয়েছিল পঞ্চদশ শতাব্দীতে একটি বিশেষ অবস্থায় সেটা যত্রতত্র যে কোনো শতাব্দীতে যে কোনো অবস্থায় প্রয়োগ করলে তার অর্থ বদলে যায়। রেনেসাঁস সেইখানেই আর তখনি হয় যেখানে ও যখন শাস্ত্র আর বিজ্ঞান ফারাক হয়ে যায়, থিয়োলজি আর ফিলসফি ফারাক হয়ে যায়, পুরাণ আর ইতিহাস ফারাক হয়ে যায়, লাটিন আর ইটালিয়ান, সংস্কৃত আর বাংলা ফারাক হয়ে যায়। জার্মানীর মারবুর্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে একদিন থিয়োলজির চেয়ার ছাড়া আরো একটা চেয়ার সৃষ্টি হয়। তার নাম ফিলসফির চেয়ার। ফিলসফি তার স্বাধীনতা ঘোষণা করে। পরে ন্যাচারাল ফিলসফি বলে নতুন একটি বিভাগ খোলা হয়। যার অপর নাম বিজ্ঞান। সেই বিজ্ঞান থেকে এখন আলাদা হয়ে গেছে সমাজবিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান। প্রত্যেকেই

স্বাধীন। এটা শুধু মারবুর্গে নয়, ইউরোপের সর্বত্র। এখন তো পৃথিবীর অধিকাংশ দেশে।

রামমোহন রায়ই প্রথমে উপলব্ধি করেন যে এদেশে থিয়োলজি শিক্ষার নতুন কোনো দরকার নেই, দরকার ফিলসফি তথা বিজ্ঞান শিক্ষার ব্যবস্থার। তিনি স্বয়ং ছিলেন জবরদস্ত মৌলবী, প্রচণ্ড বৈদান্তিক, প্রগাঢ় খ্রীস্টভক্ত। কিন্তু দেশবাসীর জন্যে যে শিক্ষা তিনি ও তাঁর সহযোগীরা মিলে প্রবর্তন করেন সেটা মারবুর্গের তিন শতাব্দী পূর্বের সেই স্বাধীন মানবিক বিদ্যার অনুবর্তন। ততদিনে সেটার আরো ভাগবিভাগ হয়েছে। ইউরোপের বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে থিয়োলজি তখনো সহ-অবস্থান করছিল। কিন্তু ভারতের বিশ্ববিদ্যালয়গুলি যখন প্রতিষ্ঠিত হয় তখন হিন্দু মুসলিম খ্রীস্টান ধর্মতত্ত্ব সম্পূর্ণ বাদ যায়।

ইউরোপের সমসাময়িক জ্ঞানবিজ্ঞানকে অন্তরের সঙ্গে অভ্যর্থনা করলেও প্রাচীন গ্রীসকে প্রেরণার উৎস বলে মেনে নিতে রামমোহন বা তাঁর সমকালীন কেউ ইচ্ছুক ছিলেন না। প্রাচীন গ্রীসের স্থানে তাঁরা অভিষেক করেছিলেন প্রাচীন ভারতকে। এক্ষেত্রে রামমোহনের সঙ্গে তাঁর প্রতিপক্ষদের বিবাদ যা ছিল তা ধর্ম বা সমাজনিবন্ধ। তাঁদেরি মতো রামমোহনেরও প্রতিষ্ঠাভূমি ছিল সংস্কৃত ভাষা ও আর্ষ সংস্কৃতি। খ্রীস্টধর্ম সম্বন্ধে যথার্থজ্ঞান লাভের জন্যে গ্রীক ভাষা শিক্ষা করলেও তিনি ইলিয়াড অডিসি বা গ্রীক ট্র্যাজেডী সম্বন্ধে কৌতূহলী ছিলেন কি না সন্দেহ। সম্ভবত গ্রীকদর্শন অধ্যয়ন করেছিলেন মাদ্রাসায় আরবী ভাষায়। গ্রীক সাহিত্য ও দর্শন সম্পর্কে জিজ্ঞাসা আসে রাম-মোহন-পরবর্তীকালে। মধুসূদন হোমার পড়ে প্রভাবিত হন। ইলিয়াডের আলোয় রামায়ণের ইণ্টারপ্রেটেশন দেন। সেটা কিন্তু একটা ব্যতিক্রম। বাংলার রেনেসাঁস গ্রীসের দিকে তাকায়নি। তাকিয়েছে ইংলণ্ডের দিকে, সেও আধুনিক ইংলণ্ড। ইউরোপের রেনেসাঁসের যেটা প্রতিষ্ঠাভূমি বাংলার বা ভারতের রেনেসাঁস তার প্রতি বিশেষ আকৃষ্ট হয়নি। হয়েছে আধুনিক ইউরোপের প্রতি। আধুনিক ইউরোপই এক্ষেত্রে প্রাচীন গ্রীসের ভূমিকা নিয়েছে।

রেনেসাঁসের একটা বিশিষ্ট লক্ষণ হচ্ছে সর্ববিষয়ে কৌতূহল বা অনু-সন্ধিৎসা। আর একটা মানব জীবনকে সর্বপ্রকারে ভরিয়ে নেওয়া ও বিকশিত করা। এ দুটি লক্ষণ ইউরোপের মতো বাংলায় তথা ভারতেও দেখা দিল। তেমনি আরো একটি লক্ষণ হলো মানবিক ব্যাপারে অতিপ্রাকৃতের হস্তক্ষেপ স্বীকার না করা। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের পরতে পরতে দেবদেবীর পদক্ষেপ ও হস্তক্ষেপ। দেবদেবীর কোপে মানুষের সর্বনাশ, দেবদেবীর বরে মানুষের সর্বসিদ্ধি এই যে সাহিত্যের নিয়ম তা সংস্কৃতে লেখা না হয়ে বাংলায় লেখা হয়েছে বলেই কি রেনেসাঁসের সূচক? কিন্তু ইংরেজী ভাষায় নতুন বিদ্যা প্রবর্তনের পর যে সাহিত্যের উদয় হলো তার আলোয় অতিপ্রাকৃতের ছায়া সরে গেল। কদাচিৎ একজন সাধু বা সন্ন্যাসী এসে পরিস্থিতি বাঁচান, কিন্তু চণ্ডী বা কালী বা ধর্ম ঠাকুর আর আসেন না। নব্য শিক্ষিত পাঠক অমন নভেল পড়বেন না, অমন নাটক দেখবেন না।

এই যে নতুন শিক্ষা এটাই ইউরোপের নিউ লার্নিং। যা মধ্যযুগকে অপসারণ করে আধুনিক যুগের পত্তন করেছিল সেখানে। এখানেও তার একই ভূমিকা। তফাতের মধ্যে এই যে এদেশের পড়ুয়াদের গ্রীক লাটিন পড়তে হয় না, তার বদলে পড়তে হয় ইংরেজী। কিন্তু সেই ইংরেজীর ভিতর লুকিয়ে থাকে গ্রীক লাটিন শেখা মন। প্রত্যক্ষভাবে না হোক পরোক্ষভাবে। প্রাচীন গ্রীস রোম আমাদের ইংরেজী শিক্ষিতদের মনের উপর কাজ করে। আর তাঁরাই হন বাংলার নতুন সাহিত্যের প্রবর্তক।

দেখতে দেখতে গড়ে ওঠে বাংলা পদ্য। গোড়ার দিকে সংস্কৃত বা পারসিক ভাষায় শিক্ষিত পণ্ডিত বা মুনশীদের হাতে। পরে ইংরেজী ভাষায় শিক্ষিত সাহিত্যিক বা সাংবাদিকদের হাতে। এঁদের সামনে ছিল ইংরেজী মডেল। ইংরেজী পত্রিকা পড়ে এঁরা বাংলা পত্রিকা লেখেন। ইংরেজী কাব্য উপন্যাস পড়ে বাংলা কাব্য উপন্যাস। সংস্কৃত মডেল সামনে রেখে যাঁরা লিখতেন তাঁরাও ইংরেজীর প্রতি আকৃষ্ট হন। যেমন সংস্কৃত রীতির কাব্যনাটকের সঙ্গে তেমনি গৌড়ীয় রীতির মঙ্গলকাব্য ও বৈষ্ণব পদাবলীর সঙ্গে ছেদ পড়ে যায়। এটাও একপ্রকার ডিস্কণ্টিনিউইটি। ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্য অষ্টাদশ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্যের পদাঙ্ক অনুসরণ করে না। এক পুরুষ কি দু পুরুষ পূর্বের ইংরেজী সাহিত্যের সঙ্গেই পা মিলিয়ে নেয়। তবে প্রাচীন সংস্কৃতের সঙ্গেও যোগসূত্র রাখতে চায়। এইখানে বাংলার বা ভারতের রেনেসাঁস ইউরোপীয় রেনেসাঁসের থেকে ভিন্ন।

ইউরোপের বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে যে গ্রীক লাটিনের চর্চা হতো তার কোন ধর্মীয় ঝোঁক ছিল না। তার প্রবণতাটাই ধর্মনিরপেক্ষ বা সেকুলার। গ্রীক বা রোমক দেবদেবীদের কেউ দেবতাজ্ঞান করত না, তাদের পায়ে মাথা ঠেকাত না। তারা যেন দেবতাই নয়, মানবমনের কল্পনা। আর এখানে মানুষ দেবতা হয়ে বসে আছেন। তাঁর মানবিক বিচার করে সাধ্য কার! দেবতারাও জাগ্রত! সংস্কৃতচর্চা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইরে যা ছিল তা সমগ্র সংস্কৃত সাহিত্যের নয়, প্রধানত হিন্দুশাস্ত্রের ও শাস্ত্রানুমোদিত সাহিত্যের। বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিতরে যেটুকু ছিল সেটুকু সমগ্র সংস্কৃত সাহিত্যের ভগ্নাংশ। জার্মানীতে বা জাপানে গেলে তার চেয়ে অনেক বেশী সংস্কৃত পুঁথিপত্রের সন্ধান পাওয়া যেত। ইউরোপের লোকেব ইলিয়াড অডিসি পড়া আর ভারতের লোকের রামায়ণ মহাভারত পড়া দুই বিভিন্ন ধরণের পড়া। ওদের পড়া বিশুদ্ধ সাহিত্য হিসাবে পড়া। এদের পড়া সাহিত্যচ্ছলে ধর্মগ্রন্থ হিসাবে পড়া। এ পড়ার মধ্যে বিচার নেই, বিশ্লেষণ নেই, লৌকিক অলৌকিক সব সমান সত্য। কেউ তর্ক করলে একটা রূপক ব্যাখ্যা দিয়ে তার মুখ বন্ধ করে দেওয়া হয়। প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যের বিরাট একটা সেকুলার দিকও ছিল। কিন্তু সেটা বিলুপ্ত বা অনাবিষ্কৃত। অশোকের শিলালিপি, কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র, মানসারের শিল্পসূত্র, ভরতের নাট্যশাস্ত্র, বাৎস্যায়নের কামসূত্র ইত্যাদি সংস্কৃত কলেজ বা হিন্দু কলেজ বা প্রেসিডেন্সী কলেজের ছাত্রদের বা তাদের অধ্যাপকদের বিদ্যার চতুঃ-

সীমার মধ্যে ছিল না। টোল চতুষ্পাঠীর বিদ্যার্থী ও পণ্ডিতদের বিদ্যার বিস্তারও সীমাবদ্ধ। রেনেসাঁসের প্রেরণা তার থেকে আসে না, আসে পূর্ববর্তী চার শতাব্দীর ইউরোপীয় বিবর্তন থেকে।

পূর্ববর্তী চার শতাব্দীতে ইউরোপ যদি এইভাবে বিবর্তিত না হতো তা হলে এদেশেও রেনেসাঁস ঘটত না। শুধুমাত্র সংস্কৃতচর্চা করেই যে কেউ প্রাচীন ভারতের স্বাধীন চিন্তা স্বাধীন পরীক্ষণ স্বাধীন জীবনকে উনবিংশ শতাব্দীতে আবাহন করে নিয়ে আসতে পারতেন তা নয়। প্রাচীন গ্রীকবিদ্যার মতো প্রাচীন সংস্কৃতবিদ্যা মধ্যযুগে অচলিত ছিল না। আধুনিক যুগের বীজ নিহিত থাকলে উনবিংশ শতাব্দীর বহুপূর্বেই ভারতে নবজাগরণ ঘটতে পারত। যে কারণেই হোক সংস্কৃতচর্চা থেকে ভারতে নবজাগরণ আসেনি, পারসিক চর্চা থেকেও না, বাংলা পদাবলী কীর্তন থেকেও না। এসেছে ইংরেজীচর্চা থেকে, ইংরেজীসূত্রে দর্শন-বিজ্ঞান ইতিহাস-ভূগোল ও নীতিচর্চা থেকে। অচলায়তনের নিষিদ্ধ দুয়ার খুলে গেছে। সেই দুয়ার দিয়ে এসেছে চার শতাব্দীর ইউরোপীয় বিবর্তন।

ইটালীর বেলা যেমন গ্রীস বাংলার বেলা তেমনি ইংলণ্ড। ইটালীর বেলা যেমন প্রাচীন যুগ বাংলার বেলা তেমনি পূর্ববর্তী চার শতাব্দী। উভয়ক্ষেত্রেই পুরাতন বিদ্যার স্থান অধিকার করে নূতন বিদ্যা। নতুন ধরনের স্কুল কলেজ ইউনিভার্সিটি। তবে রেনেসাঁস কেবল বিদ্বানদের ব্যাপার নয়। শিল্পীদেরও ব্যাপার। ইউরোপের রেনেসাঁসের নায়কদের মধ্যে ছিলেন একদিকে যেমন কোপারনিকাস, গালিলিও, ব্রুনো, ইরাসমাস প্রমুখ জ্ঞানী তেমনি অপরদিকে লেওনার্দো দা ভিঞ্চি, মাইকেল এঞ্জেলো, রাফেল, বতিচেলি প্রমুখ শিল্পী। জ্ঞানীদের উপর নির্যাতন যতখানি হয় শিল্পীদের উপর ততখানি নয়। কারণ তাঁরা খ্রীস্টীয় বিষয়েও ছবি আঁকতেন, মূর্তি গড়তেন, আবার পেগান বিষয়েও। রেনেসাঁসের জ্ঞানের দিকটা খ্রীস্টীয় চার্চের কোপদৃষ্টিতে পড়লেও শিল্পের দিকটা নীতির নামে পুনরায় অর্গলবদ্ধ হয় না। তবে লেওনার্দোকেও ভয়ে ভয়ে শবব্যবচ্ছেদ করে শরীরতত্ত্ব শিখতে হতো একান্ত গোপনে। না শিখলে নতুন যুগ আনতে পারতেন না চিত্রকলায় বা ভাস্কর্যে।

নীতিনিপুণদের বিষদৃষ্টিকে উপেক্ষা করে বা তার থেকে বাঁচিয়ে থিয়েটার, অপেরা ও ব্যালে উত্তরোত্তর সমৃদ্ধ হয় ওঠে। তেমনি নগরে নগরে যাদুঘর, আর্ট গ্যালারি ও কনসার্ট হল তৈরি হয়। রেনেসাঁসের পূর্বে ধর্মীয় সঙ্গীত ও ধর্মীয় শিল্পের চর্চা ছিল। তার সঙ্গে যুক্ত হলো সেকুলার সঙ্গীত ও শিল্প। যা কিছু মানবিক তার মর্যাদা ও মূল্য অকস্মাৎ বেড়ে গেল। ধর্মের সঙ্গে পাল্লা দিল মানবিকবাদ। বিষয় সংগ্রহ করা হলো কতক প্রাচীন গ্রীক রোমক উৎস থেকে, কতক দেশবিদেশের ইতিহাস বা কিংবদন্তী বা রূপকথার ভাণ্ডার থেকে, কতক বা পরিচিত জনজীবন থেকে। শেকসপীয়ারের নাটক এই তিনটি সূত্র থেকে বিষয় আহরণ করে থিয়েটারের গতি নির্দেশ করে দেয়। এরপরে আর পিছুটান থাকে না। ধর্মনাট্য তার জনপ্রিয়তা হারায়। শেকসপীয়ারের যুগে

অভিনেত্রীর যোগদান নিষিদ্ধ ছিল। পরবর্তীকালে নারীর ভূমিকায় নারীর অধিকার স্বীকৃত হয়।

কলকাতার পত্তনের পর থেকে স্থানীয় ইংরেজ সম্প্রদায় নিজেদের জন্যে বইপত্র ও শিল্পকর্ম আমদানী করার সঙ্গে সঙ্গে সঙ্গীত নৃত্য নাটক প্রভৃতিরও আয়োজন করে। বাঙালীরা ধীরে ধীরে আকৃষ্ট হয়। প্রথমে তাদের বড়লোকদের নজরে পড়ে গাড়ী বাড়ী আর আসবাবের উপর। ঔপনিবেশিক বাস্তুরীতির অনুসরণ করতে বাধে না। তারপর খানা বাদ দিয়ে পিনার উপর। স্বয়ং জাহাঙ্গীর বাদশাহ সেটার সূত্রপাত করে দিয়ে যান কলকাতার পত্তনের পূর্বে। ইউরোপীয় চিকিৎসাবিদ্যাও প্রবেশ পায় মোগল অন্তঃপুরে। অস্ত্রশস্ত্রও আদৃত হয়। পলাশীর আগেই ভারতের মাটিতে পাশ্চাত্ত্য মিশাল জীবনযাত্রা শুরু হয়ে যায় ইউরোপীয় সমাজে তো নিশ্চয়ই, ভারতীয় হিন্দু মুসলিম সমাজেরও উপরতলায়। খ্রীস্টধর্মে আগ্রহ আকবর বাদশাহের ছিল, কিন্তু আর কারো ছিল না। অপরপক্ষে পাশ্চাত্ত্য জীবনযাত্রার প্রতি ঔৎসুক্য আরো অনেকের ছিল। তা বলে তাঁরা কেউ পরাধীন হতে চাননি।

ইউরোপীয় আগন্তুকরাও জাহাজ বোঝাই করে এদেশের মরিচমশলা শাল-দোশালা ভোগ্যপণ্য ওদেশে নিয়ে যেতেন। কেউ কেউ নিয়ে যেতেন এদেশের পুরাকীর্তি ও পুঁথিপত্র। একদা পূর্বের সঙ্গে পশ্চিমের যোগাযোগ ছিল, আদানপ্রদানও চলত। গ্রীস ভারতের কাছে নতুন নয়, ভারতও গ্রীসের কাছে নতুন নয়। তেমনি রোমও ভারতের কাছে নতুন নয়, ভারতও রোমের কাছে নতুন নয়। মাঝখানে হাজারখানেক বছর পুরানো পথঘাট বন্ধ হয়ে যায় আরবদের দাপটে। আরবরা হয়ে যায় মুসলিম আর গ্রীক-রোমানরা খ্রীস্টান। কতকটা ধর্মীয় কারণে, কতকটা অর্থনৈতিক কারণে দুই পক্ষের মধ্যে এমন রেষারেষি হয় যে গ্রীস-রোমের লোক ভারতে আসার পথ খুঁজে পায় না, ভারতের লোক গ্রীস-রোমে যাবার পথ ফিরে পায় না। বাণিজ্যটা আরবদের হাত দিয়ে হয়, ওরাও মুনাফা লোটে। শেষকালে পর্তুগালের নাবিকরা আফ্রিকার দক্ষিণ দিয়ে ভারতের দক্ষিণ-পশ্চিম উপকূলে আসতে সমর্থ হয়। তাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে আসে ভারতীয় নাবিকরাই আফ্রিকার দক্ষিণ-পূর্ব উপকূল থেকে। কী করে তারা জানবে যে খাল কেটে কুমীর ডেকে আনছে!

পর্তুগাল অবশ্য রোম নয়, ইংলণ্ডও নয় গ্রীস। এবারকার যোগাযোগটা ইউরোপের পূর্বপ্রান্তের সঙ্গে নয়, পশ্চিমপ্রান্তের সঙ্গে। কিন্তু রেনেসাঁসের কল্যাণে পূর্ব-পশ্চিম দুই প্রান্তই এক সূত্রে গাঁথা হয়ে যায়। আর পর্তুগাল ও ইংলণ্ড থেকে যারা এসে হাজির হয় তারাও ভারতের পশ্চিম প্রান্তের সঙ্গে পূর্ব প্রান্তকে সমুদ্রপথে সংযুক্ত করে। মাঝখানে সে সংযোগও আরবদের দ্বারা ছিন্নপ্রায় হয়েছিল। স্থলপথের যোগসূত্রও ছিল ক্ষীণ। ভারতবর্ষ বলতে যা বোঝাত তা ইউরোপের মতোই একটা মহাদেশ বা উপমহাদেশ। যেখানে এক রাষ্ট্র বা এক নেশন কোনোদিন গড়ে ওঠেনি। মাঝে মাঝে চক্রবর্তী রাজারা স্থাপন করেছেন সাম্রাজ্য। যেমন ইউরোপেও। সকলেই হিন্দু, এটা তেমনি একটা তথ্য

যেমন ইউরোপের সকলেই খ্রীস্টান। খ্রীস্টান হলেই একজাতি হয় না, হিন্দু হলেও একজাতি হয় না। খ্রীস্টানরা খ্রীস্টানদের বিরুদ্ধে তুর্কদের প্রশ্রয় দিয়েছে। হিন্দুরা হিন্দুদের বিরুদ্ধে পাঠান বা তুর্কদের প্রশ্রয় দিয়েছে। তুর্করা আরবদের পদানত করে। মুসলমান বলে তুর্ক আর আরব একজাতি হয় না। পরে তো খ্রীস্টধর্মী ইউরোপীয়রাই তুর্কদের হাত থেকে আরবদের উদ্ধার করে। অবশ্য নিজেদের স্বার্থে। এখন আর কেউ আরব তুর্ক ভাই ভাই বলে না।

ইউরোপের রেনেসাঁস বাণিজ্যসূত্রে সমুদ্রপথে ভারতের উপকূলে পৌঁছয়। কিন্তু পর্তুগালের ধর্মান্ধতা তাকে রেনেসাঁসের বাহক করে না। করে ইংলণ্ডকে, ফ্রান্সকে। তাই রেনেসাঁসের প্রধান পীঠ হয় কলকাতা, মাদ্রাজ, বোম্বাই, সেই-সঙ্গে পণ্ডিচেরী। ফরাসীরা ইংরেজদের কাছে হেরে যাবার পর পণ্ডিচেরীর প্রাধান্য হ্রাস পায়। কলকাতা ইংরেজদের রাজধানী হবার পর থেকে কলকাতার প্রাধান্য বৃদ্ধি পায়। বাঙালীরা এই আকস্মিকতার সুযোগ লাভ করে। এটা দৈবলব্ধ। এর জন্যে তাদের আত্মপ্রসাদ সাজে না। তাদের কৃতিত্ব এইখানে যে তারাই সর্বপ্রথম উপলব্ধি করে সাগরপারের সঙ্গে যোগাযোগ তাদের রূপকথার রাজপুত্রদের স্বপ্ন সার্থক করবে। তারা সাত সমুদ্র তেরো নদী পেরিয়ে দেশ দেশান্তরে যাবে। যেমন যেত জাভায় সুমাত্রায় সিংহলে। কে জানে কতকাল আগে!

ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের চেয়ে বাংলাদেশেই যে রেনেসাঁস সবচেয়ে বেশী জমল তার কারণ ওই সাগরপারের স্বপ্ন। রামমোহনকে, দ্বারকানাথকে যা অস্থির করে তুলল। মধুসূদনকে তো খ্রীস্টান করে ছাড়ল। সাগরপারের আকর্ষণ এত তীব্র না হলে এঁরা সাগরপারের চিন্তার ও বিদ্যার প্রতি এত সহজে আকৃষ্ট হতেন না। এঁদের প্রত্যেকের মধ্যে স্বাদেশিকতা প্রবল ছিল। এঁরা কেউ ঘরের থেকে বিযুক্ত হতে চাননি। অথচ বাইরের সঙ্গে যুক্ত হতে ব্যাকুল হয়েছিলেন এঁরা ও এঁদের মতো আরো অনেকে।

গ্রহণ করার ইচ্ছা না থাকলে, লোক না থাকলে ইউরোপীয়রা যা বহন করে নিয়ে এল তা কলকাতা শহরের সাহেবপাড়ায় তাদেরি কাজে লাগত। তাদের দীপশিখা থেকে আর কারো দীপসলিতায় সঞ্চারিত হতো না। দেশের মন প্রস্তুত না থাকলে বহিরাগত জ্ঞান বা শিল্পরস কোথাও ফুল ফোটায় না, ফল ধরায় না। ইউরোপেও এক দেশ থেকে অপর দেশে সঞ্চারিত হতে অনেক সময় লেগেছে। রাশিয়ার রেনেসাঁস ভারতের রেনেসাঁসের সমকালীন। জাপানের রেনেসাঁস আরো পরবর্তীকালের।

নতুন আইডিয়ার জন্যে বাংলার মন প্রস্তুত ছিল। পুরুষানুক্রমিক সংস্কৃত ও পারসিক প্রস্তুতির কাজ করে রেখেছিল। বহুকালের কর্ষিত ক্ষেত্রে নতুন বীজ বপন করতে না করতেই তা অঙ্কুরিত হলো। সাত সমুদ্র পারের অচেনা ভাষা অচেনা ভাব আত্মসাৎ করতে এক পুরুষও লাগল না। দেখা গেল ডিরোজিওর শিষ্যরা ইংরেজীতে কবিতা ও প্রবন্ধ লিখছেন সহজাত প্রতিভার

সঙ্গে। অথচ স্বদেশপ্রেম বিসর্জন না দিয়ে। টমাস পেইনের 'যুক্তির যুগ' বইখানি প্রথমে এক টাকা দামে, তারপর পাঁচ টাকা দামে বিকোয়। পাঠকদের কাছে দেশ যেমন প্রিয় যুগও তেমনি। দেশকে বাদ দিয়ে যুগ নয়. যুগকে বাদ দিয়ে দেশ নয়। হিন্দু কলেজের ছাত্ররা যুগের সঙ্গে মন মিলিয়ে নেয়। মানুষের মন দেশের বেড়া মানে না। সমকালীন মনের সঙ্গে সাযুজ্য অন্বেষণ করে। তার জন্য যে পারে সশরীরে সাগর পাড়ি দেয়। যে পারে না সে ঘরে বসেই সাগরপারের হাওয়া খায়। এর নীট ফল একপ্রকার "সী চেঞ্জ"।

আমাদের যে রেনেসাঁস সেটা একপ্রকার "সী চেঞ্জ"। সামুদ্রিক পরিবর্তন। একে কয়েকজন উচ্ছৃঙ্খল অনাচারী তরুণের অপকর্ম বলে উড়িয়ে দেওয়া বা বাড়িয়ে দেখা কোনটাই যথার্থ নয়। যে মদ এদের মাতাল করেছিল সেটা নতুন বিদ্যা, নতুন ভাব, নতুন আইডিয়া, নতুন প্রকাশভঙ্গী, নতুন জীবনযাপনের ধারা। কয়েক শতক আগে ইটালীতে বা ইংলণ্ডেও অনুরূপ দেখা গেছে। সময়কালে রাশিয়াতেও লক্ষিত হয়েছে। সেই মুহূর্তে উৎসাহীদের খেয়াল ছিল না যে দেশটা পরাধীন বা সমাজটা জমিদারদের অধীন। রেনেসাঁসের উদয়লগ্নে কোথাও কারো খেয়াল থাকে না। পরবর্তীকালে উন্মাদনা কেটে যায়। যেটা থেকে যায় সেটা ওই "সী চেঞ্জ"। রূপান্তর একবার ঘটলে আর অঘটিত হয় না। পাল্টা যেটা ঘটে সেটা একপ্রকার কাউণ্টার-রেনেসাঁস। এদেশে সেটা রিভাইভালের আকার নেয়। দেশের লোক স্বদেশচেতন, অতীতসচেতন, অধীনতাসচেতন, শোষণসচেতন হয়। কিন্তু ওই সামুদ্রিক পরিবর্তনটাকে ঝেড়ে ফেলতে পারে না। ওটা অঙ্গীভূত হয়ে গেছে।

আমাদের রেনেসাঁসের দুর্বলতা এখানে নয় যে ওটাতে জনগণের যোগ ছিল না। কোন্ দেশের রেনেসাঁসেই বা ছিল? আমাদের রেনেসাঁসের অপরাধ এখানেও নয় যে ওটা পরাধীন দেশের ও ফিউডাল সমাজের ফসল। একই অপরাধ অন্যত্রও দেখা যায়। কেউ কি বলতে পারেন যে স্বাধীন ভারতে ও শ্রেণীশূন্য রাশিয়ায় নতুন এক রেনেসাঁস ঘটেছে? গণচীনের খবর কি কেউ রাখেন?

তা নয়। আমাদের রেনেসাঁসের দুর্বলতা এইখানে যে ওর কোনো ক্লাসিকাল বনেদ ছিল না। ইউরোপীয় রেনেসাঁসের ছিল। সেটা প্রাচীন গ্রীসের বনেদ। রামমোহন প্রাচীন ভারতের সঙ্গে অন্বয় রক্ষা করতে চেয়েছিলেন ধর্মে। বিদ্যাসাগর প্রাচীন ভারতের সঙ্গে অন্বয় রক্ষা করতে চেয়েছিলেন সমাজে। বাংলা গদ্যের পথিকৃৎরা অন্বয় রক্ষা করতে চেয়েছিলেন ভাষায়। সংস্কৃতানুসারী ভাষায়। কিন্তু কলেজে গিয়ে যাঁরা নতুন বিদ্যার পাঠ নিতেন তাঁদের সকলের আদর্শ ছিল ইংরেজী কাব্য নাটক উপন্যাস ও প্রবন্ধ। তাঁদের আদর্শ ছিল ইউরোপীয় থিয়েটার, চিত্রকলা, ভাস্কর্য, বাস্তুরীতি, উদারনীতি। পরবর্তীকালে এর বিরুদ্ধে একটা স্বদেশী বিদ্রোহ দেখা দেয়। কিন্তু বিদ্রোহীরাও ক্লাসিকাল বনেদ খুঁজে পেলেন না। কতকগুলি ছবি আঁকা হলো পৌরাণিক বিষয়ে, কিন্তু যে ধারায় আঁকা হলো সেটা কি দু'হাজার বছরের পুরাতন ধারা? পুরাণ যে

যুগের সে যুগের ? ভাগ্যক্রমে অজন্তা আবিষ্কৃত হয়। কিন্তু অজন্তার আদর্শে যা আঁকা হলো তার বিষয় কি বৌদ্ধ জাতক ? একালের চিত্রকররা আবার আধুনিক ইউরোপের দিকে মুখ ফিরিয়েছেন। যাঁরা লোকচিত্র বা পটচিত্র নিয়ে আছেন তাঁদের সেটা ক্লাসিকাল বনেদ নয়।

আমাদের রেনেসাঁসের দুর্বলতা এখানেও নয় যে তার জ্ঞানবিজ্ঞানের বিকাশ পশ্চিমের তুলনায় বিলম্বিত ও খর্বাঙ্গ। এই দেড় শতাব্দীতে জ্ঞানবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এদেশে প্রচুর কাজ হয়েছে। আমরা খুব বেশী পৌছিয়ে নেই। তেমনি সাহিত্যেও কাজ যা হয়েছে তার চেয়ে বেশী এত কম সময়ের মধ্যে হতো না। বঙ্কিম মধুসূদন রবীন্দ্রনাথের মতো সৃষ্টি যে কোনো দেশের আধুনিক সাহিত্যে বিরল। আমাদের রেনেসাঁসের দুর্বলতা এইখানে যে তার শিল্পের দিকটা কাঁচা। যা নিয়ে আমরা গর্ব করি তা হয় প্রাচীনের হুবহু অনুকরণ বা অনুসরণ, যেমন কথাকলি বা ভারতনাট্যম্ বা মার্গসঙ্গীত। আর নয়তো লোকনৃত্য বা লোকগীতি বা লোকনাট্য। তার সঙ্গে ধর্মের সম্পর্ক অতি নিবিড় ও অতি পুরাতন। মধ্যযুগের মতোই। শিল্পে নতুন যুগ এসেছে, যেমন বিদ্যায় ও সাহিত্যে নতুন যুগ এসেছে, একথা বলতে পারি কি আমরা! যেটুকু এসেছে সেটুকু পশ্চিমী প্রকৃতির ও পদ্ধতির।

তাছাড়া এটাও মনে রাখতে হবে যে মধ্যযুগের খ্রীস্টীয় ইউরোপে যেসব বিষয় ও যে সব রীতি শিল্পীর পক্ষে নিষিদ্ধ ছিল মধ্যযুগের ইউরোপে সেসব নিষিদ্ধ ছিল না। মন্দিরচিত্র বা মন্দির ভাস্কর্যেও শিল্পীরা নরনারীর বর্ণনা করেছে। গোপীদের বস্ত্রহরণের দৃশ্যে নগ্নতার কতটুকু বাকী ছিল! রাধাকৃষ্ণের প্রেম ও প্রেমের অভিব্যক্তি শিল্পীদের যে অসীম স্বাধীনতা দিয়েছিল সে স্বাধীনতা সমসাময়িক ইউরোপে অকল্পনীয়। তাই রেনেসাঁসের বন্ধনমুক্তির প্রশ্নই ওঠেনি হিন্দুশাসিত ভারতে। মুসলিমশাসিত ভারতেও রাজপুত সামন্তরা তাঁদের শিল্পীদের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করেননি। তবে যেখানে মন্দির নির্মাণ একেবারেই বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে সেখানে মন্দির ভাস্কর্য বা মন্দিরচিত্রও বন্ধ হয়ে গেছে। সেটা ইউরোপের মতো ব্যাপক ক্ষেত্রে নয়। দক্ষিণ ভারত ছিল হিন্দু শাসনে। আর মুসলিম শাসনও সর্বত্র অনুদার ছিল না।

শিল্পের মুক্তির জন্যে রেনেসাঁসের প্রয়োজন এদেশের ইতিহাসে ছিল না, যেমন ছিল ইউরোপের ইতিহাসে। তাহলে কি রেনেসাঁস বলতে যা বোঝায় তা এদেশের শিল্পের ক্ষেত্রে একেবারেই ঘটেনি বা ঘটবে না ? না, একটু লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে যে আমাদের আধুনিক শিল্পীরা কেউ দশানন বা পঞ্চানন আঁকেন না। দশভুজা বা চতুর্ভুজা গড়েন না। যা পূজার সময় ফরমাস দিয়ে গড়িয়ে নেওয়া হয়। ওকে ভাস্কর্যের নমুনা বলা হয় না। আর্ট থেকে অতিপ্রাকৃত অন্তর্হিত হয়েছে। প্রকৃতির হুবহু অনুকরণ কেউ চায় না, কিন্তু প্রকৃতিকে উপেক্ষা করার উপায় নেই। এই পরিবর্তনটা এদেশে ইউরোপের রেনেসাঁসের ধারা বেয়ে এসেছে, প্রাচীন ঐতিহ্যের ধারা বেয়ে নয়।

জীবনের সমূহ বিভাগের সর্বাঙ্গীণ বিকাশ কোথাও কোনোকালে একসঙ্গে

ঘটেনি। সামগ্রিক পরিবর্তনও এক আধ শতাব্দীর ব্যাপার নয়। পাঁচ শতাব্দী-কালও ইউরোপের পক্ষে যথেষ্ট হয়নি। আমাদের নতুন বিদ্যার প্রবর্তনের পর তো দেড় শতাব্দীও কাটেনি। একে যদি তিন ভাগে বিভক্ত করি তো এর প্রথম পর্বটা আধুনিক ইউরোপের সঙ্গে জ্ঞানবুদ্ধি মিলিয়ে নেওয়ায়। দ্বিতীয় পর্বটা প্রাচীন ভারতের সঙ্গে চেতনা মিলিয়ে নেওয়ায়। তৃতীয় পর্বটা অভূতপূর্ব গণজাগরণের সঙ্গে ছন্দ মিলিয়ে নেওয়ায়। প্রথমটার অস্তিত্ব এখনো অনুভব করা যায়। সেটা এখনো অতিক্রান্ত হয়নি। দ্বিতীয়টাও যে সমাপ্ত হয়েছে তা নয়। প্রাচীনের চেয়ে আরো প্রাচীনের আবিষ্কার প্রতিনিয়ত চলেছে। তৃতীয়টার তো সবে সূত্রপাত। তিনটি পর্ব যেন তিনটি স্রোত। পাশাপাশি প্রবহমাণ। একটির সঙ্গে আরেকটির সংযোগও ঘটছে, সংঘর্ষও। গতি ও প্রতিক্রিয়া উভয়ই সজীব।

রেনেসাঁসের মহত্ত্ব এইখানে যে স্বর্গ ও নরক, পরলোক ও পরকালের চিন্তা ছেড়ে দিয়ে মানুষ রিয়ালিটির সন্ধানে লেগে যায়। ইহলোকে ও ইহকালে পরিপূর্ণ জীবনই হয় তার আদর্শ। সেটা যেমন ব্যক্তির বেলা তেমনি সমষ্টির বেলা। পরিপূর্ণ জীবনের মধ্যে দেহেরও অংশ আছে, মনেরও আছে, হৃদয়েরও আছে, বিবেকেরও আছে। কিন্তু কেবলমাত্র আত্মার পরিত্রাণের উপর জোর দিতে গিয়ে এদের যথাযোগ্য গুরুত্ব দেওয়া হতো না। রেনেসাঁস এদেরও গুরুত্ব দেয়। এদের গুরুত্ব দিতে গিয়ে হয়তো আত্মার পরিত্রাণের প্রশ্নটাকে যথাযোগ্য গুরুত্ব দেয় না। এতকাল যাঁরা গুরুজন ছিলেন তাঁদের গুরুত্ব হ্রাস পায়। তবে রেনেসাঁস রেভলিউশন নয় যে ঈশ্বরকে বা ঈশ্বরের পুত্রকে বা তাঁর চার্চকে বা প্রতিনিধিকে সরাসরি অস্বীকার করবে। রেনেসাঁস রেফরমেশনও নয় যে ঈশ্বরকে ও তাঁর পুত্রকে রেখে রোমান ক্যাথলিক চার্চকে ও পোপকে সরাসরি অস্বীকার করবে। এসব পরবর্তীকালের বিবর্তন। পাশ্চাত্য রেনেসাঁসের আদিপর্ব বিশ্বাসী খ্রীস্টানদের পৃষ্ঠপোষকতা উপভোগ করেছিল।

রেনেসাঁসের সময় থেকে ইউরোপে যা হিউমানিজম বা মানবিকবাদ বলে অভিহিত হয় তারও পরবর্তীকালে বিবর্তন ঘটেছে। সেকালের মানবিকবাদীরা মানবের পরিপূর্ণ বিকাশে উৎসাহী হলেও মানবসত্যের সঙ্গে সঙ্গে ঐশ সত্যেও বিশ্বাস করতেন। একালের মানবিকবাদীদের মধ্যে তাঁরাও যেমন আছেন তেমনি আরো আছেন একদল যাঁরা ঐশকে মানবের জ্ঞানবুদ্ধির অতীত বা প্রমাণাতীত বলে মানবিক ব্যাপারের বাইরে রাখতে চান বা স্রেফ অস্বীকার করেন। এঁদের মতে মানুষের কাজ মানুষকে নিয়েই থাকা। আর মানুষের বাইরের ও ভিতরের প্রকৃতিকে। ভাগবত সত্তাকে নিয়ামক বলে স্বীকার করলে মানুষের আত্মশক্তির বিকাশই মানুষকে একদিন সর্বশক্তিমান করবে। জীবনকে করবে জরাব্যাধি-মুক্ত। সংসারকে অভাবশূন্য।

রেনেসাঁসের পূর্বেও শোনা গেছে 'সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই'। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে একথাও শোনা গেছে যে, 'এই মানুষে আছে সেই মানুষ'। তার মানে ভগবানকে মানুষ বলে গণ্য করা হয়েছে। মানবিকবাদ

মানুষকে বরাবরই উচ্চস্থান দিয়ে এসেছে, কিন্তু রেনেসাঁসের পর যে প্রকৃষ্ট স্থান দেয় তা সাধুসন্ত আউল বাউল সুফী মিস্টিকদের দেওয়া স্থান নয়, ঐতিহাসিক বৈজ্ঞানিক দার্শনিক সাহিত্যিক শিল্পীদের দেওয়া। বাইবেল বর্ণিত বিষয়ে ছবি আঁকা মূর্তি গড়া ধীরে ধীরে অচলিত হয়ে যায়। আমাদের দেশেও পৌরাণিক বিষয়ে ছবি আঁকা মূর্তি গড়া ধীরে ধীরে কমে আসছে। অবশ্য ওটা যাঁদের চিরাচরিত বৃত্তি তাঁদের কথা আলাদা।

রেনেসাঁসের পরেই মানুষ ইউটোপিয়ার স্বপ্ন দেখতে আরম্ভ করে। এমন এক রাজ্যের যেখানে সকলেই স্বাধীন, সকলেই সুখী, জীবনের সম্পদ সকলের ভাগ্যে, কেউ বঞ্চিত নয়। যেখানে আইন নিখুঁত, রাজনীতি নিখুঁত, অর্থনীতি নিখুঁত, কেউ কাউকে ফাঁকি দেয় না, শোষণ বা শাসন করে না। যেখানে অপরাধ ঘটে না, অন্যায় ঘটে না, মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্বন্ধ স্বাভাবিক সৌহার্দ্যের। যেসব আদর্শ এতকাল স্বর্গের জন্যে তোলা ছিল এখন মর্ত্যের জন্যেও প্রত্যাশা করা হলো। প্রত্যাশাটা স্বর্গের দেবতাদের কাছে নয়, মর্ত্যের প্রভুদের কাছে। স্বর্গের দেবতাদের সরানো যায় না, মর্ত্যের প্রভুদের উপর হতাশ হলে তাদের সরানো যায়। পুরাতন সমাজব্যবস্থাকে পাল্টানো যায়। পুরাতন বলে সে সনাতন নয়। মানুষের জন্যেই তার স্থিতি, তার জন্যে মানুষের স্থিতি নয়।

রেনেসাঁসের সময় থেকে ইউটোপিয়ার স্বপ্ন একভাবে না একভাবে মানুষকে প্রবৃত্ত করেছে এমন সব কর্মে যা পরলোকে বা পরকালে কাজে লাগবে না। যা এই জগৎটাকেই ও এই জীবনকেই আর একটু উপভোগ্য করবে, অন্তত আর একটু কষ্টশূন্য। ধর্মের মধ্যেও সমাজকল্যাণের নির্দেশ ছিল, কিন্তু মানবিকবাদে যে নির্দেশ ছিল তা আত্মার পুণ্যের জন্যে নয়, তা ঈশ্বরের প্রীতির জন্যে নয়, তা মানবিক পূর্ণতার জন্যে। পারফেকশান তার লক্ষ্য। মানুষ বিশ্বাস করতে আরম্ভ করল যে প্রকৃতিকে বশ করতে পারলে এই জগতেই লক্ষ্যভেদ করা সম্ভব। ধর্ম বলে আসছিল অন্তঃপ্রকৃতিকে বশ করতে। বিজ্ঞানের কাছে তাঁদের অসীম প্রত্যাশা।

রেনেসাঁসের মানুষ বলতে বোঝায় সাধুসন্ত বা মিস্টিক নয়, সবজান্তা ও সব্যসাচী মানুষ যাঁরা এই পৃথিবীকে প্রতিদিন বদলে দিচ্ছেন আরো সুন্দর ও আরো উপভোগ্য পৃথিবীর জন্যে। সফল হয়তো হচ্ছেন না, কিন্তু বিফলতাও সফলতার সোপান। তাঁদের বিশ্বাস একালে যা হলো না ভাবীকালে তা হবে। ভাবীকাল মানে পরকাল নয়। তেমনি এ পুরুষে যা হলো না পরবর্তী পুরুষে তা হবে। পরবর্তী মানে পরজন্ম নয়। রেনেসাঁস যেদেশে ঘটে সেদেশের মানুষকে ইহলোকের উপরেই সমস্ত শক্তি নিয়োগ করতে প্রবর্তনা দেয়।

ঠিক এই অর্থে রেনেসাঁস ভারতের মাটিতে হয়েছে, না মাটির গুণে অন্য রূপ নিয়েছে সেটা বিতর্কের বিষয়। কিন্তু এবিষয়ে সন্দেহ নেই যে রামমোহন থেকে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত এমন কয়েকজন মানুষ এদেশে জন্মেছেন যাঁদের বলা যেতে পারে রেনেসাঁস যুগের মানুষ। এঁরা না হলে রেনেসাঁস হতো না, রেনেসাঁস না হলে এঁরা হতেন না। রেনেসাঁস স্বীকার না করলে এঁদের জীবনের

কোনো ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না, মনে হয় এঁরা প্রক্ষিপ্ত। স্বীকার করলে ব্যাখ্যা মেলে, লক্ষণ মিলে যায়।

রামমোহন থেকে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত বহমান যে ধারা সে ধারা অষ্টাদশ শতাব্দীর বাংলার বা ভারতের সঙ্গে ধারাবাহিক নয়। তার ধারাবাহিকতা খুঁজতে হলে যেতে হয় পশ্চিমমুখে আধুনিক ইউরোপে ও অতীত মুখে প্রাচীন ভারতে। তাঁদের প্রত্যেকেই ছিলেন যুগের দিক থেকে আধুনিক আর দেশের দিক থেকে বাঙালী বা ভারতীয়। ভারতচন্দ্র বা রামপ্রসাদ তো আধুনিক ছিলেন না। কার কাছ থেকে তাঁরা তাঁদের আধুনিক ধারা পেতেন, যদি ইউরোপীয় জ্ঞান-বিজ্ঞান কাব্য উপন্যাসকে বিদেশী বা সাম্রাজ্যবাদী বা ধনতন্ত্রী বলে বর্জন করতেন? ভারতীয় জ্ঞানবিজ্ঞান কাব্য উপন্যাস বলতে যা ছিল তা মান্ধাতার আমলের। সেই মজা নদী থেকে যা পাবার তা ভারতচন্দ্র রামপ্রসাদরাও পেয়েছিলেন। রামমোহন থেকে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত যদি তার বেশী ও তার থেকে ভিন্ন কিছু না পেতেন তাহলে তাঁরাও হতেন মধ্যযুগের সামিল। তাঁদের কীর্তিও হতো সেই ধরনের ও সেই মাপের।

আমাদের পরম সৌভাগ্য যে তাঁরা গতানুগতিকের স্রোতে গা ভাসিয়ে দেননি। আর সে স্রোতও তো মজা নদীর স্রোত। গা ভাসাতে চাইলেও গা ভাসে না। যেমন ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের কবিতা। দুকূল ভাসানো এক প্লাবনের প্রয়োজন ছিল। সেটা স্বদেশ থেকে নয়, অতীত থেকে নয়, বিদেশ থেকে ও আধুনিক যুগ থেকেই আসতে পারত। দেশ মোগলশাসিত হলেও আসত। মারাঠাশাসিত হলেও আসত। আধুনিক জ্ঞানবিজ্ঞানকে বর্জন করে কোনো দেশই নতুন কিছুই করতে পারত না। গতানুগতিকে লোকের অরুচি জন্মাত। রাজনৈতিক অর্থে স্বাধীন ও অর্থনৈতিক অর্থে স্বাবলম্বী হলেও সংস্কৃতির রূপান্তরের জন্যে ভারতের জ্ঞানী বিজ্ঞানী ও ঔপন্যাসিকরা দেশের চারদিকের জানালা দরজা খুলে বাইরের আলো হাওয়াকে আমন্ত্রণ জানাতেন ও নিজেরাই তার খোঁজে বেরিয়ে পড়তেন। যেটা আবশ্যক সেটা কেমন করে হয়েছে তার চেয়ে বড় কথা সেটা যথাকালে হয়েছে। নইলে রামমোহনের নাম কে জানত, বিদ্যাসাগরের কথা কে শুনত! মাইকেল বঙ্কিম রবীন্দ্রনাথের প্রতিভাও রামপ্রসাদ ভারতচন্দ্রের প্রতিভার মতো গৃহকোণের হতো। হতো অষ্টাদশ শতাব্দীর মতো সেকেলে।

ঘটনাচক্রে গ্রীক পণ্ডিতদের কনস্টান্টিনোপল থেকে ইতালীতে শরণার্থী হয়ে আগমন যেমন সেদেশে রেনেসাঁসের সূচনা করে তেমনি ঘটনাচক্রে ইংরেজ বণিকদের বাংলাদেশে শাসনভার গ্রহণ ও তাদের নতুন বিদ্যার প্রতি এদেশের ভদ্রলোক শ্রেণীর আকর্ষণ এদেশে রেনেসাঁসের সূত্রপাত করে। আপাতদৃষ্টিতে যা ঘটনাচক্র ইতিহাসের বিচারে সেটা যুগপরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তা। মধ্যযুগ মানুষকে নিশ্চয়ই অনেক দূর এগিয়ে দিয়েছিল, ইউরোপের গথিক ক্যাথিড্রাল ও ভারতের দেবমন্দির তার সাক্ষী। কিন্তু মানবের অগ্রগতি সেইখানেই রুদ্ধগতি হতো, যদি সে আধুনিক যুগে পদার্পণ না করত। ইউরোপের রেনেসাঁস তাকে

আধুনিক যুগে রূপান্তরিত করে। তেমনি ভারতের রেনেসাঁস ভারতকে করে আধুনিক যুগে যুগান্তরিত। যুগান্তরিত যে হয় সে ধীরে ধীরে রূপান্তরিত হয়। রেফরমেশন, এনলাইটেনমেণ্ট প্রভৃতি পর্যায়ের ভিতর দিয়ে যায়। তবে একই রকম ভাবে নয়, একই অর্থে নয়।

যে রেনেসাঁস চার শতাব্দীকাল সময় পেয়েছে ও যে রেনেসাঁস সবে আরম্ভ হয়েছে তাদের একটির সঙ্গে অপরটির তুলনা করলে দ্বিতীয়টিকে নিষ্প্রভ মনে হবেই। তাছাড়া ইউরোপের পরিমণ্ডল ও ভারতের পরিমণ্ডল তো এক নয়। ইতিহাস ও ভূগোল, সমাজ ও ধর্ম, জাতি ও বর্ণ তাদের বিভিন্ন করেছে। তবে কিছু প্রচ্ছন্ন মিলও ছিল। সংস্কৃত ও লাটিন ভাষা সুদূর অতীতে এক পরিবারের ভাষা ছিল। আর সেই পরিবারটির আদিভূমি ছিল সম্ভবত একই। আদিভূমি যেখানেই হোক সেটার স্মৃতি কোনো পক্ষেরই নেই। ভারতীয়দের বিশ্বাস ভারতই সেই আদিভূমি। তাই যদি হয়ে থাকে তবে ইংরেজরা আমাদের ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে এসেছে। যা নিয়ে এসেছে সেটা সম্পূর্ণ পরকীয় নয়। বেশ চেনা-চেনা ঠেকছে।

রামমোহন রায় বা সার উইলিয়ম জোন্স অনাত্মীয়তা বোধ করেননি। একজন প্রাচ্যের প্রতি ও অপরজন পাশ্চাত্যের প্রতি জ্ঞাতিসুলভ মনোভাব পোষণ করেছিলেন। একজনের কৌতূহল প্রাচীনের প্রতি, অপরজনের আধুনিকের প্রতি। অবশ্য এটাও ঠিক যে একজন হলেন স্বাধীন দেশের লোক ও অপরজন পরাধীন দেশের। কিন্তু সেটাই কি একমাত্র গণনা? রামমোহনও তো ভাবতে পারতেন যে তিনি অতি প্রাচীন দেশের সন্তান, তাঁর উত্তরাধিকার পরাধীনতার দ্বারা আচ্ছন্ন হবার নয়। আর পরাধীনতাও তাঁর দেশের পক্ষে মঙ্গলের হতে পারে। বিধাতা কতভাবেই না নিজের কাজ করে যান। আর যে ব্যক্তি বর্ণে ব্রাহ্মণ সে ব্যক্তি যদি বর্ণে শ্বেত না হন তো কী আসে যায়! বা বর্ণও তো একদিক থেকে শ্রেষ্ঠ।

রামমোহনের মধ্যে, দ্বারকানাথের মধ্যে, বিদ্যাসাগরের মধ্যে যে মর্যাদাবোধ ছিল তা সমকক্ষের। তাঁরা মাথা উঁচু রেখেই করমর্দন করেছিলেন। তবে অযথা শ্রেষ্ঠতার বড়াই করেননি। ভারত সব বিষয়েই বড়ো এটা তাঁদের বক্তব্য ছিল না। সিপাহী বিদ্রোহের পরে ইংরেজদের ব্যবহার বদলে যায়। তারা ভারতীয়দের মর্যাদা-বোধে আঘাত করে। যে ব্যক্তি বর্ণে ব্রাহ্মণ সে ব্যক্তিও তাদের চোখে কৃষ্ণবর্ণ। যে ব্যক্তি মোগল ঘরানা বা রাজপুত্র ঘরানা সে ব্যক্তিও তাদের চোখে নিম্নবর্ণ। 'হোয়াইট ম্যানস ব্যার্ডন' বা 'লেসার ব্রীডস' শুনলে কার না রক্ত গরম হয়ে ওঠে! অসহযোগই তখন মর্যাদারক্ষার স্বাভাবিক নীতি। নিতান্ত দায়ে না ঠেকলে কেউ কাছে যেতেও চায় না, সেলাম করতেও চায় না, শিখতেও চায় না, শেখবার কিছু আছে এটা স্বীকার করতেও চায় না। এমনি করে দেশাভিমান ও জাত্যাভিমান জন্মায়। বর্ণবিদ্বেষ দেখা দেয়। যাঁরা ইংরেজ শাসনকে বিধাতার বিধান বলে স্বাগত জানিয়েছিলেন তাঁদের পৌত্ররাই তাকে শয়তানের শাসন বলে বর্জনের সংকল্প নেন।

পরবর্তী কালকে পূর্ববর্তী কালের উপর আরোপ করা উচিত নয়। সকালবেলা যেটা নিয়ে উৎসাহ বিকেলবেলা সেটা নিয়ে অবসাদ। সকালবেলা জোয়ার বিকেলবেলা ভাটা। দেশের ইতিহাসেও একই ব্যাপার। রেনেসাঁসের জোয়ার নেমে যাবার পর ভাটার সময় আসে। তখন তার সমালোচনা শুরু হয়ে যায়। যারা তার কাছে আরো অনেক কিছু আশা করছিল তারা হতাশ হয়। যাদের বদ্ধ-ধারণাগুলো তার কাছ থেকে ধাক্কা খেয়েছে তারা তাকে ক্ষমা করে না। রেনেসাঁস মানুষকে দেবতাও করে না, দানবও করে না। সে দেবতাও মানে না। তার অধ্যয়নের বিষয় হচ্ছে মানুষ আর বিশ্বপ্রকৃতি, ইহলোক আর ইহকাল। পার তো এইখানেই সে আদর্শ জগৎ গড়ে তুলবে। না পারে তো বাস্তবকে নিয়েই ঘর করবে। সমালোচকরা এতে সন্তুষ্ট নন। তাই দুই দিক থেকে কথা শুনতে হয়।

পূর্ববর্তী কালে ইংরেজ শাসন ছিল এক জিনিস রেনেসাঁস ছিল আরেক। ব্রিটিশ অধিকৃত সব অঞ্চলে রেনেসাঁস হয়নি, হয়েছিল যেখানে একদল অগ্রদূত ছিলেন। পরবর্তী কাল একথা ভুলে যায়। তার দৃষ্টিতে রেনেসাঁস ও ইংরেজ শাসন একাকার। আরো পরবর্তী কালের চোখে ইংরেজ ও বুর্জোয়ার পিণ্ড রেনেসাঁসের ঘাড়ে চাপানো হয়। তখন সে আর রেনেসাঁস বলে স্বীকৃতি পায় না। সেটা তাহলে কী? একটা বিভ্রম? ইংরেজ আর বুর্জোয়া তো আরো অনেক অঞ্চলে ছিল। কোথায় তাদের রেনেসাঁস? মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে বড়লোকের অভাব তো ছিল না। ওরাও বাস করত ইংরেজ শাসনে। কোথায় ওদের রেনেসাঁস? আসলে ইংরেজ শাসন ও রেনেসাঁস এক জিনিস নয়, বুর্জোয়া প্রাধান্য ও রেনেসাঁস নয় এক জিনিস।

যে দেশ যত প্রাচীন নবীনত্বের প্রয়োজন তারই তত বেশী। তাকেই যুগে যুগে নবীন হয়ে উঠতে হয়। সে নবীনত্ব বাইরের সাজবদল বা খোলসবদল নয়। অন্তরে যদি রং ধরে তাহলেই তা নবীনত্ব। ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাংলাদেশের তথা ভারতের অন্তরেও রং ধরেছিল, শুধু আপিসে আদালতে বা দোকানে বাজারে নয়। বাইরে থেকে কতবার কত বিদেশী এসেছিল, কেউ বা লুটপাট করতে, কেউ বাণিজ্য করতে, কেউ রাজত্ব করতে। বাইরে থেকে এলেও তারা একই যুগের মানুষ। তারা সমকালীন। কিন্তু এই প্রথম দেখা গেল তারা ভিন্ন যুগে বাস করে, তারা আধুনিক যুগের মানুষ। আর তাদের তুলনায় ভারতের লোক তিন চার শতাব্দী পেছিয়ে রয়েছে। আধুনিক যুগে পৌঁছয়নি। এই যে কালগত ব্যবধান এটা দেশগত ব্যবধানের চেয়ে দুরতিক্রম্য। একে অতিক্রম করার একমাত্র উপায় কালোপযোগী শিক্ষা ও সম্ভব হলে সমুদ্রযাত্রা। কালোপযোগী শিক্ষাই অন্তরে রং ধরায় ও সমুদ্রযাত্রা সেই রংকে আরো উজ্জ্বল করে।

যাঁরা কালোপযোগী শিক্ষাও গ্রহণ করেননি, সমুদ্র পার হয়ে দেশভ্রমণও করেননি তাঁরা আধুনিক যুগের মানুষই নন। ঊনবিংশ শতাব্দীতে দেহধারণ করলেও তাঁদের মন মধ্যযুগীয়। এঁরাও বই কাগজ লেখেন। সাহিত্যের ইতিহাসে এঁদেরও স্থান আছে। কিন্তু রেনেসাঁসের প্রবাহ এঁদের নিয়ে নয়।

যাঁরা মনেপ্রাণে আধুনিক তাঁরাই রেনেসাঁসের পথিকৃৎ পথিক। রামমোহনের ঘরোয়া পড়াশুনা ছিল কালোপযোগী ও অতিসহজেই তিনি বহু শতাব্দী অতিক্রম করে উনবিংশ শতাব্দীতে উপনীত হয়েছিলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়েরও ঘরোয়া পড়াশুনা ছিল ইংরেজী। সমুদ্রযাত্রা অবশ্য তাঁর বেলা ঘটেনি। তবে ইউরোপীয়দের সঙ্গে তাঁর মেলামেশা ছিল। সেটাই সমুদ্রযাত্রার কাজ করত।

উনবিংশ শতাব্দীতে সেই নবীনত্ব আসে যা দ্বাদশ শতাব্দীতে তুর্কদের সঙ্গে আসেনি। সে সময় এসেছিল আরবী ফরাসী শিক্ষা। সে শিক্ষা বিদেশী হলেও আধুনিক ছিল না। ছিল মধ্যযুগীয়। কয়েকটা বিষয়ে কিছু উনিশ-বিশ ছিল। কিন্তু ইংরেজী শিক্ষার মতো সব বিষয়ে অগ্রসর নয়। আরবী ফরাসী শিক্ষাও ছিল থিয়োলজি কবলিত। কারো সাধ্য ছিল না স্বাধীনভাবে চিন্তা করে বা প্রকাশ করে। আবিষ্কার, উদ্ভাবন, পরীক্ষা নিরীক্ষা প্রয়োগ থিয়োলজির সঙ্গে বিরোধ ডেকে আনত। সে বিরোধে পুরাতন বিশ্বাসের জিত নিশ্চিত। আর নতুন চিন্তার শাস্তি ভয়ঙ্কর। আরবভাষী জগতে যেটুকু এসেছিল সেটুকু তুর্কদের ভারতে প্রবেশ করার পূর্বেই থেমে যায়। উনবিংশ শতাব্দীতেই নতুন চিন্তা জয়ী হয়, পুরাতন বিশ্বাস হেরে গিয়ে পুনরুজ্জীবনের স্বপ্ন দেখে।

দুই

রুমানিয়া থেকে একজন লেখক এসেছিলেন। বললেন, "চার হাজার বছরের বহমান সভ্যতা আপনাদের। এর কোনোখানেই ছেদ পড়েনি। ধারাভঙ্গ হয়নি। আমাদের কিন্তু বার বার তিনবার ডিসকন্টিনিউইটি ঘটেছে। একবার যখন প্রাচীন গ্রীস রোম যায়, খ্রীস্টধর্ম আসে। আবার, যখন রেনেসাঁস হয়। শেষবার, যখন মার্কসবাদ এসে ওলটপালট করে। এইসব ডিসকন্টিনিউইটি নিয়ে ইউরোপের সভ্যতা।"

পূর্ব ইউরোপের সভ্যতা বলুন। পশ্চিম ইউরোপের লোক ওই তিন-বারেরটা মানে না। তাদের বেলা এখন পর্যন্ত তেমন কোনো ওলটপালট সফল হয়নি। তাহলে ওদের চোখে ডিসকন্টিনিউইটি যা তা রেনেসাঁসের সময়ই দ্বিতীয় ও শেষবার ঘটেছে।

আর আমাদের বেলা ? একথা যদি সত্য হয় যে আমাদের সভ্যতার ধারাভঙ্গ একেবারও ঘটেনি তবে বাংলার রেনেসাঁস একটা কথার কথা। যার মৃত্যু নেই তার নবজন্মও নেই। যার নিদ্রা নেই তার নবজাগরণও নেই। এদেশে কতবার গ্রীক শক কুশান হূন এসেছে, তেমনি তুর্ক মোগল পর্তুগীজ ইংরেজ এসেছে। সাময়িক এক-একটা তরঙ্গ উঠে আবার মিলিয়ে গেছে। এই যাকে রেনেসাঁস বলা হচ্ছে এও তেমনি একটা তরঙ্গ।

রুমানিয়ান লেখক আমাকে ভাবিয়ে তোলেন। ভেবে দেখি এদেশেও মাঝে মাঝে ছেদ পড়েছে। ধারাভঙ্গ হয়েছে। নয়তো মহেঞ্জোদারো ও হরপ্পা মরুপথে হারিয়ে গেল কী করে? সেই নাগরিক যুগের সঙ্গে বৈদিক আরণ্যক যুগের

ধারাবাহিকতা কোথায় ? সিন্ধু উপত্যকার প্রাচীনতর সভ্যতার অস্তিত্ব পর্যন্ত পঞ্চাশ বছর আগে আমাদের জানা ছিল না। পঞ্চনদের বৈদিককেই আমরা আদি বলে বিশ্বাস করতুম। কারণ ঋগ্বেদের চেয়ে পুরাতন শাস্ত্র পৃথিবীতে নেই। কিন্তু পাষাণের সাক্ষ্য শাস্ত্রের চেয়েও প্রামাণিক। একদিন স্বীকার করতেই হবে যে সিন্ধু সভ্যতার বিদায়ের সঙ্গে সঙ্গে একটা ছেদ পড়ে। ছেদের পর পুনরারম্ভ। বৈদিক আর্যদের আবির্ভাব। সম্ভবত বহিরাগত আক্রমণকারী রূপে।

এই ছেদটার কথা খননকার্যের পূর্বে আমাদের অজ্ঞাত ছিল। এটা এত পুরাতন যে লোকমানসেও কোনো চিহ্ন রেখে যায়নি। সেইজন্যে মনে হয়েছে আমাদের সভ্যতা চিরপ্রবহমাণ। যা গ্রীস রোম মিশরের নয়। কিন্তু একথা আমরা সবাই জানতুম যে বৌদ্ধধর্ম একদিন অস্তমিত হয়, ইসলাম একদিন উদিত হয়। প্রায় একই ঐতিহাসিক লগ্নে। বৌদ্ধদের যখন গৌরবের দিন ছিল তখন সে গৌরব মুসলিমদের চেয়ে কোনো অংশে খাটো ছিল না। আর মুসলিমদের যখন গৌরবের দিন ছিল তখন সে গৌরব বেদানুগ হিন্দুদের চেয়ে কোনো অংশে খর্ব ছিল না। ভারতের ইতিহাসে বেদানুগ হিন্দুর পাশাপাশি রয়েছে আর একটি প্রতিবাদী শক্তি। সেটি এককালে বৌদ্ধ, পরে মুসলিম। এদের মধ্যে প্রত্যক্ষ সংঘর্ষের প্রমাণ পাওয়া যায় না। একটি যে অপরটির উচ্ছেদের হেতু তাও নয়। কিন্তু একটির শূন্যতা অপরটি পূরণ করে। একের প্রস্থান, সঙ্গে সঙ্গে অপরের উত্থান।

তাই যদি হয় তবে আমাদের ইতিহাসেও বার দুই ডিস্‌কণ্টিনিউইটি ঘটেছিল। ইতিহাস লেখার অভ্যাস নেই বলে কেউ লিপিবন্ধ করেনি। লোকে ভুলে গেছে মহেঞ্জোদারো ও হরপ্পাকে। তেমনি অশোক কনিষ্ক হর্ষবর্ধন ও ধর্মপালকে। যদিও বাণভট্টের হর্ষচরিত ছিল সাক্ষী দিতে।

অন্য একদিক থেকেও বিবেচনা করতে পারি। সংস্কৃত ভাষার গৌরবের দিন যখন গেল তখন দেখা গেল রাজকর্মে তার স্থান নিয়েছে পারসিক আর জনজীবনে বাংলা, হিন্দী, মারাঠী, তামিল প্রভৃতি অসংস্কৃত ভাষা। এদের অধিকাংশই সংস্কৃতের সন্তান বলে গণ্য করা হয়, কিন্তু জয়দেবের ভাষা ও চণ্ডীমঙ্গলের ভাষার মাঝখানে নিশ্চয়ই একটা ধারাভঙ্গ ঘটেছিল। মহারাষ্ট্রের একজন সংস্কৃতজ্ঞ পাঠক জয়দেব পাঠ করার পর চণ্ডীদাস পড়তে বসলেই তৎক্ষণাৎ উপলব্ধি করবেন যে পরম্পরাটা ধারাবাহিক নয়। মাঝখানে একপ্রকার ডিস্‌কণ্টি-নিউইটি। এটা না হলে বাংলা, হিন্দী প্রভৃতি ভাষার উদ্ভবই হতো না। সংস্কৃত ভাষা সাধারণ লোকের হৃদয়াবেগ প্রকাশের বাহন ছিল না। যাত্রায়, পাঁচালীতে, কীর্তনে, গীতিকায় কেউ সংস্কৃত শুনতেও চায় না, বুঝতেও পারে না। তাঁদের মনের আনন্দ জোগায় তাদেরই মুখের ভাষা।

এটা একটা আশ্চর্য ব্যাপার যে সংস্কৃতের পর বাংলা ও বৌদ্ধধর্মের পর ইসলাম অবিকল সমকালীন না হলেও মোটামুটি একই যুগের ঘটনা। সম্পর্কটা কাকতালীয়। আমাদের মধ্যযুগকে দুই ভাগে বিভক্ত করলে এর একটা ব্যাখ্যা পাওয়া যাবে। ইসলামের ও বাংলার পূর্ব ছিল মধ্যযুগের প্রথমার্ধ। পরে এল

দ্বিতীয়ার্ধ। জয়দেব প্রথমার্ধের কবি। চণ্ডীদাস দ্বিতীয়ার্ধের কবি। মাঝখানে একটা ছেদ। মধ্যযুগের তাতে অবসান হলো না। যুগটা অবিচ্ছিন্নই রয়ে গেল। তবু যে পরিবর্তনটা ঘটল সেটাও গুরুত্বপূর্ণ। ধর্মের দিক থেকে, ভাষার দিক থেকে লোকে আরো গণতান্ত্রিক হলো। ধর্ম বলতে শুধু ইসলাম নয়, মঙ্গলকাব্য ও পদাবলীর ধর্মও বোঝায়।

সংস্কৃতের স্থান নেয় রাজকর্মে পারসিক, জনজীবনে বাংলা, হিন্দী প্রভৃতি ভাষা। কিন্তু পুরাতন জ্ঞানবিজ্ঞানের ভাষা সংস্কৃতই রয়ে যায়। সঙ্গে সঙ্গে আরবী ফারসী। সেকালের শিক্ষিত শ্রেণী বলতে বোঝাত টোল চতুষ্পাঠী মাদ্রাসায় শিক্ষিত হিন্দু মুসলিম উচ্চতর বর্ণ বা উচ্চতর শ্রেণী। যে পদ্ধতিতে এঁরা শিক্ষালাভ করতেন সেটাকে পশ্চিমে বলা হতো স্কলাস্টিক পদ্ধতি। ইউরোপে যখন নতুন বিদ্যা প্রবর্তিত হয় তখন পদ্ধতিটাই যায় পালটে। স্বাধীন চিন্তাকে উৎসাহ দেওয়া হয়। শিষ্যরা গুরুদের সঙ্গে তর্ক করতে সাহস পায়, গুরুর মত খণ্ডন করতে পারলে গুরু রুষ্ট হন না। গুরুবাদ জিনিসটাই উঠে যায়। তবে মনে রাখতে হবে যে এটা শুধু বিশ্ববিদ্যালয়ে। চার্চে নয়। কিংবা চার্চশাসিত বিভাগে নয়। যেমন থিয়োলজিতে নয়। নতুন বিদ্যা নতুন নতুন বিভাগ সৃষ্টি করে। তাই বিশ্ববিদ্যালয়ে স্বাধীন চিন্তা, স্বাধীন অনুসন্ধান, স্বাধীন গবেষণা সম্ভব হয়।

এদেশে নতুন বিদ্যার বাহন হয় ইউরোপীয় আদর্শের স্কুল কলেজ বিশ্ব-বিদ্যালয়। তাদের পদ্ধতি স্কলাস্টিক নয়। তাদের ভাষা সংস্কৃত বা আরবী ফারসী নয়। আরম্ভটা সম্পূর্ণ আধুনিক। তাই পুরাতনের সঙ্গে একটা ছেদ পড়ে যায়। শিক্ষিত শ্রেণী বললে এখন থেকে বোঝায় ইংরেজী শিক্ষিত শ্রেণী। স্কুলে কলেজে বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষিত শ্রেণী। সংস্কৃত বা আরবী ফারসীতে শিক্ষিতদের ফেলে এরা এগিয়ে যায়।

সংস্কৃত শিক্ষায় যাদের অধিকার ছিল না, পারসিক শিক্ষায় যাদের প্রয়োজন ছিল না, তারাও ইংরেজী শিক্ষার সুযোগ পায় ও তার প্রাঙ্গণে দলে দলে যোগ দেয়। পাঠশালা বাদ দিলে এর মতো গণতান্ত্রিক শিক্ষা ভারতের ইতিহাসে বৌদ্ধযুগের পূর্বে ও পরে আর কখনো দেখা যায়নি। এর বিপক্ষে ছিলেন গোঁড়া মুসলমান ও গোঁড়া হিন্দুরা। যে কারণে ইউরোপের গোঁড়া খ্রীস্টানরা বিপক্ষে ছিলেন সেই কারণে ভারতের গোঁড়ারাও। তাঁদের আশঙ্কা নতুন বিদ্যা এসে তাঁদের চিরাচরিত বিশ্বাসের মূলে ঘা দেবে। তাঁদের পায়ের তলার মাটি নড়ে গেলে মন্দির মসজিদ সব টলে পড়বে। সমাজ সংসার সব ধ্বংস হবে। ছোটলোকদের বাড় বাড়বে।

ইউরোপের গোঁড়া খ্রীস্টানরা নতুন বিদ্যার প্রবর্তকদের একদা পুড়িয়ে মেরেছিলেন। তাঁদের মতে ওটা শয়তানী বিদ্যা। কয়েক শতাব্দী পরে ওই শয়তানী বিদ্যাই বয়ে নিয়ে আসেন ইউরোপীয় খ্রীস্টান মিশনারীরা। তার থেকে এদেশের গোঁড়াদের ধারণা জন্মায় যে, ওটা খ্রীস্টানী বিদ্যা, ওর লক্ষ্য খ্রীস্টান বানানো।

ওটা অশাস্ত্রীয়, ওটা ম্লেচ্ছ, ওটা পাশ্চাত্ত্য, ওটা বিজাতীয়, ওটা জড়বাদী ইত্যাদি আখ্যায় আখ্যায়িত করা সারা উনবিংশ শতাব্দী ধরেই চলে, তা সত্ত্বেও ওর প্রসার রোধ করা যায় না। যারা কোনো কালেই উচ্চশিক্ষার ধারেকাছেও আসতে পারত না তারাও নতুন বিদ্যামন্দিরে প্রবেশ পায় ও স্বাধিকার সচেতন হয়।

কিন্তু সংস্কৃত ও আরবী ফারসীর মতো ওর মাধ্যমটা ছিল ইংরেজী। সেটা সর্বজনবোধ্য নয়। রামমোহন রায় ও তাঁর সহযোগীরা আশা করেছিলেন অবিলম্বে বাংলা, হিন্দী ভাষাতেও আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান পরিবেশন করতে পারা যাবে, কিন্তু তাঁদের সে আশা এক শতাব্দীর মধ্যেও পূর্ণ হয় না। প্রবর্তকরা এর জন্যে দায়ী নন। দায়ী আমাদের ভাষাগুলির অবস্থা। উনবিংশ শতাব্দীর পূর্বে বাংলা, হিন্দী প্রভৃতি ভাষায় যিনি যাই লিখিতেন পদ্য আকারে লিখতেন। প্রথম ছেদ পড়ল যখন ফোর্ট উইলিয়ামের পণ্ডিত বা মুনশীরা জীবনীগ্রন্থ লিখলেন বাংলা গদ্যে। সংবাদপত্রেও বাংলা গদ্য ব্যবহার করলেন মিশনারীরা। এরপর পাঠ্যপুস্তকও রচিত হয় গদ্যে। ধর্মগ্রন্থও অনুবাদ করা হয় গদ্যে।

বাংলা গদ্যের ক্রমবিকাশ কতক পরিমাণে সংস্কৃত বা পারসিক শিক্ষিত লেখকদের হাতে হলেও বিপুল পরিমাণে হয় ইংরেজী শিক্ষিত লেখকদের হাতে। পদ্যের মতো গদ্যে অশিক্ষিত পটুত্বের স্থান ছিল না। থাকলে সেটা রূপকথায় বা ব্রতকথায়। তবে এটাও লক্ষ্য করবার মতো যে বাংলা গদ্য গোড়ার দিকে যেমন দুর্বোধ্য সংস্কৃত বা পারসিকবহুল ছিল, পরে তেমন নয়। গদ্য ধীরে ধীরে সহজ ও সরল হয়ে আসে। সাধু রূপ ছেড়ে চলিত রূপ ধরে। ইউরোপের ইতিহাসে, চীনের ইতিহাসেও এর নজীর আছে।

স্কুল কলেজ বিদ্যালয়ের মতো ছাপাখানারও ভূমিকা ছিল এই যুগ-পরিবর্তনে। ছাপাখানা ছড়িয়ে দেয় রাশি রাশি বই কাগজ। এত কম দামে যে সাধারণ লোকও কিনতে পারে। উচ্চশিক্ষার সঙ্গে উচ্চবর্ণ ও উচ্চশ্রেণীর সম্পর্কটার একটা কারণ তো ছিল বইপত্রের দুষ্প্রাপ্যতা ও দুর্মূল্যতা। ছাপাখানা উদ্ভাবনের পর দেখা গেল যারা কোনো কালেই বইপত্র কিনত না তারাও কিনছে, যারা কিনতে পারছে না তারাও অন্যের লাইব্রেরীতে গিয়ে পড়ছে। পাবলিক লাইব্রেরীতে গিয়ে পড়ছে। পাবলিক লাইব্রেরীও গড়ে ওঠে।

ইংরেজী শিক্ষিত ধনী বাঙালীদের শখ ছিল সাহেবদের মতো বাড়ী করা, গাড়ী চড়া, আসবাব কেনা। সেই সঙ্গে আরো একটা শখ ছিল বিলিতী বই ও শিল্পদ্রব্য সংগ্রহ করা। তাঁদের লাইব্রেরীতে সমসাময়িক ইংলণ্ডের সবরকম বই দেখতে পাওয়া যেত। তাঁদের শিল্পশালায় সমসাময়িক ইউরোপের চিত্র ও ভাস্কর্যের নমুনা বা নকল।

সরকারী চিড়িয়াখানা ছাড়াও ধনীদের নিজেদের চিড়িয়াখানা ছিল। সরকারী বটানিক গার্ডেন ছাড়াও ধনীদের নিজেদের আমদানী গাছপালার বাগান ছিল। হেন মুলুক ছিল না যেখান থেকে জাহাজে করে ফলটা ফুলটা পাখীটা জন্তুটা না আসত, আর সাহেবদের দেখাদেখি বাবুদের কৌতূহল না জাগাত।

রেল টেলিগ্রাফ ট্রাম ইত্যাদিও এমনি করে আসে ও যাদের কৌতূহলী করে তারা কেবল সাহেব নয়, বাবু নয়, সাধারণ লোক। দেখতে দেখতে লোকের অভ্যাস বদলে যায়। তারা রেড়ির তেল ছেড়ে কেরোসিন তেল ধরে। তারপর কেরোসিনের বাতি ছেড়ে গ্যাসের বা বিজলীর বাতি। তেমনি ঘুঁটে কিংবা কাঠ ছেড়ে কয়লা জ্বালায়। পুরুষের চুল ছেঁটে সাহেবদের মতো করা হয়। টিকি কাটা যায়। মেয়েদের গায়ে সেমিজ সায়া ওঠে।

দেশটা একটু একটু করে পাশ্চাত্ত্য প্রভাবে পড়ে। কিন্তু তার চেয়ে বড়ো কথা আধুনিক যুগের সঙ্গে পা মিলিয়ে নেয়। কোন্‌টা পাশ্চাত্ত্য আর কোন্‌টা আধুনিক এটা পরিষ্কার ছিল না। পাশ্চাত্ত্যকে আধুনিক ও আধুনিককে পাশ্চাত্ত্য বলে ভ্রম হতো। এখনো হয়। জাতীয়তাবাদের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে চিন্তাশীলদের মনে একটা বিরূপ ভাবও জন্মায়। কেন, আমাদের কি আপনার বলতে কিছুই নেই যে আমরা পরেরটা নেব ?

নির্বিচারে কোনোটাই নেওয়া উচিত নয়। পরেরটাও নয়, পূর্বপুরুষেরটাও নয়। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদে যেমন পরেরটা নেবার সময় আতিশয্য দেখা গেল শেষ পাদে তেমনি পূর্বপুরুষেরটা নেবার বেলা আতিশয্য। এক শতাব্দীর মধ্যেই চাকা ঘুরে গিয়ে বৃত্ত সম্পূর্ণ হয়। 'দাও ফিরে সে অরণ্য, লহ এ নগর।' প্রাচীন ভারতের তপোবন না হলে ব্রহ্মচর্যাশ্রম হবে না, ব্রহ্মচর্যাশ্রম না হলে জাতীয় শিক্ষা হবে না। রেখে দাও তোমার হিন্দু কলেজ আর ডিরোজিও।

একটা চোখ প্রাচ্যের উপরে আরেকটা চোখ প্রতীচ্যের উপরে, একটা চোখ প্রাচীনের উপরে, একটা চোখ আধুনিকদের উপরে—এই দ্বৈত রামমোহনের মধ্যেও ছিল। কিন্তু তাঁর বিচারবুদ্ধি ছিল একান্ত সক্রিয়। গা-ভাসানো আতিশয্য তাঁর স্বভাবে ছিল না। তিনি আধুনিক ইউরোপকে আহ্বান করলেও প্রাচীন ভারতের সঙ্গে পূর্ব সম্পর্ক পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন। মধ্যযুগে সে সম্পর্ক বিকৃত হয়েছিল। একদিকে তিনি যেমন নতুন বিদ্যার প্রধান প্রবর্তক অপরদিকে তেমনি পুরাতন ধর্ম ও সমাজের মুখ্য সংস্কারক। সংস্কারকের কাজ তিন চার হাজার বছর আগে ফিরে যাওয়া নয়, তাকে ফিরিয়ে আনাও নয়, তার মূল সত্যকে পুনরাবিষ্কার করা।

আধুনিক ইউরোপ এত বড়ো একটা জাজ্বল্যমান সত্য যে তাকে উপেক্ষা করার সাধ্য কোনো শিক্ষিত ব্যক্তির ছিল না। অপরপক্ষে ভারতও আজকের দেশ নয়, এর ছিল অতি পুরাতন এক সভ্যতা ও নানা বিকৃতি সত্ত্বেও তার যে সার সত্য তাকেও উপেক্ষা করা অসম্ভব ছিল। মিশনারীরা নিজেদের ধর্মকে বড়ো করে দেখানোর জন্যে এদেশের ধর্মকে হেয় করে দেখালেও ভাষাতত্ত্ববিদ বহু ইউরোপীয় ছিলেন যাঁরা প্রাচীন প্রাচ্যবিদ্যাকে ইংরেজী ফরাসী ও জার্মান অনুবাদসূত্রে পশ্চিম ভূখণ্ডের সর্বত্র পেঁৗছে দেন। রামমোহনের অনুবাদগুলিও পশ্চিমে প্রচারিত হয়। অপরাপর ভাষায় পুনরায় অনূদিত হয়। রাজা যখন ইউরোপে যান তার আগেই যায় তাঁর লেখা, তাঁর নাম।

এই যে ইউরোপের সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ শুরু হয়ে যায় এর জন্যে প্রায়শ্চিত্ত করতে হলেও পশ্চিমযাত্রীর অভাব হয় না। যান সংস্কারবিরোধী হিন্দুরাও। ইউরোপবিরোধী ভারতীয়রাও। ম্লেচ্ছ বিদ্বেষে যাঁরা অন্ধ তাঁরাও যান কালাপানির ওপারে। এমনি করে আচার অলক্ষে শিথিল হয়। বিচারও ধীরে ধীরে উদার হয়। ওদের সব কিছু খারাপ আর আমাদের সব কিছু ভালো এ মনোভাব আরো ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের ফলে ক্ষয় হয়। কিন্তু 'ওরা স্বাধীন আর আমরা পরাধীন' এ অনুভূতি আরো তীব্র হয়ে ওঠে। জাতীয়তাবাদী অভিমান থেকে আসে ভারত সম্বন্ধে উচ্চতর ধারণা, পশ্চিম সম্বন্ধে নিম্নতর। ওরা জড়বাদী, আমরা অধ্যাত্মবাদী, আমরাই শ্রেষ্ঠ।

পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতদের অবিরাম সংস্কৃত ও পালি চর্চা তথা ভারতের বিভিন্ন স্থানে গুহাচিত্র ও শিলালিপি আবিষ্কারের ফলে ভারতের যে ইতিহাস ও প্রত্নতত্ত্ব রচিত হয় তাতে ভারতের প্রাচীন গৌরব বৃদ্ধি পায়। এমন প্রাচীন গৌরব যে দেশের সে দেশ আধুনিক ইউরোপের শিষ্য হবে না গুরু হবে। যন্ত্রতন্ত্র ছাড়া আর কিছুই ওদের কাছ থেকে শেখবার নেই, এই ধারণায় উপনীত হন যাঁরা জার্মান পণ্ডিতদের দৃষ্টিতে প্রাচীন ভারতকে দেখেন। মোক্ষমুলর বলেছে 'আর্য'। এই আর্যামিটা রামমোহনের যুগে ছিল না। হঠাৎ শোনা গেল আমরা আর্য জাতি, আমাদের ভাষা আর্য ভাষা, ধর্ম আর্য ধর্ম। আর আর্যই জগতের শ্রেষ্ঠ। একটা পরাধীন জাতির পক্ষে এটা কত বড়ো একটা সান্ত্বনা।

অতীত গৌরবের পুনরাবৃত্তির নাম রেনেসাঁস নয়, রিভাইভাল। রেনেসাঁস অতীতের থেকে প্রেরণা সংগ্রহ করলেও যা করতে চায় তা নতুন, নিত্য নতুন। যা জানতে চায় তা নতুন, নিত্য নতুন। যাদের বিশ্বাস বেদে বা বাইবেলে বা কোরানে সব কিছু আছে, তার বাইরে যাবার প্রয়োজন নেই, তাদের বিশ্বাস রেনেসাঁসের অনুকূল নয়। কারণ রেনেসাঁস নতুন করে জানতে চায়, নতুন করে বিচার করতে চায়। পুনর্বিচার না হলে রেনেসাঁস হয় না। তার ফলে খানিকটা ধারাভঙ্গ হবেই। নয়তো সেটার নাম রেনেসাঁস নয়।

ধর্ম ও সমাজ সংস্কারেও খানিকটা ধারাভঙ্গ হয়। সেটা যাদের সহ্য হয় না তারা ধর্ম সমাজ সংস্কারেও রাজী হয় না। বলে, ওসব পরে। আগে তো দেশ স্বাধীন হোক। স্বাধীনতার জন্যে যারা সবচেয়ে অধীর ধর্মসংস্কারের বেলা সমাজসংস্কারের বেলা তারা সবচেয়ে ধীর। এমন কি একেবারেই বিরূপ। জাতীয়তাবাদ প্রথমে ছিল ধর্মসংস্কারের সঙ্গে অভিন্ন। পরে দেখা গেল জাতীয়তাবাদীদের বৃহত্তর ভাগ ধর্মসংস্কারকে মনে করে জাতীয় ঐক্যবিরোধী। ঐক্যের যদি প্রয়োজন থাকে তবে যেসব প্রশ্নে তীব্র মতভেদ সেসব প্রশ্ন এড়িয়ে যেতে হবে। নয়তো জোট ভেঙে যাবে। ভোটেও হারতে হবে।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ পাদ তার প্রথম পাদের প্রতি বিমুখ। রেনেসাঁসের প্রতি বিমুখ কাউণ্টার রেনেসাঁস। রেফরমেশনের প্রতি বিমুখ কাউণ্টার রেফরমেশন। আধুনিক ইউরোপের প্রতি বিমুখ প্রাচীন ভারতীয় পুনরুজ্জীবন বা রিভাইভাল। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের প্রতি বিমুখ ভারতীয় জাতীয়তাবাদ। তা

সত্ত্বেও নতুন বিদ্যার প্রসার বন্ধ থাকে না। সেই সূত্রে ইউরোপ থেকে যে ভাবধারা আসে তা সাহিত্যকে ও শিল্পকে নতুন সঞ্জীবনী শক্তি জোগায়। অষ্টাদশ শতাব্দীর বাংলা গদ্যের তুলনায় উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা গদ্য একটা নতুন জগৎ। গদ্যবন্ধে লেখা হয় হালকা ও গম্ভীর বিভিন্ন ধরনের প্রবন্ধ, উপন্যাস, জীবনী, নাটক। পরে রম্য রচনা ও ছোটগল্প। পদ্যে একা মাইকেলই লেখেন এপিক, লীরিক, সনেট। বেশীর ভাগই পশ্চিমের আদর্শে। বিষয়টা যদিও স্বদেশী। এর পরে আর কেউ ভারতচন্দ্রকে বা ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তকে পূর্ব-সূরী বলে গ্রহণ করেন না। করেন মাইকেলকে। মাইকেলের প্রদর্শিত পন্থায় চলতে যাঁদের অনাগ্রহ তাঁরা বৈষ্ণব পদাবলী, কালিদাস ও শেলী কীটস ওয়ার্ডস-ওয়ার্থ প্রমুখ ইংরেজ রোমান্টিক কবিদের পথে চলেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর বাঙালী কবিদের সঙ্গে তাঁদের মনের অমিল। নাটক যাঁরা লেখেন তাঁরা শেকসপীয়ারকেই আদর্শ করেন। কালিদাস ভবভূতিকে নয়। বিষয় হয়তো পৌরাণিক হিন্দু। কিন্তু রীতি এলিজাবেথান বা ভিকটোরীয়।

বাংলার আধুনিক শিক্ষা যেমন প্রাচীন বা মধ্যযুগীয় শিক্ষার থেকে ভিন্ন, বাংলার আধুনিক সাহিত্যও তেমনি প্রাচীন বা মধ্যযুগীয় সাহিত্যের থেকে ভিন্ন। এই ভিন্নতাকে আর অভিন্নতায় পরিণত করা যেত না। সিপাহী বিদ্রোহের ফলাফল অন্যরূপ হলেও রেনেসাঁসের ফসল অন্যরূপ হতো না। অমন যে স্বাধীন দেশ জাপান তার আধুনিক যুগ যখন এল তখন মধ্যযুগের ঐতিহ্য ধীরে ধীরে অপগত হলো। নতুন বিদ্যা সে দেশেও প্রবর্তিত হয়। ইংরেজী ফরাসী জার্মান ইটালিয়ান ভাষায়। এক একটা বিষয় এক একটা ভাষায় পড়ানো হতো। সাহিত্য যারা পড়ত তারা ফরাসীতে। চিকিৎসাবিদ্যা যারা পড়ত তারা পড়ত জার্মান ভাষায়। আইন ও রাজনীতি যারা পডত তারা পড়ত ইংরেজীতে। ইটালিয়ান ভাষায় কী পড়ত জানিনে, বোধহয় আর্ট।

আলো হাওয়ার যেমন দেশ দেশান্তর নেই জ্ঞানবিজ্ঞানেরও তেমনি দেশ-দেশান্তর নেই। সাহিত্যের বেলাও সেই কথা খাটে। বাংলা সাহিত্যের পুরাতন যুগেও আরবী ফারসী থেকে বড়ো কম নেওয়া হয়নি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণায় সেই লুপ্ত অধ্যায়টির উদ্ধার হয়েছে। সংস্কৃত সাহিত্যই পুরাতন বাংলা সাহিত্যের একমাত্র উৎস ছিল না। সুতরাং ইংরেজী সাহিত্য যদি পরে অন্যতম উৎস হয়ে থাকে তার জন্যে লজ্জিত হবার কারণ নেই। ইংরেজীও তো বিভিন্ন উৎস থেকে রস সংগ্রহ করে নবীন হয়েছে। এর জন্যে ইংরেজরা কেউ লজ্জিত নয়।

রাজা রামমোহনই যে আমাদের রেনেসাঁসের সূত্রধার এ বিষয়ে রেনেসাঁস বিশ্বাসীরা একমত। হিন্দু কলেজের প্রতিষ্ঠাতাদের মধ্যে তাঁর নাম না থাকলেও নতুন বিদ্যার তিনিই যে প্রধান প্রবক্তা লর্ড আমহার্স্টকে লিখিত তাঁর পত্রই এর প্রমাণ।

রামমোহনের বক্তব্য—

'If had been intended to keep the British nation in ignorance

of real knowledge, the Baconian Philosophy would not have been allowed to displace the system which was the best calculated to perpetuate ignorance. In the same manner the Sanskrit system of education would be the best calculated to keep this country in darkness, if such had been the policy of the British legislature. But as the improvement of the native population is the object of the Government, it will consequently promote a liberal and enlightened system of instruction embracing Mathematics, Natural Philosophy, Chemistry, Anatomy, with other useful sciences, which may be accomplished with the sums proposed by employing a few gentlemen of talent and learning, educated in Europe and providing a college furnished with necessary books, implements and other apparatus."

পূর্ব প্রচলিত সীস্টেমটাই তাঁর মতে অজ্ঞতাকে অক্ষয় করার জন্যে কল্পিত। তার পরিবর্তে চাই একটি উদার আলোকিত সীস্টেম। তাতে থাকবে গণিত আর পদার্থবিজ্ঞান, রসায়ন আর শরীর ব্যবচ্ছেদ বিদ্যা, তাছাড়া অন্যান্য আবশ্যক বিজ্ঞান। রামমোহন একে উপরের দিকে নিবন্ধ রাখতে চাননি। ইংরেজীতেও না। একে বাংলার সহায়তায় জনসাধারণের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়া চলে।

শিক্ষার সীস্টেম পরিবর্তন না করলে সমাজের বা রাষ্ট্রের পরিবর্তন করা যেত না। তা বলে এমন কথা বলা চলে না যে শিক্ষার সীস্টেম পালটালেই আর সব সীস্টেম পালটাবে। একটি অতি পুরাতন দেশের হাজার হাজার বছরের বদ্ধমূল ধর্মের সীস্টেম, সমাজের সীস্টেম, রাষ্ট্রের সীস্টেম, উৎপাদনের সীস্টেম অত সহজে উৎপাটিত হতে পারে না। ইউরোপেও যাঁরা নতুন বিদ্যার প্রবর্তক তাঁরাও অতদূর যাবার কথা ভাবতে পারেননি। আমাদের রেনেসাঁসের নায়করাও আমূল পরিবর্তনের বিধান দেননি। কিন্তু যেখানে পরিবর্তন মাত্রেই নিষিদ্ধ সেখানে যদি পরিবর্তনের পথ সুগম হয় তবে সেই পথ দিয়ে একটার পর একটা পরিবর্তন আসে। কালে সেটা বৈপ্লবিক আকার ধারণ করে। রেনেসাঁস যদি ইটালীতে না হতো রেফরমেশন জার্মানীতে হতো না, পার্লামেন্টের কাছে রাজশক্তির পরাজয় ইংলণ্ডে হতো না। রাজতন্ত্র সামন্ততন্ত্র ও পুরোহিততন্ত্রের বিরুদ্ধে বিপ্লব ফ্রান্সে হতো না।

পাশ্চাত্য রেনেসাঁসের ভিতরেই সর্বাঙ্গীণ পরিবর্তনের প্রতিশ্রুতি নিহিত ছিল। মানুষ ইচ্ছা করলে এই জগৎকে ও এই জীবনকে সর্বতোভাবে পরিবর্তিত করতে পারে। মানুষের অসাধ্য কী আছে? মানুষ সর্বশক্তিমান। মানুষ সম্বন্ধে, জগৎ সম্বন্ধে, জীবন সম্বন্ধে এই যে অভিনব চেতনা এটাই নতুন বিদ্যার মহত্তম দান। পাশ্চাত্য রেনেসাঁস থেকে এটা প্রাচ্য রেনেসাঁসেও সঞ্চারিত হয়। হতো না যদি রামমোহনের মতো মনীষীরা অগ্রণী না হতেন। ইংরেজদের মধ্যেও দুই দল ছিলেন। একদল মনে করতেন প্রাচ্যদেশের লোকের পক্ষে প্রাচ্য বিদ্যাই

শ্রেয়। বেশ তো শান্তিতে আছে ওরা। কেন বৃথা পাশ্চাত্ত্য বিদ্যা শিখিয়ে ওদের অশান্ত করে তোলা? ওরা চাইবে চাঁদ পেড়ে আনতে। পারবে কেন? আরেক দল ভাবতেন পাশ্চাত্ত্য জ্ঞানবিজ্ঞানের আলোকবর্তিকা প্রাচ্যের পক্ষেও শ্রেয়। সেই আলোর ছোঁয়া লেগে যাদের ঘুম ভাঙবে তারাই আর সবাইকে জাগাবে। একটি পুরাতন, পশ্চাৎপদ দরিদ্র জনসমষ্টি অমনি করেই আপনার ভাগ্য পরিবর্তন করবে। সে কাজ ইংরেজদের দিয়ে হবার নয়। সে দায়িত্ব ইংরেজদের নয়। এই যে দ্বিতীয় দলটি এঁরাই নতুন বিদ্যা প্রবর্তনে উৎসাহী ভারতীয়দের পক্ষ নেন। মেকলের কাস্টিং ভোট এঁদের জিতিয়ে দেয়।

ইংরেজদের মধ্যে যাঁদের আপত্তি ছিল তাঁদের আপত্তির একটা কারণ ছিল এই যে, স্কুল কলেজের পড়া সেরে যারা জীবিকার সন্ধানে বেরোবে তাদের জন্যে সরকার এত চাকরি পাবেন কোথায়? তার জন্যে যে অর্থনৈতিক পরিবর্তন চাই তার সম্ভাবনা কতদূর? ইংলণ্ডে ততদিনে শিল্পবিপ্লব জোর কদমে চলেছিল, কিন্তু ভারতেও যদি শিল্পবিপ্লব চলে তবে ভারত হবে ইংলণ্ডের ঘোর প্রতিযোগী। তাকে কাঁচা মালের জোগানদার ও তৈরি মালের বাজার করে রাখাই যদি ব্রিটিশ পলিসি হয় তবে শিক্ষিত বেকারদের নিয়ে সমস্যায় পড়তে হবে। কিন্তু দেখতে দেখতে রেল স্টীমার ডাকঘর টেলিগ্রাফ এদেশেও এসে হাজির হয়। এখানেও নতুন কর্মের সুযোগ মেলে। যারা সরকারী চাকরি পায় না তারা ওকালতী করে। কিংবা মেডিকেল কলেজ থেকে বেরিয়ে ডাক্তারী। জমিদার ঘরের ছেলেরা জমিদারি থেকে অনর্জিত আয় পায়। কারণ রেললাইন ও শহর বিস্তারের দরুন জমির দাম বেড়ে যায়। তারাও স্কুল বসায়, ডাক্তারখানা বসায়। ইস্কুল মাস্টার ও ডাক্তারকে কাজ দেয়। জেলা ও মহকুমা নিয়ে যে নতুন প্রশাসনের প্রবর্তন হয় তার উপরের দিকে ইংরেজ থাকলেও বাকীটা দেশীয়দের জন্যে ছেড়ে দেওয়া হয়।

ইউরোপের মতো এদেশেও রেনেসাঁসের স্তম্ভ বলতে বোঝায় জমিদার, বার্গার বা বণিক, উকিল, ডাক্তার, সরকারী আমলা। ওদেশের ক্লার্জির একাংশ রেনেসাঁসের পক্ষপাতী ছিল, এদেশেও ব্রাহ্মণদের এক ভাগ ব্রাহ্মসমাজে যোগ দিক আর নাই দিক রেনেসাঁসের পক্ষপাতী হয়। সর্বপ্রথমেই মনে আসে যাঁর নাম তিনি ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। তিনি সংস্কৃত কলেজের ভার পেয়ে সেখানে পাশ্চাত্ত্য দর্শন পড়ানোর ব্যবস্থা করেন। যেমন জন স্টুয়ার্ট মিলের রচনাবলী। একখানি চিঠিতে তিনি তাঁর উদ্দেশ্য বর্ণনা করেন এই বলে ঃ

"For certain reasons, which it is needless to state here, we are obliged to continue the teaching of the Vedanta and Sankhya in the Sanskrit College. That the Vedanta and Sankhya are false systems of philosophy is no more a matter of dispute. While teaching these in the Sanskrit course we should oppose them by sound philosophy in the English course to counteract their influence."

পুরাতন বিদ্যার পাশাপাশি নতুন বিদ্যাও চলবে এই ছিল বিদ্যাসাগরের নীতি। তিনি যেমন সংস্কৃতশিক্ষাকে সাধারণের পক্ষে সহজ করতে 'ব্যাকরণ-কৌমুদী' প্রভৃতি বই লিখেছিলেন তেমনি ইংরাজীশিক্ষাকে সুলভ করতে মেট্রো-পলিটান ইনস্টিটিউশন প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। সংস্কৃত ছিল ব্রাহ্মণদের একচেটে, হলো নতুন বিদ্যালয়গুলিতে শূদ্রদেরও অবশ্যপাঠ্য। এমন কি মুসলমানরাও ইচ্ছা করলে সংস্কৃত পড়তে পারত। আর ইংরেজী তো সর্বজনপাঠ্য হলোই। বাংলাও।

সমসাময়িক ইউরোপের সঙ্গে তুলনা করলে দেখা যায় আমাদের নতুন শিক্ষা-ব্যবস্থা অপেক্ষাকৃত সেকুলার ছিল। এর জন্যে ধন্যবাদ দিতে হয় একদিকে যেমন রামমোহন ও বিদ্যাসাগরের মতো সংস্কারমুক্ত ভারতীয়দের অন্যদিকে ডেভিড হেয়ার ও মেকলে প্রমুখ সংস্কারমুক্ত ইউরোপীয়দের। ইতিহাসে দৈবাৎ এরূপ মণিকাঞ্চনযোগ ঘটে। বলা বাহুল্য এর মধ্যে একটা বিদ্যা বেচাকেনার ব্যাপার ছিল। পাঠ্যপুস্তক লিখে বিদ্যাসাগরও যে অর্থোপার্জন করেননি তা নয়। রেনেসাঁস অর্থোপার্জনের যেসব নতুন পন্থা খুলে দেয় এটাও তার একটা। সংবাদপত্র সম্পাদনা করে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত অর্থোপার্জন করেন। কাব্য লিখে মাইকেল ও উপন্যাস লিখে বঙ্কিমচন্দ্রও অর্থলাভ করেন। স্বাধীনভাবে বাস করতে হলে স্বাধীন জীবিকা চাই। সরকারের বা জমিদারদের বা ধনিকের দাক্ষিণ্যের উপর নির্ভর করলে স্বাধীনভাবে বাঁচতেও পারা যায় না, লিখতেও পারা যায় না। ঊনবিংশ শতাব্দীর ব্রিটিশ আমলেই এটা বুদ্ধিজীবীদের পক্ষে সম্ভব হয়। ছাপাখানা ও শিক্ষাবিস্তার এটাকে সম্ভব করে।

তাছাড়া স্বাধীনভাবে মত প্রকাশ করাও একটা নতুন অভিজ্ঞতা। মুঘল বা মারাঠা রাজত্বে স্বাধীন জীবিকা কারো ভাগ্যে জুটলেও মতপ্রকাশের স্বাধীনতা কারো নাগরিক অধিকারের অঙ্গ ছিল না। সিভিল লিবার্টির জন্যে স্বদেশে রক্তপাত করে ইংরেজরা বুঝত ওর কী মূল্য। এদেশেও হিকি প্রভৃতি সাংবাদিক তার জন্যে সংগ্রাম করেন। রামমোহনকেও তার জন্য সজাগ থাকতে হয়। এদেশে যে সব ইংরেজ রাজপুরুষ আসতেন গোড়া থেকেই তাঁদের একভাগ ছিলেন রক্ষণশীল ও আরেকভাগ উদারনীতিক। রবীন্দ্রনাথ যাঁদেব বলতেন ছোট ইংরেজ ও বড়ো ইংরেজ। প্রশাসনের প্রত্যেক স্তরেই এঁদের দেখা যেত। উচ্চতর আদালতে উদারনীতিকদেরই ছিল প্রাধান্য। বিলেতের বিচারব্যবস্থা এদেশে প্রবর্তিত হওয়ায় সাধারণ নাগরিকের ব্যক্তিস্বাধীনতা আইনত স্বীকৃত হয়। কার্যত হতে বহু বাধা। উদারনীতিক ইংরেজ ও উদারনীতিক ভারতীয় এই এক জায়গায় মিলিত হন।

ইংরেজরা তাদের পার্লামেন্টারী গণতন্ত্র এদেশে প্রবর্তন করতে প্রস্তুত ছিল না। তাদের স্বদেশেই তার ব্যাপ্তি হয় নি। এদেশের জনসাধারণ যে তার জন্যে প্রস্তুত ছিল তা নয়। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে উদারনীতিক ইউরোপীয় ও উদারনীতিক ভারতীয় মিলে যে কংগ্রেস প্রতিষ্ঠা করেন তার কিছুদিন আগে থেকেই পার্লামেন্টারী গণতন্ত্রের জন্যে একটা আকাঙ্ক্ষা জাগে। এটা জাতীয়তা-

বাদী আকাঙ্ক্ষার সমান্তরাল ও পরিপূরক। সারা ইউরোপ জুড়ে একই আকাঙ্ক্ষা। এর দক্ষিণে ছিল স্বৈরাচার ও বামে বিপ্লববাদ। এসব তরঙ্গ ভারতের মাটিতেও আছড়ে পড়ে। বিশেষতঃ বাংলার মৃত্তিকায়। রেনেসাঁস যেখানে সবচেয়ে সক্রিয়।

উনবিংশ শতাব্দীর পৃথিবীর সর্বত্র বৈশ্যদের ধনবল ক্রমে ক্রমে বৃদ্ধি পাচ্ছিল ও শূদ্রদের শ্রমবল তার প্রতিপক্ষরূপে তার সঙ্গে মোকাবিলার জন্যে ক্রমে ক্রমে তৈরি হচ্ছিল। ভারতও এর বাইরে ছিল না। কিন্তু ভারতের পরাধীনতা এটাকে আড়াল করেছিল। তা সত্ত্বেও স্বামী বিবেকানন্দের মতো দূরদর্শী পুরুষ সমাজতন্ত্রের কথা ভাবতে পেরেছিলেন। যদিও সেটা ধর্মনিরপেক্ষও নয়, নিরীশ্বরও নয়, মার্কসবাদীও নয় তবু সেটা সামাজিক ন্যায়। যা না হলে জাতীয়তাবাদ ও গণতন্ত্র অপরিপূর্ণ থাকবে। সাম্যের চিন্তা বঙ্কিমচন্দ্রও করেছিলেন। শ্রমজীবীদের জন্যে কেশবচন্দ্রেরও দরদ ছিল। জমিদারের প্রজাদের জন্যে রামমোহনও ব্যথা বোধ করতেন।

নারী ও শূদ্র সমাজের এই দুটি উপেক্ষিত ও উপেক্ষিতার মধ্যে নারীর জন্যেই কাজ হয় বেশী। সতীদাহ নিবারণ ও বিধবা বিবাহ প্রচলন তো রামমোহন বিদ্যাসাগরের অবিস্মরণীয় কীর্তি। নারীকে ব্রাহ্মমন্দিরের বেদীতে আচার্যের আসনে বসানো তেমনি কেশবচন্দ্রের। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কন্যারা পুরুষের সঙ্গে মেডিকাল কলেজ ও প্রেসিডেন্সী কলেজে পড়েন। ইউরোপেও সহশিক্ষা তখনো বেশীদূর যায় নি। নতুন বিদ্যালয়ে নরনারী উভয়ের জন্যে এটুকু স্বীকার করতেই চার শতাব্দী লেগে যায়। অবশ্য মেয়েদের উচ্চশিক্ষার ঘরোয়া ব্যবস্থা ধনাঢ্য পরিবারে ছিল, কিন্তু তাদের কলেজে পড়তে পাঠানো—বিশেষ করে ছেলেদের কলেজে—গত শতাব্দীর মধ্যভাগেও ছিল রক্ষণশীলদের কাছে দৃষ্টিকটু। ঘরোয়া ব্যবস্থায় উচ্চশিক্ষিতা মহিলাদের প্রসঙ্গে অষ্টাদশ শতাব্দীতে ডক্টর জনসন মন্তব্য করেছিলেন, "কুকুর হাঁটছে পেছনের পায়ে ভর দিয়ে এটা যেমন বিচিত্র ওটাও তেমনি।"

বাঙালীর মেয়েরা কলিকাতা মেডিকাল কলেজে ভর্তি হবার পরে এক মার্কিন মেয়ে স্বদেশে ডাক্তারি পড়ার সুযোগ না পেয়ে জার্মানিতে যান ও সেখানেও কেউ তাঁকে পড়তে দেয় না। শেষকালে একটি কলেজ তার জন্যে বিশেষ ব্যবস্থা করতে রাজী হয়, কিন্তু একটি কি দুটি বিষয় নারীর পক্ষে নিষিদ্ধ। এসব কথা যখন শুনি তখন উনবিংশ শতাব্দীর ভারতীয় সমাজ-সংস্কারকদের শতবার সাধুবাদ দিই। বেথুন বলে পরিচিত বীটন সাহেবের মতো ইউরোপীয় শুভাকাঙ্ক্ষীদেরও বহু ধন্যবাদ। নরনারীর সাম্যবিধানের সাধনায় জাতিধর্মনির্বিশেষে যাঁরাই কাজে যোগ দিয়েছিলেন তাঁরাই আমাদের নমস্য। এককভাবে এ সাধনা এত কম সময়ের মধ্যে সিদ্ধ হতো না। পরবর্তী-কালে ইংলণ্ডের সাফ্রাজেটরা সংগ্রাম করে যে অধিকার লাভ করেন সে অধিকার বিনা সংগ্রামে এদেশের মেয়েরাও পান।

রামমোহন ও বিদ্যাসাগর যে পুরাতন বিদ্যার পরিবর্তে নতুন বিদ্যার

প্রবর্তন চেয়েছিলেন এর তাৎপর্য তাঁরা স্থিতাবস্থায় সন্তুষ্ট ছিলেন না। যাঁরা ছিলেন তাঁরা সমাজের প্রবল ও সুবিধাভোগী অংশ। জনগণের তখন নিজের স্বার্থ বুঝে নেবার মতো বিদ্যাবুদ্ধি নেই। বিদ্যাবুদ্ধি আসতে পারত টোল চতুষ্পাঠী কিংবা মাদ্রাসা থেকে নয়, স্কুল কলেজ থেকেই। তবে এটাও তাঁদের কাম্য ছিল যে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য ইংরেজীর সহায়তায় যুগোপযোগী হয়ে জনশিক্ষার বাহন হয়। তার জন্যে তাঁরাও পাঠ্য প্রণয়ন করেছিলেন। বাংলা এর আগে পাঠশালার উপরে উঠতে পারে নি। তাকে মাধ্যমিক স্তরে উন্নীত করাই ছিল তৎকালীন কর্তব্য। সে স্তরে বাংলা হলো অবশ্য শিক্ষণীয়। নিচের দিকে শিক্ষার মাধ্যম। লোকে যাকে ইংরেজী বিদ্যালয় বলত তাতে বাংলারও স্থান ছিল। বাংলার মতো অন্যান্য ভারতীয় ভাষাও অন্যত্র স্থান পায়। এসব ভাষাকে বলা হতো দ্বিতীয় ভাষা। মর্যাদার দিক থেকে এরা ইংরেজীর চেয়ে খাটো। পরে এটা অসহ্য হয়।

অসহ্য হবার কারণ বাংলার অভূতপূর্ব উন্নতি। অষ্টাদশ শতাব্দীতে ক'খানাই বা পুঁথি লেখা হয়েছিল। আর কীই বা ছিল তার মান। সংস্কৃত পণ্ডিতরাও তাকে অবজ্ঞা করতেন। তার নিজের কোনো নাম পর্যন্ত ছিল না। শুধু "ভাষা" বলে উল্লেখ করা হতো। বিদেশীরাই নাম রাখে 'বেঙ্গলী'। তার থেকে আসে 'গৌড়ীয়'। পরে 'বাঙ্গলা'। অষ্টাদশ শতাব্দীর সঙ্গে তুলনা করলে দেখা যাবে ঊনবিংশ শতাব্দীই বাংলা সাহিত্যের স্বর্ণযুগ। সোনার কাঠির পরশ লেগে রাজকন্যার ঘুম ভাঙে। ছুঁইয়ে দেয় ভিনদেশী রাজপুত্র। সেই যে জাগরণ তার চিহ্ন জীবনের প্রত্যেকটি বিভাগে। ধর্মে, সমাজে, সাহিত্যে, বিজ্ঞানে, শিল্পে, নগরবিন্যাসে, প্রাসাদনির্মাণে, থিয়েটারে, যানবাহনে। দেশটা হয়ে ওঠে কলকাতাকেন্দ্রিক। আর কলকাতা নিজে লণ্ডনকেন্দ্রিক।

এর নাম ঔপনিবেশিকতা। আমাদের সভ্যতা হয় কলোনিয়াল সভ্যতা। আমাদের সংস্কৃতিও কলোনিয়াল ধারায় চলেছে দেখে আমাদের মনীষীরা বিদ্রোহী হন। বঙ্কিমচন্দ্রের 'বঙ্গদর্শন' এই বিদ্রোহের সংকেত। গোড়ায় এটা সাংস্কৃতিক বিদ্রোহ। পরে অর্থনীতি ও রাজনীতির ক্ষেত্রেও সঞ্চারিত হয়। এরই চূড়ান্ত পরিণতি "কুইট ইণ্ডিয়া"। সঙ্গে সঙ্গে "ডিভাইড অ্যাণ্ড কুইট"। বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠে'র ভিতরেই উভয়ের বীজ নিহিত ছিল।

ইংলণ্ডের সঙ্গে ভারতের সম্বন্ধটা ছিল এই যে এপার থেকে জাহাজ ভর্তি করে কাঁচামাল যেত ওপারে। আর ওপার থেকে জাহাজ ভর্তি করে তৈরি মাল আসত এপারে। তেমনি এপার থেকে পুরাতত্ত্ব যেত ওপারে। আর ওপার থেকে আধুনিক বিদ্যা, আধুনিক চিন্তা, আধুনিক বিচার, আধুনিক নিয়মকানুন, আধুনিক কলাকৌশল, আধুনিক সংস্কার বা বিপ্লব আসত এপারে। পশ্চিম থেকে আসত বলেই তার সঙ্গে একটা পশ্চিমা পোশাক ছিল। সেটা যাঁদের ভালো লাগত তাঁরা পোশাকটাতেই মুগ্ধ। আধুনিকতা তাঁদের চোখে নিছক সাহেবিয়ানা। আবার সেটা যাঁদের খারাপ লাগত তাঁরা পোশাক দেখেই রুষ্ট। আধুনিকতা তাদের চোখে সাহেবিয়ানা ছাড়া আর কিছু নয়। কোন্‌টা যে

পাশ্চাত্ত্য আর কোন্‌টা যে আধুনিক, কোন্‌টা যে বিদেশী আর কোন্‌টা যে স্বযুগী, এটা প্রথম দৃষ্টিতে পরিষ্কার ছিল না।

বিদেশীর বিরুদ্ধে স্বদেশী খাড়া করতে গিয়ে যেটা হলো সেটা স্বযুগীর বিরুদ্ধে বিযুগী। অর্থাৎ উনবিংশ শতাব্দীর বিরুদ্ধে অষ্টাদশ শতাব্দী। যাঁরা মুসলিম-বিরোধী তাঁরা পারসিকবিরোধী হওয়ায় তাঁদের বেলা অষ্টাদশ শতাব্দীই যথেষ্ট বিযুগ নয়। তাঁরা আরো উজানে গিয়ে হাজির হন দ্বাদশ শতাব্দীতে। সংস্কৃত যখন ছিল একচ্ছত্র। তাঁদের অনেকে আরো উজিয়ে যান কালিদাসের কালে। কেউ কেউ আরো দূরে উজিয়ে যান মুনি ঋষিদের কালে। ইসলাম এঁদের বাঞ্ছিত সংস্কৃতির ত্রিসীমানায় ছিল না। খ্রীস্টধর্মও না। তা বলে যে এঁরা বৌদ্ধধর্মের উপর সদয় ছিলেন তা নয়। বুদ্ধ সম্বন্ধে এঁদের ধারণা জয়দেবের মতোই। বুদ্ধ নাকি বিষ্ণুরই একটি অবতার। যদিও বৌদ্ধদের মতে বুদ্ধই সব দেবতার উপরে। প্রাচীন বিদ্যা সম্বন্ধে-যতখানি মুক্ত মন চাই ততখানি এঁদের ছিল না। নতুন বিদ্যা সম্বন্ধে তো নয়ই। অথচ প্রেরণা আসছে যেখান থেকে সেটা হচ্ছে স্বদেশবোধ ও স্বদেশের স্বাধীনতাকামনা।

অথচ ওদিকে টেলিগ্রাফ উদ্ভাবিত হয়েছে। রোজ তার আসছে বিদেশ থেকে। ছাপা হয়ে যাচ্ছে খবরের কাগজে। জাহাজের খবরের জন্যে কেউ সবুর করবে না। দুনিয়া এগিয়ে যাচ্ছে পশ্চিমের আধুনিকতার সঙ্গে পা ফেলে। প্রাচ্যের প্রাচীনতার সঙ্গে পা ফেলবে কে? দেশের লোকও পাশ্চাত্ত্য না হোক আধুনিক হতে চায়। বাহ্যত আধুনিক। অন্তর থেকে আধুনিক হওয়া অত সহজ নয়। তেমন একজন মানুষ ছিলেন অক্ষয়কুমার দত্ত। তেমন একজন মানুষ ছিলেন বিদ্যাসাগর। এঁরা এঁদের পরবর্তীদের চেয়েও অগ্রগামী ছিলেন কারণ রেনেসাঁস তখনো তার গতিবেগ হারিয়ে রিভাইভালের মরুপথে ক্ষীণধারায় প্রবাহিত হয় নি।

দেশাভিমানীদের মতে ভারতীয় সাহিত্যের, দর্শনের, শিল্পের বিচার হবে ঐতিহ্যবাহিত স্বকীয় স্ট্যাণ্ডার্ডে। আন্তর্জাতিক স্ট্যাণ্ডার্ডে নয়। আন্তর্জাতিক স্ট্যাণ্ডার্ড তো প্রকৃতপক্ষে ইউরোপীয় স্ট্যাণ্ডার্ড। তাকেই যদি প্রামাণিক বলে মেনে নেয় তবে ভারত তার আপনাকে হারাবে। রাজনৈতিক স্বাধীনতা, অর্থনৈতিক স্বাতন্ত্র্য, গ্রামীণ কারুশিল্প সব একে একে গেছে। এক সভ্যতার বাসগৃহে অপর এক সভ্যতা এসে জবর দখল নিয়ে বসেছে। থাকবার মধ্যে আছে ভারতীয় সংস্কৃতি। সেও কি তার নিজ বাসগৃহে পরমুখাপেক্ষী হবে? না, আমাদের দুর্গ আমরা পরকে ছেড়ে দেব না। সাংস্কৃতিক বিজয় ঘটতে দেব না। ভারতের আত্মা অপরাজিত। ধর্মেই এর সমধিক প্রকাশ। ধর্মের পরেই সংস্কৃতি। সংস্কৃতিকে যারা ফেরঙ্গ সংস্কৃতিতে পরিণত করতে চায় তারা স্বদেশের শত্রু।

উনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে যে প্রতিরোধ দেখা দিয়েছিল সেটা হিন্দু নামক একটি ধর্ম বা সমাজের তরফ থেকে। শেষের দিকে যেটা দেখা দিল সেটা ভারত নামক একটি দেশের তরফ থেকে। নামে ভারত, কার্যত হিন্দু

ভারত। দেশের আত্মাকে বিজিত হতে দিলে এদেশ কোনোদিন স্বাধীন হতে পারবে না। সাংস্কৃতিক বিজয় সমস্ত শক্তি দিয়ে প্রতিরোধ করতে হবে। বঙ্কিম, বিবেকানন্দ, অরবিন্দ, রবীন্দ্র, গান্ধী, সকলেই এবিষয়ে একমত। দিকে দিকে স্বদেশী চারুশিল্প ও কারুশিল্পের পুনরুজ্জীবন হয়, জাতীয় শিক্ষার আত্মরক্ষা করে ও পরবর্তী কালে রাজনৈতিক বলপরীক্ষার জন্যে শক্তি সংগ্রহ করে। নৈতিক ও মানসিক শক্তি। সামনে একটা সংগ্রাম রয়েছে একথা যদি মনে রাখি তা হলে পুনরুজ্জীবনবাদী প্রযত্ন দেখে আশ্চর্য হব না। দুর্বল দেশ এমনি করে প্রবল দেশের সঙ্গে লড়তে সাহস পায়।

রেনেসাঁস এসেছিল মানুষকে সর্বদেশে সর্বপ্রকারে মুক্ত করতে। শাস্ত্রের হাত থেকে, দেবতার হাত থেকে, গুরুর হাত থেকে, পুরোহিতের হাত থেকে, রাজার হাত থেকে, সামন্তের হাত থেকে। কুসংস্কারের হাত থেকে, কুপ্রথার হাত থেকে, অসাম্যের হাত থেকে। একদিনে বা একশতাব্দীতে নয়। ধাপে ধাপে। সা বিদ্যা যা বিমুক্তয়ে। সেই হচ্ছে বিদ্যা যা মুক্তি দেয়। রেনেসাঁস এসেছিল তেমন বিদ্যা নিয়ে। আমাদের বহুভাগ্য যে অভিজাত ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর কতক লোকের মন তার জন্যে উন্মুখ ছিল। মহাসৌভাগ্য যে কলকাতা ছিল রাজধানী ও সমুদ্রপথে ইউরোপ আমেরিকার সঙ্গে যুক্ত। সেই সূত্রে তথ্য ও আইডিয়ার চলাচল ছিল অবধারিত। কিন্তু জনগণ তার অংশীদার ছিল না ও প্রাচীনপন্থীরা ছিল বিরূপ। পরে দেশাভিমানীরাও হয় বিমুখ।

আমাদের রেনেসাঁসের পরাকাষ্ঠা রবীন্দ্রনাথের নোবেল পুরস্কার। তাতে করে প্রমাণিত হয় যে আন্তর্জাতিক স্ট্যাণ্ডার্ড বলে একটা কিছু আছে আর বাংলা সাহিত্য সেই স্ট্যাণ্ডার্ডে উপনীত হয়েছে। অধিকন্তু এটাও প্রমাণিত হয় যে, ভারতের সাহিত্য ও সংস্কৃতি একটি বিজিত দেশের সাহিত্য ও সংস্কৃতি নয়। ভারত সেক্ষেত্রে অপরাজিত। এতে আমাদের আত্মবিশ্বাস ও আত্মসম্মানবোধ বেড়ে যায়। আমরাও পশ্চিমের সঙ্গে পাল্লা দেবার সামর্থ্য রাখি। "জগৎ কবিসভায় মোরা তোমার করি গর্ব। বাঙালী আজ গানের রাজা বাঙালী নহে খর্ব।" সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের এই উক্তি সব গ্লানি ভুলিয়ে দেয়।

তখনো কারো জানা ছিল না যে প্রথম মহাযুদ্ধ আসছে, তার পিঠ পিঠ রুশবিপ্লব ও তার শেষে ভারতের গণ জাগরণ। যেমন পশ্চিম ইউরোপে তেমনি ভারতেও একটা যুগ শেষ হয়ে যাচ্ছে। ঊনবিংশ শতাব্দীর আরো বিশটা বছর টেনে আনলে বলতে পারা যায় ওটা ঊনবিংশ শতাব্দীরও শেষ। সব দেশের লিবারলরা অস্তংগমিতমহিমা। এমনতর মোহভঙ্গ এর পূর্বে আর কখনো ঘটেনি। সভ্যতার স্বরূপ দেখে সভ্য মানুষ বর্বরের দিকে ঈর্ষার সঙ্গে তাকায়। কতক সভ্য মানুষ বর্বর বনে যায়ও। ইটালীতে ও জার্মানীতে। তাদের চেহারা দেখে কে বিশ্বাস করবে যে তাদের দেশে একটা রেনেসাঁস ও রেফরমেশন

হয়েছিল ? প্রমাণ কোথায় যে মানবিকবাদ বিকশিত ঘটেছিল ?

ইউরোপের উপর মোহভঙ্গ আমাদের আপনার দেশের দিকে ফিরে তাকাতে উদ্বুদ্ধ করে। মোহভঙ্গটা শুধু পশ্চিমের উপর নয়, আধুনিকের উপরও। নাগরিকের উপরও। আমরা গ্রামে যাই। জনগণের সঙ্গে অভিন্ন হতে চেষ্টা করি। আমরা মনেপ্রাণে স্বদেশী হতে গিয়ে স্বদেশের সাহিত্য ও সংস্কৃতির মধ্যেই আমাদের চিৎপ্রকর্ষের আমাদের বৈশিষ্ট্যের ও আমাদের সৃজনীশক্তির উৎস আবিষ্কার করি। আমাদের সত্যিকার শিকড় যেমন গ্রামে ও গ্রামীণ শিল্পে ও কৃষিকর্মে তেমনি লোকসংস্কৃতিতে ও তারই উপর ভিত্তি করে রচিত বা গ্রথিত রামায়ণে মহাভারতে। রামায়ণ মহাভারতই আমাদের ভিতরকার ইতিহাস।

সিন্ধু উপত্যকার সভ্যতা তখনো আবিষ্কৃত হয়নি। তাকে বাদ দিলে ভারতীয় সভ্যতার ধারাবাহিকতা রক্ষা করে এসেছে রামায়ণ ও মহাভারত। এই দুই মহাকাব্য অবলম্বন করে হাজার হাজার বছর ধরে লেখা হয়েছে হাজার হাজার খণ্ডকাব্য, আঁকা হয়েছে হাজার হাজার ছবি, গড়া হয়েছে হাজার হাজার মূর্তি, নাচা হয়েছে হাজার হাজার নাচ, গাওয়া হয়েছে হাজার হাজার গান, শোনানো হয়েছে হাজার হাজার কথকতা, অভিনীত হয়েছে হাজার হাজার নাটক বা যাত্রা। কোথায় তার ছেদ বা ডিসকণ্টিনিউটি!

রামায়ণ বা মহাভারত একজন লেখকের একজীবনে লেখা হয়েছে বলে মনে হয় না। হয়ে থাকলে বহুযুগ ধরে প্রচলিত বহুজনের গাওয়া লোকগীতি বা গাথা অবলম্বন করে হয়েছে। মূলকাহিনীর সঙ্গে শাখা প্রশাখা জুড়ে জুড়ে কাব্যকে যে বিশাল আয়তন দেওয়া হয়েছে তা কোষগ্রন্থের সঙ্গে তুলনীয়। প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতি এইভাবে আপনাকে দুটি কোষগ্রন্থে সংহত ও সংক্ষিপ্ত করে ভাবীকালের জনসাধারণের জন্যে রেখে যায়। মধ্যযুগের ভারত এই দুটির অঙ্গে আর কিছু সংযোজন করেনি। তবে সংস্কৃত থেকে বাংলা প্রভৃতি ভাষার ভাবানুবাদ যাঁরা করেন তাঁরা যেমন কতক অংশ বাদ দেন তেমনি কতক অংশ জুড়ে দেন আর চরিত্রগুলিকেও এমনভাবে রূপান্তরিত করেন যে তারা হয়ে ওঠে স্বকালের ও স্বপ্রদেশের নরনারী। তার থেকে বিষয় নিয়ে যখন যাত্রা অভিনয় হয় তখন দর্শকদের রুচি অনুসারে নতুন নতুন চরিত্রের উদ্ভাবন হয়। রামায়ণ ও মহাভারত জনতার অনুরোধে গ্রামে গ্রামে সৃষ্ট হয়ে চলেছে। কেবল ভারতে নয়, ইন্দোনেশিয়ায় ও ইন্দোচীনে। তথা সিংহলে।

একদা যা ছিল ক্ষত্রিয়দের বীরগাথা ও রাজসভাতেই গীত বা অভিনীত হতো তা এখন সর্বজনপ্রিয়। তার সঙ্গে মিশে গেছে ধর্ম আর দর্শন, পুরাতত্ত্ব ও সমাজতত্ত্ব, ধনুর্বিদ্যা ও রাজনীতি, অর্থশাস্ত্র ও কামশাস্ত্র। জনতা এর সবটা চায় না ও পায় না। তারা বোঝে বীরত্ব ও যুদ্ধ, সেই সঙ্গে কয়েকটি মূলনীতি। পিতৃসত্যের জন্যে রাম বনে গেলেন, পত্নী উদ্ধারের জন্যে তিনি যুদ্ধ করলেন, প্রজারঞ্জনের জন্যে তিনি পত্নীকে বনবাসে পাঠালেন। যুধিষ্ঠির সর্ব অবস্থায় সত্যনিষ্ঠ, সেইজন্যে স্বর্গের পথে তার পতন ও মৃত্যু হলো না, তিনি সশরীরে স্বর্গে গেলেন, কিন্তু একবার একটি অর্ধ সত্য ও অর্ধ অসত্য

উচ্চারণের কর্মফল হলো নরকদর্শন। সত্যের উপর এই পরিমাণ জোর আর কোনো দেশের মহাকাব্যে আছে কি না বলতে পারব না। তবে কয়েকটা মূলনীতি ইলিয়াডেও আছে, ওডিসিতেও আছে। আছে জার্মানদের নিবেলুঙ্গেন-লীড নামক প্রাচীন কাব্যে। কার কাছে কোনটা বড়ো সেটাই সার কথা।

রামায়ণ মহাভারত যতদিন বহমান থাকবে ততদিন জনমানসে ধারাভঙ্গ ঘটবে না। কিন্তু সেটা কতদিন তা কেউ ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারবে না। শিল্পবিপ্লব ভারতেও সক্রিয়। সমাজবিপ্লব না হোক সমাজতান্ত্রিক পরিবর্তন ভারতীয়দেরও অভিষ্ট। কালক্রমে রামায়ণ মহাভারতের মহিমাও অস্তংগমিত হবে। সে ক্ষত্রিয়সমাজ তো আর নেই। রাজারাজড়াদের যুগ গেছে। পরে বীরগাথার পাত্ররা হবে অনভিজাত। অতিপ্রাকৃতেও লোকের বিশ্বাস শিথিল হবে। সূর্য যে কী তা একবার জানবার পর তাকে বগলদাবা করা বীর হনুমানেরও অসাধ্য হবে। গন্ধমাদন বয়ে আনাও অবিশ্বাসের উদ্রেক করবে। তেমনি কুন্তীর ও গান্ধারীর পুত্র লাভের প্রক্রিয়াও সন্দেহজনক হবে। তা বলে রামায়ণ ও মহাভারতের আবেদন ব্যর্থ হবে না। রামায়ণ মহাভারত নতুন করে লেখা হবে। যতদিন না জননায়করা ফতোয়া দিচ্ছেন যে, ওই দুটি মহাকাব্য ফিউডাল সমাজব্যবস্থার ধারক ও বাহক। সুতরাং পরিত্যজ্য। যেমন পরিত্যজ্য চীনদেশে কনফিউসিয়াসের শিক্ষা।

ভবিষ্যতে ধারাভঙ্গ হবে না এমন কথা কেউ বলতে পারে না। আমিও বলব না। জীবন কখনো একই খাতে প্রবাহিত হয় না। বড়ো বড়ো নদীকেও মাঝে মাঝে খাত বদল করতে দেখা যায়। বড়ো বড়ো সভ্যতাও যদি তাই করে তবে আশ্চর্য হবার কী আছে? ভারত অনেককাল ধরে বিচ্ছিন্ন ছিল বলে এতদিন হয়তো একটা ব্যতিক্রম ছিল। এখন আর তা নয়। জলপথে জাহাজ এসে তার বিচ্ছিন্নতা দূর করেছে। আকাশপথে বিমান এসে তাকে অবিচ্ছেদ্য করছে। ব্যতিক্রমের মোহভঙ্গ হলে অতীতের সঙ্গে ধারাভঙ্গও হতে পারে। তবে সেটা আমাদের কাম্য নয়। আমরা চাই অতীতের সঙ্গে অন্বয় রক্ষা করে অগ্রসর হতে। অন্বয়রক্ষা মানে কিন্তু অতীতরক্ষা নয়। অতীতের স্থান যাদুঘরে। সেখানেই তাকে রক্ষা করতে হবে। জীবনে স্থান দিতে হবে বর্তমানকে ও তার পরে ভবিষ্যৎকে। জীবনেও যারা অতীতরক্ষা করতে চায় তাদের সঙ্গে অগ্রসর দলের ছাড়াছাড়ি ঘটবেই।

রেনেসাঁসের সময়ও অতীতরক্ষীদের সঙ্গে অগ্রসর দলের ছাড়াছাড়ি ঘটেছিল। প্রথমে সতীদাহের প্রশ্নে। পরে ইংরেজী শিক্ষার প্রশ্নে। আরো পরে উপবীত ত্যাগের প্রশ্নে, জাতিভেদের প্রশ্নে, নারীর অধিকারের প্রশ্নে, অসবর্ণ বিবাহের প্রশ্নে। আরো পরে বহুবিবাহের প্রশ্নে। ছাড়াছাড়ি বলতে বোঝায় একটা পা-কে পেছনে রেখে আরেকটা পায়ের এগিয়ে যাওয়া। পেছিয়ে থাকা পা চিরদিন পেছনে পড়ে থাকে না। সেও তার নিজের সময়ে এগোয়। হয়তো একশো বছর সময় নেয়। কিংবা আরো বেশী। সংস্কারবদ্ধ মন সহজে সংস্কার-মুক্ত হয় না। এই তো সেদিনও আমাদের ধারণা ছিল হিন্দুমতে বিয়ে হয়ে থাকলে বিবাহবিচ্ছেদ অসম্ভব। এর যাতে পুনর্বিচার হয় তার জন্যে আমি কত

কষ্ট করে উপন্যাস লিখলুম। এখন দেখছি হিন্দুরা ক্যাথলিকদেরও হার মানিয়ে দিয়েছে। রক্ষণশীল পরিবারেও বিবাহবিচ্ছেদ চলতি হয়ে গেছে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে বাড়াবাড়িও হচ্ছে। এ অসম্ভব সম্ভব হলো কি করে?' হলো এইজন্যে যে মেয়েরাও শিক্ষিত হয়েছে। তারা তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে বিয়ে করতে রাজী নয়, বিবাহিত জীবন ব্যর্থ হয়ে থাকলে নতুন করে আরম্ভ করতে চায়। একই মনোভাব ছেলেদের মধ্যেও।

পুনর্বিচার, পুনর্মূল্যায়ন, পুনরারম্ভ এইসব হলো রেনেসাঁসের মর্ম। অগ্রসর অংশটাই ঐতিহ্যের দ্বারা সম্মোহিত না হয়ে তার উপর স্বাধীন বিবেক ও মুক্ত বুদ্ধির প্রয়োগ করে। অহেতুক বর্জনও করে না, অহেতুক সংরক্ষণও করে না। অপরিবর্তনীয় বা সনাতন বলে তাকে নিরস্ত করতে যায় পশ্চাৎপদ অংশ। তার উপর নির্যাতনও করে। তাকে দুর্ভাগ্যের ভিতর দিয়ে যেতে হয়। ধীরে ধীরে জনমতের গতি হয় অগ্রমুখী। ইতিহাসও তাই চায়। অগ্রসর অংশের কার্যকলাপ ইতিহাসের অভিপ্রায় সিদ্ধ করে। বলতে পারা যায় যে মানুষের ভিতর ইতিহাস কাজ করে যায়। এই প্রাচীন দেশের ইতিহাসের এটাও একটা পট পরিবর্তন। এই যাকে বলা হচ্ছে রেনেসাঁস। রেনেসাঁস সম্পূর্ণ হলে প্রাচীন আর প্রাচীন থাকে না। সে হয় নবীন। ভারতকে আমরা নবীন ভারত বলতে পারব যখন দেখব যে পশ্চাৎপদ অংশও অগ্রসর অংশের সঙ্গে পা মিলিয়ে নিয়েছে।

বিশ্বাসী খ্রীস্টানরা মানুষকে পুড়িয়ে মারত এই ভেবে যে তার দেহ ভস্মীভূত হলেও তার আত্মার কল্যাণ হবে। বিশ্বাসী হিন্দুরাও সদ্যবিধবাকে পুড়িয়ে মারত এই মনে করে যে সাধ্বী স্ত্রীর যথার্থ স্থান হলো স্বামীর সঙ্গে যেমন ইহলোকে তেমনি পরলোকে। নয়তো সে সাধ্বী নয়। তার সতীত্ব অপরীক্ষিত। রামমোহন ও তাঁর সম-সাময়িক অগ্রবর্তীরা এর পুনর্বিচার ও পুনর্মূল্যায়ন করেন। যে স্বামীর চিতায় পুড়ে মরল ও যে তা করল না তাদের একজন কি সাধ্বী, অপরজন অসতী? এটা পুরাতন বিচার। নতুন বিচার এ নয়। বেঁচে থেকেও যদি সাধ্বী হওয়া যায়, অগ্নীপরীক্ষা না দিয়েও যদি সতী হওয়া যায় তবে কেন ওই অনাবশ্যক মৃত্যু? যা কখনো আত্ম-হত্যা, কখনো প্রথাসিদ্ধ হত্যা। অসভ্য মানুষের নরবলির সভ্য সংস্করণ। শিক্ষিত ভদ্র হিন্দুরাও এই প্রশ্নে রামমোহনের বিপক্ষে দাঁড়ান ও প্রিভি কাউন্সিল পর্যন্ত ধাওয়া করেন। আইন করে সতীদাহ নিবারণ সম্বন্ধে রামমোহনেরও দ্বিধা ছিল। বেণ্টিঙ্কের ছিল না। ইউরোপীয় এনলাইটেনমেণ্ট বেণ্টিঙ্কের মধ্যেই মূর্ত হয়েছিল। জনমতের জন্যে তিনি অপেক্ষা করেননি। ক্ষমতার সুপ্রয়োগ করে অমানবিককে রহিত করেন। জানতেন না যে তাতে করে সিপাহী-বিদ্রোহকে ইন্ধন জোগানো হবে। সিপাহীরা ছিল পশ্চাৎপদ অংশ। অগ্রসর অংশ তাদের সমর্থন করে না। করে ইংরেজ রাজেরই সমর্থন।

বিধবাবিবাহের প্রবর্তনের পেছনেও ছিল পুনর্বিচার ও পুনর্মূল্যায়ন। যে নারী দশ বারো বছর বয়সে বিধবা হয়েছে সে তার স্বামীসঙ্গ থেকে ও মাতৃত্ব থেকে বঞ্চিত হলেই কি তার সেই বঞ্চিত থাকাটাই হবে সতীত্ব? সারা জীবন

মৃত স্বামীর ধ্যান ও অমানুষিক কৃচ্ছ্রসাধনই হবে সতীত্বের পরীক্ষা ? তাই যদি হয় তবে সেটা হোক ঐচ্ছিক। কিন্তু সবাইকে বাধ্য করা কেন ? যখন দেখা যাচ্ছে যে অনেকেরই জীবনে ঘটছে স্খলন পতন ও সেটা প্রকৃতির সঙ্গে যুঝতে গিয়ে। নতুন করে ঘরসংসার পাতার সুযোগ পেলে তারাও হতো সুচরিতা পত্নী ও জননী। তারাও সতী, যদি সতীত্বের সংজ্ঞাকে উদার করি।

সতীদাহের পেছনে ছিল সতীত্ব সম্বন্ধে বহুকালের সংস্কার। তাকে টলিয়ে দিয়ে যান রামমোহন। সেটা না টললে সতী নারীর বৈধব্যের পর পুনর্বিবাহ-বিরোধী সংস্কার টলত না। এটাকে টলিয়ে দেন বিদ্যাসাগর। এর পরের ধারা হলো বহুবিবাহ নিরোধ। বিদ্যাসাগর এর জন্যেও একটা আইন পাশ করাতে চেয়েছিলেন, কিন্তু সিপাহী-বিদ্রোহের পর সরকার হয়েছিলেন বিষম সতর্ক। আইন পাশ না হলেও জনমত ধীরে ধীরে বহুবিবাহের বিরুদ্ধে যায়। এখানেও সেই পুনর্বিচার ও পুনর্মূল্যায়ন চলছিল। একজন পুরুষের একাধিক স্ত্রী এতকাল কারো চোখে বিসদৃশ ঠেকেনি। লোকে এই ভেবে সমর্থন করত যে পিণ্ডের জন্যে পুত্রের প্রয়োজন ও পুত্রের জন্যে ভার্যার। একটি ভার্যার যদি পুত্র না হয় তবে আরেকটি বিবাহ করাই তো সঙ্গত। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর মানবিকবাদ নারীর মূল্য বাড়িয়ে দেয়। পুত্র যার হয়নি সেও তো একটি নারী। সে বেঁচে থাকতে আর একটি নারী গ্রহণ করা কি অন্যায় নয় ? এই যে অন্যায়বোধ এটা নতুন। বংশ-রক্ষা যদি নাও হয়, পিণ্ডদান যদি নাও হয় তা হলেও এক স্ত্রী থাকতে আর এক স্ত্রী গ্রহণ করা চলবে না। পরিশেষে এটা আইন পাশ করে নিষিদ্ধ হলো স্বাধীনতার পরে।

সাহিত্যে এই নতুন মূল্যবোধের প্রতিফলন হয়। ভার্যার মূল্য তো বেড়ে যায়ই, নারীমাত্রেরই মূল্য যায় বেড়ে। তাই বিধবা পায় পুনর্বিবাহের অধিকার, কুমারী পায় নিজের পতি মনোনয়নের অধিকার, সধবা পায় বিবাহবিচ্ছেদের শর্তাধীন অধিকার, পতিতা পায় সংশোধনের পর সম্মানিত জীবনের অধিকার। সব ক'টি অধিকারের মূলে সাম্য ও স্ব স্বাধীনতা। যেমন পুরুষের বেলা তেমনি নারীর বেলা। রেনেসাঁস না হলে এ কি কখনো হতো ? রেনেসাঁস যে হয়েছে এই তার মোক্ষম প্রমাণ।

তবে এটাও ঠিক যে দেশের লোক কোনো রকম পরিবর্তনই কেবলমাত্র যুক্তি-গ্রাহ্য বলে বা ন্যায়সঙ্গত বলে মেনে নিত না। সেইজন্যে পদে পদে সংস্কৃত শাস্ত্র থেকে বচন উদ্ধার করে বোঝাতে হতো যে শাস্ত্রেও এর অনুমোদন আছে। তেমনি মহাভারত থেকে দৃষ্টান্ত চয়ন করে প্রাচীন ভারতের নজীর দেখাতে হতো। সেইভাবেই ঐতিহ্যের অন্বয় রক্ষা করতে হয়। ডিস্‌কন্টিনিউটি এড়াতে হয়।

তিন

ওদের রেনেসাঁস আর আমাদের রেনেসাঁস এই দুই রেনেসাঁসের মধ্যে মৌল প্রভেদ ছিল একটি জায়গায়। ওদের রেনেসাঁস এসেছিল প্রাচীন গ্রীস রোমের

সঙ্গে ছিন্ন যোগসূত্র পুনরুদ্ধার করতে। আমাদের বেলা প্রাচীন ভারতের সঙ্গে যোগসূত্র ছিন্ন হয়নি, সুতরাং পুনরুদ্ধারের কথা ওঠে না। আমাদের রেনেসাঁস এসেছিল আধুনিক ইউরোপের সঙ্গে নতুন করে যোগসূত্র স্থাপন করতে। মাঝখানে ছিল বহু সমুদ্রের তথা বহু শতাব্দীর ব্যবধান। সমুদ্র লঙ্ঘন করা তত কঠিন নয় শতাব্দী লঙ্ঘন করা যত কঠিন। একটা পেছিয়ে পড়া দেশকে এগিয়ে যাওয়া কালের সঙ্গে পা ফেলে চলতে হবে, এই ছিল আমাদের রেনেসাঁসের আহ্বান। তার জন্যে রাখতে হবে অগ্রসর যাত্রীদের উপর দৃষ্টি।

আমাদের রেনেসাঁসের নায়কদের দৃষ্টি ছিল অগ্রসর যাত্রীদের উপরে। তাই ভারতও দিন দিন আধুনিক হয়ে ওঠে। আধুনিক ভারত আর মধ্যযুগের ভারত নয়। যদি মধ্যযুগের ভারত হয়ে থাকে তবে আধুনিক ভারত নয়। কিন্তু কালের সঙ্গে পা মিলিয়ে নিলেও এদেশের প্রাচীনের সঙ্গে এদেশের আধুনিকের একটা যোগসূত্র ছিল। সেটার সম্বন্ধে সচেতন না হয়ে অগ্রসর হলে ঐতিহ্যবোধ হারিয়ে যেত। ঐতিহ্যের সঙ্গে অন্বয়রক্ষাও ছিল আমাদের অন্যতম অবশ্য কর্তব্য। আমাদের রেনেসাঁসের নায়করা প্রাচীন ভারতের সঙ্গে অন্বয়রক্ষা করতে যত্নবান ছিলেন। কেমন করে প্রাচীন ভারতের সঙ্গে আধুনিক ইউরোপের সমন্বয় ঘটানো যায় এটা ছিল তাঁদের কাছে সবচেয়ে বড়ো প্রশ্ন।

পরবর্তীকালেব চিন্তানায়কদের কাছে সবচেয়ে বড়ো প্রশ্ন হলো কেমন করে পরাধীন ভারতকে স্বাধীন ভারতে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা যায়। যেমনটি সে পলাশীর পূর্বে ছিল বা পৃথ্বীরাজের পরাজয়ের পূর্বে ছিল। কারো মতে পরাধীনতা হয় পলাশীর পর থেকে। কারো মতে পৃথ্বীরাজের পরাজয়ের পর থেকে। যাঁদেব মত মুসলিমশাসিত ভারতও ছিল পরাধীন ভারত, তাঁরা স্বাধীন ভারত বলতে বুঝতেন প্রাচীন ভারত। সেই প্রাচীন ভারতকে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা বা সেইখানে ফিরে যাওয়াই ছিল তাঁদের মতে স্বাধীনতার পুনঃপ্রতিষ্ঠা। এর নাম রেনেসাঁস নয় রিভাইভাল। রিভাইভালের নায়করা আধুনিক ইউরোপের সঙ্গে সমন্বয়ের কথা ভাবতেন না। বরং ভাবতেন কেমন করে তার হাত থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। ঝগড়াটা শুধু ইংলণ্ডের সঙ্গে নয়। ইংলণ্ড যাকে বয়ে নিয়ে এসেছে সেই আধুনিক তথা পাশ্চাত্য সভ্যতার সঙ্গেও। পুনরুজ্জীবনবাদীরা প্রাচ্যের দেশরক্ষী ও কালরক্ষী।

পৌরাণিক সৃষ্টিতত্ত্বের সঙ্গে বৈজ্ঞানিক সৃষ্টিতত্ত্ব যদি না মেলে রেনেসাঁসপন্থীরা বলবেন বৈজ্ঞানিকটাই সত্য আর রিভাইভালপন্থীরা বলবেন পৌরাণিকটা সত্য। পুরাণের সঙ্গে ইতিহাসের বিবরণ যদি না মেলে রেনেসাঁসপন্থীরা বলবেন ইতিহাসের বিবরণটাই প্রামাণিক আর রিভাইভালপন্থীরা বলবেন পুরাণের বিবরণটাই প্রামাণিক। দুই পক্ষই ইংরেজী শিক্ষিত, দুই পক্ষই নতুন শিক্ষাব্যবস্থার ফসল। অথচ রিভাইভালপন্থীদের কথাবার্তা শুনলে মনে হবে তাঁরা স্কুল কলেজ থেকে কিছুই শেখেননি কিংবা যা শিখেছেন সব ভুল। তা বলে যে তাঁরা তাঁদের সন্তানদের টোল চতুষ্পাঠীতে পাঠাবেন তা নয়। যাবে তারা ওই সব স্কুল কলেজেই কিংবা নবপ্রতিষ্ঠিত গুরুকুলে বা ব্রহ্মচর্যাশ্রমে। যুগটাকে

তাঁরা সরাসরি অস্বীকারও করতে পারেন না। নবপ্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়েও মাতৃ-ভাষায় একালের ভূগোল ইতিহাস পড়ানো হয়। অথচ মনটা পড়ে আছে সুদূর অতীতে। যখন চারিদিকের আবহাওয়া ছিল সম্পূর্ণ আলাদা।

পঞ্চদশ শতাব্দীতে ইটালিয়ানরাও তো দু'হাজার বছর পূর্বের গ্রীসের পুনর্জন্ম কল্পনা করেছিল। হোমরের গ্রীস, পেরিক্লিসের অ্যাথেন্স ছিল তাদের কল্পলোক। ঊনবিংশ শতাব্দীর বাঙালীরাও যদি বেদ উপনিষদের তপোবন তথা রামায়ণ মহাভারতের রাজসভার বা রণাঙ্গনের কল্পনা করে কেনই বা তার নাম হবে পুনরুজ্জীবন? পুনর্জন্মের জন্যে কেনই বা তাদের স্বদেশের বাইরে তাকাতে হবে? আধুনিক ইউরোপের কাছে পাঠ নিতে হবে? তা হলে তো ইউরোপকেই ভারতের উপর জিতিয়ে দেওয়া হয়। তা হলে কি ভারত তার স্বাধীনতা ফিরে পাবে? হেরে যাওয়া দেশের মানসিক বল নির্ভর করে বিজেতার দান প্রত্যাখানের উপর। নতুন বিদ্যাও তো সেইরূপ একটা দান।

রিভাইভালের সঙ্গে রেনেসাঁসের তফাৎটা হচ্ছে ভক্তির সঙ্গে যুক্তির, বিশ্বাসের সঙ্গে বিচারের, পূর্বপুরুষ পূজার সঙ্গে আত্ম-স্বাধীনতার। শাস্ত্রজ্ঞানের সঙ্গে বাস্তবজ্ঞানের, আপ্তবাক্যের সঙ্গে পরীক্ষা-নিরীক্ষার, স্থিরসিদ্ধান্তের সঙ্গে কৌতূহলী জিজ্ঞাসার, সংস্কারের সঙ্গে সংস্কারমুক্তির, আচারের সঙ্গে আচার-লঙ্ঘনের, স্থিতাবস্থার সঙ্গে অভিনবত্বের। বর্ণাশ্রমের সঙ্গে বর্ণাশ্রম বর্জনের, যজ্ঞের সঙ্গে যজ্ঞত্যাগের, মন্ত্রের সঙ্গে খোলা মনের। রিভাইভালপন্থীদের কথা হলো সেকালে যা হয়নি একালে তা হবে না, সেকালের মতো হবে। রেনেসাঁসপন্থীদের কথা হলো পুনর্জন্ম মানে পূর্বজন্ম নয়, দেশ তার পূর্বজন্মে ফিরে যেতে পারে না। দেশকে বাঁচাতে হবে কালের সঙ্গে তাল রেখে। কালকে বদলে দিতে পারা যাবে না দু'হাজার বা দু'শো বছর বাদে।

অশনে বসনে স্বদেশী, শিক্ষায় দীক্ষায় স্বদেশী হতে গিয়ে সত্যযুগের মতো যোগী ঋষি ও বর্ণাশ্রমী, এই যে বিবর্তন এটা স্বদেশের দুর্গরক্ষার জন্যে। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে জাতীয়তাবাদ ছিল না, তাই পুনরুজ্জীবনবাদও ছিল না। নবজাগ্রত জাতীয়তাবাদই পুনরুজ্জীবনের উত্থানের কারণ। 'আনন্দমঠ' থেকে 'গোরা' পর্যন্ত সময়টা ছিল রিভাইভালবাদের মধ্যাহ্নকাল। রবীন্দ্রনাথ প্রভাব কাটিয়ে ওঠেন। 'সবুজপত্রে' যাঁকে পাই তিনি রেনেসাঁসের রবীন্দ্রনাথ।

প্রথম মহাযুদ্ধের পর দেখা গেল রেনেসাঁসের পাল থেকে হাওয়া সরে গেছে। কারণ খাস ইউরোপেই একটা হাওয়া বদল হয়েছে। জীবনের মূল প্রত্যয়গুলোই মার খেয়েছে বা ধ্বংস হয়েছে। কবিদের কেউ কেউ নিশ্চিতি অন্বেষণে ক্যাথলিক ডগমার আশ্রয় নিয়েছেন। রেনেসাঁস মানুষকে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল তার পরিণতি কি কমিউনিজম ও ফ্যাসিজম? না রেনেসাঁসের আদর্শের ভিতরেই বিনাশের বীজ নিহিত ছিল? দুই মহাযুদ্ধের মাঝখানে একটা হিসাবনিকাশের পালা চলে। তারপর দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ এসে আরেক দফা মার দেয় ও আরো বিধ্বংস ঘটায়। বাইরের ভাঙন পুনর্গঠিত হয়। কিন্তু ভিতরের ভাঙন চায়

নতুন নিশ্চিতি, নতুন বিশ্বাস, নতুন স্বপ্ন, নতুন কল্পনা। কেউ কেউ তার জন্যে রাশিয়ার বা চীনের দিকে চেয়ে আছেন। কেউ কেউ বা আমেরিকার দিকে। ইউরোপের নিজের বলতে যেটা ছিল সেটা আত্মরক্ষায় ব্যাপৃত। সেও করছে তার দুর্গরক্ষা। তারও স্বাধীনতা বিপন্ন। যদিও ঠিক আক্ষরিক অর্থে নয়। ইউরোপ যাকে রক্ষা করতে চায় তা দু'হাজার বছর আগেকার ইউরোপ নয়, গত তিন চার শতকের ইউরোপ।

এই যখন খাস ইউরোপের অবস্থা তখন তার কাছে থেকে যাঁরা প্রেরণা পেতেন তাঁদের অবস্থা করুণ। দেশ স্বাধীন হয়েছে। পুনরুজ্জীবনবাদের পুরোনো অজুহাত আর নেই, তবু পরাধীন ভারতের মতো স্বাধীন ভারতেও পুনরুজ্জীবনবাদ নতুন অজুহাতে কাজ করে যাচ্ছে। ইসলাম তার শত্রু, কমিউনিজম তার শত্রু। কিংবা তারাও নয়, প্রগতিশীল মতবাদ তার শত্রু। দেশের একভাগই অপরভাগের শত্রু। নূতনই পুরাতনের শত্রু। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সমন্বয় হতে পারে, কারণ একটার অস্তিত্ব অপরটার নাস্তিত্ব নয়। কিন্তু নূতন ও পুরাতনের সঙ্গে সমন্বয় কেমন করে সম্ভব? একটার অস্তিত্ব যে অপরটার নাস্তিত্ব। নূতন থাকলে পুরাতন থাকে না, পুরাতন থাকলে নূতন থাকে না। তাদের মধ্যে সম্ভব যেটা সেটা অন্বয়রক্ষা। তার বেশী রক্ষা করতে গেলে নূতনের বাড় বাধা পায়। বিদেশের হাত থেকে মুক্তি মিলবে কবে? যে যুগ পৃথ্বীরাজের ও পূর্বের?

রেনেসাঁস মানুষকে ধর্মনির্বিশেষে জাতিনির্বিশেষে, বর্ণনির্বিশেষে ও শ্রেণীনির্বিশেষে যে মহত্ত্ব দিয়েছে আর কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী তা দেয়নি। জাতীয়তাবাদও না, পুনরুজ্জীবনবাদও না, কমিউনিজমও না। আরো পুরাতন হিন্দুধর্মও না, ইসলামও না। সেইজন্যে মানব ইতিহাসে রেনেসাঁসের একটি মহৎ স্থান নির্দিষ্ট হয়ে রয়েছে ও থাকবে। তার আয়ুকাল যতই ক্ষীণ হোক না কেন। রেনেসাঁসের দরুন মানুষের মহত্ত্ব যদি বেড়ে গিয়ে থাকে তবে সে মহত্ত্ব স্বীকার করেছেন যাঁরা তাঁদেরও মহত্ত্ব বেড়ে গেছে। ধর্মযাজকদের চেয়ে বৈজ্ঞানিকদের মহত্ত্ব বেশী, দার্শনিকদের মহত্ত্ব বেশী, কবি ও নাট্যকারদের মহত্ত্ব বেশী, ভাস্কর ও চিত্রকরদের মহত্ত্ব বেশী, এটা গত চার পাঁচ শতাব্দীর লাভ। এই চার পাঁচ শতাব্দীর বেশীর ভাগ ভারতের বাইরে ছিল বলে ভারত তার থেকে কম লাভবান হয়নি। ভারত যদি নেপালের মতো পুরোপুরি তার বাইরে থাকত তা হলে সেই লাভ থেকে বঞ্চিত হতো। কূপমণ্ডুকের মতো স্বাধীন থেকে আফগানিস্থান যা পেয়েছে বাংলাদেশও তাই পেত। তাতে তার অষ্টাদশ শতাব্দী প্রলম্বিত হতো। ঊনবিংশ শতাব্দী বন্ধ্যা যেত।

একথা সত্য যে রেনেসাঁস জনগণের মধ্যে ছড়ায়নি। ধর্মই সেখানে ঘাঁটি গেড়ে বসেছে। ধর্মকে স্থানচ্যুত করে কমিউনিজম তার জায়গায় ঘাঁটি গেড়ে বসতে চায়, যেমন বসেছে রাশিয়ায় ও চীনে। এটা নাকি ইতিহাসের লিখন। কিন্তু এখনো এই লিখন সব দেশের মানুষের কপালে লেখা হয়নি। লেখা হয়ে থাকলে পড়া যাচ্ছে না। ভারতের ভাগ্য অনিশ্চিত। ভারতের সাধারণ লোক

ধর্মের কাছ থেকে যা পেয়েছে তাকে ভবিষ্যতের আশায় হাতছাড়া করতে চায় না। তেমনি শিক্ষিত মহল রেনেসাঁসের কাছ থেকে যেটুকু পেয়েছে সেইটুকুর মূল্য বোঝে। তার থেকে বঞ্চিত হলে তাদের চেহারা হতো টোলের পণ্ডিত ও মাদ্রাসার মৌলবীর মতো। তা দেখে জনগণ পায়ে লুটিয়ে পড়ত। কিন্তু জনগণের তাতে মাথা উঁচু হতো না। যেটুকু হয়েছে সেটাও রেনেসাঁসের হাওয়া লেগে হয়েছে। এবং স্বাধীনতা সংগ্রামে যোগ দিয়ে। গত শতাব্দীর নবজাগরণ ও বর্তমান শতাব্দীর গণজাগরণ তাদের উঠে দাঁড়াতে শিখিয়েছে। একটির অগ্রপথিক রামমোহন, অপরটির গান্ধী।

রামমোহন কেবল রেনেসাঁসের নন, রেফরমেশনেরও অগ্রণী। যদি রেফরমেশন শব্দটা প্রয়োগ করা যুক্তিযুক্ত হয়। রেনেসাঁসও কি যুক্তিযুক্ত নাকি? রামমোহনের যেমন দ্বৈত ভূমিকা গান্ধীজীরও তেমনি। তিনি ভারতের মুক্তি চেয়েছিলেন যেমন ব্রিটিশ শক্তির হাত থেকে তেমনি আধুনিক সভ্যতার হাত থেকেও। এই দ্বিতীয় ভূমিকায় তাঁকে মনে হতে পারে পুনরুজ্জীবনবাদীর মতো। কিন্তু তাঁর পরীক্ষা-নিরীক্ষার স্বাধীনতা অবিকল বৈজ্ঞানিকদের মতো। সে স্বাধীনতা তিনি গুরু পুরোহিত বা পণ্ডিতদের পায়ে সঁপে দেননি। করুণার অনুরোধে গোবৎসবধের বিধান দিয়েছেন। সাম্যের অনুরোধে হরিজন পাত্রের সঙ্গে ব্রাহ্মণ পাত্রীর বিবাহ দিয়েছেন। জন্মত দ্বিজ হয়েও উপবীত ধারণ করেননি। পেশী কী জানতে চাইলে বলেছেন চাষী ও তাঁতী। যে রামরাজ্যের স্বপ্ন তিনি দেখেছেন তা ত্রেতাযুগের রাজা রামের রাজ্য নয়, যীশু যাকে বলতেন ভগবানের রাজ্য। সেটাও একপ্রকার ইউটোপিয়া।

তবে এটাও ঠিক যে আধুনিক সভ্যতা বলতে ইউরোপে যা বোঝায় তা তিনি ইউরোপের পক্ষেও অহিতকর মনে করতেন। তাঁর মতে সেটা একটা রোগ। ইউরোপ থেকে সেটা ভারতেও সংক্রামিত হচ্ছে। তার আগে যে ইউরোপ ছিল তার সঙ্গে তাঁর বিরোধ ছিল না। পুঁজিবাদ ও শিল্পায়ন মিলে তাকে বিপথগামী করে। বিপথগামিতাকেই সে সভ্যতা বলে ভুল করে। একই ভুল করবে ভারত, যদি একইভাবে বিপথগামী হয়। আবহমানকালের পাশ্চাত্য সভ্যতার কতটুকু অংশ এই আধুনিক সভ্যতা! শুধু এই অংশটুকুর সঙ্গেই তাঁর কলহ, সমগ্র পাশ্চাত্য সভ্যতার সঙ্গে নয়। দেশ স্বাধীন হয়ে যদি এই বিপথ ধরে তা হলে দেশের সঙ্গেও তাঁর কলহ বাধবে। আধুনিকতার সংজ্ঞা তাঁর কাছে ছিল নেহাৎ সঙ্কীর্ণ। আরো প্রশস্ত হলে তাঁর বিচার অন্যরূপ হতো। সব দিক দেখার সুযোগ তিনি পাননি। দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে বা পরাধীন ভারত থেকে সব দিক দেখা যায় না। তা ছাড়া সমকালীন ইউরোপীয়দের অনেকে আধুনিক সভ্যতার বিরূপ সমালোচক ছিলেন। নীতির দৃষ্টিতেই তাঁরা দেখতেন! গান্ধীজীর দৃষ্টিও নীতির দৃষ্টি। টলস্টয়ের মতো, রাস্কিনের মতো।

"দেশকে স্বাধীন করতে সকলেই পারে। আমি চাই জনগণকে জাগাতে।" গান্ধীজী বলেছিলেন আগস্ট আন্দোলনের প্রাক্কালে। স্বাধীনতার সংগ্রাম তাঁর আগেই শুরু হয়েছিল, কিন্তু জনগণের জাগরণ তাঁর অপেক্ষায় ছিল। কোনো

পুনরুজ্জীবনবাদী নেতা এই কাজটি পারতেন না। জনগণকে বিভ্রান্ত করা সহজ, কিন্তু তাদের আস্থা অর্জন করা সহজ নয়। প্রাচীন ভারতে জনগণ বলতে বোঝাত শূদ্র বা ছোটলোক। শূদ্র মানেই ক্ষুদ্র। কোনো অধিকারই তাদের ছিল না। প্রাচীন ভারতকে ফিরিয়ে আনা বা সেখানে ফিরে যাওয়া তাদের দিক থেকে প্রতিক্রিয়া। কেনই বা তারা তেমন এক আদর্শের জন্যে লড়বে। পুনরায় শৃংখলিত হতে কে চায়।

আমাদের রেনেসাঁস, রেফরমেশন ও এনলাইটেনমেন্ট উনবিংশ শতাব্দীতেই ঘটেছিল। বাকী ছিল ফরাসী বিপ্লব। তারই সঙ্গে তুলনীয় এই গণজাগরণ। এটা একদিনে ঘটেনি। এর জন্যে মানসিক প্রস্তুতি চলেছিল শতখানেক বছর ধরে। সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতা তিনটি বনিয়াদী আদর্শ ছিল এর পশ্চাতে। মৈত্রীরই অন্য নাম অহিংসা। আমাদের রেনেসাঁস যেমন ইউরোপীয় রেনেসাঁসের হুবহু নকল নয় তেমনি আমাদের ফরাসী বিপ্লবও ইউরোপের ফরাসী বিপ্লবের নির্বিচার অনুকরণ নয়। দেশ অনুসারে কাল অনুসারে পাত্র অনুসারে ভিন্ন। একই স্পিরিট কাজ করছিল এদেশেও, সেইজন্যে এদেশেও রাজতন্ত্র তথা সামন্ত-তন্ত্রের পতন হলো। দেশীয় রাজ্যের বিলোপ, জমিদারির বিলোপ অনায়াসে সম্পন্ন হলো। তবে পুরোহিততন্ত্রের পতন হয়নি, তার বদলে হয়েছে ধর্ম-নিরপেক্ষ রাষ্ট্রের প্রবর্তন আমাদের সুদীর্ঘ ইতিহাসে এই প্রথম। ক্ষমতা হস্তান্তরের পূর্বে গান্ধীজীকেই বলতে শোনা যায় আমাদের রাষ্ট্র হবে ধর্ম-নিরপেক্ষ বা সেকুলার। ইতিমধ্যেই তিনি নিরীশ্বরবাদীদের কোল দিতে আরম্ভ করেছিলেন। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন যে সত্যই ভগবান। নিরীশ্বরবাদীও সত্যের সাক্ষাৎকার পেতে পারেন। এক শিষ্যকে এই মর্মে লিখেছিলেন, "কে জানে তোমার নিরীশ্বরবাদ হয়তো আমার ঈশ্বরবাদের চেয়ে নিকৃষ্ট নয়। হয়তো উৎকৃষ্ট।" সেই ব্রাহ্মণ শিষ্যের কন্যার বিবাহ হরিজন পাত্রের সঙ্গে নিরীশ্বরবাদী পদ্ধতিতে অনুষ্ঠিত হবে তাঁরই আশ্রমে ও তাঁরই উপস্থিতিতে, এই অনুরোধে সম্মত হবার পরেই তিনি নিহত হন। হত্যাকারীরা বর্ণাশ্রমবাদী হিন্দু।

ফরাসী বিপ্লব রুশ বিপ্লব নয়। ধনতন্ত্রের উচ্ছেদ তার অন্বিষ্ট নয়। সুতরাং ভারতের গণজাগরণ ততদূর যায়নি বলে তাকে দোষ দেওয়া যায় না। গান্ধীজীকেও দোষী করা যায় না। মার্কসবাদ ভারতে এসে পৌঁছয় প্রথম মহাযুদ্ধের পরে। মার্কসবাদী চিন্তার প্রসার হয় আরো দুই দশক বাদে। মার্কসবাদীরা যখন বিপ্লবের উদ্যোগ করেন তার আগেই দেশ হয়েছে স্বাধীন। জনগণ নতুন কোনো অগ্নিপরীক্ষার জন্যে প্রস্তুত নয়। গান্ধীজী তাঁদের বার বার তিনবার অগ্নিপরীক্ষায় ফেলে তাদের শক্তির সঞ্চয় নিঃশেষিত করেছিলেন। বাকী যেটুকু ছিল সেটুকু সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাহাঙ্গামায় লক্ষ্যভ্রষ্ট। লক্ষ্যে ফিরিয়ে না এনে নতুন কোনো পরীক্ষায় নিযুক্ত করা ছিল গান্ধীজীরও অসাধ্য। তাই তিনি অসহায়ভাবে দেশভাগ মেনে নেন। মার্কসবাদীরাও যে ব্যর্থ হবেন এটা বিচিত্র নয়। বিচিত্র এই যে তাঁরা রাজতন্ত্র ও সামন্ততন্ত্রের পতনের সঙ্গে সঙ্গে

একনিশ্বাসে ধনতন্ত্রের পতনও প্রত্যাশা করেছিলেন। যেখানে সাম্প্রদায়িকতার আগুন গান্ধীজীকেই দগ্ধ করেছে সেখানে মার্কসকেও কি করত না ?

মার্কসবাদের উদ্ভবও পশ্চিম ইউরোপে। সে যখন পৃথিবীর একপ্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে ছড়ায় তখন সেটা অসঙ্গত মনে হয় না। অসঙ্গতির কথা ওঠে রেনেসাঁসের বেলা। আসলে বৌদ্ধধর্মের মতো, খ্রীস্টধর্মের মতো, ইসলামের মতো আধুনিক যুগের বড়ো বড়ো মুভমেণ্টগুলিও সর্বত্রসঞ্চারী। আজকের দিনে আমরা দেখতে পাচ্ছি দেশকে দেশ ন্যাশনালিজম, ডেমোক্রাসী আর সোশিয়াল জাসটিস এই তিনটি সত্ত্ব স্বেচ্ছায় হোক বা অনিচ্ছায় হোক মেনে নিচ্ছে। তিনটির উৎপত্তি পশ্চিম ইউরোপে। যে পশ্চিম ইউরোপ আরো আগে রেনেসাঁস, রেফরমেশন ও এনলাইটেনমেণ্টের ভিতর দিয়ে গেছে। এইসব পর্যায় মানুষের মনের দুয়ার একটু একটু করে খুলে দিয়েছে। দুয়ার খোলা পেয়ে ওইসব আইডিয়া বা আইডিয়াল ক্রমে ক্রমে প্রবেশ করেছে। তবে সব দেশের বিবর্তন একই রকম নয়। আফ্রিকার দেশগুলিতে রেনেসাঁসের পূর্বেই ন্যাশনালিজম গিয়ে হাজির হয়েছে। তেমনি আরব দেশগুলির কয়েকটিতে ডেমোক্রাসীর পূর্বেই সোশিয়াল জাসটিস।

জব চার্নক কলকাতা বন্দর প্রতিষ্ঠা করার পর পিটার দ্য গ্রেট করেন পিটারসবুর্গ বন্দর প্রতিষ্ঠা। সমুদ্রপথে পশ্চিম ইউরোপের সঙ্গে রাশিয়াকে যুক্ত করে দেন। জার্মানীর এক রাজকুমারী পরে হন রাশিয়ার সম্রাজ্ঞী। ক্যাথরিন দ্য গ্রেট অষ্টাদশ শতাব্দীতে জার্মানীর মতো বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করেন। গড়ে ওঠে একটি বিদ্বৎসমাজ। এর পূর্বে রাশিয়াকে কেউ ইউরোপের অঙ্গ মনে করত না। রাশিয়ানরাও না। এর পরেও উভয়পক্ষের দ্বিধা যায় না। ইউরোপ সম্বন্ধে বঙ্কিমের যে মনোভাব টলস্টয় ও ডস্টয়েভস্কিরও সেই মনোভাব। অপরপক্ষে মাইকেলের যে মনোভাব টুর্গেনিভেরও সেই মনোভাব। লেনিন ছিলেন ইউরোপমনস্ক, স্টালিন ছিলেন রুশমনস্ক। রাশিয়া এখনো এ দোটানা কাটিয়ে উঠতে পারেনি। বোধহয় চায়ও না।

রাশিয়ার বরাত ভালো যে সেদেশে পিটার দ্য গ্রেট ও ক্যাথরিন দ্য গ্রেট গোড়াপত্তন করেছিলেন। চীনে তো এই শতাব্দীর প্রথম দশকেও দরজা জুড়ে বসেছিলেন মাঞ্চুসম্রাজ্ঞী। শাংহাই প্রভৃতি কয়েকটি জানালা দিয়ে ঢুকেছিল বাইরের আলো হাওয়া। তার ফলে যেটা হয়েছিল সেটা হয়তো একপ্রকার রেনেসাঁস, কিন্তু যেমন বিলম্বিত তেমনি দুর্বল। এরকম দেশ মার্কসবাদী হতে পারে, বিপ্লবের ভিতর দিয়ে যেতে পারে, কিন্তু 'একশোটি ফুল' ফোটাতে চাইলে কী হবে, একটিও ফুল ফোটাতে পারে না। রাশিয়ায় ও কাজটি বিপ্লবের পূর্বে এগিয়ে রয়েছিল, পরে এগিয়েছে, কিন্তু সাহিত্যে নয়, বিজ্ঞানে। রাশিয়ার লোক সাবেক আমলের ব্যালেকে চক্ষের মণির মতো রক্ষা করেছে, যদিও তা অভিজাতকুলের।

রেনেসাঁস যেখানে ঘটে সেখানে ধর্মযাজক বা মান্দারিন বা ব্রাহ্মণ বা উলেমার চেয়ে বৈজ্ঞানিক বা দার্শনিক বা নাট্যকার বা ভাস্করের মহত্ত্ব বৃদ্ধি

পায়। রেনেসাঁসের পূর্বে কেউ ভাবতেই পারত না লেওনার্দো বা শেকসপীয়ার বা গ্যালিলিও বা বেকনের কী মহত্ত্ব। মানুষকে এঁরা কত বড়ো উচ্চতায় নিয়ে গেছেন। সেসব এভারেস্ট বা কাঞ্চনজঙ্ঘায় আরোহণের জন্যে শত শত মানুষ জীবন পণ করেন। কেউ বা পৌঁছন, কেউ বা পথে মারা যান। পৃথিবীকে দেশ অনুসারে ভাগ না করে যুগ অনুসারে ভাগ করলে তিনটি যুগে ভাগ করা যায়। প্রাচীন যুগ, মধ্য যুগ ও আধুনিক যুগ। আধুনিক যুগ কোথাও আগে এসেছে, কোথাও পরে, কিন্তু সারা পৃথিবী জুড়ে এটা একটাই যুগ। এযুগে যেখানেই যিনি কাজ করে থাকুন না কেন সকলের জন্যেই করেছেন, সকলের হয়ে করেছেন। সেইজন্যে উনবিংশ শতাব্দীর বাঙালীরা এত সহজে শেকসপীয়ারকেও রোমান্টিক কবিদের আপনার করে নেন। দেশ কিংবা ভাষা সেখানে অন্তরায় হয় না। পরাধীনতা কিংবা পুঁজিবাদী শোষণ সেখানে রসভঙ্গ করে না। লোকে যেমন কবিরাজ ছেড়ে ডাক্তার ডাকে তেমনি মঙ্গলকাব্য ছেড়ে স্কট ডিকেন্স পড়ে। এই যে রুচিবদল এর থেকে আসে পালাবদল। সাহিত্যে নবযুগ। পুরাতনের সঙ্গে যার ভাষার মিল, কিন্তু ভাবের মিল পরদেশীর সঙ্গে। পরদেশী হলেও সে স্বকালের। কালগত ব্যবধান না থাকায় শেলী কীটস বায়রন নিকটতর, রামপ্রসাদ ভারতচন্দ্র দূরতর।

কিন্তু নিজের দেশেও যখন বায়রন ও স্কট জন্মালেন তখন বিদেশের বায়রন ও স্কট হলেন দূরতর। দেশগত ব্যবধান না থাকায় মাইকেল ও বঙ্কিম হলেন নিকটতর। স্বদেশীয়রা পৃষ্ঠপোষকতা না করলে স্বদেশী কারুশিল্প দাঁড়াতে পারবে না এটা যেমন সত্য, তেমনি সত্য স্বদেশীয়রা পৃষ্ঠপোষকতা না করলে স্বদেশী চারুকলাও দাঁড়াতে পারবে না। চারুকলার মধ্যে পড়ে কাব্য উপন্যাস নাটক। এই স্বদেশী মনোভাব থেকে আসে শেকসপীয়ার ছেড়ে কালিদাসের দিকে দৃষ্টিপাত। বায়রণ ছেড়ে মহাভারতের দিকে দৃষ্টিপাত। হারিয়ে যাওয়া খেই ফিরে পেতে আকাঙ্ক্ষা জাগে। অজন্তার খেই ফিরে পেয়ে চিত্রকরদের হাত খুলে যায়। পুরাণের খেই ফিরে পেয়ে নাট্যকারদের। এরই নাম রিভাইভাল। কিন্তু উপন্যাসের বা ছোট গল্পের বা প্রবন্ধের কোনো প্রাচীন আদর্শ পাওয়া গেল না, অগত্যা আধুনিক ইউরোপের দিকেই দৃষ্টিপাত করতে হলো। বিষয়টা রইল স্বদেশী, কিন্তু আঙ্গিকটা হলো আধুনিক, আধুনিকতর, অত্যাধুনিক। বিদেশের সঙ্গে তাল রেখে। প্লট চুরি করে বা ধার করে বিদেশীকেও স্বদেশী বলে চালিয়ে দেওয়া গেল।

প্রথম মহাযুদ্ধের পরে আসে গান্ধী উদ্বোধিত গণজাগরণ। গত শতাব্দীর নবজাগরণের মতো এই শতাব্দীর গণজাগরণও জগতের থেকে বিচ্ছিন্ন কোন ঘটনা নয়। গণসত্যাগ্রহও একপ্রকার বিপ্লব। এতে নীচের মানুষকে উপরে তুলে দেওয়া হয়, উপরের মানুষকে নিচে নামিয়ে দেওয়া হয়। রেনেসাঁসের সময় যেমন বৈজ্ঞানিক দার্শনিক প্রভৃতির মহত্ত্ব বেড়ে যায় রেভোলিউশনের সময় তেমনি সাধারণ লোকের, বিশেষ করে চাষী মজুরের। গণসত্যাগ্রহের দিন এরাই গণ। বিপ্লবের দিন এরাই বরযাত্রী।

সাহিত্যের আসরে কিন্তু এদের হাজির করা শক্ত। ক'জন সাহিত্যিক আছেন যাঁরা এঁদের সঙ্গে জুটে মাঠে ময়দানে রাজদ্বারে শ্মশানে গেছেন? আন্দোলনের ভিতর থেকে এঁদের দেখেছেন? পারতেন যাঁরা তাঁরাও রাজদ্রোহের ভয়ে পারেননি। তার চেয়েও ভয় নেতারা কী মনে করবেন। বাস্তবানুগ ছবি আঁকলে নেতাদের তো দেবতার মতো করে দেখানো যাবে না। দোষে গুণে মানুষের মতো করে আঁকতে হবে। দোষগুলো সাহিত্যে অমর হলে কোনু নেতা সেটা ক্ষমা করবেন? কাজগুলোও সব সময় বীরোচিত নয়। অথচ তাকে যদি মানুষের মতো করে আঁকা হয় তো আপত্তি উঠবে, আঁকতে হবে তাকে শয়তানের মতো করে।

আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের তথা গণজাগরণের বাস্তবানুগ কাহিনী অল্পই লেখা হয়েছে। একদিন হয়তো তা নিয়ে একটা মহাভারত লেখা হবে। যিনি লিখবেন তাঁকে দল ও মতের ঊর্ধ্বে উঠতে হবে। যাঁরা প্রত্যক্ষদর্শী তাঁদের পক্ষে এটা শক্ত। আর যাঁরা পাঁচজনের মুখে শুনেছেন তাঁদের বিবরণ হয়তো ঘটনার দিক থেকে শুষ্ক শীতল নিষ্প্রাণ।

ত্রিশের দশকের আগেই বস্তিবাসীকে সাহিত্যে আনা হয়েছিল, এর পরে আনা হলো চাষাভূষা জেলে মাঝিদের। এরা হয়তো সংগ্রামরত নয়। পরে যাদের আনা হলো তারা সংগ্রামী জনতা। কিন্তু তাদের সংগ্রাম দেশের জন্যে নয়, শ্রেণীর জন্যে। এটা জাতীয়তাবাদী লেখকদের পক্ষে অসম্ভব। সাম্যবাদী বা প্রগতিবাদী লেখকদের পক্ষেই সম্ভব। দেশ স্বাধীন হবার পূর্বেই শ্রেণী-সংগ্রাম সাহিত্যের আসরে জায়গা করে নেয়। স্বাধীনতার পরে জাতীয়তাবাদকে কোণঠাসা করে, যদি না সেটা হয় সন্ত্রাসবাদ।

কিন্তু গণজাগরণ থেকে যে জিনিসটি আশা করে গেছল সেই জিনিসটি হলো না। শিক্ষিত স্তরের সঙ্গে অশিক্ষিত স্তরের ব্যবধান লোপ। বামপন্থী কবির রচনাও শিক্ষিত ভিন্ন আর কেউ পড়ে না। আর কেউ বোঝে না। কেমন করে বলব ইনি জনগণের সভাকবি!

নবজাগরণের যুগেও যে প্রশ্ন উঠেছিল সেই একই প্রশ্ন গণজাগরণের যুগেও অন্যভাবে উঠেছে। ইউরোপীয় রেনেসাঁসের নায়করা ছিলেন লাটিনভাষায় শিক্ষিত। লাটিন রচনায় নিপুণ। তা সত্ত্বেও তাঁরা ইচ্ছে করেই লিখলেন ইটালিয়ান ফরাসী ইংরেজী প্রভৃতি লোকভাষায়। যাতে দেশের লোকের সঙ্গে মানসিক ব্যবধান না থাকে। এদেশেও তেমনি রামমোহন ও বিদ্যাসাগর ছিলেন সংস্কৃতভাষায় শিক্ষিত, বিদ্যাসাগর তো সংস্কৃত রচনায় নিপুণ। তবু ইচ্ছা করেই তাঁরা লিখতেন বাংলাভাষায়। যাতে দেশের লোকের সঙ্গে মানসিক ব্যবধান দূর হয়। ইউরোপে যেমন লাটিন তেমনি সংস্কৃত। ইউরোপে যেমন ইটালিয়ান ফরাসী ইংরেজী তেমনি ভারতে বাংলা হিন্দী মারাঠী। তাছাড়া পারসিক শিক্ষিত মহলও ছিলেন। পারসিক রচনায় সিদ্ধহস্ত। রামমোহনও তাঁদের একজন। কিন্তু নবজাগরণের সময় স্থির হয়ে যায় যে লোকভাষায় লিখতে হবে। পরবর্তীকালের ইংরেজী শিক্ষিতরাও ইংরেজী রচনায় নৈপুণ্য

সত্ত্বেও বাংলায় লেখার সিদ্ধান্ত নেন। যেমন মাইকেল ও বঙ্কিম। যাতে দেশের লোকের সঙ্গে মানসিক ব্যবধান না থাকে।

রবীন্দ্রনাথ, প্রমথ চৌধুরী প্রমুখ বাংলাভাষার লেখকরা ক্রমে উপলব্ধি করেন যে এও যথেষ্ট নয়। সাধু ছেড়ে চলতি বাংলায় লিখতে হবে। এরূপ উপলব্ধি চীনের লেখকদেরও হয়েছিল। প্রমথ চৌধুরী মহাশয়ের প্রচেষ্টা এতদিনে সফল হয়েছে। চলতি বাংলার প্রচলন বেশী। যদিও এ রীতি পূর্ব বাংলার নয় তবু পূর্ব বাংলার সাহিত্যিকরাও একে উৎসাহের সঙ্গে গ্রহণ করেছেন। কিন্তু এতদূর আসার পরও দেখা যাচ্ছে এ ভাষা শিক্ষিত মহলেরই ভাষা। ইংরেজী শিক্ষিত না হয়ে বাংলা শিক্ষিত হলেও তাঁরা শিক্ষিত। তাঁরা সংস্কৃতিমান। কালচারের মধ্যে একটা কর্ষণের ভাব আছে। তাঁরা কর্ষণ করেছেন। লাঙল দিয়ে নয়, বুদ্ধি দিয়ে, বিদ্যা দিয়ে। তাঁদের ভাষা ঠিক জনগণের ভাষা নয়, যদিও লেখেন কথ্যরীতিতে।

এ প্রসঙ্গে প্রমথ চৌধুরী মহাশয় একবার আমাকে বলেছিলেন এই মর্মে, "যে ভাষায় আমি লিখি সেটা কথ্যভাষা, কিন্তু সাধারণ লোকের মুখের ভাষা নয়। তাদের কাছে এখনো পৌঁছতে পারিনি।" এর জন্যে তাঁর মনে আফসোস ছিল।

সে আফসোস তাঁর একার নয়। বিদগ্ধ নাগরিকদের মার্জিত ভাষা যেন ভিটামিনবর্জিত ছাঁটা সিদ্ধ চালের ফ্যানগালা ভাত। তাতে না থাকে স্বাদ, না হয় পুষ্টি। তাছাড়া তাঁর মননও তাঁকে দূরের মানুষ করে। কথ্যরীতির দরুন ব্যবধান কমতে পারে কিন্তু উচ্চচিন্তার দরুন দূরত্ব থেকে যায়।

গণজাগরণের পূর্বেই বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ ও প্রমথ চৌধুরীর কথ্যরীতিতে লেখা আরম্ভ হয়ে যায়। গণজাগরণের পরে এটা আরো ব্যাপক হয়। কিন্তু প্রশ্নটা ব্যাপ্তির প্রশ্ন নয়। ব্যবধানলোপের প্রশ্ন। আমাদের বামপন্থী লেখকরা গণজাগরণের পরে এসেছেন। এঁদেরই তো লোকমুখের ভাষার সঙ্গে লেখনীরূপ ভাষার কোনোরূপ ব্যবধান না রাখা। কিন্তু লেখেন যাঁরা তাঁরা ভদ্রলোক। পড়েন যাঁরা তাঁরাও ভদ্রলোক, ভদ্রলোকদের পালিশ করা ভাষাতেই লেখা হয়। আঙ্গিক তো আরো সোফিস্টিকেটেড। এর জন্যে যে নাগরিকত্বের দরকার সে জিনিস জনগণের নাগালের বাইরে। যে নাগরিকত্বের দরকার সেটাও বহুপুরুষার্জিত। মতবাদ হয়তো অভিন্ন, কিন্তু মনের গড়ন যে ভিন্ন। একই রকম ইউনিফর্ম পরিয়েও একজন ভদ্রলোককে একজন শ্রমিকের সঙ্গে একাকার করতে পারা যাবে না। শ্রমিককে ভদ্রলোক করলেও করতে পারা যায়, কিন্তু ভদ্রলোককে শ্রমিক করা কারো সাধ্য নয়। যদি না তাঁকে জেলে পাঠিয়ে ঘানী ঘোরাতে বাধ্য করা হয়। কিংবা সমস্ত দেশটাকে একটা কারাগারে পরিণত করা হয়। তার মানে প্রোলিটারিয়াটের ডিকটেটরশিপ।

আমাদের সুদীর্ঘ ইতিহাসে কী না ঘটেছে! এটাই বা না ঘটবে কেন? গণতন্ত্রকে অন্তহীন সুযোগ কেউ দেবে না। যে সুযোগ দেওয়া হয়েছে তার সদ্ব্যবহার না করলে রাজতন্ত্রের মতো গণতন্ত্রও একদিন যাবে। তখন ডিকটেটর-

শিপ ব্যতীত আর কি বিকল্প। ডিকটেটরশিপ মাত্রেই প্রোলিটারিন নয়। দৃষ্টান্ত স্পেন। দৃষ্টান্ত গ্রীস। তাছাড়া দেশটা বৃহৎ ও বহুভাষী। সুতরাং আবার ভাগ হয়ে যেতে পারে। তারপরে কোথাও গণতন্ত্র, কোথাও একনায়কত্ব, কোথাও শ্রমিকের রাজত্ব, কোথাও সৈনিকের রাজত্ব। আমরা চেষ্টা করছি সবাইকে একসঙ্গে নিয়ে চলতে। ধর্মনির্বিশেষে। ভাষানির্বিশেষে। শ্রেণী-নির্বিশেষে। মতবাদনির্বিশেষে। এটা শুধু গণতন্ত্রেই সম্ভব। গণতন্ত্র যদি সকলের শ্রদ্ধা ও সহযোগিতা পায়।

গণজাগরণের পর থেকে জনগণের গুরুত্ব বেড়ে গেছে, অথচ নবজাগরণ যাদের গুরুত্ব দিয়েছিল সেই ভদ্রলোকশ্রেণীর গুরুত্ব কমেনি। কেনই বা কমবে? ভদ্রলোকরা কি সংস্কৃতির দায়িত্ব পালন করেননি? সাহিত্যকে বিজ্ঞানকে সঙ্গীতকে নাট্যকে ললিতকলাকে এগিয়ে দেননি? এই দেড়শো বছরের ইতিহাস কি অগ্রগতির ইতিহাস নয়? অগ্রগতি সব সময় সরল রেখায় হয় না, নদীর মতো আঁকাবাঁকা গতিও অগ্রগতি, স্পাইরালের মতো উঁচুনিচু গতিও অগ্রগতি। যেখানে রিভাইভালবাদ পেছনে টানছে সেখানে রেনেসাঁসবাদ সামনে টেনে নিয়ে যেতে বাধা পায়। তা সত্ত্বেও যদি আমাদের সংস্কৃতি চার পাঁচ শতাব্দীর পথ দেড় শতাব্দীতেই অতিক্রম করে থাকে তবে আমি তো বলব অসাধ্যসাধন করেছে। এদেশ শুধু যে পরাধীন ছিল তাই নয়। ছিল জগতের কালপ্রবাহ থেকে বিচ্ছিন্ন মরা গাঙ্। এখানে যে আবার প্রবাহ ফিরে এসেছে, জোয়ার ভাঁটা খেলছে, জাহাজ চলাচল করছে এর জন্যে আমাদের ঊনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর মুক্তমনা সাহিত্যিকদের ধন্যবাদ দিতে হয়।

তাঁদের প্রেরণা আসত প্রধানত দুটি উৎস থেকে। একটি তো প্রাচীন ভারত, অপরটি আধুনিক ভারত। ক্রমে ক্রমে দুটি উৎসই শুকিয়ে আসে। সংস্কৃত কাব্য ও নাটক থেকে নতুন কিছু পাওয়া যায় না। রামায়ণ মহাভারত থেকে পাওয়া যায়, কিন্তু নতুন রূপ দিতে সাধ্যে কুলয় না। রবীন্দ্রনাথ একবার আমাকে বলেছিলেন অর্জুনের চোখের উপর কৃষ্ণের পরিবারের নারীদের হরণ করে নিয়ে যায় দস্যুরা, কেউ কেউ স্বেচ্ছায় হৃত হয়, যেন আগে থেকে ঠিক করা ছিল যে তাদের প্রেমিকরা তাদের হরণ করে নিয়ে যাবে দস্যু সেজে। কেমন চমৎকার একটি বিষয় যা নিয়ে নাটক লেখা যায়। কিন্তু লিখবে কে? কবির বয়স গেছে, সাহস হয় না। লিখব আমরাই। কিন্তু আমরাও লিখিনে। কারণ লিখলে সেটা হবে ধর্মদ্রোহ। ভাগ্যিস মহাভারত লেখা হয়ে গেছল কৃষ্ণের অবতারত্ব প্রতিষ্ঠার পূর্বে। রামায়ণও রামের অবতারত্ব প্রতিষ্ঠার পূর্বে। এসব গ্রন্থ থেকে বিষয় নিয়ে তাকে নতুন রূপ দিলে ভক্তরা প্রকাশ বন্ধ করে দেবেন।

তার চেয়ে সোজা ইউরোপ থেকে ভাব সংগ্রহ করা ও তাকে নতুন রূপ দেওয়া। কিন্তু প্রথম মহাযুদ্ধ ও রুশবিপ্লবের পর পশ্চিম ইউরোপের মহিমা ক্রমেই অস্তাচলমুখী হয় ও আমাদের লেখকদের দৃষ্টি পড়ে রাশিয়ার উদয়াচলের উপর। পরে সেদিক থেকেও প্রতিহত হয়ে ফিরে আসে। বিনা বিচারে বা

নামমাত্র বিচারে বা স্বীকারোক্তির ভিত্তিতে শত শত ব্যক্তির প্রাণদণ্ড মধ্যযুগের খ্রীস্টীয় ইনকুইজিশনের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। পোপ যদি অভ্রান্ত না হয়ে থাকেন স্টালিনও কি অভ্রান্ত? সেই যে খটকা বাধে সেটা পরে আরো দৃঢ় হয়। পশ্চিম ইউরোপের মতো রাশিয়ার মহিমাও হ্রাস পায়। বাইরের দিকে তাকানো ছেড়ে আমরা ঘরের দিকে তাকাই, কিন্তু পুরাণের দিকে নয়। লোকসংস্কৃতির বহমান ধারার দিকে। এর থেকে রস আহরণ করি। কিন্তু আলো পাইনে। রূপও কি পাই? লোকসঙ্গীত যেমন মার্গসঙ্গীতের অভাব পূরণ করতে পারে না লোকসাহিত্যও তেমনি মার্গসাহিত্যের।

তবে প্রাণশক্তির অভাব হলে জনগণের জীবন সে অভাব পূরণ করতে পারে। যদি তারা থাকে মাটির কাছাকাছি। কিন্তু তারা যদি শহরে চলে আসে ও মাটির সঙ্গে সম্পর্ক না রাখে তবে তাদেরও প্রাণশক্তিতে টান পড়বে। সবকʼটি উৎস শুকিয়ে এলে সাহিত্য রচনাও অবক্ষয়ী হবে। মাটির সঙ্গে সংযোগ থেকেই প্রাণশক্তি। বিয়োগ থেকেই অবক্ষয়।

সাহিত্যকে ও সংস্কৃতিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। এর দায়িত্ব যদি ভদ্রলোকদের হাত থেকে আর কোনো শ্রেণীর হাতে যায় আমি একটুও দুঃখিত হব না। এই সম্প্রতি কারো কারো ভাগ্যে ধন সম্পদ জুটছে, নয়তো সরস্বতীর সেবকরা লক্ষ্মীর কৃপা থেকে চিরদিন বঞ্চিত। যে গাধাখাটুনি তাঁদের খাটতে হয় তার অনুপাতে পারিশ্রমিক তাঁদের অকিঞ্চিৎকর। শ্রমিক হলে তাঁরা পর্যাপ্ত মজুরির দাবীতে ধর্মঘট করতেন, ওভারটাইমের জন্য বাড়তি মজুরি চাইতেন, নিয়মিত ছুটি চাইতেন। শ্রমিকদের অবস্থার যখন আরো উন্নতি হবে তখন দেখা যাবে শ্রমিক হওয়াই অধিকতর লাভজনক। দুটি একটি বিভাগ বাদ দিলে সাহিত্যকর্মী অর্থকরী নয়। আর সেই দুটি একটি বিভাগে এত বেশী কর্মী যে অধিকাংশের বরাতেই লাভের ঘরে শূন্য। জীবিকার জন্যে অন্যকিছু করতে হয় বলেই সাহিত্যকর্মে শ্রমদান পোষায়। কিন্তু এমনও হয় যে সেই অন্যকিছুর পেছনে সমস্ত শক্তি যায়, সাহিত্যকর্মের জন্যে উদ্বৃত্ত যেটুকু থাকে সেটুকু অতি সামান্য। উনবিংশ শতাব্দীর ইউরোপ এর একটা সমাধান করেছিল। লেখকদের অনেকের ছিল বাপ খুড়োর পিসি মাসির রেখে যাওয়া টাকা বা সম্পত্তি। এদেশে তার উদাহরণ রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রনাথ, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথ। বিংশ শতাব্দীতে করবৃদ্ধির ফলে লেখকদের সেই প্রাইভেট আয়ের স্বর্গসুখ গেছে। তবে পাঁচরকমের উপার্জনের পন্থা খোলা আছে। এদেশে সেটারও অভাব।

মোট কথা সাহিত্যের কাজ হচ্ছে প্রেমের শ্রম। যে প্রেমিক সেই শ্রমিক। পারিশ্রমিক কেউ পায় কেউ পায় না। যে পায় সে পাওনার চেয়ে কম পায়। এইভাবেই এতদিন কাজের লোক পাওয়া গেছে। এর পরে যদি না পাওয়া যায় তবে সাহিত্যের অনেকগুলি বিভাগ অপুষ্ট থাকবে। উপন্যাসের অতিস্ফীতিই সাহিত্যের সর্বাঙ্গীণ বিকাশ নয়। যাঁর উপন্যাস লেখার কথা নয়, তিনিও বছরে চারখানা উপন্যাস লিখছেন। কবিতার হাত হারাচ্ছেন, প্রবন্ধের জন্যে সময়

করে উঠতে পারছেন না। সেকালে অভিজাত শ্রেণীর পক্ষে কতকগুলি অবশ্য-করণীয় কৃত্য ছিল, যার বিনিময়ে তাঁরা পেতেন সম্মান। তাঁদের সেই কৃত্যকে বলা হতো নোবলেস অবলিজ। তেমনি ভদ্রলোক শ্রেণীর পক্ষে অবশ্যকরণীয় একটি কৃত্য হচ্ছে সংস্কৃতির জন্যে শ্রম। এটাও একরকম নোবলেস অবলিজ।

একদা অভিজাত শ্রেণীর যে সাংস্কৃতিক দায় ছিল সে দায় এখন ভদ্রলোক শ্রেণীর উপর বর্তেছে। এই শ্রেণী যদি সংস্কৃতিকে কেনা-বেচার একটা ব্যাপার করে তোলে ও তাই নিয়ে ব্যবসাদারী করে তবে তার শেষ ফল হবে লোভে পাপ ও পাপে মৃত্যু। কতক সাহিত্যিককে মনে মনে বেছে নিতে হবে এমন এক পথ যেটা বিত্তময়ী সৃঙকা নয়। অথবা নয় সাহিত্যকে দিয়ে সামাজিক বা রাজনৈতিক উদ্দেশ্যসিদ্ধির পন্থা। সাহিত্যিকদের সত্যিকার কমিটমেণ্ট সত্যের কাছে, সৌন্দর্যের কাছে, প্রেমের কাছে। প্রথমটা বৈজ্ঞানিকের মতো, দ্বিতীয়টা শিল্পীর মতো,. তৃতীয়টা ধার্মিকের মতো। এর কোনোটিই রাজনীতিকের মতো বা সৈনিকের মতো নয়। তবে কোনো সাহিত্যিক যদি অন্তরে তেমন কোনো তাগিদ অনুভব করেন সে স্বাধীনতা তার আছে। তখন সেটাই তাঁর কর্তব্য। এর জন্যে তাঁর হয়তো বহু দুর্ভোগ পোহাতে হবে। স্পেনের গৃহযুদ্ধে ঝাঁপ দিতে গেছলেন কয়েকজন ইংরেজ লেখক। আরো এক শতক আগে গ্রীসের যুদ্ধে বায়রন। এদেশের স্বাধীনতাসংগ্রামে যোগদানেরও নজীর আছে।

সংস্কৃতিকে এগিয়ে দেওয়া এক কথা। সমাজকে পালটে দেওয়া আরেক। এই দ্বিতীয় কৃত্যটি স্বেচ্ছায় ঘাড়ে তুলে নিয়েছিলেন রুশো, ভলতেয়ার ও দিদেরো। তা বলে সেটি লেখকমাত্রেরই ঘাড়ে তাঁর অনিচ্ছাসত্ত্বেও চাপিয়ে দেওয়া যায় না। সমাজকে পালটানোর ভার নিলে সাহিত্যসৃষ্টির উপর লক্ষ্য রাখা শক্ত। লক্ষ্যভ্রষ্ট রচনা সামাজিক পরিবর্তন ঘটালেও সাহিত্যে উচ্চ স্থান পায় না। সাহিত্যিককে সেইজন্যে ফরমাস করতে নেই, করলে সেটা হবে লক্ষ্যভ্রষ্টতার নির্দেশ। যাঁরা ভিতর থেকে অনুশাসন পান তাঁরা তাকে প্রতিরোধ করতে পারেন না।. সেটাও একপ্রকার নোবলেস অবলিজ। মানুষের আরও পাঁচটা দিক আছে। একজন সাহিত্যসৃষ্টি করেন বলে সমাজসংস্কারও করেন না তা নয়। একই লেখনী দুই কাজে নিযুক্ত হয়। যাঁর কাজ সমাজ-সংস্কার তিনিও করেন সাহিত্যসৃষ্টি। রামমোহন, বিদ্যাসাগর, রবীন্দ্রনাথ প্রত্যেকের ছিল একাধিক সত্তা। বঙ্কিমচন্দ্রেরও ছিল, কিন্তু তিনি সমাজসংস্কার না সমাজসংস্করণ কোনটার সহায়তা করেছিলেন বলা কঠিন। শরৎচন্দ্র তাঁর বিধবা নায়িকাদের বিয়ে দেননি। একথা তিনি নিজেই লিখেছিলেন আমাদের এক বিখ্যাত মহিলা কবিকে।

রেনেসাঁসের মূল্যগুলি ইউরোপের যেসব দেশে অনেক দুঃখে অর্জিত হয়েছে সেসব দেশ সামাজিক ন্যায়ের অনুরোধেও পাঁচ শতাব্দীর পথ পিছু হটতে রাজী নন। যখন ছিল কর্তার ইচ্ছায় কর্ম তা তিনি যিনিই হোন—রাজা অথবা পোপ। একালে তার প্রতিরূপ রাষ্ট্রের অধিনায়ক ও পার্টির পরিচালক। আমাদের এখনো দেড় শতাব্দী যায়নি। অর্জনের জন্যে তেমন কিছু দুঃখও

পোহাতে হয়নি। চিন্তার স্বাধীনতা, বচনের স্বাধীনতা, ছাপার হরফের স্বাধীনতা, প্রকাশের স্বাধীনতা, সভাসমিতির স্বাধীনতা, আন্দোলনের স্বাধীনতা যখনি বাধা পেয়েছে তখনি বিলেতের লিবারল বন্ধুরা তার জন্যে লজ্জিত হয়ে সেখানকার কর্তাদের কাছে আপীল করেছেন ও তাঁরা হস্তক্ষেপ করেছেন। দেশেব স্বাধীনতা ফিরে পাওয়া যেমন দুঃসাধ্য হয়নি, তেমনি ব্যক্তির স্বাধীনতা হরণ করাও সহজ হয়নি। সরকারেরও জবাবদিহির দায় ছিল ব্রিটিশ পার্লামেণ্ট ও জনমতের কাছে। ব্রিটিশ শাসন বাদশাহী শাসন ছিল না। ব্যক্তিস্বাধীনতা অনায়াসলভ্য ছিল বলেই সরকারী চাকুরিতে থাকার সময় বিদ্যাসাগর, মাইকেল, দীনবন্ধু, বঙ্কিমচন্দ্র, রমেশচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, দ্বিজেন্দ্রলাল অমন অবাধে অজস্র লিখতে পেরেছিলেন। কিন্তু সরকারী চাকুরি করলেও এঁরা কেউ কর্তার ইচ্ছায় লেখনী ব্যবহার করেননি। প্রশস্তি রচনা করেননি। সভাকবি বা দরবারী সাহিত্যিক হননি। ব্রিটিশ ভারত দেশীয় রাজ্য ছিল না। তার পাশেই ছিল অপর এক ঐতিহ্য। কিন্তু আমাদের রেনেসাঁস সে ঐতিহ্য অনুসরণ করেনি। তাই আমাদের লেখকরা ছিলেন স্বাধীন লেখক। স্বাধীন দেশের লেখক না হয়েও স্বাধীন লেখক হওয়া যেত। এটা ছিল ব্রিটিশ রুদ্রের দক্ষিণ মুখ।

দেশ এখন স্বাধীন হয়েছে। এখন তো সবাই আমরা স্বাধীন লেখক। ব্যক্তিস্বাধীনতা আমাদের সংবিধানসম্মত অধিকার। একে প্রাণপণে রক্ষা করতে হবে। রক্ষা করার শ্রেষ্ঠ উপায় সদ্ব্যবহার করা। যারা স্বাধীনতার সদ্ব্যবহার করে না তারা তার যোগ্য নয়। সেটা আপনি হারিয়ে যায় বা অপহৃত হয়। লেখকের স্বাধীন লেখনীই তার সেরা সম্পদ। স্বাধীনতার বিনিময়ে আর কোনো সম্পদ কখনো সেরা সম্পদ হতে পারে না। আজকের দিনে যে প্রলোভন আমাদের সামনে ঝুলছে তেমন কোনো প্রলোভন আগেকার দিনে ছিল না। প্রলোভন মানুষকে পরীক্ষা করে। এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়াই মনুষ্যত্ব। নির্যাতনের পরীক্ষাও অন্তর্হিত হয়েছে তা নয়। ক্ষুরধার পন্থা। একধারে হেললে প্রলোভন, আরেক ধারে হেললে নির্যাতন। অপ্রমত্ত হতে হবে।

যে দেশ যে সরকারের যোগ্য সে দেশ সেই সরকার পায়। তেমনি যে জাতি যে সভ্যতার বা যে সংস্কৃতির যোগ্য সে জাতি সেই সভ্যতা বা সেই সংস্কৃতি পায়। আমরাও পেয়েছি। আমি এর জন্যে গৌরব বোধ করি। এই দেড় শতকের মধ্যে আমরা স্বাধীনতাহীনতার হীনতা কাটিয়ে উঠেছি। তেমনি আধুনিকতাহীনতার দীনতা। আমাদের সাহিত্য এখন স্থিতিশীল নয়, গতিশীল তথা প্রগতিশীল। তবে সব অঙ্গ সমান পুষ্ট নয়। সামনের দেড়শো বছর হয়তো অপুষ্ট অঙ্গের পুষ্টি হবে। সাংস্কৃতিক যেসব বিভাগ সাহিত্যের তুলনায় পশ্চাদ্‌পদ তারাও অগ্রসর হয়ে সাহিত্যের সঙ্গে পা মেলাবে। ফ্রান্সে যেমন সাহিত্য ও চিত্রকলা পরস্পরের সঙ্গে পা মিলিয়ে চলে।

ভারতকে একটা উপদ্বীপ বলা হয়। আসলে কিন্তু এটা একটা মহাদ্বীপ। হিমালয়ও এককালে একটা সমুদ্র ছিল। এখনো সমুদ্রের মতো পথ রোধ

করে রয়েছে। হাজার হাজার বছর ধরে ভারতের লোক দ্বৈপায়ন। তাদের মনটাও ইনসিউলার। চার যুগ, চার বর্ণ, চার আশ্রম তাদের মনের চার দেয়াল। সেই চার প্রাচীরের অন্তরালে জনমানস অবরুদ্ধ। ইংরেজী শিক্ষার পণ্ডিতরাও সংস্কৃত শিক্ষার পণ্ডিতদের ভাষায় কথা বলেন। এরপরে যখন বাংলা শিক্ষার পণ্ডিতরা সমাসীন হবেন তাঁদের কথাবার্তাও হয়তো একই রকম হবে। শিক্ষার সঙ্গে সংস্কৃতির সম্পর্ক অতি ঘনিষ্ঠ। ঊনবিংশ শতাব্দীতে আমাদের শিক্ষা যদি নতুন মোড় না নিত আমাদের সাহিত্যও নতুন মোড় নিত না। প্রাচীনকালের শিক্ষাব্যবস্থা ছিল সংস্কৃতিভিত্তিক। ব্রাহ্মণরাই তার সুযোগ পেতেন। তাই সাহিত্যও ছিল ব্রাহ্মণদের হাতে গড়া। আধুনিককালের শিক্ষাব্যবস্থা হচ্ছে ইংরেজীভিত্তিক। ভদ্রলোকরাই তার সুযোগ পান। তাই সাহিত্যও ভদ্রলোকদের হাতে গড়া। প্রাচীনকালের সাহিত্যের মতো আধুনিককালের সাহিত্যেরও পায়ের তলার মাটি সংকীর্ণ। শিক্ষা যদি বাংলাভিত্তিক হয় ও জনগণ তার সুযোগ পায় তাহলে শিক্ষার মোড় থেকে আসবে নতুন সাহিত্য। এটা যেমন একটা প্রিয় সম্ভাবনা আর একটা তেমনি হচ্ছে বিশেষ মুখ্য স্রোতের সঙ্গে ভারতের অন্তঃস্রোতের সংযোগ যেটুকু ঘটেছিল সেটুকু ছিন্ন করে দ্বৈপায়নত্বের পুনঃপ্রতিষ্ঠা। এবার জনগণের কর্তৃত্বে।

নবজাগরণ থেকে আধুনিক সাহিত্য ও আধুনিক সংস্কৃতি এর মধ্যে একটা পারম্পর্য আছে। তেমনি গণজাগরণ থেকে গণসাহিত্য ও গণসংস্কৃতি এর মধ্যেও আর একটা পারম্পর্য। দুই পারম্পর্যের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করতে হবে আমাদের উপর এই ভার পড়েছে, যেমন আমাদের পূর্বসূরীদের উপর পড়েছিল প্রাচীন ভারত ও আধুনিক ইউরোপ দুই পক্ষের মধ্যে সমন্বয়-সাধনের ভার। নবজাগরণের লাভগুলিকে ত্যাগ করলে জনগণেরও ক্ষতি হবে। সেটা বুঝতে ওদের সময় লাগবে। যারা বোঝে তাদের কর্তব্য হবে লাভগুলিকে হাতছাড়া না করা। উপরন্তু গণজাগরণ থেকে যা লাভ করা গেছে ও যাবে সেসব লাভকেও হাত পেতে নেওয়া। জনগণের মধ্যে নতুন একটা জগৎ নিহিত রয়েছে। বীজের মধ্যে যেমন বনস্পতি। তাকে সাদরে বরণ করতে হবে। তেমনি তার কাছেও আশা করতে হবে সশ্রদ্ধ স্বীকৃতি।

গণজাগরণ যখন খুশি যেখানে খুশি ঘটানো যায় না। তার আগে নবজাগরণ ঘটে থাকা চাই। ইউরোপের ইতিহাসে দেখা যায় আগে রেনেসাঁস, তার পরে রেফরমেশন, তারপরে এনলাইটেনমেণ্ট, তার পরে ফরাসী বিপ্লব। মোটামুটি এই পরম্পরা রাশিয়াতেও অনুসৃত হয়েছে। ভারতেও। যদিও আমাদের গণজাগরণকে বিপ্লল বলে গণ্য করা হয় না। বিপ্লব হয়তো ভবিষ্যতে আসবে। কিন্তু তার আগে যেসব পর্যায় পার হওয়া গেছে সেগুলিকে অস্বীকার করে নয়। রেনেসাঁস যেখানে ঘটেনি রেভোলিউশন সেখানে ঘটে না। ঘটলে ধোপে টেকে না।

মানুষের সুদীর্ঘ ইতিহাসে বিপ্লব যে কখনো কোথাও ঘটেনি তা নয়, কিন্তু ফরাসী বিপ্লবের আগে কোনো দাগ রেখে যায়নি। ফরাসী বিপ্লব একসঙ্গে

চার্চকে ও রাষ্ট্রকে, পোপকে ও রাজাক, শাস্ত্রকে ও শস্ত্রকে নস্যাৎ করতে চেয়েছিল। আমাদের গণজাগরণ ততদূর যায়নি, যেতে সাহস পায় নি। শাস্ত্র সম্বন্ধে আমাদের নেতাদের মনোভাব ছিল সংস্কারের। বিপ্লবীর নয়। শাস্ত্র সম্বন্ধে মহাত্মাজীর মনোভাব অহিংস অর্থে বৈপ্লবিক, কিন্তু অন্যান্য নেতাদের মনোভাব জাতীয়তাবাদী। চার্চ তো আমাদের ছিলই না, পোপের মতো যাঁরা ছিলেন তাঁরা ক্ষমতাহীন। রাষ্ট্র আর রাজার বিরুদ্ধেই আমাদের গণজাগরণ। সঙ্গে সঙ্গে রাজন্য ও জমিদারদেরও বিরুদ্ধে। তবু এর মধ্যে একটা mystique ছিল। সেটা সঞ্চার করেছিলেন আমাদের মহান নেতা গান্ধীজী। তিনি ছিলেন নৈরাজ্যবাদী। রাষ্ট্র তাঁর হাতে পড়লে তার বিকেন্দ্রীকরণ হতো। প্রত্যেকটি গ্রামই হতো স্বাধীন ও স্বাবলম্বী। সঙ্গে সঙ্গে শিল্পবাণিজ্যেরও হতো বিকেন্দ্রীকরণ। সৈন্যদল থাকত না। থাকলে অতি ক্ষুদ্র আকারে। দেশ বিপন্ন হলে প্রত্যেকটি নাগরিক নিরস্ত্রভাবে লড়ত। কেমন করে লড়তে হয় গান্ধীজীই সেটা শেখাতে চেয়েছিলেন।

কিন্তু গান্ধীজীর পেছনে ভারতে কোনো ভাবুক পরম্পরা ছিল না। পরম্পরা যেটা ছিল সেটা পশ্চিমে। থোরো, রাস্কিন, টলস্টয় ও তাঁদেরি মতো কয়েকজন ভাবুক তাঁর পূর্বসূরী। ভারতীয়দের মধ্যে যাঁদের তিনি মানতেন তাঁবা রেনেসাঁসের নায়ক নন রিভাইভালের নায়ক। এক গোখলে বাদে। প্রাচীন ভারতে নৈরাজ্যবাদের মূল সন্ধান করা বৃথা। সে ভারত ছিল ঘোরতর রাজতন্ত্রী ও পুরোহিততন্ত্রী। তাকে পুনরুজ্জীবিত করলে তার বিরুদ্ধে নতুন করে লড়তে হতো। গৃহযুদ্ধের ভিতর দিয়ে যেতে হতো। গান্ধীজী স্বয়ং রিভাইভালের ঊর্ধ্বে উঠলেও তাঁর শিষ্যরা এখনো তার মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছেন। এঁরা টলস্টয়, থোরো, রাসকিনের নামও করেন না। এঁদের পেছনে তেমন কোনো ভাবুক পরম্পরা নেই। আছেন যাঁরা তাঁরা প্রাচীন ও মধ্যযুগের সাধক ও সাধু। রেনেসাঁস থেকে এরা শতহস্ত দূরে। শুধুমাত্র নৈতিক প্রভাবের দ্বারা কোথাও কোনো বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটেনি। ইতিহাস কি চায়, কোন্ অভিমুখে যাচ্ছে, কেমন করে লক্ষ্যস্থলে পৌঁছবে, সবচেয়ে কম রক্তপাতে বা কম হিংসায় সবচেয়ে বেশীদূর অগ্রসর হবার উপায় কী, এসব প্রশ্নের উত্তর দিতে না পারলে নেতৃত্ব তাঁদের হাত থেকে চলে যাবে।

মার্কস শিষ্যদের কাছে হয়তো বিকল্প নেতৃত্ব প্রত্যাশা করা যেত। কিন্তু তাঁদেরও ধারণা ইতিহাস রেনেসাঁস, রেফরমেশন ও এনলাইটমেণ্ট নামক ধাপগুলি ডিঙিয়ে একলম্ফে রেভোলিউশনে পৌঁছতে পারে। এরকম ধারণা স্বয়ং মার্কসের ছিল না। রেভোলিউশনের ভবিষ্যদ্বাণী তিনি করেছিলেন পশ্চিম ইউরোপের জন্যে। যেখানে ওই ধাপগুলি আগেই পার হওয়া গেছল। রাশিয়ার বিপ্লবীরা তাকে সেদেশেও ঘটাতে চাইলেন। পারলেন যে তার অন্যতম কারণ সেদেশেও কতক পরিমাণে রেনেসাঁস ও এনলাইটেনমেণ্ট সম্পন্ন হয়েছিল। রেফরমেশন যদিও হয়নি তবু এনলাইটেনমেণ্টের প্রভাবে রুশদেশের মার্কস-পন্থীরা সকলেই ছিলেন নিরীশ্বরবাদী। ধর্মকে তাঁরা মনে করতেন জনগণের

আফিম। এসব কথা চীন সম্বন্ধেও মোটামুটি খাটে। চীনারা বৌদ্ধই হোক আর কনফিউসিয়ানই হোক ঈশ্বরবাদী নয়। মানুষের মন বদলে না দিয়ে শুধুমাত্র বাইরের অ্যাকশন দিয়ে যা হয় তা বিপ্লব নয়, বিদ্রোহ বা বিক্ষোভ। যেমন সিপাহীবিদ্রোহ।

আমাদের রেনেসাঁসের নায়কদের ঐতিহাসিক ভূমিকা ছিল দেশের লোককে আধুনিক যুগের লোক করে তোলা। আধুনিকতা নিছক সমকালীনতা নয়। সমকালীন হলেই আধুনিক হয় না। আধুনিক শব্দটির অর্থ আর একটু সূক্ষ্ম। সে অর্থে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর আধুনিক কিন্তু ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত নন। মধ্যযুগেও এমন কবি দু'চারজন ছিলেন যাঁরা এই সূক্ষ্মতর অর্থে আধুনিক। প্রাচীন গ্রীসে তেমন কবি বা নাট্যকার দার্শনিক অনেক বেশী ছিলেন। মহাভারত পড়তে পড়তে মাঝে মঝে মনে হয় যিনি বা যাঁরা লিখেছিলেন তিনি বা তাঁরা কারো চেয়ে কম আধুনিক ছিলেন না। আসলে যুগটা আধুনিক বলে সব সৃষ্টি আধুনিকতাসম্পন্ন নয়। আবার যুগটা আধুনিক নয় বলে সব সৃষ্টি আধুনিকতাবর্জিত নয়।

আধুনিকতা তাহলে কী? এর সংজ্ঞা দেওয়া সহজ নয়। এর লক্ষণ হচ্ছে, সবকিছু জানার জন্যে সব কিছু বোঝার জন্যে সব কিছু নেড়েচেড়ে দেখার জন্যে স্বাভাবিক কৌতূহল। তার জন্যে অবাধ স্বাধীনতা। বিপজ্জনক অ্যাডভেঞ্চার। অবিরত পরীক্ষা নিরীক্ষা। শাস্ত্রবাক্য গুরুবাক্যকে শেষকথা বলে ধরে না নেওয়া। ব্যাক্তির বিচারবিবেকের উপর আত্মকর্তৃত্ব। দেহের সৌন্দর্যে আনন্দ। ইন্দ্রিয়ের বিচিত্র বোধ। হৃদয়ের বিচিত্র অনুভূতি। সত্যের জন্যে নিত্য ব্যাকুলতা, নিত্য উদ্যোগ। নিজের মতো করে বাঁচা। জীবনকে ভরিয়ে নেওয়া। মরণকে ভয় না করা। পরকাল বা পরলোক নিয়ে মাথা না ঘামানো। ইহকাল ও ইহলোকের কাজ নিখুঁতভাবে করে যাওয়া। আদর্শকে এই জগতেই ও এই জীবনেই যথাসাধ্য রূপায়িত করা। নতুনের জন্যে মনের দুয়ার সব সময় খোলা রাখা। অতীতকেই ভবিষ্যতের ধ্রুবতারা না করা।

আজকাল সব দেশের উপরের স্তরের দিনযাপন ও নিশিবিহারের ধারা প্রায় একই প্রকার। শিল্পবিপ্লব থেকে উদ্ভূত সমস্যাগুলোও প্রায় একই জাতের। এর নাম সমকালীনতা, আধুনিকতা নয়। সত্যিকার আধুনিকতা আরো গভীর স্তরের ব্যাপার। রেনেসাঁস, রেফরমেশন, এনলাইটেনমেণ্ট যেসব দেশে হয়নি সেসব দেশ আধুনিক যন্ত্রপাতির বা অস্ত্রশস্ত্রের দৌলতে ভারতের তুলনায় সম্পদশালী বা শক্তিশালী হতে পারে কিন্তু গভীরতর অর্থে আধুনিক নয়। এই দেড়শো বছরে আমরা তাদের তুলনায় আরো আধুনিক হয়েছি। নবলব্ধ স্বাধীনতা আমাদের আধুনিকতার সহায়ক হবে। তা বলে ইংরেজ আমলও যে সহায়ক ছিল না তা নয়। মনটাকে প্যাশনমুক্ত করে বিচার করলে বোঝা যাবে ইংরেজ আমল নানা দিক দিয়ে পূর্বের চেয়ে প্রগতিশীল ছিল। প্রত্যেক পুরুষেই উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটে। সব মিলিয়ে যা ঘটে তা ঐতিহাসিক বিবর্তন। তাতে ভারতীয়দের যেমন হাত ছিল তেমনি ইংরেজদেরও হাত।

হাতাহাতি হয়নি তা নয়, কিন্তু হাত ধরাধরিও হয়েছে। যে যুগ চলে গেছে তার ষোল আনা নিন্দাবাদ করা সত্যভাষণ নয়। আমরা এগিয়েছি ঠিকই। হয়তো আরো বেশী এগোতে পারতুম। বাধা পেয়েছি।

কিন্তু বাধা কেবল বাইরে থেকেই আসেনি। আমাদের অতি পুরাতন ঐতিহ্যও আমাদের বাধা। কিন্তু সেক্ষেত্রেও মনটাকে প্যাশনমুক্ত করে বিচার করতে হবে। এ দেশটা ইংলন্ড বা আমেরিকা নয়, রাশিয়া বা জার্মানী নয়। এটা ভারত। ভরোতরও একটি মুখ্য স্রোত আছে। সে স্রোত আর্যপূর্ব যুগ থেকে প্রবহমাণ। কত জাতি, কত ভাষা, কত ধর্ম, কত দার্শনিক তত্ত্ব তার সামিল হয়ে তার বৈচিত্র্য বৃদ্ধি করেছে। তাকে বৈশিষ্ট্য দিয়েছেও। ভারতের যে ঐতিহ্য তাকে তুলনা করতে পারি গঙ্গার সঙ্গে। গঙ্গার মতো সে আদিকালের গঙ্গোত্রী থেকে নির্গত হয়ে একালের গঙ্গাসাগরসঙ্গমে বহির্জগতের মহত্তর ঐতিহ্যের সঙ্গে মিলিত হয়েছে। এই যে মহত্তর সাগর এর জোয়ার এসেছে গঙ্গার বুকে বঙ্গোপসাগরের জোয়ারের মতো।

আর্য ও আর্যপূর্ব, বৌদ্ধ ও বৌদ্ধপূর্ব, মুসলিম ও মুসলিমপূর্ব, আধুনিক ও আধুনিকপূর্ব, ভারতের বিবর্তনের এই চারটি পর্বকেই ইতি-হাসের বিধান বলে মেনে নিতে হবে। এক একটি পর্বের ভালো আর মন্দ দুটি করে দিক। দুই দিকই সত্য। মন্দের জন্যে ভালোকে অস্বীকার করা ভুল। মানবিক ব্যাপাবে ভালো মন্দ একসঙ্গে জড়িয়ে থাকে। বেনেসাঁসের ভিতরেও প্রচুব কলুষ ছিল যেমন ইটালীতে তেমনি ইংলন্ডে। রেফরমেশনও ছিল রেভোলিউশনের মতো রক্তাক্ত যেমন জার্মানীতে তেমনি ফ্রান্সে। আর এনলাই-টেনমেণ্ট সম্বন্ধেও একালের সমালোচকরা তেমন সপ্রশংস নন। তার নায়করা নাকি বিশ্বাস করতেন যে একজন প্রজাহিতৈষী স্বৈরাচারী রাজা যতখানি মঙ্গল সাধন করতে পারবেন একটা অনাচারী গণতন্ত্র ততখানি নয়। এতে সাধারণ ভোটদাতার উপর অবিশ্বাস প্রকাশ পায়। আখেরে মানবপ্রকৃতির উপর। পক্ষান্তবে এটাও তো দেখা গেল জার্মানীর সাধারণ ভোটদাতাদের দ্বারা নির্বাচিত হয়েই হিটলার চান্সেলার পদে অধিষ্ঠিত হন ও তারপর সর্বময় ক্ষমতা করায়ত্ত করে চরম অমঙ্গল সাধন করেন।

ঐতিহ্যের সঙ্গে আধুনিকতার সামঞ্জস্য এখনো বাকী। ঐতিহ্য যে বাধা দেয় এ বিষয়ে সন্দেহ নেই, অথচ ঐতিহ্য যদি আদৌ না থাকে তবে তার শূন্যতাও অপূরণীয়। ভারত যদি প্রাচীন না হয়ে অর্বাচীন হতো সেটাও কি আনন্দের বিষয় হতো ? তাহলে তো আমাদের আদিম অবস্থা থেকেই আরম্ভ করতে হতো। যে উত্তরাধিকার আমরা বিবর্তনসূত্রে লাভ করেছি তার সমস্ত ত্রুটিসত্ত্বেও তা অমূল্য। আর যে উত্তরাধিকার আমরা বৃহত্তর মানব পরিবার থেকে আধুনিক শিক্ষাসূত্রে ভ্রমণসূত্রে যোগাযোগসূত্রে লাভ করেছি, করছি ও করতে পারি তার সমস্ত ত্রুটিসত্ত্বেও তাও তেমনি অমূল্য। দেশাভিমান বা শ্রেণীসচেতনতা যেন আমাদের পূর্ণ উত্তরাধিকার থেকে আমাদের বঞ্চিত না করে। কিন্তু গ্রহণ করলেও আমরা নির্বিচারে গ্রহণ করতে বাধ্য নই। পুন-

বিচার ও পুনর্মূল্যায়ন সারাক্ষণ চলবে। রেনেসাঁসের মূলকথাই তাই।

আজকের ভারতে সবচেয়ে রক্ষণশীল শক্তি ঐতিহ্য নয়, ধর্ম। প্রাগৈতিহাসিক কুসংস্কার, প্রাচীনযুগের আচার অনুষ্ঠান, মধ্যযুগের যুক্তিহীন ভক্তি ও অন্ধ বিশ্বাস, এসব বাদ দিলেও এমন কিছু থাকে যার জন্যে হিন্দুদের ধর্ম এখনো প্রাণবান। এখনো সৌন্দর্যসৃষ্টির আকর। এখনো নৃত্যে গীতে কারুশিল্পে অভিনব প্রেরণার উৎস। ধর্মীয়তার অন্তরালে আধ্যাত্মিকতার অন্তঃস্রোত এখনো বহমান। ঐতিহ্যের মুখ্য স্রোতের মতো আধ্যাত্মিকতার অন্তঃস্রোতের সঙ্গেও আধুনিকতার সামঞ্জস্য সন্ধান করতে হবে। মানুষের সর্বাঙ্গীণ বিকাশের মধ্যে আধ্যাত্মিক বিকাশও কি পড়ে না? নৈতিক বিকাশও পড়ে। এগুলি বাদ দিলে মানবিকবাদও ধর্মের মতো একপেশে হবে। সব দিক নিয়েই সমগ্র মানবসত্তা। নইলে অপূরণীয় শূন্যতা।

রেনেসাঁসের নবপর্যায়

ইতিহাসকে নতুন দৃষ্টিতে দেখা যায়, নতুন করে লেখা যায়, কিন্তু যা ঘটে গেছে তাকে ইচ্ছামতো পালটে দেওয়া যায় না। জাতীয় অহমিকায় বাধে, সামাজিক অভিমান আহত হয় তবু এটা মেনে নেওয়াই ভালো যে ভারত একটা অক্ষয় অব্যয় অনাদি অনন্ত চিন্ময় সত্তা নয়। সে কখনো গৌরবের কখনো অগৌরবের কখনো আলোকের কখনো অন্ধকারের কখনো উত্থানের কখনো পতনের কখনো স্বাধীনতার কখনো পরাধীনতার ভিতর দিয়ে গেছে। একই কথা বলতে পারা যায় ইউরোপীয় দেশগুলোর বেলাও। ইতিহাস কেবল একটানা সৌভাগ্যের ইতিহাস নয়, দুর্ভাগ্যেরও ইতিহাস। দুর্ভাগ্যকে জয় করতে হয়। কিন্তু দুর্ভাগ্য যে ঘটেছে এটা মেনে নিতে হয়।

মানবিক ব্যাপারে দুর্ভাগ্যও অবিমিশ্র দুর্ভাগ্য নয়। কালো মেঘেরও একটা রুপালী রেখা থাকে। পরাধীনতার সেই কালো মেঘের রুপালী রেখা ছিল বাংলার রেনেসাঁস। বাংলা ছিল ভারতের অঙ্গ। সুতরাং সেটা ছিল ভারতেরও রেনেসাঁস। বাংলায় শুরু হলেও সেটা সেইখানেই সীমাবদ্ধ ছিল না। ক্রমে ক্রমে ভারতময় ব্যাপ্ত হয়েছিল। রামমোহন থেকে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত বিস্তৃত যে যুগ তার বিস্তার কেবল দশক থেকে দশকে নয়, প্রদেশ থেকে প্রদেশে। হিন্দী সাহিত্যের ভারতেন্দু হরিশ্চন্দ্র, ওড়িয়া সাহিত্যের ফকিরমোহন সেনাপতি, অসমীয়া সাহিত্যের লক্ষ্মীনাথ বেজবরুয়া এঁরাও রেনেসাঁস যুগের নায়ক।

রবীন্দ্রনাথের তিরোধানের ছ'বছর বাদে পরাধীনতারও অবসান। রবীন্দ্রোত্তর ও ব্রিটিশোত্তর মোটামুটি সমবয়স্ক। আমরা যারা এই শতাব্দীর গোড়ার দিকে জন্মেছি তারা এক যুগ থেকে আরেক যুগে উপনীত হয়েছি। কিন্তু যাদের জন্ম স্বাধীন ভারতে তাদের জীবন তো আমাদের মতো অন্ধকার থেকে আলোকে

উত্তরণ নয়। তাদের কী করে বোঝানো যাবে যে অন্ধকার রাত্রেও আকাশে তারা ফোটে চাঁদ ওঠে আর জ্যোৎস্নায় দশদিক প্লাবিত হয়ে যায়। কী জানি কেমন করে সূর্যও উঠেছিল। রেনেসাঁস সত্যি সত্যিই একটা রূপালী রেখা ছিল। যদিও একালের লোক বিশ্বাসই করতে চায় না যে পরাধীন দেশে রেনেসাঁস হতে পারে। বিশ্বাস করলেও বলে তা অকিঞ্চিৎকর। যে হেতু তার সৃষ্টি স্থিতি ও বিলয় বুর্জোয়া শ্রেণীতে। ইংরেজদের মতো বুর্জোয়াদেরও আয়ুষ্কাল ফুরিয়ে এসেছে। তাদের রেনেসাঁস তাদের সঙ্গেই সহমরণে যাবে।

ইতিহাসের পাতায় অনেক বৈদেশিক আক্রমণের বিবরণ আছে, কিন্তু এমনটি কোথাও লেখা নেই যে সাত সমুদ্র পারের একটি সওদাগর কোম্পানী প্রথমে ভারতের সাগর উপকূলে মাদ্রাজ, বোমবাই ও কলকাতা নামে তিনটি বন্দর পত্তন করে, পরে সেই তিনটি বন্দর থেকে বাণিজ্য করতে করতে আত্মরক্ষার জন্যে তিনটি দুর্গ নির্মাণ করে, আরো পরে তিনটি অঞ্চলের রাজনীতির জালে জড়িয়ে পড়ে, আরও পরে ছলে বলে কৌশলে তিনটি আঞ্চলিক সরকার গঠন করে, পরিশেষে তিন দিক থেকে সারা ভারত ঘিরে ফেলে ও একচ্ছত্র সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে। আমাদের রাজা বাদশারা ছিলেন একচক্ষু হরিণ। তাঁরা স্বপ্নেও ভাবেননি যে সমুদ্রপথ দিয়ে শত্রু আসতে পারে, সামুদ্রিক বন্দর হতে পারে বৈদেশিক নৌবাহিনীর ঘাঁটি, সী পাওয়ার থেকে আসতে পারে ল্যান্ড পাওয়ার, অতিকায় মোগল ফৌজ ও দুর্ধর্ষ মারাঠা সেনা একমুঠো গোরা গোলন্দাজের কাছে হার মানতে পাবে।

কিন্তু বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে আসলে ওটা ছিল আধুনিক জ্ঞানবিজ্ঞানের সাধনায় তিন শতাব্দী এগিয়ে থাকা একটি শক্তির কাছে তিন শতাব্দী পেছিয়ে থাকা অন্য কয়েকটি খণ্ডশক্তির পরাজয়। এই খণ্ডশক্তিগুলি যদি পরস্পরের সঙ্গে যুদ্ধবিগ্রহে বলক্ষয় না করত তা হলে হয়তো পেছিয়ে থাকা সত্ত্বেও জাপানের মতো স্বাধীনতা রক্ষা করত। কিন্তু কলহ তাদের অস্থিমজ্জায়। দুই শতাব্দী পরাধীন থেকেও তারা একতাবদ্ধ হতে শিখল না। ফলে স্বাধীনতার সঙ্গে সঙ্গে দেশ হয়ে গেল দু' ভাগ। আমাদের ইতিহাসে এটা নতুন কিছু নয়। বরং এইটেই আমাদের পক্ষে স্বাভাবিক। কোনো একজন রাজ-চক্রবর্তী আর সবাইকে যুদ্ধে হারিয়ে না দিলে ভারত কখনো আপনা হতে একশাসনাধীন হয়নি। তবে তাঁরা ছিলেন রাজচক্রবর্তী সওদাগর শিরোমণি নন। মোগল বাদশারাও প্রকারান্তরে ক্ষত্রিয়, প্রকারান্তরে বৈশ্য নন।

ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর রাজত্ব ছিল বৈশ্য রাজত্ব। ভারতে তারা নিয়ে আসে বৈশ্য যুগ। তাদের স্বদেশেই ক্ষত্রিয় যুগের আয়ু শেষ হয়ে এসেছিল, ঠাটটা ক্ষত্রিয় রয়ে গেলেও চরিত্রটা বৈশ্য। ক্ষমতার আসনে ভূম্যধিকারীদের দল, কিন্তু ক্ষমতার রশি যাঁদের হাতে তাঁরা পুঁজিপতি ও শিল্পপতিদের দল। চার্চ বা ব্রাহ্মণশক্তি রাষ্ট্র বা ক্ষত্রিয়শক্তির কাছে বশ্যতা স্বীকার করেছিল। আবার রাষ্ট্র বা ক্ষত্রিয়শক্তিও পার্লামেনট বা ক্ষত্রিয়-বৈশ্যের যৌথশক্তির কাছে নতি স্বীকার করেছিল। এর ফলে ইঙ্গদ্বীপী ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্যের মধ্যে যে

পরিমাণ একতা ছিল তেমন আর কোনোখানে ছিল না। ফ্রান্স, জার্মানী ইত্যাদি দেশ আত্মকলহে জর্জর।

ইটালীতে ও তার পরে ফ্রান্সে স্পেনে ও ইংলণ্ডে যে রেনেসাঁস হয় তার পটভূমিকা ও আমাদের এদেশে যে রেনেসাঁস হয় তার পটভূমিকা এক নয়। এক না হওয়ার কারণ এ নয় যে ওরা ছিল রেনেসাঁসের সময় স্বাধীন আর আমরা ছিলুম রেনেসাঁসের সময় পরাধীন। ওদের রেনেসাঁস বৈশ্যযুগের পূর্বেই ঘটেছিল, আমাদের রেনেসাঁস বৈশ্য যুগের সূচনার পর। এই প্রভেদটা ভালো করে মনে রাখা দরকার। আমাদের রেনেসাঁসের নায়করা বুর্জোয়া শ্রেণীভুক্ত। ওদের রেনেসাঁসের নায়করা তখনো বুর্জোয়া বলে চিহ্নিত হয়নি। তাঁদের পৃষ্ঠপোষকরা তাঁদের দেশের অভিজাতশ্রেণী। চার্চও গোড়ার দিকে পৃষ্ঠপোষক ছিল, কিন্তু রেনেসাঁসের স্বরূপ আবিষ্কার করার পর বিরূপ হয়। রেনেসাঁস থেকে আসে বিজ্ঞানে মতি। আর বিজ্ঞান তো যুক্তি বিনা এক কদমও এগোয় না। আর যুক্তি করাই যার প্রকৃতি সে কখনো বিনা বাক্যে শাস্ত্রবাক্য মেনে নিতে পারে না। সাহিত্যে আর চিত্রভাস্কর্যে আসে গ্রীকদের জীবনদর্শন। সে জীবনদর্শন খ্রীস্টীয় জীবনদর্শনের সঙ্গে মেলে না। দর্শনশাস্ত্র ধর্মশাস্ত্রের থেকে পৃথক হয়ে যায়। পদে পদে বিরোধ বাধে। কিন্তু ওসব দেশের অভিজাত শ্রেণী রেনেসাঁসের গোড়ায় যেমন পক্ষপাতী ছিলেন শেষেও তেমনি। নাইটদের জীবনদর্শনের সঙ্গে রেনেসাঁসের জীবনদর্শনের তেমন কোনো বিরোধ ছিল না। রেনেসাঁসের ফলে তাঁদের জীবন আরো সমৃদ্ধ হয়। তাঁরা থিয়েটারে যান। অভিনয় দেখেন। বিশ্ববিদ্যালয়ে যান। গ্রীক সাহিত্য পড়েন। অবজারভেটরিতে বসে টেলিস্কোপ দিয়ে গ্রহনক্ষত্র পর্যবেক্ষণ করেন। স্টুডিওতে গিয়ে শিল্পীদের উৎসাহ দেন গ্রীক আদর্শে আঁকতে ও গড়তে। ওয়ার্কশপে গিয়ে কারিগরদের ফরমাস করেন রকমারি তৈজসপত্র বানাতে। অভিজাত শ্রেণীর অনুসরণে বুর্জোয়া শ্রেণীও পরবর্তীকালে রেনেসাঁসের পৃষ্ঠপোষক হন। কিন্তু এঁরা ছিলেন অভিজাতকুলের তুলনায় অধিকতর পরিমাণে চার্চের আঁচলে বাঁধা।

ষোড়শ শতাব্দীর রেনেসাঁস যখন ঊনবিংশ শতাব্দীতে পড়ে তার বহু-পূর্বেই ইংলণ্ডে একটা পটপরিবর্তন ঘটে যায়। বুর্জোয়া শ্রেণী ততদিনে জাঁকিয়ে বসেছেন। থিয়েটারের দর্শক, বইপত্রের পাঠক ও গ্রাহক, শিল্পদ্রব্যের ক্রেতা, ভোগ্যসামগ্রীর উদ্‌ভাবক অভিজাতদের পেছনে ফেলে বুর্জোয়া শ্রেণীর কাঞ্চনকুলীন। এই কাঞ্চনকৌলীন্যই এদেশে আমদানী হয় অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে পলাশীর পর। সূর্যাস্ত আইনে পুরানো জমিদারি কিনে নেন নতুন জমিদারকুল। এঁরা মহাজনী তেজারতী ও ব্যবসাদারি করে বড়লোক। এঁদের অভিজাত না বলে কাঞ্চনকুলীন বলাই সমীচীন। এঁরা জাতে যাই হোন বর্ণে বৈশ্য।

সপ্তদশ শতাব্দীতে প্রতিষ্ঠিত বাণিজ্যকেন্দ্র মাদ্রাজ, বোম্বাই ও কলকাতা অষ্টাদশ শতাব্দীতে হয় প্রশাসনকেন্দ্র। তারপর ঊনবিংশ শতাব্দীতে শিক্ষা ও সংস্কৃতিকেন্দ্র। তিনটির মধ্যে কলকাতাই হয় অগ্রগণ্য কারণ সারা ভারতের

রাজধানী স্থাপিত হয় কলকাতায়। এই শহরের অবস্থান যদিও পূর্বভারতে তবু এই কেন্দ্র থেকেই সমগ্র উত্তর ভারত ইংরেজদের অধিকারে আসে। ইংরেজ যেখানেই যায় বাঙালীও যায় সেখানে। সাংস্কৃতিক দিগ্বিজয়ে ইংরেজদের সহকারী সেনাপতি হয় বাঙালী। এতে তার মান বাড়ে বই কমে না। কিন্তু শতাব্দীর প্রারম্ভের এই সম্মানের সম্পর্কটা সিপাহী বিদ্রোহের পর থেকে ক্রমশ অসম্মানের হয়ে ওঠে। কিপলিং-এর "হারি চান্ডার মুকার্জি'র" অপরাধ তিনি সাহেবদের সমকক্ষ হতে চান। সহকারী সেনাপতির সাধ কিনা সেনাপতি হতে। বামন হয়ে চাঁদে হাত। সাহেবখেদা আন্দোলনে বাঙালীর নেতৃত্ব নতুন এক ইতিহাস সৃষ্টি করে। কিন্তু ইতিমধ্যে রেনেসাঁসের দফা রফা। সে পড়ে যায় দুই আগুনের মাঝখানে। সাম্রাজ্যবাদ বনাম জাতীয়তাবাদ। জাতীয়তাবাদকে জোর জোগায় রেনেসাঁস নয়, রিভাইভালিজম অর্থাৎ পুনরুজ্জীবনবাদ।

পুনরুজ্জীবন বলতে বোঝায় প্রাচীন ভারতের আদর্শে আধুনিক ভারতের রূপায়ণ। কিন্তু প্রাচীন ভারত কি কেবল আর্য ভারত? বৈদিক ভারত? তার পূর্বেও তো প্রাচীনতর আর্যপূর্ব ভারত ছিল। আমাদের পুনরুজ্জীবনবাদীরা জানতেন না যে সিন্ধু সভ্যতা বলে একটি প্রাচীনতর সভ্যতা ছিল, সেটা আর্যদের জন্য অপেক্ষা না করে বহুদূর অগ্রসর হয়েছিল। মহেঞ্জোদারো ও হরপ্পা খনন করতে গিয়ে দুটি অতুলনীয় নগর পাওয়া গেছে। বৈদিক আর্যদের তেমন কোনো কীর্তির সন্ধান মেলেনি। উৎখনন এখনো চলছে ও নিত্য নতুন সাক্ষ্য উদ্ধার হচ্ছে। সেই সভ্যতার বিস্তার কেবল সিন্ধুতটেই সীমাবদ্ধ ছিল না। তার বিস্তার রাজস্থানকে ছাড়িয়ে আরো পূবদিকে ও কাথিয়াবাড়কে ছাড়িয়ে আরো দক্ষিণ দিকে এগিয়েছিল। বৈদিক আর্যদের সঙ্গে এই প্রাগ্‌বৈদিকপ্রাগ্‌ আর্যদের বিরোধ বেধেছিল বলে অনুমান করা অসঙ্গত নয়, কারণ বেদ যুদ্ধবিগ্রহের বর্ণনায় মুখর। শত্রুরা দুর্জয় না হলে তাদের বধ করার জন্যে দেবতাদের স্তবস্তুতি করতে হতো না। সিন্ধু সভ্যতারই বা পুনরুজ্জীবন হবে না কেন, যদি পুনরুজ্জীবনই হয় লক্ষ্য? তারপর আর্য ভারতও যে সার্বভৌম ছিল তা নয়। আর্যাবর্তেই তার সীমাবদ্ধতা। তার বাইরে ছিল বঙ্গ, তার বাইরে ছিল দাক্ষিণাত্য। আর তার স্থিতিকালও হাজার বছরের বেশী নয়। আর্য ভারতের পরে মৌর্য ভারত। আর্য অনার্যের মিশ্র ভারত। তার অধিকার প্রায় ভারতব্যাপী। ভারতের বাইরেও তার প্রভাব। ততদিনে বেদবিরোধী বৌদ্ধ জৈন ধর্ম সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে রাজশক্তিকেও ধর্মান্তরিত করেছে।

মৌর্য ভারতের পরে যাকে সাধারণত হিন্দু ভারত বলে অভিহিত করা হয় তার মোহানায় মিশেছিল গ্রীক আর পারসিক, শক আর কুশান, হূন আর বহুপ্রকার মঙ্গোলীয় উপজাতি। এদের কেউ এসেছিল উত্তরপূর্ব থেকে, কেউ উত্তর থেকে। প্রাচীন ভারত বলতে মুসলিমপূর্ব এই ভারতকেও বোঝায়। এই ভারতে ব্রাহ্মণ্য ঐতিহ্যের সঙ্গে বৌদ্ধ ও জৈন ঐতিহ্যের বিরোধ চরমে ওঠে।

ব্রাহ্মণ্য ঐতিহ্যই জয়ী হয়, কিন্তু সে আর ক'দিনের জন্যে। দেখতে দেখতে ইসলামধর্মী আরব তুর্ক মোগল এসে পড়ে। মোগল যে সময় আসে সেই সময় আসে তার বিপরীত দিক থেকে খ্রীস্টধর্মী পর্তুগীজ। তার পিছু পিছু ইংরেজ ফরাসী দিনেমার ওলন্দাজ। জার্মানও এসেছিল, কিন্তু স্বদেশের গৃহবিবাদের দরুন গুছিয়ে বসতে পারেনি। পূব দিক থেকে আসে আহোম। আহোমরা শাক্ত ও বৈষ্ণব দীক্ষা ও সংস্কৃত নাম গ্রহণ করে। কিন্তু অন্যেরা তা করে না। তার ফলে মুসলিম ভারত বলে একটি সত্তার সূচনা হয়। পরবর্তীকালে ব্রিটিশ ভারত, ফরাসী ভারত, পর্তুগীজ ভারত এরাও উদয় হয়।

পুনরুজ্জীবনবাদীরা শেষের এই তিনটি ভারতের অবসান চেয়েছিলেন। এটা সবাই জানে। কিন্তু মুসলিম ভারতেরও অবলোপ চেয়েছিলেন কি? যদি চেয়ে থাকেন তা হলে আর মুসলিম পুনরুজ্জীবনবাদীদের দোষ দিয়ে কী হবে? মুসলিম ভারত হিন্দুর পক্ষে যতই অগৌরবের হোক না কেন মুসলমানদের পক্ষে গৌরবের। মুসলিম ভারতকে হিন্দু ভারতের থেকে ভিন্ন করতে হলে দেশটাকেও ছিন্নভিন্ন করতে হয়। অতীতমুখী ভাবনার অনিবার্য পরিণাম ভারত ভাগ। এর পরেও যদি কেউ পুনরুজ্জীবনের কথা ভাবেন তা হলে বলতে হবে তিনি আজকের এই খণ্ডিত ভারতকেও খণ্ড খণ্ড করতে চান। অত কিছুর পরেও কি সে গৌরব ফিরবে? ফিরতে পারে না। কারণ তার আয়ু সে নিঃশেষে ভোগ করেছে। দ্বিতীয়বার যদি সে আসে দ্বিতীয়বার সে যাবে। মাঝখানের স্থিতিকাল হয়তো বিশ ত্রিশ বছর।

রেনেসাঁস ও রিভাইভাল আমাদের ঊনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর ইতিহাসে দুটি বিশিষ্ট অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। রেনেসাঁসের যাঁরা ধারক ও বাহক তাঁরা সকলেই ইংরেজী শিক্ষিত। অনেকেই ইংলণ্ড ঘুরে এসেছেন। কেউ কেউ সেইখানেই দেহরক্ষা করেছেন। সমসাময়িক ইউরোপীয় চিন্তার সঙ্গে নিত্য ও অবিচ্ছিন্ন যোগ রক্ষা করতেন তাঁরা। তাঁদের সম্পাদিত সাময়িকপত্র পাঠ করলেই সেটা বোঝা যায়। কোনটি ইংরেজীতে প্রকাশিত, কোনটি আধুনিক ভারতীয় ভাষায়। কিন্তু একখানিও সংস্কৃত ভাষায় নয়। তার মানে এ নয় যে তাঁরা সংস্কৃত জানতেন না বা পড়তেন না। প্রাচীন সংস্কৃতিকে তাঁরা শ্রদ্ধা করতেন, ভালবাসতেন, তাকে সংরক্ষণ করতেই তাঁদের বাসনা। কিন্তু যে প্রাচীন জ্ঞানবিজ্ঞান বৃদ্ধি পেতে পেতে বহুকাল পূর্বে একটি জায়গায় এসে থেমে গেছে তাকে ক্রমবর্ধমান আধুনিক জ্ঞানবিজ্ঞানের সঙ্গে কেমন করে মেলাবেন। খ্রীস্টীয় চার্চ যদি তা পারত তা হলে এতজন দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিককে পুড়িয়ে মারতে হতো না। আধুনিক জ্ঞানবিজ্ঞান অজ্ঞান নয়। বস্তুজ্ঞান। বাস্তবজ্ঞান। তাকে সত্য বলে স্বীকার করলে প্রাচীন জ্ঞানবিজ্ঞানকে বিদায় দিতে হয়। অন্তত আবার যাচাই করে শোধন করতে হয়।

আধুনিক জ্ঞানবিজ্ঞান বিদেশ থেকে এসেছে বলে তা বর্জনীয় নয়, বিজাতির সঙ্গে এসেছে বলে অনাচারণীয় নয়, বিজেতার সঙ্গে এসেছে বলে বিতাড়নযোগ্য নয়, পশ্চিম থেকে এসেছে বলে পাশ্চাত্ত্য দোষে দূষিত নয়। পশ্চিম একটি

দিক্‌বাচক বা দেশবাচক শব্দ। আধুনিক একটি কালবাচক বা যুগবাচক শব্দ। আমরাও যদি আধুনিক কালের বা আধুনিক যুগের মানুষ হয়ে থাকি তবে আমাদের কালের সঙ্গে আমাদেরও তাল রাখতে হবে, আমাদের যুগের সঙ্গে আমাদের পা মিলিয়ে নিতে হবে। কালিদাস ভালোবাসি বলে কালিদাসের কালে নিঃশ্বাস নিতে পারিনে। রামায়ণ ভালোবাসি বলে রামায়ণের যুগের সঙ্গে মনের মিল অনুভব করতে পারিনে। টলস্টয়ের উপন্যাসের নায়ক নায়িকাদের সঙ্গে আমি তার চেয়ে বেশি সহমর্মিতা বোধ করি। ব্রাউনিং-এর কবিতা আমাকে তার চেয়ে বেশি দোলা দেয়।

ঐতিহ্যের মাটিতে মূল থাকুক, মূলোৎপাটনের জন্য কেউ উৎসাহী নয়। দেশ থাকলে তার মূল থাকবেই। সে মূল আর্যই হোক আর আর্যপূর্বই হোক। তেমনি কাল থাকলে তার এক এক ঋতুতে এক এক রকম ফুল ফোটাতে হবে। এক এক শতাব্দীতে এক এক রকম আদর্শ বা তত্ত্ব মেনে চলতে হবে। ফরাসী সাহিত্যে তো এক এক দশকে এক একটা 'ইজম' চলতি হয়। নব নব উন্মেষ না হলে সাহিত্য বা চিত্রকলা প্রাণবন্ত হয় না। যার প্রাণপ্রবাহ শুকিয়ে গেছে তার কাছে নতুন কিছু পাবার নেই। রসের জন্যে, রূপের জন্যে, আইডিয়ার জন্যে, জ্ঞানের জন্যে, আমাদের আধুনিক পাশ্চাত্ত্য সাহিত্য বা আর্টের কাছে যেতে হয়। আমাদের পূর্বপুরুষদের কাছে যা পাই শুধুমাত্র তারই উপর নির্ভর করলে আমরাও কিছুদিনের মধ্যে ফুরিয়ে যাই বা বুড়িয়ে যাই। লিখব উপন্যাস অথচ ইংরেজী বা ফরাসী বা রুশ উপন্যাস পড়ব না, পড়ব শুধু কাদম্বরী ও দশকুমারচরিত এমনতর ফতোয়া জারী হলে উপন্যাসের বিকাশ রুদ্ধ হয়ে যাবে, আর যিনি লিখবেন তিনিও বিশ্বসাহিত্যের দরবারে অপাঙক্তেয় হবেন। পুনরুজ্জীবনবাদীরা এমন কিছু দিতে পারেন নি যা তাঁদের পূর্ব-পুরুষরা দিয়ে যাননি। অতীতের অনুকরণও একপ্রকার অনুকরণ।

স্বাধীনতা পুনরুদ্ধারের পর পুনরুজ্জীবনবাদের প্রয়োজন ফুরিয়েছে। কিন্তু তার প্রবক্তাদের বদ্ধমূল ধারণা তাঁরাই স্বাধীন ভারতের ভবিষ্যতের নিয়ন্তা। ভাবী ভারত হবে প্রাচীন ভারতের ছাঁচে ঢালা। বিদেশীর হাত থেকে স্বাধীনতা পেলেও অতীতের হাত থেকে স্বাধীনতা পাবে না। ইতিহাস না পড়ে পুরাণ পড়তে হবে, পৌরাণিক যুদ্ধবিগ্রহকে বলতে হবে ঐতিহাসিক যুদ্ধবিগ্রহ, পৌরাণিক যুদ্ধক্ষেত্রকে ঐতিহাসিক যুদ্ধক্ষেত্র, পৌরাণিক বীর-পুরুষদের ঐতিহাসিক বীরপুরুষ। এ বিভ্রম ঐতিহাসিকদের কারো কারো গবেষণায় লক্ষ্য করা যায়। পরাধীন ভারতে এঁদের পৃষ্ঠপোষকের অভাব ছিল। এখন এঁরা উচ্চপদস্থ। এই যেমন পুরাণের সঙ্গে ইতিহাসকে একাকার করা তেমনি থিওলজির সঙ্গে ফিলসফিকে একাকার করাও লক্ষ্যণীয়। মারবুর্গ বিশ্ববিদ্যালয় সাড়ে চার শতাব্দী পূর্বে ও দুটোকে আলাদা করেছিল। ভারতের বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে শুধু ফিলোসফিই প্রবর্তিত হয়েছিল। এখন ফিলসফির বাঘের ঘরে থিওলজির ঘোগ বাসা বাঁধছে।

আবার এমনও দেখছি যে মোগল ও ব্রিটিশ আমলের জমিদারকুল নির্মূল,

হিন্দু আমলের রাজবংশ নিবীর্য। প্রাচীন ভারতের ক্ষত্রিয়শ্রেণীকে পুনরুজ্জীবিত করতে দিচ্ছে কে ? তাঁদের নিঃক্ষত্রিয় করাই তো যুগধর্ম। দেশে দেশে সেই কর্ম চলেছে। নেহাৎ ইংলণ্ডের আশ্রয়ে ছিলেন বলেই তাঁরা এতদিন রক্ষা পেয়েছিলেন। ইংলণ্ডের অভিজাতশ্রেণী তাঁদের প্রতি অনুকম্পাপরায়ণ। ক্ষত্রিয়শ্রেণী যাগযজ্ঞ ও দানধ্যান না করলে ব্রাহ্মণ শ্রেণীর পায়ের তলা থেকে মাটি সরে যায়। ব্রহ্মোত্তর ও দেবোত্তর জমি ভূমিসংস্কার আইনের আওতায় পড়ে। তা হলে বাকী থাকে বৈশ্য বর্ণ শূদ্র বর্ণ। ধনিক ও শ্রমিক। জোতদার ও চাষী। ক্ষমতার আসনে যাঁরা অধিষ্ঠিত তাঁরা শ্রেণীসংঘর্ষ পরিহার করতে চান। মহাত্মা গান্ধীও ট্রাস্টীশিপের মন্ত্র ও মন্ত্রণা দিয়ে গেছেন। পুনরুজ্জীবনে বৈশ্য বর্ণের উচ্চাভিলাষ পূর্ণ হতে পারত, কিন্তু শূদ্র বর্ণের অভিযোগ দূর হবার নয়। তারা বিদ্রোহী হলে তাদের দমন করার জন্যে সে রামও নেই, সে অযোধ্যাও নেই। শূদ্রের দিক থেকে শম্বুকবধ প্রার্থনীয় নয়। তার দৃষ্টি এখন রুশ চীনের উপরে। যেমন বৈশ্যের দৃষ্টি আমেরিকার উপরে।

না, এখন আর পশ্চিম দিকে তাকাতে কারো অভিমানে বাধে না। মুসলমানের যেমন মক্কা, হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে শ্রমিকশ্রেণীর মস্কো আর ধনিকশ্রেণীর নিউ ইয়র্ক। প্রতিদিন আকাশপথে পুষ্পক বিমান ছুটছে পশ্চিম ভূমণ্ডলের দুই প্রান্তে। আজকাল পশ্চিম ভূমণ্ডলকে দুই প্রান্তে ভাগ করা হয়েছে। পূর্ব প্রান্ত ও পশ্চিম প্রান্ত। পশ্চিম প্রান্তে আমেরিকা প্রমুখ ধনতন্ত্রী দেশ। পূর্ব প্রান্তে রাশিয়া প্রমুখ সমাজতন্ত্রী দেশ। সেকালে যেমন কিপলিং বলতেন পূর্ব আর পশ্চিম কস্মিনকালে মিলবে না একালেও তেমনি একদল সাহিত্যিকের ধুয়ো পূর্ব আর পশ্চিম কোনদিনই মিলবে না। সেকালে যেমন রবীন্দ্রনাথ বিশ্বাস করতেন পূর্ব আর পশ্চিম পরস্পরের পরিপূরক, মহামানবের সাগরতীরে তাদের মিলন হবে, একালেও তেমনি আরেক দল সাহিত্যিকের স্বপ্ন পূর্ব আর পশ্চিম তৃতীয় মহাযুদ্ধে নামবে না, তার আগেই মিটমাট করবে। তার লক্ষণ এই সেদিন হেলসিঙ্কি শহরে দেখা গেল। ফরাসী ভাষায় দুটো শব্দ আছে। আঁতাত আর দেতাঁত। মনে রাখবেন, দাঁতাত নয়। চন্দ্রবিন্দুটা প্রথম অক্ষরের মাথার উপরে। আপাতত দুই মহাশক্তির কাম্য দেতাঁত। আঁতাত বহু দূর। মহাশূন্যে সোয়ুজের সঙ্গে অ্যাপোলোর সাযুজ্য এক সুদূরবর্তী সম্ভাবনার আভাস।

রিভাইভালিজম যদি এই পরিবর্তিত পরিবেশে নিঃশ্বাস নিতে পারে তা হলে মানতে হবে সে এক মহত্তর শক্তি। জোর করে কিছুই বলা যায় না। কে জানত গেটের জার্মানী একদিন নাৎসী হবে। হিটলারের দল ক্ষত্রিয়ও ছিল না, বৈশ্যও ছিল না, ব্রাহ্মণ তো ছিলই না। নানা কার্যকারণের যোগাযোগে শূদ্রদেরই এক অংশ অপর অংশের জোটের বিপক্ষে জোট পাকায়। জার্মানীতে কমিউনিস্টরা যদি অত প্রবল না হতো নাৎসীরাও অত প্রবল হতো না। প্রবলের সঙ্গে প্রবলের দ্বন্দ্বে প্রবলতর কে হবে রাজনৈতিক গণৎকারদেরও গণনার বাইরে ছিল। শেষ মুহূর্তে নাৎসীদের দিকেই পাল্লা ভারী হয়। সেটার অন্যতম কারণ

বিশুদ্ধ আর্যরক্তে অন্ধ বিশ্বাস আর গভীর ইহুদী বিদ্বেষ। জার্মানীর ইহুদীদেরও ছিল বিশুদ্ধ সেমিটিক রক্তে অন্ধবিশ্বাস ও আদিবাসভূমির প্রতি প্রথম আনুগত্য। ভারতেও অনুরূপ কতরকম জটিলতা আছে। চক্রের ভিতরে চক্র। তার ভিতরে চক্র। বুর্জোয়া যাদের বলা হচ্ছে তারাও কি একজোট নাকি? পরস্পরের এত বড়ো শত্রু কি আর আছে? এত যে রাজনৈতিক খুনোখুনি হয়েছে, মেরেছে ও মরেছে কারা? শ্রেণীতত্ত্বে এর কোনো ব্যাখ্যা নেই। ইডিওলজিতে থাকতে পারে। যেমন মেরেছে ও মরছে একই শ্রেণীর হিন্দু মুসলমান। ইডিওলজিও একপ্রকার ধর্ম।

সেদিন এক ভদ্রলোক আমাকে জিজ্ঞাসা করেন, "রেনসাঁস কি আছে না নেই?" এক কথায় উত্তর দেওয়া শক্ত। থাকলে তিনি নিজেই দেখতে পেতেন। দেখতে না পেলে আমার সাক্ষ্যের কী মূল্য। এই পর্যন্ত বলতে পারি যে রামমোহন রবীন্দ্রনাথের ভাবধারা এখনো শুকিয়ে যায়নি। পরে যদি শুকিয়ে যায় তা হলেও অন্তঃসলিলা ফল্গুর মতো বহমান থাকবে। রেনেসাঁসের ইতিহাসে কাউন্টার-রেনেসাঁসও অজানা নয়। পালাবদল হলে ভিতরে ভিতরে মূল্যবোধও বদলে যায়। সকলের সেটা সহ্য হয় না। তারা বিদ্রোহী হয়। বুদ্ধির মুক্তিও অনেকের কাছে ভয়াবহ। তাদের কাছে যুক্তির চেয়ে ভক্তিই শ্রেয়।

ইডিওলজি যদি থিওলজির স্থান নেয় ও ফিলজফির সঙ্গে একাকার হয়ে যায় বা একাকারত্ব দাবি করে তা হলেও রেনেসাঁস তার তাৎপর্য হারায়। ইতিহাস লিখতে বসে যদি বিশিষ্ট বিপ্লবী নেতাদের নাম মুছে ফেলা হয় বা ঘটনা চাপা দেওয়া হয় তা হলেও রেনেসাঁস তার গতিপথে বাধা পায়। নিজেদের বানানো আধুনিক পুরাণও পুরাণ। উদ্দেশ্য তার নতুন রাজবংশের মহিমাকীর্তন ও অভিনব ধর্মপ্রচার। প্রকৃত ইতিহাসের মর্মোদ্ধার ভাবীকালের ঐতিহাসিকদের পক্ষে দুরূহ হবে, যদি সরকারী ইতিহাস ভিন্ন আর কোনো ইতিহাস প্রকাশিত না হয়। বিপ্লবোত্তর দেশগুলির বৈজ্ঞানিক প্রগতি বিস্ময়কর। তার জন্যে আমরা তাদের টুপী খুলে অভিবাদন জানাব। কিন্তু ফিলসফি ও থিওলজি যদি আবার একাকার হয়ে যায় তবে আমরা আবার মারবুর্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের পূর্বতন যুগে ফিরে যাব। তেমনি পুরাণ ও ইতিহাস যদি আবার অভিন্ন হয়ে যায় তা হলে আবার আমরা চার শতাব্দী পিছু হটব। বিজ্ঞান ও টেকনোলজি টানতে থাকবে সামনের দিকে আর থিওলজি ও পুরাণ পেছনের দিকে—এই দোটানার মধ্যে পড়ে শিক্ষিত মানস দিশাহারা হবে।

বুর্জোয়া আধিপত্য যাবার মুখে। মরা ঘোড়াকে চাবুক মেরে হাতের সুখ খুব বেশীদিন থাকবে না। তখন প্রশ্ন উঠবে, কোন্ সত্যের উপরে নতুন রেনেসাঁস প্রতিষ্ঠিত হবে? সে কি কেবল বিজ্ঞানের সত্য? টেকনোলজির সঙ্গে দর্শনের সত্য নয়? ইতিহাসের সত্য নয়? এসব ক্ষেত্রে কি থিওলজি ও পুরাণ আবার জমিয়ে বসবে? আর্টের সত্যও আরো একপ্রকার সত্য। ধর্মপ্রচার বা তত্ত্ব প্রচার তার কর্ম নয়। শিল্পীকে তার প্রয়োজনীয় স্বাধীনতা না দিলে যা সে সৃষ্টি করবে তা স্বকীয়তাবিহীন ফরমায়েসী সৃষ্টি। সৃষ্টি নয় সৃষ্টির

অপলাপ। এর লক্ষণ দেশে দেশে দেখা যাচ্ছে। এদেশেও দেখা যেতে পারে, যদি না কতক শিল্পী স্বাধীনতা রক্ষা করেন।

যাঁদের বিশ্বাস বুর্জোয়া আমলে রেনেসাঁস হতে পারে না, বহু দেশ ও ইতিহাস তাঁদের অপূর্ব সুযোগ দিয়েছে। সমাজতন্ত্রী আমলের নতুন এক রেনেসাঁস-এর জন্যে পটভূমিকা এখন প্রস্তুত। উঠোনকে দোষ দেওয়া এ জমানায় আর চলবে না। এখন দেখাতে হবে নাচ। সে নাচ যারা দেখবে তারা একবাক্যে সাধুবাদ দিয়ে বলবে, "কোথায় লাগে শেকসপীয়ার গ্যেটে।" দেখাতে না পেরে সোভিয়েট রাশিয়াও বুর্জোয়া রাশিয়ার সাহিত্যের প্রতি সশ্রদ্ধ হয়েছে। ডস্টয়েভ্স্কি ও চেকভের উপর থেকে নিষেধ উঠে গেছে। টলস্টয়কে সকলেই মান্য করে। গর্কিকে টুর্গেনেভের চেয়ে উচ্চতর স্থান দেয় না। রসের মূল্য, রূপের মূল্য বোঝে। কিন্তু এঁদের প্রতি সুবিচার যেমন আনন্দের বিষয় জীবিতদের প্রতি সুবিচারও তেমনি কাম্য। বোধহয় জিনিসটাই শর্তাধীন। শর্তটা হচ্ছে মরণোত্তর কালোত্তীর্ণতা। কালজয়ীর সঙ্গে কে না চায় আত্মীয়তা দাবি করতে!

ইতিহাস পরাধীন ভারতকে যে সুযোগ দেয়নি স্বাধীন ভারতকে তা দিয়েছে। স্বাধীন ভারতের শ্রমিক কৃষক শ্রেণীকে যে সুযোগ দেয়নি পরে সমাজতন্ত্রী জমানায় তা দেবে। যারা প্রায় তিন হাজার বছর ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্যের দাপটে মাথা তুলতে ও মুখ খুলতে পারেনি তাদের মধ্যে নিহিত রয়েছে অক্ষত সম্ভাবনা। তাদের মতো আমিও চাই তাদের সেই নিহিত সম্ভাবনা সমূহের পরিপূর্ণ প্রকাশ ও বিকাশ। মতভেদ শুধু এইখানে যে, সেটা কি ইংলণ্ডের মতো ধীরে ধীরে বিবর্তনসূত্রে হবে, না রুশ চীনের মতো রাতারাতি বিপ্লবসূত্রে হবে? যদি বিপ্লবসূত্রে হয় তবে গান্ধীপন্থায় অহিংসভাবে হবে, না লেনিনপন্থায় সহিংসভাবে হবে? সেটা যে সূত্রেই হোক, যেভাবেই হোক, ইতিহাসের গতি সেই অভিমুখে। একটা কথা আছে, অঙ্কস্য বামা গতি। কথাটা বোধহয় সমাজের বেলাও খাটে। সমাজেরও বামদিকে গতি। বামাই সমাজের গতি। শূদ্র জাগরণ ও নারী জাগরণ স্বচক্ষেই দেখতে পাচ্ছি। আরো কিছুদিন বেঁচে থাকলে আরো ব্যাপকভাবে দেখব।

কিন্তু যেটা দেখতে চাই সেটা কেবল ক্ষমতার বামা গতি নয়, কেবল বিত্তের বামা গতি নয়, জ্ঞানেরও বামা গতি, রসেরও বামা গতি, রূপেরও বামা গতি। কেবল বিজ্ঞানের বামা গতি নয়, সংস্কৃতির বিবিধ বিভাগেরও বামা গতি। এখন আর উঠোনের দোষ নয়, নাচবে যারা তাদেরই দোষ। নতুন একটা রেনেসাঁসের জন্যে পটভূমিকা প্রস্তুত হচ্ছে, কিন্তু পটভূমিকাই তো সব নয়। কোথায় সেই সব শিল্পী ও দার্শনিক, রসিক ও ভাবুকের সমাবেশ যাঁদের বাদ দিয়ে রেনেসাঁস যেন ডেনমার্কের যুবরাজকে বাদ দিয়ে হ্যামলেট! হয়তো এখনো সময় হয়নি। বুর্জোয়ারা মঞ্চ জুড়ে রয়েছেন বলেই বোধহয় তাঁরা মঞ্চে প্রবেশ করছেন না। সত্য মিথ্যা বোঝা যাবে আরো বিশ-ত্রিশ বছর অতীত হলে।

সে রেনেসাঁস সত্য হলে এ রেনেসাঁস মিথ্যা হয়ে যাবে না। সেটা হবে এই

নিঃশেষিতপ্রায় রেনেসাঁসের নবপর্যায়। নবপর্যায়ের স্বরূপ এখন থেকে উপলব্ধি করা সম্ভব নয়। কিন্তু সেটা যেন নিছক শ্রেণীবিদ্বেষে বা শ্রেণীগরিমায় পর্যবসিত না হয়। রেনেসাঁসের মঞ্চে যাঁরাই প্রবেশ করবেন তাঁদেরই দেখাতে হবে উচ্চাঙ্গের নাটক। যাত্রা বা প্রহসন নয়। তাঁদেরও লিখতে হবে ক্লাসিক। তাঁদেরও হতে হবে তত্ত্বদর্শী। জ্ঞানবিজ্ঞানের অতন্দ্র সন্ধানী হতে হবে তাঁদেরও। ইতিহাসকে আর দর্শনকে পুরাণ আর থিওলজির সঙ্গে একাকার করবেন না তাঁরাও। কোন্‌টা যুক্তিসহ আর কোন্‌টা ভক্তিপ্রবণ এই পার্থক্যবোধ তাঁদেরও থাকবে। পূর্ব ও পশ্চিম যেমন পরস্পরের পরিপূরক, প্রাচীন ও আধুনিক যেমন পরস্পরের পরিপূরক, তেমনি সেই রেনেসাঁসও হবে এই রেনেসাঁসের পরিপূরক।

একবিংশ শতাব্দীর রেনেসাঁসের নায়ক হবেন যাঁরা তাঁরাও অনুভব করবেন যে জীবনের যে কোনো বিভাগে নতুন কোনো কাজ দেখাতে হলে তার আগে চাই চিন্তার ও কল্পনার স্বাধীনতা, নিরীক্ষণ ও পরীক্ষণের স্বাধীনতা, বিশ্বাস ও অবিশ্বাসের স্বাধীনতা, বাক্যের ও প্রকাশের স্বাধীনতা, বিচারের ও বিবেকের স্বাধীনতা। সব স্বাধীনতার মূল প্রত্যয় ব্যক্তিসত্তার পরম মূল্য। ব্যক্তি আবার কে? সমাজই তো সব। ব্যক্তি আবার কে? রাষ্ট্রই তো সব। ব্যক্তি আবার কে? নেশনই তো সব। ব্যক্তি আবার কে? আর্যরক্ত বা সেমিটিক রক্তই তো সব। ব্যক্তি আবার কে? শ্রেণীই তো সব। এই যে ব্যক্তিবিরোধী সমষ্টিসর্বস্ব মনোভাব এ যদি থাকে তো রেনেসাঁস থাকে না। ক্ষণবিদ্যুতের মতো তার চোখ-ধাঁধানো দীপ্তি সঙ্গে সঙ্গে মিলিয়ে যায়। ইলেকট্রিকের বাতির মতো রাতদিন জ্বলে না। রেনেসাঁস ব্যক্তিসত্তাকে অত্যন্ত মূল্যবান মনে করে। ব্যক্তিই দিয়ে যায় নতুন ভাবনা নতুন রস, নতুন ধ্যান নতুন রূপ। বুদ্ধ বা যীশু, হোমার বা কালিদাস, কনফুসিয়াস বা প্লেটো, হিপোক্রাটিস বা চরক, আভিসেনা বা গালিলিও, শেক্সপীয়ার বা মাইকেল অ্যাঞ্জেলো, ভলতেয়ার বা রুশো, মার্কস বা ফ্রয়েড, আইনস্টাইন বা গান্ধী, এঁদের প্রত্যেকেই এক একজন ব্যক্তি। যদিও সমাজের থেকে বা স্বজাতির থেকে বিচ্ছিন্ন নন।

ষোড়শ শতাব্দীর রেনেসাঁস রাতারাতি কোনো বিপ্লব বা বিদ্রোহ ঘটায়নি, কিন্তু ব্যক্তির উপর যে মূল্য আরোপ করেছে তার থেকে এসেছে প্রচলিত মূল্যরাজির পরিবর্তন ও বিবর্তন। স্থলে স্থলে সে পরিবর্তন বৈপ্লবিক হয়েছে। বৈপ্লবিক যে সর্বত্র হবেই তেমন কোনো কথা ছিল না। বৈপ্লবিক যে কোথাও হবে না এমন কোনো কথাও কি ছিল? তবে পুরাতন মূল্য একবার বদলাতে শুরু করলে কতদূর বদলাবে তা কেউ গণনা করে বলতে পারে না। পাশ্চাত্য রেনেসাঁসের নায়করাও জানতেন না যে তাঁরা বিজ্ঞানের সত্য নির্ণয় করতে গিয়ে লোকের বদ্ধমূল সংস্কারে ঘা দিচ্ছেন ও তার ফলে চার্চ তার অথারিটি হারাচ্ছে। রেনেসাঁস বলে একটা অধ্যায় না থাকলে এনলাইটেনমেণ্ট বলে আর একটা অধ্যায় থাকত না, সেটা না থাকলে পরে ফরাসীবিপ্লব বলে আরো একটা অধ্যায় থাকত না, সেটা না থাকলে আরো পরে রুশ বিপ্লব বলে আরো একটা

অধ্যায় থাকত না। এই যে পারম্পর্য এর মধ্যে শিল্পবিপ্লবও পড়ে। যারা এক প্রকার বিপ্লব এড়িয়েছে তারা আরেক প্রকার বিপ্লব এড়াতে পারেনি।

কিন্তু অদৃষ্টের এমনি বিড়ম্বনা যে ব্যক্তির মূল্যটাই সমাজের বা দেশের বা রাষ্ট্রের বা নেশনের বা শ্রেণীর দৃষ্টিতে খর্ব হয়েছে। মণ্ডলী বা দল গঠন করতে না পারলে ব্যক্তি যেমন দুর্বল ছিল তেমনি দুর্বল কিংবা তার চেয়েও অসহায়। তাই সংকটকালে স্মরণ করতে হয় সেই সনাতন ভগবানকে।

ভগবানকে স্মরণ করলে আবার তর্ক ওঠে, এ কেমনতর মানবিকবাদ যে ভগবানকে স্বীকার করে? রেনেসাঁসের সময় থেকেই মানবিকবাদ বা হিউম্যানিজম কথাটির চল হয়েছে। বস্তুটি বৌদ্ধ ও বাউলদের মধ্যেও ছিল। ছিল প্রাচীন গ্রীকদের মধ্যেও। তবে ভক্তিমূলক ধর্মের প্রবল প্লাবনে মানবিকবাদ ছিল মজ্জমান। এবার এল দর্শননির্ভর মানবিকবাদ। দর্শনও হলো বিজ্ঞাননির্ভর। বিজ্ঞানও হলো নিরীক্ষণ ও পরীক্ষণনির্ভর। অতীন্দ্রিয় বা অতিপ্রাকৃতের জন্যে মনের দরজা জানলা খোলা রইল না। ভগবান তা হলে আসবেন কোন্ পথ দিয়ে? লাইব্রেরী, লেবরেটরি, অবজারভেটরি কোন্ আঙিনা দিয়ে?

তা বলে মানবিকবাদীরা সকলেই কিন্তু নিরীশ্বরবাদী নন। এক ভাগ এখনো ঈশ্বরবাদী। অপরাপর ভাগ নিরশ্বরবাদী বা অজ্ঞেয়বাদী। মানবিক জিজ্ঞাসার মধ্যে ব্রহ্মজিজ্ঞাসাও কি পড়ে না? মানুষের কি কেবল ইনটেলেকট আছে, ইনটুইশন নেই? চোখ দিয়ে সব কিছু দেখা যায় না বলে টেলিস্কোপ ও মাইক্রোস্কোপ লাগে। দূরের চেয়ে কি আরো দূর নেই? সূক্ষ্মের চেয়ে কি আরো সূক্ষ্ম নেই? সীমার বাইরে কি অসীম নেই? দৃশ্যমানের অন্তরালে কি অদৃশ্য নেই? সব জিজ্ঞাসার মীমাংসা যুক্তি দিয়ে হয় কি? তাই মানবিকবাদীরা সবাই রেনেসাঁস থেকে প্রেরণা লাভ করলেও ধর্মের সঙ্গে সম্পর্ক যাঁরা ছেদ করেন নি তাঁরাও মানবিকবাদী। হিউম্যানিস্ট অথচ খ্রীস্টান এই যাঁদের পরিচিতি তাঁদের সংখ্যাও অল্প নয়।

রেনেসাঁস যদি খাস ইউরোপেও নিঃশেষিত হয়ে এসে থাকে তবে তা বুর্জোয়াশ্রেণীর শ্রেণীসত্তার ঐতিহাসিক প্রয়োজন ফুরিয়ে আসার জন্যই কি? না তার অন্য কোনো কারণ আছে? এমনও তো হতে পারে যে রেনেসাঁস মানুষকে প্রকৃতি মন্থন করার যে শক্তি দিয়েছে তার অতিপ্রয়োগ বা অপপ্রয়োগের ফলে অমৃতের সঙ্গে সঙ্গে গরলও উঠছে, কিন্তু সে গরলকে ধারণ করার জন্যে কোনো নীলকণ্ঠ নেই। আকাশ বাতাস জল স্থল সব বিষিয়ে গেছে। যেখানে যায়নি সেখানেও যাবে। হিংসায় উন্মত্ত পৃথ্বী রেনেসাঁসের পক্ষে অনুকূল নয়। হিংসা যে মানুষের ইতিহাসে নতুন তা নয়, কিন্তু এমন নির্বিবেক হৃদয়হীন নৈর্ব্যক্তিক হিংসা দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পূর্বে লক্ষিত হয়নি। তৃতীয় মহাযুদ্ধে এর পরাকাষ্ঠা ঘটবে, যদি না মদমত্ত মানুষ স্বেচ্ছায় অস্ত্রত্যাগ করে। তা যদি সে করে তবে সেটা হবে একটা নৈতিক বিপ্লব। তখন দেখতে পাওয়া যাবে মানুষ কত উচ্চে উঠতে পারে। মানুষের নৈতিক সত্তা রেনেসাঁসের সঙ্গে বেখাপ নয়। বরং বলা যেতে পারে রেনেসাঁসের জন্যেই ক্রীতদাস প্রথার উচ্ছেদ হলো।

বিশ্বমানবের সেই নৈতিক সত্তা একদিন তাকে অস্ত্র ত্যাগেরও প্রবর্তনা দেবে।

যেসব মূল্য মরা পাতার মতো আপনি ঝরে পড়ছে সেসব পুরাতন মূল্যকে প্রাণপণে আঁকড়ে ধরে থাকলে নতুন মূল্যগুলিকে তাদের প্রাপ্য সুযোগ থেকে বঞ্চিত করা হয়। ভালো-মন্দের কষ্টিপাথরে তাদের সব কটিই হয়তো সোনা নয়, তা হলেও তাদের পরখ করতে হবে ও যতক্ষণ না তারা মন্দ বলে প্রতিপন্ন হচ্ছে ততক্ষণ তাদের জন্যে মনটাকে খোলা রাখতে হবে। এই খোলা মন না হলে রেনেসাঁস হয় না। খোলা মন যেমন অত্যাবশ্যক খোলা সমাজও তেমনি। আমাদের মধ্যযুগে না ছিল খোলা মন, না ছিল খোলা সমাজ। আধুনিক যুগের মহিমাই এইখানে যে মন এখন খোলা, সমাজ এখন খোলা। কিন্তু আবার যদি পুনরুজ্জীবনের নামে বা স্বয়ং-সম্পূর্ণতার নামে বা বিপ্লবের নামে খোলা সমাজ বন্ধ হয়ে যায় তা হলে আধুনিক যুগের আধুনিকতা বলতে যা অবশিষ্ট থাকবে তা ওই নামটা। গুণগত আধুনিকতা কোথায় মিলিয়ে যাবে।

গুণগত আধুনিকতা প্রাচীন সংস্কৃতিকেও সম্মান করে। মধ্যযুগের সংস্কৃতিকেও শ্রদ্ধা করে। পুরাতন ক্লাসিক বা পুরাতন ক্যাথিড্রাল বা পুরাতন মন্দির বা পুরাতন মসজিদ আধুনিকতাবাদীদেরও প্রিয়। মানবিকতাবাদীদের যে ভাগটি নিরীশ্বরবাদী সে ভাগটিও পুরানো মদ ভালোবাসে। সেই সঙ্গে পুরানো ছবি বা মূর্তি। এমন কালাপাহাড় একালে কেউ নেই যে অসত্য বা অশুভ বলে কীর্তি ধ্বংস করবে। মানব বিবর্তন একের পর এক যেসব অতিক্রম করে এতদূর এসেছে তার প্রত্যেকটি অধ্যায়ের ধ্বংসাবশিষ্ট সম্পদ সযত্নে সংরক্ষণ করা হচ্ছে ভাবীকালের জন্যে। উত্তরপুরুষ যাতে পূর্বপুরুষের সঙ্গে সম্পূর্ণ সম্পর্কচ্যুত না হয়। মাঝে মাঝে ধারাভঙ্গ ঘটেছে। তা সত্ত্বেও ধারাবাহিকতার সন্ধান চলেছে। সেটা হয়তো পাওয়া যাবে কারিগরশ্রেণীর কারুশিল্পে। হরপ্পা মহেঞ্জোদারো থেকে আরম্ভ করে আজ পর্যন্ত এ দেশের লোকের প্রধান উপজীব্য কৃষি ও কারুশিল্প। এই নিয়ে যারা ছিল ও আছে তাদের সৃষ্ট লোক-গীতি, লোকগাথা, রূপকথা, কিংবদন্তী, প্রবাদবচন প্রভৃতির মধ্যে কি একটি ধারাবাহিকতা মেলে না? আমার তো মনে হয় মৃৎশিল্প, দারুশিল্প ও শিলাশিল্পের মধ্যেও তা মেলে। আমাদের দৃষ্টি সাধারণত লোকসংস্কৃতির বা লোকশ্রুতির উপর পড়ে না। তার সম্যক চর্চা থেকেও নতুন একটা রেনেসাঁস ঘটতে পারে। সেটা জনমানসের রেনেসাঁস।

সম্ভবত সেই নতুন রেনেসাঁস বাইরে থেকে নয়, উপর থেকে নয়, অতীত থেকে নয়, তল থেকে আসবে। তল থেকে আসাও ভিতর থেকে আসা। তার দিকে আমি তো আমার একটা হাত বাড়িয়েই রেখেছি।

বাংলার রেনেসাঁস ঃ পুনর্ভাবনা

ইংরেজরা যখন এদেশে বাণিজ্য করতে আসে তার আগেই তারা রেনেসাঁসের ভিতর দিয়ে গেছে ও তখন রেফরমেশনের ভিতর দিয়ে যাচ্ছে, অর্থাৎ ক্যাথলিক থেকে প্রটেস্টাণ্ট হয়ে উঠছে। বাণিজ্য করতে এসে রাজত্ব যখন হাতে পায় তার আগেই তাদের দেশে এনলাইটেনমেন্ট শুরু হয়ে গেছে ও তখন ইণ্ডাস্ট্রিয়াল রেভলিউশন শুরু হয়ে যাচ্ছে। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে আরো দুটি তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা ঘটে। আমেরিকার স্বাধীনতা ও ফরাসী বিপ্লব। এ দুটির সঙ্গেও এদেশের ইংরেজরা জড়িয়ে পড়ে। বস্টন টী পার্টির চা যায় কলকাতা থেকে বস্টনে। আর এদেশের ফরাসী অধিকৃত অঞ্চলগুলির উপর ব্রিটিশ পতাকা ওড়ে।

তুর্ক আফগান মোগলের পরে নতুন একদল বিদেশী এসে এদেশের ইতিহাসে নতুন এক অধ্যায়ের সূচনা করল। কিন্তু এটাই একমাত্র সত্য নয়। তাদের জীবনকে অবলম্বন করে বইতে লাগল ইউরোপের ইতিহাসের বহমান স্রোত। রেনেসাঁস, রেফরমেশন, এনলাইটেনমেণ্ট। আমেরিকার স্বাধীনতা তথা ফরাসী বিপ্লব। আমেরিকার স্বাধীনতাকেও বিপ্লব বলা হয়। তা হলে যুগল বিপ্লব। এ দেশের মানসেও তার পরশ লাগল।

সুদূর ইউরোপ থেকে জাহাজ আসে। গঙ্গার ঘাটে নামিয়ে দেয় ইংরেজী ভাষায় লেখা বইপত্র। নাটক উপন্যাস কাব্য প্রবন্ধ। রাজনীতি অর্থনীতি দর্শন বিজ্ঞান সন্দর্ভ। ইংরেজদের ঘরে ঘরে ক্লাবে ক্লাবে বইপত্র জমে ওঠে। কিছু কি বাঙালীদের নজরে পড়ে না? ইংরেজদের জন্যে থিয়েটার গড়ে ওঠে। বাঙালীরা কেউ কি টিকিট কেটে অভিনয় দেখতে যায় না? ইংরেজদের জন্যে পাশ্চাত্ত্য পদ্ধতির সুরম্য হর্ম্য নির্মিত হয়। বাঙালী অভিজাতরা কেউ কি অনুকরণ করেন না? ইংরেজদের জন্য আমদানী হয় ঘোড়ার গাড়ী। বাঙালী বড়লোকরা কেউ কি কেনেন না? ইংরেজদের জন্য আমদানি বা তৈরি হয় পাশ্চাত্ত্য ধরনের আসবাব। শৌখীন বাঙালীরা কেউ কি তা দিয়ে ঘর সাজান না? অলক্ষিতে বাঙালীর জীবনেও ইউরোপের স্রোত সঞ্চারিত হয়। সে ইউরোপ মধ্যযুগীয় নয়, আধুনিক। তাকে আধুনিক করে তুলেছে রেনেসাঁস, রেফরমেশন, এনলাইটেনমেণ্ট, আমেরিকান তথা ফরাসী বিপ্লব। অষ্টাদশ শতাব্দীর পূর্বেই কলকাতা শহরের পত্তন। সারা অষ্টাদশ শতাব্দী জুড়ে বিলিতী জাহাজের আনাগোনা। লণ্ডনের মানসলোক কলকাতায় প্রভাব বিস্তার করে। বাঙালীদের কেউ কি সেই মানসলোকের প্রভাব অনুভব করেনি?

আমার মনে হয় অষ্টাদশ শতাব্দীতেই বাংলার নবজাগরণের উন্মেষ ঘটেছিল, যদিও তার সমসাময়িক প্রমাণ পাওয়া যায় না। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আমলারা সংস্কৃত চর্চা করতেন, ফারসী চর্চা করতেন, সেইসঙ্গে বাংলা চর্চাও করতেন। বাঙালী কারিগরকে দিয়ে বাংলা হরফও তৈরি করিয়েছিলেন। বাংলার প্রতি এই মনোযোগ থেকে প্রণীত হয় হ্যালহেডের ব্যাকরণ। কোম্পানীর আমলাদের ভাষাচর্চা খ্রীস্টীয় মিশনারীদের মতো ধর্মীয় উদ্দেশ্যপ্রণোদিত নয়।

তাঁরা হিউম্যানিস্ট। মানুষ সম্পর্কিত যে কোনো ব্যাপারে তাঁদের ঔৎসুক্য। সার উইলিয়াম জোন্সের অনুবাদকর্ম সেই ঔৎসুক্যের থেকে সঞ্জাত। হিউম্যানিস্ট বলেই তিনি ইণ্ডোলজিস্ট। আর হিউম্যানিজম তো রেনেসাঁসের সঙ্গে ওতপ্রোত।

খ্রীস্ট্রীয় মিশনারীদের ব্রিটিশ ভারতে আসা নিষিদ্ধ ছিল। তাঁদের আসতে দেন শ্রীরামপুরের দিনেমার কর্তৃপক্ষ। সেইখান থেকেই তাঁরা বিভিন্ন ভারতীয় ভাষায় বাইবেলের অনুবাদ ছেপে বার করেন। উদ্দেশ্যটা রেনেসাঁসের দ্যোতক নয়, কিন্তু মুদ্রাযন্ত্রের সাহায্যে বিভিন্ন ভারতীয় ভাষায় পুস্তক প্রকাশ রেনেসাঁসের সহায়ক। তাঁরা এর পরে সংবাদপত্রও প্রকাশ করেন বাংলায়। তাতে থাকে নানা দেশের বিচিত্র বিবরণ। প্রথম প্রসঙ্গটাই ছিল আমেরিকা বলে এক অজানা ভূখণ্ডের। ধর্মপ্রচার যদিও মূল উদ্দেশ্য তবু বৃহত্তর জগতের জ্ঞান পরিবেশনও কর্তব্য। মানুষকে মানুষের জীবন সম্পর্কে সচেতন করা হিউম্যানিজমের আওতায় পড়ে। মিশনারীরা সেদিক থেকে হিউম্যানিস্ট। তারা যেসব বিদ্যালয় স্থাপন করেন সেসব বিদ্যালয়ে ভূগোল, ইতিহাস, গণিত প্রভৃতি যুগোচিত বিদ্যার প্রচলন ছিল। যারা খ্রীস্টান নয় ও হবে না তাদের কাছেও ছিল সেসব বিদ্যাসত্র অবারিত। কোম্পানীর সরকার ভারতীয় বিদ্যার্থীদের জন্য ততখানি উদ্যোগী ছিলেন না যতখানি ইউরোপের বিভিন্ন দেশ থেকে আগত খ্রীস্ট্রীয় মিশন। এঁরা পরে ব্রিটিশ ভারতের অভ্যন্তরে প্রবেশ পান। কেরী সাহেবের সহযোগিতায় কোম্পানীর আমলের রাজকর্মচারীদের জন্যে প্রতিষ্ঠিত ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ হয়ে ওঠে বাংলা, হিন্দী, উর্দু প্রভৃতি ভার্নাকুলারের গদ্যসাহিত্যের আঁতুড়ঘর।

ইটালী, ফ্রান্স, ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশের রেনেসাঁসের অন্যতম কর্ম ছিল ইটালীয়, ফরাসী, ইংরেজী প্রভৃতি ভার্নাকুলারের গদ্যসাহিত্য সৃষ্টি। মাতৃভাষা তাদের বেলা লাটিন গ্রীক নয়। এ দেশের বেলা সংস্কৃত আরবী ফারসী নয়। ভার্নাকুলার আগে ছিল অবজ্ঞাসূচক। রেনেসাঁসই তাকে মর্যাদা দেয়। তবে জার্মান গদ্যসাহিত্যের সূচনা রেফরমেশন থেকে। মার্টিন লুথারই জার্মান গদ্যের জনক। আবার জার্মানরাই সর্বপ্রথম তাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে লাটিনের জায়গায় জার্মান মাধ্যম প্রবর্তন করে।

রেনেসাঁস ও রেফরমেশন একই জিনিস নয়। রেফরমেশন হলো খ্রীস্টধর্মের সংস্কার। আর রেনেসাঁস হলো পরলোকের বা পরকালের বা অতিপ্রাকৃতের স্বপ্ন থেকে জেগে উঠে ইহলোকের তথা প্রকৃতির মধ্যে মানবজীবনের পরিপূর্ণতার অন্বেষা। মানুষ এই জগতের নিয়মগুলো জেনে নিয়ে এই জগতেই উন্নতির চরম শীর্ষে উত্তীর্ণ হতে পারে। যেমন হয়েছিল প্রাচীন গ্রীকরা। কত উন্নত ছিল তাদের কাব্য নাটক দর্শন বিজ্ঞান। তাদের নাট্য নৃত্য ভাস্কর্য স্থাপত্য! রেনেসাঁস ধর্ম বা খ্রীস্ট বা ঈশ্বরকে বাদ দিতে চায়নি। যা চেয়েছে তা নতুন করে ভাববার স্বাধীনতা, আঁকবার স্বাধীনতা, গড়বার স্বাধীনতা, করবার স্বাধীনতা। এতখানি স্বাধীনতা খ্রীস্টীয় সংস্কারকরা সহ্য করতেন না। তাই

রেফরমেশন আর রেনেসাঁসের মধ্যে একটা তফাৎ ছিল। ক্রমে ব্যবধান হ্রাস পায়।

এদেশের রেনেসাঁসের মূলে গ্রীস রোম নয়, ইংলণ্ড ফ্রান্স। ইংরেজ ফরাসীরা এদেশে না এলে এদেশের রেনেসাঁস ভিতর থেকে ঘটত না। সংস্কৃত বা পারসিক শিক্ষা থেকেও নয়। তার জন্যে আমাদের বিদ্যার্থীদের ইউরোপ যেতে হতো। সংস্কৃত বা পারসিক চর্চা এদেশে একদিনের জন্যেও বন্ধ হয়নি। সেই উৎস থেকে রেনেসাঁস প্রবাহিত হলে বহু পূর্বেই প্রবাহিত হতো। মানতেই হবে যে তার জন্যে ইংরেজ ফরাসীর প্রয়োজন ছিল। ইংরেজীর তুলনায় ফরাসী চর্চা সামান্যই হয়। ইংরেজরা না হয়ে ফরাসীরা আমাদের শাসক হলে আরো বেশী ফরাসী চর্চা হতো। রেনেসাঁসের পক্ষে সেটাও হতো অনুকূল। রামমোহন, দ্বারকানাথ, মধুসূদন তিনজনেই ইংলণ্ডে তথা ফ্রান্সে যান। মধুসূদন তো ফরাসী সহধর্মিণীর সঙ্গে ফ্রান্সে বসবাস করেন।

তা বলে আমাদের মনীষীরা কেউ প্রাচীন গ্রীস বা প্রাচীন রোমে তাঁদের শিকড় খুঁজতে যাননি। শিকড় তাঁদের এই দেশের অতীতেই। ইলিয়াডে অডিসিতে নয়, রামায়ণ মহাভারতেই। তবে ইলিয়াড না পড়লে 'মেঘনাদবধ' লেখা যেত না। তার জন্যে শুধুমাত্র রামায়ণ পড়াই যথেষ্ট ছিল না। আমাদের রেনেসাঁস প্রাচীন ভারতের সঙ্গেও একপ্রকার ধারাবাহিকতা ফিরে পায়। ইউরোপের রেনেসাঁস যেমন ফিরে পেরেছিল প্রাচীন গ্রীস রোমের সঙ্গে ধারাবাহিকতা। প্রাচীন ভারতের পুনরাবিষ্কারে ইউরোপীয় ভারততত্ত্ববিদ্‌দের কাছে আমাদের ঋণ অশেষ। গোটা বৌদ্ধ যুগটাই তো হারিয়ে গেছল। কেই বা মনে রেখেছিল মৌর্যসম্রাট অশোককে। কিংবা কুশানসম্রাট কনিষ্ককে! কিংবা মহাকবি অশ্বঘোষকে! কিংবা বৌদ্ধ জাতককে! অনবদ্য ভাস্কর্য অবহেলিত অজ্ঞাত অবস্থায় পড়ে রয়েছিল। আমাদের রেনেসাঁস বৌদ্ধ জ্ঞানবিজ্ঞান বাদ দিয়ে কেবল ব্রহ্মণ্য জ্ঞানবিজ্ঞানের অবলম্বন করতে গেলে অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। এর জন্যে চীন জাপান তিব্বতের দিকে তাকাতে হবে। সেসব দেশে সং ক্ষিত হয়েছে আমাদের বৌদ্ধ উত্তরাধিকার।

অথচ আমাদের রেনেসাঁস বৌদ্ধ উত্তরাধিকার সম্বন্ধে অজ্ঞ বা উদাসীন বললে চলে। ব্যতিক্রম কেবল রবীন্দ্রনাথ ও হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, যতদূর মনে পড়ে। বৈদিক ধারাটাই প্রাচীন ভারতের একমাত্র ধারা ছিল না। কিন্তু বৌদ্ধ ধারা শুকিয়ে যাওয়ায় বা খাত বদল করে তিব্বতে চীনে জাপানে প্রবাহিত হওয়ায় বৈদিক ধারাই হয় একমাত্র বহমান ধারা। এর থেকে যতখানি উর্বরা হওয়া সম্ভব ততখানি উর্বরা হয়েছে আমাদের সাহিত্যের ও দর্শনের ক্ষেত। বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে বিশেষ কোন ফলন লক্ষ্য করা যায়নি। যাকে আমরা হিন্দু ঐতিহ্য বলি তার ঝোঁকটা যুক্তির দিকে নয়, বিশ্বাসের দিকে। তাই আমাদের দার্শনিকরা ফিলসফি আর থিয়লজির পার্থক্য মানেন না। ধর্মগ্রন্থও তাঁদের কাছে দার্শনিক গ্রন্থ। তেমনি, আমাদের ঐতিহাসিকদের কাছে পুরাণে ইতিহাসে প্রভেদ নেই। রামায়ণ মহাভারতও তাঁদের কাছে ইতিহাসের মর্যাদা পায়। তেমনি, আমাদের শিক্ষিতজনের কাছে জ্যোতিষ আর জ্যোতির্বিজ্ঞান অভিন্ন।

প্রাচীন গ্রীসের সঙ্গে ধারাবাহিকতা পুনঃস্থাপন না করলে ইউরোপের রেনেসাঁস সম্ভব হতো না। তা বলে কি কেউ প্রাচীন গ্রীসকেই পুনরুজ্জীবিত করার কথা ভেবেছেন বা বলেছেন? রেনেসাঁসের অন্য নাম রিভাইভাল নয়। অথবা রিভাইভালের নামান্তর রেনেসাঁস নয়। রেনেসাঁসের দৃষ্টি সম্মুখের দিকে। তার সামনে অনন্ত ভবিষ্যৎ। অতীত তার তুলনায় কতটুকু! অপরপক্ষে রিভাইভালের দৃষ্টি পশ্চাৎ দিকে। সে পদে পদে অতীতের সঙ্গে মিলিয়ে নিতে চায়। যেন অতীতেই নির্দিষ্ট হয়ে গেছে তার ভবিষ্যৎ। অতীতকে অতিক্রমণের স্বাধীনতা নেই। যেন অতীতই অভ্রান্ত।

আমাদের রেনেসাঁস বঙ্কিমচন্দ্রের মধ্যবয়স থেকে প্রাচীন ভারতের পুনরুজ্জীবনের দিকে মোড় ঘোরে। ততদিনে সিপাহীবিদ্রোহ দমন করতে গিয়ে বিদেশী শাসকের সংহারমূর্তি উদ্ঘাটিত হয়েছে। স্বদেশী শিল্পের বিনাশফলে দারিদ্র্য ও দুর্ভিক্ষ যান্ত্রিক প্রগতি দিয়ে ঢাকা যায় না। স্বদেশ বনাম বিদেশ এই চিন্তা থেকে উদ্ভূত হয় জাতীয়তাবাদ। কিন্তু গোড়ায় সেটা রূপ নেয় হিন্দু জাতীয়তাবাদের। প্রাচীন ভারতের হিন্দু জাতির পুনরুজ্জীবনই হয় লক্ষ্য। মুসলমানবা তো প্রাচীন ভারতে ছিল না। সুতরাং তাদেব বাদ দিয়ে ভাবা হয়। যাদের বাদ দেওয়া হলো তারাও চায় পুনরুজ্জীবন। কিন্তু প্রাচীন ভারতেব নয়। কারণ সেখানে তারা ছিল না। তারা চায় ইসলামেব আদিপর্বের পুনরুজ্জীবন। তাদের বেলা ওটা জাতীয়তাবাদ নয়। প্যানইসলামিজম। পরবর্তীকালে হিন্দু জাতীয়তাবাদ যখন ভারতীয় জাতীয়তাবাদ হয় তখন প্যানইসলামিজম হয় মুসলিম জাতীয়তাবাদ।

সব দেশেই বেনেসাঁস দেশভিত্তিক অথবা ভাষাভিত্তিক। কোথাও ধর্মভিত্তিক বা সমাজভিত্তিক নয়। পুনরুজ্জীবনবাদীরা বিদেশী বর্জন করতে গিয়ে স্বযুগকেও বর্জন করার পরামর্শ দেন। ফিরে যেতে বলেন প্রাচীন যুগে বা মধ্যযুগে। ফিরিয়ে আনতে চান প্রাচীন যুগ বা মধ্যযুগকে। পরাধীন ও পরশোষিত দেশে রেনেসাঁসের বাণী তার গরিমা হারায়। আগে তো আমরা স্বাধীন ও স্বয়ম্ভর হই, তার পরে হবে রেনেসাঁস। স্বয়ম্ভর বলতে এটাও বোঝায় যে সংস্কৃতিতে স্বয়ম্ভর হতে হবে। পাশ্চাত্য শিক্ষা ও পাশ্চাত্য সংস্কৃতি আমাদের স্বয়ম্ভরতার অন্তরায়। তাঁদের বিশ্বাস ইংরেজী চর্চা করলে বাংলার উন্নতি হতে পারে না। অথচ হিন্দু কলেজের উদ্যোক্তারা বাংলাকেও ইংবেজীর সঙ্গে বন্ধনীভুক্ত করেছিলেন ও ইংরেজী শিক্ষার গোড়া থেকেই বাংলা শিক্ষা ছিল। তার সঙ্গে সংযুক্ত পাঠ্যপুস্তক লেখা হতো ইংরেজী, বাংলা, ফরাসী, সংস্কৃত ও আরবী ভাষায়। কলকাতায় স্কুলবুক সোসাইটির রিপোর্ট থেকে জানা যায় যে জানুয়ারী ১৮৩২ থেকে ডিসেম্বর ১৮৩৩ এই দুই বছরে ইংরেজী বই বিক্রী হয় ১৪, ৭৯২ খানা। বাংলা বই ৪,৮৯৬ খানা। ফারসী বই ৮৩ খানা। সংস্কৃত বই ২০৮ খানা। আরবী বই ১৩ খানা। বেশ বোঝা যায় বাংলা ইংরেজীর ঠিক পরে আসর জমিয়ে বসেছে। পরাধীনতা ও পরশোষণ তার অন্তরায় হয়নি।

সংস্কৃত সাহিত্য একদা অতি জীবন্ত ছিল, কিন্তু কালক্রমে তার অবস্থা হয় জীবন্মৃতের মতো। তার কাছ থেকে পাবার যা ছিল তা ক্রমে নিঃশেষিত হয়, কিন্তু ইংরেজীর মারফৎ পাওয়া ইউরোপীয় সাহিত্য দর্শন ইতিহাস প্রভৃতির ভাণ্ডার অফুরন্ত। স্বযুগ স্বদেশের চেয়ে বড়ো। অতীতকে কাঁধে নিয়ে কেউ বাঁচতে পারে না। বাড়তে পারে না। রেনেসাঁস থেকে যাঁরা অতীতে সরে গেছেন তাঁরাও রেনেসাঁসপরবর্তী বিজ্ঞানের কাছে ঋণী। বিজ্ঞান না হলে দৈনন্দিন জীবনযাত্রা অচল। বিশেষত শহর অঞ্চলে। আধুনিক বিজ্ঞান পাশ্চাত্ত্য রেনেসাঁসেরই মানসসন্তান। এ স্রোতের উজানে যাওয়া নিরর্থক। ধর্মের বেলা সেটা সম্ভব হতে পারে, কিন্তু বিজ্ঞানের বেলা অসম্ভব। বিজ্ঞানের কল্যাণে মানুষ মহাশূন্য অতিক্রম করে চন্দ্রে পদার্পণ করেছে। মানুষের অসাধ্য কী আছে, যদি সে ক্রমাগত অগ্রসর হয়? যদি আপনার অস্ত্রে আপনি নির্মূল না হয়?

মানুষ যে অসাধ্যসাধন করতে পারে এ ধারণা আগেও ছিল, কিন্তু মন্ত্রতন্ত্রের সাহায্যে। এখন মন্ত্রতন্ত্রের স্থান নিয়েছে বিজ্ঞান ও বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি। তার পেছনে রয়েছে অবশ্য এই প্রতীতি যে মানুষই মানুষের নিয়ন্তা। বাইরের কোন অলৌকিক শক্তি নয়। প্রকৃতির সমস্ত রহস্য এখনো অধিগত হয়নি, কিন্তু হতে পারে এমন সম্ভাবনা আছে। মানুষের ভিতরেও রয়েছে অপার সম্ভাব্যতা। সে হতে হতে কী যে হয়ে উঠবে তা সে নিজেই জানে না। সুপারম্যান হওয়াও অসম্ভব নয়। সেকালে লোকে তপস্যা করত স্বর্গের ইন্দ্র হতে। একালের বিশ্বমানচিত্রে স্বর্গের অবস্থান অজানা। ইন্দ্রের হাতে ছিল বজ্র। তার চেয়েও শক্তিমান হাইড্রোজেন বোমা এখন মানুষেয় হাতে। আরো শক্তিশালী মারণাস্ত্র এর পরে হাতে আসতে পারে। রেনেসাঁসের পূর্বে বৌদ্ধরা বিশ্বাস করতেন যে, মানুষ সাধনা করলে বুদ্ধত্ব লাভ করতে পারে। আর বুদ্ধ যিনি হন তিনি দেবতাদের চেয়েও ঊর্ধ্বে। দেবত্ব লাভ করাই বড় কথা নয়। রেনেসাঁসের পরে হিউম্যানিস্টরা বিশ্বাস করেন যে দেবত্বলাভ বা বুদ্ধত্বলাভও শেষ কথা নয়। শেষ কথা বলে কোন কথা নেই। ক্রমাগত বিবর্তিত হতে হবে, জগতের পরিবর্তন ঘটাতে হবে, এমন কোনো পরিণতি কাম্য নয় যা অপরিবর্তনীয় বা চিরন্তন।

এসব সত্ত্বেও আজকের দিনের মানুষ আশাবাদী নয়। যতদূর বোঝা যায় পৃথিবী ধীরে ধীরে শীতল হয়ে আসবে, তুষার দিয়ে ঢেকে যাবে। মানুষ যদি বেঁচে থাকে তো এস্কিমোদের মতো বরফের গুহায় বাস করবে। ভাবনার কথা বইকি। তখন হয়তো মানুষ গ্রহান্তরে গিয়ে উপনিবেশ স্থাপন করবে। সারা পৃথিবী তো আজ এখনি উত্তর মেরু বা দক্ষিণ মেরু বনে যাচ্ছে না। সামনে হাজার হাজার বছর সময় রয়েছে শীতাপনিয়ন্ত্রণের সামগ্রিক ব্যবস্থা উদ্ভাবনের। প্রাণ এক ফুঁয়ে নির্বাপিত হয় না। এটা অবশ্য বিশ্বাসের কথা।

রেনেসাঁস হলো রিয়ালিটির সঙ্গে পা মিলিয়ে নেওয়া। তা যদি না হয় তো সেটা রেনেসাঁস নয়, সেই নামে অন্য জিনিস। বাংলার রেনেসাঁস কি রিয়ালিটির

সঙ্গে পা মিলিয়ে নিয়েছে ? ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ ও শ্রীরামপুর মিশন থেকে প্রকাশিত বইপত্র পড়ে যাঁদের জ্ঞানোদয় হয় তাঁরা ধর্মে ও সমাজে ঘোর রক্ষণশীল হলেও বাস্তব জগতের স্বরূপ জানতে সংস্কারকদের মতোই উৎসুক ছিলেন। হিন্দু কলেজের সনাতনী উদ্যোক্তারা সার এডওয়ার্ড হাইড ইস্টকে যা বলেন তা হাইডের পত্রে বর্ণিত হয়েছিল এইভাবে—

"The principal objects proposed for their adoption had been the cultivation of the Bengalee and English languages in particular. The Hindustance tongue as convenient in the Upper Provinces, and the Persian if desired as ornamental. General duty to God. The English system of morals (the Pundits and some of the most sensible of the rest deplored their national deficiency in morals), Grammar Writing in English (as well as Bengalee), Arithmetic (this is one of the Hindu virtues), History, Geography. Astronomy, Mathematics, English Belles Letters, Poetry as the fund increases." (Sir Edward Hyde East's letter to the Earl of Buckinghamshire, dated, Calcutta, 7 May 1816)।

লক্ষণীয় এই যে বিষয়তালিকায় সংস্কৃতের উল্লেখ ছিল না। হিন্দু কলেজের ছাত্ররা হিন্দু। তারাই তা হলে সংস্কৃতবর্জিত শিক্ষা লাভ করবে। হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয় বেসরকারী উদ্যোগে। সরকার তার দায়িত্ব নিতে নারাজ। পরে সরকারী উদ্যোগে কলকাতায় সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠাকালে সমাজসংস্কারক রামমোহন রায় লর্ড আমহার্স্টকে যে পত্র লেখেন তার সার কথা এইরূপ ঃ

"Rammohan's chief arguments were the Sanskrit learning resembled the pre-Baconian scholastic learning of medieval Europe ; he apprehended that the plan to establish a Sanskrit College could 'only be expected to lead the minds of youth with grammatical niceties and metaphysical distinctions of little or no practical use to the possessors or to society.' He therefore made a fervent appeal to the Government to 'promote a more liberal and enlightened system of instruction, embracing mathematics, natural philosophy, chemistry and anatomy with other useful sciences which may be accomplished with the sum proposed by employing a few gentlemen with talents and learning educated in Europe, and providing a College furnished with the necessary books and instruments and other apparatus.' This remarkable letter was forwarded by Lord Amherst to the Committee for Public Instruction for its consideration. But

the Committee dominated by the 'Orientalists' seemed to ignore it. *Social Ideas and Social Change in Beugal 1818-1835* by Dr A. F. Salahuddin Ahmed, pp 159-60)।

হিন্দুরা সংস্কৃত চায় না, চায় পাশ্চাত্ত্য বিদ্যা। ইংরেজরা পাশ্চাত্ত্য বিদ্যা শেখাতে চায় না, শেখাবে সংস্কৃত। আজ আমাদের কাছে এটা অবিশ্বাস্য। কিন্তু গত শতাব্দীর দ্বিতীয় ও তৃতীয় দশকে এটাই ছিল শিক্ষার অবস্থা এবং ব্যবস্থা। তৃতীয় দশকে মেকলে এসে পাশ্চাত্ত্য বিদ্যার পক্ষে মত দেন। পাশ্চাত্ত্য বিদ্যার বাহন হয় প্রথমত ইংরেজী, দ্বিতীয়ত বাংলা। পাশ্চাত্য না বলে তাকে আধুনিক বলাই সঙ্গত। স্কুল কলেজে প্রধানত আধুনিক বিদ্যাই শেখানো শুরু হয়। সংস্কৃতকেও স্থান দেওয়া হয়। আরবী, ফারসীকেও।

ইউরোপের রেনেসাঁসের অন্য নাম নিউ লার্নিং। সেখানকার রেনেসাঁসের সূচনা আর নববিদ্যার সূচনা সমসাময়িক। এদেশের রেনেসাঁসের সূচনা আর নববিদ্যার সূচনাও সমসাময়িক। নববিদ্যা যে চিরকাল ইংরেজী ভাষার সাহায্য নেবে এমন কোনো কথা ছিল না, এমন কোনো কথা নেই। বাংলাও নববিদ্যার বাহন হতে পারে। হচ্ছেও বাংলাদেশে। পশ্চিমবঙ্গে যদি না হয়ে থাকে তার কারণ পশ্চিমবঙ্গ ভারতের অঙ্গ। আর ভারত একটি বহুভাষী দেশ। প্রত্যেকটি রাজ্য যদি ভাষাভিত্তিক হয় তবে ভারত বহুধা বিভক্ত হতে পারে। যেমন হয়েছে অস্ট্রীয়া হাঙ্গেরি। ইংরেজীই একমাত্র ভাষা যা সব রাজ্যের বিদ্বানরা বোঝেন, যা তাঁদের যোগাযোগের ভাষা। তাই ইংরেজীর প্রয়োজন ফুরোয়নি, চিন্তার আদানপ্রদানের জন্যে তা অপরিহার্য এক লিঙ্গুয়া ফাঙ্কা। তা ছাড়া বাইরের বিশ্বের নিত্য নতুন জ্ঞানও তো ইংরেজীর সাহায্যেই আমরা পাচ্ছি। সংস্কৃত বা ফরাসীর মতো ইংরেজী গতিহীন নয়। এ দেশের ইংরেজী জানা লোকেরাই সব চেয়ে এগিয়ে। নিছক বাংলা জানা লোকেরা তুলনায় পেছিয়ে। রেনেসাঁস তো অগ্রসরদের নিয়েই হয়। সর্বজনকে দিয়ে নয়।

সার্বজনীন শিক্ষা অবশ্যই প্রয়োজন। সেটাও হবে বিজ্ঞান, ইতিহাস, ভূগোল ইত্যাদি বিষয়ের শিক্ষা। তার সঙ্গে কারিগরি বা কৃষিকর্মের। কিন্তু তার জন্যে আমি ইংরেজীর আবশ্যকতা দেখিনে। তবে যাদের বেলা সেটা উচ্চতর শিক্ষার সোপান তাদের জন্যে ইংরেজীর ব্যবস্থা থাকা চাই। নইলে তাদের উচ্চতর শিক্ষা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। শিক্ষার সম্পূর্ণতা ন্যায়ত সকলের প্রাপ্য, কিন্তু কার্যত তাদেরই, যারা তার যোগ্য ও যারা তাদের যোগ্যতার পরীক্ষা দিয়েছে। শিক্ষা সম্পূর্ণ করতে অন্তত পঁচিশ বছর বয়স লাগে, অতদিন অপেক্ষা করা সকলের পক্ষে সম্ভব নয়। তা ছাড়া ক'জনেরই বা তাতে সত্যিকার আগ্রহ আছে? অধিকাংশেরই তো লক্ষ্য রুজি রোজগার। তার জন্যে জীবনের প্রথম পঁচিশটা বছর অপেক্ষা করতে রাজী হবে ক'জন? স্কুলের পড়া শেষ হতে না হতেই ইংলণ্ডে আজকাল চাকরি জুটে যায় অধিকাংশের। চাকরি করতে করতে তারা রাতের বেলা ক্লাস করে, পরে পরীক্ষা দেয়, ডিগ্রী পায়। নয়তো লাইব্রেরীতে গিয়ে বা লাইব্রেরী থেকে বই আনিয়ে

পড়াশুনা করে। জ্ঞান বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে সময়ের সঙ্গে তাল রেখে চলাটাই মুখ্য। যারা পেছিয়ে পড়ে তারা বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতম ডিগ্রীধারী হলেও একালের দৃষ্টিতে সেকালের।

ইংরেজ আমলের আগে হিন্দুরা ছিল পেছিয়ে পড়া সেকেলে এক ধর্ম-সম্প্রদায়। মুসলমানরা তাদের তুলনায় এগিয়ে রয়েছিল গ্রীক থেকে অনূদিত আরবী গ্রন্থের ও আরবী থেকে অনূদিত ফারসী গ্রন্থের মাধ্যমে। ইটালীতে গ্রীক পণ্ডিতদের আশ্রয় গ্রহণের পূর্বে আরবরাই স্পেন জয় করে গ্রীক থেকে অনূদিত আরবী গ্রন্থের সাহায্যে সেকালের পক্ষে আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞান শিক্ষা দেয়। চিকিৎসাবিজ্ঞানের দিক থেকে সেটাও একপ্রকার রেনেসাঁস। কিন্তু তার সীমা অত্যন্ত সংকীর্ণ। গ্রীক থেকে কিছু দার্শনিক গ্রন্থও আরবীতে তর্জমা হয়েছিল। কিন্তু সবার উপরে কোরান সত্য, তাহার উপরে নাই। তাই মানবিকবাদী চিন্তা আরব পারসিকদের মধ্যে দীর্ঘস্থায়ী হয় না। ভারতের মুসলিম সমাজ কালক্রমে সেকেলে হয়ে যায়। রিয়ালিটির থেকে তাদের দূরত্ব মাদ্রাসার শিক্ষার দ্বারা ঘোচে না। ঘোচবার নয়। প্রয়োজন ছিল হিন্দু কলেজের অনুরূপ আর একটি কলেজ প্রতিষ্ঠার অথবা হিন্দু কলেজেই অহিন্দু ছাত্রদের সহাধ্যয়নের। প্রথমটিতে মুসলিম সমাজের আগ্রহ ছিল না। দ্বিতীয়টিতে হিন্দু সমাজের আপত্তি ছিল। শেষে সরকারী চাপে হিন্দু কলেজের উচ্চতর বিভাগ রূপান্তরিত হয় প্রেসিডেন্সী কলেজে, নিম্নতর বিভাগ নামান্তরিত হয় হিন্দু স্কুলে। মুসলমানরা কলেজ বিভাগে প্রবেশ পায়। কিন্তু তাদের সংখ্যা বাড়া দূরে থাক কমতে কমতে শূন্য হয়ে যায়। বোঝা গেল যে তারা কলেজ ফী যোগাড় করতে পারছে না। তখন তাদের জন্যে ছাত্রবৃত্তির ব্যবস্থা করতে হয়। ইতিমধ্যে হিন্দু ছাত্ররা ঝাঁকে ঝাঁকে পাশ করে বেরিয়েছে। কেবল প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে নয়, বেসরকারী কলেজ থেকে, যেখানকার ফী অনেক কম। হিন্দু ছাত্ররা যে স্টার্ট পেয়ে যায় মুসলিম ছাত্ররা একই কলেজে পড়ে কোন দিনই তার সঙ্গে পাল্লা দিতে পারে না। তখন তাদের জন্যে আলাদা কলেজ খুলতে হয়। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় তো সেই একই। পরে তাদের জন্যে আলাদা বিশ্ব-বিদ্যালয়ও হলো। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়টা প্রধানত তাদের স্বার্থেই প্রতিষ্ঠিত।

হিন্দু কলেজের মতো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়েরও ঐতিহাসিক ভূমিকা হলো রেনেসাঁসের উদ্বোধন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে কেন্দ্র করে যে 'বুদ্ধির মুক্তি' গোষ্ঠীর উদয় হয় তার নজীর কলকাতার হিন্দু কলেজের 'ইয়ং বেঙ্গল' গোষ্ঠী। ডিরোজিও যার নেতা। মুসলমানপ্রধান পূর্ববাংলার রেনেসাঁসের সূত্রপাত হয় মূল বাংলার রেনেসাঁসের শতখানেক বছর পরে। এই অস্বাভাবিক বিলম্বের একাধিক কারণ। প্রথম কারণটা হলো খ্রীস্টধর্মের সঙ্গে একাকার ভেবে ইংরেজীর প্রতি অনীহা। এটা হিন্দুদের মধ্যেও কতক পরিমাণে ছিল। ওড়িশায় এ মনোভাব বিংশ শতাব্দীর গোড়াতেও লক্ষিত হয়েছে। চিন্তামণি আচার্যের পিতা তাঁকে ইংরেজী স্কুলে পড়তে পাঠাবেন না, ছেলে পাছে খ্রীস্টান হয়ে যায়। ছেলেকে বাড়ী থেকে পালাতে হয়। অমূলক আশঙ্কা। কিন্তু এর ফলে

রেনেসাঁস বিলম্বিত। সারা দুনিয়ার মুসলমান এর দরুন পশ্চাৎপদ। ইংরেজীর প্রতি অনীহা দূর হলো যদি তো বাংলার প্রতি বিরাগ কিছুতেই যায় না। বাংলা নাকি হিন্দুধর্মের সঙ্গে একাকার। পাকিস্তান সৃষ্টির পরেও বাঙালী মুসলমান বাংলার মধ্যে হিন্দুত্বের গন্ধ পায়। যে ভাষা ইসলামের ভাষা নয় সে ভাষা কি করে বাঙালী মুসলমানের ভাষা হবে? অথচ উর্দু শিখতেও সে উৎসাহ বোধ করে না। প্রতিযোগিতায় উর্দুভাষী মুসলমানদের সঙ্গে পাল্লা দিতে পারবে না। আরবী হরফে লেখা বাংলা, আরবী ফারসী দিয়ে 'পাক' করা বাংলা এমনি কতরকম প্রস্তাবের পর সে বাংলাকেই তার আপনার ভাষা বলে মেনে নেয় ও তার জন্যে প্রাণ পর্যন্ত উৎসর্গ করে।

ভূমি বা ভাষা এর একটির বা এ দুটির উপর দাঁড়িয়ে আছে যে কোনো দেশের রেনেসাঁস। তা সে ইটালীরই হোক আর বাংলারই হোক। হিন্দুত্বের রেনেসাঁস হয় না, হয় রেফরমেশন। ইসলামের রেনেসাঁস হয় না, হতে পারত রেফরমেশন, কিন্তু এখনো হয়নি। হিন্দুরা এটা মোটামুটি বুঝতে পারে মাইকেল মধুসূদনের কীর্তি দেখে। তিনি ধর্মে হিন্দু নন, তাঁর স্ত্রী ফরাসী, তাঁর আচার সাহেবী, অথচ তাঁর সৃষ্টির জন্যে প্রত্যেক বাঙালীর উচ্চতা বেড়ে গেছে। রবীন্দ্রনাথ বহুদেবতাবাদী সাকারবাদী হিন্দু নন, একেশ্বরবাদী ব্রাহ্ম। অথচ বিশ্বকবিসভায় তিনিই বাঙালীর অদ্বিতীয় প্রতিনিধি। বাংলার রেনেসাঁসের আদি পুরুষ বলে যদি রামমোহনকে গণনা করি তবে তিনিও সাম্প্রদায়িক অর্থে হিন্দু নন। আর যদি রামমোহনকে রেনেসাঁসের আদি পুরুষ না বলে রেফরমেশনের আদি পুরুষ বলি তবে রেনেসাঁসের আদি পুরুষ বলতে হয় ডিরোজিওকে। কিন্তু তাঁর চিন্তার বাহন ছিল বাংলা নয়, ইংরেজী। ঐতিহাসিক কারণে বাংলা আর ইংরেজী দুই ভাষাই হয় বাংলার রেনেসাঁসের আধার। রামমোহনের বেলাও তাই। মাইকেলের বেলাও তাই। বঙ্কিমচন্দ্রের বেলাও তাই। এমন কি বিদ্যাসাগরও ইংরেজীতে লিখেছেন। এক্ষেত্রে দেশই বড়ো কথা। ভাষা তার পরে।

এখন যাকে বাংলাদেশ বলে চিহ্নিত করা হচ্ছে তার বেলা কিন্তু ভাষাই বড়ো কথা। দেশ তার পরে। পাকিস্তানের সৃষ্টি ধর্ম থেকে। বাংলাদেশের সৃষ্টি ভাষা থেকে। সেখানকার রেনেসাঁস বিলম্বিত হলেও সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তবে সব সময় মনে রাখতে হবে যে রিয়ালিটির সঙ্গে পা মিলিয়ে নিতে হবে নইলে বাংলাও সংস্কৃত ও ফারসীর মতো পেছনে পড়ে থাকবে।

পরিশিষ্ট

পাশ্চাত্য রেনেসাঁস বেশী লোকের কাজ নয়, অল্পসংখ্যক বিদ্বান ও শিল্পীর কাজ। প্রাচীন গ্রীসেও প্রদীপের তলায় ছিল অন্ধকার। অধিকাংশ লোকই ক্রীতদাস বা ধর্মান্ধ। পাশ্চাত্য রেনেসাঁস যেখান থেকে প্রেরণা পেয়েছিল সে দেশ প্রাচীন গ্রীস। আর পাশ্চাত্য রেফরমেশন যে দেশ থেকে প্রেরণা পেয়েছিল সেদেশ প্রাচীন প্যালেস্টাইন। এই দুটো মুভমেণ্ট বিচ্ছিন্ন না হলেও স্বতন্ত্র। লুথার ক্যালভিনকে কেউ রেনেসাঁসের নায়ক বলে না। রেনেসাঁসের অগ্রণী যে ইটালী সেখানে কোনোদিনই রেফরমেশন ঘটেনি। মোগলদের আমলে যে প্রদেশ মধ্যযুগে ছিল সে প্রদেশ ইংরেজদের আমল শুরু হবার ষাট বছরের মধ্যেই আধুনিক যুগের আলো বাতাস লেগে নতুন করে জেগে উঠেছিল এটা কি বিস্ময়ের কথা? কোনোদেশে কোনোকালে সবাই কি একদিনে বা এক শতাব্দীতে জেগেছে? ইটালীর গ্রামবাসী জনগণ কি আজো রেনেসাঁসের তাৎপর্য বুঝেছে? রেনেসাঁস থেকে শিল্পবিপ্লবে পৌঁছতে ইংলণ্ডেরই লেগেছে তিনশো বছর। ইটালীর তো আরো বেশী। দক্ষিণ ইটালীতে এখনো ও জিনিস হয়নি।

কাউণ্টার রেনেসাঁস ইটালীতেও ঘটেছিল। কাউণ্টার রেফরমেশন জার্মানীতেও। এ দেশে ঘটলে আশ্চর্যের কী আছে? আমাদের জাতীয়তাবাদীদের মধ্যে সব রকমের লোক ছিলেন। বীরপূজা রাশিয়ার মতো নাস্তিকদের দেশেও দেখা যাচ্ছে। যুক্তিবাদ কোন্ দেশেই বা সুপ্রতিষ্ঠিত! চীনদেশ কোনকালেই ঈশ্বরবাদী ছিল না। কিন্তু কোথায় তার রেনেসাঁস! একটিমাত্র মুভমেণ্টের উপর মানবভাগ্য নির্ভর করে না। সে মুভমেণ্টের দৃঢ়ভিত্তি ইউরোপেও বিরল। দুই মহাযুদ্ধ ও রুশবিপ্লবের পর সে ভিত্তিও তেমন দৃঢ় নয়। নইলে সুররিয়্যালিস্ট চিত্র বা অ্যাবসার্ড নাটক আসে কেন?

পশ্চিমের রেনেসাঁসের আদিপর্বে জ্ঞানবিজ্ঞানের ভাষা ছিল লাটিন। সে ভাষায় শিক্ষালাভ করতে ও শিক্ষাদান করতে এক প্রান্তের বিদ্যার্থী ও বিদ্বানরা অপর প্রান্তে যাতায়াত করতেন। অমনি করেই রেনেসাঁস সর্বত্র সঞ্চারিত হয়। লাটিন থেকে ইটালিয়ান, ইংরেজী, ফরাসী, জার্মান ভাষায় উপনীত হতে সাহিত্যের বেলা বেশীদিন লাগেনি, কিন্তু দর্শন বিজ্ঞানের বেলা বহু শতাব্দী লেগে যায়। জার্মানরাই সকলের আগে তাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে লাটিনের পরিবর্তে জার্মান চালায়। অথচ ইংরেজরা এই সেদিনও লাটিন পরীক্ষায় পাশ না করলে অক্সফোর্ড কেমব্রিজে প্রবেশপত্র দিত না। জ্ঞান বিজ্ঞানের ইঙ্গীকরণ খাস ইংলণ্ডেই বেকন নিউটনের যুগে হয়নি। হয়েছে আরো পরে। জ্ঞান বিজ্ঞানের বঙ্গীকরণ কি রাতারাতি হতে পারে? বঙ্গীকরণ কেন গত শতাব্দীতে হলো না, কেন এই শতাব্দীতে হচ্ছে না, তার কারণ জ্ঞানবিজ্ঞান আলো বাতাসের মতো আন্তর্জাতিক। মাটির মতো জাতীয় নয়। সাহিত্যের সঙ্গে তুলনা হয় না। ইংরেজীই একালের লাটিন বা সংস্কৃত। তাকে হটানো জনগণের স্তরে সম্ভব, কিন্তু সুধীজনের স্তরে অসম্ভব। লোকভাষা দিয়ে পপুলার সায়েন্স লেখা যায়, কিন্তু সায়েন্স লিখতে সত্যেন্দ্রনাথ বসু, সুনীতি-

কুমার চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি আচার্যরা এখনো তো পারলেন না। যে দু'একজন চেষ্টা করেছেন তাঁরা ভারতের অন্যত্র অপঠিত ও অচলিত, ভারতের বাইরে তো অজ্ঞাত ও অপাঙ্‌ক্তেয়। অমন যে রবীন্দ্রনাথ তাঁকেই বা চিনত কে, যদি না তাঁর রচনা ইংরেজীতে তর্জমা হতো?

রেনেসাঁস জনগণের সৃষ্টি নয়। জনগণের কাছে তাকে পৌঁছে দিতে হলে তার দায়িত্ব নিতে হবে লোকশিক্ষকদের। নিরক্ষরতা দূর করতে হবে, লক্ষ লক্ষ প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয় স্থাপন করতে হবে। বেতার ও টেলিভিসনের সাহায্য নিতে হবে। রাষ্ট্র যতদিন না যুদ্ধের জন্যে খরচ কমিয়ে শিক্ষার জন্যে খরচ বাড়াচ্ছে ততদিন ওটা দুরাশা। স্বাধীনতার পরে সামরিক ব্যয় বহুগুণিত হয়েছে। যন্ত্রশিল্পের বিস্তারও প্রভূত ব্যয়সাপেক্ষ। তবে লোকশিক্ষার সমস্যারও একদিন সমাধান হবে। যেটার হবে না সেটা রেনেসাঁসের মূল সমস্যা। হাজার হাজার বছর আমরা চর্বিত চর্বণ ছাড়া আর কিছু করিনি। সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস একই বিষয়বস্তু নিয়ে শত শত গ্রন্থ রচনার ইতিহাস। ঊনবিংশ শতাব্দীর পূর্বে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসও তাই। বিচিত্র অভিজ্ঞতা, অপূর্ব আবিষ্কার না হলে রেনেসাঁস হয় না। অজ্ঞেয়বাদ এদেশে আড়াই হাজার বছর আগেও ছিল। তার থেকে ক'খানা মহাকাব্য হতে পারে! যুক্তিবাদের চূড়ান্ত দেখিয়েছেন বৌদ্ধরা। সেই বা কী রেখে গেল! সব দিক বিবেচনা করলে গত শতাব্দী ভূতপূর্ব বহু শতাব্দীর মতো বন্ধ্যা নয়, উর্বরা। বীজ এসেছিল বাইরে থেকে আলোর সঙ্গে বাতাসের সঙ্গে।

শ্রীসুনীল বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রবন্ধপুস্তকের ভূমিকারূপে প্রকাশিত আমার এই রচনাটি এই বইয়ের পরিশিষ্টরূপে পুনঃপ্রকাশিত হলো।

অন্নদাশঙ্কর রায়

কবি ও তার স্বকাল

কবি কি তার স্বকালের ?

কবি তার স্বকালের বই-কি। কিন্তু কবির উক্তি একবার উচ্চারিত হলে চিরকালের। হাওয়ার পিঠে সওয়ার হয়ে বীজ যেমন দূর দেশে যায় তেমনি সময়ের পাখায় ভর দিয়ে কবির উক্তি যেতে পারে নিরবধি কালের শেষ সীমানা অবধি। মিশরের মমীর সঙ্গে পাওয়া শস্যের মতো চার হাজার বছরের বিস্মৃতির পরে অঙ্কুরিত হতে পারে কবির উক্তি। সমসাময়িক সমালোচকরা অনেক সময় সেই সোনার জহুরীর মতো যে কমলবনে আসে কমলকে নিকষে ঘষে পরখ করতে। সমসাময়িক জীবনের উপর প্রভাব বা প্রভাবের জ্ঞান দিয়ে কবির উক্তির বিচার করা চলে না। ম্যাথ্যু আর্নল্ডের বিবেচনায় শেলী একটি নিষ্ফল দেবদূত, তার শূন্যে ডানা ঝটপট করা বৃথা। অথচ গান্ধী, ভারতের কর্মী পুরুষ, বৈদেশিক শাসনের সশস্ত্র শক্তিকে তুচ্ছ করার প্রেরণা সঞ্চার করেছিলেন লক্ষ লক্ষ হৃদয়ে শেলীর উক্তি দিয়ে। গান্ধী যদি ইতিহাস সৃষ্টি করে থাকেন, তাঁর হাত দিয়ে শেলী কি সৃষ্টি করেননি ইতিহাস ? কবির যদি এমন ভাগ্য না-ও হয় তবু সে যে বলতে পেয়েছে যা বলতে চায় এর জন্যে তার কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত। দুঃখের বিষয় আজকের দিনে কবির সমস্যা এই যে পৃথিবীর বৃহৎ অংশে কবি যা বলতে চায় তা বলতে পায় না। যেখানে বলতে পায় সেখানেও তাকে লড়তে হয় নানা অদৃশ্য শক্তির সঙ্গে যারা তার শব্দকে ভিন্ন আকৃতি দিতে ও নির্বীর্য করতে চায়। ফলে রাশি রাশি শব্দ উৎপন্ন হচ্ছে, কিন্তু তাদের শক্তি নেই অঙ্কুরিত হবার।

কবি যে তার স্বকালের এটা কী ভাবে ?

যে ভাবে গাছ তার মাটির। গাছের বীজকে সব ক্ষেত্রে সময়ের সীমায় আবদ্ধ করা যায় না। কিন্তু গাছকে তার সীমা মানতে হয় প্রতি ক্ষেত্রে। তবে স্বকালের হতে হতে কবি তার স্বকালের ঊর্ধ্বে উঠতে পারে।

—প্রবন্ধ সমগ্র দ্বিতীয় খণ্ড সমাপ্ত—